ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক

Ebong Prantik

বর্ষ ৯, সংখ্যা ২১, সেপ্টেম্বর, ২০২২

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 7.309
Vol. 9th Issue 21th, Sept., 2022

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদক

সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 7.309
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 9th Issue 21th, 26th Sept., 2022, Rs. 700/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
৯ ম বর্ষ ও ২১ তম সংখ্যা
২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিষ্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২
সার্বিক সহয়তা - সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৭০০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ,
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. মোনালিসা দাস, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল,
ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনির্বাণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মাখন চন্দ্র রায় (বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

রচনা রায় (বাংলা বিভাগ, আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা (বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (আর্য মহিলা পি. জি. কলেজ, বারাণসী)
ড. শান্তনু দলাই (এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

১. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। অনধিক ৪০০০ শব্দ সংখ্যা এবং সঙ্গে ৪০০/৫০০ শব্দের সারাৎসার পাঠাতে হবে।

২. পেজমেকার/ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠানো যাবে। ১৪ ফন্টে লেখা পাঠাতে হবে এবং সঙ্গে পি ডিএফ ও সফট কপি (লেখা নির্বাচিত হলে) পাঠাতে হবে। হাতে লেখা হলে মার্জিনসহ পরিচ্ছন্ন লেখা পাঠাবেন।

৩. অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হবে না। লেখার কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।

৪. পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।

৫. কোনো লেখা ছাপার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে কিনা তা জানতে ৩/৪ মাস সময় লাগতে পারে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২
ফোন : ৯৮০৪৯২৩১৮২

Registered Address
Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102
Ph. No. : 9804923182
E-mail : ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস
ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০০ টাকা এবং
ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে

প্রাপ্তিস্থান
দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা / এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন
Website : www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

কাজী নজরুল ইসলামের গানের বিচিত্রতা প্রসঙ্গ : প্রেম

টুম্পা সমদ্দার ১৫

উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলা কবিতা : কয়েকটি মৌল চেতনা

তাপস ব্যানার্জী ২৪

বিদ্যাসাগরীয় জীবনাদর্শ ও জাতির জনক

অভি কোলে ৩২

ভারহীন গল্পকথার কথক প্রভাতকুমার

বিশ্বজিৎ পোদ্দার ৪০

১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইন ও পরবর্তী এক দশকের বাংলার রাজনীতির গতিপ্রকৃতি

রেবতী রঞ্জন ওঝা ৪৮

বাংলা ছোটগল্প : সূচনা পর্বের শিল্পরূপ

অলোক নস্কর ৫৯

অহিংসা : টলস্টয়, গান্ধি ও রবীন্দ্রনাথ - উত্তরণের পারস্পরিকতা

অজয় কুমার দাস ৬৮

ভারতীয় সমাজে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা ও কর্মযোগ

অক্ষয় দত্ত ৯৫

নবনীতা দেবসেনের অ্যালবাট্রস্ : নারীর যাত্রাপথের এক ভিন্ন স্বর

অমিত অধিকারী ১০১

অমর মিত্রের গল্পে ভারতবর্ষের বর্ণময় চিত্র

বহ্নিশিখা সরকার ১০৭

স্বাধীনতা পরবর্তী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নির্বাচিত ছোটগল্প : ব্যক্তির জীবিকাগত বৈচিত্র্য ও সমস্যা

ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য্য ১১৬

বহুমুখী ভাবনা ও বহুমাত্রিক পাঠ: সুকুমারী ভট্টাচার্যের মহাভারত চর্চা
স্নেহাশিস দাস কর্মকার ১২৩

কল্পবিজ্ঞানের আলোকে প্রকাশ কুমার মাইতি'র 'মেধা বৃদ্ধির দাওয়াই'
দীপান্বিতা কাঁড়ার ১৩২

রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক জ্ঞানের আলোকে শশাঙ্ক ও হর্ষবর্ধনের দ্বন্দ্ব বিচার
ধৃতি মোহন বিশ্বাস ১৩৮

মল্লিকা সেনগুপ্তের উপন্যাসে পুরুষ
শর্মী বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৭

পুরুলিয়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
নীলাঞ্জন চাকী ১৫৪

ভারতের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে
আঞ্চলিকতাবাদ: একটি তাত্ত্বিক আলোচনা
জ্যোতি মিত্র ১৬২

তারাশঙ্কর : দেশ-কাল ও ধাত্রীদেবতা উপন্যাস
সদানন্দ বেরা ১৭৪

সমাজ শিক্ষায় বিবেকানন্দ : দেশাত্মবোধের প্রেক্ষিতে
তারক নাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৪

রবীন্দ্রনাথের দেনাপাওনা : অকালে নিরুপমার বিসর্জন
সিদ্ধার্থ ঘোষ ১৯৪

সুধামুখীর স্বপ্ন
বৈশালী বিশ্বাস ২০০

সুশীল জানার ছোটগল্প : একটি আলোচনা
সুজাতা দাস ২০৭

অতিমারির প্রেক্ষাপটে কবি কৃষ্ণরাম দাসের শীতলামঙ্গল
শুকদেব ঘোষ ২১৩

ভগীরথ মিশ্রের 'চারণভূমি' : ভকত সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা

সুতনু দাস ২১৯

বিমূর্তে মূর্ত যাপন: সংযোগের অনুভূতি বিচ্ছিন্নতায়

শুভদীপ মুখার্জী ২২৫

অদ্ভুতময়তায় আবিষ্ট চেতনা: প্রসঙ্গ রবীন্দ্র ছোটগল্প

বিশ্বজিৎ সাউ ২৩০

অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্পে নিম্নবর্গের স্বরূপ সন্ধান : সামাজিক
নিপীড়নে নিম্নবর্গের ভূমিকা

প্রতাপ বিশ্বাস ২৩৯

শরৎচন্দ্রের নির্বাচিত গল্পে সামাজিক অনুশাসন

সমরেশ বাগ ২৪৭

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে দেশাত্মবোধক
সংগীতের স্ফূরণ ও বিবর্তন: একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

দেবলীনা ভট্টাচার্য্য ২৫২

তুলসীদাস ও সতীনাথের জীবনরসে সম্পৃক্ত "ঢোঁড়াই রামকথা"

পায়েল বাগচী ২৬০

কাঞ্চনজঙ্ঘা : চিত্রনাট্যের বীক্ষণে ভাষা ও সংস্কৃতি

তপন কুমার বালা ২৬৭

নির্বাচিত পত্রিকাসমূহ- একটি সৃষ্টি ও সৃষ্টিক্ষেত্র: সার্ধশতবর্ষের আলোকে

তমা দাস ২৭৭

জীবনানন্দের কাব্য ভাবনা: অস্তিবাদের আলোকে

অচ্যুতানন্দ বিশ্বাস ২৮২

মেঘালয়ের কয়লা শ্রমিকদের যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবনের আখ্যান:
অমিতাভ রায়ের 'জোয়াই'

যাদব মুরারী ২৯০

দেবারতি মিত্রের কবিতা : প্রেক্ষিতে নাগরিক জীবন-সংস্কৃতি
সত্য দাস ২৯৯

হাসান আজিজুল হকের আত্মজা ও একটি করবী গাছ : পরাজিত বিবেকের আত্মদহন
সাহাবুল মন্ডল ৩০৬

প্রাচীন বাংলার অবয়বে সামজিক ইতিহাস নির্মাণ : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গৌড়মল্লার' উপন্যাস
অপূর্ব সাহা ৩১২

পরিমল গোস্বামীর 'মারকে লেঙ্গে' : এক সংকীর্ণ সময়ের প্রতিচ্ছবি
সুকান্ত চ্যাটার্জি ৩২০

সংস্কৃত সাহিত্যে বিজ্ঞানমনস্কতা : একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা
দেবশ্রী গিরি ৩২৬

বাংলা কথাসাহিত্যে আদিবাসী জনজাতি : প্রসঙ্গ 'অরণ্য-বহ্নি'
বিকাশ কালিন্দী ৩৩৮

রাসসুন্দরী দাসী রচিত 'আমার জীবন' : উনিশ শতকের সাধারণ এক রমণীর আত্মদর্শন : নারীদের যন্ত্রণাময় জীবনের প্রতিচ্ছবি
অন্তিমা ভট্টাচার্য ৩৪৭

লোকসাংস্কৃতিক ভাবনার আলোকে সেলিম আল দীনের 'প্রাচ্য' নাটক
কমল রায় ৩৫৫

প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্প: আত্মপরিচয় সংকট ও বিপন্নতার বহুকৌণিক ভাষ্য
শবনম মুস্তারী ৩৬২

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের উপন্যাসে ভাষাশিল্প
শ্রাবন্তী বর্মন ৩৭০

সত্তরের রাজনীতির প্রেক্ষিতে প্রতিবাদী নাট্যব্যক্তিত্ব অমল রায়

অমর ভাণ্ডারী ৩৭৯

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর নির্বাচিত ছোটোগল্পে অবক্ষয়ী জীবন সংগ্রামের যন্ত্রণা

সুকন্যা বেরা ৩৮৮

সুন্দরবনের প্রকৃতি ও পরিবেশ- সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

অলোক কোরা ৩৯৭

সৈকত রক্ষিতের "সিঁদুরে কাজলে" উপন্যাসে : প্রান্তিক নারীর অবস্থান

রিবা দত্ত ৪০৬

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস : প্রসঙ্গ 'সংস্থান' ধারণা

সন্দীপ দাস ৪১৪

রবীন্দ্রনাথের নাটকে সঙ্গীতের ভূমিকা : অচলায়তন ও মুক্তধারা

অনিন্দিতা শেঠ ৪২৬

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়েরকবি : প্রেক্ষিত লোকসংগীত

দেবলীনা দেবনাথ ৪৩৮

প্রসঙ্গ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য: সৃষ্টির নেপথ্যে ইতিহাস

সুদেব বিশ্বাস ৪৫২

বাংলা ভাষায় উপসর্গের বিশেষ গুরুত্ব ও অবস্থান

মৌমিতা দাস ৪৫৬

রবীন্দ্র সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ন

মুকুল সেন ৪৬৪

বিশ্বায়নের আলোকে সোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুইটি বাংলা নাটক ও
বিপন্ন শিক্ষার্থী

তাপস চক্রবর্তী ৪৭১

বাংলা গানের নবরূপায়ণে বিস্মৃতপ্রায় যোগসূত্র: অতুলপ্রসাদ,
দিলীপকুমার ও নজরুল

গৌরব চৌধুরী ৪৮০

অভিব্যক্তিমূলক মনোচিকিৎসায় সাইকোড্রামার প্রয়োগ-প্রক্রিয়া

আরাফাতুল আলম ৪৯২

সন্ন্যাসী ভোলানাথ সুন্দরবনের ইতিহাসে এক উপেক্ষিত ব্যক্তি

দীপক মন্ডল ৫০৫

UTILIZING SOCIAL MEDIA PLATFORM AS A STRATEGY TO IMPROVE STUDENTS' ENGLISH WRITING SKILLS

Sanjib Kumar Haldar ৫১০

A Study of the Local Legends and Cultural Heritage of the Agrarian Sufi Cult of Bengal

Jahira Hossain ৫১৬

AN OVERVIEW ON TEACHER EDUCATION ENVISAGED BY NEP 2020

Sajal Dey ৫২৬

Is Higher Mind Free from Empirical Mind & from Rational Pressure ? A Brief Discussion in the Light of Sri Aurobindo's Philosophy

Santanu Ger ৫৩১

Religion-Science Interface: Revisiting the Select Works of Rajsekhar Basu

Somnath Roy ৫৩৭

A CRITICAL STUDY OF THE NOVELS OF AMITAV GHOSH FROM THE POST COLONIAL PERSPECTIVE

Rana Gorai ৫৪৩

Online Education & Covid 19

Aniruddha Saha

Aryakannya Samanta ৫৫১

M. N. Roy's Philosophical Reflection on Humanism
Kalpita Nandi ৫৫৭

Comparison of Cyber etiquette and its importance
to the economic development of India
Trisha Paul ৫৬২

Outlier India?
Understanding the Classical Agrarian Question and
Agrarian Transition in India through the Prism of Caste
Sohini Jha ৫৭২

A Study of the Attitudinal Differences of Teachers of
Different Boards in Dooars Region
Sanghamitra Roy ৫৮২

Women –Violence and Peace in North East India
Ananya Bose ৫৯১

In Search of an Alternative Idea of State: John Rawls
Property Owning Democracy and Liberal Socialist Regime
Md. Salim Shahzada ৫৯৯

Steel Workers of Burnpur-Kulti: Understanding Their
Political Conflicts and Trade Union Activities during the
Colonial Period
Chiranjit Gorai ৬০৫

Tebhaga movement in Nadia district
Bhabananda Roy ৬১৪

সম্পাদকীয়

ভুলভুলাইয়ার মধ্যে নয়। বরং ভাবনায় থাকুন। ইচ্ছারাও বাসা বাধে অনিচ্ছার ঘরে। টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো জুড়েই সাত পাঁচের ভাবনাগুলো তৈরি। আমি এবং আপনি চাই ভাবতে এবং ভাবাতে। নিজের ইচ্ছার বিষয় অন্যকে চাপিয়ে নয়। যুক্তির হাত ধরে সমৃদ্ধির বাগানে পৌঁছাতে। অনুসন্ধানের পথ দেখানোই যার উদ্দেশ্য। অপরিচিত পথকে অন্যদের সামনে শুধু পরিচিত করাই নয়। বরং মুগ্ধতা থাকুক। ডাক আসবে নতুনের। সন্ধান হবে ফলস্বরূপ ।

কাজী নজরুল ইসলামের গানের বিচিত্রতা প্রসঙ্গ : প্রেম

টুম্পা সমাদ্দার
সহকারী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সুর ও বাণীর সম্মিলনে মানবচিত্তের বিচিত্র ভাব রচনায় কাজী নজরুল ইসলামের গান এক অসামান্য সৃষ্টি। কবি নজরুলের সৃষ্টিশীল জীবনের (১৯২০ - ১৯৪২) অর্ধেকেরও বেশি সময় কেটেছে সংগীতের ভুবনে। তার অফুরন্ত গানের বাণী কখনো আমাদের সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছে, বিদ্রোহী করে তুলেছে, কখনো-বা সংবেদনশীল হৃদয়ে আবেগ জাগিয়েছে। এই গান শুধু গান নয়, প্রতিটি গানে মিশে রয়েছে তার নিজস্ব জীবন-উপলব্ধির প্রকাশ। ব্যক্তি-নজরুলের প্রেমের অনুভূতি, ব্যর্থতা, প্রতীক্ষা, হতাশা, উল্লাস, উচ্ছ্বাস তার সমগ্র সৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে। তার গানে অনুভবের প্রকাশ একই সঙ্গে আন্তরিক ও তীব্র। বাংলা সংগীতে কাজী নজরুল ইসলাম যে বাণী ও সুরের প্রয়োগ করেছিলেন তা সূদুরসঞ্চারী। আলোচ্য প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলামের আধুনিক গানের বৈচিত্র্যতা প্রকাশ পেয়েছে এবং বিচিত্র বিন্যাসে প্রেমের মিলন, বিরহ, বেদনার রূপ আলোচিত হয়েছে।
সূচকশব্দ: ক্ষমতা, চেতনা, ঔপনিবেশিকতাবাদ, জ্ঞান, আধুনিকতা, আত্মসমর্পণ।

বিমূর্ত অনুভূতি প্রকাশের একটি বিশেষ মাধ্যম সংগীত। এর মধ্যে প্রেম বিমূর্ত অনুভূতি বিশেষ। প্রেমের সৃষ্টি রূপ অথবা গুণে কিংবা উভয়েই। মিলন, বিরহ, বেদনার অন্তর্গূঢ় রক্তক্ষরণ এর অনুষঙ্গ। যুগ যুগ ধরে সকল শিল্প মাধ্যমই প্রেমকে ঘিরে বিকাশ লাভ করেছে। জীবন ও পরিবেশের সঙ্গতি রেখে পরিবর্তিত হয়েছে নানামাত্রিক বিচিত্রতা। বাংলা কাব্য সংগীতের ধারায় আধুনিক গান বা প্রেমসংগীত একটি অন্যতম ধারা। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর আধুনিক গানে এই বিষয়টিকে আশ্রয় করেছেন বহুবার এবং বিচিত্র বিন্যাসে।

আধুনিক বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে সুকুমার রায় তাঁর ‘বাংলা সংগীতের রূপ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

> যে কোন শিল্পরূপের সমসাময়িক প্রবাহমান ভাবধারা তাকে আধুনিক করে তোলে। সমসাময়িক রাজনীতির জন্যে, জীবনের প্রয়োজনে এবং যেকোন মনোভাব রূপায়ণের নবসৃষ্ট কায়দার জন্যে শিল্পে আধুনিকতা প্রতিফলিত হয়। কিন্তু কেন এরূপ হয়? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সেই এক কথাই বলা চলে- সমসাময়িক প্রয়োজন। সমসাময়িক প্রয়োজনে চিত্রে, কবিতায় এবং অন্যান্য সুকুমার শিল্পে যেমন আধুনিকতা প্রশ্রয় পায়, সংগীতেরও তেমনি করেই আধুনিকতার উদ্ভব। কিন্তু সংগীতকে যে অর্থে এখানে আধুনিক বলে উল্লেখ

> করা হচ্ছে, সে অর্থে সকল শিল্পকর্মকেই আধুনিক বলা চলে না। প্রতি যুগের সমসাময়িক ভাবাপন্ন রচনাকে সে যুগের আধুনিক বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু আধুনিক গান এখানে বিশেষ অর্থে আধুনিক, সাধারণ অর্থে প্রযোজ্য নয়।(উদ্ধৃতি: করুনাময়, ১৯৭৮: ২৮১-২৮২)

আধুনিক গান বা প্রেম সংগীত বলতে আমরা মূলত নর-নারীর ভালোবাসার গানকে বুঝে থাকি। বাংলা কাব্য সংগীতে এই ধারার প্রতিষ্ঠা করেন নিধু বাবু (১৭৪১-১৮৩৯)। রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলার আবরণ থেকে মুক্ত করে তিনি বাংলা গানকে সর্বজনীন ভালোবাসার গানে পরিণত করেন। মর্ত্যবাসী নর-নারীর ভালোবাসাই এই গানের উপজীব্য। কাজী নজরুলের আধুনিক গানকে আমরা কাব্যগীতিও বলে থাকি। প্রকৃতপক্ষে কাজী নজরুলের সকল শ্রেণির গীত রচনাই কাব্যগীতি। যেখানে গানের বাণী ও সুর একে অপরকে ছাপিয়ে যায় না। সহজ সরল সুরে একটি কাব্য রচনা করে। কলকাতার হরফ প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত জনাব আব্দুল আজীজ আল আমান এর সম্পাদিত 'নজরুল গীতি অখন্ড' এর দ্বিতীয় সংস্করণে কাব্যগীতি হিসেবে আখ্যায়িত কাজী নজরুলের ৭৮১ টি আধুনিক গান পাওয়া যায়। বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদ সুধীর চক্রবর্তী তাঁর রচিত 'শত শত গীত মুখরিত' গ্রন্থে লিখেছেন:

> ১৯২৭ সালে কলকাতা বেতার কেন্দ্র চালু হবার পর যেসব নতুন তৈরি বাংলা গান সেখানে পরিবেশিত হতো তার নাম ছিল 'ভাবগীতি' ও 'কাব্যগীতি'। অনেক পরে ঢাকায় যখন বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হলো তখন সেখান থেকে 'আধুনিক বাংলা গান' কথাটা প্রথম চালানো হয়। সেটাই শেষ পর্যন্ত সবাই মেনে নিয়েছেন। (সুধীর, ২০১৮: ২১৪)

আধুনিক গান মূলত নর-নারীর ভালোবাসার গান। কাজী নজরুলের আধুনিক গানের প্রধান বিষয়বস্তু প্রেম। আনন্দে, বিষাদে, অনুরাগে কাজী নজরুলের প্রেমের গান সাধারণ জাগতিক মানুষের অনুভব ও আবেগের প্রতিচ্ছবি। সমালোচকের ভাষায়-

> ১৯৩৪ সালে বাংলা গানে ভুবনে 'মডার্ণ' তথা 'আধুিনক গান' নামকরণে একটি জনপ্রিয় নতুন সঙ্গীত বিভাগ সংযোজন করেন সঙ্গীত ¯্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলাম। গানের কথা ও সুর রচনায় ভিন্ন মেজাজ ও ঢঙ তথা বিচিত্র নান্দনিক রসসম্ভারে আধুনিক বাংলা গানকে ঋদ্ধ করেন তিনি। (সাত্তার, ১৯৯৩: ৪০৩)

উচ্ছ্বাসে, অনুরাগে, বেদনায়, বিহবলতায় এই প্রেমের গান মানুষকে কখনো আনন্দ দিয়েছে, কখনো মনে আশা জাগিয়েছে, কখনো বিরহী করে তুলেছে, কখনো বা মনকে ব্যাকুল করেছে। তিনি তাঁর সৃষ্টিতে প্রেমের বিরহ, ব্যর্থতা, আশা-নিরাশা, আনন্দ, বেদনা, না পাওয়ার আকুতি, পাওয়ার ব্যকুলতা, মিলন নানা বৈচিত্র্যের বা অনুভূতির

প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলামের আধুনিক গানের নানা বিষয়কে বিভিন্ন উপ-বিভাগে ভাগ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিরহ-বিচ্ছেদ

নজরুলের কাব্য সংগীতে বা প্রেম সংগীতে ফুটে উঠেছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনুভূতি। তাঁর জীবনের না পাওয়ার বেদনা তাঁকে করে তুলেছিল বিরহী। সেই বিরহী মনের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অসংখ্য প্রেমের গানে।

১. আমি চিরতরে দূরে চলে যাব তবু আমারে দেব না ভূলিতে

আমি বাতাস হইয়া জড়াইব কেশ বেণী যাবে যবে খুলিতে। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬:

৩৭)

গানটি বিরহের গান। মৃত্যু বিচ্ছেদই আবার শুধু মৃত্যুর বিচ্ছেদ নয়। প্রেম না পাবার, পেয়ে হারাবার ব্যথা এই গানে প্রকাশ পেয়েছে। প্রিয়ার প্রেম হারিয়ে কবি তাঁর চির বিদায়ের কথা বলেছেন। আবার চির বিদায়ের পরে প্রিয়ার দেহে-মনে সমগ্র অস্তিত্বে কীভাবে জড়িয়ে থাকবেন, তার ছবি এঁকেছেন। ভুলিতে না দেয়ার চাঁপা প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা, সুরের নেশায় আকাশ ঝিমায়, বাতাস কাঁদে- সমগ্র উপমায় কবির বিরহী মনের ব্যকুলতায় প্রকাশ পেয়েছে একটি নাট্যিক সমাপ্তি। যেন দৃশ্যমান-কুঞ্জপথে নৃত্যপর রমণী চলেছে- তাকে থমকে দাঁড়াতে হল ব্যথার কশাঘাতে। তার প্রিয়া তার চলার পথের ধুলায় মিশে আছে। বিরহ-বিচ্ছিন্ন প্রেমিক এই গানে ‘বাতাসে, ‘রোদনে,‘ধুলি, কণায় মিশে আছে। এই গানের সুর ও গায়কীতে অনেক সংগীত রসিক এবং প্রেমিক মন মোহাবিষ্ট হবেন।

সঞ্চারীতে কবির অভিমানী হৃদয় গেয়ে ওঠে-

আসিবে তোমার পরমোৎসব কত প্রিয়জন কে জানে মনে পড়ে যাবে- কোন সে ভিখারি পায়নি ভিক্ষা এখানে। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ৩৭)

সুরের মাঝেও বেদনার করূণ রূপের প্রকাশ এখানে সুস্পষ্ট।

২. বঁধু, তোমার আমার এই যে বিরহ এক জনমের নহে।

তাই যত কাছে পাই তত এ হিয়ায় কি যেন অভাব রহে ।

(নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ৮২)

সম্পূর্ণ গান জুড়েই রয়েছে প্রিয়াকে পাওয়ার অব্যক্ত ভালোবাসা। নিমিষের দেখাতেই প্রেম অনুভূত হচ্ছে, আবার সেই মালা ছিড়েও ফেলছেন। দু’জন দু’জনকে পাবে না জেনেও পাবার আকুল আকুতি। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-বিরহের মত বিচ্ছেদও যে কতটা গভীর হতে পারে তার প্রকাশ রয়েছে পুরো গান জুড়ে।এই ধরনের গানের বাণীতে বেদনার অনুভুতি শব্দে, ছন্দে, ফুটে উঠেছে।

বিরহ-বেদনা

কাজী নজরুলের আধুনিক গানের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে বিরহ বা বেদনার গান। কবি প্রেমভিক্ষু, শুধু প্রেমভিক্ষু নয়, প্রেম বুভুক্ষু; সিন্ধুর মতো অনন্ত জলরাশি বুকে নিয়েও তিনি চির ক্ষুধিত ও পিপাসিত। তাই বিরহ ও বেদনা এবং বেদনা জনিত বিষাদ তাঁর নিয়তি। অতৃপ্তির জন্য তাঁর বেদনা কিন্তু বেদনাই তাঁর তৃপ্তি। (শাহাবুদ্দিন, ১৩৯২: ৪৫)

১. নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে
হে প্রিয়, কোথা তুমি দূর প্রবাসে। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ৭৭)

দিনের পরে রাত আসে আবার রাতের পরে নতুন দিনের শুরু হয়। কিন্তু তার দু চোখের পাতা এক হয় না। প্রিয় দূর প্রবাসে- তার বিরহে বিরহী মনের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। ভালোবাসার মানুষকে ঘিরে সংশয় গান গুলোকে আরো বিষাদ করে তুলেছে।

২. বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরণে চলো লো গোরী। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ২৯৮)

৩. সাঁঝের পাখিরা ফিরিল কুলায় তুমি ফিরিলে না ঘরে,
আঁধার ভবন জ্বলেনি প্রদীপ মন যে কেমন করে। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ১৮৫)

৪. পিয়া গেছে কবে পরদেশ পিউ কাঁহা ডাকে পাপিয়া,
দোয়েল শ্যামার শীসে তারি হুতাশ উঠেছে ছাপিয়া। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ১৫৮)

৫. আমার ভুবন কান পেতে রয় প্রিয়তম তব লাগিয়া
দীপ নিভে যায়, সকলে ঘুমায় মোর আঁখি রহে জাগিয়া। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ৩৫)

উপরিউক্ত সকল গানেই কবির বিরহী মনের না পাওয়ার আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। কবির অন্তরের অনুভূতি নানা চিত্রকল্পে আমাদের অনুভূতিকে রাঙ্গিয়ে তুলেছে। ‘পিয়া পিয়া বলে ডাকিছে পাপিয়া, ‘সে তরী-সাথিরে খুঁজি, ‘কেন মনে পড়ে যায় তাকে- এখানে আমরা কবি হৃদয়ের বিরহী মনের বেদনাকে উপলব্ধি করি।

আকুতি-আকুলতা-ব্যকুলতা প্রেমের তীব্রতাই মানুষকে ব্যাকুল বা আকুল করে তোলে। প্রিয় বা প্রিয়াকে কাছে পাবার আকুতিই এই গানের উপজীব্য। আত্ম নিবেদনই এখানে মূল কথা। কখনো অর্থবোধক, কখনো শুধু কথা, নেই তার অর্থ, শুধু বলে যাওয়া। একটি হৃদয় আরেকটি হৃদয়কে কাছে পাবার আকুলতা, চোখে চোখ রেখে আকাশের গ্রহ, নক্ষত্র, তারা সুরে ফিরে এসে আবার কথার জাল বোনা। দোঁহে দোঁহে বলে ‘এসো প্রিয় আরো কাছে’।

১. আরো কতদিন বাকি

তোমারে পাওয়ার আগে বুঝি হায়! নিভে যায় মোর আঁখি। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ২৬)

প্রিয় বা প্রিয়াকে ফিরে পাওয়ার আকুতি এই গানে সর্বত্র বিরাজিত। গানের সুরেও বিরহী মনের বেদনা প্রকাশ পেয়েছে।

২. কত আর এ মন্দির দ্বার, হে প্রিয়, রাখিব খুলি'।
বয়ে যায় যে লগ্নের ক্ষণ, জীবনে ঘনায় গোধুলি। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ১৬৫)

স্মৃতির মালিকা শুকিয়ে যায়, জীবনে ঘনায় গোধূলি তবু দেখা মেলে না প্রাণের দেবতার।

৩. আমি জানি তব মন বুঝি তব ভাষা
তব কঠিন হিয়ার তলে জাগে কি গভীর ভালবাসা। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ৩৭)

শত অভিমান অবহেরা ভুলেও ভালোবাসার মানুষকে ফিরে পাবার অসীম পিয়াসা প্রকাশ পেয়েছে এই গানে।

৪. এসো প্রিয় আরো কাছে
পাইতে হৃদয়ে এ বিরহী মন যাচে। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ১০)
৫. ঝর ঝর বারি ঝরে অম্বর ব্যাপিয়া
এসো এসো মেঘমালা প্রিয়া প্রিয়া। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ২০)

ভালোবাসার মানুষকে কাছে পাবার, অনুভব করার কী ব্যাকূল পিয়াসা-

দূরে থেকোনা এই শ্রাবণ নিশিথে
কাঁদে তব তরে পিয়াসী হিয়া। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ২০)
৬. এসো প্রিয়, মন রাঙ্গায়ে ধীরে ধীরে ঘুম ভাঙ্গায়ে
মন মাধবী বন দুলায়ে, দুলায়ে, দুলায়ে। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ৬)
৭. সাধ জাগে মনে পর-জীবনে
(আমি) তব কপোলে যেন তিল হই।
ভালবাসিয়া মোরে দিল্ দিবে তুমি
(যেন) আমি তোমার মত বে-দিল্ ঘন। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ৯)

সকল প্রেম ভাবনা বা প্রত্যাখান বিচ্ছেদ তৈরি করে না। কখনো কখনো মনে আশাও জাগিয়ে তোলে। উপরের উল্লিখিত সব গানেই প্রিয় বা প্রিয়াকে কাছে পাবার আকুতি বা আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। দীর্ঘ বিরহের পরে মিলন সেই আকুতি বা ব্যাকুলতাই প্রকাশ পেয়েছে গানের কথায়। 'মিটিবে কি তব পরানের পিপাসা, 'কেঁদে যেন ডাকে, 'পাওয়ার সাধ যে জাগে, 'দূরে থেকো না'- ইত্যাদি চিত্রকল্প আমাদের মনকে আশাবাদী করে তোলে।

অভিমান-অবহেলা

কবি নজরুলের প্রেম ভাবনার গানে ফুটে উঠেছে কবি মনের নিঃসঙ্গতার রূপ। প্রিয়াকে কাছে পাবার আনন্দ যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি প্রকাশ পেয়েছে না পাবার বেদনা। মিলনের প্রত্যাশা, বিরহের আর্তি কখনো কখনো রূপ নিয়েছে অভিমানে, অবহেলায়।

১. মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে বিদায় সন্ধ্যাবেলা-
আমি দাঁড়ায়ে রহিনু এপারে তুমি ওপারে ভাসালে ভেলা। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ১৮৬)

সে বলেছিলো- 'রাখিবে আমারে মনে' 'খেলিবে আবার সেই পুরাতন খেলা'। 'গানের পাপিয়া, 'গহন কাননে''পিয়া পিয়া সুরে'ডাকলেও সে ফিরে আসে না। অবহেলা বুকে নিয়ে ফিরে আসে পাখি। ইমন-কল্যাণ রাগে বেদনার রূপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। বিষাদ মিশ্রিত এই গানের সুরে যে প্যাথোজ ভাবের প্রকাশ ঘটেছে তাতে প্রেমিক হৃদয়ে চাঁপা বেদনা গুমরে ওঠে।

২. মোর না মিটিতে আশা ভাঙিল খেলা,
জীবন প্রভাতে এলো বিদায় বেলা । (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ১৮৬)
বহুল প্রচলিত একটি গান। এখানেও বিরহী মন অভিমান সিক্ত-
বুঝি দুখ নিশি মোর
হবে না হবে না ভোর
ভিড়িবে না কূলে মোর বিরহের ভেলা।
৩. যবে তুলসীতলায় প্রিয় সন্ধ্যাবেলায় তুমি করিবে প্রণাম,
তব দেবতার নাম নিতে ভুলিয়া বারেক প্রিয় নিও মোর নাম। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ১৬০)
৪. ভীরু এ মনের কলি ফোটালে না কেন ফোটালে না -
জয় করে কেন নিলে না আমারে, কেন তুমি গেলে চলি। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ১৬১)
৫. বৃথা তুই কাহার, পরে করিস অভিমান
পাষাণ- প্রতিমা সে যে হৃদয় পাষাণ। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ১৯)

উপরে উল্লিখিত সকল গানেই বেদনার অশ্রু অনুভূত হয়েছে। প্রেম প্রত্যাশা সকল গানেই অবহেলা, অভিমানে প্রকাশ পেয়েছে। সুখের প্রত্যাশায় বারবার ফুটে উঠেছে নিরাশার সুর।

মিলন

প্রেম বলতেই আমরা বুঝি মিলন। এই গানে আমাদের মধ্যে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয় তা একেবারেই রোমান্টিক। কাব্যগীতির এই সকল গানে কোথাও বিরহ, বেদনা, চিত্তের

দাহ নেই। দু'জন দু'জনে পাওয়ার আনন্দ গানে ব্যক্ত হয়। মনের শিহরণ এখানে মিলনের মতো পরিপূর্ণ প্রতিফলিত হয়।

১. স্বপ্নে দেখি একটি নতুন ঘর
তুমি আমি দু'জন প্রিয় তুমি আমি দু'জন।
বাহিরে বকুল-বনে কুহু পাপিয়া করে কুজন।
(নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ৯)

উপরিউক্ত গানটি নির্ভেজাল প্রেমের গান। গানের প্রতিটি চরণে শুধুই মিলনের ছোঁয়া। কবি এখানে তাদের মিলনের আনন্দকে 'ব্রজের মধুবন' সঙ্গে তুলনা করেছেন।

২. মোরা ছিনু একেলা, হইনু দু'জন।
সুন্দরতম হ'ল নিখিল ভুবন। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ৫৬৪)

মিলনের প্রত্যেকটি গানে উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। প্রেমের আবেশে আনন্দের শিহরণ, স্বপ্ন কল্পনার অনুভব মনে দোলা জাগায়। উচ্ছ্¡সিত আবেগে মানব মনে আনন্দ অনুভূতির সঞ্চার হয়।

৩. মোরা ছিলাম একা আজি মিলিনু দু'জন।
পাপিয়ার পিয়া বোল্ কপোত-কুজন। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ৫০৬)

এ গানটি একটি নাটিকার গান। বর-বধূর ভালোবাসার গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে এই গানে।

৪. তব গানের ভাষার সুরে বুঝেছি বুঝেছি বুঝেছি
এতদিনে পেয়েছি তারে, আমি যারে খুঁজেছি। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ০৫)

বিরহ সুন্দর হয়ে এসেছে প্রেমিকের জীবনে। উপরিউক্ত গানটিতে সুর ও ছন্দে আনন্দের প্রকাশ।

৫. বাহির দুয়ার মোর বন্ধ হে প্রিয় মনের দুয়ার আজি খোলা,
সেই পথে এসো হে মোর চিত-চোর- হে দেবতা পথ ভোলা। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ১৬০)

লাজ, কলঙ্ক, ভয় গঞ্জনা সব বিদায় দিয়ে মেতে উঠেছে মিলনের আনন্দে।

৬. আজি মিলন বাসর প্রিয়া হের মধুমাধবী নিশা।
কত জনম অভিসারে শেষে প্রিয় পেয়েছি তব দিশা। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ১০১)

চাঁদনী রাতে আজ মিলনের মাতামাতি। এ শুধু আনন্দের রূপ নয়, প্রেমেরও রূপ।

৭. আজ সকালে সূর্য ওঠা সফল হলো মম
ঘরে এলে ফিরে পরবাসী প্রিয়তম। (নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ৩৩)

প্রিয়া ফিরে এসেছে বলেই প্রভাত হয়ে উঠেছে সুখময়। দিনের সকল কাজের মাঝে আনন্দের বীণা বাজে।

৮. মম মায়াময় স্বপনে কার বাঁশী বাজে গোপনে
বিধুর মধুর স্বরে কে এলো, কে এলো সহসা।
(নজরুল গীতি সমগ্র, ২০০৬: ১৭)

মনের সঙ্গে মনের, আত্মার সঙ্গে আত্মার একাত্ম হওয়ার যে বাসনা তাই মিলন। উপরে উল্লেখিত সব গানেই মিলনের চিত্র সুস্পষ্ট। জীবন সত্যিই আনন্দের ও উপভোগের উপরিউক্ত গান গুলোতে এই আবেদন সুস্পষ্ট।

পরিশেষে বলতে পারি মনের আবেগ প্রকাশের সরলতা, বাণী ও সুরের সহজবোধ্যতাই কাজী নজরুলের প্রেমের গানকে আমাদের জীবন ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে। বিশ শতকের ত্রিশের দশকের গোড়ায় সৃষ্ট এক ধরনের বিশেষ সাঙ্গীতিক পরিস্থিতি এ নব সঙ্গীত ধারা বিকাশের প্রধান কারণ। শ্রোতাদের ভালো লাগা-মন্দ লাগা, পছন্দ-অপছন্দসহ শ্রোতাদের মনোরঞ্জন প্রভৃতি বিষয়কে বিবেচনায় রেখেই আধুনিক গান রচিত হয়। কেউ গান রচনা করেছেন, কেউ সুর দিয়েছেন, কেউ সঙ্গীতায়োজন করেছেন, আবার কেউ সুললিত কণ্ঠে সে গান শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আধুনিক গানের এমন ব্যতিক্রম ও যুগোপযোগী কর্মটি বাংলা গানে যাঁর হাত ধরে শুরু হয়েছে তিনি কাজী নজরুল ইসলাম।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. আব্দুল কাদির, *নজরুল প্রতিভার স্বরূপ,* নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৮৯
২. আমিনুল ইসলাম, *নজরুল সংগীত: বাণীর বৈভব,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০২১
৩. আবদুস্ সাত্তার, *নজরুল সঙ্গীত অভিধান,* নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৩
৪. করুণাময় গোস্বামী, নজরুল- গীতি প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮
৫. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম(সম্পাদিত), *নজরুল ইসলাম : নানা প্রসঙ্গ,* নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯১
৬. মোহাম্মদ আবুল খায়ের, *নজরুল সংগীতে নান্দনিকতা,* অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৪
৭. মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্, *নজরুলের কাব্য ও সংগীত,* ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন, ঢাকা, ২০১২
৮. যূথিকা বসু, *বাংলা গানের আঙিনায়,* পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ২০০৪
৯. রশিদুন্নবী(সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *নজরুল সঙ্গীত সমগ্র,* নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০৬

১০. শাহাবুদ্দীন আহমদ, *নজরুল সংগীতের বৈশিষ্ট্য*, নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, ঢাকা, ১৩৯২
১১. সুধীর চক্রবর্তী, *শত শত গীত মুখরিত*, বেঙ্গল পাবলিকেশনস, ঢাকা, ২০১৮
১২. সুশীলকুমার গুপ্ত, *নজরুল- চরিতমানস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭
১৩. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমকালের বাংলা গান ও রবীন্দ্র সংগীত*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯২

উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলা কবিতা : কয়েকটি মৌল চেতনা

তাপস ব্যানার্জী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
গভঃ জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, পুরুলিয়া

বিশ শতকের এক প্রখ্যাত ফরাসী তাত্ত্বিকের নাম মিশেল ফুকো।তিনি সমগ্র বিশ্বে ক্ষমতার তত্ত্বের জন্য সমাদৃত ও সমালোচিত।সভ্যতা, যৌনতা,কিংবা উন্মাদের ইতিহাস সংশ্লেষে তিনি খুঁজে পেয়েছেন ক্ষমতা বা প্রতাপের আধিপত্যকে।তাঁর কাছে ক্ষমতায়ন হল এক ধরনের শোষণ- যা আধুনিক সভ্যতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় রয়েছে।সেই প্রতিষ্ঠান একদিকে যেমন কারাগারের মধ্যে,তেমনি কারখান, স্কুল, হাসপাতালের মধ্যেও রয়েছে। এই প্রতাপেরব লে বলীয়ান রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ এর বিবিধ যুগপৎ শক্তি ব্যক্তির জীবন ও মননকে নিয়ন্ত্রণ করে, শাস্তি দেয়, মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। সমাজের সমস্ত বুদ্ধিজীবী এই ক্ষমতার দন্ডধারী। এই ক্ষমতা জ্ঞান উৎপাদন করে, যাকে তিনি ক্ষমতা-জ্ঞান বলেছেন। এই ক্ষমতা-জ্ঞান এর তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, আর এক তাত্ত্বিক এডওয়ার্ড সাঈদ। যিনি তাঁর “Orientalism”(1978) গ্রন্থে দেখিয়েছেন, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে ইউরোপীয় শক্তি এশিয়া,আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ দখল করে উপনিবেশ স্থাপন করে। এক জ্ঞানতাত্ত্বিক ডিসর্কোসের দ্বারা তারা প্রতিপন্ন করে পাশ্চাত্য উন্নত, প্রাচ্য অনুন্নত।পৃথিবীকে এইভাবে মেরুকরণ করা হয়। উনিশ শতকের বাঙালিদের মধ্যে তাঁদের অনেকে এই প্রকল্পকে মেনে নিয়েছিল, তাদের দিশাতেই ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শনের নির্মাণ করতে চাওয়া হয়েছিল এক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায়।স্বাধীনতা পরবর্তী কালেও একশ্রেণির সাহিত্যিক এই ক্ষমতার কেন্দ্রে অধিষ্ঠান করে, উৎকৃষ্টতার কৃত্রিম বলয় তৈরি করে সাংস্কৃতিক আধিপত্য নির্মাণ করে অপরায়ণ এর প্রক্রিয়াকে জীবিত রেখেছিল। তবু এই অপরের স্বর রুদ্ধ হয় নি। নিজের কন্ঠ খুঁজতে চেয়েছিল। একদিকে আধিপত্য অন্যদিকে সেই আধিপত্যের প্রতিরোধ দেখা গিয়েছিল স্বাধীনতা পরবর্তী কবিতায়।

বাংলা কবিতায় আধুনিকতার সূত্রপাত হয় উনিশ শতকে।সেটা ছিল ঐতিহাসিক আধুনিকতা। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার এক নতুন তাত্ত্বিক রূপ ফুটে উঠে। সেই আধুনিক তত্ত্বের পরিচয়ে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল ত্রিশের কবিরা এবং কয়েকটি সাহিত্যিক পত্রিকা। স্বাধীনতা উত্তরকালে সেই আধুনিকতার নন্দন নিয়ে পাঠক মহলে সমালোচনা হয়েছে। যেমন অমিতাভ গুপ্ত,অঞ্জন সেন প্রমুখের প্রচারিত “উওর আধুনিক” তত্ত্বে সেই আধুনিকতাকে দেখানো হয়েছিল,পাশ্চাত্য আধুনিকতা হিসেবে।তাদের দাবি ছিল,পাশ্চাত্যের হুবুহু অনুকরণ করতে সেই আধুনিকতার সূত্রপাত,অর্থাৎ তা ছিল ঔপনিবেশিক আধুনিকতা। সেই আধুনিকতার

সঙ্গে দেশ ও জাতির কোনো সম্পর্ক ছিল না।তাই অঞ্জন সেন এর বক্তব্যঃ "কবিতার আধুনিকতা বিষয়ে আলোচনায় ঔপনিবেশিকতার প্রসঙ্গ কেন? ঔপনিবেশিকতা একটা জাতির মেরুদন্ড ভেঙে দেয়,সমাজ সংস্কৃতি,শিল্প-সাহিত্য চেতনার যে স্বাভাবিক গতি তা ধীরে ধীরে কৃত্রিমতা দিয়ে ঢেকে দেয়।১৯ শতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একরকমভাবে বাঙালির মেরুদন্ড ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল বিজ্ঞান আর কারিগরির লোভ দেখিয়ে । সে সময় অগ্রসর বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা সবাই এই ঔপনিবেশিকতার কাছে আত্মসমর্পণ করেননি।কিন্তু এক বিপুল অংশ আত্মসমর্পণ করেছিলেন,আজকের বাংলা সাহিত্য তার থেকে মুক্ত হয় নি।"[১]পরবর্তী কালে উত্তর ঔপনিবেশিক চিন্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনে করা হয়,বিশ শতকের ত্রিশের দশকের আধুনিকতার মধ্যে বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট দেখা যায় –যা ঔপনিবেশিক আধুনিকতার মডেলকে অনুসরণ করা হয়েছে। এই আধুনিকতার মধ্যে "এক ধরনের ক্ষমতা লাভের ইপ্সা এই সব লেখায় প্রচ্ছন্ন"[২] ।শধু তাই নয়,এই আধুনিকতার নামে ত্রিশের এই কবিরা বাংলা কাব্যের আবহমানতাকে যেমন তাদের সীমানার বাইরে করেছিল, প্রাচ্যবাদী তাত্ত্বিক এডওয়ার্ড সাঈদের পরিভাষা অনুযায়ী "otherize' করেছিলঃ " সুতরাং একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, রবীন্দ্র পরবর্তী সময়ে বুদ্ধদেব প্রমুখ কবিতার যে ডিকশন নির্মাণ করেছিলেন,যে সীমা নির্দিষ্ট করেছিলেন,তার বহির্ভূত যাবতীয় কবিতাই 'অনাধুনিক'।একথা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে,বুদ্ধদেব প্রমুখ নিজেদের কাব্যাদর্শকে 'আধুনিক' বলে চিহ্নিত করে বেশ কিছু কবিকে "otherize' করেছিলেন"[৩]। এই অপরায়ণের কথা স্বাধীনতা-উত্তর এক কবি মণীন্দ্র গুপ্ত এক জায়গাতে বলেনঃ "রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক,কিন্তু বয়সে ছোট,একদল সমর্থ এবং সাবলীল কবিকে রবীন্দ্রানুসারী বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।ভোঁতা আলোচনার এটা একটা লাগসই কথা মাত্র এবং আমাদের দীর্ঘসূত্রতায় এই ভুল,এই লঘুতাসূচক অভিধা এখনো সেঁটে আছে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়,যতীন্দ্রমোহন বাগচী,সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,কুমুদরঞ্জন মল্লিক,কালিদাস রায়ের নামের সঙ্গে।অথচ স্বাধীনতার আগেকার বিস্তীর্ণ পল্লীবাংলা এবং গরিব বাঙালি জীবন চিরস্থায়ী হয়ে বেঁচে রইল এঁদেরই কবিতার মধ্যে।ক্রমবিস্মৃতি থেকে তুলে এনে এঁদের এখনও পুনঃপ্রতিষ্ঠা দিতে না পারলে আমরা কিসের পাঠক"[৪]আধুনিকতার নামে সেই ঐতিহ্যকে বিসর্জন দেন নি স্বাধীনতা উত্তর কালের কবিরা কিংবা বলা যেতে পারে ঐতিহ্য ও আবহমানতকে মান্যতা দিয়েছিল কালীকৃষ্ণ গুহ,পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল,রমেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী প্রমুখ কবিরা।

ঔপনিবেশিক যে আধুনিকতা বাংলা সাহিত্যে এসেছিল,সেখানে প্রাধান্য পেয়েছিল একধরনের পুরুষতান্ত্রিকতা।ইংরেজিতে যাকে বলা হয় মেল গেইজ। আশিস নন্দী তাঁর " The intimate enemy" "The Psychology of colonialism:Sex,Age and ideology in British India" নামক অধ্যায়ে তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে ব্রিটিশদের সংস্পর্শে এসে ভারতীয় তথা বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে পুরুষ বীরত্ব প্রাধান্য পেয়েছিলঃ

“colonialism,too,was congruent with the existing Western sexual stereotypes and the philosophy of life which they represented. It produced a cultural consensus in which political and socio-economic dominance symbolized the dominance of men and masculinity over women and feminity”[৫] এই পুরুষ প্রাধান্যের লক্ষণ দেখা যায় বাংলা কবিতার তথাকথিত আধুনিকতায়। অনির্বান মুখোপাধ্যায় তাঁর উত্তর- ঔপনিবেশিক বাংলা কবিতা” এ উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি বুদ্ধদেব বসু ও স্বাধীনতা উত্তর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার মধ্যে দেখতে পান। এছাড়াও তুষার রায়,তারাপদ রায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়,রণজিৎ দাশ,জয় গোস্বামী প্রমুখের কবিতায় পাওয়া যায়।আধুনিক এই ডিসকোর্সের বিপ্রতীপে জেগে উঠেছিল উত্তর-ঔপনিবেশিক নারীস্বর। ত্রিশের দশকের যে আধুনিকতা সেখানে নারীদের কবিতা দেখা যায় নি। পুরুষ প্রাধান্যের ফলে নারীস্বরকে অপরায়ন করা হয়েছিল। তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর “প্রতীচ্যের সাহিত্য তত্ত্ব” নামক গ্রন্থের “ নারীচেতনাবাদ” নামক অধ্যায়ে দেখিয়েছেন উপনিবেশবাদের পীড়নে কীভাবে ধ্বস্ত হতে হতে নিরুচ্চার হয়ে পড়ে অন্তেবাসীরা,এটা যেমন দেখিয়েছেন তাঁরা, তেমনি ঔপনিবেশিক প্রতিবেদনকে মোকাবিলা করার পথও খুঁজেছেন।স্পিভক আরও একটু এগিয়ে উপনিবেশকৃত নারীসত্তার বিপুলতর নৈঃশব্দের পরিধির প্রতি তর্জনী সংকেত করেছেন।... গায়ত্রী মনে করেন,নৈঃশব্দ্য-গ্রস্ত অন্তেবাসী নারীর জন্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো পরিসর নেই,উচ্চারণও নেইঃ “ There is no space from where the subaltern (sexed) subject can speak” পিতৃতন্ত্র এতই সর্বগ্রাসী যে নর্মসঙ্গিনী ও যৌনপুত্তলিকা হিসেবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত নারীর জন্যে কোন স্বাধীন ইচ্ছার সম্ভাবনা পর্যন্ত অনুমোদন করতে নারাজ।সুতরাং নারীচেতনা বহুমাত্রিক ঔপনিবেশিকতার আক্রমণে প্রান্তিকায়িত হচ্ছে অহরহ”[৬]এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কবিতায় পঞ্চাশের দশক থেকে ঔপনিবেশিক প্রতাপের ঔদ্ধত্যকে অস্বীকার করে পুরুষপ্রাধান্যের বিপরীতে নারীস্বরের নির্মাণ লক্ষ্য করা যায়। এই কবিদের মধ্যে হলেন কবিতা সিংহ,সাধনা মুখোপাধ্যায়,গীতা চট্টোপাধ্যায়,দেবারতি মিত্র,বিজয়া মুখোপাধ্যায়,কৃষ্ণা বসু,নবনীতা দেবসেন,মল্লিকা সেনগুপ্ত,সুতপা সেনগুপ্ত,মন্দাক্রান্তা সেন প্রমুখ। পুরুষপ্রতাপকে অস্বীকার করে তাঁদের কবিতায় দেখা গেল নারীবাদী কণ্ঠস্বর –

“না আমি হবো না মোম
আমাকে জ্বালিয়ে তুমি লিখবে না ।
হবো না শিমুল শস্য সোনালী নরম
বালিশের কবোষ্ণ গরম।
কবিতা লেখার পরে বুকে শুয়ে ঘুমোতে দেবো না,
আমার কবন্ধ দেহ ভোগ করে তুমি তৃপ্ত মুখ;

জানলে না কাটা মুন্ডে ঘোরে এক বাসন্তী অসুখ..............।

....

তোমার বাঁপাশে তাই নিশ্চিন্ত পুতুল হেন শুই
যন্ত্রণা আমাকে কাটে, যেমন পুথিকে কাটে উই।(না/সহজ সুন্দরী)

কিংবা মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা থেকে বলা যায়-

" আমার শৈশবে কোনও লিঙ্গ ঈর্ষা কখনও ছিল না
আত্মপরিচয়ে আমি সম্পূর্ণ ছিলাম
আজও আমি দ্বিধাহীন সম্পূর্ণ মানুষী
তৃতীয় বিশ্বের এক স্পর্শকাতর কালো মেয়ে
আজ থেকে আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে
কে অধম কে উত্তম বাড়তি কে কমতি কোনটা-
এই কূট তর্কের মীমাংসা করবার ভার
আপনাকে কে দিয়েছে ফ্রয়েড সাহেব ! (ফ্রয়েডকে খোলা চিঠি)

উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলা কবিতায় কবিরা তাঁদের দেশকালের দিকে দৃষ্টি দিলেন। পঞ্চাশের কবিদের আঘাত এনেছিল ষাটের কবিরা। পঞ্চাশের বাংলা কবিদের একটা বিরাট অংশ আত্মজীবনী মূলক কবিতা লেখার দিকে ঝুঁকে ছিলেন। বিচিত্র সমাজ জীবনের সঙ্গে তাদের কবিতার সংযোগ বিঘ্নিত হয়েছিল,যেন বাংলা কবিতার প্রেক্ষিত টিকে ছোট করে এনেছিল। সেই জায়গায় কবিতার বিস্তৃতি চেয়েছিলেন একদল যুবক কবি। এদের মধ্যে একজন ছিলেন কবি দেবদাস আচার্য।তাঁর মনে হয়েছিলঃ "জীবনের ভাষায় হবেই কাব্যভাষা।একটা বড় সমাজ-জীবন, যে সমাজ জীবনে মানুষের আমি।নানা বিচিত্র পেশার নানা বিচিত্র জীবন যাপনের মধ্যে রয়েছে যে বৃহত্তর সমাজের মানুষ,তাকে অনুভব করতে পারলে হয়ত একটা নতুন কাব্যভুবনই গড়ে তোলা যেতে পারে।কাব্য ভাষাও।পঞ্চাশের কবিদের শব্দ-দীনতার কথা আমরা জানি,সেখান থেকে বেরিয়ে নতুন ভাষা নতুন শব্দ ভান্ডার গড়ে তোলার জন্য হাংরিদের কথা আমরা জানি। ষাটের দশকের বিট কবি ও গায়কদের বঙ্গবিজয় ও অ্যালেন গিনসবার্গের কলকাতা আগমন হাংরি কবিদের ওপর কতটা ও কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল,সেটাও আলোচিত হয়েছে ও হচ্ছে।অর্থাৎ এসব,সেই অর্থে,জনজীবনস্পর্শী ছিল না।কাব্য ভাষা সে সময় এসব কারণে সংকীর্ণতা, দীনতায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল বলে আমার মনে হয়। বাংলা কাব্য ভাষাকে ভূমি স্পর্শী করার দরকার ছিল।আর এটা করতে হলে প্রথমেই দেশ কাল সময় সমাজ জনজীবন প্রবাহের দিকে যেমন নজর দেওয়া জরুরী ছিল, তেমনই, সংস্কারমুক্ত সাহসী মনেরও প্রয়োজন ছিল"[৭] ১৯৭৮ সালে তাঁর যখন "মানুষের মূর্তি" কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হল তখন দেখা গেল সেই কবিতায় "ছুতোর কাকা,মিস্ত্রী দাদু, সেলাই কল চালানো বাবা, বদ্যি-বুড়ি, কারখানার শ্রমিক, পোশাকের হকার অর্থাৎ আমাদের চারপাশের শ্রমজীবী মানুষেরা স্বমহিমায় হাজির

হয়েছেন”[৮]চল্লিশের কবিতাতেও এঁরা ছিল কিন্তু তাঁরা দলীয় পতাকার বাহক ছিলেন,যান্ত্রিক ভাবে,যন্ত্রাংশের মতো। স্বাধীনতা পরবর্তী কবিতায় এই বিস্তার ঘটতে দেখা যায়। নাগরিকতার বাইরে বেরিয়ে এক অন্য নন্দনের খোঁজ করতে থাকে কবিরা। এমনই নন্দনের কথা পাওয়া যাবে কবি নির্মল হালদারের কবিতার দিকে যদি আমরা লক্ষ্য রাখি। কবি নির্মল হালদার সত্তর দশকের কবি। বাংলা কবিতায় তাঁর জোরালো আত্মঘোষণা “বাবুমশাই আমি নির্মল হালদার’।এই ঘোষণায় পঞ্চাশের কবিদের টোন নেই,বরং প্রতিষ্ঠন বিরোধিতা তাঁর মধ্যে দেখা যায়

“ক্ষুধায় ক্ষুধায় ক্ষুধিত হোক,তবেই তো ক্ষুধিত কবির প্রদর্শনী হবে
বহুদিন পোশাকে,প্রতিষ্ঠায় আছে,এইবার নগ্নতা মনোহারী হোক
ওর মুখ ছুঁইয়ে যাক ভিখারির ভুখ,না হলে আমি শালা টেবিল উল্টে দেব
দুমাদ্দুম লাথি মারব প্রতিষ্ঠার মুখে,বলবঃ
কবি তুই দুখী হ,দুখে আছে জনসাধারণ”(প্রতিষ্ঠার মুখে লাথি)

এই কবিতার দিকে লক্ষ রেখে সমালোচক হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এর একটি মন্তব্য করা যেতে পারেঃ “ এইরকম আত্মঘোষণা অন্তত এটা বুঝিয়ে দেয় তাঁর শ্রেণী অবস্থান বাবুদের দিকে নয়।এবং মেরুকরণের পুরনো ধারণা একটু বদলে সাম্প্রতিক সাব অলর্টান চর্চার সহজ পাঠ এটাই শেখায়,শুধু আর্থসামাজিক মানদন্ডে নীচের মহলে যারা কোনঠাসা,এলিটের উঁচুনাক যাদের কুঁকড়ে রাখে,যাদের সাদামাটা সাংস্কৃতিক পরিচয় অপমানে নীল –তাঁরাও আর এক রকমের সর্ভারা।নির্মল যেন তাঁদের চারণ”[৯]বাংলা কবিতায় নাগরিক কবিদের যে আধিপত্য তার বিরুদ্ধে কবির এই কৌশল উত্তর উপনিবেশি মননকেই চিহ্নিত করে। নাগরিক আধুনিকতার বাইরে বেরিয়ে তিনি ভাবতে চেয়েছেন মানুষকে যেমন তেমনি তাঁর কবিতার ভাবনায় এসেছে মানুষ ছাড়াও বিভিন্ন প্রাণীরা। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যে আধুনিকতা শুরু হয়েছিল,তার মূলে ছিল মানব,সর্বত্রই একধরণের মানবকেন্দ্রিক বা “Anthropocentric” দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়েছিল, সর্বত্রই প্রাধান্য পেয়েছিল মানব।সেই জায়গায় প্রকৃতি বা না-মানুষ প্রাণীরা বাংলা কবিতার জগৎ থেকে সরে গিয়েছিল। নির্মল হালদার এর মতো কবিরা তাঁর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর কতগুলি কথা এই প্রসঙ্গে বলা যায়ঃ “ বহমান সময়ের ভেতরই প্রকৃতির বিচিত্র রূপ চলাচল।প্রকৃতি কেবল নিসর্গ নয়।প্রকৃতি যে আবহমান মানুষ।মানুষের স্বর মানুষ বাদ দিয়ে নিসর্গ নয়।নিসর্গ বাদ দিয়ে মানুষ নয়। ………পোকামাকড়ের নিঃশ্বাস,মাছের নিঃশ্বাস এবং গাছপালার নিঃশ্বাস আমার নিঃশ্বাসে মিশে যায়। এই ভূ-প্রকৃতির ভারসাম্যে প্রতিটি জীবের ভূমিকাকে খাটো করা যায় না”[১০]উত্তর- ঔপনিবেশিক বাংলা কবিতায় এক ধরনের বায়োসেন্ট্রিক মুড লক্ষ্য করা যায়।তাই কবি মণীন্দ্র গুপ্ত তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকাতে বলেছিলেনঃ “আমি তো সব সময় চেয়েছি-লোকসংখ্যা কমুক,বৈভব তৈজস কমুক,শব্দ বাক্য কমুক।মাছ পাখি পশু

বাড়ুক,বন বাড়ুক।পৃথিবী শান্ত সৌন্দর্যে টলমল করুক।মানুষের মুখরতাকে চাপা দিয়ে যাক বনমর্মর”[১১]

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কবিতায় কবিদের সংখ্যা প্রচুর।যদি দশক অনুযায়ী ভাগ করে দেখি তাহলে সংখ্যাটা কম নয় প্রতি দশক অনুযায়ী। যার ফলে পাঠকও কবিতার পাঠ নিতে গিয়ে দিশেহারা।পাঠক ও কবিতার মাঝে খুব সহজেই জায়গা করে নিল মিডিয়া,তাঁদের চকমকি প্রচারের দ্বারা। এক এক জন কবিকে আইকন বানিয়ে দেওয়া হল,মোটা মাইনের চাকুরি দেওয়া হল, আর তাদের প্রকাশনায় অজস্র বই ছাপিয়ে দেওয়া হল। বলতে দ্বিধা নেই,বাংলা কবিতার বাজারিকরণের প্রক্রিয়াটি শুরু হয় পঞ্চাশ- ষাট দশকের কবিতা থেকে। পঞ্চাশ এর অনেক কবিরা সমসাময়সিক যুগসমস্যা থেকে নিজেদের সরিয়ে এক অতিয়াধুনিকের দিকে যাত্রা করলেন সেই অতিয়াধুনিকতায় প্রাধান্য পেয়েছিল যৌনতা বলে এক সময় অভিযোগ করেছিলেন অরুণ ভট্টাচার্য্য বিশ্বভারতী পত্রিকায়।তিনি বলেছিলেনঃ “চূড়ান্ত দেহসর্বস্বতাকে কবি যৌবনের একমাত্র প্রতীকে দাঁড় করাতে চেয়েছেন” এই অভিযোগ ছিল মূলত কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কবিদের প্রতি। এই দেহসর্বস্বতার জন্য তাদের একটা চাহিদা তৈরি হয় বলে মনে করেন অঞ্জন সেন। তাই তিনি বলেনঃ “এক শ্রেণির পাঠকের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন অতি আধুনিকরা- কারণ শরীর সর্বস্ব সাহিত্যের একো চাহিদা আছে।সাহিত্যের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গুলি নতুন বাজার খুঁজে পেল এঁদেরই মাধ্যমে।সংবাদপত্রে প্রচার অভিযান চলল,সাহিত্য প্রতিষ্ঠানগুলি প্রভাবিত হয়ে পুরস্কারাদি প্রদান শুরু করলেন।জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে গেলেন অতি আধুনিকেরা”[১২] সেই থেকে শুরু।তারপর বাংলা কবিতায় সংবাদ মাধ্যম হয়ে উঠল অন্যতম ক্ষমতাবান। রাতারাতি কবিরা শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেতে শুরু করলেন। অনির্বান মুখোপাধ্যায় তাঁর একটিগ্রন্থে এই সংবাদ মাধ্যমের ক্ষমতার কথা বলেছেনঃ “পঞ্চাশের কবিরা যখন একে একে পুরস্কার পেতে শুরু করলেন, এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই আনন্দবাজার হাউসে চাকরি পেতে থাকলেন, তখন সরকারি-বেসরকারি উভয় মিডিয়াই তাঁদের আইকন হিসেবে প্রজেক্ট শুরু করল। আনন্দবাজার ও তার সহোদর অন্যান্য পত্র-পত্রিকাগুলিও তাঁদের প্রজেক্ট করা শুরু করে ব্যবসার খাতিরে, আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত তাঁদের গ্রন্থসমূহ বিক্রয়ের তাগিদে”[১৩]এইসব আইকনদের ঘিরে নানা রকম ক্ষমতা বলয় তৈরি হয়। যার কেন্দ্রে কখনো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কখনো বা জয় গোস্বামী অধিষ্ঠিত থাকেন।পরবর্তী কালের নব্বই দশকের নবীন কবিদের অনেকে মনে করেছিলেন কবিতা লিখে ক্যারিয়ারের কথা। তারা দেখেছিলেন, জয় গোস্বামী কীভাবে রণজিৎ দাশ ও গীতা চট্টোপাধ্যায় এর কবিতা প্রকাশে ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং তারা আনন্দ পুরস্কার পেয়েছিলেন –এই কথা শ্রী মুখোপাধ্যায়[১৪] আমাদের জানান।এই ক্ষমতাবলয়ের বাইরে বাংলা কবিতায় দেখা যায়,লিটল ম্যাগাজিন বা সমান্তরাল প্রকাশনার কথা। যারা এই ক্ষমতাবৃত্ত থেকে বেরিয়ে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন অপরায়ণের এক ভিন্ন নন্দন।লিটল

ম্যগাজিনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলাগুলো থেকে বাংলা কবিতায় বহুস্বরকে দেখা যায়। কেন্দ্র থেকে বাংলা কবিতাকে বিকেন্দ্রীকরনের এক ধরনের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এইভাবে ক্ষমতার বৈপরীত্যে অপরদের অধিষ্ঠান বাংলা কবিতায় দেখা যায়। বাংলা কবিতা আধুনিকতার সীমানা থেকে বেরিয়ে এক নতুন আধুনিকতা নির্মাণের চেষ্টা করে।

তথ্যসূত্র:

১. অঞ্জন সেন, ঔপনিবেশিকতা থেকে উত্তরাধুনিকতা,বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১, পৃঃ ২৫
২. অনির্বান মুখোপাধ্যায়, উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলা কবিতা, নিষাদ, কলকাতা, ২০১৮, পৃঃ ৬
৩. তদেব,পৃঃ ৭
৪. মণীন্দ্র গুপ্ত, গদ্য সংগ্রহ ১, অবভাস ,কলকাতা, পৃঃ ২৪১
৫. Ashis Nandy,The Intimate Enemy Loss and Recovery of Self Under Colonialism, OUP, Delhi, 1983, pp-4
৬. তপোধীর ভট্টাচার্য, প্রতীচ্যের সাহিত্য তত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬, পৃঃ১৭৪
৭. দেবদাস আচার্য, পরিকথা (সম্পাদক-দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়) ,সপ্তদশ বর্ষ, ডিসেম্বর, দক্ষিন চব্বিশ পরগণা, ২০১৪,পৃঃ৭৪
৮. তদেব, পৃঃ১০১
৯. হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতা নিয়ে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১, পৃঃ ১৩৩
১০. নির্মল হালদার, পরিকথা (সম্পাদক-দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়) ,সপ্তদশ বর্ষ, ডিসেম্বর, দক্ষিন চব্বিশ পরগণা, ২০১৪, পৃঃ৮৫
১১. নির্মল হালদার, পরিকথা (সম্পাদক-দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়) ,সপ্তদশ বর্ষ, ডিসেম্বর, দক্ষিন চব্বিশ পরগণা, ২০১৪, পৃঃ৮৬
১২. অঞ্জন সেন, ঔপনিবেশিকতা থেকে উত্তরাধুনিকতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১, পৃঃ ৩১
১৩. অনির্বান মুখোপাধ্যায়, উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলা কবিতা, নিষাদ, কলকাতা, ২০১৮, পৃঃ ৩৬
১৪. অনির্বান মুখোপাধ্যায়, উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলা কবিতা, নিষাদ, কলকাতা, ২০১৮, পৃঃ৩২-৪৬

নির্বাচিত সহায়ক গ্রন্থঃ

শূর চিরঞ্জিত ২০১৭ উত্তরঔপনিবেশিকতাবাদ ও বাংলা সাহিত্য,আলোচনা চক্র, কলকাতা

শূর চিরঞ্জিত ২০১৬ প্রতীচ্যের সাহিত্য তত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনা,আলোচনা চক্র, কলকাতা

মুখোপাধ্যায় অনির্বাণ ২০১৮ উত্তরঔপনিবেশিক বাংলা কবিতা ,নিষাদ, কলকাতা

ভদ্র গৌতম,চট্টোপাধ্যায় পার্থ,২০১৫, নিম্নবর্গের ইতিহাস আনন্দ কলকাতা

আলম ফয়েজ,২০১৪, উত্তর উপনিবেশি মন, সংবেদ,ঢাকা

বন্দ্যোপাধ্যায় পার্থপ্রতিম,২০০৭, পোস্ট মডার্ন ভাবনা ও অন্যান্য,র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন কলকাতা

সেন অঞ্জন,২০১১, ঔপনিবেশিকতা থেকে উত্তর আধুনিকতা,বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ কলকাতা

নির্বাচিত সহায়ক গ্রন্থ (ইংরেজি)

Barry Peter 2011 Beginning Theory Viva Books Kolkata

Gandhi Leela 1999 Postcolonial Theory Oxford University press New Delhi

Abram M.H 2009 A Hand Book Of Literary Terms Cengage Learning New Delhi

NayarK.Pramod 2008 Postcolonial Literature An Introduction Pearson Education New Delhi

বিদ্যাসাগরীয় জীবনাদর্শ ও জাতির জনক

অভি কোলে
গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ : মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, অর্থাৎ সর্বজনশ্রদ্ধেয়, সর্বজনবন্দিত জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে গুজরাটি ভাষায় একটি প্রবন্ধ রচনা করেন যা ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয় এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর 'Indian Opinion' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে গান্ধীজি বিদ্যাসাগরের অগাধ পান্ডিত্যের পাশাপাশি এই মহাজীবনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা উল্লেখ করেছেন।
প্রথমত : ধর্ম-বর্ণ, জাত-পাত নির্বিশেষে সর্বমানবে সমদৃষ্টি,
দ্বিতীয়ত :অসহায় মানুষের প্রতি অকৃত্রিম মানবিক সহমর্মিতা ও যথাসাধ্য সহায়তার মনোভাব,
তৃতীয়ত : সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপন।

গান্ধীজি লিখেছেন— "... the people in Bengal are more alert than in other parts of India. ... The main reason for the special distinction that we find in Bengal is that many great men were born there during that last century (nineteenth century). ... It can be said that Iswarchandra Vidyasagar was the greatest among them." ("collected works of Mahatma Gandhi", Vol. V (1905-1906), New Delhi, 1961, p. 65-66)

বস্তুতপক্ষে, বিদ্যাসাগরের জীবন বাংলা তথা ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের কাছে চিরন্তন প্রেরণা-স্থল। শুধু তাই-ই নয়, একাধিক মহামানবের মধ্যে যেমন অনিবার্য চেতনা–সামীপ্য দেখা যায়, ঠিক তেমনি উনিশ শতকের বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের হীরকোজ্জ্বল জীবন দ্যুতির সঙ্গে বিশ শতকে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নামে অপর এক ধ্রুব-জীবনের অনিন্দ্যসুন্দর সাযুজ্য ভারতীয় সভ্যতার অক্ষয় সম্পদ। বিদ্যাসাগরের মতো গান্ধীজিও সর্বমানবে সমদৃষ্টির বার্তা বিঘোষিত করেছেন আজীবন। মানবতাবাদের জাগ্রত-পূজারী এই অহিংসাব্রতীর হৃদয় সর্বদা সাধারণ মানুষের অসহায় ক্রন্দনে বিচলিত হয়েছে। আর গান্ধীজির জীবন–যাপনের অনাড়ম্বর সারল্য নিঃসন্দেহে বিদ্যাসাগরীয় উত্তরাধিকার হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, এমনকি উভয়ের পোশাকের মধ্যেও সুস্পষ্ট সাদৃশ্য চোখে পড়বে। বক্ষ্যমাণ আলোচনা পরিসরে

আমরা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেগুলি তাঁর নিজ-জীবনে কতটা প্রতিফলিত হয়েছিল সে বিষয়েই আলোচনায় প্রয়াসী।

সূচক শব্দ :উনিশ-বিশ শতক, বিদ্যাসাগর, গান্ধীজি, উদারতা, দয়াদাক্ষিণ্য পরবশ, সর্বমানবে সমদৃষ্টি, পোশাক-পরিচ্ছদ।

মূল আলোচনা :

বাংলা তথা ভারতের নবচেতনার উন্মেষ-লগ্নের অন্যতম স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মহাজীবন কেবলমাত্র বাঙালি ও ভারতীয়দেরই অনুকরণীয় নয়, তা বিশ্বের দৃঢ়চেতা অথচ মানব-প্রেমে বলীয়ান স্নেহার্দ চিত্তের কাছে চিরন্তন প্রেরণা-স্থল। ভারত-ইতিহাস তার অগণনীয় সাক্ষ্য বহন করছে। মহাকালের চলার পথে অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক মহামানবের মধ্যে অনিবার্য চেতনা-সামীপ্য দেখা যায়। ভারতাত্মার এমনই দুই উদ্ভাসিত প্রভার নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। রামমোহন রায় যদি উনিশ শতকীয় নবজাগরণের পথ-প্রদর্শক হন, তাহলে বলা যায় বিদ্যাসাগর সেই বন্ধুর, কন্টকাকীর্ণ পথকে মসৃণ করেছেন, পথিপার্শ্বে সুগন্ধি পুষ্প ও সুস্বাদু ফলের গাছ রোপণ করেছেন। এতে গ্লানিজর্জর সমকালীন জনজীবন পেয়েছে সৌন্দর্যময় জীবনের আস্বাদ, সমৃদ্ধ চেতনার পুষ্টি। আর উনিশ শতকের বাংলা তথা ভারতবর্ষের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের হীরকোজ্জ্বল জীবন-দ্যুতির সঙ্গে বিশ শতকে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নামে অপর এক ধ্রুব-জীবনের অনিন্দ্যসুন্দর সাযুজ্য ভারতীয় সভ্যতার অক্ষয় সম্পদ। কর্ম-পরিসরে উভয়ের স্বাতন্ত্র্য থাকলেও মর্ম-পরিসর জুড়ে আমরা লক্ষ করি সহজ সখ্যতা। বক্ষ্যমাণ আলোচনা-পরিসরে আমরা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গী এবং সেগুলি তাঁর নিজ-জীবনে কতটা প্রতিফলিত হয়েছিল সে বিষয়েই আলোচনায় প্রয়াসী।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, অর্থাৎ সর্বজনশ্রদ্ধেয়, সর্বজনবন্দিত জাতির জনক গান্ধী বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে গুজরাটি ভাষায় একটি প্রবন্ধ রচনা করেন যা ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয় এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর 'Indian Opinion' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে গান্ধীজি লিখেছেন—

> "... the people in Bengal are more alert than in other parts of India. ... The main reason for the special distinction that we find in Bengal is that many great men were born there during the last century (nineteenth century). ... It can be said that Iswarchandra Vidyasagar was the greatest among them."[১]

এই 'greatest' মানুষটির চারিত্রিক দৃঢ়তা বিশ্ববন্দিত, পাণ্ডিত্য ও বিনয়, কোমল, সহৃদয়তা ও অন্যায়ের সঙ্গে আপোশহীন অবস্থান— এসবই গান্ধীজির পর্যালোচনায় স্থান

করে নিয়েছে। পাশাপাশি তিনি এই মহাজীবনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত : ধর্ম-বর্ণ, জাত-পাত নির্বিশেষে সর্বমানবে সমদৃষ্টি;

দ্বিতীয়ত : অসহায় মানুষের প্রতি অকৃত্রিম মানবিক সহমর্মিতা ও যথাসাধ্য সহায়তার মনোভাব;

তৃতীয়ত : সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপন।

বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস উনিশ শতকের পূর্বেই খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে চৈতন্যদেবের হাত ধরে নবজাগৃতির গৌরব লাভ করেছিল। আদ্বিজচণ্ডালে প্রেমের বার্তা পৌঁছে দিয়ে তিনি বাংলার জাত-পাতের মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিলেন। এক তরুণ সন্ন্যাসীর কাছ থেকে সেদিন বিতরিত হয়েছিল ভেদাভেদহীন মানবতার উদার বীজমন্ত্র। বিদ্যাসাগর উনিশ শতকীয় বাংলায় সেই চেতনাকেই মনে-প্রাণে বহন করেছেন। ১৮৬৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার বিভিন্ন এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। কলকাতায় কলেজ-স্কোয়ারে অনাহারী মানুষজনের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাত্যাভিমানের তোয়াক্কা না করে বিদ্যাসাগর নিজে খাদ্য-পরিবেশনে পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। বীরসিংহ গ্রামে তিনি একটি অন্নছত্র খোলেন। সেখানে আগত মানুষেরা খিচুড়ি খেতেন। তাদের আবদার মেনে নিয়ে বিদ্যাসাগর সপ্তাহে একদিন মাছ-ভাতের ব্যবস্থা করলেন। অন্নছত্রে আগত মেয়েদের মাথার চুলের রুক্ষতা বিদ্যাসাগরকে ব্যথিত করে। তিনি সবার জন্য দু-পলা করে তেলের ব্যবস্থা করেন। তেল বিলি করত যারা, তারা হাড়ি-মুচি-ডোম প্রভৃতি তথাকথিত নিচু জাতের মেয়েদের তেল দেওয়ার ক্ষেত্রে ইতস্ততঃ করলে বিদ্যাসাগর নিজে এগিয়ে আসেন। তিনি স্বহস্তে গরীব দুঃখিনীদের রুক্ষ চুলে তেল মাখিয়ে দিতেন। করুণা উদ্রেক অনেকের হৃদয়েই হয়, কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর করুণার সাগর অতিক্রম করে মনুষ্যত্বের চিরন্তন দারুচিনি দ্বীপে পৌঁছে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—

> "এই ঘটনাশ্রবণে আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা বিদ্যাসাগরের দয়া অনুভব করিয়া নহে— কিন্তু তাঁহার দয়ার মধ্য হইতে যে একটি নিঃসংকোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহা দেখিয়া আমাদের এই নীচজাতির প্রতি চিরাভ্যস্ত ঘৃণাপ্রবণ মনও আপন নিগূঢ় মানবধর্মবশত ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।"[২]

জীবনাচরণের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মানবপ্রেমের সর্বাত্মক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর 'করুণাসাগর' অভিধা যথার্থ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক। চন্দননগরে বিদ্যাসাগর একদিন দেখেন একটি পাগল ছেলেকে নিয়ে সবাই মজা করছে। তিনি চোখের জল আটকে রাখতে পারলেন না। ছেলেটিকে কলকাতায় নিয়ে এসে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। ফরাসডাঙায় থাকার সময় একদিন এক অন্ধ মুসলমান

ভিক্ষুক স্ত্রীর হাত ধরে বিদ্যাসাগরের কাছে এলেন। সারা শহর ঘুরেও ভিক্ষে না জোটায় অবসন্ন মনে তারা বিদ্যাসাগরের কাছে এলেন। বিদ্যাসাগর কিছু পয়সা দিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন কিছু খেয়েছেন কিনা। ভিক্ষুক না বলায় তিনি তাদের কি খেতে ইচ্ছে করে জানতে চাইলেন। ভিক্ষুক বললেন লুচি। বিদ্যাসাগর লুচি ভাজানোর ব্যবস্থা করলেন, বললেন প্রতি রবিবার এসে লুচি খেয়ে যেতে এবং প্রতিমাসে আট আনা করে ঘরভাড়ারও ব্যবস্থা করেন। এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। সামান্য দৃষ্টান্তেই করুণাসাগরের করুণ হৃদয়ের পরিচয় বোঝা যায়। এখানে একটি বিষয় লক্ষ করার অসহায় মানুষের কেবল মানবিক পরিচয়টিই তাঁর কাছে গুরুত্ব পেয়েছে, অন্য কোন পরিচয় নয়। বিহারীলাল সরকার লিখেছিলেন—

> "স্বদেশী হউক, বিদেশী হউক, ব্রাহ্ম হউক, খৃষ্টান হউক, হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, সাহসী, সদালাপী, সরল সত্যসন্ধ ব্যক্তিমাত্রেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয় অধিকার করিতেন।"[৩]

বিদ্যাসাগরের সর্বমানবে এই সহৃদয় সমদৃষ্টি নিখিল মানবের প্রেরণাস্থল। গান্ধীজি তাই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক কর্ম-পরিসরে গান্ধীজি সমাজের সমস্ত মানুষের পাশে থেকেছেন জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা নয়, মুখ্যতা পেয়েছিল মানবিক উদারতা। ১৯৩৩ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর হরিজন দিবস উপলক্ষে এক বার্তায় গান্ধীজি লেখেন—

> "On the occasion of the Harijan Day, I sincerely hope that pure love will be roused in the hearts of caste Hindus towards their Harijan brothers and sisters, and that every Hindu, man or women, will be convinced of the need for the eradication of untouchability."[৪]

গুজরাটি ভাষায় প্রকাশিত 'হরিজনবন্ধু' পত্রিকায় এক হরিজনকর্মীর সঙ্গে গান্ধীজির কথোপকথন প্রকাশিত হয় যেখানে গান্ধীজি তাঁকে বলেছেন—

> "As for me, I am carrying on the campaign among caste Hindus for the eradication of untouchability and at the same time telling Harians what their dharma is."[৫]

শুধুমাত্র আদর্শগত দিক দিয়েই নয়, বাস্তবিক ক্ষেত্রেও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে গান্ধীজির আন্দোলন আজ বিশ্ববন্দিত। ব্যক্তিজীবনে বিদ্যাসাগর যেমন সমাজসংস্কারমূলক কাজ করার ক্ষেত্রে নিজের সমাজের দ্বারা নানাভাবে বাধা পেয়েছিলেন, গান্ধীজিও তা পেয়েছিলেন। উচ্চতর শিক্ষার জন্য যখন তিনি বিলেত যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন তাঁর নিজের সমাজ তাঁকে প্রবলভাবে বাধা দেয়। তাঁকে সমাজচ্যুত করার হুমকিও দেওয়া হয়; কিন্তু সকল বাধা তুচ্ছ ক'রে তিনি নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। সমাজপতিদের যাবতীয় আপত্তিকে নস্যাৎ ক'রে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সবিনয়ে জানান—

> "I am really helpless. I think the caste should not interfere in the matter."[৬]

সারাজীবন এই চারিত্রিক দৃঢ়তা তিনি অক্ষুন্ন রেখেছিলেন, যা আমরা বিদ্যাসাগরের জীবনেও লক্ষ করি।

বিদ্যাসাগরের মতো গান্ধীজিও সর্বমানবে সমদৃষ্টির বার্তা বিঘোষিত করেছেন আজীবন। মানবতাবাদের জাগ্রত-পূজারী এই অহিংসাব্রতীর হৃদয় সর্বদা সাধারণ মানুষের অসহায় ক্রন্দনে বিচলিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের হৃদয়-স্পর্শ লাভের জন্য কোন মানুষের পূর্বপরিচিতির দরকার ছিল না, প্রয়োজন পড়ত না কারোর সুপারিশের। একটিবার যদি সাহায্যের আবেদনটি বিদ্যাসাগরের কান পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া যায়, তাহলে আর কোন চিন্তা থাকে না। বিহারীলাল সরকার তাঁর 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে একটি ঘটনার কথা লিখেছেন—

> "একদিন হেদুয়ায় এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়ানোর সময় বিদ্যাসাগর দেখলেন এক ব্রাহ্মণ গঙ্গা-স্নান সেরে কাঁদতে কাঁদতে ফিরছেন। বিদ্যাসাগর বারংবার জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানালেন মেয়ের বিয়ের সময় ধার নেওয়া টাকা শোধ দিতে না পারায় পাওনাদার আদালতে মামলা করেছে। বিদ্যাসাগর মামলার বিস্তৃত খবরাখবর নিলেন। সুদে-আসলে প্রায় আড়াই হাজার টাকা নির্দিষ্ট দিনে আদালতে জমা দিলেন। সংশ্লিষ্ট সবাইকে বললেন যে ব্রাহ্মণ যেন টাকা কে দিলেন তা জানতে না পারেন।"[৭]

বিদ্যাসাগরের সংবেদনশীল হৃদয়ধর্ম সুপরিচিত, কিন্তু সেই পরিচয়ের মধ্যেই যে আত্মপ্রচারবিমুখতা ও আত্মস্বার্থবিমুখতার পরিচয় মেলে তা তাঁর মহত্ত্বকে বহুগুণিত করে। ভারতবর্ষের অসহায়-নিপীড়িত মানুষ গান্ধীজিকে পেয়েছেন সকল প্রয়োজনে। তবে এটা ঠিক যে ব্যক্তিমানুষের প্রয়োজনে বিদ্যাসাগর যতটা এগিয়ে আসতে পেরেছিলেন গান্ধীজির কাছে সে সুযোগ ছিল না।

বিদ্যাসাগরের সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপন গান্ধীজিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর অন্যের প্রয়োজনে যথাসাধ্য সহায়তা করতেন; কিন্তু নিজে অত্যন্ত সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। শৈশব থেকে যে জীবনধারায় তিনি অভ্যস্ত ছিলেন পরবর্তীকালে তার বিশেষ পরিবর্তন ঘটান নি, সম্ভাবনাও ছিল না; কেননা তাঁর উপার্জিত অর্থের বেশিরভাগই ব্যয় হতো সেবামূলক কাজে। নিজের জন্য যে পোশাক-বিধি তিনি তৈরি ক'রে নিয়েছিলেন তা একপ্রকার বৈরাগ্যসাধনেরই নামান্তর। গান্ধীজির ভাষায়—

> "He was really a *fakir*, a *sannyasi* or a *yogi*. It behoves us all to reflect on his life."[৮]

ধুতি-চাদর আর জুতো— এই পোশাক পরিধান ক'রে বিদ্যাসাগর সাধারণ মানুষের সঙ্গে যেমন দেখা করতেন, তেমনি গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাতের ক্ষেত্রেও তাঁর একই পোশাক থাকত। নিজের স্বাতন্ত্র্য তিনি কোনভাবেই বিসর্জন দেন নি। আর গান্ধীজিও একই বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে গান্ধীজির জীবন শুরু হলেও তিনি ক্রমশ সে জীবন ত্যাগ ক'রে সহজ-অনাড়ম্বর জীবনে পদার্পণ করতে সচেষ্ট হন। নিজের কাজ নিজে করে নেওয়ার অভ্যাস তিনি গড়ে তুলেছিলেন। লন্ড্রীর অভাব না থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজের জামা-কাপড় নিজে পরিষ্কার করতেন। পেরোরিয়ায় এক ইংরেজ-ক্ষৌরিক তাঁর ক্ষৌরকর্ম করতে অস্বীকার করলে তিনি নিজেই সেকাজ শুরু করেন। আদালতে তাঁর উকিল বন্ধুরা হাসাহাসি করলেও তিনি এক্ষেত্রে খুশি ছিলেন এই ভেবে যে তিনি পরনির্ভরতা ত্যাগ করতে পেরেছেন। অস্পৃশ্যতা, বর্ণভেদের নোংরামোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনাগুলিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী জীবনে এইসব ঘটনার বিশেষ ভূমিকার কথা গান্ধীজি স্বয়ং বলেছেন—

> "The extreme forms in which my passion for self-help and simplicity ultimately expressed itself will be described in their proper place. The seed had been long sown. It only needed watering to take root, to flower and to fructly, and the watering came in due course."[১]

বিদ্যাসাগরের মতো গান্ধীজির জীবন-যাপনের সারল্যের অন্যতম অঙ্গ ছিল তাঁর পোশাক। ১৯১৪ সালে গান্ধীজি যখন স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাসের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে চলে আসেন তখন কাথিয়াওয়াড়ি পোশাকে তাঁকে দেখা গিয়েছিল বোম্বাইয়ের প্রথম অভ্যর্থনা সভায়। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পোশাক ত্যাগ ক'রে ধুতি-কুর্তা ব্যবহার শুরু করেন। আর চম্পারণ সত্যাগ্রহের পর থেকে ধুতি-চাদর ও চটি বেছে নেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দেশে-বিদেশে সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি এই পোশাকই পরিধান করতেন। বিদ্যাসাগরের মতো তিনিও কোনোভাবেই আত্মস্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাবোধকে খাটো করেননি। গান্ধীজির জীবন-যাপনের অনাড়ম্বর সারল্য নিঃসন্দেহে বিদ্যাসাগরীয় উত্তরাধিকার হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, এমনকি উভয়ের পোশাকের মধ্যেও সুস্পষ্ট সাদৃশ্য চোখে পড়বে। গান্ধীজির পিতামহ উত্তম চন্দ বা উতা গান্ধী সাহসী সত্যপ্রিয় ও দৃঢ়সংকল্প। বিদ্যাসাগরের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণও অনুরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। 'পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ' শীর্ষক প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর স্বয়ং পিতামহের পরিচয় দিয়েছিলেন। কাকতালীয় হলেও এই ঘটনাটিও দুই মহাপুরুষের মধ্যে অনিন্দ্যসুন্দর মিলের সন্ধান দেয়। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের অনমনীয় পৌরুষের মধ্যে আমরা তাঁর পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ, পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব লক্ষ করি, ঠিক তেমনি গান্ধীজির অন্যায়ের সঙ্গে আপোসহীন মানসিকতার বীজ তাঁর

পিতামহ উতা গান্ধী এবং পিতা কাবা গান্ধী নামক দুই উন্নত চরিত-বৃক্ষ থেকে উৎপাদিত। উভয়ের ক্ষেত্রেই পিতামহের প্রভাব অধিক।

জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে বিদ্যাসাগর রাজনৈতিক দলের প্রতি বিরূপতা পোষণ করেছেন। ১৮৮৫ সালে গড়ে ওঠা কংগ্রেস দলের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসকে রাজনৈতিক দল হিসাবে ঘোষণা করা হয়। বিদ্যাসাগর কংগ্রেস প্রসঙ্গে বললেন—

> "বাবুরা কংগ্রেস করছেন, আস্ফালন করছেন, ভারত উদ্ধার করছেন। দেশের হাজার হাজার মানুষ অনাহারে প্রতিদিন মরছে, সেদিকে কারো চোখ নেই।"[১০]

বিদ্যাসাগরের দেশহিতৈষণার সঙ্গে রাজনীতির কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না সত্য; কিন্তু তা বলে জাতিপ্রেম তাঁর ছিল না— এমনটা বলা যায় না। আসলে বিদ্যাসাগরের দেশ মানবশূন্য ভূ-ভাগমাত্র ছিল না, মানবপ্রেমের সুপ্রশস্ত পথ বেয়েই তিনি দেশপ্রেমের সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন। সেই পথ ধরে হাঁটতেই তিনি দেশপ্রেমের সীমানা অতিক্রম ক'রে বিশ্বপ্রেমের সুবিস্তৃত উপত্যকায় অনায়াস-বিচরণ করেছেন। আর গান্ধীজির অহিংস-নীতির কেন্দ্রবিন্দুতেও ছিল নিখাদ মানব-প্রেম। ফলে বিদ্যাসাগর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না হলেও মানব-কল্যাণের আদর্শের দিক দিয়ে তিনি ও গান্ধীজি একবিন্দুতে মিলিত হয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১. Gandhi, Mahatma: 'The Collected Works of Mahatma Gandhi', (Vol. V, 1905 - 1906) (June, 1961), The Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, New Delhi, 1961, P. 65-66.

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; 'বিদ্যাসাগরচরিত' (ভাদ্র, ১৪০০), বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ৪১।

৩. সরকার, বিহারীলাল; 'বিদ্যাসাগর' (তৃতীয় সংস্করণ), কলকাতা, পৃ. ৪৪০।

৪. Gandhi, Mahatma: 'Message for Harijan Day', ['The Hindu', 25-09-1933/ 'The Collected Works of Mahatma Gandhi', Vol. 56 (September 16, 1933 - 15 January, 1934), The Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, New Delhi, 1961, P. 28.

৫. Gandhi, Mahatma: 'Talk with a Harijan Worker', ('The Collected Works of Mahatma Gandhi') Vol. 56 ibid, P. 8.

৬. Gandhi, Mahatma: ‘Outcaste’, ‘The Story of My Experiments with truth’ (Translated from original Gujrati by Mahadev Desai, Reprint 2018), Prakash Books India Pvt. Ltd. (CLASSICS), New Delhi, P. 50.

৭. সরকার, বিহারীলাল; তদেব, পৃ. ৩৪৭-৩৪৮।

৮. Gandhi, Mahatma: ‘Iswar Chandra Vidyasagar’, (‘The Collected Works of Mahatma Gandhi’, Vol. 5, ibid, P. 66.

৯. Gandhi, Mahatma: “The Story of My Experiments with truth’, ibid, P. 197.

১০. বিদ্যারত্ন, শম্ভুচন্দ্র; ‘বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত’ (প্রথম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ : ১৮৯১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, পৃ. ৪০।

ভারহীন গল্পকথার কথক প্রভাতকুমার

বিশ্বজিৎ পোদ্দার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আসাননগর মদনমোহন তর্কালঙ্কার কলেজ

সারসংক্ষেপ : ইংরাজীতে Wit, Humour, Fun, Satire, Comic, Lampoon, Nonsensical ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে হাসির প্রকার ইত্যাদি নির্দিষ্ট করা হয়। বাংলায় হাসির প্রকার নির্ধারণ করা হয় রঙ্গ, ব্যঙ্গ, কৌতুক, বিদ্রুপ, শ্লেষ, স্থূল ভাঁড়ামো, অশ্লীল রসিকতা ইত্যাদি শব্দ দ্বারা। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শান্তরসাশ্রিত নানা গল্পে কৌতুক ও রঙ্গ (Wit এবং Fun) সমানভাবে পরিকীর্ণ। কিছু গল্পে আছে শ্লেষের তীব্রতা। প্রভাতকুমারের সিরিয়াস গল্পের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তাঁর গল্প বলার সহজাত ক্ষমতা (Precision) এবং ঘটনা সংস্থান বিস্ময়কর। নিপুণ আঙ্গিক রীতি গ্রহণের জন্য তার গল্প সহজ-নিরাভরণ হয়েও পাঠককে সহজেই আকর্ষণ করতে পারে। কৌতুক রসের নির্মল হাসির উপাচারের মধ্যেও কারুণ্যের মেঘ এমনভাবে গল্পদেহে সংযোজন করেন যা পাঠক-হৃদয়কে সহজেই ভারাক্রান্তা করে তোলে।

শব্দবন্ধন : রঙ্গ-রসিকতা, বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস, ট্রাজিক মহিমা, গ্রহের ফের, নিরাভরণ গদ্য, সিরিয়াস গল্প, Precision, Wit, Fun, শ্লেষাত্মক বাণ বর্ষণ, বিদ্রুপাত্মক অনুভূতি, অনাবিল হাসি ইত্যাদি।

প্রতিপাদ্য বিষয় : কথাসাহিত্যিক সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘বাংলা গল্প বিচিত্রা’ নামক আলোচনামূলক গ্রন্থটিতে ‘সহজ সুরে সহজ কথা’ (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়) শিরোনামাংশে স্পষ্টই বলেছেন–

> ‘রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পাঠকের মধ্যে যে ‘শূন্যস্থান’ ছিল, প্রভাতকুমার সেইখানে এসে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, ----------। তিনি কোনো সংস্কার ভাঙেন নি, কোনো নতুন সত্য সন্ধান করেন নি, জীবনকে বিচার করবার ও প্রশ্ন করবার যে বলিষ্ঠ দুঃসাহস প্রত্যেকটি শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প-লেখকের আছে – প্রভাতকুমারের মধ্যে তার স্বল্পতা সহজেই অনুভবনীয়। প্রতিটি প্রধান ছোটগল্প-লেখক যে ‘Individuality’র অধিকারী, যে ‘Personality’তে চেখভ-মোপাসাঁ-রবীন্দ্রনাথ-গোর্কী-জয়েস-হেমিংওয়ে দেদীপ্যমান –প্রভাতকুমারের মধ্যে সেই স্বাতন্ত্র্য-রেখাঙ্কিত অনন্য ব্যক্তিত্বকে আমরা পাই না। কিন্তু ‘great’ না হলেও তিনি ‘good’– তাঁর কৃতিত্ব সেইখানেই।’১

উপরের এই বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট যে প্রভাতকুমারের গল্প-পাঠক সংস্কার-ছিন্ন নতুন সত্যসন্ধানী বলিষ্ঠ দুঃসাহসিক কোন প্রভাতকুমারকে পাবেন না। যাকে পাবেন তিনি Precision-এর সঙ্গে ঘটনা-সংস্থানের মিশ্রণে চিত্ত বিনোদক কৌতুকাবহ নির্মল

হাস্যরসের গল্পকার প্রভাতকুমার। যিনি ‘শান্ত, স্নিগ্ধ, সংযত, আত্মতৃপ্ত’। শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী তাকে সমকালীন লোকপ্রিয়তার কারণে বাংলার মোপাসাঁ বলে অভিহিত করেছেন। প্রভাতকুমার মোপাসাঁর মতোই রূপদক্ষ শিল্পী। দুজনেই তাঁরা জীবনের ভাষ্যকার নন, উন্মেষকার। একথা স্বীকার করেও ‘আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী’ নামক গ্রন্থে তাদের দুজনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য নিরূপণ করেছেন শ্রদ্ধেয় জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনি বলেছেন মোপাসাঁ ‘প্রকৃতিবাদী’। ‘মানুষ ও পশুতে, জীবলোকে ও নিসর্গলোকে একই প্রাকৃতিক শক্তির সার্বভৌম উন্মেষ রহস্যকে স্বীকার’ মোপাসাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে তির্যকভাবে ক্রিয়াশীল। শ্রদ্ধেয় ভট্টাচার্য মহাশয় যথার্থই দুজনের পার্থক্য নিরূপণ করে বলেছেন –

> ‘মোপাসাঁর সাহিত্যে মানুষের ধাতুপ্রকৃতিতে এই পাশব-সত্তার লীলা-রহস্যই বারবার উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু প্রভাতকুমারের সাহিত্যে মানুষের পশুপ্রবৃত্তি নয়, হৃদয়বৃত্তিরই জয়গান’।২

প্রভাতকুমারের গল্পে ওই হৃদয়বৃত্তির সন্ধানই মুখ্য বিষয়। সেই সঙ্গে অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় ‘great’ না হলেও ‘good’ গল্পকার প্রভাতকুমারে‘কী পেয়েছি’ তা আস্বাদন করাই শ্রেয়। এই আলোকেই তাঁর কিছু গল্প বিশ্লেষণ করা যাক:

‘কুড়ানো মেয়ে’ গল্পখানিতে নবগ্রামের এক কৃপণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অর্থলালসার চিত্রকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই গল্পটি গহনালোভী এক কৃপণ বৃদ্ধের পরিচিত কাহিনী। নৌকাডুবিতে তার বিপর্যস্ত হবার কাহিনীতেও প্রায়শ্চিত্তের লেশ নেই। গল্পের শেষ দিকে এসে কেবল গহনাগুলিকে ঘরে তোলার প্রয়াসে বৃদ্ধের বিবাহের সিদ্ধান্তে একটা কৌতুক সৃষ্টির প্রচেষ্টা আছে। তবে সে প্রচেষ্টাও সফল নয়। কারণ জানা গেল পাত্রীটি তারই মৃত পুত্রবধূর বোন। এ সত্য অবশ্য বৃদ্ধ জানলেন গল্পের শেষে এসে। এ বিয়ে ঘটলে কেলেঙ্কারির আর অবধি থাকে না। মোটামুটি কথা এই – গল্পখানি কোন দিক থেকেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে নি।

প্রভাতকুমারের ‘প্রণয় পরিণাম’ বাল্যপ্রণয়ের কৌতুকাবহ হাস্যমধুর কাহিনী। বয়ঃসন্ধিকালে এই প্রণয়ের বাতিক এবং সেই বাতিক থেকে কবিত্বশক্তির জন্ম নেওয়া – এক অতিপরিচিত কাহিনী প্লট। যথাসময়ে গন্ডদেশে কয়েকটা চপেটাঘাত আর ‘জুতিয়ে পিঠ ছিঁড়ে’ দেবার ভয় দিয়েই উপন্যাসের অনুকরণে প্রেমে পড়া পুত্রকে সুবোধ বালকে পরিবর্তিত করে ফেললেন পিতা। সময়মতো কুসুমের বিয়েও হয়ে গেল। প্রণয়ের ভূত থেকে মুক্ত সুবোধ বালক উপন্যাসের চরিত্রের মতো গৃহত্যাগও করেনি। বিষ খেয়ে আত্মহত্যাও করেনি। বরং বয়সের প্রণয়ের বাতিক এবং তার ফলশ্রুতিতে বাতিকগ্রস্থ আচরণ এবং শেষে পিতার শাসনে তার বাতিক-মুক্তির কাহিনীতে কোন জটিল বিষয়ের অবতারণা নেই, সমাজ-সংস্কার ভাঙার বাঞ্ছাও নেই। যা আছে তা কেবল নির্মল হাসি।

হাস্যরসের গল্প হিসাবে প্রভাতকুমারের ‘বলবান জামাতা’ গল্পখানি বেশ উঁচু দরের গল্প। আলোচ্য গল্পে গল্পকার Wit ও Fun-কে বিশেষভাবে গল্পদেহে ছড়িয়ে

দিয়েছেন। এই সূত্রে তিনি Precision এবং ঘটনা সন্নিবেশের জন্য অপরিহার্য সময়জ্ঞানের নিখুঁত পরিচয় রেখেছেন। কারো নাকাল হবার দৃশ্যে পাঠকের তখনই হাসির উদ্রেগ ঘটবে যখন চরিত্রটির নাকাল হবার পিছনে তার নিজেরই কোন কৃতকর্ম বা অসঙ্গতি দায়ী থাকবে। সর্বোপরি নাস্তানাবুদ হওয়া চরিত্রটি যদি আবার স্বমহিমায় স্বস্থানে অধিষ্ঠিত হতে পারে তাহলেও পূর্ব ঘটনার রেশ থেকে পাঠক-চিত্তে অনাবিল হাসির উদ্রেগ ঘটবে। পরন্তু ঐ সাময়িক নাকাল হবার মুহূর্ত নিয়ে পাঠকচিত্ত বিন্দুমাত্র ভারাক্রান্ত হবে না। ননীর পুতুলের মতো নধর দেহের জামাইয়ের দৈহিক গঠন নিয়ে বাসর ঘরে শ্যালিকার পরিহাস-মিশ্রিত শ্লেষের জবাব দিতে গিয়ে আলিপুরের পোষ্টমাষ্টার নলিনীবাবু কসরত-সাপেক্ষে নিজের দেহকে বলিষ্ঠ-সুঠাম করে তোলে। পরিবর্তিত এই ডাকাবুকো চেহারাই তার নাকাল হবার বিধিলিপি লিখেছিল। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কিছু অভ্যাসগত পরিবর্তন (শিকারের বন্ধুক সঙ্গে নিয়ে শ্বশুরালয়ে যাত্রা)। ভ্রমবশত শ্বশুরের সম-নামধারী অন্য উকিলের বাড়ী উপস্থিত হয়ে প্রথমে জামাই হিসাবে বেশ খাতির-আপ্যায়ন লাভ করার পরে জোচ্চোর, ডাকাত প্রতিপন্ন হয়ে সে গৃহ তাকে ত্যাগ করতে হয়। নিজের শ্বশুরবাড়ী উপস্থিত হলে নবকলেবর এই জামাইকে চিনতে তাদের ভুল হয়। সেখানেও বিপর্যস্ত হয়ে তাকে ফিরতে হয় স্টেশনের পথে। সেই মুহূর্তেই শ্বশুর মশাইয়ের হাতে পৌঁছায় তার প্রেরিত টেলিগ্রাম। সব সমস্যার সমাধান হলে তাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয় শ্বশুরালয়ে। যথাসময়ে সেই টেলিগ্রাম হাতে পৌঁছে দেওয়া বাস্তবে গল্পকারেরই সময়জ্ঞানের নিপুণতা। এমন নিরাভরণ, ভারহীন কৌতুকরসের গল্প সত্যিই বিরল।

প্রভাতকুমারের সিচুয়েশন এবং সময়জ্ঞান নির্ভর নিখুঁত কৌতুক রসের গল্প ‘রসময়ীর রসিকতা’। গল্পখানিতে থিয়োসফিক্যাল ভাবনার উপর কিছু শ্লেষাত্মক বাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কলহপ্রবণ স্ত্রীর বিরুদ্ধে শিক্ষা দিতে ক্ষেত্রমোহনের নতুন দারগ্রহণের সিদ্ধান্ত। আবার স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বিবাহ-ইচ্ছুক ব্যক্তির নাকাল হবার ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে গল্পে। সংসার জীবনে যন্ত্রণাদাত্রী ছিলেন স্ত্রী রসময়ী। আবার রসময়ী তার মৃত্যুর পরও স্বামীর জন্য যন্ত্রণাদাত্রীর ভূমিকা নিয়ে গল্পে উপস্থিত। স্বাভাবিকভাবে ভৌতিক পরিবেশের অবতারণা ঘটেছে কাহিনীতে। স্ত্রীর বর্তমান-অবর্তমান সব অবস্থাতেই নাকাল হওয়া চরিত্র ক্ষেত্রমোহন। রসময়ীর চিঠির বয়ান এবং বানান – উভয়ই পাঠক চিত্তে অনাবিল হাসির জন্ম দেয়। তার মৃত্যুর পরও স্বামী যাতে বিবাহ করতে না পারে তাই সম্ভাব্য ঘটনাবলী নিয়ে একাধিক পত্র লিখে রাখে রসময়ী। তার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কাহিনীতে একচেটিয়া কেবল তর্জন-গর্জন চলেছে। গল্পের হাস্যরসের খোরাক সঞ্চিত ছিল রসময়ীর বাক্সবন্দী হয়ে। মৃত্যুর পর তার বিধবা দিদি পরপর ঘটনার সূত্র সমর্থিত পত্রগুলি এক এক করে প্রেরণ করে গেছে ক্ষেত্রমোহনের ঠিকানায়। কোন যুক্ত-বুদ্ধিতেই নিষ্কৃতি লাভ সম্ভব হচ্ছিল না

ক্ষেত্রমোহনের। প্রকৃত সত্য প্রমাণের অভাবে সেগুলোকে ভৌতিক ব্যাপার ধরেই তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হতে হচ্ছিল। অন্যদিকে অল্পবয়স্কা নববধূ গ্রহণের ইচ্ছাটাও পরিত্যাগ করা যাচ্ছে না। দোল উপলক্ষে শ্বশুরগৃহে দুর্ঘটনা ঘটে। শ্যালক সুবোধ আহত হয়ে ভর্তি হয় হসপিটালে। পুলিস সুপার সাহেব আইনানুগভাবে বাড়ী সার্চ করেন। এই সময় বাক্স মধ্যে আবিস্কৃত হয় ক্ষেত্রমোহনের ভৌতিক চিঠির রহস্য। তার আর বিয়ে করা হয়ে ওঠে কিনা তা গল্পে বলা নেই। তবে তার মন যে সমস্ত ভৌতিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি লাভ করলো তা বলাই বাহুল্য।

'নিষিদ্ধ ফল' গল্পখানি খামখেয়ালি অথচ দোর্দন্ডপ্রতাপ পিতার সিদ্ধান্তে বাধাপ্রাপ্ত দাম্পত্য প্রণয়ের গল্প। জমিদার পিতা বাল্যবিবাহের সমর্থক হয়ে পুত্রকে সামান্য ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। 'সামাজিক সমস্যা সমাধান' নামক গ্রন্থ লিখে তাতে বর-কনের মিলনের বয়স স্থির করে দিয়েছেন চব্বিশ এবং ষোল। সজাগ দৃষ্টি রেখে ছেলে-বউমার সাক্ষাতের বিঘ্ন ঘটিয়েছেন। প্রেসিডেন্সির ছাত্র শ্রীমান হেমন্তকুমার নানা অছিলায় দুই এক পলক স্ত্রীকে দেখতে পেয়েছে মাত্র। স্ত্রীর বিরহে 'বঙ্গবাণী'-তে' চকোরের ব্যথা' শিরোনামাঙ্কিত কবিতাও লিখেছে সে। নন্দরানীর বড়দি যামিনীর বিবাহ হয়েছে শিবপুরে। তার এবং তার স্বামীর উদ্যোগে শিবপুরে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয় হেমন্তকুমার-নন্দরানীর। বাড়ীতে স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সে ঝি-কে পারিতোষিক দিয়েছে, দড়ির মই ক্রয় করে নন্দরানীর জানালায় স্থাপন করেছে। পিতার অজান্তে গ্রামে ফিরে সেই গোপন পথে স্ত্রীর ঘরে ঢুকতে গিয়ে তাকে যেভাবে নাকাল হতে হয়েছে – সেটাই আলোচ্য গল্পের হাস্যরসের কাহিনী। চোর প্রতিপন্ন হয়ে বাগানে লুকোচুপিও খেলতে হয়েছে প্রহরী-কর্মচারীদের সঙ্গে। শেষ দৃশ্যে পিতা তাকে বউমার কক্ষে আবিষ্কার করার পর নিজের গ্রন্থে বর-কনের মিলনের বয়স কেটে করেছেন বাইশ এবং চোদ্দ। আলোচ্য এই হাস্যরসের কাহিনীতে তাদের প্রণয়ের আকর্ষণ থেকে উদ্ভূত ঘটনা আমাদের জন্য হাসির খোরাকের জোগান দিয়েছে।

'বিবাহের বিজ্ঞাপন' এবং 'পোষ্টমাষ্টার' গল্প দুখানি হাস্যরসের গল্প হলেও সেখানে হাস্যরসের উৎপত্তির কারণ চরিত্রের কৌতূহলী সিদ্ধান্ত ও অসংযম প্রবৃত্তি। 'বিবাহের বিজ্ঞাপন' গল্পখানির পটভূমিকা বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশের বাইরে। গল্পের মূল চরিত্র গাজীপুরের গোরাবাজারের দ্বাবিংশতিবর্ষীয় সিদ্ধিখোর যুবক রাম অওতার। অকস্মাৎ একদিন হিন্দি কাগজের ঠোঙায় বিগত দিনের এক বিবাহের বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করে সে। প্রার্থনাসমাজভুক্ত একটি সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যার জন্য সচ্চরিত্র, সুশিক্ষিত কায়স্থ পাত্র আবশ্যক। বিজ্ঞাপনদাতা লালা মুরলীধর লাল বেনারস সিটির কেদার ঘাট নিবাসী মহাদেও মিশ্রের ভাড়াটিয়া। কয়েক বছর আগেই তার কন্যার বিবাহ হয়ে গেছে। সপরিবারে ভাড়া গুটিয়ে অন্যত্র বাসাবদলও করে নিয়েছে। এসব খবর রাম অওতারের জানার কথা নয়। নিতান্ত কৌতুহলের ছলে নিজের বিয়ের খবর গোপন রেখে সে সেই ঠিকানায় চিঠি লেখে। চিঠি মহাদেও মিশ্রের হাতে পৌঁছায়। মহাদেও মিশ্র এবং তার

সাকরেদ কাহ্নাইয়ালাল কাশীর দুই বিখ্যাত গুন্ডা। চিঠির প্রত্যুত্তরে তারা স্টুডিও থেকে ফাটো সংগ্রহ করে পাঠায়। দুই গুন্ডার বাঁধা ছকে পা দিয়ে রাম রেশমী চাপকান, সুন্দর মখমলের টুপি, রঙীন জুতা, সোনার ঘড়ি, সোনার চেন, হীরার আংটি এবং দুইশত টাকা সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করে। যথাসময়ে তাকে গোপন গৃহে তোলা হয়। সামান্য জলযোগ করিয়ে পর্যাপ্ত সিদ্ধি খাইয়ে তাকে বেহুঁশ করে সব লুঠ করে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় সন্ন্যাসী কৌপীন পরিয়ে দিয়ে মান মন্দিরের দেউড়ীতে ফেলে আসা হয়। পরবর্তী কালে শোনা যায় রাম এখন সংসার-বিরাগী কাশীর সন্ন্যাসী। একদিন তার মাতুল তাকে অনেক বুঝিয়ে গৃহস্থাশ্রমে ফিরিয়ে আনেন। সমাজে ধার্মিক ব্যক্তি বলে রামের নতুন এক খ্যাতি, পরিচিতি গড়ে উঠেছে। পাঠক জানে তার আজকের এই খ্যাতি অর্জনের ইতিহাস। তার সেই নাকাল হবার হাস্যরসাত্মক কাহিনী সংঘটনের পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল তার অহেতুক কৌতূহল। যে কৌতূহল থেকেই পাঠকের জন্য হাসির খোরাকের জন্ম হয়েছে। প্রভাতকুমার লিখিত কৌতূহল থেকে নাকাল হবার আরেকটি কৌতুকাবহ গল্পের নাম 'পোষ্টমাষ্টার'। মহেশপুরের জীর্ণ পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টার বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাম অওতারের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় বিমলচন্দ্র অনেক বেশী প্রবঞ্চক ব্যক্তিত্ব। কৌতূহল জন্ম নেবার ফলে দুজনেই তারা কাহিনীতে নাকাল হয়েছে। একজন সর্বস্ব খুইয়েছে। আর একজন উত্তম-মধ্যম প্রহৃত হয়েছেন। জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক সন্তানের জন্য দুধ কিনতে চিঠির খামের মধ্যে প্রেরিত দশ টাকা হাতিয়ে বিমল মদ-মাংসের আসর জমায়। অন্যের প্রেমপত্র খুলে নিজের মনের খোরাক জোগায়। কত লোকের পাঠানো (খামের মধ্যে) টাকা হাতিয়ে সে যে বেলেল্লাপনা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। শেষে বিধবা বনলতার নামে লেখা নরেন্দ্রনাথ মন্ডলের চিঠি যাতে গোপনে তাকে রসুলপুর থেকে কলকাতা নিয়ে যাবার কথা ব্যক্ত হয়েছে, পোষ্টমাষ্টার তা পড়ে কৌতূহলী হয়েছে। পরপর দুটি চিঠিতেই তাকে নিয়ে যাবার কথা বলা আছে। তবে চিঠি দুটিতে পার্থক্য কেবল তারিখের পরিবর্তন করে নিয়ে যাবার দিনের পরিবর্তনের কথা। তারিখ পরিবর্তন করে স্বাভাবিকভাবে নরেন্দ্রনাথ সেদিন আসেননি। সেখানে পৌঁছালেন পোষ্টমাষ্টার। বনলতার শ্বশুর চিঠি হাতে পেয়ে সব অবজ্ঞাত হয়ে যথাসময়ে সদলবলে সঙ্কেত-নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হন। অন্ধকারে উত্তম-মধ্যম প্রহার করে অচেতন করে ফেলেন পোষ্টমাষ্টারকে। আলো জ্বেলে পোষ্টমাষ্টারকে দেখে তারা হতচকিত হয়ে অফিসের বারান্দায় ফেলে যায় তাকে। বিমল এই ঘটনাকে ডাকাতি বলে চালিয়ে দেয়। সরকারী তহবিল রক্ষার্থে সে প্রহৃত হয়েছেন — এমন সাক্ষ্য প্রদান করেন তার পিয়নেরা। বিমলের পদোন্নতি ঘটে। সুতরাং ঠকবাজিতে তার এই পদোন্নতির ঘটনা পাঠকের হৃদয়ে হাসির উদ্রেগ করে।

ইউরোপের পটভূমিকায় লেখা প্রভাতকুমারের দুটি মর্মস্পর্শী সিরিয়াস গল্প 'ফুলের মূল্য' এবং 'মাতৃহীন'। গল্পদুটি তাঁর 'দেশী ও বিলাতী' গল্পমালার 'বিলাতী'

পর্যায়ের গল্প। ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবাসীর চক্ষে ইংরেজরা ঘৃণ্য জাতি বলেই চিহ্নিত। আলোচ্য দুই গল্পে লেখক সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসেছেন। তাদের অন্তরলোকের প্রকৃত সত্তা উৎঘাটনের মাধ্যমে ইংরাজ সম্পর্কে আমাদের চিরাচরিত বিশ্বাসকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন।

সমসাময়িক বিষয়ের মধ্যে নিত্যাকালের ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে প্রভাতকুমার অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই সূত্রে আমরা তাঁর 'খোকার কান্ড' গল্পটিকে উল্লেখ করতে পারি। আমার মতে সমকালীন ধর্ম বিশ্বাস-কেন্দ্রীক দ্বন্দ্ব, যেমন হিন্দু-ব্রাহ্ম দ্বন্দ্ব মোটেই হাস্যরসাত্মক বিষয় নয়। সেই সিরিয়াস বিষয়টি গল্পের কেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত। গল্পের নামকরণ 'খোকার কান্ড' অথচ বৃহৎ কায়া-সমৃদ্ধ আলোচ্য গল্পটিতে বাস্তবিক খোকার কান্ড ঘটেছে গল্পের শেষে। পুরুষ-শাসিত সমাজ তাঁর নিজের ধর্মবিশ্বাসকেও নারীর উপর চাপিয়ে দিচ্ছে — এখানেও লেখকের কোন বক্তব্য লুকিয়ে থাকতে পারে। সহজ সাবলীল গতিতে অনিবার্য পরিণামের দিকে ধাবিত পূর্বপরিকল্পিত ছকবিহীনএকটি গল্প 'কাশীবাসিনী'তে গল্পকার তুচ্ছ সাধারণ চরিত্রের মধ্যেও মাতৃসত্তার মহিমময় রূপটিকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় পশুমনস্তত্ত্বের একটি অসাধারণ ছোটগল্প 'আদরিণী'। পশুর প্রতি বাৎসল্য-স্নেহের এমন ছোটগল্পের উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে কমই আছে। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' বনফুলের 'গণেশ জননী' এক্ষেত্রে স্মরণীয়। বন্ধুমহলে আত্মসম্মান রক্ষার্থে জয়রাম মোক্তার প্রবল জিদের বশে দুহাজার টাকার বিনিময়ে মাদী হাতিটিকে কিনে আনে বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর কাছ থেকে। মহারাজ নরেশচন্দ্রের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন এই হাতির পিঠে চড়ে। ক্রমে একদিন মোক্তারের সাংসারিক অনটন দেখা দেয়। হাল আমলের উকিলদের রমরমায় সেকেলে মোক্তারদের পেশাগত জীবন ধাক্কা খেতে শুরু করে। প্রবল আর্থিক অনটনে পড়ে একসময় মোক্তার রাজী হয় 'আদরিণী' নাম্নী মাদী হাতিটিকে বেঁচে দিতে। বিক্রির জন্য বামুনহাটের মেলায় পাঠানো তার প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হয় মোক্তারের মিথ্যা অথচ একরাশ হতাশাকে চাপা দেওয়া ভগ্নকণ্ঠের সংলাপে —'আদর, যাও মা, বামুনহাটের মেলা দেখে এস।' বিদায়বাণীটুকু উচ্চারণ না করতে পারার এই ছলনাটুকু পশু বোঝে না। তাই সব বাধা ভেঙে সে ফিরে আসে মোক্তারের গৃহে। এরপর তাকে বিক্রির জন্য রসুলগঞ্জের মেলায় পাঠানো হয়। এই দ্বিতীয় প্রয়াসে অভিমানিনী আদর পথেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে মোক্তার সেখানে পৌঁছানোর আগেই আদর জীবন ছেড়ে চলে যায়। তার নিশ্চল-নিস্পন্দ দেহের উপর আছড়ে পড়ে বৃদ্ধের বিলাপ —

> 'অভিমান করে চলে গেলি মা ? তোকে বিক্রি করতে পাঠিয়েছিলাম বলে — তুই অভিমান করে চলে গেলি ?'৩

এই ঘটনার পর মোক্তার মুখোপাধ্যায় মশাই আর দুমাস মাত্র বেঁচে ছিলেন। আদরের মৃত্যুতে ছিন্ন হয়েছিল পিতা-কন্যার বাৎসল্য-মধুর স্নেহের সম্পর্ক। এই শোক তরান্বিত

করেছিল মোক্তারের মৃত্যুর মুক্তিপথের যাত্রা। শ্রদ্ধেয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ‘great short story’-র (প্রভাতকুমারের গল্প তালিকায়) খাতায় প্রভাতকুমারের দেড়খানি গল্পকে মান্যতা দেবার পক্ষপাতী। অর্ধাংশ ‘আদরিণী’ আর পূর্ণ একটি গল্প ‘দেবী’। ‘দেবী’ গল্পখানির প্লট গল্পকারকে দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গল্পখানির প্রশংসা করলেও ‘বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার’ গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় শ্রীভূদেব চৌধুরী যথার্থই বলেছেন —

> ‘গল্পের এই গতি ও পরিণতিকে নাটকীয় বলা চলে না, — এর পূর্বাংশে না আছে প্রত্যক্ষ সংঘাত, — না আছে পরিণামের আকস্মিকতা। এ যেন সত্যিই সিচুয়েশন-এর ওপরে সিচুয়েশন-এর চাপ দিয়ে অনুভবের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাথরের ভার বাড়িয়ে নিরুদ্ধশ্বাস করে তোলার আর্ট।’৪

দেবী যতদিন মানবী দয়াময়ী ছিল ততদিনই সে বাস্তবিক সুখী ছিল। উমাপ্রসাদের সঙ্গে তার দাম্পত্য-মধুর সম্পর্ক প্রত্যেক সাংসারিক নারীর কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের মতো। ভাশুর তারাপ্রসাদ ও বড় জা হরসুন্দরীর একমাত্র সন্তান খোকাকে অপত্য-স্নেহে আহ্লাদে চমৎকার কেটে যাচ্ছিল তার দিন। শক্তিসাধক জমিদার শ্বশুর কালীকিঙ্কর রায়ের আকস্মিক স্বপ্নদর্শন দয়াময়ীর জীবনে নতুন বাঁকের জন্ম দেয়। আকস্মিকভাবে দেবীর চরণে স্থান পাওয়া দু-একটি মুমূর্ষু রোগীর রোগমুক্তি দয়াময়ীর নিজস্ব ভাবনার রূপান্তর এনে দেয়। স্বামীর কাছ থেকে সে নিজেকে আড়াল করতে শুরু করে। স্বামীর পলায়ন পরিকল্পনায় তাই মদত জুগিয়েও শেষমুহূর্তে সে নাকচ করে পালানোর সেই প্রস্তাব। কারণ তার দেবীত্ব তাকে ততদিনে আষ্টেপিষ্টে আঁকড়ে ধরেছে। এই নাকচই তার জন্য রচনা করেছে পরিণতির ট্রাজেডি। অসুস্থ খোকাকে রক্ষা করতে দেবী প্রতিপন্ন দয়াময়ী সত্যিকারের দেবীর কাছে অনেক প্রার্থনা করে ব্যর্থ হল। মুহূর্তে তার দেবীত্ব রাক্ষসীত্বে পরিবর্তিত হয়ে গেলে ‘আত্মহত্যা’ ছাড়া আর তার কোন পথ থাকে না। তাই –‘পরিধেয় বস্ত্র রজ্জুর মত করিয়া পাকাইয়া, কড়িকাঠে লাগাইয়া দেবী আত্মহত্যা করিয়াছে।’৫

আলোচনার শেষে এসে বলতে হয় রূপদক্ষ শিল্পী প্রভাতকুমার যেভাবে জীবনকে দেখেছেন সেই উপলব্ধিকে অত্যন্ত সহজ-সরল উপস্থাপনায় গল্পদেহে বর্ণনা করে গেছেন। এমন ভারহীন সরলরৈখিক গদ্য সত্যিই বিরল। Wit আর Fun তাঁর অধিকাংশ গল্পদেহের ধারক। কোন কোন গল্পে মৃদু শ্লেষ থাকাও অস্বাভাবিক নয়। হাস্যরসাত্মক কৌতুকাবহ সৃষ্টিতে তিনি অনবদ্য স্বাক্ষর রেখেছেন সত্য, পাশাপাশি serious গল্পের আলোচনায় অনেক ক্ষেত্রে তিনি সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের mystic এবং দুর্বোধ্য রচনার ‘select reader’ প্রভাতকুমারে এসে যেন হাফ ছেড়েছেন। তাঁর সাহিত্যের reader ‘common reader’ হয়ে উঠেছে। নিপুণ আঙ্গিক রীতির প্রয়োগে গল্প বলার বিশেষ ক্ষমতা ‘Precision’ তাঁর ছিল বলেই তিনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় ‘great’ না হলেও ‘good’ গল্পকার হয়ে উঠেছিলেন।

কোন সংস্কারকে না টলিয়ে কোন নতুন সত্যকে আবিষ্কার না করেও নিজের ঘরাণায় ‘Personality’-তে দেদীপ্যমান হতে পেরেছেন তিনি।

তথ্যসূত্র:

১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘বাংলা গল্প বিচিত্রা’, পঞ্চম মুদ্রণঃ আশ্বিন, ১৪১০, প্রকাশ ভবন, ১৫, কলিকাতা-৭৩, পৃ. ২৪
২. জগদীশ ভট্টাচার্য, ‘আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী’, দ্বিতীয় প্রকাশ মাঘ ১৪১৩, জানিয়ারি ২০০৭, ভারবি, কলিকাতা-৭৩, পৃ. ৩২
৩. অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, একাদশ মূদ্রণঃ ভাদ্র ১৪১০, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা-৭৩, পৃ. ১৮৭
৪. শ্রীভূদেব চৌধুরী, ‘বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার’,চতুর্থ প্রকাশ (পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত) ১৯৮৭,পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৯,মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭৩,পৃ. ১৫৬
৫. অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, একাদশ মূদ্রণঃ ভাদ্র ১৪১০, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা-৭৩, পৃ. ৫৮

১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইন ও পরবর্তী এক দশকের বাংলার রাজনীতির গতিপ্রকৃতি

রেবতী রঞ্জন ওঝা
সহকারী অধ্যাপক, পাঁচথুপী হরিপদ গৌরীবালা কলেজ,
পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ

সারসংক্ষেপঃ স্বাধীনতার পূর্ববর্তী একদশকে ভারত তথা বাংলার ইতিহাস নিশ্চিতভাবেই এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কারন এই সময়পর্বে বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল সেটা বাংলা তথা দেশভাগের একটি অন্যতম প্রধান কারন হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাকে কেন্দ্র করে বাংলার প্রাদেশিক রাজনীতি এক অন্ধকারময় পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় উপমহাদেশকে একটি শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের সকল চেষ্টাই বিফল হয়। হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য, মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ, ফজলুল হকের কৃষক প্রজাপার্টির ব্যর্থতা, জাতীয় কংগ্রেসে বামপন্থী মতাদর্শের প্রসার ও ফরওয়ার্ড ব্লক দল প্রতিষ্ঠা, তেভাগা আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ, কোলকাতা দাঙ্গা, সর্বোপরী বাংলা তথা দেশভাগ প্রভৃতি এই কালপর্বকে ভারত ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ও বহুচর্চিত বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রস্তাবিত এই প্রবন্ধে এই সকল বিষয়কে তথ্যনিষ্ঠ ও গুরুত্বসহকারে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। সর্বোপরি তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতি সত্যিই কি দেশভাগকে অনিবার্য করে তুলেছিল কিনা তারও একটা স্বচ্ছ ধারনা দেওয়ার চেষ্টা করেছি এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে।

সূচকশব্দ : জাতীয় কংগ্রেস, দেশভাগ, প্রাদেশিক নির্বাচন, ফরওয়ার্ড ব্লক, ভারত শাসন আইন ১৯৩৫, মুসলিম লীগ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর ব্রিটিশ প্রদত্ত ১৯১৯ এর মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্খা পূরণে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। ফলে ভারতবাসীর রাজনৈতিক অগ্রগতি ক্রমশ প্রত্যক্ষ আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন শাসন সংস্কার আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারতবাসীর পুঞ্জিভূত ক্ষোভকে নিরসনের জন্য ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন গঠন করে। এরপর ১৯৩৩ সালে তিনটি গোলটেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্ত ও সরকারি বিভিন্ন প্রস্তাবগুলি পরীক্ষা করে একটি নীতি নির্ধারণ করা হয়। এই নীতির উপর ভিত্তি করে ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বরে

ভারতসচিব স্যার স্যামুয়েল হোর ইংল্যান্ডের হাউস অব কমন্স-এ ভারতীয়দের জন্য নতুন শাসনতান্ত্রিক বিল উত্থাপন করেন। দীর্ঘ আলোচনা করে ১৯৩৫ সালে পার্লামেন্টের অনুমোদন নিয়ে ভারত শাসন আইন প্রবর্তন হয়।

ভারত শাসন আইনের দুটি প্রধান দিক হল ১. ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয় প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহকে নিয়ে গঠিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং ২. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন। তবে ভারতের কোন রাজনৈতিক দলই এই আইনকে সমর্থন করেনি। কারন এই আইনে ব্রিটিশ ভারতের মাত্র ১৪ শতাংশ মানুষ ভোটদানের অধিকারী হয়েছিল। ভাইসরয় ও গভর্নরদের হাতে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের বিষয়টি দেশীয় রাজ্যগুলির ইচ্ছাধীন করা হয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতার বীজ নিহিত থাকায় জাতীয়তাবাদও অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা হয়। ঐতিহাসিক সুমিত সরকারের ভাষায় “...the 1935 Act remained entirely silent about Dominion status.”[১] কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহরু এই আইনকে ‘দাসত্বের এক নতুন অধ্যায়’ বলে অভিহিত করেছেন।[২] অন্যদিকে বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার আগেই মুসলিম লীগ এর সমালোচনা করে বলেছিল-“The Muslims and Muslim masses will suffer from the new scheme as much as any other section of the Indian people.”[৩] অবশ্য ঐতিহাসিক পি. ই. রবার্টস প্রমুখ ঐতিহাসিক এই আইনের প্রশংসা করেছেন। তাঁর ভাষায় “ It was the last major constructive achievement of the British India.”[৪] তবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের তাৎপর্য সবচেয়ে ভাল করে বলা যায় বড়োলাট লর্ড লিনলিথগোর ভাষায়। তিনি বলেছেন, “মোটের ওপর আমরা ১৯৩৫ সালের সংবিধান রচনা করেছিলাম কারন আমরা মনে করেছিলাম এই পথেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষকে সুচারুরূপে বেঁধে রাখা যাবে।”[৫] যাই হোক সমালোচনা, প্রতিবাদ সত্তেও ১৯৩৭ এর ১লা এপ্রিল থেকে এই আইন কার্যকরী হয়।

১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে সারা ভারতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলার রাজনীতিও ছিল ঘটনাবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনে বাংলার বহু রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহন করলেও তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দল এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১. এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক প্রজাপার্টি, ২. পুনর্গঠিত মুসলিম লীগ, যার নেতৃত্বে ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না, ৩. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। এই নির্বাচনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় কংগ্রেস সরকার গঠন করলেও পাঞ্জাব ও বাংলায় তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। বাংলায় আঞ্চলিক দল ফজলুল হকের কৃষক প্রজাপার্টি উল্লেখযোগ্য সফলতা পায়।

কৃষক প্রজাপার্টিঃ এই দল প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট হিসাবে বলা যায়, ১৯২৯ সালে স্যার আবদুর রহিম যে “নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি” প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৩৫ সালে এ. কে.

ফজলুল হক তার সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৩৬ সালে প্রজা সিমিতির নতুন নামকরণ হয় 'কৃষক প্রজা পার্টি'। নির্বাচনের আগে তারা নির্বাচনী ইস্তাহারে ১৪ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, কৃষকের খাজনার হার কমানো, ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন, নযর ও সেলামী প্রথা বন্ধ করা, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা ইত্যাদি। ফজলুল হকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে এই দল গ্রামবাংলার সাধারন খেটেখাওয়া মেহনতি মানুষের কাছে জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি ও নিউ মুসলিম মজলিশ পার্টিঃ ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে দ্বিতীয় যে আঞ্চলিক দল অংশগ্রহণ করে সেটি হল 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি'। নবাব হাবিবুল্লা কলকাতার রক্ষণশীল মুসলিম নেতৃবৃন্দদের নিয়ে ১৯৩৬ সালে এই দল প্রতিষ্ঠা করেন। সোরাবর্দী এই দলে যোগদান করলে দলটি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রায় একই সময়ে 'নিউ মুসলিম মজলিশ' নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ডা. রফি আহম্মদ, হাসান ইস্পাহানী প্রমুখ। পরবর্তীকালে ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি ও নিউ মুসলিম মজলিশ দল দুটি একত্রিত হয়ে মুসলিম লীগ পুনর্গঠিত হয়।

পুনর্গঠিত মুসলিম লিগঃ ১৯০৬ সালে ঢাকাতে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা হলেও জাতীয় কংগ্রেসের মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। মহম্মদ আলি জিন্না ১৯১৩ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করে লীগকে একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করার চেষ্টা করেও বিশেষ সফল হননি। এই কারনে হতাশ হয়ে তিনি লন্ডনে স্বেচ্ছায় নির্বাসন নেন। কিন্তু ১৯৩৪ সালে জিন্না স্বেচ্ছা নির্বাসন কাটিয়ে ভারতে ফিরে আসেন এবং লীগের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। এরপর তিনি মুসলিম লীগের পুনর্গঠনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি কলকাতায় এসে মুসলিম দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করে আসন্ন নির্বাচনে মুসলিম লীগের নেতৃত্বাধীনে নির্বাচনের প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবে ফজলুল হকের ব্যক্তিগত সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কৃষক প্রজা পার্টি যৌথ নির্বাচনের প্রস্তাব থেকে সরে দাঁড়ায়। এর ফলে কৃষক প্রজা পার্টি ও পুনর্গঠিত মুসলিম লীগ পৃথকভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। জাতীয় কংগ্রেসও এই নির্বাচনে স্বতন্ত্রভাবে অংশ নেয়।

১৯৩৭ এর নির্বাচন ও ফলাফলঃ এই নির্বাচনে সমস্ত দলই তাদের নির্বাচনী ইস্তাহার অনুযায়ী প্রচারকার্য চালায়। কংগ্রেস ও লীগের দাবী ছিল রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক। অন্যদিকে কৃষক প্রজা পার্টি উন্নয়নমূলক কর্মসূচির উপর গুরুত্ব দিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে এই দলের জনকল্যানমূলক কর্মসূচি সহজেই বাংলার

সাধারন গ্রামীণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এছাড়া ফজলুল হকের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাও এই দলের প্রতি জনসমর্থন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কৃষক প্রজা পার্টির ঘোষিত ডাল-ভাত কর্মসূচী দরিদ্র জনসাধারণের প্রতীক। বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ২৫০। এর মধ্যে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত ছিল ১২১। নির্বাচনে প্রাপ্ত আসনের মধ্যে ছিল জাতীয় কংগ্রেস ৬০, কৃষক প্রজা পার্টি ৩৫, লীগ ৪০, নির্দলীয় মুসলমান ৪১, ইউরোপীয় ২৫, নির্দলীয় নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ২৩, নির্দলীয় বর্ণহিন্দু ১৪, এছাড়া অন্যান্য ১২। এই নির্বাচনে কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ কালপর্বে বাংলায় মোট চারটি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

১. ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রীসভাঃ ১৯৩৭ এর বঙ্গীয় প্রাদেশিক নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি। ফলে বাংলায় জোট সরকার গঠন অনিবার্য হয়ে পড়ে। নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টি, মুসলিম লীগ ও নির্দলীয় মুসলিমদের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি থাকলেও বাংলার গভর্নর হার্বার্ট ফজলুল হককে মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান করেন। এর মূলে ছিল ফজলুল হকের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা। তিনি কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে সরকার গঠন করতে চাইলেও কংগ্রেস তাতে অসম্মতি জানায়। তাই বিকল্প হিসাবে মুসলিম লীগের প্রস্তাব মতো তিনি তাদের সঙ্গে ১১ সদস্যের একটি জোট সরকার গঠন করেন। কৃষক প্রজা পার্টির মাত্র দুই জন সদস্য থাকায় এই মন্ত্রীসভা নিয়ে পার্টির মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং পার্টি আনুষ্ঠানিক ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে মন্ত্রীসভা ধরে রাখতে একপ্রকার বাধ্য হয়ে তিনি ১৯৩৭ এর ১৫ অক্টোবর আনুষ্ঠানিক ভাবে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। অর্থাৎ কংগ্রেসের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়ে তিনি 'মুসলিম লীগের বাহুর মধ্যে' যেতে বাধ্য হন।[৬] 'এর ফলে বাংলার রাজনীতিতে বাংলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আবির্ভাব ঘটে।'[৭] এরপর তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি হন ও সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহন করেন হোসেন শাহীদ সোরাবর্দি।

শুরুতেই লীগের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে কৃষক প্রজা পার্টিকে 'বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা' উচ্ছেদ সহ বেশ কিছু বিষয়ে লীগের সঙ্গে আপোষ করতে হয়। বহু বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও হক মন্ত্রীসভা জমিদারদের ক্ষমতা হ্রাস, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন (১৯৩৮), কৃষিখাত আইন, চাকরীতে মুসলমানদের জন্য ৫০% সংরক্ষণ, রাজবন্দীদের মুক্তি সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। কিন্তু কৃষক প্রজা পার্টির এই কৃতিত্বের সুফলকে মুসলিম লীগ নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার ও প্রচার চালায়। এর ফলে বঙ্গ রাজনীতিতে লীগের জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব দুই-ই বৃদ্ধি পায়। ১৯৪০ সালে মুসলিমদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দাবিতে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করলে মুসলিম লীগ জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছায়। অবশ্য সুচতুর লীগ ফজলুল হককে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে সম্মান জানায়।[৮] এক পর্যায়ে লীগ নেতা জিন্না ও

সোরাবর্দির সাথে ফজলুল হকের মতবিরোধ এমন হয় যে প্রথমে তিনি মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ও কাউন্সিল থেকে এবং শেষে ১৯৪১ এর ১ লা ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করলে প্রথম হক মন্ত্রীসভার পতন ঘটে।

বাংলায় কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বঃ প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্ন কর্মপন্থা ও নীতি-আদর্শ নিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতপার্থক্য ও সংঘাত ছিল। ১৯০৭ সালে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থী বিভাজনের মাধ্যমে সেই সজ্ঘাতের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে এবং পুনরায় ১৯৩৭ এর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। ফজলুল হক কংগ্রেসের সাহায্যে বাংলায় মন্ত্রীসভা গঠনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু এবং আইনসভার কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসু কৃষক প্রজা পার্টির সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে চাইলেও গান্ধীজীর অনুগত বিধান চন্দ্র রায়, কিরনশঙ্কর রায় ও প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের বিরোধীতায় সেটা সম্ভব হয়নি।

১৯৩৭ এর নির্বাচন ও জোট সরকার গঠন নিয়ে কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী গোষ্ঠীর প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। এই গোষ্ঠীর প্রধান শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্র বসু 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের' তরুন সদস্যদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু দক্ষিণপন্থী গান্ধিবাদী নেতারা সুভাষপন্থীদের মেনে নিতে পারেনি। তা সত্ত্বেও বিপুল জনসমর্থন নিয়ে কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে (১৯৩৮) সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। এরপর তিনি বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রী শ্রমিক-কৃষক সংগঠনগুলিকে কংগ্রেসের সাথে যুক্ত করে শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর 'National Planning Commission'- এর রিপোর্টে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির দ্বারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলেন। কিন্তু গান্ধীজী রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করে সুভাষ বোসের পরিকল্পনার বিরোধীতা করেন। এইভাবে ত্রিপুরী অধিবেশনের প্রাক্কালে ভারতীয় রাজনীতিতে 'গান্ধী-বোস দ্বন্দ্বের' উৎপত্তি হয়। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গান্ধীজীর নির্দেশ অমান্য করে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে (১৯৩৯) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং গান্ধী মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে ২০৩ ভোটে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার সভাপতি নির্বাচিত হন। এতে একপ্রকার হতাশ হয়ে গান্ধীজী ক্ষোভের সঙ্গে জানান যে, 'সীতারামাইয়ার পরাজয় মানে তাঁর নিজের পরাজয়'।

ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠনঃ ত্রিপুরী অধিবেশনে নির্বাচিত হলেও সুভাষচন্দ্র স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেনি। কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যরা প্রতিপদে তাঁর কাজে বাঁধা সৃষ্টি করেছিলেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরবর্তী এই সঙ্কট কাটাতে সুভাষচন্দ্র আপ্রাণ চেষ্টা করেও সফল হননি। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অনবরত বিরোধিতার ফলে ১৯৩৯ সালের ২৯ এপ্রিল কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে

আনুষ্ঠানিকভাবে সভাপতির পদ থেকে তিনি ইস্তফা দেন এবং ১৯৩৯ এর ৩ মে 'ফরওয়ার্ড ব্লক দল' গঠন করেন। ক্ষুব্ধ কংগ্রেস হাইকমান্ড তাকে ১৯৩৯ এর ১১ আগস্ট প্রথমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পদ থেকে এবং পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পদ থেকে ৩ বছরের জন্য বহিষ্কার করেন।

হক মন্ত্রীসভার দ্বিতীয় পর্যায়ঃ প্রথম হক মন্ত্রীসভার পতনের পর ফজলুল হক তাঁর কৃষক প্রজা পার্টি ও অনুগামীদের নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক, হিন্দু মহাসভা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট তফসিলি হিন্দুদের সমন্বয়ে 'প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি' নামে একটি নতুন সম্মিলিত দল গঠন করেন। এই দলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে উন্নত করে সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা ফজলুল হককে সমর্থন করায় বাংলার গভর্নর হার্বাট দ্বিতীয়বারের জন্য হক সাহেবকে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন। শরৎচন্দ্র বসু গ্রেপ্তার হওয়ায় তাকে বাদ দিয়েই ফজলুল হক ১১ সদস্যের পূর্ণ মন্ত্রীসভা গঠন করেন। মন্ত্রীসভার উল্লেখযোগ্য সদস্যরা হলেন খাজা হাবিবুল্লা, শামসুদ্দিন আহম্মদ, হিন্দু মহাসভার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রমুখ। ফজলুল হকের এই পাঁচমিশালী দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা দেখে ভাইসরয় লিনলিথগো মন্তব্য করেছিলেন, "এটি খুবই লক্ষণীয় বিষয় হবে যদি এমন্ত্রীসভা নয় বা বারো মাস একত্রে থাকতে পারে।" [৯]

জাতীয় কংগ্রেস কিন্তু এই মন্ত্রীসভাতেও যোগ দেয়নি। অন্যদিকে হিন্দু মহাসভার নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মন্ত্রীসভায় যোগ দেওয়ায় লীগ এই মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে মুসলিম জনমত গঠনে তৎপরতা দেখায়। মুসলিম লীগ এই মন্ত্রীসভাকে 'শ্যামা-হক' মন্ত্রীসভা বলে বিদ্রুপ করে।[১০] লীগ এই মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে জনসভাগুলিতে প্রচার চালিয়ে ফজলুল হক ও তাঁর সহযোগীদের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা বলে চিহ্নিত করা হয়। বলা হয় যে, "এসব মুসলমান কুইসলিং মুসলিম বাংলাকে মহাসভার হাতে তুলে দিয়েছে, যেভাবে মীরজাফর বাংলাকে ক্লাইভের হাতে তুলে দিয়েছিল।"[১১] ফলে হক মন্ত্রীসভা মুসলিমদের মধ্যে ক্রমশ জনপ্রিয়তা হারায়। তাছাড়া দ্বিতীয় হক মন্ত্রীসভার কিছু পদক্ষেপ মুসলিম জনমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অন্যদিকে মেদিনীপুরে কংগ্রেস সমর্থকদের উপর পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। এই সঙ্কট মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে ফজলুল হক পদত্যাগ করেন। "বাংলার গভর্নর হার্বার্টের সক্রিয় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ১৯৪৩ এর মার্চে হক মন্ত্রীসভা ভেঙে দেওয়া হয় এবং খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠা করা হয়।"[১২]

নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভাঃ হার্বার্টের সহযোগিতায় গঠিত নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভায় ৭ জন মুসলিম ও ৬ জন হিন্দু সদস্য ছিল। কংগ্রেস এবারও মন্ত্রীসভায় যোগদান করেনি। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন ছাড়া নবাব মোশারফ হোসেন, খাজা শাহাব উদ্দিন,তমিজ উদ্দিন খান, পুলিন বিহারী মল্লিক প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য সদস্য। সোরাবর্দী বেসামরিক

মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই সময়ে পঞ্চাশের মন্বন্তরে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তার ফলে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। এই সময় মন্ত্রীসভার সদস্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ প্রভৃতি কারনে এই সরকারের ভীত যেমন দূর্বল হয়ে পড়ে, তেমনি হিন্দু-মুসলিম জনসমর্থনও কমতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪৫ সালের বাজেট অধিবেশনের সময় ভোটাভুটিতে তিনি পরাজিত হলে তাঁর মন্ত্রীসভার পতন ঘটে।

সোরাবর্দী মন্ত্রীসভা ও অখণ্ড স্বাধীন বাংলা গড়ার প্রয়াসঃ ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ইংল্যান্ডে যে নির্বাচন হয়, তাতে জয়লাভ করে শ্রমিক দলের নেতা ক্লিমেন্ট এটলী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এটলীর ঘোষণা মতো ভারতেও সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এ নির্বাচন বিভিন্ন দিক গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গীয় আইনসভার ১২১ টি সংরক্ষিত মুসলিম আসনের মধ্যে তারা ১১৪ টিতে জয়লাভ করে। ফজলুল হক জয়লাভ করলেও সামগ্রিকভাবে কৃষক প্রজা পার্টি চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়। লীগ বাংলার রাজনীতিতে মুসলিমদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। নির্বাচনে জয়লাভ করে সোরাবর্দী ৮ সদস্যের যে মন্ত্রীসভা গঠন করেন।

সোরাবর্দী মন্ত্রীসভা ১৫ মাস ক্ষমতায় থাকলেও এই মন্ত্রীসভার কার্যকাল ছিল বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্রান্তিকাল। ভাগচাষীদের তেভাগা আন্দোলন, কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান, দেশবিভাগ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি প্রভৃতি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মন্ত্রীসভার রাজনীতি আবর্তিত হয়। সময়কাল স্বল্প হলেও সোরাবর্দী মন্ত্রীসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল স্বাধীন অখণ্ড বাংলা গড়ার প্রয়াস। এইসময় ভারতীয়দের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানের জন্য ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ সরকার তিন সদস্যের ক্যাবিনেট মিশন পাঠালেও ভারতবাসী তা প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৪৬ এর ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ডাক দিলে কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়। পরবর্তীতে পূর্ববঙ্গ, বিহার, পাঞ্জাবেও এই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ১৯৪৭ এর ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। এ ঘোষণায় ভারত বিভাগের ইঙ্গিত থাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের সুবিধার্থে নিজ নিজ প্রস্তাব ও কর্মপন্থা রচনা করে। হিন্দু মহাসভা বাংলাকে বিভক্ত করে হিন্দু প্রধান অঞ্চল নিয়ে 'পশ্চিম বাংলা প্রদেশ' গঠন এবং একে ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে যুক্ত করার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও কলকাতার অনেক শিল্প-বনিক সংগঠন ও তাঁর আন্দোলনের সমর্থনে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসে। এই পরিস্থিতিতে বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সোরাবর্দী স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহন করেন।

প্রধানমন্ত্রী সোরাবর্দী বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের স্বপক্ষে সাওয়াল করেন। ১৯৪৭ এর ৮ এপ্রিল এক সাক্ষাতকারে সোরাবর্দী বলেন, "I have always held the view that Bengal cannot be partitioned. I am in favour of a united and greater Bengal."[১৩]। এছাড়া নোয়াখালী দাঙ্গার পর আতঙ্কিত হিন্দুদের আশ্বস্ত করতে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, " নোয়াখালী ছাড়া বাংলায় আরও বহু জেলা রয়েছে, যেখানে মুসলমানরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও উভয় সম্প্রদায় বহুকাল শান্তি ও পারস্পারিক সৌহার্দের মধ্যে বসবাস করে আসছে। বাংলা ভাগ হিন্দুদের জন্য আত্মহত্যার শামিল হবে।"[১৪] শরৎচন্দ্র বসু ভারত ও বাংলা ভাগের বিরোধিতা করে বলেন ভারতবর্ষ হবে কতগুলো সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক নিয়ে গঠিত ইউনিয়ন। তিনি লেখেন, " I picture my country as a union of socialist republics- an immense melting-pot in which the characters of all the races and nationalities comprised in it will be mixed and out of which a new worldism will arise which will recognize no frontiers, no races and no classes.[১৫] এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ এর ২০ মে শরৎ বসু ও সোরাবর্দী বাংলার হিন্দু-মুসলিম নেতৃত্বদের নিয়ে এক পরিকল্পনা করেন, যা 'বসু-সোরাবর্দী পরিকল্পনা' নামে বিখ্যাত।

কংগ্রেসের তরফ থেকে এ বিষয়ে কোন ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় শরৎচন্দ্র কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে ইস্তফা দেন। পরবর্তীতে কংগ্রেস নেতা কিরণশঙ্কর রায়ের প্রচেষ্টায় তিনি একটি সমঝোতায় আসেন। প্রাদেশিক লীগের সঙ্গে বসে তিনি ঠিক করলেন 'United and Sovereign Bengal' তৈরি করা হবে। বাঙালীদের সেই শেষ যুক্ত চেষ্টা, 'Sovereign Bengal' কল্পনা কতদূর গড়িয়েছিল তা গান্ধীজীর সেক্রেটারী পিয়ারীলাল গান্ধী- জীবনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। গান্ধীজী বলেছিলেন, "It seems that till last Sarat Bose could not get either Suhrawardy or Muslim League to agree to Gandhiji's stipulation that every act of the Government- including the decision about 'Sovereign Bengal' or its subsequent joining India or Pakistan – must carry with it the cooperation of the least two-thirds of the Hindu minority in the execution and in the legislature. What appeared in its place in the amended clauses (of the draft) was an overall two-thirds majority.[১৬] বসু-সোরাবর্দী প্রস্তাবে বলা হয়, বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে। নির্বাচনে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ও হিন্দু-মুসলিম সংখ্যা অনুপাতে আসন সংরক্ষণ করা হবে। বলা হয় বাংলা মুসলিমপ্রধান দেশ বলে মুখ্যমন্ত্রী পদটি থাকবে মুসলমানদের আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থাকবে হিন্দুদের হাতে। বাকি সব পদে হিন্দু-মুসলিম সমানাধিকার থাকবে। কিন্তু কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এই প্রস্তাবে রাজি ছিলনা।[১৭] সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই

পরিকল্পনাকে একটি ফাঁদ হিসেবে আখ্যায়িত করে হিন্দু ও কংগ্রেস নেতাদের এ ফাঁদে পা না দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে দেন।[১৮] তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, 'বাংলার অমুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে বাংলাকে অবশ্যই বিভক্ত করতে হবে'।[১৯] জওহরলাল নেহেরুও সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, "বিরাজমান অবস্থায় বাংলার স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ যা দাঁড়াবে তা হচ্ছে এখানে মুসলিম লীগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। এর অর্থ হবে কার্যত সমগ্র বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যদিও এর প্রবক্তারা তা বলছে না"।[২০]

অন্যদিকে মুসলিম লীগ ভারত ভাগের দাবী জানালে তার বিরধোধিতা করে কৃষক প্রজা পার্টির নেতারা বলেন " ... মুসলিম লীগ যদি ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে অস্বীকার করে তাহলে তারা এক বিকলাঙ্গ পাকিস্তান পাবে। এই বিকলাঙ্গ পাকিস্তানে মুসলমানদের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে আমরা ভয়ে কম্পমান হই"।[২১] কমিউনিস্ট পার্টিও ভারত ভাগের বিরোধিতা করে। তাদের মতে, "ভারত বিভাগ ও বঙ্গভঙ্গ ধ্বনি স্বাধীনতার ধ্বনি নয়, ইহা হতাশা, বিক্ষোভ ও মৃত্যুর আলিঙ্গন।"[২২] যাই হোক আশা-আকাঙ্খা সত্ত্বেও অখণ্ড বাংলা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পৃথক পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নিলে অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয়দের হাতে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে ১৯৪৭ এর ২৪ মার্চ লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে বড়লাট করে ভারতে পাঠানো হয়। বহু চেষ্টা করেও তিনি ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয় হন। অবশেষে ৩রা জুন মাউন্টব্যাটেন ঐতিহাসিক ভারতবিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। সেই সঙ্গে বাংলা ও পাঞ্জাবের বিষয়ে বলা হয় এই দুই প্রদেশের প্রতিনিধিরা আলাদাভাবে ভোটের মাধ্যমে ঠিক করবে যে তাঁরা তাঁদের প্রদেশ বিভক্ত করতে চায় কি না। যদি দেখা যায় ভোটাভুটিতে বেশিরভাগ প্রতিনিধি প্রদেশ ভাগ চাইছেন, তাহলে সেই প্রদেশ ভাগ করা হবে।[২৩]

এই ঘোষণার পরেই শরৎচন্দ্র বসু লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের প্রস্তাবটি মেনে না নিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কংগ্রেস ৩ জুনের এই প্রস্তাব মেনে নেয়। প্রথমে বিরোধিতা করলেও শেষপর্যন্ত ৭ জুন গান্ধীজী এই প্রস্তাব মেনে নেন। একমাত্র মওলানা আবুল কালাম আজাদ অখণ্ড ভারতের দাবিতে অটল থাকেন। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতারা বাংলাকে স্বাধীনতা দিতে রাজি ছিলেন না। গান্ধীজীর উপস্থিতিতেই তাঁরা এই নিয়ে আলোচনা ও তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন।[২৪] অন্যদিকে সম্পূর্ণ বাংলা ও সম্পূর্ণ পাঞ্জাব পাকিস্তান প্রস্তাবে না থাকায় মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব প্রথমে মেনে নেয়নি। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন জিন্নাকে 'অখণ্ড ভারত' অথবা খণ্ডিত পাঞ্জাব ও বাংলা নিয়ে পাকিস্তান এর যেকোনো একটি বেছে নিতে বলেন। শেষপর্যন্ত ৯ জুন নিরুপায় হয়ে জিন্না ক্ষুদ্র পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হন।

আবার জমিদারী ব্যবস্থায় ব্রিটিশ সরকার ও বঙ্গীয় মন্ত্রীসভার বিভিন্ন সংস্কারের ফলে বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। এরজন্য অনেকেই তাঁরা রাজনীতির মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই প্রস্তাবিত বাংলাভাগে তাঁরা আশ্বস্ত হয়েছিল যে, তাঁরা তাঁদের হৃতগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং সমগ্র বাংলাজুড়ে মূলত হিন্দু শাসন থাকবে। তার ফলে মুসলিম প্রধান এলাকায় এই সিদ্ধান্তের মারাত্মক ফল দেখা দেয়।[২৫] বাংলাভাগের সিদ্ধান্তের পিছনে অর্থনৈতিক সুবিধার কথাও ভাবা হয়েছিল। কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালী-অবাঙালী ব্যবসায়ী যেমন-বিড়লা, গোয়েঙ্কা গোষ্ঠী বাংলা ভাগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এঁদের সঙ্গে নলিনীরঞ্জন সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন বাংলা ভাগের ক্ষেত্রে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতেও এঁরা ছিলেন, যেখানে বাংলাভাগের সিদ্ধান্তে শিলমোহর পড়ে।[২৬] এছাড়া জমিদার, কর্মচারী, কেরানী, শ্রমিক, আদিবাসী সমাজ, বঙ্গীয় সদগোপ সভা, বঙ্গীয় মাহিষ্য সমতি, তপশিলি হিন্দু সম্প্রদায় প্রভৃতি শ্রেণির মতামতও বাংলাভাগের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায় স্বাধীনতার পূর্বে এক দশকের (১৯৩৭-১৯৪৭) বাংলার অস্থির রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ, দুর্বল অর্থনৈতিক কাঠামো, সঙ্গে জাতীয় নেতাদের সংকীর্ন স্বার্থ বাংলা তথা দেশভাগকে অনিবার্য করে তুলেছিল। তাই ভারতীয় ইতিহাস রচনা ও আলোচনায় এই দশকের গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্যসূত্র :

১। Sarkar, Sumit Modern India, Macmillan India Ltd. New Delhi, 2005, p. 338.

২। মল্লিক, সমরকুমার আধুনিক ভারতের রুপান্তর, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ২০২১, পৃ. ৫৭১।

৩। তদেব, পৃ. ৫৭১।

৪। মণ্ডল, শচীন্দ্রনাথ আধুনিক ভারত ও বিশ্বের ইতিহাস, ক্যালকাটা বুক হাউস, কোলকাতা, পৃ. ৪৬ পাদটীকা।

৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর পলাশি থেকে পার্টিশন ও তারপর, অনুবাদ কৃষ্ণেন্দু রায়, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৩৮৫।

৬। চ্যাটার্জী, জয়া বাঙলা ভাগ হলঃ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭, অনুবাদ জাফর আবু, কোলকাতা, ১৯৯৯ পৃ. ১২৪।

৭। চৌধুরী, তেসলিম ভারতের ইতিহাসঃ আধুনিক যুগ, ১৭০৭-১৯৬৪, মিত্রম, কোলকাতা, ২০১১, পৃ. ৬৫৬।

৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২২।

৯। ইসলাম, সিরাজুল সম্পাঃ বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, মিত্র ও ঘোষ, কোলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২৫২।
১০। তদেব, পৃ. ২৫৪।
১১। তদেব, পৃ. ২৫৪।
১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৩।
১৩। দে, অমলেন্দু স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনাঃ প্রয়াস ও পরিণতি, কোলকাতা, ৯ মে, ১৯৭৫, পৃ. ৭।
১৪। ইসলাম, সিরাজুল সম্পাঃ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮১।
১৫। দে, অমলেন্দু পূর্বোক্ত, পৃ. ২২।
১৬। বিশ্বাস, কালিপদ যুক্ত বাঙলার শেষ অধ্যায়, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কোলকাতা, ১৫ আগস্ট, ১৯৬৬, পৃ. ৪০২।
১৭। Chatterji, Joya Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition 1932-1947, Cambridge, 1994, P, 298.
১৮ । ইসলাম, সিরাজুল সম্পাঃ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৩।
১৯। তদেব, পৃ. ৩৯৩।
২০। তদেব, পৃ. ৩৯৩।
২১। দে, অমলেন্দু পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯।
২২। তদেব, পৃ. ৮২।
২৩। তদেব, পৃ. ৮৯।
২৪। তদেব, পৃঃ ৯০।
২৫। Chatterji, Joya op.cit., P. 288-289.
২৬। The Statesman, 1 May, 1947.

বাংলা ছোটগল্প : সূচনা পর্বের শিল্পরূপ

অলোক নস্কর
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারাংশ : বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের শিল্পরূপের সূচনা হয়, উনিশ শতকের শেষের দিকে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার হাত ধরে। তাই অনেক সমালোচক বলেছেন-'ছোটগল্প যুগ যন্ত্রণার ফসল।'যা ছোটগল্প শিল্পরূপ কে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে।পরবর্তী শতক গুলিতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ এর মতো শিল্পরূপ থেকে ভিন্নতা বজায় রেখে আরও বিকশিত হয়ে চলেছে।এবং কালের দাবি মেনে তার বিবর্তন হয়েছে নবীন ছোটগল্পকারদের ছোটগল্প রচনার মধ্যদিয়ে,বাংলা সাহিত্যে ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ প্রথম ‘ছোটগল্প’ শব্দটি ব্যবহার করেন।এবং সার্থক ছোটগল্প রচনা তাঁর হাতে সূচিত হয়েছিল।পল্লী প্রকৃতি নদ-নদী,সবুজ বনানী মধ্যে মানব জীবনের সুখ-দুঃখ,হাসি-কান্নার মিলনে বাংলা ছোটগল্পের সূচনা পর্বের যাত্রা শুরু হয়।

সূচক শব্দ : বাংলা ছোটগল্প, শিল্পরূপ, বৈশিষ্ট্য, পার্থক্য, মধুমতী, গল্প লেখিকা, দেশজ গল্পরীতি, নবীন ছোটগল্পকার, বিবর্তন, ক্রমবিকাশ।

মূল আলোচনা : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পরূপ হলো ‘কথাসাহিত্য’। এই কথাসাহিত্যের মধ্যে ‘উপন্যাস’ ও ’ছোটগল্প’ দুটি কে একত্রে ‘কথাসাহিত্য’ রূপে ধরা হয়।তাই ‘উপন্যাস’ ও ‘ছোটগল্প’ দুটি আবার আলাদা আলাদা শিল্পরূপ। তুলনামূলক ভাবে ‘উপন্যাস’ (Novel) শিল্পরূপ ছোটগল্পের পূর্ববর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেছে। ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) ’বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে “দুর্গেশনন্দিনী” প্রকাশের মধ্যদিয়ে বাংলা উপন্যাসের ধারা সূচনা হয়।যা বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় ঘটনা, এবং সেই কারণে সমালোচকগন বঙ্কিমচন্দ্র কে বাংলা সাহিত্যের ‘সাহিত্যসম্রাট’ নামে আখ্যায়িত করেছেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে (১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ) বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদক রূপে বাঙালির হৃদয় জয় করেন।

কথাসাহিত্যের মধ্যে ‘রূপকথা,উপাখ্যান,নীতিগল্প,রোমান্স’প্রভৃতি শিল্পরূপ গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে।উপন্যাস ও ছোটগল্প আধুনিক কালের কিন্তু উপন্যাসের থেকে ছোটগল্প আরও আধুনিকতম বাংলা সাহিত্য শিল্পরূপ।উনিশ শতকের শেষের দিকে বাংলা ছোটগল্পের জন্ম।সুতরাং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শিল্পরূপের থেকে পার্থক্য তো সহজে ফুটে উঠে।তবুও ‘চরিত্র’গত ভাবে দেখলে কিছু মিল পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতম শিল্পরূপ ‘ছোটগল্প’এটি একটি জনপ্রিয় ও সর্বকনিষ্ঠ শিল্পরূপ,উনিশ শতকের দিক থেকে বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্র বিকশিত হতে

থাকে,এর পূর্বে পাশ্চাত্য সাহিত্যে ‘short story' নামে পরিচিত হয়।বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে যদিও ছোটগল্পের নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞায় আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তবুও অনেক সমালোচনার মধ্যদিয়ে এইচ.জি.ওয়েলস্ ছোটগল্পের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন-

“A short story is,or should be,a simple thing;it aims at producing one single vivid effect;it has to seize the attention at the onset,and never releasing,gather it together more and more until the climax is reached.The limits of human capacity to attend closely therefore set a limit to it;it must exploed and finish before interruption occurs or fatigue sets in.”[১]

এই সংজ্ঞায় ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য গুলো ধরা পড়েছে।একটি মাত্র রসবোধ মুহূর্ত,জীবনমুখীতা উঠে আসে,গল্পের একমুখিতার মধ্যদিয়ে চরম পরিনতি লক্ষ্য করা যায়,এবং জীবনের খন্ড চিত্র প্রকাশ পায় ছোটগল্পে,এই সবের মাধ্যমে লেখক নিজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেন।পরবর্তী পাশ্চাত্যের পথ ঘুরে বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় বাংলা ছোটগল্প সৃষ্টির পর্ব সূচিত হয়।

বাংলা ছোটগল্প কালগত ভাবে আধুনিক সৃষ্টি,ফলত ছোটগল্পের বিশেষ রস সৃষ্টি পাঠকে আকর্ষণ করে,যেখানে কাহিনী,আখ্যান,চরিত্র মিলে একটি অখণ্ড কাহিনীর সৃষ্টি করে অল্পস্বল্প পরিসরের মধ্যে,যা বাংলা সাহিত্যের ‘ছোটগল্প’এর শিল্পরূপ সৃষ্টি হয়।

প্রখ্যাত সমালোচক ‘শিশিরকুমার দাশ' মহাশয় তাঁর ‘বাংলা ছোটগল্প’ বইটিতে ছোটগল্প সৃষ্টির পূর্ববর্তী সময়ের যে প্রস্তুতি পর্ব গুলি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন।তিনি এই পর্ব গুলো চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। ১) চূর্ণক ২) আখ্যানক ৩) নক্সা ৪) নভেলা বলে উল্লেখ করেছেন।

তিনি আরও বলেছেন-

“রবীন্দ্রনাথ বা আধুনিক কোনো ছোটগল্পকারের দিকে তাকিয়ে অনেকের মনে হতে পারে এর সঙ্গে চূর্ণক,আখ্যানক,নক্সা ইত্যাদির যোগ কোথায়।মনে রাখতে হবে এ যোগ ছোটগল্পের morphology'র-বিবর্তনের ধারায় এরা এক-একটি ধাপ।কিন্তু প্রাণের তফাৎ আছে বলেই ছোটগল্প একটি বিশেষ রূপ। এইখান থেকেই ছোটগল্পের বহিরঙ্গ প্রভৃতি জানা যায় -ছোটগল্পে চরিত্রসংখ্যা কম:একটি :ঘটনা ও কম,একটি বা দুটি এবং সবশেষে একট চরিত্র,বা একটি ঘটনা বা একটি ভাবের প্রাধান্য।এখানেই তার যোগ গীতিকবিতার সঙ্গে,বা তার চেয়েও বেশি যোগ একাঙ্কিকা নাটিকার।”[২]

‘চূর্ণক' গল্পের উদাহরণ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ‘চোখ গেল' যেসব গল্পের একটি করে স্তর থাকে তাকে চূর্ণক গল্প বলে।তেমনি ‘আখ্যানক’ গল্প হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সুভা’’শুভদৃষ্টি’ যে সমস্ত গল্প গুলি কয়েকটি স্তরে বিভক্ত থাকে তাকে

আখ্যানক গল্প বলা যেতে পারে।'নক্সা' জাতীয় গল্প একটি বিশেষ চরিত্র কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে,তাকে কেন্দ্র করে গল্পের সমাপ্তি হয় তাকে নক্সা শ্রেণির গল্প বলা হয়, নক্সা রচনার স্বরূপ ধরা পড়ে বনফুলের 'শ্রীপতি সামন্ত' 'হৃদয়েশ্বর মুখুর্জ্জে' এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঠাকুরদা'অধ্যাপক'ছোটগল্প গুলি একটি চরিত্র কেন্দ্রিক তাই নক্সা গল্প বলা যেতে পারে।'নভেলা' গল্পের উদাহরণ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের'বিন্দুর ছেলে' 'রামের সুমতি''কাশীনাথ' এবং 'ছবি' ছোটগল্প গুলো,কারণ নভেলা আসলে উপন্যাসের সমরূপ,যেখানে ছোটগল্পের মধ্যে উপন্যাসের গুণাগুণ বর্তমান ফলত ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এই জাতীয় রচনা গল্পের ক্ষতি ও করে,নভেলার প্রভাব ছোটগল্পের প্রায়ই দেখা যায়।কিন্তু এই রচনা গুলো ছোটগল্প হিসাবে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এবং এগুলো ছোটগল্প হিসাবে রচনা করা হয়।কাহিনী,চরিত্র ও আখ্যানের বিস্তারের ফলে নভেলার স্বরূপ ধরা পড়েছে এই ছোটগল্প গুলোতে।

একটা সময় পত্র-পত্রিকায় 'চূর্ণক' গল্প প্রকাশিত হত।টুকরো টুকরো কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে দুটি একটি চরিত্র নিয়ে,যাহাকে সমালোচক চূর্ণক বলেছেন,সেই সমস্ত গল্প গুলিতে একটি ঘটনা,অল্প কথা দিয়ে বর্ণনা,উল্কাপাতের মতো জ্বলে আবার নিভে যায়।প্রকাশিত 'চূর্ণক' পড়লে বুঝতে পারা যায় সমকালীন সমাজের অবস্থান ধরা পড়ত।

ছোটগল্প থেকে উপন্যাসের শিল্পরূপ ভিন্নতা হলেও,উপাদানগত মিল রয়েছে যেমন সাহিত্যে উপন্যাসের শিল্পরূপে কাহিনী,চরিত্র,প্লট,বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।যা ছোটগল্পে সংক্ষিপ্ত রূপে দেখা যায়।আবার উপন্যাসের কাহিনীতে এক বা একাধিক উপকাহিনী থাকে তাদের ও বিস্তার দেখানো হয়,সেখানে ছোটগল্পে উপকাহিনী স্থান দেওয়া হয় না,কারণ ছোটগল্পের গুণাগুণের পক্ষে ক্ষতি করে।উপন্যাসে খন্ড খন্ড চিত্র দিয়ে একটি অখণ্ড কাহিনী তুলে ধরেন লেখক,কিন্তু ছোটগল্পে খন্ড কাহিনী থাকে,একটি ঘটনা।উপন্যাসের সাধারণ লক্ষন বহুমুখিনতাই।কিন্তু ছোটগল্পের একমুখিতা লক্ষ্য করা যায়।উপন্যাসে বহু চরিত্রের বিকাশ,অনেক ঘটনার সজ্জায় উপকাহিনীর বিন্যাসের মধ্যদিয়ে একটি বিস্তারিত সময়কালের চিত্র রূপ ধরা পরে।সেখানে ছোটগল্পে সল্প বিস্তার, একটি কাহিনী,অল্প চরিত্র,একক প্লট ও একমুখিতার মধ্যদিয়ে ছোটো সময়ের একটি চিত্র রূপ তুলে ধরে ছোটগল্পে,যাকে এককথায় 'বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন' বলা যেতে পারে।

কবিগুরু 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষাযাপন' কবিতাটির মধ্যে 'ছোটগল্প'এর রূপ-রীতি'র ও বৈশিষ্ট্যগত ভাবনার সুন্দর প্রকাশ করেছেন।

"ছোট প্রাণ,ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখকথা
নিতান্তই সহজসরল;
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি

তারি দু-চারটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ননার ছটা,   ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি র'বে   সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।”[৩]

(সোনার তরী/বর্ষাযাপন, ১৭ই জৈষ্ঠ্য ১২৯৯)

কবিতাটির মধ্যে ‘ছোটগল্প’এর সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন কবি,ছোটগল্প বৈশিষ্ট্য গুলো ধরা পড়েছে,ছোটগল্পের মধ্যে যে নাটকীয় ঘটনা ও গীতিকবিতার আবেশ থাকে এবং সমাপ্তি হলেও হৃদয়ে আরও একটু বেশি পাবার আশার ভাব জাগবে,আরও একটু জানিতে পারলে ভালো হত।

বাংলা ছোটগল্পের জন্ম ও বিকাশ মূলে রয়েছে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা গুলোর বিশেষ ভূমিকা,উনিশ শতকে সাধনা, হিতবাদী, সবুজপত্র, নবজীবন, সাহিত্য, ভারতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, পূর্বাশা, ইত্যাদি পত্রিকায় ছোটগল্প রচনা ও প্রকাশের প্রতি জোর দিয়েছিল,কারণ উনিশ শতকের প্রথম দিকে উপন্যাস রচনার ধারা লক্ষ্য করা যায়,অনেক উপন্যাস আকার ছোট আকারের ছিল,পরবর্তী সময়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ‘ছোটগল্প’ রচনার তাগিদ চরম পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায়।সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লেখালেখি দেখা যায়, সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, জীবন সংগ্রাম ও বিপন্ন জীবন ও বিভিন্ন ধরনের চরিত্র উঠে আসতে থাকে ছোটগল্পে এবং বাস্তব জীবনের ছবি উঠে আসে।যা মানুষের মনের পরিবর্তনে প্রভাব ফেলে,যেখানে ছোট কাহিনীর প্রতি পাঠক কুলের টান লক্ষ্য করা যায়। সল্প পরিসরের মধ্যে ছোটগল্পের প্রকাশ করা হয়।

তাই সমালোচক ‘শ্রীভূদেব চৌধুরী’ মহাশয় তাঁর ‘বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' গ্রন্থে জানিয়েছেন-

“বাংলা ভাষায় সাহিত্য-সাময়িক হিসেবে “বঙ্গদর্শন” কেবল নূতন যুগের পথিকৃৎ-ই নয় ; নবজীবনের ধারাবাহকও।১২৭৯ বাংলা সালের প্রথমাবধি “বঙ্গদর্শনে”র প্রকাশ বাঙালির রস-বাসনা ও জ্ঞান-পিপাসার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্যের সূচনা করেছিল। বস্তুত “ভারতী”,সাধনা”,”হিতবাদী”,”নবজীবন”,”সাহিত্য” ইত্যাদি উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পত্রিকার অজস্র প্রবাহ “বঙ্গদর্শনে”র জীবন-প্রেরণারই উৎসজাত। তাছাড়া,শুধু সেকালের নয়,একালের সাহিত্য-পত্রিকাবলিও অনেকাংশে “বঙ্গদর্শনে”র ভাব ও আঙ্গিকগত আদর্শ আজ পর্যন্ত অনুসরণ করে চলেছে।ছোট আকৃতির গল্প রচনা,তথা ছোটগল্প লেখার প্রয়োজন-প্রেরণা প্রথমে জুগিয়েছে এই “বঙ্গদর্শন”ই।”[৪]

এভাবেই ছোটগল্প রচনার যাত্রাপথের সূচনা হয়,উপন্যাস হলেও আকারে ছোট কাহিনী,চরিত্র কম,প্লট ছোটখাটো,যা ‘বঙ্গদর্শনে’’বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘ইন্দিরা’ রচনা থেকে লক্ষ্য করা যায়।পরবর্তী সময়ে ‘যুগলাঙ্গুরীয়” উপন্যাস ও প্রকাশ করেন কিন্তু আকারে ছোট ছিল।এই ছোটগল্প রচনার বাইরের প্রেরণা অবশ্যই সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রভাবই ছিল।

পরবর্তী কালে “বঙ্গদর্শন”এ (১২৮০) সালে জৈষ্ঠ্যমাসের সংখ্যায় “মধুমতী” নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়।গল্পটির রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রের সহোদর ‘পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’।যদিও এটি উপন্যাস হিসেবে প্রকাশিত করা হয়েছিল।কিন্তু আকৃতি ছিল সল্প পরিসরের, কাহিনী, চরিত্র, প্লট এই তিনের সমন্বয় ছিল, ছোটগল্পের, তাই সমালোচকগণ বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ছোটগল্প বলেছেন।‘মধুমতী’গল্পে মধুমতী জীবন কাহিনী এবং লেখকের লেখেনি শক্তির মধ্যদিয়ে যথাযথ ছোটগল্প হয়ে উঠেছে।বঙ্গদর্শনের পাতায় মধুমতীর জীবনের সমস্যা ও শেষে সমাধান কিভাবে হয়েছে লেখক সেই কথায় তুলে ধরেছেন। গঠনগত ও আকৃতিগত দিক দিয়ে ‘মধুমতী’ ছোটগল্পের মতন,জীবনের সমস্যা গল্পের একমুখিতা,অল্প পরিসরের মধ্যে ঘটনার বিস্তার এবং সমকালীন জীবনের কথা,সমাজ,ভালোবাসা,স্মৃতি,ফিরে যাওয়া,মৃত্যু সহানুভূতি ভালোবাসার জন্য,এই জীবন দর্শন প্রদর্শন দেখা যায়, আর ‘মধুমতী’ হয়েছে ছোটগল্পের বৃহৎ গাছের অঙ্কুরিত প্রথম বীজ,যা অন্যান্য গল্পকার আরও সমৃদ্ধ করে দিয়ে গিয়েছেন।

এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯) বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা।‘ভ্রমর' পত্রিকায় ১২৮১ বঙ্গাব্দে প্রথম দুই সংখ্যায় ‘রামেশ্বরের অদৃষ্ট’ ও ‘দামিনী নামে গল্প প্রকাশ করেন।সেই সময়ের ছোটগল্পের সূচনা পর্বে ছোটগল্পের রচনার গতি বৃদ্ধিতে সহায় হয়েছিল।রামেশ্বরের অদৃষ্ট একটি দুঃখপীড়িত মানুষের জীবন কাহিনী।আর দামিনী গল্পে দামিনীর জীবন বর্ননায় লেখকের বিশেষ প্রতিভা ফুটে উঠেছে।এভাবেই ছোটগল্প রচনার পথ আগিয়েছে।

রবীন্দ্র পূর্ববর্তী গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯) তিনি বাংলা সাহিত্যে একজন শক্তিধর লেখক,তাঁর রচনার মধ্যে দেশজ গল্প বলার ধারাকে তুলে ধরেছেন।মানুষ, ভূত প্রেত,কুসংস্কার ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস,উদ্ভট সৃষ্টির জগৎ, যেখানে রূপকথার আমেজ থাকে যা সৃষ্টি করেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় আপন অনুভূতি দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তি ভাবে তাঁর সৃষ্টির নিজস্বতা তুলে ধরেছেন। ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, হাসি, তামাশার ভিতর দিয়ে তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন,নারী চরিত্রে নিজস্বতা প্রকাশ করেছেন।ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা গল্পের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন গ্রাম্যতা,গ্রাম বাংলার জীবন যাত্রা,ছোট শিশুদের গল্প শোনার ইচ্ছে ও ঠাকুরমার মুখের গল্প,রাতের অন্ধকার থেকে ফুট উঠে জীবনের লড়াই এর কাল্পনিক চিত্র প্রকাশিত হয়।

এছাড়া ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম ও প্রধান সৃষ্টি ‘কঙ্কাবতী’(১৮৯২) রূপকথার জগৎ থেকে কঙ্কাবতী বাস্তবের মাটি ফিরে আসে,সেই কাহিনী বর্নিত হয়েছে কঙ্কাবতী’তে।

পরবর্তী সময়ে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সে সব গল্প রচনা করেছেন,সে গুলো হলো ‘ভূত ও মানুষ’ (১৮৯৭), ‘মুক্তামালা’ (১৯০১), ‘মজার গল্প’ (১৯০৪), ‘ডমরুচরিত’ (১৯২৩:মৃত্যুর পর প্রকাশিত)। প্রভৃতি গল্প সংকলনের মধ্যে মোট ত্রিশ টি গল্প আছে,যার মধ্যে সমকালীন সমাজ জীবনের সময়কে তুলে ধরেছেন,হাস্য কৌতুক,ভূত প্রেত কে সামনে রেখে আড়ালে বাস্তব চিত্র প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন।তাঁর সৃষ্ট ‘নয়নচাঁদ’ ও ‘ডমরু ধর' চরিত্র বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যের অন্যতম চরিত্রের যারা হাসি ব্যঙ্গ,তামাশার দিয়ে মানুষের আসল স্বরূপ তুলে ধরেছেন।সামনের মানুষ আর আড়ালের মানুষের মধ্যে পার্থক্য সেটা দেখিয়েছেন।মানুষের অন্তর মন কে দর্পনের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় যথাযথ ছোটগল্প সৃষ্টি না করতে পারলেও তাঁর লেখার প্রতি বাংলাদেশের পাঠক কে আকর্ষণ করেছিল,যে দেশজ গল্পধারা রবীন্দ্র পূর্ববর্তী সময়ের প্রচলিত ছিল তাঁর ধারক ও অগ্রগতি দাতা,কৌতুক রসের মধ্যদিয়ে সমকালের চিত্র তুলে ধরেছেন।রূপকথার গল্পধারা বাংলা সাহিত্যে যে নিজস্ব মৌলিকতা নিয়ে এসেছেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় স্বরচিত ছোটগল্পে।

স্বর্ণকুমারী দেবী(১৮৫৫-১৯৩২)রবীন্দ্র পরবর্তী গল্পকার ও ‘ভারতী’ পত্রিকার সম্পাদিকা রূপে প্রতিষ্ঠা পান,তিনি প্রথম ‘গল্প’ ‘ক্ষুদ্রগল্প’ ‘ক্ষুদ্রকথা’ নামে পত্রিকায় গল্প রচনা করেছিলেন।তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ ন-দিদি।স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘নবকাহিনী’ তাঁর গল্প সংকলন,যেখানে তিনি অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে গল্প রচনা করেছেন।যেমন,‘কুমার ভীমসিংহ' ‘ক্ষত্রিয় রমনী' ‘অশ্ব ও তরবারী’ ইত্যাদি এই গল্প গুলো যথাযথ ছোটগল্প হয়ে উঠেনি,কারণ এই গল্পে ছোটগল্পের একমুখিতা লক্ষ্য করা যায়নি।তবে তিনি অনেক উল্লেখযোগ্য গল্প রচনা করেন সে গুলি হলো,‘গহনা, ‘নতুনবালা’ ‘পেন প্রীতি’ চাবি চুরি’ ‘মিউটিনি’ ও ‘অমরগুচ্ছ’ ইত্যাদি যাহাতে স্বর্ণকুমারী দেবী নিজস্বতার ছাপ রেখেছেন,সমাজ,সংস্কার,সংসার,সংস্কৃতি রক্ষা করতে হবে,এবং তাঁর সৃষ্ট চরিত্র বিশেষ করে নারী চরিত্র গুলি উল্লেখযোগ্য।তিনি আরও অনেক ছোটগল্প রচনা করেছেন,যেখানে কাহিনীর সুন্দর বর্ণনা করেছেন,ঐতিহাসিক ঘটনা,চরিত্র, প্লট,দ্বন্দ্ব ও বিকাশের মধ্যদিয়ে তা নাটকীয়তাপূর্ণ করে তুলেছেন,নারীর জীবন কথা স্বর্ণকুমারী দেবী সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন ছোটগল্পে।

বাংলা ছোটগল্পের সূচনা পর্বে ‘নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত’(১৮৬১-১৯৪১) অবদান রয়েছে বিশেষ,তাঁর রচনার মধ্যে বাংলা ছোটগল্পের গতি প্রকৃতি আগিয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্র

সমসাময়িক সময়ের হলেও তিনি ছোটগল্প রচনায় আগিয়ে ছিলেন।তিনি 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় (১২৯৪-১২৯৬) বঙ্গাব্দের মধ্যে ছয়টি ছোটগল্প রচনা করেছিলেন। সেগুলি হল-'চুরি না বাহাদুরি' (১২৯৪, বৈশাখ), 'দুইবার' (১২৯৬, বৈশাখ), 'বধিরের বাসনা' ও 'ঘরের অলক্ষ্মী' (১২৯৬, আষাঢ়), 'ভৈরবী' (১২৯৬, শ্রাবণ), 'চিরকুমারী' (১২৯৬, ভাদ্র) এই গল্পগুলিতে প্রেম, রোমাঞ্চ, দুঃখ, ভালোবাসা ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপট রয়েছে। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নিজস্ব ভাবনা, চিন্তার গুলি এই সব ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে পাঠকের মনের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। সহজ, সরল ভাষায়। এছাড়াও তিনি আরও অনেক ছোটগল্প রচনা করেছেন-'ব্রাহ্মণবাদ', 'টিকিয়াশাহ', 'নতুন বাড়ি', 'কাহার ভ্রম', 'মেহেরজান', 'ফাতিমা', 'বিক্রমসিংহ' এবং 'লক্ষহীরা' ইত্যাদি ছোটগল্পে গ্রাম বাংলার মানব চরিত্র, ঐতিহাসিক চরিত্র, পৌরাণিক চরিত্র ও কাহিনী, সামাজিক প্রথা, সংস্কার, রোমান্স কে কাহিনীর মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই সময়ে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই গল্প গুলির মাধ্যমে নিজের প্রতিভার জোরে পাঠক মহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

বাংলা ছোটগল্প সূচনাপর্বের সম্পূর্ণতা লাভ করেছে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'এর হাতে,তিনি প্রথম "ছোটগল্প" শব্দটি ব্যবহার করেন।১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যায়,'ভারতী পত্রিকায়' 'ভিখারিনী' গল্প প্রকাশের মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটগল্প রচনার সূচনা করেন। পরবর্তীতে বাংলা ছোটগল্পের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করেন। 'ভারতী', 'হিতবাদী', 'সাধনা', 'প্রদীপ', 'প্রবাসী', 'সবুজপত্র' পত্রিকায় তাঁর ছোটগল্প প্রকাশিত হতে থাকে। 'ছোটগল্প' রচনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে কি আগ্রহ ও ভালোবাসা ছিল তা বুঝতে পারা যায় তাঁর 'ছিন্নপত্রাবলী' পড়লে,সেখানে তিনি বারে বারে প্রকাশ করেছেন তাঁর মনের ভাবনা-চিন্তা গুলো,ছোটগল্পের প্রকৃতি, প্লট,চরিত্র'এর কথাও তুলে ধরেছেন।পল্লী বাংলার রূপ,রস,গন্ধ তিনি নিজস্ব অভিজ্ঞতায় রচনা করেছেন। তিনি নিজে যেমন,নদ-নদী,পদ্মা,সাজাদপুর,পতিসর,শিলাইদহের রূপ দেখেছেন।তেমনি তাঁর ভাবনা,চিন্তা, জীবনদর্শন ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা তুলে ধরেছেন ছোটগল্পের মধ্যে- 'পোস্টমাস্টার', 'একরাত্রি', 'ছুটি', 'সুভা', 'সমাপ্তি', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'দৃষ্টিদান', 'শুভদৃষ্টি', 'নষ্টনীড়', 'স্ত্রীপত্র', 'ল্যাবরেটরি', 'রবিবার'এর মতো ছোটগল্প রচনা করেছেন।পল্লী প্রকৃতি ও চরিত্র মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে আর মানুষের মনের কথা সজীবতা সঙ্গে প্রকাশ করেছেন।রবীন্দ্র ছোটগল্পে বৈচিত্র্য দেখা যায়, 'নিশীথে','ক্ষুধিত পাষাণ','মনিহারা','কঙ্কাল' গল্পে ভৌতিক আবহাওয়া দেখা যায়। 'কাবুলিওয়ালা', 'দুরাশা', 'মুসলমানীর গল্প' গল্প গুলিতে ধর্মীয় সম্প্রীতির সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। 'সুভা' ,'ছুটি', 'সমাপ্তি' গল্পের মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে মানব চরিত্রের গভীর টানের কথা ধরা পড়েছে,তা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে করুন পরিনতি হয়েছে সুভা,ফটিক,মৃন্ময়ী চরিত্রের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মধ্যে 'গীতিকবিতার'সুর

লক্ষ্য করা যায়। তিনি কবিগুরু তাঁর মুক্তির পরিসর এই কাব্যিকগতির মধ্যে দিয়ে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।নারী,শিশু চরিত্র গুলি রবীন্দ্র ছোটগল্পের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে,'রতন, মৃণালিনী, চন্দরা, সুভা, কুমুদিনী, গিরিবালা'র মতো চরিত্র নিজগুণে উজ্জ্বল হয়ে আছে।রবীন্দ্র ছোটগল্পে পল্লী প্রকৃতি মধ্যে স্বাভাবিক বেড়ে উঠে,তাদের সুখ-দুঃখ,মান-অভিমান নিয়ে গ্রাম বাংলা নদী তাদের আপন মিলনস্থল।ভাবে ভাষায়, সহজ, সরল হৃদয়ের স্পন্দনের কথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ছোটগল্পে মধ্যে ধরে দিয়েছেন যা আগামীর পথে আরও বিকশিত হয়েছে।

রবীন্দ্র সমসাময়িক লেখকগনের মধ্যে 'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের' 'আদরিনী','দেবী', 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের', 'অভাগীর স্বর্গ','আঁধারে আলো'র মতো গল্প গুলি ছোটগল্পের জগতে উল্লেখ যোগ্য।পরবর্তীতে চল্লিশ,পঞ্চাশ ও তৎপরবর্তীকালের নবীন ছোটগল্পকাররা 'কল্লোল,কালিকলম,পরিচয়, পূর্বাশা, দেশ,আনন্দবাজার' পত্র-পত্রিকায় নিজস্ব নতুন ভাবনা,চিন্তার ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ করেছেন সৃজনে ও মননে ছোটগল্পের পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন সমসাময়িক সমাজ,ধর্ম,সংস্কার, রাজনীতি,যুগের যন্ত্রণা, হিংসা, দ্বেষ, প্রেম,ভালোবাসার মধ্যে প্রকৃতি ও নারীবাদী চিন্তা ভাবনার,নতুন আদর্শ ও দার্শনিক জগতের কথার মধ্যে মানব মনের চেতনা প্রবাহ কে তুলে ধরেছেন। 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের', 'পুঁইমাচা', 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের', 'অগ্রদাণী', 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'বনফুলের', 'নীমগাছ', 'শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের', 'কয়লাকুঠি', 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের', 'পুন্নাম', 'সুবোধ ঘোষের', 'সুন্দরম্'এর মতো ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ভান্ডার ভরিয়ে দিয়েছে এবং আরও আগিয়ে দিয়েছে পরবর্তী নতুন ছোটগল্পকারদের জন্য।

তথ্যসূত্র:

১. অরুনকুমার মুখোপাধ্যায়,কালের পুত্তলিকা, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১১, পৃ.৭

২. শিশিরকুমার দাশ,বাংলা ছোটগল্প, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, আগস্ট ২০১২, পৃ.৯

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোনার তরী, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ২০০০, পৃ.৩৬

৪. শ্রীভূদেব চৌধুরী,বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার,মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা,পঞ্চম প্রকাশ(নতুন সংস্করণ),২০০৩,পৃ.৪৮

সহায়ক গ্রন্থ :

১. সুকুমার সেন,বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আনন্দ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৬
২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০১০-২০১১
৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,কলকাতা, প্রথম মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, আশ্বিন ১৪২৮

অহিংসা : টলস্টয়, গান্ধি ও রবীন্দ্রনাথ - উত্তরণের পারস্পরিকতা

অজয় কুমার দাস
অধ্যাপক, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়
চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্বমেদিনীপুর

।। এক ।।

"কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।।"(১)

যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করেন, তিনি শাস্ত্র বিহিত কর্ম করেই বাঁচতে চাইবেন। এছাড়া কোন উপায় নেই। এই সংসারে তখন ব্যক্তিকে অশুভ কর্মে লিপ্ত হতে হবে না। যথাযথ কর্তব্য কর্ম করেই মানুষ সাংসারিক আসক্তির উর্দ্ধে উঠতে পারেন। হিংসা অশুভ কর্ম। হিংসা উন্নত জীবনের পরিপন্থী। হিংসা অশুভ কর্ম থেকে মানুষকে রক্ষা করে না। লাভ-লোভ-কামনা-বাসনার সঙ্গে হিংসা সম্পৃক্ত।

অহিংসা অর্থাৎ হিংসা থেকে দূরে থাকা। ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক। অহিংসার জন্মভূমিও এই দেশ। অহিংসাকে লালিত, পরিশীলিত করে প্রবর্ধমান লাবণ্যে ভরপুর করেছে এই দেশের মাটি। অহিংসা একটি বহুমাত্রিক উপলব্ধি। জীবের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের প্রকাশ। আধ্যাত্মিক শক্তির পূর্ণ বিকশিত রূপ মানুষের মধ্যেই প্রতিভাত হয়। সুতরাং অন্য সত্তাকে আঘাত করা হলে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই আঘাত করা হয়। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে আধ্যাত্মিক-শীলিত পরিমার্জন সমাজক্ষেত্রে অহিংসাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হয়েছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষে ভারতীয় জাতির অন্তরাত্মা জাগ্রত হয়েছিল অহিংসাকে অবলম্বন করে। অহিংসা জৈন ধর্মের অন্যতম প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। জৈন ধর্মাচার্য তেইশতম তীর্থঙ্কর প্রভু পার্শ্বনাথ খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে অহিংসার ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। আর চব্বিশতম অর্থাৎ শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে অহিংসার ধারণাকে পূর্ণ রূপ দিয়েছিলেন।

অহিংসা জৈন ধর্মের মুখ্য বিষয়। Pandit Sukhalal Sanghvi (D.Litt) তাঁর 'Some Fundamental principles of Jainism' রচনায় লিখেছেন—"Jainism has some specific characteristics, ethical and philosophical, based on equality and non-violence....All the Jaina religious rites, external or internal, gross or subtle, were formulated round non-violence. Although every religious school has laid stress, to a more or less

degree, on the principle of non-violence, the supreme importance and wide application that it receives in Jainism is not found in any other school."(২) তবুও একথা ঠিক, জৈন দর্শনের থেকে বৌদ্ধ দর্শনে অহিংসার ধারণা অনেক বেশি পুষ্ট ও বিস্তৃত। আসলে সমগ্র পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্মের প্রসার সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাপকতার কারণেই বৌদ্ধধর্মে অহিংসার ধারণা এত বেশি বিকশিত। ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের জানায়, প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ভারতবর্ষে জৈনধর্ম মানব সমাজে তেমন প্রসার লাভ করেনি। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম সমগ্র ভারতরাষ্ট্রে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। বিশেষত সম্রাট অশোক এবং কনিষ্কের শাসনকাল ও পাল রাজাদের সময়ে বৌদ্ধধর্ম স্বমহিমায় বিরাজ করেছিল। জৈনধর্মের উৎসভূমি ভারতবর্ষ হলেও এই ধর্ম ভারতবর্ষের বাইরে তেমন প্রসার লাভ করতে পারেনি। অপরপক্ষে বৌদ্ধদর্শনের উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষ। তফাত হল, এই ধর্ম প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে সমগ্র উত্তরভারত থেকে তিব্বত এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল, ভুটান, চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়াতেও বিস্তারলাভ করেছে। এছাড়া দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, লাওস এবং ভিয়েতনামসহ মালয়ের সামুদ্রিক জলবেষ্টিত উপদ্বীপসমূহে বিস্তারলাভ করেছে। এই দেশগুলিতে জৈনধর্ম প্রসার লাভ করেনি। স্বভাবতই এই দেশের জনসাধারণ অহিংসাকে বৌদ্ধদর্শনের অন্যতম মূলসূত্র রূপে বরণ করেছেন। ভগবান বুদ্ধের সমগ্র জীবন তো এক অর্থে অহিংসা ব্রত। Satkari Mookerjee তাঁর 'Buddhism in Indian life and thought' প্রবন্ধে লিখেছেন—"There will be an end to suffering, if only one can go beyond this cycle of birth and death. This consummation is called nirvana."(৩) বুদ্ধদেব পশুহিংসাকে কোনভাবেই মান্যতা দিতেন না। ধর্মানন্দ কোসাম্বী, তাঁর 'ভগবান বুদ্ধ' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, বৌদ্ধরাই গোমাংস আহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। 'ব্রাহ্মণ ধাম্মিক সুত্তের' দু'টি গাথা উদ্ধৃত করে পণ্ডিত কোসাম্বী দেখিয়েছেন যে, গোরু মেষের মত নম্র। এরা হাঁড়ি ভরে দুধ দেয়। এরা পা, শিং কিংবা অন্য কোন অবয়ব দিয়ে কাউকে হিংসা করে না। কাউকে মারে না। এমন গাভীকে রাজা শিং ধরে বধ করলেন। গোরুর উপর অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। এটা অধর্ম—

"ন পাদা ন বিসানেন নাস্‌সু হিসংন্তি কেন চি।
গাবো এলক সমানা সোরতা কুম্ভ দুহনা।
তা বিসাণে গহেত্বান রাজা সত্থেন ঘাতয়ি।।
ততো চ দেবা পিতরো ইন্দো অসুর-রক্ষসা।
অধম্মো ইতি পক্কন্দুং যং সত্থং নিপতী গবে।।"(৪)

প্রাণী হিংসার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সম্রাট অশোক প্রচার করেছেন একথা সর্বজন বিদিত। অশোকের প্রথম শিলালিপিতে উল্লিখিত আছে—"এই রাজ্যে কোন প্রাণীই মারিয়া হোম হরণ করিবে না, ও মেলা, যাত্রা প্রভৃতি আরম্ভ করিবে না। ......পূর্বে

প্রিয়দর্শি রাজার পাকশালাতে রন্ধন করিবার জন্য, হাজার হাজার প্রাণী মারা হইত। যখন এই ধর্মলিপি লিখিত হইল, তখন হইতে দুইটি ময়ূর ও একটি হরিণও, এইভাবে শুধু তিনটি প্রাণী মারা হয় না। আর হরিণও রোজ মারা হয় না। ভবিষ্যতে এই তিনটি প্রাণীও আর মারা হইবে না।”[৫] এমনকি বুদ্ধদেব দৈনন্দিন আহারের জন্যেও প্রাণীহত্যা করতে নিষেধ করেছেন। দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বী (Damodar Dharmanand Kosambi) তাঁর “An Introduction to the study of Indian History” গ্রন্থে প্রাচীন পালির কয়েক ছত্র উল্লেখ করে লিখেছেন—“Cattle are our friends, just as parents and other relatives; for cultivation depends upon them. They give food, strength, freshness of complexion, and happiness. Knowing this, brahmins of old did not kill Cattle.”[৬]

মহাত্মা গান্ধি ভারতীয় জাতিসত্তায় অহিংসার উত্তরাধিকার বহন করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য পরম্পরায় অহিংসার বহমান যাজ্ঞিক তিনি। সমাজক্ষেত্রে অহিংসার প্রায়োগিক কৌশল আবিষ্কার করে পৃথিবীবাসীর কাছে তিনি অমরতা লাভ করেছেন। গান্ধির জন্মদিন প্রতিবছর ২ অক্টোবর আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস পালিত হয়। এই দিনটি ভারতবর্ষে গান্ধি জয়ন্তী হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২ অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস রূপে চিহ্নিত করে ভোট দেন। অহিংসার এমন বার্তা প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রান্তবাসীর কাছে আজ পৌঁছে গেছে সহজেই। অহিংসা দিবস পালনের লক্ষ্য পৃথিবী থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা, মারামারি—হানাহানি বন্ধে বিশ্ববাসীকে সজাগ ও সচেতন করা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদিত জননেতা গান্ধির নেতৃত্বে কলঙ্কিত পরাধীনতা মুক্তির সংগ্রামে হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল অহিংসা।

বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টের মতই গান্ধির বাণী ভারতের সীমানা অতিক্রম করে দূর অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো মানুষদের দেশে পৌঁছে গেছে। সাগরপারের তীর্থযাত্রী তিনি। আজ অবিচারের বিরুদ্ধে সমাজ যখন অহিংস সংগ্রাম করে, তখন গান্ধিই সেই জ্যোতির্ময় অনুপ্রেরণার আলোকিত উৎস। অহিংসা ভারতীয় জীবনবোধের সঙ্গে নিষ্ঠ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট। আর পৃথিবীব্যাপী অহিংসার আলোকস্তম্ভ হয়ে থাকলেন সেই ভারতীয় ঋষিসুলভ প্রজ্ঞা, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণপুরুষ মহাত্মা গান্ধি। অহিংসাকে আন্তর্জাতিক পটভূমিতে দেখেছেন তিনি। নিম্নবর্গীয় মানুষের অধিকারবোধকে মমত্ব দিয়ে অন্তরে অনুভব করেছেন তিনি। অহিংসার আন্তর্জাতিকীকরণ তাঁরই বেদনার শুভ্র আলোকপ্রভা। আর দূর ইউরোপের আর এক ঋষি সুলভ প্রজ্ঞা টলস্টয়কে তিনি আপনার গুরুপদে বরণ করে নিয়েছেন। অহিংসার আলোচনা সূত্রে গান্ধি, টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথ একই তীর্থে যাত্রা করেছেন। মহামানবের পথ, ভাবনা এবং লক্ষ্য একই। অহিংসা জড়োয়া শিল্পের মত ভিন্ন স্রষ্টার অন্তর্লোকে চিরন্তন আসন নিয়েছে।

মানবজাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে এরা রেখে গেছে শীতল ছায়া। Romain Rolland তাঁর ‘Mahatma Gandhi’ গ্রন্থে লিখেছেন—“Gandhi is too much of a saint; he is too pure, too free from the animal passions that lie dormant in man. He does not dream that they lie there crouching within the people, devouring his words and thriving on them. Tagore, more clear-sighted, realized the danger the non-co-operation are skirting when they innocently lay bare the crimes Europe, profess non-violence, and simultaneously plant in people’s minds the virus which will inevitably break in violence! But this they do not realize, these apostles whose hearts are free from hatred.”(৭)

।। দুই।।

“The kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force.”(৮)

--স্বর্গরাজ্যে এসেছিল অরাজক বিশৃঙ্খলা। হিংসা তাঁর স্থান দখল করেছিল। লিও টলস্টয় (Leo Tolstoy, 1828-1910) তাঁর ‘The kingdom of God is Within you’—গ্রন্থে একথা লিখেছেন। এই গ্রন্থেই টলস্টয় অহিংসা প্রতিরোধের নীতি (‘Principle of Non-violent resistance’) প্রণয়ন করেন। যখন ব্যক্তি হিংসার মুখোমুখি হন, তখনই প্রয়োজন হয় অহিংসা প্রতিরোধের। অহিংসার এই শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন মানবপুত্র খ্রীষ্টের কাছ থেকে (Jesus Christ)। টলস্টয়ের ঈশ্বরবিশ্বাস এবং ধর্মচিন্তার বৃহত্তম পরিসর নিশ্চয়ই মানবপুত্র খ্রীষ্ট। খ্রীষ্টর কাছ থেকে তিনি লাভ করেছিলেন পরিশুদ্ধ মানবপ্রেম। খ্রীষ্টের অন্তরের স্বচ্ছ অনুরোধ শুনেছিলেন তিনি। প্রতিধ্বনিত সেই বার্তা পৃথিবীর প্রতিটি মানবের পল্লী কুটিরে কুটিরে জ্যোতির্ময় আলো দিয়েছে। যদি বলি টলস্টয় খ্রীষ্টের উপাসক, তাহলে খুব একটা ভুল হবে না। তাঁর ‘The kingdom of God is within you’- গ্রন্থে সেই চিরকিশোর ঈশ্বরের দূত, মানবপুত্র যীশুর জীবনসাধনাকে স্পর্শ করতে পেরেছেন তিনি।

টলস্টয় মনে করতেন, মানবপুত্র খ্রীষ্ট মানব সমাজকে যে প্রেমধর্মের বাণী উপহার দিয়েছেন, পরবর্তীকালে যাজক সম্প্রদায় সে বাণীর মর্মার্থ গ্রহণ করতে পারেন নি। এছাড়া তাঁর ‘The pathway of life’ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মহাপুরুষের বাণী ভাষ্য। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থের সারসংকলন। এককথায়, মানবমন্ত্র এবং শান্তিমন্ত্রের নির্যাস। শত মহাপুরুষের শত শত ওঁ-কার ধ্বনি আমাদের বর্তমান পৃথিবীর আকাশ-বাতাসকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর তাঁর ‘ওয়ার অ্যাণ্ড পীস’ (‘War and Peace’) উপন্যাস তো মানব কল্যাণ ও শান্তির অভ্রান্ত পথ পরিক্রমা। ঈশ্বর বিশ্বাসী তিনি। উপন্যাসের শেষ অংশে লিখলেন—মানুষ এক সর্বশক্তিমান, সর্বকল্যাণময় ও সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সৃষ্টি—

"Man is the creation of an all-powerful, all-good, and all-seeing God."(৯) টলস্টয় মনে করেন, মানুষকে ধার্মিক হতে হবে, মানুষকে দার্শনিক হতে হবে। ব্যক্তিকে নৈতিক জীবনের অনুশীলনে অভ্যস্ত হতে হবে। আত্মজ্ঞান ছাড়া কোন বুদ্ধির প্রয়োগের কথা চিন্তা করা যায় না। তিনি লিখেছেন—আমাদের চৈতন্যের এই জবাব বুদ্ধির অধীন নয়—".....of an effect without a cause, that only proves that consciousness is not subject to reason."(১০) টলস্টয় জানেন, প্রভুত্ব বিস্তারকারী ক্ষমতাবান মানুষ মানব কল্যাণের ধারণা এবং অহিংসার তাৎপর্য বোঝেন না। টলস্টয় লিখেছেন, ক্ষমতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে ষড়যন্ত্র, খোশামোদ এবং আত্ম-প্রবঞ্চনার মত প্রচণ্ড শক্তিগুলি—"Standing on the highest possible pinnacle of human power with the blinding light of history focused upon him, a character exposed to those strongest of all influences : the intrigues, flattery, and self-deception inseparable from power, a character who at every moment of his life felt a responsibility for all that was happening Europe."(১১) অবশেষে টলস্টয় হয়ে উঠলেন অহিংসার পূজারী।

আর গান্ধিজি? গান্ধিজির সত্যাগ্রহ অহিংস। জীবনের প্রতিটি জয়কে গান্ধিজি সত্যাগ্রহের ভিত্তি বলে মনে করেছেন। কি ভারতবর্ষ, কি দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ সর্বত্রই গান্ধিজি দেখেছেন, সাধারণ মানুষ বা নিম্নবর্গীয় মানুষকে তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত করে দেখা হয়। কখনো বা নিম্নশ্রেণীর পশুর সমতুল বলেই মনে করা হয়। এদের কাছ থেকে অযথা বেশি বেশি শুল্ক আদায় করা হত। কিন্তু গান্ধিজির অহিংস এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ফলে তৎকালীন ইংরেজ সরকার একপ্রকার বাধ্য হন শুল্ক প্রত্যাহার করে নিতে। এই জয়কে গান্ধিজি সত্যাগ্রহের ভিত্তি বলে মনে করেছেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'The Story of My Experiments With Truth' গ্রন্থের 'Was it a Threat?' প্রবন্ধে লিখেছেন—"I regarded this event as the advent of Satyagraha in India."(১২) গান্ধিজী সত্যাগ্রহকে মনে করেছেন শুদ্ধ অহিংস অস্ত্র—"Usually they include violence as the last remedy. Satyagraha, on the other hand, is an absolutely non-violent weapon."(১৩) গান্ধিজি মনে করেছেন, ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি ছাড়া অহিংসার উৎসব অসম্ভব। হৃদয়ে যিনি শুদ্ধশীল নন, তাঁর পক্ষে অহিংসার উপলব্ধি সম্ভব নয়। এই আত্মশুদ্ধির পথ অনেক কণ্টকাকীর্ণ। ব্যক্তিকে নম্র এবং বিনয়ী হতে হবে। গান্ধিজী তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থের 'Farewell'—প্রবন্ধে লিখেছেন—"Identification with everything that lives is impossible without self-purification, without self-purification; the observance of the law of ahimsa must remain an empty dream; God can never be

realized by one who is not pure of heart ...... But the path of self-purification is hard and steep."[১৪]

অহিংসার এই উৎসব ছিল গান্ধিজির জীবনব্রত। সাহসী তিনি। অহিংসার জ্যোতির্ময় আলো জ্বেলে তিনি হিংসার আবর্জনাকে দূরে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছেন। পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছেন ব্যক্তি এবং সমাজকে। আর টলস্টয়কে স্থান দিয়েছেন অন্তরের অন্ত:স্থলে বরণ করেছেন আপন শিক্ষক রূপে। রবীন্দ্রনাথকে গান্ধিজি পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। প্রকৃত জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী নয়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আন্তর্জাতিক মানুষ যথার্থ জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতার অনুকূল। রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি পত্রে (১৯.০২.১৯৪০) গান্ধিজি লিখেছেন, "Gurudev himself is international because he is truly national. Therefore all his creation is international and Viswa-Vharati is the best of all." [১৪.ক]

আর রবীন্দ্রনাথ হিংসা ও যুদ্ধকে দেখেছেন জাতিপ্রেমের তাণ্ডবরূপে। তিনি মনে করেন, জাতি-বিদ্বেষ এক গভীর অজ্ঞানতা প্রসূত। উগ্র জাতীয়তা রবীন্দ্রনাথের কাছে চিরকালই অসহিষ্ণু ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্বে রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধবাজ একনায়কদের উগ্র জাতিপ্রেমের পূজা করতে দেখেছেন। জাতীয়তা রবীন্দ্রনাথের কাছে 'অপদেবতার মূর্তি' ছাড়া আর কিছু নয়। উগ্র জাতীয়তা হিংসার জন্ম দেয়। উগ্র জাতীয়তা বিষবৃক্ষ বপন করে। এক নায়কেরা হিংসা ও ধ্বংসকে প্রতিষ্ঠিত করেন। যুদ্ধ জয়ের শয়তানী হাতিয়ার হল উগ্র জাতীয়তা। এই জাতীয়তা প্রকৃতপক্ষে 'জাতিপ্রেমের বহ্নি উৎসব'। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন সাধনা অহিংসার সাধনা। ১৮১৮ সালের ১১ই নভেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটল। এর প্রায় এক মাস পরে রবীন্দ্রনাথ বোলপুরের নির্জন পল্লীতে হাতে গোনা কয়েকজন সত্যব্রতী, জ্ঞানদীপ্ত প্রজ্ঞাবানকে সাথী করে ঔপনিষদিক ঋষির শান্তিমন্ত্র শোনাতে চেয়েছেন। শিক্ষাব্রতী জ্ঞানতাপস রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমৈত্রীর বাণীবাহক হয়ে উঠলেন বিশ্বভারতী (২৩শে ডিসেম্বর, ১৯১৮, ৮ই পৌষ ১৩২৫) প্রতিষ্ঠা করে। অহিংসা এবং শান্তির দূত হয়ে আবহমান কালের কপোল তলে জ্যোতির্ময় দীপের আলো জ্বেলে দিলেন। চিরজাগ্রত রইল কবির সাধ-স্বপ্নের বিশ্বভারতী।

হিংসা যে কখনো জয়ী হতে পারে না, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টির পরতে পরতে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতি হিংসার প্রতিমূর্তি। শক্তি, দম্ভ এবং অহংকারের প্রতিভূ তিনি। কিন্তু জয়সিংহের মৃত্যুতে রঘুপতি সম্বিৎ ফিরে পেয়েছেন। দেবীর মূর্তিকে গোমতীর জলে বিসর্জিত করেছেন। জয়সিংহের মৃত্যু রঘুপতিকে বিচলিত করেছে। তিনি আর্তনাদ করে উঠেছেন। - জয়সিংহের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন –

" অহংকার অভিমান
দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক ! তুই আয়!"[১৫]

নাটক শেষ হয়েছে হৃদয়ের নির্মল পবিত্রতায়। যেন একখণ্ড সাদা মেঘ আশ্বিনের রৌদ্রধৌত বলাকার শ্রেণি দলের মত আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে পৃথিবীময় চামর দোলাতে দোলাতে শান্তির ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছে। -

"অপর্ণা । পিতা, চলে এসো !
রঘুপতি । পাষাণ ভাঙিয়া গেল-জননী আমার
এবার দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা !
জননী অমৃতময়ী !
অপর্ণা । পিতা, চলে এসো !"(১৬)

টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০), রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) ও গান্ধি (১৮৬৯-১৯৪৮) প্রায় একই কালের মহামানব। মানবপুত্রের উত্তরাধিকার – মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সন্ততি এরা। টলস্টয় দূর ওপারের, পশ্চিম, সাগরপারের। আর রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধি – এই প্রাচ্য ভারতভূমির মহান সন্তান। তিন শ্রেষ্ঠ মানব সন্তানের ভাবনা একই রকম। মহামানবদের যাত্রাপথ এক, গন্তব্যও এক। তিনজনেই পৌঁছেছেন নিজ নিজ প্রার্থিত দ্বীপভূমিতে। কঠিন, দুরারোহ তাঁদের যাত্রাপথ। তপস্যা কঠিন সাধনা এই ত্রয়ীর। সত্যব্রতী সমাজ শিক্ষক এঁরা। ব্রহ্মচর্য এঁদের জীবনব্রত। টলস্টয়ের লেখনী অহিংসা ও মানব কল্যাণের অনুর্বর অমসৃণ পথে শান বাঁধানো প্লাটফর্ম নির্মাণ করেছে। গান্ধি টলস্টয়কে গুরুপদে বরণ করেছেন। সাধনার কঠিন পথে যাত্রা করে অভীপ্স লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন। অহিংস প্রতিরোধকে সমাজ জীবনের প্রতিটি গৃহকোণে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। টলস্টয়ের তত্ত্ব পূর্ণাঙ্গ প্রায়োগিক চারণক্ষেত্রে লালিত হল গান্ধির আধ্যাত্মিক স্নিগ্ধ ছায়ায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম অহিংস প্রতিরোধের সেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। এককথায়, গীতার অভ্যাসযোগের সংগ্রামভূমি, যুদ্ধকাব্য। দূর ইউরোপ থেকে টলস্টয় গান্ধির সত্যাগ্রহ এবং অহিংস আন্দোলনের খোঁজ খবর রেখেছিলেন। টলস্টয়ের কাছে গান্ধির সেই মহৎ কর্ম ছিল মৌলিক ও মূল্যবান। গান্ধির সুবৃহৎ কর্ম পরিধিকে টলস্টয় অহিংসার বাস্তব প্রামাণিক দলিল বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি আরো মনে করেন, এই কাজে সমস্ত পৃথিবীবাসীর অংশগ্রহণের দরজা উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে। কেবল খ্রীষ্টানেরাই নন, সমস্ত পৃথিবীবাসীকেই গান্ধির এই মহান কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন টলস্টয়। টলস্টয় লিখেছেন – "........ The most fundamental and the most important to us supplying the most weighty Practical Proof in which the world Can now share and with which must participate not only the Christians but all the peoples of the world."(১৭)

আর রবীন্দ্রনাথ? আশৈশব ঔপনিষদিক পরিবেশ-পরিমণ্ডলের ধূপ-ছায়ায় লালিত তিনি। অহিংসাই তাঁর জীবন ব্রত। শুদ্ধ-পবিত্র পূত জীবনের তিনি অনুসন্ধান করেছেন

আমৃত্যু। প্রেম-কল্যাণ-সত্য-মঙ্গলের জ্যোতির্ময় মথিত সত্তা তিনি। ব্রহ্মের স্বরূপ সন্ধান করেন তিনি। বৈষ্ণব দর্শনের জারক রসে টইটম্বুর তাঁর নির্মল হৃদয়। বাউলের গান তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে দেদীপ্যমান। তিনিই জ্যোতির্ময় আলোর রবীন্দ্রনাথ। লিখেছেন গীতাঞ্জলি। টলস্টয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ যোগাযোগ হয়ে ওঠেনি। ইউরোপীয়দের কাছে তিনি হিন্দু টলস্টয় – " Rabindranath Tagore is a Kind of Hindu Tolstoy." [১৮] রবীন্দ্রসৃষ্টিতে অবশ্য টলস্টয়ের উল্লেখ এসেছে। 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'-তে রবীন্দ্রনাথ টলস্টয়ের মহিমময় বিরাটত্বের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। বড় তিনি, সৃষ্টিশীল তিনি, অজস্র কল্পনা প্রাচুর্যে ভরপুর তিনি। সুতরাং তাকে উপেক্ষা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছ থেকে শুধু জ্ঞানের যোগ নয়, প্রাণের নিবিড় যোগ অনুভব করেন। ম্যাক্সিম গোর্কি টলস্টয়ের জীবনচরিত লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ এ লেখাকে মনে করেছেন অসম্পূর্ণ। সেই লেখায় রয়েছে ছবির তীক্ষ্ণ তুলির টান। একথা ঠিক, টলস্টয়ের কিছু দুর্বলতা, কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল। কিন্তু সত্যের গুণে টলস্টয় হিমালয়ের মত উত্তুঙ্গ। সাধারণ মেঘ-কুয়াশা কিংবা আলো-ছায়া তাঁর উজ্জ্বলন্ত জ্যোতির্ময় রূপকে ঢেকে রাখতে পারে না। যেমন কাঞ্চনজঙ্ঘার শ্বেতশুভ্র মহত্ত্বকে সামান্য কুয়াশা আচ্ছন্ন করতে পারে না। টলস্টয়ের সৃষ্টির মধ্যে বহুকালের বহু মানুষের সত্যদৃষ্টির ছবি আঁকা আছে। তিনি যথার্থই অন্যতর অনুভবের স্রষ্টা। তাঁর সত্য মূর্তির দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন – " যে সত্যের গুণে টলস্টয় বহুলোকের এবং বহুকালের, তাঁর ক্ষণিকমূর্তি যদি সেই সত্যকে আমাদের কাছ থেকে, আচ্ছন্ন করে থাকে তা হলে এই আর্টিস্টের আশ্চর্য ছবি নিয়ে আমার লাভ হবে কী। প্রথম যখন আমি দার্জিলিং দেখতে গিয়েছিলুম দিনের পর দিন কেবলই দেখেছিলুম মেঘ আর কুয়াশা। কিন্তু জানা ছিল, এগুলো সাময়িক এবং যদিও হিমালয়কে আচ্ছন্ন করবার এদের শক্তি আছে তবুও এরা কালো বাষ্পমাত্র, কাঞ্চনজঙ্ঘার ধ্রুব শুভ্র মহত্ত্বকে এরা অতিক্রম করতে পারে না।"[১৯]

রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন টলস্টয় শুধু কিন্তু বিশ্ব উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র নয়, বিশ্বসাহিত্যের প্রকৃতপক্ষে তিনি বিশ্বমানবতার এক সুউচ্চ চূড়ো। সমকালের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবচরিত্র। টলস্টয় যথার্থই স্বদেশ- সমকাল এবং জাতীয় সত্তা ছাপিয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্বে মানবতার জ্যোতির্ময় আলো ফেলেছেন। টলস্টয় এবং রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যের দীপ্ত জ্যোতি। আর ত্যাগব্রতী ব্রহ্মচারী গান্ধিজি অহিংস প্রতিরোধকে দেশ এবং সমাজ বদলের প্রধান অস্ত্র মনে করেছেন। তিন যুগন্ধর স্রষ্টাই অহিংসাকে লালন করেছেন আপন অন্তরে। মানব সভ্যতা যতদিন পৃথিবীতে বহমান থাকবে, ততদিন মানবজাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন টলস্টয়-রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিকে।

।। তিন ।।

"..... it lies in the fact that people who wield organized violence have the power to compel others to obey them and to do as they like."[২০]

মানুষ ক্ষমতা দ্বারা হিংসা সংগঠিত করেন। তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী নিজের তৈরি নিয়ম অপরকে মানতে বাধ্য করেন। একথা বলেছেন লিও টলস্টয় তাঁর 'The Slavery of Our Times' – গ্রন্থে। মানুষ তো পশু নন। মানুষ মানুষ হওয়ার জন্য তপস্যা করেছে। কবে যে সে তপস্যা সম্পূর্ণ হবে আমরা জানি না। মানুষকে যথার্থ মানুষ হতে হলে হিংসামুক্ত হতে হবে। সংযম এবং ব্রহ্মচর্য পালনের সাধনাই মানুষকে প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে তুলতে পারে। ধীরে ধীরে মানুষ শীলিত, পরিমার্জিত এবং সংযত হয়েছে । কিন্তু সে সম্পূর্ণ হয় নি। সম্পদকে কুক্ষিগত করা, লাভ-লোভ, ক্ষমতা-শক্তিমত্তা কেবল মানুষকে শোষণ করার জন্য। গোষ্ঠী-সম্প্রদায় এমনকি রাষ্ট্র হিংসাশ্রয়ী হয়ে ওঠে এভাবেই। হিংসা নিয়ে আসে জাতি-বিদ্বেষ, উগ্র জাতীয়তা। হিংসা নিয়ে আসে যুদ্ধ। হিংসা মানুষকে – জাতিকে ক্ষত বিক্ষত করে। টলস্টয় এমন হিংসা মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন। আর গান্ধি হিংসামুক্ত পৃথিবীর শুধু স্বপ্ন দেখেন নি। সেই স্বপ্নকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য নিরলসভাবে অহিংস প্রতিরোধের পথকে সময়োচিত মনে করেছেন। আর টলস্টয়কে বসিয়েছেন গুরুর আসনে। মহাত্মাজি তাঁর 'Indian Home Rule(Hind Swaraj)' – গ্রন্থে লিখেছেন –"Whilst the views expressed in 'Hind Swaraj' are held by me, I have but endeavoured humbly to follow Tolstoy, Ruskin, Thoreau, Emerson and other writers, besides the masters of Indian Philosophy. Tolstoy has been one of my teachers for a number of years."[২১]

টলস্টয় তাঁর 'The Slavery of Our Times' – গ্রন্থে হিংসা বর্জনের কথা বলেছেন যা তিনি লাভ করেছেন ঈশ্বরের বাণী থেকে। উক্ত গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি আরো বলেছেন যে , একটি চোখের বদলে আর একটি চোখ – অর্থাৎ তোমাকে শেখানো হয়েছে যে হিংসার দ্বারা হিংসা প্রতিরোধ। আমি তোমার কাছে পৌঁছব, তখন এক গালে আঘাত পেলে বাড়িয়ে দাও অন্য গাল – অর্থাৎ ব্যক্তি নিজে হিংসা ভোগ করলেও তা কাজে লাগানো অনুচিত।আর হিংসা জর্জরিত মানুষও হিংসাশ্রয়ী হবেন না কখনোই। টলস্টয় লিখেছেন – "The fundamental thought both of that book and of this article is the repudiation of violence. That repudiation I learnt and understood from the Gospels, where it is most clearly expressed in the words : It was said to you, An eye for an eye", ... i.e. you have been taught to oppose violence by violence, But I teach you :

turn the other cheek when you are struck – that is, Suffer violence, but do not employ it."(২২)

'একগালে আঘাত পেলে অন্য গাল বাড়িয়ে দাও' – টলস্টয়ের এই ভাবনাই মহাত্মা গান্ধির অহিংস প্রতিরোধের (non-violent resistance movement) সংগ্রামকে পুষ্ট করেছিল। 'The Slavery of our Times' – গ্রন্থের প্রথমাংশে সমালোচক লিখেছেন – "Tolstoy took the injunction to 'turn the other cheek' as a Commandment of non –resistance to evil by force' and a doctrine pacifism and nonviolence. By directly influencing Mahatma Gandhi with this idea through his work ' The Kingdom of God is within you, Tolstoy has had a huge influence on the nonviolent resistance movement to this day."(২৩)

আইন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রতিফলন। টলস্টয় তাঁর জীবিতকালে সাম্যবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা দেখে যেতে পারেন নি। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তো প্রকৃতপক্ষে শোষণ যন্ত্র। স্বভাবতই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন সৎ মানুষ হয় না। পুঁজি এবং শ্রম – সম্পর্ক এটা এমনই এক অক্ষদণ্ড যার চারিদিক পরিক্রমণ করছে একাল পর্যন্ত সমস্ত সমাজ সিস্টেম। মনীষী কার্ল মার্কস (Karl Marx) তাঁর 'Das Capital' গ্রন্থে লিখেছেন " As a matter of history, Capital, as opposed to landed property, invariably takes the form at first of money; it appears as moneyed wealth, as the capital of the merchant and of the usurer."(২৪) শ্রমিক শ্রেণী ধনতন্ত্রের গর্ভ চিরে জন্মলাভ করেছে। শোষক গড়ে তুলেছে পুঁজি, মূলধন। মূলধনের মাথা এবং পা আর রন্ধ্র দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। অনেক পচা দুর্গন্ধ সেখানে। সুতরাং ধনতান্ত্রিক সমাজ হিংসার তাজা রক্তে পরিস্নাত। এমন রাষ্ট্র যন্ত্রই সৃষ্টি করে আইন। টলস্টয় লিখেছেন, আইন হল নিয়ম, যা মানুষ সংগঠিত হিংসা দ্বারা পরিচালনা করে । যারা তার সাথে সমঝোতা করতে পারে না, তারাই শিকার হয় প্রতিঘাতের। কখনো বাক্ স্বাধীনতা হারায়। কখনও বা প্রাণও দিতে হয় – "Laws are rules made by people who govern by means of organized violence, for compliance with which the non- complier is subjected to blows, to loss of liberty, or even to being murdered."(২৫)

টলস্টয় মনে করেন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা খুবই করুণ ও মর্মান্তিক। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছেন যারা শান্তিকামী। এরা যথার্থই সংবেদনশীল। এরা বোঝেন যুদ্ধের বীভৎসরূপ ও ভয়াবহ পরিণামের কথা। টলস্টয় তাঁর 'The Kingdom of God is Within You' – গ্রন্থে লিখেছেন - " Another attitude to war has something tragical in it. There are men who maintain that the love for peace and the inevitability of war form a hideous contradiction,

and that such is the fate of man. These are mostly gifted and sensitive men, who see and realize all the horror and imbecility and cruelty of war."(২৬) টলস্টয়ের উপলব্ধি, এইসব সংবেদনশীল মানুষও মনের এক অদ্ভুত অযাচিত পরিবর্তনে কেমন হয়ে যায়। তারা এসব থেকে বেরিয়ে আসার যথার্থ পথের খোঁজ করে না। এবং অসহায় মানুষের মধ্যে থেকেও সেই আঘাতকে খোঁচা দিয়ে আনন্দ পায়। টলস্টয় লিখেছেন – "but through some strange perversion of mind neither see nor seek to find any way out of this position, and seen to take (pleasure) in teasing the wound by dwelling on the desperate position of humanity."(২৭)

টলস্টয় মনে করেন যুদ্ধ, হত্যা এবং মানুষের ভয়ঙ্কর দুর্দশা নিয়ে আমরা বিচলিত হই। অথচ বর্তমান সভ্যতায় বিজ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটেছে। মানুষের দার্শনিক বোধ হয়েছে উন্নত। তা সত্ত্বেও মানুষ তৈরি করেছে হত্যা শেখানোর প্রতিষ্ঠান। যাতে বিনা প্রচেষ্টায় অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা যায় নির্বিচারে। টলস্টয় লিখেছেন – "War ! fighting ! Slaughter ! massacres Of men! And we have now, in our century, with our Civilization, with the spread of science, and the degree of philosophy which the genius of man is supposed to have attained, schools for training to kill, to kill very far off, to perfection, great numbers at once, to kill poor devils of innocent men with families and without any kind of trial."(২৮) টলস্টয় মনে করেন, আধুনিক পৃথিবীর মানুষ উন্নতি করেছেন হিংসার উপর ভিত্তি করে। মানুষ তার প্রতিবেশীকে ভালবাসেন। অথচ তিনি ভাবেন না যে, তার দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলীতে তার প্রতিবেশী কতটা উপকার করেছেন। তিনি লিখেছেন –"A man of the modern world who profits by the order of things based on violence, and at the same time protests that he loves his neighbor and does not observe what he is doing in his daily life to his neighbor."(২৯) টলস্টয় দেখেছেন, মানুষের মধ্যে নিহিত রয়েছে হিংসাশ্রয়ী মনোভাব। তিনি লিখেছেন, প্রতিটি যুদ্ধ, তা যতই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পরিচালিত হোক না কেন, তার ফলাফল যতই স্বল্পস্থায়ী হোক না কেন, তা চাষবাসের ক্ষতি করে, ফসল বিনষ্ট করে। মানুষকে হত্যা করে। আরও কত কি? "Every war, even the most humanely Conducted, with all its ordinary Consequences, the destruction of harvests, robberies, the license and debauchery, and the murder with the Justifications' of its necessity."(৩০)

টলস্টয় তাঁর ‘ The Kingdom of God is Within You’ – গ্রন্থে ঈশ্বরের রাজত্বের কথা বলেছেন। কেমন হবে সেই ‘ঈশ্বরের রাজত্ব’ – ‘The kingdom of God’? টলস্টয় লিখেছেন – পুরানো ধর্মীয় রীতিনীতির বদলে খ্রীষ্ট প্রদর্শিত নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অন্তরের ও বাইরের সম্পূর্ণতা, সত্য ও ভালবাসা – যা হল ঈশ্বরের প্রকৃত রাজত্ব। যেখানে মানুষ এই অর্জিত শিক্ষার দ্বারা যুদ্ধ বন্ধ করতে শিখবে। ঈশ্বর সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন করবে এবং ভালবাসার মাধ্যমে একত্রিত হবে। তখন সিংহও হিংসা ভুলে পরম শান্তিতে ভেড়ার সাথে নিদ্রা যাবে –
“In place of all the rules of the old religions, this doctrine sets up only a type of inward perfection, truth, and love in the person of christ, and – as a result of this inward perfection being attained by men also the outward perfection foretold by the prophets – the kingdom of God, when all men will cease to learn to make war, when all shall be taught of God and united in love, and the lion will lie down with the lamb.”(৩১)

সর্বোপরি টলস্টয় হয়ে উঠেছেন অহিংসার পূজারি। তিনি মনে করেন, চিরন্তন উজ্জীবনী শক্তি ঈশ্বরের মধ্যে নিহিত রয়েছে। ঈশ্বরের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল করার জন্য যীশু বা সাধারণ মানুষ সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। ব্যক্তিগত, পরিবারগত এবং সামাজগত স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগের জন্য ব্যক্তিকে উৎসর্গীকৃত করে তুলতে হয়। সামাজিক কল্যাণ কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়। ব্যক্তির জীবনের চালিকা শক্তি হল প্রেম। তাঁর ধর্ম হল ঈশ্বরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া ও সুগভীর সত্যের পূজা । মানবতা তাঁর লক্ষ্য - “but in the eternal undying source of life – in God; and to fulfill the will of God he is ready to sacrifice his individual and family and social welfare. The motor power of his life is love. And his religion is the worship in deep and in truth of the principle of the whole – God.”(৩২)

টলস্টয় মনে করেন, ধর্মপ্রাণ এবং সত্যাশ্রয়ী মহাপুরুষই পারেন হিংসা থেকে দূরে থাকতে। তাঁর ‘The Pathway of life’ – গ্রন্থটি মহাপুরুষদের বাণীর সারসংকলন। মহাত্মা মহাপুরুষদের বাণীই আগামী প্রজন্মকে সত্যের দিশা দেখাতে পারে। হজরত মহম্মদের বাণী উদ্ধৃত করেছেন টলস্টয়। মহম্মদ বলেছেন, সুখের পেছনে আছে নরক, আর শ্রম ও ক্লেশের পেছনে আছে স্বর্গ – “Hell is hidden behind pleasures, Paradise behind labor and privations.”(৩৩)

টলস্টয় উদ্ধৃত করেছেন, আবারও মহম্মদের বাণী যিনি শ্রম করেন না – তিনি নিজেকে খাওয়ার থেকে বঞ্চিত করবেন – “What is the sweetest food? The food which you have earned with your own labor.”(৩৪) টলস্টয় উক্ত গ্রন্থে

উদ্ধৃত করেছেন, Apostle Paul – এর বাণী। যিনি বলেছেন, যে শ্রম করবে না সে নিজেকে খাওয়ার থেকে বঞ্চিত করবে – “He who will not work, neither let him eat.”(৩৫) টলস্টয় মনে করেন, এমন ধর্মবোধই মানুষকে অহিংস উপলব্ধিতে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

হিংসা ও যুদ্ধের পরিণতি কি হতে পারে? টলস্টয় তাঁর পৃথিবী বিখ্যাত উপন্যাস ‘ওয়ার অ্যান্ড পীস’(War and Peace)-এ যুদ্ধের মর্মান্তিক মৃত্যু দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। আহত সৈন্যরা টলতে টলতে চলেছে। তাদের স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অনবরত গোলাগুলি। বারুদের ধোঁয়ায় চারিদিক ঢেকে যাচ্ছে। কোন সৈনিকের পা উড়ে গেছে। কয়েকজনের দেহ এখানে ওখানে পড়ে আছে। পোড়া ঘাসের উপর ইতস্তত ছড়িয়ে আছে পোড়া কাঠ ও ছেঁড়া কাপড়ের স্তূপ। সৈনিকের পায়ের নিচে রক্তের স্রোতে ভাসছে ঘোড়া ও মানুষ। কোথাও একক, কোথাও বা স্তূপ হয়ে। শুধু আর্তনাদ-মৃত্যু, গোঙানি। রক্তাক্ত ধূলি কলঙ্কিত সৈনিকের মৃতদেহ। কারো পেটের নাড়ি ভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে। রণক্ষেত্রে পড়ে থাকা মৃতদেহতে কৃষকেরা একমাস পরে কবর দিচ্ছে। সেগুলি কাগজের মত সাদা, কোন গন্ধ তাতে পাওয়া যায়নি। আবার কোথাও মৃতদেহ পচে গেছে, পোকা পড়েছে। মুখে রুমাল বেঁধে কবর দিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। টলস্টয় লিখেছেন – “well, those dead had been lying there for nearly a month, and says the peasant, ‘they lie as white as paper, clean, and not as much smell as a puff of powder smoke.’ .... we tie our faces up with kerchiefs and turn our heads away as we drag them off : we can hardly do it. But theirs’, he says ‘are white as paper and not so much smell as a whiff of gunpowder.”(৩৬)

টলস্টয় জীবনের অন্তিম পরিণামে ঈশ্বরের কাছে নতজানু হয়েছেন। ঈশ্বর বিশ্বাসী তিনি। তাঁর ‘Anna karenina’ – উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র তথা নায়িকা আনা ঠিক মৃত্যু মুহূর্তে বলেছেন, ঈশ্বর সমস্ত কিছুর জন্য আমাকে ক্ষমা করো – “Lord, forgive me for everything!”(৩৭)

টলস্টয়ের জীবনীকার পল বিরুকফ (Paul Birukoff) তাঁর ‘Leo Tolstoy his Life and Work’ – গ্রন্থে টলস্টয়ের আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ এবং বিবর্তন প্রসঙ্গে লিখেছেন – “ This dissatisfaction was not a sickly, causeless complaining. Deep and real causes lay at the bottom of it. With all the great resources of his spiritual development, he was devoid of a substantial foundation – of the synthesis of all the ideas in which he was interested.”(৩৮)

।। চার ।।

"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি,
নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর – কুটিল পন্থ তার
লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
করো ত্রাণ মহাপ্রাণ, আনো অমৃতবাণী,
বিকশিত করো প্রেমপদ্ম
চিরমধুনিষ্যন্দ।
....
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষগ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আনো, তব দক্ষিণ পাণি।"(৩৯)

হিংসা স্নাত পৃথিবী। করুণাঘন বুদ্ধের কাছে নতজানু কবি। বুদ্ধের অমৃতবাণীই পৃথিবীকে হিংসামুক্ত করতে পারে। 'বুদ্ধজন্মোৎসব' – কবিতায় রবীন্দ্রনাথ হিংসা আক্রান্ত পৃথিবীতে অহিংসার মঙ্গলবার্তা দিতে চেয়েছেন। উগ্র জাতীয়তার জয়তিলক, রক্ত-কলুষতায় আক্রান্ত পৃথিবী। কবি মহামানবের পদধ্বনি শুনেছেন। মঙ্গল শঙ্খের পবিত্র ধ্বনি পৃথিবীকে ভাতৃঘাতী সংঘাত থেকে মুক্তি দেবে। কবি হিংসামুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন।

বিশ্বব্যাপী হিংসাসুরের দু'দুটো তাণ্ডব নৃত্য রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন। তাঁর সৃষ্টির পাতায় পাতায় রেখে গেছেন সেই চিহ্ন। রবীন্দ্রনাথ সেই রক্ত পিশাচ মানুষদের স্বরূপ চিনেছেন। যারা যুদ্ধজয়ের জন্য, মানুষকে হত্যা করার জন্য দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন। হিংসা বিধ্বস্ত এই যুদ্ধের স্বরূপ কি? রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পত্রপুট' – কাব্যের সতেরো সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন –

"যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।
ওদের ঘাড় হল বাঁকা, চোখ হল রাঙা
কিড়মিড় করতে লাগল দাঁত।
... .
ওরা হিসাব রাখবে মরে পড়ল কত মানুষ,
পঙ্গু হয়ে গেল কয়জনা
....
পিশাচের অট্টহাসি জাগিয়ে তুলবে
শিশু আর নারীদেহের ছেঁড়া টুকরোর ছড়াছড়িতে।"(৪০)

অহিংসার মুক্তিদূত করুণাঘন বুদ্ধ। বুদ্ধ রবীন্দ্রসৃষ্টিতে ঘুরে ফিরে এসেছেন। যখনই রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধক্ষত পৃথিবীকে মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন, তখনই বিপন্নবোধ

করেছেন। আর আশ্রয় নিয়েছেন বুদ্ধের পদতলে । ‘নবজাতক’ কাব্যগ্রন্থের ‘বুদ্ধভক্তি’ কবিতার শুরুতে জানিয়েছেন, কোন জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধ মন্দিরে পূজা দিতে গেছেন। কবি লিখেছেন –

“হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য
সংগ্রহ করিবারে সমনের খাদ্য।
সাজিয়াছে ওরা সবে উৎকটদর্শন,
দন্তে দন্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ
....
গর্জিয়া প্রার্থনা করে
আর্তরোদন যেন জাগে ঘরে ঘরে।”[(৪১)]

অহিংসার পূজারি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ‘মানুষের ধর্ম’। মানুষের ধর্ম হল সত্যধর্ম। এই ধর্ম যুদ্ধকালেও নিরস্ত্র রথীকে হত্যার কথা বলে না। বর্মহীন ঘুমন্ত মানুষকেও আঘাত করার কথা বলে না। ভীত শোকার্ত মানুষকেও মারতে নাই। ‘মানুষের ধর্ম’ বলে ‘শত্রুকে ক্ষমা করো’। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘মানুষের ধর্ম’ প্রবন্ধে লিখেছেন “শত্রুহননের সহজ প্রবৃত্তি মানুষের জীবধর্মে, তাকে উত্তীর্ণ হয়ে মানুষ উদ্ভুত কথা বললে, ‘শত্রুকে ক্ষমা করো।’ এ কথাটা জীবধর্মের হানিকর, কিন্তু মানবধর্মের উৎকর্ষলক্ষণ। .... সত্যের ধর্ম বলতে বোঝায় মানুষের মধ্যে যে সত্য তাঁরই ধর্ম, মানুষের মধ্যে যে মহৎ তাঁরই ধর্ম।

শত্রুকে নিধনের পরিমাপ আছে, শত্রুকে ক্ষমার পরিমাপ নেই।”[(৪২)]

হিংসা নয়, প্রেমের বার্তা, ক্ষমার বার্তা মহাপুরুষেরা পৌঁছে দিয়েছেন মানুষের ঘরে ঘরে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘পরিশেষ’ কাব্যগ্রন্থের ‘বুদ্ধদেবের প্রতি’ কবিতায় লিখেছেন –

“ভারত – অঙ্গনতলে, আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্তা শতকণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি –
এনে দিক অজেয় আহ্বান।”[(৪৩)]

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ পুষ্ট হয়েছে বুদ্ধ এবং খ্রীষ্ট – এই দুই মহাপুরুষের জীবন এবং বাণীকে অবলম্বন করে। রবীন্দ্রনাথের কাছে খ্রীষ্ট মানব পুত্র। দুই মহাপুরুষই অহিংসাকে পরিত্যাগ করতে বলেছেন। কল্যাণপূত কর্মেই মানুষের মুক্তি খুঁজেছেন। রবীন্দ্রনাথ ‘খৃষ্ট’ গ্রন্থের ‘খৃষ্ট’ প্রবন্ধে লিখেছেন, যীশুকে যারা অন্তরে সত্যভাবে গ্রহণ করেছেন, তারা কেবল পূজার্চনা দিয়ে দিনরাত কাটিয়ে দিতে পারেন না- “ মানুষের সেবা তাঁহাদের পূজা, অতি কঠিন তাহাদের ব্রত। তাঁহারা আরামের শয্যা ত্যাগ করিয়া, প্রাণের মমতা বিসর্জন দিয়া, দূর দেশ-দেশান্তরে নরখাদকদের মধ্যে, কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে, জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন – কেননা, যাঁহার নিকট হইতে তাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ

করিয়াছেন তিনি মানবপুত্র, তাঁহার আবির্ভাব মানবের প্রতি ঈশ্বরের দয়া সুস্পষ্ট প্রকাশমান হইয়াছে।”[৪৪]

মানুষকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন খ্রীষ্ট। নিজে হিংসার আগুনে পুড়ে গিয়েও মানুষকে প্রেমের মন্ত্র দিয়েছেন। ‘খৃষ্ট’ গ্রন্থের ‘খৃষ্টোৎসব’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- “এমনি করেই একজন মানবসন্তান একদিন বলেছিলেন যে, আমরা সকলে বিশ্বপিতার সন্তান, আমাদের অন্তরে যে প্রেমের পিপাসা আছে তা তাঁকে স্পর্শ করেছে।”[৪৫] রবীন্দ্রনাথ দূর ইতিহাসের বিবর্ণ পাতায় আলো ফেলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, এমন কি খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরাই তাঁর বাণীর প্রতি অমর্যাদা করেছেন। হিংসা এবং রক্তচিহ্নকে তারা আবাহন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- “ তারা বারে বারে ইতিহাসে তাঁর বাণীর অবমাননা করেছে, রক্তের চিহ্নের দ্বারা ধরাতল রঞ্জিত করে দিয়েছে- তারা যিশুকে একবার নয়, বার-বার ক্রুশেতে বিদ্ধ করেছে।”[৪৬]

মানব প্রেমিক যীশু হিংসার বলি হয়েছিলেন। তাকে ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল। সে আজ অনেক কালের কথা। সেই হত্যাকারীরা আজও জন্ম নিয়েছে নতুনভাবে, দলে দলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থের ‘মানবপুত্র’ কবিতায় লিখেছেন -

“মৃত্যুর পাত্রে খৃস্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন
রবাহুত অনাহুতের জন্যে,
তার পরে কেটে গেছে বহু শত বৎসর।

....
সেদিন তাকে মেরেছিল যারা
ধর্মমন্দিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে,
তারাই আজ নূতন জন্ম নিল দলে দলে।”[৪৭]

হিংসা দীর্ণ এই পৃথিবী। রবীন্দ্র –হৃদয় পীড়িত, রক্তাক্ত, যন্ত্রণা জর্জর। ‘বড়োদিন’ – উৎসবে যীশুকে কবি স্মরণ করেছেন বড় বেদনায়। কবি দেখেছেন গীর্জার বাইরে রক্তাক্ত পৃথিবী। দিনের পর দিন এভাবেই মানবতার মৃত্যু হয়েছে ক্রুশে। পৃথিবী আত্মহত্যায় মেতেছে । বাইরের পৃথিবীতে কামানের গর্জন শোনা যাচ্ছে। কবি ‘খৃষ্ট’ গ্রন্থের ‘বড়োদিন’ প্রবন্ধে লিখেছেন – “আমাদের জীবনে তাঁর জন্মদিন দৈবাৎ আসে, কিন্তু ক্রুশে বিদ্ধ তাঁর মৃত্যু সে তো আসে দিনের পর দিন। জানি আজ বিশেষ দিনে দেশে দেশে গির্জায় গির্জায় তাঁর জয়ধ্বনি উঠছে, যিনি পরম পিতার বার্তা এনেছেন মানবসন্তানের কাছে – আর সেই গির্জার বাইরে রক্তাক্ত হয়ে উঠছে পৃথিবী আত্মহত্যায়। দেবালয়ে স্তবমন্ত্রে তাঁকে আজ যারা ঘোষণা করছে তারাই কামানের গর্জনে তাঁকে অস্বীকার করছে, আকাশ থেকে মৃত্যুবর্ষণ করে তাঁর বাণীকে অতি ভীষণ ব্যঙ্গ করছে”।[৪৮] যীশু মানব সমাজে দীপ জ্বেলেছেন। অনাথ পীড়িতদের দুঃখ দূর করেছেন। প্রগাঢ় ভালবেসেছেন। তবুও দেখেছেন, হিংসাচ্ছন্ন পৃথিবীকে। রবীন্দ্রনাথ

তাঁর 'খৃষ্ট' গ্রন্থের 'খৃষ্ট' প্রবন্ধে লিখেছেন – "কী দানবতা আজ চার দিকে, কলুষে পৃথিবী আচ্ছন্ন – তবু বলতে হবে : স্বল্পমপস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ! এই বিরাট কলুষনিবিড়তার মধ্যে দেখা যায় না তাঁদের যাঁরা মানবসমাজের পুণ্যের আকর।"(৪৯)

অহিংসার এমন সত্য - শিক্ষা রবীন্দ্রনাথ অর্জন করেছিলেন কিশোর কালেই। পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে তিনি লাভ করেছিলেন উপনিষদের শিক্ষা। রাজা রামমোহন রায় এবং পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন ধর্মশিক্ষা। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের 'মানবসত্য' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন - "আমার জন্ম যে পরিবারে সে পরিবারের ধর্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের। উপনিষদ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর - আর সাধকদের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা।"(৫০) গান্ধিজির কিশোর কালের ধর্মশিক্ষাও এভাবেই ঘটেছিল। গান্ধিজি তাঁর আত্মজীবনী 'The Story of My Experiments with Truth' – গ্রন্থে লিখেছেন যে, তাঁর খুড়তুতো ভাই রামভক্ত ছিলেন। গান্ধির কাকা দুই ভাইয়ের জন্য রামরক্ষা পাঠ শেখানোর ব্যবস্থা করলেন – "Just about this time, a cousin of mine who was a devotee of the Ramayana arranged for my second brother and me to learn Ram Raksha."(৫১)

বাল্যকালের ধর্মশিক্ষা দুই মহাপুরুষকেই অহিংসার পুণ্যস্নানে পবিত্র করেছিল। রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধি দু'জনেই ঔপনিষদিক ভাবরসে অবগাহন করেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় ঋষির শান্তিমন্ত্র দুই মহাপুরুষের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করেছিল। শীলিত সংযম, ব্রহ্মচর্য এবং ত্যাগের মহিমা দুই হৃদয়কেই তপস্যা কঠিন করে তুলেছিল। 'ঈশ উপনিষদ' – এর সেই শ্লোক, যার তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ; ত্যাগের সঙ্গে ভোগ করবে। কারো ধনে লোভ করো না –

"তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্।"(৫২)

।। পাঁচ ।।

"A man who has realised his manhood, who fears only God, will fear no one else. Man – made laws are not necessarily binding on him."(৫৩)

মানুষের মনুষ্যত্ব যখন জাগ্রত হয়, তখন ঈশ্বর ছাড়া তিনি কাউকে ভয় করেন না। মানুষের তৈরি নিয়মে তিনি বাঁধা পড়েন না। মহাত্মা গান্ধি একথা লিখেছেন তাঁর 'Indian Home Rule (Hind Swaraj)' গ্রন্থে। স্বরাজ হল আত্মনিয়ন্ত্রণ। ব্যক্তি এবং জাতি দুঃখকে বরণ করেই বড় হতে পারে। গান্ধির মতে, স্বরাজ লাভ সম্ভব হবে অহিংস এবং অসহযোগ আন্দোলনের পথে। আত্মিক নির্ভরতা এবং মানবিক প্রেমের শক্তি স্বরাজ এনে দিতে পারে। স্বদেশের প্রতি ভালোবাসাই স্বরাজ লাভের উপায়। স্বনির্ভর সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন গান্ধিজি। সত্যাগ্রহী ব্যক্তি স্বরাজ লাভে অগ্রণী ভূমিকা

পালন করতে পারেন। সত্যাগ্রহ হল অবিচার , অত্যাচার, অসাম্যের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ। আত্মিক এবং নৈতিক প্রতিরোধও বটে। আমাদের এই মানুষের সমাজে মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। অহিংসার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হবে সেই সমাজ। গান্ধিজি লিখেছেন – "আগামী দিনের পৃথিবীতে যে সমাজ হবে বা যে সমাজ হওয়া উচিত তার আধার হবে অহিংসা। একে এখন দূরবর্তী, অব্যবহার্য, স্বপ্নময় বোধ হতে পারে কিন্তু এ একেবারে অসম্ভব নয়, কেননা আমরা এখানে এখনই তার প্রয়োগ করতে পারি।"[(৫৪)]

ব্রহ্মচর্য হল মন, বাক্য এবং দেহ – সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সামঞ্জস্য পূর্ণ সংযম। পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য হচ্ছে ব্রহ্মদর্শন। ব্রহ্মচর্যের মধ্যে শরীর, বুদ্ধি আত্মা রক্ষিত হয়। গান্ধিজি তাঁর 'The Story of My Experiments With Truth' – গ্রন্থের Brahmacharya – II –অধ্যায়ে লিখেছেন – "The knowledge that a perfect observance of brahmacharya means realization of brahman ...... Every day of the vow has taken me nearer the knowledge that in brahmacharya lies the protection of the body, the mind and the soul."[(৫৫)] গান্ধিজি মনে করেন, প্রকৃত মানবপ্রেম হল অহিংসা। সত্যাগ্রহীদের গুরুত্বপূর্ণ ব্রত হল – সত্য, অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য। শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র ভাণ্ডারি মহাশয় ব্রতগুলিকে বাংলা কবিতায় রূপ দিয়েছিলেন -

" অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য অসংগ্রহ।"[(৫৬)]

গান্ধিজি মনে করেন, বন্ধুক নিয়ে যুদ্ধ করা, আর তাকে সাহায্য করা একই মুদ্রার দুই পিঠ। তিনি তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে লিখেছেন – "I make no distinction, from the point of view of ahimsa between combatants and non – combatants."[(৫৭)]

স্বরাজ হল আত্মশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self – Rule or self control)। গান্ধিজি লিখেছেন – "1. Real home rule is self-rule or self –control. 2. The way to it is passive risistance : that is soul – force or love force. 3. In order to exert this force, Swadeshi in every sense is necessary."[(৫৮)]

গান্ধিজি সত্যাগ্রহকে শুদ্ধ, অহিংস এবং নতুন অস্ত্র বলেছেন – 'a novle weapon' [(৫৯)] তিনি আরও লিখেছেন – ব্যক্তির দুঃখ দূর করা তাঁর ধর্ম। "It is my duty to place before the people all the legitimate remedies for grievances. [(৬০)] গান্ধিজি মনে করেন, সত্যাশ্রয়ী জীবনবোধের প্রয়োজনে মানুষকে অহিংসা ধর্ম অবলম্বন করতে হয়। অহিংসা ছাড়া সত্য অর্জন করা সম্ভব নয়। আমৃত্যু গান্ধিজি সত্যের উপাসনা করেছেন। তিনি মনে করেছেন, সত্যকে লাভ করতে হয় আত্মশুদ্ধির দ্বারা। আত্মশুদ্ধি না থাকলে অহিংসার উৎসব ব্যর্থতায় পরিণত হয়। গান্ধিজি লিখেছেন

– "Without self – Purification the observance of the law of ahimsa must remain an empry dream."(৬১) গান্ধিজি লিখেছেন, অহিংসা হল নম্রতার শেষ সীমানা – 'Ahimsa is the farthest limit of humility."(৬২) টলস্টয় মানবজীবনে সমস্ত কৃত্রিমতা থেকে মুক্তির কথা বলেছেন। মানুষের অন্তর হবে সাদা। ঈশ্বরের বসবাস সেখানে। ঈশ্বরের কাছে গান্ধির প্রার্থনা তাঁর শৈশব ব্রতের অভ্যেস শুধু নয়, তা ঈশ্বরের করুণা ধারার মত পরিশ্রুত, যা টলস্টয়ের গ্রন্থপাঠের ফল।
গান্ধির অহিংস প্রতিরোধ প্রকৃতই 'দ্যা পাওয়ার অফ দ্য পাওয়ারলেস' – 'ক্ষমতাহীনের ক্ষমতা'। বর্তমান পৃথিবীতেও খুব প্রাসঙ্গিক এই ধারণা। দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যাণ্ডেলার বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী সংগ্রাম, পৃথিবীর বিভিন্ন মানবাধিকার আন্দোলন, এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া নারীবাদীদের নারী মুক্তি এবং নারী স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন প্রভৃতি এক অর্থে অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন। শক্তিমত্তার বিরুদ্ধে নির্জিত মানুষের অধিকারের লড়াইয়ে অহিংস প্রতিরোধ ছাড়া আর কী-ই বা থাকতে পারে। অহিংসা এবং অসহযোগ অন্যায়কারীর নিকট ব্যক্তিকে নত করে না। বরং স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষের আত্মোপলব্ধির বোধকে জাগ্রত করে। অহিংসার ধারণা প্রয়োগ করতে হলে সত্যাগ্রহীকে ধৈর্য ধরতে হবে। অধ্যাত্ম চেতনা এবং মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী হতে হবে। ক্ষমতাবানের অস্ত্র দুর্বলকে বিনষ্ট করে। কিন্তু আত্মশক্তি, আধ্যাত্মিকতা এবং মানবিক অস্ত্রকে ধ্বংস করা যায় না। নিরস্ত্র প্রতিরোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। ইংরেজদের অত্যাচারে গান্ধিজি হতাশ ছিলেন না। আধ্যাত্মবোধ, সত্যদর্শন এবং মানবিকতার অস্ত্র তাকে পরাক্রান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে অজেয় করে তুলেছিল। শুধু বর্তমান ভারতবাসী নয়, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ উত্তরপুরুষও তাকে একারণে স্মরণ রাখবে। ২০১১ সালে তৎকালীন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা বলেছিলেন, পৃথিবীতে গান্ধির আগমন না ঘটলে তাঁর রাষ্ট্রপতি হওয়ার স্বপ্ন অধরাই থেকে যেত। বারুদের গোলার থেকেও অনেক বেশি শক্তিশালী গান্ধির আদর্শ।

।। ছয় ।।

"আমাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন যাঁরা হিংস্রতাকে মন থেকে দূর করে দেখতে পারেন। এই হিংসাপ্রবৃত্তি স্বীকার না করেও আমরা জয়ী হব, একথা আমরা মানি কি। ...... কিন্তু এই যে একটা অনুশাসন মরব তবু মারব না, এবং এই করেই জয়ী হব – এ একটা মস্ত বড়ো কথা, একটা বাণী।"(৬৩) –মহাত্মার প্রতি রবীন্দ্রনাথের এ এক শ্রদ্ধার্ঘ্য। রবীন্দ্রনাথও অহিংসাকে সত্যরূপে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের উর্বর পলল মৃত্তিকায় অহিংসাকে ফুলে ফলে বিকশিত করেছেন মহাত্মাজি। গান্ধির প্রতি রবীন্দ্রনাথের এমন নম্র অঞ্জলি কবির সৃষ্টির নানা স্থানে মুক্তোর মত ছড়িয়ে রয়েছে –

১) "..... কিন্তু অদ্ভুত মনে হচ্ছে মহাত্মাজির অহিংস্র আত্মত্যাগী প্রয়াসের শান্তমূর্তি।"(৬৪)

২) "তাঁর জীবনের ইতিহাস দুঃখের ইতিহাস। দুঃখ অপমান ভোগ করেছেন কেবল ভারতবর্ষে নয়, দক্ষিণ-আফ্রিকায় কত মার তাঁকে মৃত্যুর ধারে এনে ফেলেছে। .... ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা , তপস্যার দ্বারা তিনি জয়ী হয়েছেন।"[৬৫]

৩) "সমস্ত ভারতবর্ষ কিরকম করে তাঁকে ভক্তি দিয়েছে; একটি নাম দিয়েছে – মহাত্মা। ...... যার আত্মা বড়ো, তিনিই মহাত্মা। তিনি আজ মৃত্যুব্রত গ্রহণ করেছেন ছোট - বড়োকে এক করবার জন্যে।"[৬৬]

৪) "জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো" গীতাঞ্জলির এই গানটি মহাত্মাজির প্রিয়।"[৬৭]

গান্ধিজি টলস্টয়ের মানবসেবায় বিশেষভাবে প্রাণিত হয়েছিলেন। অপরপক্ষে গান্ধি এবং রবীন্দ্রনাথের মনস্বিতা সমগ্র ভারতবর্ষকে আলোড়িত করেছিল। কার্ল মার্কসের মত মনীষী এবং টলস্টয় এই দুই যুগচিন্তক ইউরোপের এক বিস্ময়। সামাজিক অসাম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে টলস্টয় আমৃত্যু লড়াই করেছেন। কিন্তু তাঁর চিন্তার স্তর ভিন্নমুখী। ঈশ্বর বিশ্বাসী তিনি। আধ্যাত্মিক উত্তরণ ঘটেছিল তাঁর। নৈতিক জীবন এবং আধ্যাত্মচেতনাকে মানব কল্যাণে সমর্পণ করেছিলেন তিনি। এ কারণে গান্ধিজি তাঁকে শিক্ষক পদে বরণ করেছিলেন। টলস্টয়ের 'ভালবাসাই ঈশ্বর', 'ঈশ্বর সত্যকে দেখেন কিন্তু অপেক্ষা করেন' প্রভৃতি গল্পে তাঁর জীবনাদর্শ ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষত টলস্টয় তাঁর 'বোকা ইভান' গল্পে অত্যাচারী শত্রুর বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধের মাধ্যমে শান্তির সবুজ দ্বীপের আলোকবর্তিকা দেখিয়েছেন। হিংস্র অত্যাচারী শত্রুদের হৃদয় পরিবর্তিত হয়েছে। অহিংসার দ্বারা যে সমাজ পরিবর্তিত হতে পারে, একথা রাশিয়ার এই ঋষিপুত্র জানিয়েছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁর নিজের দেশ এমন কি বিশেষত ইউরোপ তার এই অহিংসা তত্ত্বকে গ্রহণ করে নি। রাশিয়ার চিত্তক্ষেত্রে তাঁর অঙ্কুরিত অহিংসার বীজ ভারতবর্ষের উর্বর পলল মৃত্তিকায় ফলবান হয়েছে। অনেক আঘাত সহ্য করে উত্তুঙ্গ হিমালয়ের মত গান্ধিজি অহিংসার মহাকাশকে নিজের মাথায় ধারণ করেছেন। পৃথিবীব্যাপী অহিংসার কচি সবুজ ঘাসের দিগন্ত বিস্তৃত সমারোহ গান্ধির উচ্চস্তরীয় চিন্তার ফল। এছাড়া গান্ধিজি John Ruskin এর 'Unto This Last' নামের ক্ষীণকায় গ্রন্থটি যে তাকে প্রভাবিত করেছিল, তা লিখেছেন। রাস্কিন লিখেছেন – "For, truly, the man who does not know when to die, does not know how to live."[৬৮] গান্ধিজি বাঁচার এমন অর্থ যথার্থই বুঝেছিলেন। গান্ধি প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রেম ও হিংসার উত্তরাধিকার বহন করে এনেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতে প্রেম ও অহিংসার উত্তর সাধক। ইউরোপের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' কাব্যের 'ঝড়ের খেয়া' ('৩৭' – সংখ্যক) কবিতায় লিখলেন –

"বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা।

....
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?”[৬৯]

অপরপক্ষে, গান্ধির সমগ্র জীবন ও কর্মই তাঁর তপস্যা। দুই মহাদেশের তিন কল্যাণব্রতীর সৃষ্টি এবং কর্ম মিলেমিশে সর্বমানবের চেতনাকে বৃহত্তর তাৎপর্যে মথিত করেছে। টলস্টয় ঋষি, গান্ধিজি ঋষিকুমার। টলস্টয়ের কাছে শ্রমিকের কাজ শ্রেষ্ঠ, আর গান্ধির কাছে কৃষকের। টলস্টয় চাষার জীবন যাপন করেন, গান্ধি চরকা কাটেন, স্বনির্ভর হওয়ার কথা বলেন, দেশীয় শিল্পের উজ্জীবন ঘটান – খাদি বোনার পরামর্শ দেন। আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে – শিল্পচর্চা করেন, ছবি আঁকেন, মমত্ব দিয়ে লালন করেন শ্রীনিকেতনের বহুমুখী কর্মধারাকে। টলস্টয় এবং গান্ধি পরস্পর পত্র বিনিময়ের মধ্য দিয়ে পরস্পরের সৃষ্টি কর্মকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আর গান্ধিজি শান্তিনিকেতনে এসেছেন, রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের বিশ্বভারতীকে দেখেছেন, দেখেছেন কবির বহুমুখী কর্ম পরিকল্পনাকে। মত বিনিময় করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন। তিন স্রষ্টাই এক মহৎভাব বৃত্তে কর্মমুখর থেকেছেন আমৃত্যু। শুধু সত্যাগ্রহ এবং অহিংসা নয়, টলস্টয় গান্ধির ভাবধারাকে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন এক মহান ঋষি সুলভ বিস্ময়ে। Romain Rolland তাঁর ‘Mahatma Gandhi’ গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন – “A little later we will discuss this magic word of ahimsa, the sublime message of India to the word.”[৭০] সমগ্র মানবসমাজকে অহিংসার উৎসবে অংশ গ্রহণের কথা বলেছেন গান্ধিজি। গান্ধির স্বদেশি আন্দোলনে শ্রদ্ধা পোষণ করতেন রবীন্দ্রনাথ। রোমাঁ রোল্যাঁ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন – “Tagore, too, praised this khaddar, or khadi.”[৭১] তিন স্রষ্টাই অহিংসাকে আধ্যাত্ম চেতনার সঙ্গে এক করে দেখেছেন। তিন জনেই অধ্যাত্মচেতনার পুণ্যতোয়া নীরে নিজেদের ধৌত করেছেন। তিনজনেই মনে করেছেন অহিংসা অধ্যাত্মচেতনার এক পরিপূর্ণ রূপ। তিন কর্মযোগীই গীতা, উপনিষদ, হিন্দুদর্শন, বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টের বাণীকে শাশ্বত বলে জেনেছেন। কোন অলৌকিক ঈশ্বর নন, মানুষের হৃদয়ই ঈশ্বরের আবাসভূমি – অধ্যাত্ম বোধের সোপান হল এই। তিন কর্মযোগীই এমন বিশ্বাস করেছেন। তিনজনের সত্য উপলব্ধিই অহিংসা এবং দাসত্বমুক্তির ইতিহাসকে প্রশস্ত করেছে। গান্ধিজি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে[৭২]। আজও ১০ই মার্চ দিনটি শান্তিনিকেতনে গান্ধি দিবস হিসেবে পালিত হয়। শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের মহাত্মা গান্ধী পরমত –সহিষ্ণুতা, অহিংসা এবং সাবলম্বন নীতি শিখিয়েছিলেন। সংগ্রাম ছাড়া বৃটিশদের কাছ থেকে কিছুই লাভ করা যেতো না, সেই সংগ্রাম অহিংস হলেও নয়। ১৯১৭ সালের ১৬ই জুন [ভারতরক্ষা আইনের

(১৯১৫) অজুহাতে] শ্রীমতী বেশান্তকে কারারুদ্ধ করা হল। দেশব্যাপী প্রতিবাদ সভার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন – 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরি'[৭৩] গানটি।

গান্ধির অহিংস (Non –violence) আন্দোলন, যা দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষের সংগ্রামের মুখ হয়ে উঠেছিল, তাই ছিল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance)। গান্ধি তা পেয়েছিলেন টলস্টয়ের কাছ থেকে। তিনি তাঁর রচনায় লিখেছেন – "It marks the rise and growth of Passive Resisitance, which has attracted world –wide attention. The term does not fit the activity of the Indian Community during the past eight years. Its equivalent in the vernacular(Satyagraha), rendered into English, means Truth – Force. I think Tolstoy called it also Soul – Force or Love – Force, and so it is."[৭৪]

ভারতবাসী পাশ্চাত্যকে কি দিতে পারে? গান্ধি এবং রবীন্দ্রনাথই বা পাশ্চাত্যকে কি দিয়েছেন? দিয়েছেন অহিংসা মন্ত্রের সজীব উপহার। রবীন্দ্র –বন্ধু সি.এফ.এণ্ড্রুজ সাহেব তাঁর 'Mahatma Gandhi at work' – গ্রন্থে লিখেছেন – রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধি এই দুই স্রষ্টা আমাদের যুগের দুই জীবন্ত কিংবদন্তী। এই দুই মহাপুরুষকে আদর্শ করে পশ্চিম পূর্বকে উপলব্ধি করতে পারেন – "Tagore and Gandhi – are the living Examples in our own generation whereby the West may test its capacity to understand the East."[৭৫]

টলস্টয় – রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধি এই তিন মহাস্রষ্টাই বিশ্বমানবের অন্তরে রৌদ্রকরোজ্জ্বল অহিংস আকাশের প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। মানবতার মুক্তি তীর্থে অহিংস সত্যের দীপালোক মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। যুদ্ধ দগ্ধ অশান্ত পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক অহিংসার সবুজ দ্বীপ উপহার দিয়েছেন। তিনজন মহাস্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য থাকলেও তিনজনই মানুষের চৈতন্যে অহিংসাকে তীর্থভূমি রূপে স্থান দিয়েছেন। মানুষের হৃদয় কর্ষণ করে অহিংসার সোনালী ফসল ফলিয়েছেন। Romain Rolland যথার্থই বলেছেন – "Tagore always looked upon Gandhi as a saint, and I have often heard him speak of him with veneration. When, in referring to the Mahatma, I mentioned Tolstoi, Tagore pointed out to me – and I realize it now that I know Gandhi better – how much more clothed in light and radiance Gandhi's spirit is then Tolstoi's. With Gandhi everything is nature – modest, simple, pure – while all his struggles are hallowed by religious serenity, whereas with Tolstoi everything is proud revalt against pride, hatred against hatred, passion against passion. Everything in Tolstoi is violence, even his doctrine of non – violence."[৭৬]

তথ্যসূত্র :

১) ঈশোপনিষৎ, বেদগ্রন্থমালা (ঊনবিংশ খণ্ড), উপনিষৎ (প্রধান), প্রকাশক – স্বামী সুপর্ণানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা ১৪১৫, পৃ. ৩

২) Pandit Sukhalal Sanghvi, D.Litt., Some Fundamental Principles of Jainism, (Article), The Cultural Heritage of India, Volume – I, The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Gol park, Kolkata, 2015, PP. 434-436

৩) Satkari Mookerjee, Buddhism in India life and thought – The Cultural Heritage of India, Volume – I, The Ramakrisna Mission Institute of Culture, Gol park, Kolkata, 2015, P. 576

৪) ধর্মানন্দ কোসম্বি, ভগবান বুদ্ধ, অনুবাদ – চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ২০১৭ পৃ. ১৯২।

৫) পূর্বোক্ত ,পৃ. ১৯৩

৬) Damodar Dharmand Kosambi, an Introduction to the study of Indian History, Popular Prakashan, Bomby, 2002, P. 170.

৭) Romain Rolland, Mahatma Gandhi, Srishti Publishers, C.R.Park, New Delhi, 2013, PP. 104-105

৮) Leo Tolstoy, The Kingdom of God is Within You, Prabhat Prakashan, New Delhi, 2017, P. 356

৯) Leo Tolstoy, War and Peace, Finger Print Classics, Prakash Books India Pvt . Ltd, New Delhi, 2019, P. 1187

১০) ibid, P. 1187

১১) ibid, P. 1113

১২) Mohandas Karamchand Gandhi, Was it a Threat? The story of my Experiments with Truth (Book), Om Books International, Noida, Uttar Pradesh, India, 2019, P. 428

১৩) ibid, P. 429

১৪) ibid, Farewell, PP. 567-568

১৪.ক) M.K. Gandhi, Letter on the way to Calcutta (19.02.40), উদ্ধৃতিটি গৌতম ভট্টাচার্য প্রণীত রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজি ও হরিজন পত্রিকা, সম্পা. গৌতম ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪, পৃ ৯২ গ্রন্থ থেকে নেওয়া

১৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিসর্জন, রবীন্দ্র – রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৫৯৩
১৬) পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৭
১৭) Kalidas Nag, Tolstoy and Gandhi, Patna, India, 1950, P. 74
১৮) শশিভূষণ দাশগুপ্ত, টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ, সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৭৩
১৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাত্রী (পরিশিষ্ট), ইউরোপ যাত্রীর ডায়ারি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৪৯০
২০) Leo Tolstoy, The Slavery of Our Times, British Library, 2013, P. 92
২১) Leo Tolstoy, Indian Home Rule (Hind Swaraj), Promilla and Co., Publishers New Delhi and Chicago, 2020, P.110
২২) Leo Tolstoy, The Slavery of Our Times, Author's Preface, British Library, 2013, PP. 19-20
২৩) ibid, P.4
২৪) Karl Marx, The General Formula for Capital, Das Capital (Book), Includes Vol –I, II, And III, Finger Print Classics, Prakash Books India Private Ltd. 2020, P. 92
২৫) Leo Tolstoy, The Slavery of Our Times, (Book), Chapter XII, The Essence of Legislation is Organised Violence, British Library, 2013, P. 92
২৬) Leo Tolstoy, The Kingdom of God is Within You, Prabhat Prakashan, New Delhi, 2017 P. 154
২৭) ibid
২৮) ibid, P. 155
২৯) ibid, P. 346
৩০) ibid, P. 345
৩১) ibid, P. 57
৩২) ibid, P. 94-95
৩৩) Leo Tolstoy, The Pathway of life, Part – I, International Book Publising Company 1919, P. 147
৩৪) ibid, P. 144

৩৫) ibid, P. 143

৩৬) Leo Tolstoy, War and Peace, Finger Print ! Classics, Prakash Books India Pvt. Ltd., New Delhi, 2019, PP. 1077- 1078

৩৭) leo Tolstoy, Anna Karenina, Penguin Books, London, England, 2006, P. 768

৩৮) Paul Birukoff, Leo Tolstoy His Life and work, (The Biography of Leo Tolstoy), Vol. I, Charles scribner's Sons, 1906, P. 370

৩৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধজন্মোৎসব (সংযোজন), পরিশেষ, রবীন্দ্র –রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২১৫

৪০) পূর্বোক্ত, পত্রপুট, 'সতেরো' সংখ্যক কবিতা, দশম খণ্ড, পৃ. ১৩২-১৩৩

৪১) পূর্বোক্ত, বুদ্ধভক্তি, নবজাতক, দশম খণ্ড, পৃ ৬৬৮

৪২) পূর্বোক্ত, মানুষের ধর্ম (প্রবন্ধ), দশম খণ্ড, পৃ. ৬৩৯

৪৩) পূর্বোক্ত, বুদ্ধদেবের প্রতি, পরিশেষ, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ২০৫

৪৪) পূর্বোক্ত, যিশুচরিত, খৃষ্ট (প্রবন্ধ গ্রন্থ), চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৩৪০

৪৫) পূর্বোক্ত, খৃষ্টোৎসব, খৃষ্ট (প্রবন্ধ গ্রন্থ), পৃ. ৩৪৪

৪৬) তদেব, পৃ. ৩৪৫

৪৭) পূর্বোক্ত, মানব পুত্র, পুনশ্চ (কাব্যগ্রন্থ), অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৩১৮

৪৮) পূর্বোক্ত, বড়োদিন, খৃষ্ট (প্রবন্ধ গ্রন্থ), চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৩৪৮

৪৯) পূর্বোক্ত, খৃষ্ট, খৃষ্ট (প্রবন্ধ গ্রন্থ), চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৩৫০

৫০) পূর্বোক্ত, মানব সত্য, মানুষের ধর্ম (প্রবন্ধ গ্রন্থ), দশম খণ্ড, পৃ. ৬৫৩

৫১) Mohandas Karamchand Gandhi, The story of my Experiments with Truth An Auto Biography, Om Books International, Noida, Uttar Pradesh, India, 2019, P. 36

৫২) অতুলচন্দ্র সেন ও অন্যান্য, ঈশ উপনিষদ, উপনিষদ (অখণ্ড সংস্করণ), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৭

৫৩) M.K.Gandhi, Indian Home Rule (Hind Swaraj), Ed. by S.R. Mehrotra, Promilla and Co, Publishers, New Delhi and Chicago, 2020, P. 192

৫৪) কানাইলাল দত্ত, গান্ধী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৬৯

৫৫) Mohandas Karamchand Gandhi, The Story of My Experiments with Truth An Auto Biography, Om Books International, Noida, Uttar Pradesh, India, 2019, P. 231

৫৬) কানাইলাল দত্ত, গান্ধী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৭৪
৫৭) Mohandas Karamchand Gandhi, The Story of My Experiments with Truth An Auto Biography, Om Books International, Noida, Uttar Pradesh, India, 2019, P. 396
৫৮) M.K.Gandhi, Indian Home Rule (Hind Swaraj), Ed. by S.R. Mehrotra, Promilla and Co, Publishers, New Delhi and Chicago, 2020, P. 221
৫৯) Mohandas Karamchand Gandhi, The Rowlatt Bills and my Dilemma, The Story of My Experiments with Truth (An Autobiography), Om Books International, Noida, Uttar Pradesh, India, 2019, P. 514
৬০) ibid, Was it a Threat? PP. 428
৬১) ibid, Farewell, P. 567
৬২) ibid, Farewell, P. 568
৬৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্র –রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২০৮
৬৪) পূর্বোক্ত, চৌঠা আশ্বিন, মহাত্মা গান্ধী, পৃ. ২১৩
৬৫) পূর্বোক্ত, মহাত্মাজির পুণ্যব্রত, মহাত্মা গান্ধী, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ২১৪
৬৬) তদেব
৬৭) পূর্বোক্ত, ব্রত উদ্‌যাপন, মহাত্মা গান্ধী, পৃ. ২১৮
৬৮) John Ruskin, Unto This Last, Cosimo classics, New York, 2006, P. 18
৬৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঝড়ের খেয়া, ('৩৭' সংখ্যক কবিতা), বলাকা (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২৮৮
৭০) Romain Rolland, Mahatma Gandhi, Srishti Publishers and Distributors, New Delhi,
2013, P. 6
৭১) ibid, 62
৭২) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩২৬, পৃ. ৫০১
৭৩) পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০২

৭৪) Mahatma Gandhi, The Essential Writings, Edited by Judith M.Brown, Oxford University Press, Oxford, New York, 2008, P. 309

৭৫) C.F. Andrews, Mahatma Gandhi At Work, London, 1931

৭৬) Romain Rolland, Mahatma Gandhi, Srishti Publishers and Distributors, C.R.Park, New Delhi, 2013, P. 84

ভারতীয় সমাজে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা ও কর্মযোগ

অক্ষয় দত্ত
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : সমগ্র সমাজের কল্যাণের জন্য ও যুব সম্প্রদায়কে গড়ে তোলার জন্য এই পৃথিবীতে মহামানবের আবির্ভাব হয়- আর তিনি হলেন ভারতের বীর তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ(১৮৬৩ – ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ)। আমাদের কাছে তিনি এক শক্তির প্রতীক। জ্বলন্ত অগ্নি-পিণ্ডের ন্যায় সমস্ত কুসংস্কারকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছিলেন। মৃতকে দিয়েছিলেন মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্র, দুর্বলকে দিয়েছিলেন উজ্জীবনের স্বপ্ন, আর সমাজকে দিয়েছিলেন তাঁর জীবন অর্থাৎ 'বিবেক জীবন'। বিবেকানন্দের 'কর্মযোগ' সম্পর্কে সহজ সরল ব্যাখ্যা যা জনমানসে আলোড়ন সৃষ্টি করে। যা আস্তিক এবং নাস্তিক উভয় মানুষজনের কাছেই সমানভাবে গ্রহনযোগ্য। সত্যিই তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করে সাধারণ যুব সমাজ কে যা দিয়ে গিয়েছিলেন - তা ভেবে শেষ করা যায় না।

সূচক শব্দ : কর্মযোগ, বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ ভাবনায়- শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম, নারী।

মূল আলোচনা

ভারতীয় সমাজ-জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান যে সব-সময়ের জন্যই প্রাসঙ্গিক, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তথাপি তিনি ভাগবত গীতায় উল্লিখিত 'কর্মযোগ'কে বিস্তারিত আলোচনা করে ভারতীয় সমাজে যেভাবে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন তা এককথায় অতুলনীয় ।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্যের নারীদের মাহাত্ম্য তুলে ধরেছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে। শিকাগো ধর্ম মহাসভার অধিবেশন (১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ) চলাকালে স্বামী বিবেকানন্দ একটি বিশেষ সভায় প্রাচ্যদেশের নারীদের বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে আলোচনা করেনঃ কোনো জাতির উন্নতির শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি নারীদের প্রতি তার মনোভাব। প্রাচীন গ্রীসে স্ত্রী – পুরুষের মর্যাদায় কোন পার্থক্য ছিল না, পূর্ণ সমতার ভাব ছিল। কোনো হিন্দুও বিবাহিত না হলে পুরোহিত হতে পারেনা; ভাবটা এই যে – অবিবাহিত পুরুষ অর্ধাঙ্গ ও অসম্পূর্ণ। পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যই পূর্ণ নারীত্ব। সম্ভবত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নারীদের চেয়ে হিন্দুনারীরা বেশি ধর্মশীল এবং আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন। যদি আমরা চরিত্রের এইসব সৎগুন রক্ষা করতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নারীদের বুদ্ধিবৃত্তির পুষ্টিসাধন করতে পারি, তাহলে ভবিষ্যতে হিন্দুনারী জগতের আর্দশ স্থানীয়া হবেন।[১]

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনায় ধর্ম কি? দেশ- কাল হিসেবে মানুষের মধ্যে এক এক জায়গায় এক একটা ধর্মের প্রচলন হয়েছে। কিন্তু মানুষের একটা ধর্ম আছে, কর্তব্য আছে, আকাঙ্ক্ষা, আকুতি আছে জীবনের। এই আকাঙ্ক্ষার, আকুতির প্রাপ্তির যে পথ, তাই ধর্মপথ। এরকম যেখানেই হয়, যাদেরই হয় সেখানে তাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান কোন পার্থক্য নেই। এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন অনেক ভাবে, তাঁর দৃষ্টিতে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি দুটোকে জয় করতে পারলেই ধর্মলাভ। এটা শক্তিদায়ী – যথার্থ শক্তি দেয়, তাই আসল ধর্ম। যা জীবনকে পশুস্তর থেকে দিব্যস্তরে উন্নীত করে তাই ধর্ম।[২] ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।[৩]

মানুষ যথার্থ সংস্কৃত হলে তাঁর জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি দুটোই বদলে যায়, পরিস্ফুট হয়, উন্নত হয়। মনুষ্যত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সুকুমার বৃত্তি, সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হয়। বস্তুর কার্যকারিতা বা উপযোগ মাত্র আর তাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারেনা। সবকিছুর মধ্যেই সে সৌন্দর্যের অন্বেষণ করে। বিবেকানন্দ বিশেষ করে বলেছেন, শিক্ষার সঙ্গে সাধারণকে সংস্কৃতি দিতে হবে, কারণ সংস্কৃতিই নানাভাবের অভিঘাতকে প্রতিহত করতে পারে। ফলে জীবন-যাপন ও পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে একটা মৌল পরিবর্তন আসে – সৌজন্য, সৌহার্দ্য, প্রীতি, সহানুভূতি সংস্কৃতিবানের আচরণকে সুন্দরতর করে।

তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি বলেছেন, "তোমাকে ক্রমশ ভিতর হইতে বাহিরের দিকে বিকশিত হতে হইবে, ইহা কেহই তোমাকে শিখাইতে পারেনা। তোমার নিজের অন্তরাত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন শিক্ষক নাই... যাঁহার হৃদয়- বেদ খুলিয়া গিয়াছে, তাঁহার কোন গ্রন্থের প্রয়োজন হয় না। গ্রন্থের একমাত্র কাজ হইল অন্তরে আকাঙ্খা সৃষ্টি করা। গ্রন্থগুলি তো অন্যের অভিজ্ঞতা মাত্র।" আসলে যা শিখলে জীবন সুখময় হয়, তাহাই শিক্ষা। যার দ্বারা বাল্যকালের আনন্দ যৌবনে নিরানন্দে পরিনত হবে না, আবার যৌবনের সুখ পৌঢ় বয়সে এবং পৌঢ় বয়সের সুখ বার্ধক্যে দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে না, তাহাই শিক্ষা। মানুষের ভিতরে যে পূর্ণত্ব প্রথম থেকেই আছে, তারই প্রকাশ-সাধনকে বলে শিক্ষা। তবে জীবিকার জন্য অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা, শিক্ষার সামান্য এক অংশমাত্র। বুদ্ধিবিকাশের জন্য বিজ্ঞান- দর্শন- ধর্মশাস্ত্র - সাহিত্য- সঙ্গীত- শিল্প প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান আবশ্যক, কিন্তু শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন বা মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন। চরিত্র মহৎ না হলে সকল শিক্ষাই ব্যর্থ হয়। ছাত্র ও যুব সমাজের জন্য দিক নির্দেশ করে গিয়েছেন, তারা যেন, - ১) নিজের হিত, ২) ভারতের হিত, ৩) সমগ্র মানব সমাজের হিতের দিকে দৃষ্টি রেখে পথচলে। বিবেকানন্দের প্রাণের আগুনে সবাই জ্বলে উঠতে পারেন, কিন্তু শর্ত একটাই- 'তোমাদের মন ও মুখ এক হোক – ভাবের ঘরে চুরি যেন একদম না থাকে।' এবং এইভাবে বিবেকানন্দের কাছে বা

কাজে অর্থাৎ তার 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা ব্রতের' যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ বা আত্মসমর্পিত হলে তাঁদের আত্মজাগরণও অবধারিত। বিবেকানন্দ আত্মতত্ত্বের কথা বলেছেন। তিনি বলছেন- "কেবল বেদান্তেই সেই মহান তত্ত্ব নিহিত, যাহা সমগ্র জগতের ভাব-রাশিকে আমূল পরিবর্তিত করিয়া ফেলিবে এবং বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের সামঞ্জস্য বিধান করিবে।"[৪]

সমাজ সেবার পরিকল্পনা দিয়েছিলেন স্বামীজী নিজে। মূর্খ দারিদ্রের সেবা, নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, রোগীকে ঔষধ দেবার মত সেবাকাজ স্বামীজীর নির্দেশিত কার্যের মধ্যেই পড়ে। তবে তিনি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন যে কাজের উপর সেটা হল, মানুষকে ভাল ভাব দেওয়া,- এমন ভাব যাতে মানুষ নিজেকে উন্নত করতে পারে। সমাজ সংসারে অনেকের সেরকম উন্নত হবার উপযোগী ভাব নেই। তাঁরা অভাবী সত্যি- সত্যিই। শুধু টাকা নেই যার, পেটে খেতে পায় না যে সেই অভাবী নয়। অ-ভাবী অর্থাৎ ভাবের ঘাটতি, অপ্রতুলতা যার সেও অভাবী। স্বামীজীর চিন্তায় এই অভাবীকে সেবা করাই সব থেকে বড় সমাজসেবা। বিবেকানন্দের এই আহ্বানে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবাসী ও বিশ্ববাসী জেগে উঠতেই পারেন। এভাবে স্বামীজীর আর্দশকে মানুষ যখনই সন্মান দিয়েছে – তখনই তিনি শক্তি দিয়েছেন। সেই শক্তির পথ কেবল এক ঝোঁকা নয়। তা কোনও দৈহিক পক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণ মনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে। ভারতবর্ষের যুবকদের মধ্যে যে সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই, তার মূলে আছে স্বামী বিবেকানন্দের সেই বাণী, - "যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়।" আত্মবিস্মৃত মানুষের তিনি আশাভরসা ও প্রেরণাদাতা। নব প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত করার আশ্রয়স্থল। এমনিভাবেই যদি আত্মজাগরণ হয় সেই আদর্শ পুরুষের আহ্বান ধ্বনিতে তবেই তো তাঁর কাছে নিঃশর্ত নির্ভর আত্মসমর্পণের জন্য প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে -

'জীবন সঁপিয়া, জীবনেশ্বর,
পেতে হবে তব পরিচয়;
তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে
সকল শঙ্কা করি জয়।'

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।[৫]

বিবেকানন্দ ভাবনায় কর্মযোগঃ

'কর্মযোগ' কথাটির অর্থ হল,- গীতায় নির্দিষ্ট নিষ্কাম, অর্থাৎ ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে কর্মের দ্বারা আত্মোন্নতিবিধান। স্বামী বিবেকানন্দের লেখা একটি বইয়ের নাম হল- 'কর্মযোগ'। এই বইয়ের মূল বিষয়বস্তু হল- কর্ম ও কর্মযোগ। এখানে বিবেকানন্দ ভগবতগীতার 'কর্মযোগ' ধারণাটি আলোচনা করেছেন। এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা অত্যন্ত প্রয়োজন যে, কর্মযোগ আলোচিত বিষয় কেন? সমাজে এর প্রয়োজনীয়তা কি? বিবেকানন্দ তাঁর 'কর্মযোগ' বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই জায়গাটির মূল ধারণা ব্যক্ত

করেছেন, সেটি হল-“যদি কেও দর্শনের একটা সূত্রও না পাঠ করে, যদি সে ঈশ্বরের অস্তিত্বেই না বিশ্বাস করে, এবং যদি সারা জীবনে একবারও ঈশ্বর আরাধনা না করে, তবু শুভ কর্মসমূহের সরলক্ষমতা তাকে সেই অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে যেখানে পরের জন্য সে তার জীবন ও অন্য সব কিছুই উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। এক্ষেত্রে একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি তার আরাধনার মাধ্যমে আর একজন দার্শনিক তার জ্ঞানের মাধ্যমে সেই বিন্দুতে পৌঁছতে সক্ষম। সুতরাং তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে দার্শনিক, কর্মী ও ভক্ত সকলে একই বিন্দুতে মিলিত হয়; আর সেই বিন্দুই হচ্ছে আত্মোৎসর্গীকৃত হওয়া।”[৬] অর্থাৎ কর্মযোগ হল কর্মফলের আশা না করে সম্পূর্ণ সৎ এবং নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করে মুক্তিলাভ করিবার একটি ধর্ম ও নীতিপ্রনালী। তবে কর্মযোগীর কোনো প্রকার ধর্মমতে বিশ্বাস করার আবশ্যিকতা নেই। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করিতে পারেন, কোনো প্রকার দার্শনিক বিচার ও আত্মা সম্বন্ধে অনুসন্ধান না করিতে পারেন, তাতে কিছুই আসে যায় না। তাঁহার বিশেষ উদ্দেশ্য নিঃস্বার্থপরতা লাভ করা এবং তাঁহাকে নিজ চেষ্টাতেই উহা লাভ করিতে হইবে। তাঁহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই উহার উপলব্ধি, কারণ জ্ঞানী যুক্তিবিচার করিয়া বা ভক্ত ভক্তির দ্বারা যে সমস্যা সমাধান করিতেছেন, তাঁহাকে কোনোপ্রকার মতবাদের সহায়তা না লইয়া কেবল কর্মদ্বারা সেই সমস্যারই সমাধান করিতে হবে।[৭]

'কর্ম'- শব্দটা আমাদেরকে 'কার্য্য' এই হিসেবে দেখতে হবে। মানবজাতির চরম লক্ষ্যই হল জ্ঞানলাভ। কোনো ব্যক্তির চরিত্রই হল তারই মনের প্রবণতা সমূহের সমষ্টিমাত্র এবং 'মন'ই হল সমস্ত জ্ঞানের উৎসস্থল। যদি আমরা ধীরভাবে নিজেদের অন্তঃকরণকে অধ্যয়ন করি, তবে দেখব, আমাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, নিন্দা-সুখ্যাতি, আশীর্বাদ-অভিসম্পাত এই সমস্তগুলি আমাদের মনের উপর বহির্জগতের নানা ঘাত-প্রতিঘাত থেকে উৎপন্ন। এসবের ফলেই আমাদের বর্তমান চরিত্র গঠিত হয়; এই সমুদয় ঘাত-প্রতিঘাত গুলিকে একত্রে 'কর্ম' বলে। বিবেকানন্দের কথায়- “যদি কারও চরিত্র বিচার করতে হয়, তবে তাঁর কোনো প্রখ্যাত বড় কার্য্য নয়, তাঁহার অতি সামান্য কার্য্য করিবার সময় লক্ষ্য করিতে হবে, ইহাতেই মহৎ লোকের প্রকৃত চরিত্র বোঝা যাবে। সকল অবস্থাতেই যাহার চরিত্রের মহত্ত্ব লক্ষিত হয়, তিনিই প্রকৃত মহৎ লোক।”[৮]

আর 'যোগ' কথার অর্থ হল- জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন। সকল দেশেই এমন কতকগুলি ব্যক্তি আছেন, যারা জগতের জন্য সুসন্তান; ইঁহারা কার্যের জন্যই কার্য করেন। ইঁহারা নাম যশের কাঙাল নন, অথবা স্বর্গেও যেতে চান না।(৯)

কর্মের কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। তবে তা ভালো না খারাপ তা আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে। কারণ কর্মের প্রভাব আমাদের ওপর পড়ে এবং আমাদের চরিত্র নির্ধারণ করে। কোনো কাজ কি ভাব নিয়ে করা হচ্ছে সেই প্রভাবই আমাদের চরিত্রের ওপর পড়ে। নিষ্কাম কর্মই মূল কথা, তবে যিনি নিষ্কাম কর্ম করতে

পারবেন না, তিনি স্বকাম ভাবেই কর্ম করতে পারেন। আসলে স্বকাম কর্ম করতে করতেই নিষ্কাম কর্মের ভাব আসবে। কিন্তু প্রতিটি কাজ নিষ্ঠার সাথে সচেতন ভাবে করতে হবে, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে করতে হবে, যা আমাদের চরিত্রকে আরো সুদৃঢ় করবে। কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিষ্কাম কর্ম করতে করতেই – সে নিজের ভেতরের মধ্যে থাকা পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারবে। অর্থাৎ ভেতরে থাকা 'আমি'কে উপলব্ধি করতে পারেন, বাইরের/বাহ্যিক 'আমি'কে নয়। কর্মের দ্বারা আমরা যখন পরমাত্মার সাথে যুক্ত হচ্ছি, সেই পদ্ধতিকেই আমরা বলব কর্মযোগ।

তাহলে কর্ম কাকে বলব? -যেই কাজগুলো করার সময় কর্তা সচেতন থাকেন তাকেই বলব- 'কর্ম'। এই কর্ম কিভাবে চরিত্রের ওপর প্রভাব ফেলে? যেমন, ভালো কাজ, মন্দ কাজ এগুলো বাইরের স্থূলরূপ আর মনের বা চিন্তার সূক্ষ্মরূপ। এই চিন্তা আমাদের চিত্তের ওপর ছাপ তৈরি করে। মানে শুভ-অশুভ কাজ গুলোর ছাপ আমাদের চিত্তের ওপর প্রভাব ফেলে। অর্থাৎ চিন্তা ও কর্ম পারস্পরিক সম্পর্কিত। আর এই কাজগুলো দ্বারাই ব্যক্তিত্ব তৈরি হচ্ছে। কর্ম আমাদের চরিত্র বা ব্যক্তিত্বের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলে। কোনো কাজ বা চিন্তা আমরা যখন বারবার করি, তাকেই বলা হবে সংস্কার। প্রেমযুক্ত কাজ সব-সময় মধুর হয়, অর্থাৎ ভালো মনোভাব সম্পন্ন হয়ে কাজ করা আমাদের কর্তব্য। বিবেকানন্দ মহাশয় কোনো কাজকে ছোট বা বড় করেননি। পরোপকারে উপকার সবচেয়ে আমাদেরই বেশি, - কারণ সেখানে প্রত্যাশা না থাকলে ফলভোগ করতে হয় না, যা থেকে হয় মুক্তি অর্থাৎ নিষ্কামে কর্ম করা। পরোপকার মানে ঈশ্বরকে এবং সেই ব্যক্তিকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, যে সেই ব্যক্তি আমাদিগকে কর্ম করার সুযোগ দিয়েছে।

তাহলে কর্ম কিভাবে আমাদেরকে মুক্ত করে? আমরা আমাদের কোনো কর্মের যদি ফলাফলের ওপর মনোনিবেশ করে কর্ম করি, তাহলে তার একটা শুভ-অশুভ কর্মফলের প্রারব্ধ তৈরি করে। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম কর্মফল সৃষ্টি করতে পারে না। যার ফলে তিনি পরমাত্মার সাথে মিলিত হন, কেননা তাকে আর কর্মের শুভ-অশুভ ফলাফল ভোগ করতে হয় না। আর তখনই হয় মোক্ষলাভ বা মুক্তি।[১০],[১১],[১২]

বিবেকানন্দের কথায়- "যিনি অর্থ বা অন্য কোনোরূপ অভিসন্ধিশূন্য হইয়া কার্য করেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে কার্য করেন আর মানুষ যখনই ইহা করিতে সমর্থ হয়, তখন সেও একজন বুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তাঁহার ভেতর হইতে এরূপ কার্য্যশক্তির প্রকাশ হইবে, যাহাতে জগতের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করিয়া ফেলা যাইতে পারে। ইহাই কর্মযোগের আদর্শ।"[১৩]

পরিশেষে বলা যায় যে, কর্মযোগের মূল যে দিক, যার জন্য এটি জনমত নির্বিশেষে সবার কাছেই গ্রহনযোগ্য, যেখানে আবশ্যকতা নেই ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস নাও করতে পারেন। তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য নিঃস্বার্থপরতা লাভ করা,- যা তাঁকে নিজের চেষ্টাতেই লাভ করতে হবে।

তথ্যসূত্র :

১) স্বামী লোকেশ্বরানন্দ,(১৯৯৩), পরিব্রাজক স্বামীজী দেশে ও বিদেশে, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, পৃ.১০৬।

২) স্বামী বিবেকানন্দ,(২০০৫), আমার ভারত অমর ভারত, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা।

৩) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা – চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৩৮,ষষ্ঠ খন্ড, পৃ.৪০০।

৪) স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতে বিবেকানন্দ -সপ্তদশ সংস্করণ, ১৩৮৮, পৃ.২৭।

৫) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ,(১৯২৫), পূরবী কাব্যগ্রন্থের সুপ্রভাত কবিতা, পৃ.২৫১-৫৪।

৬) স্বামী বিবেকানন্দ,(১৩১৮),কর্মযোগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৃ.১১০-১১২।

৭) তদৃশ, পৃ.১৩৪-৪১।

৮) তদৃশ, পৃ.০৫।

৯) তদৃশ, পৃ.১০।

১০) আলোচনা, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, ১৪.০৩.২০১৯, https://youtu.be/0bdds5USE3A

১১) আলোচনা, অধ্যাপক অরিজিৎ সরকার, ১৮.০৭.২০১৯, https://youtu.be/Hh0VFm7djSg

১২) আলোচনা, স্বামী একরূপানন্দজী, ২২.০৭.২০২০, https://youtu.be/hdQmg5Hye6I

১৩) স্বামী বিবেকানন্দ,(১৩১৮),কর্মযোগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৃ.১৬৪।

নবনীতা দেবসেনের অ্যালবাট্রস্ : নারীর যাত্রাপথের এক ভিন্ন স্বর

অমিত অধিকারী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : প্রচলিত ভাবনার বিপরীতে নারীর যাত্রাপথের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে এই উপন্যাসে। উঠে এসেছে নারীর হয়ে ওঠার পথের প্রত্যেক আড়ালের কথা। নারীজীবনের স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের করুণ ইতিহাস আর তা থেকে উত্তরণের গল্প। পদ্মিনী মাসি ও পিউ'এর জীবনের আপাত বিরুদ্ধতার আড়ালে আড়ালে সম্পূর্ণ নারীজীবনই এখানে প্রকাশিত হয়েছে। একদিকে পদ্মিনী মাসির জীবনকে উল্লাসের সাথে চূড়ান্ত ভোগ করা অন্যদিকে পিউয়ের জীবনকে মধ্যবিত্ততার মূল্যবোধে মাপা – এই দ্বন্দ্ব নিয়েই আলবাট্রস। শিল্পবোধে, ভাষা ব্যাবহারে, উপমার প্রয়োগে তা হয়ে উঠেছে কালোত্তীর্ণ।

সূচকশব্দ: নারীজীবনবোধ, যৌনতা, আড়াল, মানসিক বিকার, মুক্তিকামী ডানা, ঘর বাঁধা, বাঙালি নারীভাবনা।

মূল রচনাঃ বাংলা সাহিত্যে নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮-২০১৯) মানেই প্রাণোচ্ছ্বল এক কথা-মানবী। যাঁর চেতনায় এসে মিশে যায় কবির আবেগ, গবেষকের শাণিত যুক্তিবোধ, রূপকথাকারের বিস্ময়, অধ্যাপকের নিয়মানুবর্তিতা ও ঔপন্যাসিকের ব্যাপ্ত দৃষ্টি। সে জীবনে কত বাঁকবদল, আর লেখিকা নবনীতা সেই সবকিছুকেই মোকাবিলা করেছেন। কখনও হেরে গেছেন কিন্তু হারিয়ে যাননি। সফলতার স্বপ্ন দেখাই হয়তো জীবনযুদ্ধে তাঁকে জিতিয়েছে। ঘরের আগল ভেঙে তিনি গোটা বিশ্বকেই করে তুলেছেন ঘর। এ বিশ্বের ধুলো-কাদা-আনন্দের সাথে মাঠ-ঘাট-আকাশের সাথে তাঁর প্রেম। ব্যক্তি জীবনে তিনি সফল মা। পেশাগত জীবনে সফল অধ্যাপক। লেখিকা জীবনেও তিনি সফল। নারীজীবনকে তাঁর সাহিত্যে তিনি পরিসর দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। তিনি বিশ্বাস করেন, দক্ষিণ এশিয়ার মেয়েদের জীবন সমস্যা পশ্চিমের দেশগুলির মেয়েদের জীবন সমস্যার চেয়ে আলাদা। সমগ্র জীবন জুড়ে তিনি গবেষণা চালিয়েছেন নারী জীবনের ওপর। 'সই' সংগঠন গড়ে তুলেছেন। মেয়েদের উদ্যোগে আস্ত একটি 'বইমেলা' সংগঠিত করা যায় এমন সব উদাহরণও কলকাতার বুকে তৈরি করেছেন। সেই 'সই' সংগঠক নবনীতা দেবসেনের 'অ্যালবাট্রস্' উপন্যাসে নারীভাবনার এই বিশেষ পরিসরকে অন্বেষণ করতেই এই আলোচনার অবতারণা।

ঔপন্যাসিক নবনীতা দেবসেনের আয়তনের দিক থেকে ছোটো উপন্যাসগুলির তালিকায় নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য নাম 'অ্যালবাট্রস'। কিন্তু তাঁরই অপরাপর স্বল্পায়তনের

উপন্যাসে এমন গহীন জীবন সমস্যাকে এতো সম্যক শিল্পিত ভাবে প্রকাশের জুরি মেলা ভার। এই উপন্যাস তার স্বপ্নময় প্রাকচেতনা সর্বস্বতার বৈশিষ্ট্যে পাঠকের কাছে আপাতভাবে জটিল হলেও, তার বয়ানে ধরা পড়া জীবন-সত্য ভাষণের গুণে পাঠকের প্রিয়ও বটে। আখ্যানের শুরু হয় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত পিউয়ের সঙ্গে ডক্টর মজুমদারের কথোপকথন দিয়ে। কাউন্সেলিং চলছে মিস ব্যানার্জীর (পিউ)। পিউ মফস্বলে বড়ো হয়েছে অনেকখানি মুক্তির সাধ পেতে পেতে। চন্দননগরে গঙ্গার ধারেই তাদের বাড়ি ছিল। নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে, সাঁতার কেটেছে, আমগাছ, পেয়ারা গাছে উঠেছে। আবার বাঙালি পরিবারে মেয়েরা যেমন সংসারের কাজে মাকে সাহায্য করে তাও করেছে। মিশনারি স্কুলে পড়া, রেডিও, টিভি এইসব নিয়েই তার বড় হয়ে ওঠা। পিউ কর্মসূত্রে কলকাতায় মিসেস মিত্র'র বাড়িতে মেস ভাড়া নেয়, সেখানেই তার রুম পার্টনার হিসেবে সাক্ষাৎ হয় পদ্মিনী সিংহের সঙ্গে। ভাড়া বাড়িতে বা চারপাশের সকলে পদ্মিনীকে 'প্যাডি' বলে সম্বোধন করলেও পিউ তাকে প্রথম থেকেই 'পদ্মিনী মাসি' বলে সম্বোধন করতে

পদ্মিনী সিং ছিল সম্পূর্ণভাবে দেহসর্বস্ব জগতের বাসিন্দা। শরীর, যৌনতা, মিলন, যথেচ্ছাচার এই তার গল্প। মা'র অবর্তমানে ঠাকুমার শাসনের রশি আলগা হওয়ায়, বাবার সংসারের প্রতি অমনোযোগের কারণে পদ্মিনী সিংয়ের জীবন শরীরসর্বস্ব হয়ে ওঠার পথে ক্রমশ উদ্ধত হয়ে উঠেছিল। পাড়ার ছেলেদের সহজে পাওয়া শরীরী যন্ত্র ছিল সে। যৌবনের আগেই অভিভাবকহীনতার সুযোগ নিয়ে নিজের মেসো তাকে ভোগ করেছে। একের পর এক প্রেমিকের প্রতি শরীর, মনের নিবিড় আকর্ষণ ধেয়ে চলেছে তার। অঙ্কের মাস্টারমশাই থেকে পাড়ার বিজন দা, থেমেছে বলবীর সিংয়ের স্বীকৃতি দানে। পদ্মিনী নিজেই প্রেম নিবেদন করে, বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে বলবীরকে। বিয়ের পর কানাডায় স্থায়ী হল তারা, কিন্তু সে সম্পর্ক ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে ছিন্ন হল। প্লেন ক্র্যাশে বলবীরকে হারানোর পর আবার পদ্মিনীর একার পথ চলা শুরু হল। আবার স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে আমূল ডুব দিচ্ছে পদ্মিনী মাসি। এভাবেই পিউয়ের মাঝবয়সী রুমমেট তার জীবনকে আষ্টেপৃষ্টে ভোগ করেছে। শরীরময় সেই যথেচ্ছাচারের ইতিহাস সে পিউকে মেসবাড়িতে শোনাতে থাকে। একঘেয়ে সে গল্প। 'পূতিগন্ধময়'২ গল্প। এক বালিকার কিশোরী, যুবতী, মাঝবয়সী মহিলা হয়ে ওঠার জার্নিতে পুরুষ অঙ্গ ভোগের গল্প। নিজের শরীরময় ইচ্ছাগুলোকে তৃপ্ত করতে, শরীর সম্পর্কে প্রায় কিছুই না বোঝার বালিকা বয়স থেকে অপারাপর পুরুষের কাছে 'সেক্স টয়' হয়ে ওঠার গল্প। যদিও সেই যৌন সুখানুভূতি সমানভাবে তাকেও আনন্দ দিয়েছে। এমনই দু-একটি গল্পদৃশ্য উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে, যা পদ্মিনীমাসি বলছে স্মৃতি থেকে পিউকে। যদিও তাকে স্মৃতি বলা উচিত হবে কিনা তা ভাবার যথেষ্ট পরিসর আছে। কারণ পদ্মিনী মাসি নিয়ত এই গল্প গুলির মধ্যেই বাঁচতে ভালোবাসে।

গল্পদৃশ্য এক : পদ্মিনীর বিয়ে-থা দেওয়ার আগে মেসোমশাইয়ের পক্ষ থেকে পদ্মিনীকে 'বড় হবার মন্তর'ও শেখানো।

গল্পদৃশ্য দুই : পদ্মিনী মাসির সঙ্গে পাড়ার ছেলেরা যা যা করত, সে কীর্তিকলাপগুলো মজা দিত পদ্মিনী মাসিকেও। প্রায় অভিভাবকহীন পদ্মিনী তখন সবে কিশোরী বা যৌবনে পা রেখেছে।

আর এই সমস্ত গল্প প্রায় গায়ে পড়ে পদ্মিনী মাসি শোনাত পিউকে। সারাদিন অফিসে কাজ করে আসার পর চূড়ান্ত 'পূতিগন্ধময়' এই কথাগুলোকে সর্বস্ব শক্তি দিয়ে ঠেকাতে চেষ্টা করার পরও পিউ ব্যর্থ হ'ত।

সেই পদ্মিনীমাসির হঠাৎ আত্মহত্যা পিউকে মানসিকভাবে আঘাত দিয়েছে। সে প্রত্যেক মুহূর্তে যেন পদ্মিনীর সাক্ষাৎ পাচ্ছে, কথা হচ্ছে তার। পিউয়ের প্রত্যেক মুহূর্তে মনে হয়েছে পদ্মিনী মাসিকে সেই মেরেছে। আর তার পক্ষে যুক্তি সাজাতে গিয়ে সে হাজির করছে প্রাক চেতনের সেই আধা বাস্তব আধা কল্পনা জগতের কিছু ঘটনা। যে ঘটনাগুলো পিউকে সর্বস্বহীনা করে তুলেছিল। পিউকে ঠকিয়েছিল, পিউয়ের কাছ থেকে অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছিল। যেমন তার শৈশবে তার বাবার সংসার ছেড়ে চলে যাওয়া, তার প্রেমিক ঋত্বিকের এমিলির অনুরোধে ভার্জিন কলঙ্ক দূর করতে এমিলির সঙ্গে মিলিত হওয়া। এসবের মূল কারণ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত পিউয়ের কাছে পদ্মিনী মাসি। ডক্টর মজুমদারের চিকিৎসা আর প্রেমিক ঋত্বিকের পাশে থাকা পিউকে শেষ পর্যন্ত সুস্থ করে তুলেছে। উপন্যাসের অন্তিম পরিণতিও বাঙালি মেয়েদের জন্য প্রকৃত ও স্বাভাবিক, ঘরবাঁধা। রুমমেটের ভারবাল অ্যাবিউজড আর ব্যক্তিগত জীবনে বড়ো হয়ে ওঠার পথের সংকটগুলো জমাট বেঁধে এক মানসিক সংকট তৈরি করেছিল পিউয়ের। নার্ভাস সমস্যাকে কাটিয়ে দাম্পত্য জীবনের পথে পা বাড়াতে, শুভ পরিণয়ের দিকে আনন্দের সঙ্গে হাঁটলেও, বেশ কিছু সংকট, হিংসা, না পাওয়ার অতীত ভুললে এই উপন্যাস পাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। গোটা উপন্যাস জুড়ে পিউয়ের মানসিক রোগের চিকিৎসা চলছে বলেই পিউয়ের সব বক্তব্যকে অপ্রকৃত মনে করার কোনো কারণ নেই। মানসিক রোগী বাস্তববোধ বিবর্জিত, এমন ধারণা শুধু ভুল নয়, অন্যায়ও বটে। উপন্যাসে মানসিক রোগ, আত্মহত্যা প্রবণতা, আত্মহত্যা, বাস্তব ও কল্পনার মাঝামাঝি অবস্থানে নানা কাহিনির আড়ালে আড়ালে আমাদের পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েদের অবস্থানের সূক্ষ্ম প্রকাশ আছে। পদ্মিনী মাসির শরীর সর্বস্বতার আপাত অর্থে মজাদার গল্পগুলির তলায় চাপা পড়ে আছে আমাদের বাঙালি পরিবারে মেসো-বাবার বয়সী পুরুষদের কন্যাসম পদ্মদের ওপর লোভের দংশন। পাড়ার দাদাদের, পরিবারের মেসোদের বাইরেও এই রোগ প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। তা থেকে সত্যি সত্যিই আমরা চোখ ফিরিয়ে নিয়ে পড়তে পারিনা এই উপন্যাস। পুরুষের লালসার শিকার হ'তে হ'তে পদ্মিনীদের জন্ম হয়। সমাজ কিন্তু পদ্মিনীদের ওপরই সব দায় রক্ষার ভার দিয়ে বসে। এই পুরুষ শাসিত সমাজ সংসারে পদ্মিনীরা যা খুশি তাই করলেই তা

অন্যায্য, অন্যায়। আর ঋত্বিকরা করলে স্বাভাবিক। মেনে নেওয়া উচিত। ম্যাচিওর সিদ্ধান্ত। মানসিক রোগ, মানসিক রোগী, হঠাৎ ঘটে যাওয়া আত্মহত্যার আপাত বর্মের আড়ালে এই উপন্যাস আসলে আমাদের সমাজ পরিবারের যৌনতার, যৌনবোধের ইতিহাস। পিউ পদ্মিনীর কাছ থেকে দূরে সরতে পারছে না। রোজই সে পিউয়ের কাছে আসছে। আবারও সেই একঘেয়ে শরীরসর্বস্ব গল্পগুলো বলছে, যা হওয়ার কথা নয়।

পদ্মিনীমাসি আত্মহত্যা করার পর এই ঘটনা সত্যিই অসম্ভব। পিউইয়ের মানসিক সংকট থেকেই এমন মনে হচ্ছে। কিন্তু একটু অন্যভাবে পড়লে কি বলা যায় না, পিউ নিজেরই মুখোমুখি হচ্ছে। পদ্মিনী মাসির স্বীকারোক্তি গুলো নিজের জীবনের প্রেক্ষিতে মেলাচ্ছে। পিউ মানসিক রোগী, একথা উপন্যাসে খুব স্পষ্ট। তার কাউন্সেলিং দিয়েই উপন্যাসের শুরু। তবু আমাদের মনের গহীন অন্ধকারগুলো তো আর মিথ্যা হয়ে যেতে পারেনা। দুটি সমান্তরাল পাশাপাশি পাঠ এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে জরুরি। একদিকে মানসিক রোগী, আত্মহত্যা, শুভ পরিণয় অন্যদিকে আমাদের সমাজ, পরিবারে পুরুষ নারীর যৌন সম্পর্কের আলো-অন্ধকার, ন্যায়-অন্যায়। লেখিকা নবনীতা, 'সই' সংগঠক নবনীতার এই ব্যাপ্ত দেখাকেই উপন্যাসের বিচারে গুরুত্ব দিতে হবে। 'পদ্মিনী মাসির এই অসংকোচ বেহায়াপনা'৪ কিংবা লজ্জা-শরমহীনতা আমাদের তথাকথিত পুরুষতন্ত্র নির্মিত সমাজ পরিবার ভাবনায় বড্ড আঘাত দেয়। পদ্মিনী মাসি আসলে আমাদের দেখা নারীর আর্কেটাইপ ঘরানাকে অতিক্রম করে যায়। তার ইচ্ছা পুরুষ নির্মিত খেলাঘরে আটকে থাকে না। পদ্মিনী মাসি আমাদের মধ্যবিত্ততার গায়ে বারবার আঁচড় দিয়ে ফেলে। "পদ্মিনীমাসির মতে, বয়ফ্রেন্ডদের সর্বদা অন্য ক্ষেত্র থেকে বেছে নিতে হয়। বয়ফ্রেন্ডরা বেশিদিন নিজের বিষয়ে নিজের থেকে বেশি সাকসেসফুল মেয়ের প্রেমে পড়ে থাকতে পারেনা - হিংসেয় নীল হয়ে শত্রুতা শুরু করে দেয়। কিংবা স্রেফ পালায়। অন্যত্র দুর্বলতরও মেয়ে খুঁজে নেয় নিশ্চিন্তে প্রেম করবার জন্য। যেখানে সে সুপিরিয়র ফিল করবে।"৫

পদ্মিনী মাসি জীবন দিয়ে পুরুষ মানুষকে চিনেছে। তার সেই চেনা পুরুষ মানুষের গল্প পিউকে বিপর্যস্ত করেছে, কারণ পিউ পুরুষকে এভাবে চেনে না। লেখিকা নবনীতা সেই 'পুরুষ'কেই তুলে ধরতে চেয়েছেন তার সব আলো অন্ধকার নিয়ে। পদ্মিনী মাসির শরীরময়তা যদি সত্য হয় তা আংশিক সত্য। তার পাশাপাশি ঘর বাঁধার ইচ্ছেও সত্য। "চল না আমরা অন্য কোনও দেশে গিয়ে ঘর বাঁধি? সংসার পাতি? আমি তোমাকে রান্না করে খাওয়াব। তোমাকে গান শোনাব। আমরা দুজন একসঙ্গে সমুদ্রে সূর্য অস্ত যাওয়া দেখব। চল না, পালাবে?"৬ এখানেই পদ্মিনী মাসি অনন্ত নক্ষত্র বীথির মধ্যে দাঁড়িয়ে বাঙালি নারীসত্তায় স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। তার মধ্যে ঘর বাঁধার আনন্দ তাকে আদ্যন্ত 'বাঙালি নারী' করে তোলে। আমেরিকা, ইউরোপ নিদেন পক্ষে ব্যাঙ্গালোর, দিল্লিও নয়, এ যেন নিতান্তই বাঙালির শিকড়ের ভাবনায় ফেরবার কথা

বলে। সংসার পাতবার কথা বলে। কিন্তু নারী জীবনের ইতিহাস তো শুধু এতেই থেমে থাকে না। তাই বিচিত্র ঘটনা বহুলতার আয়োজনে সে জীবনকেই ভিতর থেকে দেখান লেখিকা। আমাদের সামনেও হাজির করেন তার 'পাকভর্তি জমির খতিয়ান', যা আমাদের 'ভেতরকার নিহিত মধ্যবিত্ততায়'৭ প্রবল আঘাত করে। যেমন পদ্মিনী মাসির অনন্ত কথা স্রোত পিউয়ের নিহিত মধ্যবিত্ততায় আঘাত করে। তবু শেষে বলতেই হয়, 'অ্যালবাট্রস্' এক মানসিক রোগীর কাহিনি। কিন্তু এও বলতে হয়, তা অংশত সত্য। বহুমাত্রিকতার বিচারে তা লেখিকা নবনীতার অন্যতম সমীক্ষামূলক কাজ। 'সেক্সুয়াল অবসেশন' ট্রান্সফারের সত্যের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে স্বাধীন চেতনার ট্রান্সফার-ও ঘটেছে।

পদ্মিনী মাসি যে স্ফুলিং থেকে জীবনবোধ গড়ে তুলেছে তা সীমানাতিক্রমী। ইউরোপ-আমেরিকার সুদূরতা যেন তাতে অবলীলায় মিশেছে। সেই মুক্তমনা জীবনবোধ-ই পাড়ি জমিয়েছে পদ্মিনী মাসির মন থেকে পিউয়ের মধ্যে। 'অ্যালবাট্রস' নামকরণেও লেখিকা বিশেষ তাৎপর্যবাহী করে তুলেছেন এই আখ্যানকে। অ্যালবাট্রস দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের বিশেষ পাখি যাদের দুই বড় ডানার মাঝের দূরত্ব সাধারণ পাখির চেয়ে খানিক বেশি। এই পাখির অন্যতম বৈশিষ্ট্য একটানা একই দিকে দীর্ঘক্ষণ উড়ে বেড়ানো। উপন্যাসে পদ্মিনী সিং বা পিউ যা ভাবতে পারে তা যেন সাধারণ মেয়েদের ভাবনা-চিন্তার গণ্ডির বাইরের বিষয়। তারা এই নিজস্বতার কারণে যেমন বহুল চর্চিত, ঠিক তেমনি আমাদের চেনা সমাজ পরিবারে প্রান্তিক-ও বটে। এতোখানিই প্রান্তিক যা সমাজের পক্ষে সয় না। তাই সমাজ তাদের মানসিক বিকারগ্রস্ত তকমা দিতে মুখিয়ে থাকে। তাদের কাউন্সেলিংয়ের প্রয়োজন সোচ্চারে ঘোষণা করে। সে নিতান্তই সমাজের জন্য। তারা সমাজের খাপের বাইরে; তাদের মুক্তিকামী ডানা সে খাপে আটে না। প্রান্তবাসী হয়েও জীবনী শক্তির প্রাচুর্যে তারা জীবনকে ক্রমশ রচনা করে চলে। প্রান্তিকতার কারণেই পদ্মিনী, পিউদের একা হয়ে পড়তে হয়। ডুব দিতে হয় মনের গভীর অতলান্তিকতায়। সমাজ এই অবস্থাকে চিহ্নিত করে মানসিক রোগ বলে। সমাজের এই আপাত স্থির ভাবনার বিপ্রতীপে তাদের ব্যক্তিত্ব, স্বাধীন চেতনা, নিজস্বতার গুণেই মুক্তির পথে ডানা মেলতে পারে। আলবাট্রসের মত আপন খেয়ালে।

তথ্যসূত্র :

১। দেব সেন নবনীতা, নানা রসের ৯টি উপন্যাস, জানুয়ারি ২০১৯, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পৃ: ২৫৪
২। দেব সেন নবনীতা, নানা রসের ৯টি উপন্যাস, জানুয়ারি ২০১৯, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পৃ: ২৬৫
৩। দেব সেন নবনীতা, নানা রসের ৯টি উপন্যাস, জানুয়ারি ২০১৯, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পৃ: ২৬৯

৪। দেব সেন নবনীতা, নানা রসের ৯টি উপন্যাস, জানুয়ারি ২০১৯, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পৃ: ২৬০
৫। দেব সেন নবনীতা, নানা রসের ৯টি উপন্যাস, জানুয়ারি ২০১৯, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পৃ: ২৬৪
৬। দেব সেন নবনীতা, নানা রসের ৯টি উপন্যাস, জানুয়ারি ২০১৯, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পৃ: ২৬৩
৭। দেব সেন নবনীতা, নানা রসের ৯টি উপন্যাস, জানুয়ারি ২০১৯, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পৃ: ২৭৫

অমর মিত্রের গল্পে ভারতবর্ষের বর্ণময় চিত্র

বহ্নিশিখা সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
বিনোদ বিহারী মাহাতো কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়

শিল্পকে জনরুচির মনোমতো করে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষায় বেশিরভাগ সাহিত্যিক যখন পণ্যায়নের নীতিবর্জিতার কাছে আত্মসমর্পণ করছিল তখন অমর মিত্র সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে চাষিবাসী নিরন্ন, বিপন্ন মানুষগুলিকে গল্প উপন্যাসের কেন্দ্রে রেখে সাহিত্য আসরে উপনিত হয়েছিলেন। দেশ কাল মাটির প্রতি দায়বদ্ধতাই তাঁর রচনার উদ্দেশ্য। ভূমি রাজস্ব বিভাগের চাকরি নিয়ে তিনি যেমন ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত গ্রামে কাটিয়েছেন তেমনি শহর জীবনের অলিগলিতেও বিচরণ করেছেন। সেজন্য ভারতবর্ষের বর্ণময় চিত্র তাঁর রচনায় ধরা পড়েছে। তাই এই ভারতবর্ষের বর্ণময় জীবন তাঁর কাছে যেন অলীক বলেই মনে হয়।

"আমার কাছে কোনটা সত্য-ম্যালেরিয়া জ্বরে জীর্ণ হয়ে যাওয়া চাষির ধানকাটা, হাঁটানো মেয়ের ভারে বিপন্ন মা বুড়ি, নাকি কফিহাউসের আড্ডাবাজ তরুণ কবি, গল্প লেখক, মেট্রেরেলের সুবেশা তরুণী, তরুণ এক্সিকিউটিভ যারা কোন কথা বলে না, ইকোনমিক টাইমস-এর কেনাবেচার পাতায় চোখ মেলে রাখে নিঃশব্দে। নিজেকে কি তখন নামানুষ মিথ্যামানুষ মনে হয় না? কী অলীক এই জীবন-জীবনকে দেখে নেওয়া! কী অলীক এই ভারত নামে দেশটি ... আমার তো সত্যই মনে হয় যারা খরায় মরে, বন্যায় মরে, ধর্ষিতা হয়, খুন হয়ে যায় ভূস্বামীদের প্রাইভেট আর্মির হাতে, তারা যেন এই ভারতবর্ষের কেউ নয়, তারা এক অলীক অলীক ভারতবর্ষের মানুষ, এইভাবে হত হতে, ধর্ষিতা হতেই জন্মায়"[১]।

আসলে অমর মিত্র বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে সাহিত্য আসরে অবতীর্ণ হওয়ার সময় ভারতবর্ষ নামক দেশটিতে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা ঘটনার স্রোত প্রবহমান ছিল। নকশাল আন্দোলন, বর্গা-অপারেশন বর্গাতে জমি অধিগ্রহণ ও তার পুনঃবন্টন, জরুরী অবস্থা, ইন্দিরা গান্ধী হত্যা, বামফ্রন্ট সরকারের আগমন ইত্যাদি রক্তস্নাত সময়ের সাক্ষী থেকেছেন লেখক অমর মিত্র। আর তাঁর এই দেশকে, মানুষকে চেনার ও দেখার চোখ তৈরি করে দিয়েছিল প্রত্যন্ত গ্রামে থাকার অভিজ্ঞতা। তাই তিনি মনে করেন মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, দক্ষিণ, উত্তর চব্বিশ পরগনার গ্রামকে না দেখলে কলকাতাকে চিনতে পারতেন না। দীর্ঘ আঠাশ বছর গ্রাম ও শহর বাসের অভিজ্ঞতা তাঁর গল্প উপন্যাসের মধ্যে ধরা পড়ে।

এখন প্রশ্ন জাগে লেখক যে ভারতবর্ষকে দেখেছিলেন তা কি শুধুই উচ্চবিত্তের? এ প্রশ্নের উত্তর হবে না। ভারতবর্ষ কেবল উচ্চবিত্তের নয় তা দরিদ্র, শোষিত,

নিপীড়িত মানুষদেরও। যারা সুদীর্ঘকাল ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমে বড়ো বড়ো ইমারত গড়ে বিশ্বের দরবারে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে জয়ের মুকুট ছিনিয়ে এনেছে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হলকর্ষণ করে ফসল ফলিয়ে মানুষের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দিয়েছে, কলকারখানায় নিত্য নতুন দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস তৈরি করে দেশের ও বিদেশের চাহিদা পূরণ করে চলেছে প্রতিনিয়ত ভারতবর্ষ তাদের। আসলে এইসব শ্রমজীবী মানুষদের উপর নির্ভর করে দেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। সাঁওতাল, মুন্ডা, ডোম, শবররাই সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অথচ এই মেহনতি মানুষদের উপর ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত খাড়ার আঘাত। অমর মিত্র গ্রামে থাকাকালিন দেখে ছিলেন জমিদার, জোতদার, রাজনৈতিক ক্ষমতাবান মানুষ ও পুলিশ প্রশাসনের মিলিত শোষণ অত্যাচার এবং আইনি জটিলতায় জমি, ভিটেবাড়ি হারানো ছিন্নমূল মানুষের করুণ জীবন চিত্র। এই সমস্ত আদিবাসি কৃষিজীবীদের উচ্ছেদ ও যন্ত্রণার কাহিনি ধরা পড়েছে অমর মিত্রের ‘ভারতবর্ষ’ (১৯৮০ খ্রিঃ, প্রস্তুতি পর্ব) গল্পটিতে। গল্পটির প্রথমে নাম ছিল ‘আত্মপাথর’। গল্পটির পটভূমি মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর থানার মহুলবনি গ্রাম। এই গল্পের কাহিনি সম্পর্কে লেখক এই গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছদে বলেছেন-

“ধরা যাক এই মহুলবনিই ভারতবর্ষ। একটি গ্রামকে পর্যবেক্ষণ করলেই দেশকে দেখা হয়[২]”।

জমিদার ও কৃষকের সঙ্গে দ্বন্দ এই গল্পের মূল বিষয়বস্তু। মহুলবনিতে গড়ে ওঠা মন্দির আকৃতির ঢিবির গবেষণায় এক পুরাতত্ত্বের গবেষক ছাত্র আসলে মহাপাত্রদের দেওয়া ভুল তথ্য নিয়ে রিপোর্ট বানায়। এখানে প্রকৃত ইতিহাসের বিকৃতি ঘটে। প্রকৃত ইতিহাস হল মহুলবনির শতকরা পঁচাত্তর ভাগ জমি মহাপাত্রদের মতো জমিদাররা ভোগ করে। বুদাং মুন্ডার মতো সাঁওতাল, ডোম, শবররা মহুলবনির মতো ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গল কেটে অনুর্বর পাথুরে জমিকে চাষযোগ্য করে ফসল ফলায় কিন্তু মহাপাত্রদের মতো জমিদাররা সেই জমি কৌশলে অর্থাৎ কখন বিবাহিত মেয়ে, সারা বছরের বেকার খাটা চাকর তো কখন পোষা গরুর নামে জমি রেখে জমির উর্দ্ধসীমা আইনকে ফাঁকি দেয়। ১৯৫৩ খ্রিঃ জমিদারি বিলোপ আইন পাশ হলে কোন ব্যক্তি ২৪ একরের বেশি জমি রাখতে পারতো না। কিন্তু জমিদাররা খাতায় কলমে অপরের নামে জমি রেখে নিজেরা ভোগ করতো। এই প্রথা দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসলেও কেউ প্রতিবাদ করেনি। ১০-১২ বছর আগে একবার চাষিরা একজোট হয়ে জমি দখল করে প্রতিবাদ করলে মহাপাত্ররা ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালালেও পরিস্থিতি শান্ত হলে আধুনিক অস্ত্রের দ্বারা বলীয়ান হয়ে আবার ফিরে আসে।

মহুলবনির ১নং ম্যাপে বসবাসরত সংগ্রামী চাষি বুদাং মুন্ডা বিঘে খানেক রুক্ষ অনুর্বর জমিকে উর্বরা করে চাষ করতে থাকে কিন্তু পাশে মহাপাত্রদের জমি থাকায় সেই জমি একদিন সরে এসে একটা জমিতে পরিণত হয় এবং তাকে জানানো হয়

তার এই জমি গভর্মেন্টের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে সে পেয়েছে। অর্থাৎ ওই জমির মালিকানা মহাপাত্ররা দাবি করলে সরকার জমির উর্দ্ধসীমা আইনে তা খাস জমি হিসেবে দখল করলেও ক্ষতিপূরণ হিসেবে সেই জমি পুনরায় তাদের ফেরত দেয়। শেষে মহাপাত্ররা দয়া পরবশ হয়ে বুদাংকে ভাগ চাষির অধিকার দেয়। ফরেস্ট অফিসাররাও তাদের এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয় কারণ-

"ফরেস্ট বিট অফিসার মহাপাত্রদের অনুগত। জমি বুদাং একা ভোগ করতে পারে না, কিন্তু ওই রকম বন্দোবস্তে তিনি খুশি। ফসলের ভাগ মহাপাত্রবাবুরা পেলে বিট অফিসার বাঁচেন[৩]"।

ইতিমধ্যে গবেষক ছাত্র মহাপাত্রদের বানানো তথ্যের রিপোর্ট নিয়ে কলকাতা চলে যাওয়ার পর মহুলবনি আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সমস্ত ভাগচাষিরা মহাপাত্রদের কাছে রসিদ দাবি করে কিন্তু তারা রসিদ দিতে অস্বীকার করে। ফলে আন্দোলনকারীরা বিহার থেকে মুন্ডাদের এনে তাদের আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা করে। এই পরিস্থিতিতে মহাপাত্ররা ভয় পেয়ে পুলিশকে আন্দোলনের নেতা বুদাং মুন্ডাকে অ্যারেস্ট করতে বলে কিন্তু প্রশাসন পূর্বে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে স্মরণ করে তা করতে পারে না আবার মহাপাত্রদের বিরুদ্ধেও যেতে পারে না। ফলে পুলিশের বড় কর্তাদের রাতের ঘুম চলে যায়। তারা শেষ পর্যন্ত বিহার থেকে মুন্ডাদের মহুলবনিতে আসার সমস্ত পথ বন্ধ করতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে মহাপাত্ররা বিহার থেকে ভাড়াটে খুনি ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে। এরপর আসে সেই আন্দোলনের মাহেন্দ্রক্ষণ ২০ ও ২১ শে নভেম্বরের রাত। হাজার মশালধারী মুন্ডারা মহাপাত্রদের বন্দুকের নলের সামনে দিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকলে একে একে তারা মাটিতে পড়তে থাকে এবং একসময় সেই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। চারিদিকে নিঃশব্দ কান্নার রোল ধ্বনিত হতে থাকে।

গবেষক এই আন্দোলনের খবরে আবার মহুলবনিতে ফিরে আসে এবং মন্দির আকৃতির ঢিবির প্রকৃত ইতিহাসের সন্ধান পায়। নিখোঁজ বুদাং মুন্ডার খোঁজ করলে শিশু বুড়ো সকলেই মহাপাত্রদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। লেখক এখানে দেখান পিছিয়ে পড়া সমাজ শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, সাঁওতাল, মুন্ডাদের কোন সংগ্রামের ইতিহাস নেই, তারা কেবল বঞ্চিত হতেই জন্মায়। কিন্তু ঐতিহাসিকরা দেশের প্রকৃত ইতিহাস তুলে না আনলেও সাহিত্যিক পারেন। আর সেই ইতিহাসকেই অমর মিত্র গল্পে তুলে এনেছেন এমনভাবে-

"মহুলবনির পাথরগুলোর ইতিহাসই আসল ইতিহাস। তা, থেকে অরণ্যময় আদিম ভারতবর্ষের মূল ইতিহাস ও সংস্কৃতির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়[৪]"।

অন্যদিকে হিন্দু মুসলিমের দাঙ্গার পটভূমিকায় প্রফুল্ল রায়ের 'ভারতবর্ষ' এবং বিদেশী সৈনিকদের দ্বারা কৃষি নির্ভর জনগোষ্ঠীর ভিখারীতে পরিণত হওয়ার মর্মবিদারক

কাহিনি রমাপদ চৌধুরীর 'ভারতবর্ষ' গল্পে উঠে এসেছে । রমাপদ চৌধুরীর এই গল্প সম্পর্কে স্বয়ং অমর মিত্র বলেন-

"ভারতবর্ষ শুধু ভারতবর্ষের গল্প নয়, এ গল্প গোটা তৃতীয় বিশ্বের হয়ে গেছে[৫]"।

অমর মিত্র 'ভারতবর্ষ' গল্পে একটি মৌজার ঘটনা বর্ণনায় সমগ্র ভারতবর্ষের চিত্রকে যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি তাঁর 'মেলার দিকে ঘর' (১৯৭৪, একাল পত্রিকা) গল্পটিতে দারিদ্র্যের কবলে পড়া একটি পরিবারের অসহায়তার চিত্র তুলে ধরার মধ্য দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অসাম্যের রূপটিকেও চাক্ষুষ করিয়েছেন। সহদেব তিনদিন পর বাড়ি ফিরে ষোড়শী কন্যা লক্ষ্মীকে ভাত রান্না করতে বলে মেলায় নিয়ে যাওয়ার লোভ দেখায় । মেয়ে বুঝতে পারে না পিতার এই বৈপরীত্যময় আচরণের কারণ। যেহেতু তার পরিবার তিনদিন অভুক্ত থেকে খিদের জ্বালায় মাটিতে পেট চেপে শুয়ে থাকে সেই পরিবারের মেলা দেখার মতো শৌখিনতা বড়ই বেমানান। তাই সে পিতার কথায় কিছুটা অবাকই হয়। ভাত ফোটার গন্ধে সহদেবের সন্তানরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। সকলেই উননের চারিদিকে গোল হয়ে বসে ভাত হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকে। ভাত হয়ে গেলে খাওয়ার সময় সহদেব লক্ষ্মীর পাতে কয়েক গাল ভাত তুলে দিয়ে বলতে থাকে 'খা খা বেশী করে খা, অনেক হাঁটতি হব্যা কাল'। পিতার এই স্নেহসুলভ আচরনের উদ্দেশ্য লক্ষ্মীর মতো পাঠককেও বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়।

সহদেবের ঘর ও স্ত্রী সন্তানদের পোশাক পরিচ্ছদ চরম দারিদ্র্যের চিত্রকে স্পষ্ট করে। তাছাড়া সহদেবের যতটুকু জমি ছিল তা ধারের দেনা শোধে গেছে। গ্রামের সমস্ত মানুষ যখন অন্নের খোঁজে গ্রাম ছাড়ছে তখন সহায় সম্বলহীন সহদেব গ্রাম ছাড়ার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেও অপারক। অন্নের সংস্থানে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে তিনদিন পর সে কিছু চাল ও কুড়ি টাকা যোগাড় করে।

লক্ষ্মীকে লাল ডুরে শাড়ি পড়িয়ে, লাল ফিতেয় চুল বেঁধে, কপালে টিপ দিয়ে, আলতা পরিয়ে সহদেব মেলাতে নিয়ে যায়। যেন মা দুর্গাকে সাজিয়ে বিসর্জনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নানা মাঠ জঙ্গল পেরিয়ে অবশেষে সহদেবের গন্তব্যস্থল নদীর ধারে চায়ের দোকানে পৌঁছয়। সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল নারী পাচারকারী অসাধু পাঁচজন ব্যবসায়ী। তারা লক্ষ্মীকে জহুরীর চোখে দেখে জিনিসের ভালো মন্দের মাপকাঠিতে মাপতে থাকে এবং তাকে অনুসরণ করে। নদীর ধারের তপ্ত বালু এবং সেই বালি থেকে শিয়ালের টেনে বের করা মৃত শিশু ও শকুনের কর্কশ চিৎকারে ভয় পেয়ে লক্ষ্মী পালাতে গেলে বালিতে পা ঢুকে গিয়ে পড়ে গিয়ে কাঁদতে থাকলে সহদেব ছুটে যায় কিন্তু তাকে কোন সান্ত্বনা দিতে পারেনা। বরং সে দেখতে থাকে মেয়ের সম্ভাব্য ধর্ষণের পরিণতি-

"সহদেব দেখে লক্ষ্মীর পায়ের গাঢ় আলতার দাগ মুছে সেখানে কিছু নেই, কপালের টিপ মুছে গেছে, সযত্নে বাঁধা চুল খুলে ছড়িয়ে পড়েছে মুখময়, আঁচল লুটোয় বালিতে[৬]"।

এমন ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখিন হয়ে লক্ষ্মীর মেলায় যাওয়ার সমস্ত স্বাদ ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যায়। সে বাড়ি ফেরার জন্য পিতাকে কাতর আর্তি জানায় কিন্তু কন্যার করুণ আর্তি তাকে তার সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারে না। সে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কারণ-

"কোমরে ওর এক কুড়ি টাকা আর জিহ্বায় গত রাত্রের অন্নের স্বাদ এখনো বর্তমান[৭]"।

তাই সহদেব নিরুপায় হয়ে মেয়েকে ধর্ষিতদের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অভাব ও ক্ষুধার কাছে পরাজিত হয় পিতা ও কন্যার সু-সুকুমার সুন্দর সম্পর্ক, বিশ্বাস এবং ভরসাস্থল। অসাম্য মানুষকে পঙ্গু করে দিয়েছে। অর্থের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে মানবিকতা, সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহ ভালোবাসা। দারিদ্র থেকে বাঁচতে এমনই এক পিতার কন্যাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করার চিত্র দেখা যায় অমর মিত্রের 'অশ্বচরিত' উপন্যাসে। এও ভারতবর্ষেরই গ্রাম গঞ্জে অবস্থানরত পিতার মন মানসিকতার বিকারের দিককেই সূচিত করে।

আমাদের ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। আর সেই গণতন্ত্র সংঘটিত হয় জনগণের ভোটের মাধ্যমে অথচ স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসব ভোটের নামে চলে হত্যার উৎসব। দেশীয় রাজনীতির জাতাকলের কাছে বেশিরভাগ সাহিত্যিকরা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। আর কিছু সংখ্যক সাহিত্যিক ক্ষমতাধর নেতা মন্ত্রী তথা সরকারের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে শিল্পের স্বাভাবিক পথকে বেছে নিয়েছেন। অমর মিত্র হলেন শেষ পর্যায়ের লেখক। তাঁর কাছে কোন বাধাই বাধা ছিল না তাই **১৯৯১** খ্রিঃ 'ভোটের আগের রাত্রি' ও তার ঠিক কুড়ি বছর পর 'মানুষী মাহাতোর জীবন মরণ'এর মতো গল্প লিখতে পেরেছিলেন। প্রথমটিতে অসাধু পার্টি কর্মীদের টাকার বিনিময়ে ভোট কিনে গণতন্ত্রের অপব্যবহার এবং শেষেরটিতে গণতন্ত্রের নামে মৃত্যু মিছিলের ঘটনা স্থান পেয়েছে। 'মানুষী মাহাতোর জীবন মরণ' গল্পটিতে রাজনীতির খেলায় মেতে ওঠা রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতায়নের করালগ্রাসে বনকাটি, মনসাবাড়ি, দশ হাজারি, আমলাশোল, সাপধরা, কুসুমডির নিম্নবর্গীয় নিঃস্ব মানুষেরা কিভাবে হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে তারই আখ্যান। গল্পটির মূল ঘটনা ফ্ল্যাশব্যাকে বর্ণিত হয়েছে। পার্টির ক্ষমতাধারী নেতা মাইতি চায় পার্টির সমস্ত কর্মী ও জনসাধারণ তার কথা মতোই চলুক। নিজের হাতে ক্ষমতা রেখে সেই তাদের চালনা করবে কিন্তু মানুষী মাহাতো তার এই প্রবণতা মেনে নিতে পারেনি তাই বিরোধী দল বনপার্টিতে নাম লেখায়, পরিণাম হয় ভয়াবহ, তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। মাইতি মানসীকে তাদেরই পার্টির প্রতিনিধি এন্তাজ, বিজলীদের দিয়ে করর দেওয়া করায়।

সেদিন মাইতির ভয়ে কেউ মুখ না খুললেও এতবছর পর তাদের মধ্যে শ্রেণিচেতনার জাগরণ ঘটেছে। তারা বুঝতে পেরেছে তাদের সামান্য ভুলে সমগ্র সাপধরা কুসুমডিকে শোষিত হতে হয়েছে কারণ মানসী ছিল শ্রেণি সংগ্রামের প্রতীক। তাই এন্তাজের স্ত্রীর বিশ্বাস "মানুষীর তেজ মারতে পারে নাই মাতি, তেজ মরে নাই মানুষীর[৭]"। তাদের এই শোষণ থেকে মুক্তি পেতে মানষীকে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। মানষীর জেগে ওঠা মানে সমগ্র গ্রামবাসীর জেগে ওঠা। মানষীই হয়ে উঠবে তাদের বিপ্লবের প্রতীক।

"মানুষীকে তুলা হোক, না তুললে মাতির শেকল বাঁধা মুনিষ শেকলে বাধা-ই রাহি যাবে, কারুর মুক্তি হবেনি[৮]"।

তাই এন্তাজরা কোদাল দিয়ে মানষীর মৃতদেহ তোলার জন্য উদ্যোগী হয়। এক নেতার মৃত্যুতে তো বিপ্লবের শেষ হয়না। বিপ্লব মানুষের মধ্যে কুল কাঠের আংরার মতো প্রতিনিয়ত জ্বলতে থাকে। আর সময় সুযোগ হলে সেই আগুন শতগুণ হয়ে জ্বলে উঠবে এই আশার আলো দেখিয়ে লেখক গল্পটির পরিসমাপ্তি টেনেছেন।

মানুষের উচ্ছেদ নতুন কথা নয় তবে পূর্বে জমিদার জোতদারদের দ্বারা মানুষেরা যেভাবে উচ্ছেদ হত বর্তমানে তার রূপ বদলেছে। বর্তমানে বিভিন্ন কর্পরেট সংস্থা, সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও প্রমটারদের লালসার কাছে সাধারণ মানুষ অসহায়ভাবে পরাজিত হয়ে নিঃস্বতে পরিণত হচ্ছে। আধুনিক সভ্যতায় ভারতবর্ষের এমনই এক রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় অমর মিত্রের 'বিভুতিবাবুর দেশ' গল্পটিতে। ফুলকিয়া বইহার, নাঢ়া বইহার, লবটুলিয়া, সরস্বতী কুন্ডের নীচে কপার ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ আকরিক এবং আরও অনেক ধাতুর অবস্থান সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে বিভিন্ন কর্পরেট সংস্থাগুলির আনাগোনা বাড়ে এবং সরকারের অনুমতিতে সেখানকার বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করার ভার পড়ে ধনেশ সিংএর মতো রাজপুতদের উপর যারা পাহাড়ের সমস্ত জঙ্গল একা রাজত্ব করার জন্য সেখানকার বাসিন্দাদের মিথ্যা কেসে ফাঁসায়। পুলিশ আসামির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না পেলেও বিভিন্ন কেস দিয়ে জেলে ঢোকায়। একটা কেসের জামিন পেলেও তারা অন্য কেসে জড়িয়ে যায় ফলে তারা সারা জীবনেও বাড়ির মুখ দেখতে পায় না। তাই দেখা যায় এমনই এক কেসে ফেঁসে গিয়ে লগন মুন্ডাকে জেল হাসপাতালে মরতে হয় এবং ভানুমতির বাবা লবসাকে বিনা অপরাধে জেলে থাকতে হয়।

ভানুমতি ও তার মা জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বাড়ি ফিরলে ধনেশ সিং তাদেকে বাড়ি ছাড়ার হুমকি দিয়ে আসে। কারণ সমস্ত গ্রামবাসীকে উচ্ছেদ করে যখন তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের এত কাছে আসতে পেরেছে তখন ওই দুই জনের জন্য তাতে অসফল হতে পারে না। তাই তাদের রাতের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার কথা জানায়। এই কাজে তাকে অনেক নির্মম হতে হয়েছে। অবাধ্য গ্রামবাসীদের নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের বডিকে মাটির তলায় পুঁতে দেওয়ার অর্ডার দিয়েছে।

"বড়ি যেন না থাকে, পুঁতে দিয়ে আসবে ধাতুরিয়া, কুন্তা মঞ্চিদের মতো, আগে যেমন হয়েছে[৯]"।

লেখক গল্পের শেষে প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। যদি তাদের গবেষণা ভুল হয় তাহলে মাটির তলা থেকে বেরিয়ে আসবে বোন ডাস্টের ক্যালসিয়াম কার্বনেট, কারণ-

"শুধু তো মানুষ নয়, যুগলপ্রসাদ, রাজু পাঁড়ে, মটুকনাথ পন্ডিত, ধাতুরিয়া কুন্তা, মঞ্চিরা নয়, ওই বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমির যতো প্রাণী, কীটপতঙ্গ, পাখপাখালি সব নিধন করে ধনেশ সিং আর টহলদার বাহিনী মাটির তলায় চালান করে দিয়েছিল[১০]"।

মাটি খনন করে খনিজ পদার্থ উত্তলনের ক্ষেত্রে যেমন সরকারি সিদ্ধান্তই শেষ কথা সেখানে মানুষের কোন মতামত থাকে না তেমনি নগরায়নে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছে অনিচ্ছের কোন মূল্য থাকে না, সরকারি সিদ্ধান্তই হয় শেষ কথা এবং সরকারের অঙ্গুলি হেলনেই মানুষের ভালো মন্দ থাকা নির্ভর করে। এমনই এক বিষয়কে অবলম্বন করে অমর মিত্র 'আপনার আমার ইচ্ছা' গল্পটি রচনা করেন। সরকার যখন চেয়েছিলেন রাজারামপুরে ক্যানেল গড়া হবে তখন তা মানুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয়েছিল আবার বর্তমানে ক্যানেলের পরিবর্তে গ্যাস কোম্পানিকে জমি দেওয়া হবে তার জন্য তিন ফসলি জমি অধিগ্রহণ করা হবে। সরকারের এই রায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষকে মেনে নিতে হবে। অন্যথায় সরকার সমস্ত শক্তির প্রয়োগে করে এই প্রজেক্টকে বাস্তবায়িত করবে।

সরকারের এই প্রজেক্টে রাজারামপুরের অনেক মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বে জমি দিয়ে দিলেও রামদাসের মতো কয়েকজন দিতে অস্বীকার করে। বর্গা চাষি জমি ভোগ করায় রামদাস জমি থেকে কোন লভ্যাংশ না পেলেও ফ্যাক্টরি গড়ার পক্ষপাতি নয় কারণ তার মতে ফ্যাক্টরি একদিন বন্ধ হয়ে যাবে তখন বহু মানুষ কাজ হারা হয়ে পড়বে, বিঘার পর বিঘা জমি চাষহীন হয়ে পড়ে থাকবে। যদিও পঁচিশ বছর আগে গড়ে ওঠা বি.ডি.ওর স্বপ্নের ক্যানেলে প্রথমে সে সাড়া না দিলেও পরে ক্যানেলের উপযোগিতা নিজের চোখে দেখে এসে আর না করতে পারেনি। তখন বি.ডি.ওর বদান্যতায় তারা এক ফসল থেকে তিন ফসলের সুবিধা ভোগ করেছিল। কিন্তু বর্তমানে রামদাস লক্ষ লক্ষ টাকার ক্যানেল বাদ দিয়ে গ্যাস কোম্পানিকে জমি দিতে চায় না। তাই সেখানকার মানুষদের নিয়ে গ্যাস প্রজেক্ট প্রতিরোধ দল গঠন করেছে এবং হুমকিও দিয়েছে তারা কোর্টের শরণাপন্ন হবে।

গ্যাস কোম্পানি নিরুপায় হয়ে সেই ক্যানেলের রূপকার বি.ডি.ও সমীর গুপ্তের শরণাপন্ন হয়। সমীর গুপ্ত বোঝাতে আসলে তার কথায় রামদাস বিস্ময় প্রকাশ করে বলে-

"লাখ লাখ টাকা দিয়ে ক্যানেল কাটা হল, আমরা জলকর দিয়ে সেই টাকা শুধেছি এত বছর, এখন ক্যানেল বাদ, জমি চলে যাবে, তাহলে ক্যানেল কেটেছিলেন কেন[১১]"?

তার প্রশ্ন শুনে সমীর গুপ্ত পূর্বের ও বর্তমানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানান-
"আমার আপনার ইচ্ছেয় ক্যানেল কাটা হয়নি। ... সব সরকারের ইচ্ছে ... আপনার আমার মতামতেরই বা মূল্য কী? ... আপনি না বললেও হ্যাঁ, হ্যাঁ বললেও হ্যাঁ[১২]"।

সরকারি প্রকল্পে মানুষের যেমন ইচ্ছে অনিচ্ছের মূল্য নেই তেমনি সরকারি কর্মচারীরও নেই। তাদের কেবল সরকারের কর্মসূচিকে রূপ দেওয়ার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। শেষপর্যন্ত সেই জমিতে গ্যাস কোম্পানি গড়ে ওঠে এবং ক্যানেলটি মরা খালে পরিণত হয়।

এই পৃথিবীতে মানুষের মতামতের কোন মূল্য থাকে না বরং মানুষ প্রশাসকের লাভ লোকসানের গুটির উপর নির্ভরশীল। তারা যেভাবে চালাবে মানুষকে সেইভাবে চলতে হবে। তাই তো দেশভাগের মতো আদিপাপে মানুষকে দেশীয় নেতাদের ক্ষমতার লালসার বলি হতে হয়েছিল। তাদের ইচ্ছাতেই কোটি কোটি মানুষকে দেশ, জেলা, নদী, জন্মভূমিকে ত্যাগ করতে হয়েছিল চোখের জলে।

লেখক প্রায় ধূসর হয়ে যাওয়া মানুষগুলিকে নিয়ে লিখতে লিখতে কখনও পাড়ি দিয়েছেন গ্রাম থেকে গ্রামে, জেলা থেকে জেলায় এবং রাজ্য থেকে রাজ্যে অর্থাৎ গল্প উপন্যাসের উপাদান খোঁজার জন্য তিনি পুরো ভারতবর্ষ পাড়ি দিয়েছেন তাই তো তাঁর 'নিশীথ শোকগাথা'য় যেমন উঠে আসে ভূমিকম্প পীড়িত মহারাষ্ট্রের লাতুর জেলা তেমনি 'ধ্রুবপুত্র' উপন্যাসের পটভূমি হয় প্রাচীন ভারতের উজ্জয়িনী নগর যেটি বর্তমানে মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত। ভারতবর্ষের মানুষকে জানা ও চেনার যে চোখ তাঁর মেদিনীপুরে বসবাসকালে তৈরি হয়েছিল তার ক্লান্তি আজও আসেনি তাই তাঁর কলম আজও বহমান এবং রচনাগুলি তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতায় রাঙানো।

তথ্যসূত্রঃ

১. 'অলীক এই জীবন্', 'অমর মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প', প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ২০০৩, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, পৃঃ XVII – XVIII

২. 'ভারতবর্ষ', 'অমর মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃঃ ২৭

৩. তদেব, পৃঃ ২৮

৪. তদেব, পৃঃ ৩২

৫. অমর মিত্র, 'গল্পের হাতছানি', প্রথম প্রকাশ, ২০১৬, কারিগর, কলকাতা-৯, পৃঃ ৬৪

৬. 'মেলার দিকে ঘর', অমর মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃঃ ৭

৭. 'মানসী মাহাতর জীবন মরণ', অমর মিত্রের সেরা ৫০টি গল্প', প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃঃ ৬৩

৮. তদেব, পৃঃ ৬৪

৯. 'বিভূতিবাবুর দেশ্', তদেব, পৃঃ ৮৫

১০. 'আপনার আমার ইচ্ছা', তদেব, পৃঃ ৩০৯

১১. তদেব, পৃঃ ৩১১

স্বাধীনতা পরবর্তী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নির্বাচিত ছোটগল্প : ব্যক্তির জীবিকাগত বৈচিত্র্য ও সমস্যা

ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য্য
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প নামক সংরূপটি যে সকল ছোটগল্পকারদের লেখনীর স্পর্শে পাঠক সমাজের মনের গভীরে স্থান করে নিয়েছে সেই সকল ছোটগল্পকারদের মধ্যে অন্যতম হলেন লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র। তাঁর জীবৎকালের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে এবং তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে। পরাধীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রাম,দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতি,পঞ্চাশের মন্বন্তর,স্বাধীনতার উল্লাস এবং সেই সঙ্গে দেশ বিভাজনের যন্ত্রণা,উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদি সমস্ত কিছুই তিনি তাঁর জীবৎকালে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সাহিত্যিকের সমকালে ঘটে চলা বিভিন্ন সামাজিক,রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রভাব সাহিত্যিকের কলমের দ্বারা পাঠকদের সামনে এসে হাজির হয়। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল জীবিকা। জীবিকাগত সংকট মানুষের জীবনকে কীভাবে দুর্বিষহ করে তোলে তার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বহু ছোটগল্পে। বিশেষত স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নানান জটিলতায় বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র বন্ধ হয়ে যায়,কর্মসংস্থানের অভাব দেখা যায়,উদ্বাস্তু সংখ্যা বাড়তে থাকায় ছিন্নমূল মানুষদের বাসস্থানের সমস্যাও দেখা যায়। স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে বেঁচে থাকা নয়,শুধুমাত্র সমাজের বুকে টিকে থাকার তাগিদে লড়াই করতে গিয়ে অনেক মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ঘটে। আবার এই সময় দেখা যায় বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারীরা প্রবেশ করতে শুরু করেন, নারীদের স্বাধীন মতামত ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখা অসংখ্য ছোটগল্পে আমরা এইসব চিত্রগুলি খুঁজে পাই। মূল প্রবন্ধটির দিকে নজর রাখলেই এই বিষয়ে কিছুটা ধারণালাভ করা সম্ভব।

সূচকশব্দ : স্বাধীনতা পরবর্তীকালের উদ্বাস্তু সমস্যা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের অভাব ও তা থেকে উত্তরনের প্রচেষ্টা, কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রবেশ, জীবিকা ও সংসার সংক্রান্ত বিষয়ে নারীর স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

মূল আলোচনা

বাংলা সাহিত্যাকাশে মধ্যবিত্তের জীবনচিত্র অঙ্কনের একজন শ্রেষ্ঠ রূপকার হলেন লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র। বাংলা সাহিত্যের নবতম সংরূপ হল ছোটগল্প। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত

ধরে সার্থক ভাবে এই ছোটগল্পের জয়যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু রাবীন্দ্রিক ছোটগল্প বিষয়ে,আঙ্গিকে,গঠন কাঠামোয় যে ধারায় এগিয়ে চলেছিল তা পরিবর্তনশীল সময়ের নিয়ম মেনে চল্লিশের দশকের সময়কাল থেকে ক্রমশ বিপরীতমুখী স্রোতে এগিয়ে যেতে থাকে। চল্লিশের দশক থেকেই বিভিন্ন লেখকদের সৃষ্ট ছোটগল্পগুলি আরো বেশি করে বলতে শুরু করে সাধারণ মানুষের জীবনের করুণ কাহিনি। ছোটগল্পের প্রধান চরিত্র হিসাবে স্থান পান সমাজে পিছিয়ে পড়া অসহায় মানুষরা। পরপর ঘটে যাওয়া দুই বিশ্বযুদ্ধ,ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ,সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এই সমস্ত কিছুর প্রভাব যখন এদেশের সমাজে বিদ্যমান তখনই আসে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা। কিন্তু এই স্বাধীনতা এদেশের সাধারণ মানুষকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তির উল্লাস এনে দিতে পারেনি,বরং তার বদলে এনে দিয়েছিল বেদনার আঘাত,স্বজন হারানোর যন্ত্রণা। মানুষের জীবনধারণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হল কোনো একটি জীবিকায় নিজেকে নিযুক্ত করা। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এই জীবিকা সংক্রান্ত নানান সমস্যা মানুষের জীবনকে জর্জরিত করে তুলেছিল। লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর জীবৎকালে সমাজে ঘটে চলা নানান ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছেন। সাহিত্যিকের সমকালীন বিভিন্ন ঘটনা তার কলমের দ্বারা পাঠক সমাজের সামনে এসে উপস্থিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ব্যক্তির জীবিকাগত সমস্যা কীভাবে তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল তার বহিঃপ্রকাশ আমরা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বহু ছোটগল্পে লক্ষ্য করতে পারি।

সমাজ জীবনের একটি ভিত্তিভূমি হল অর্থনীতি। সমাজে মানুষকে টিকে থাকতে হলে কোনো একটি জীবিকা অবলম্বন করতেই হয়। অর্থনৈতিক মানদণ্ডের উপর নির্ভর করে সমাজে মানুষকে প্রধানত উচ্চবিত্ত,মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি মানুষের জীবনধারণের জন্য অনিবার্য ভাবে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের প্রয়োজন এবং যার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের দ্বারা আমরা জীবনের অপরিহার্য উপকরণগুলি সংগ্রহ করতে পারি তাকেই বলা হয় জীবিকা। এই কারণেই যে কোনো মানুষের জীবনধারণের জন্য কোনো একটি পেশায় নিজেকে নিযুক্ত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

পূর্ববর্তী সময় থেকেই এদেশে বিভিন্ন পেশার মানুষ বসবাস করতেন। বিভিন্ন সামাজিক,রাজনৈতিক পরিবর্তনে এবং ক্রমপ্রবহমান সময়ের স্রোতে বহু জীবিকা লুপ্ত হয়েছে আবার অনেক নতুন জীবিকার দিশা খুঁজে পেয়ে মানুষ নতুন ভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে। সামাজিক বিভিন্ন অস্থিরতায় বহু মানুষ জীবিকা হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। দেশভাগের পর অসংখ্য উদ্বাস্তু মানুষ এদেশে প্রবেশ করার ফলে দেশে জনসংখ্যার চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং সেই সঙ্গে দেখা যায় কর্মসংস্থানের অভাব। স্বাধীনতার পর ১৯৫১ সালে এদেশে প্রথম জনগণনা হয়। এই জনগণনার পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় সে সময় পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার শতকরা ৪২.৮ শতাংশ মানুষ ছিলেন অ-কৃষিজীবী এবং ৫৭.২ শতাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু

ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক ভাবে এদেশ ক্রমশ পিছিয়ে যেতে শুরু করে। দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু হিসাবে এদেশে চলে আসা ছিন্নমূল মানুষরা নিজেদের পূর্বতন জীবিকার সমকক্ষ কোনো কাজ জোগাড় করতে না পেরে অসহায় অবস্থায় যে কোনো একটি কাজের আশায় মরিয়া চেষ্টা চালাতে শুরু করেছিলেন। আর এদেশীয় মানুষ যারা সামান্য বেতনের কোনো পেশায় নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন তাদের অবস্থাও সে সময় একেবারেই সুখকর ছিল না। সংসার চালানোর তাগিদে নারীরাও এসময় বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিজেকে নিযুক্ত করেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রচিত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিভিন্ন ছোটগল্পে আমরা দেখতে পাই স্বাধীনতা পরবর্তীকালের সমাজে জীবিকাগত সংকট কিভাবে সাধারণ মানুষের জীবনকে জর্জরিত করে তুলেছিল। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কয়েকটি ছোটগল্প আলোচনা করলেই আমরা এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারি এবং পুরুষের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রবেশ ও নারীর জীবনে ঘটে যাওয়া জীবিকা সংক্রান্ত নানান সমস্যা সম্পর্কেও অবগত হতে পারি।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখা বিখ্যাত একটি ছোটগল্প হল 'কাঠগোলাপ'। জীবিকাগত সংকট সাধারণ মধ্যবিত্তের সাংসারিক জীবনকে কিভাবে দুর্বিষহ করে তোলে সেই করুণ চিত্র আমরা এই গল্পে ফুটে উঠতে দেখি। এই ছোটগল্পের কাহিনি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় গল্পের চরিত্র নীরদ পাবলিসিটি কোম্পানির অফিসের একজন কেরানি। দীর্ঘ কয়েক বছর মেস-হোটেলের খাবার খেয়ে অতি কষ্টে কলকাতায় থেকে চাকরি করার পর দেশভাগ ও পাকিস্তানের হাঙ্গামার কারণে গ্রাম থেকে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে আসে কলকাতা শহরে। পরিবার নিয়ে থাকার জন্য শহরতলীর বুকে ঘর ও জোগাড় হয় একটি। একতলার স্যাঁতস্যাঁতে ঘর,চুন-বালি ঝরা দীর্ঘকালের পুরানো দেওয়াল,জানলা খুললেই নর্দমার গন্ধ,ব্যবহারের অযোগ্য বাথরুম,নোংরা ভরা উঠোন ইত্যাদি অসুবিধার মধ্যে কলকাতায় নতুন সংসার শুরু করতে হলেও নীরদের স্ত্রী অণিমা কলকাতায় থাকার আনন্দে অত্যধিক খুশি। কলকাতা শহরের বিলাস-ব্যসনের সঙ্গে পাল্লা দিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকা কেরানির স্ত্রী অণিমা ধীরে ধীরে বে-হিসেবী হতে শুরু করে। যার ফলে স্বল্প মাইনেতে তার স্বামী নীরদের পক্ষে সংসার চালানো কষ্টকর হয়ে যায়। তাদের জীবনে আরো একটি দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে যেদিন অণিমা নতুন টেলিফোন ব্যবহারের উচ্ছাসে কাজের সময় স্বামীর অফিসে ফোন করে। অফিসে কাজের সময় স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনের কারণে অফিসের ম্যানেজারের কাছে অপমানিত হয়ে চাকরি ছেড়ে দেয় নীরদ। একটি অস্থায়ী চাকরি জোগাড় হলেও সেই বেতনে সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে যায়। নীরদ তার পরিচিত অনেককেই পূর্ববর্তী জীবিকা ত্যাগ করে নতুন জীবিকা গ্রহণ করতে দেখেছে। সে দেখেছে তার দেশের ভুবন ও ফটিক চন্দ আগে রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে দলিল লেখার কাজ করলেও বর্তমানে দুই ভাই ফল এবং সবজির ব্যবসা করে। দেশে মাস্টারীর কাজ করা নবীন

কোনো বাঁধা কাজ না পেয়ে অফিসে অফিসে ঘুরে ঘড়ি,পেন ইত্যাদি মেরামত করে উপার্জনের চেষ্টা করে। কখনও কখনও অভাব থেকে মুক্তি পেতে নীরদ এসব কাজ করার কথাও ভাবতে চায়। যদিও অণিমা তার স্বামীকে এই সব কাজ করতে দিতে চায় না। তাই শেষ পর্যন্ত সংসার চালানোর অর্থের প্রয়োজনে রাত জেগে ঠোঙা বানাতে শুরু করে অণিমা। কিন্তু এ কাহিনি শুধু কোনো ব্যক্তিনামের জীবন কাহিনি নয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বহু নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার জীবিকাগত সংকটের কারণে এইরূপ নানান কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল।

পূর্ববর্তী জীবিকা ত্যাগ করে নতুন একটি পেশায় নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে বাধ্য হওয়ার একটি চিত্র আমরা দেখতে পাই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'হেডমাস্টার' নামক ছোটগল্পটিতে। এই ছোটগল্পে দেখা যায় সাগরপুর এম.ই স্কুলের প্রাক্তন হেড মাস্টারমশাই কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার বেকারত্বের জ্বালায় বাধ্য হয়ে তার পূর্বতন কৃতী ছাত্র নিরুপম নন্দীর কাছে আসেন যে কোনো একটি চাকরি জোগাড়ের আশায়। নিরুপমকে বলা মাস্টারমশাই এর বক্তব্য থেকে জানা যায় দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাজিত হয়ে যাওয়ার পর পাকিস্তানের হুজুগে গ্রামের বেশিরভাগ হিন্দু ছাত্র গ্রাম ছাড়ায় স্কুলের ছাত্র সংখ্যা অনেক কমে যায়। আর থেকে যাওয়া গুটিকয়েক ছাত্র ঠিকমতো বেতন দিতে না পারায় শিক্ষকদের বেতনের অর্থে সংকট দেখা যায়। গ্রামের চৌধুরী বাড়িতে ভালো মাইনেতে মাস্টারমশাই গৃহশিক্ষকতা করে সেই অর্থে দিনাতিপাত করলেও তারা দেশ ছাড়ায় সে রোজগারও বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তিনি পরিবার নিয়ে নিজেও দেশ ছেড়ে কলকাতায় এসে কালীঘাটের একটি বস্তিতে ছোট একটি ভাড়াঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং শিক্ষকতা আর করবেন না এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রাক্তন ছাত্র নিরুপমের কাছে সাহায্যের জন্য আসেন। নিরুপম তার কর্মক্ষেত্র ব্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ কর্তা। তাই তার সুপারিশে সেই ব্যাঙ্কে একান্ন বছর বয়সী মাস্টারমশাই এর পঁচাশি টাকা বেতনের একটি চাকরি হয়ে যায়। প্রথমে ক্লিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে মাস্টারমশাই এর কাজ শুরু হলেও তার শিক্ষকসুলভ মনোভাবে ব্যাঙ্কের অন্য কর্মীদের ভুল ধরা স্বভাবের জন্য সবাই তাকে নিয়ে নালিশ জানাতে থাকে এবং একটার পর একটা ডিপার্টমেন্টে তার বদলি হয়। একজন শিক্ষকের শিক্ষাদানের আগ্রহ চিরকাল বজায় থাকে। সংসার চালানোর তাগিদে অন্য জীবিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়া মাস্টারমশাই ও তাই তার প্রকৃত সত্তা থেকে আত্মিকভাবে কখনো বিচ্যুত হননি তাই শেষ পর্যন্ত অফিসের পর বেয়ারাদের শিক্ষা দান করতে দেখা যায় তাকে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখা 'আকিঞ্চন' নামক ছোটগল্পটিতেও আমরা বৃদ্ধ প্রাক্তন শিক্ষক বিপিনবাবুকে আর্থিক অনটনের কারণে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় দেখতে পাই। দেখা যায় অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় অর্থ উপার্জনের কোনো পন্থা আবিষ্কার করতে না পেরে বিপিনবাবু নিজের প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে টাকা ধার চেয়ে চিঠি লিখে নিজের বেকার পুত্রকে তাদের কাছে পাঠান। পিতার লেখা চিঠি নিয়ে বিপিনবাবুর বেকার পুত্র

বিজনকেই যেন ভিক্ষুকের মত পিতার প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে ঘুরে বেড়াতে হয়। কোনো চিঠির বিষয়বস্তু থাকে বিজনের জন্য একটি চাকরি প্রার্থনা আবার কোনো চিঠিতে থাকে সামান্য অর্থ ধার দেওয়ার জন্য প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে একজন গুরুর সবিনয় অনুরোধ। শিক্ষক অবস্থায় বিপিনবাবু অনেক ছাত্রদের পড়িয়েছেন যাদের অনেকেই কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষায় পাশ করে কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন উচ্চপদে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাদেরই শিক্ষক বিপিনবাবুর অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে কোনো ভাবে অর্থ জোগাড় করতে না পারলে পরেরদিন রান্না করার মত কোনো সামগ্রীও তার সংসারে উপজীব্য নেই। কোনো ছাত্রের কাছে তিনি সামান্য কিছু টাকা ধার পান আবার কেউ কেউ পত্রপাঠ বিদায় করে দেয় বা ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দেয়। জীবিকাহীনতা সাধারণ মানুষের জীবনকে কতটা অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয় তার বহিঃপ্রকাশ আমরা এই ছোটগল্পটিতে ফুটে উঠতে দেখি।

সামাজিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে অচল সংসারের হাল ধরতে অনেক নারী সে সময় পারিবারিক গণ্ডি পেড়িয়ে কোনো পেশায় নিজেকে নিযুক্ত করেছে। পুরুষের পাশাপাশি বা পুরুষের অক্ষমতায় নিজের উপার্জনে সংসারের মানুষদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের এই অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা তাদের পরিবার সব সময় ভালো ভাবে গ্রহণ করেনি। জীবিকাগত কারণে নানান সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে নারীরা। এই চিত্র আমরা দেখতে পাই ‘সেতার’, ‘অবতরণিকা’, ‘ছোট দিদিমণি’ ইত্যাদি ছোটগল্পে। এই তিনটি ছোটগল্প পর্যালোচনা করলে কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রবেশ,জীবিকাগত সংকট এবং নারীদের নিজস্ব স্বাধীন মতামত তৈরির বিষয়গুলি সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি।

‘সেতার’ নামক গল্পটিতে দেখা যায় এই গল্পের প্রধান নারী চরিত্র নীলিমার স্বামী সুবিমল অসুস্থ হয়ে দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকায় তার সংসারে অত্যন্ত অনটন দেখা যায়। সুবিমলের বয়স্ক পিতা মার্চেন্ট অফিসের হিসাব লেখার কাজ করলেও তার রোজগারে অসুখের চিকিৎসা,সংসার খরচ সমস্ত কিছু চালানো সম্ভব হয়না। তাই নীলিমা সংসারের হাল ধরতে একটি গানের টিউশনি জোগাড় করে। নীলিমার যে শ্বশুর-শাশুড়ি বিয়ের পর পুত্রবধূকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাটা দিতে দেননি তারাই সংসারের অচলাবস্থার কথা ভেবে নিমরাজী হয়েছেন নীলিমার রোজগার করতে বেরোনোর জন্য। গানের টিউশনির পাশাপাশি আরো কিছু উপার্জনের আশায় সেতার শিখে নীলিমা কিছু সেতারের টিউশনি জোগাড় করে,প্রোগ্রাম ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলে রেডিওতে অনুষ্ঠানের সুযোগ পায়। অবশেষে সুবিমল সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এসে নীলিমার কাজে বাঁধা সৃষ্টি করে এবং তাকে বাঈজী বলে অভিহিত করে। সংসারের প্রয়োজনে একজন নারী নিজেকে স্বাবলম্বী করে তুললেও জীবিকার কারণে সংসারের মানুষদের কাছে যথাযোগ্য সন্মান লাভ করে না।

'অবতরণিকা' ছোটগল্পটিতে দেখা যায় নায়িকা আরতি একজন চাকরিজীবী মহিলা। কিন্তু গল্পের কাহিনির শুরুতেই দেখা যায় তার এই চাকরি নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে। আরতির শ্বশুর ও শাশুড়ি পুত্রবধূর চাকরি করতে যাওয়ার কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন ও নানান কথা বলেছেন। সংসারের প্রয়োজনে আরতির স্বামী সুব্রত নিজের ইচ্ছায় প্রথমে স্ত্রীকে চাকরি করতে পাঠালেও পরে তার মনে হয়েছে বাইরে চাকরি করতে বেড়িয়ে স্ত্রীর স্বাধীনচেতা মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে,স্বামীর প্রতি নির্ভরতা তার ক্রমশ কমে আসছে। এই মনোভাব থেকেই স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু নিজের দৃঢ়চেতা মানসিকতায় স্বামীর নির্দেশ মেনে চাকরি ছাড়তে রাজি হয়নি আরতি। এই আরতিকেই আবার আমরা দেখি নিজের বান্ধবীর সম্মানের কথা ভেবে অফিসে বসের বিরুদ্ধাচরণ করেছে সে এবং নিজের চাকরিটি ছেড়ে দিয়ে যেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখা 'ছোটদিদিমণি' গল্পে আমরা দেখি রেবা অর্থাৎ গল্পের নায়িকা সংসারে আর্থিক টানাপড়েনের কারণে অভাব মেটানোর জন্য একটি স্কুলে কেরানির চাকরি নিতে বাধ্য হয়। যদিও এই চাকরি তাকে মানসিক শান্তি এনে দিতে পারেনি। সে বারবার স্বামীর কাছে আক্ষেপের সুরে বলেছে স্কুলে ঢুকে পড়াতে না পারলে সেই চাকরির কোনো সার্থকতা নেই। যদিও কেরানির চাকরি করেও তার কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ স্কুলে প্রত্যেকের কাছে যথাযোগ্য সম্মান পেয়েছে রেবা। কিন্তু এই চাকরি নিয়ে স্বামীর কাছ থেকে বিভিন্ন সময় নানান ব্যাঙ্গ বিদ্রুপও পেয়েছে সে। যদিও স্বামীর কাছে পাওয়া নানা ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ সহ্য করেও সে চাকরিটি টিকিয়ে রাখতে চেয়েছে নিজের সংসারের স্বচ্ছলতার কথা ভেবে এবং নিজের স্বাধীন চিন্তা চেতনার দ্বারা নিজের পুত্রকে কুপথ থেকে ফিরিয়ে এনে তাকে আবার একজন ভালো মানুষ রূপে গড়ে তোলার পন্থা খুঁজে পেয়েছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর সাহিত্যজীবনে অসংখ্য ছোটগল্প রচনা করেছেন। তাঁর রচিত প্রতিটি ছোটগল্পই বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় স্বমহিমায় মহিমান্বিত হয়ে আছে। বিশ্বযুদ্ধ,সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা,স্বাধীনতা অর্জন ও দেশভাগ,উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনা পরপর সমাজের বুকে ঘটে চলার কারণে মধ্যবিত্ত মানুষের আত্মশক্তির অবক্ষয় ঘটেছিল। সামাজিক,অর্থনৈতিক সমস্ত দিক থেকেই তারা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। জীবিকাগত সমস্যা তাদের জীবনকে আরো দুর্বিষহ করে তুলেছিল। অর্থনৈতিক সংকটের যে প্রভাব মানুষের জীবনে পড়েছিল তার ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বহু ছোটগল্পে। স্বল্প পরিসরে উপরিউক্ত কয়েকটি ছোটগল্পের আলোচনার দ্বারা জীবিকাগত সমস্যা মানুষের জীবনকে কিভাবে দুর্বিষহ করে তুলেছিল সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা সম্ভব। আর একথা বলাই যায় সহজ সরলতায় সাধারণ মানুষের জীবন কাহিনি ছোটগল্পের মাধ্যমে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে

নরেন্দ্রনাথ মিত্র একজন সচেতন গদ্যশিল্পী হিসাবে বাংলা ছোটগল্পের জগতে তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের দরবারে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

তথ্যসূত্র:

১। নরেন্দ্রনাথ মিত্র গল্পমালা ১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬, ত্রয়োদশ মুদ্রণ আগস্ট ২০১৮।

২। নরেন্দ্রনাথ মিত্র গল্পমালা ২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৮৯, অষ্টম মুদ্রণ জুন ২০১৮।

৩। সাত দশক সমকাল ও আনন্দবাজার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০০৫।

বহুমুখী ভাবনা ও বহুমাত্রিক পাঠ: সুকুমারী ভট্টাচার্যের মহাভারত চর্চা

স্নেহাশিস দাস কর্মকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর মহাভারতের পাঠে এই মহাকাব্যকে একাধিক অভিমুখ থেকে পড়তে চেয়েছেন। মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনাবলী ধরে ধরে বলতে চেয়েছেন যে মহাভারতের ঘটনাগুলির অভিঘাত পাঠকের কাছে সংকটের এবং গভীর মানসিক দ্বন্দ্বেরও বটে। এই সংকট ভারতীয় অন্য মহাকাব্যতে একেবারেই আমরা পাব না, আমাদের আলোচনায় তাই উঠে এসেছে নিষাদ মা ও পুত্রদের হত্যা থেকে শুরু করে পাঞ্চালীর বস্ত্রহরণ এবং মহারথীদের অন্যায়ভাবে মৃত্যু। এছাড়াও জীবনের অর্থ, মানব জীবনের সার্থকতা নিয়েও মহাভারতের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আখ্যান আমাদের নানাভাবে জীবনের মানেকে একাধিক দিক থেকে ভাবতে অনুপ্রেরণা দেয়। মূলত এই বিষয়গুলিকেই কেন্দ্র করে আমাদের আলোচনা আবর্তিত হয়েছে।
সূচক শব্দ: পাঠক মনের সংকট, জীবনদর্শনের পার্থক্য, বহুমাত্রিক ভাবনা, দেবতার কাজের প্রতি প্রশ্ন, মহৎ সত্য।

মহাভারতকে নিয়ে মার্কসীয় বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে যে ব্যক্তিরা চর্চা করেছেন, তাদের মধ্যে সুকুমারী ভট্টাচার্য অন্যতম একজন। গাঙচিল প্রকাশিত সুকুমারী ভট্টাচার্যের মহাভারত সম্পর্কিত প্রবন্ধগুচ্ছের নাম হল-*আপেক্ষিক মূল্যায়নে রামায়ণ ও মহাভারত* । এই প্রবন্ধগুচ্ছের মধ্যে মোট ষোলটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। সুকুমারী ভট্টাচার্যের অন্যান্য প্রবন্ধগুলির মতো এখানেও মহাভারতকে নিয়ে আলোচনার সূত্রে উঠে এসেছে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, ভারতীয় পুরাণ, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি একাধিক বিদ্যায়তনিক জ্ঞানচর্চার শাখাসমূহ। প্রাবন্ধিকের মহাভারত আলোচনাটি আয়তনে খুব একটা বড়ো না হলেও এই বিষয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মতামত আমরা পেয়েছি। প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য মহাভারতকে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রামায়ণের সঙ্গে তুলনা ও প্রতিতুলনার মধ্যে দিয়ে মহাভারতের দ্বন্দ্ব, সংকট, জটিলতা এবং জীবনবোধ উপস্থাপন করেছেন। এই বিষয়ে সুকুমারী ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণে আমাদের মনে হয়েছে যে রামায়ণের কাহিনি সহজ ও জনপ্রিয়; অন্যদিকে মহাভারত প্রথম থেকেই একাধিক কাহিনি ও উপকাহিনিতে বহুস্তর বিশিষ্ট, জটিল ও কম জনপ্রিয়। রামায়ণের সারল্যের বিপরীতে মহাভারতে নানান সামাজিক অসমতা ও নৈতিক সংকট নিয়ে যে জটিল বুনন

তা পাঠক মনে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মহাভারত তাই পাঠক ও শ্রোতার কাছে দাবি করে ঐকান্তিক মনোযোগ এবং একনিষ্ঠ চিন্তা।

প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য তাঁর এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে মহাভারতের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে দেখাতে পেরেছেন যে মহাভারতের দ্বন্দ্ব এবং সংকটের কারণেই পাঠকের প্রতিক্রিয়া কখনোই একমুখী হয় না। মহাভারতের কাহিনির মধ্যে পাঠক অথবা শ্রোতা কারোরই জোরালো সমর্থন এক পক্ষের দিকে থাকে না, অন্যদিকে সীতা হরণের পর রামায়ণে পাঠকের সমর্থন প্রগাঢ়ভাবে রামের দিকেই। রামায়ণের পাঠক নিজেরাই চাইছে যে যুদ্ধে রাবণের পরাজয় এবং রামের বিজয়। কিন্তু মহাভারতের ক্ষেত্রে হিসাবটা অনেকটা জটিল, এখানে ন্যায় এবং অন্যায়ের মাঝে পার্থক্যের সীমারেখাটি রামায়ণের মতো স্পষ্ট নয়। সেটা যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলা হোক অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য, অঙ্গরাজ কর্ণ, অভিমুন্য, শল্য অথবা যুবরাজ দুর্যোধনের মৃত্যুই হোক । যুধিষ্ঠির নিজে শাস্ত্র বিদ্যায় যথার্থ জ্ঞানী হওয়ার পরেও পাশাখেলা অন্যায় জেনেও তা খেলেছে- ফলে পাঠক এখানে দোষ একতরফা ভাবে দুর্যোধনকে দিতে পারে না। পাঠকের প্রতিক্রিয়া দ্বিধাবিভক্ত স্বাভাবিকভাবেই হতে বাধ্য। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রত্যেক জন মহারথীদের মৃত্যুও স্বাভাবিকভাবে হল না, প্রতিটা ক্ষেত্রেই ছল-কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে, তাই সে ক্ষেত্রে পাঠক ও শ্রোতার মনে একটি দ্বন্দ্ব প্রতিনিয়তই অবস্থান করতে বাধ্য। রামায়ণের মধ্যেও কিছু কিছু নৈতিক সংঘাত অবশ্যই আছে, সেগুলির গুরুত্বও অনস্বীকার্য, তবু সেগুলি সংখ্যায় কম এবং অধিকাংশ সংঘাতই পাঠককে উদ্ভ্রান্ত বা যন্ত্রণাতুর করে তোলে না। সমাজপতিদের বাঁধা ছকেই রামায়ণের কাহিনি এগিয়েছে, মূলত পরিবারনিষ্ঠ ও সমাজনিষ্ঠ মূল্যবোধ সরলরৈখিক ভাবে রামায়ণে এসেছে। রামায়ণের মধ্যে অলৌকিকতার প্রচুর উপাদান আছে, কাব্যটি কাব্যিক উপমায় ও রসে ভরপুর, কাহিনির প্রয়োজনে যখন যেটা হওয়া প্রয়োজন সেটাই ঘটেছে এবং বাস্তব অবাস্তবের মধ্যে ভেদ নেই। সাধারণ পাঠকের কাছে তাই রামায়ণের জনপ্রিয়তা মহাভারতের থেকে অনেক বেশি। অন্যদিকে মহাভারত দাবি করে ঐকান্তিক মনোযোগ এবং একনিষ্ঠ চিন্তা, মহাভারতের এই দাবিই তাকে অধিকতর জটিল করে তুলেছে। কিন্তু, প্রাবন্ধিক তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে দেখাতে পেরেছেন যে মহাভারত জটিল ও বহুস্তরবিশিষ্ট হওয়ার কারণে যে মহাভারত আগ্রহ এবং নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করে সে সমৃদ্ধ হয় বেশি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মহাভারতের *স্ত্রীপর্বে*-র একটি উপাখ্যান বলা যেতে পারে। প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য মানুষের জীবন সম্পর্কে *স্ত্রীপর্বে*-র একটি উপাখ্যান উল্লেখ করেছেন, যেখানে জীবন সম্পর্কে মহাভারত যা বলতে চায় তা বিধৃত হয়েছে:

> এক ব্রাহ্মণ রাক্ষসবহুল এক বনে প্রবেশ করেন। সেখানে অনেক সিংহ, বাঘ , হাতি চারিদিকে ঘুরছে। দেখে ব্রাহ্মণটির ভয়ে রোমাঞ্চ হল। দেখলেন চারিদিকে জালে ঢাকা এক বনভূমি তাকে এক নারী দু-হাতে বেষ্টন করে আছে।......................................
> ....মানুষ সংসারে নিক্ষিপ্ত হয়ে এই ভাবেই বেঁচে থাকে।[১]

'জীবনদর্শনের পার্থক্য' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য *স্ত্রীপর্বে*-র এই উপাখ্যানটি উল্লেখ করার মধ্যে দিয়ে মানব জীবন সম্পর্কে এক নতুন ধারণা দিলেন। জীবনের অর্থ, বেঁচে থাকার কারণ সম্পর্কে নতুন এক পথ মহাভারত এখানে বলছে। আমরা জানি মানব জীবনে ভয়, সংকট এবং আশঙ্কা থাকবেই। উপরের উপাখ্যানটি থেকেই দেখতে পাচ্ছি যে অনিবার্য মৃত্যুর বহুবিধ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও প্রতিকূল পরিবেশে মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। কীসের ইচ্ছা ও অতৃপ্তি তাকে বাঁচিয়ে রাখে? এখানেই মহাভারত বলছে যে মৌচাক থেকে পড়া ফোঁটা ফোঁটা মধু, যেটি পান করে মানুষ কখনওই তৃপ্ত হয় না, কিন্তু যার জন্য লোলুপতা তাকে বাঁচিয়ে রাখে, জাগিয়ে রাখে পরবর্তী মধু পানের প্রত্যাশায়। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই মধু-র স্বরূপ প্রত্যেক জীবনে ভিন্ন, কোথাও এটি কর্ম, কোনও জায়গায় প্রেম অথবা মানবিক আদর্শ, কোথাও আবার অন্য কিছু। এটির স্বরূপ যাই হোক, এই মধু বিন্দু মানুষটিকে তার অতৃপ্তি ক্রমশ বাড়িয়েই দেয়। *স্ত্রীপর্বে*-র এই আখ্যানে মহাভারত মানব জীবনের পুনর্মূল্যায়ন করেছে। মানব জীবন সম্পর্কে এরকম জটিল ভাবনা রামায়ণে নেই। প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য খুব সুন্দরভাবে আলোচনার মাধ্যমে দেখাতে পেরেছেন যে এই রচনা বৌদ্ধ ধর্মের 'নির্বাণ' বা উপনিষদের 'মোক্ষ' কল্পনার পরবর্তী সময়ের কথা। এখানে 'নির্বাণ' লাভের বাইরে গিয়ে মানুষের বাঁচার প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাচ্ছে।

প্রাবন্ধিক সুকুমারী তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে দিয়ে একজন পাঠক অথবা শ্রোতার মহাভারত পাঠের বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার প্রসঙ্গটি নানাভাবে উপস্থাপন করেছেন। প্রাবন্ধিক *শান্তিপর্ব, অনুশাসনপর্ব* নিয়েও বেশ কিছু পাঠক মনের সংকটের কথা বলতে চেয়েছেন। এই পর্বগুলির মধ্যে একাধিক স্ববিরোধী বক্তব্য রয়েছে, যেখানে পাঠককে সহজেই বিভ্রান্ত হতে হয়। পাঠক বা শ্রোতার বোধগম্য হয় না, সে সংকট ও দ্বিধায় পড়ে। এই বিষয়ে দু'একটি প্রসঙ্গ তুলে ধরার চেষ্টা করছি :

> যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম বলছেন, তীক্ষ্ণ বিষ কালসাপ, ক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধার, বিষ ও নারী একই রকম প্রাণনাশক; আর যা-ই করো, যুধিষ্ঠির, নারীকে কদাপি বিশ্বাস কোরো না।[২]

এখানে পিতামহ ভীষ্মের মুখ থেকে যেটি উচ্চারিত হল সেটি নারী সম্পর্কে তার মনোভাব স্পষ্ট করে। বক্তা চিরকুমার, ব্যক্তিগতভাবে নারী সম্পর্কে সুগভীর ধারণা থাকা সম্ভব নয়। অন্যদিকে যুধিষ্ঠির ব্যক্তিগত জীবনে একাধিক নারী সঙ্গ পেয়েছে, ফলে

শ্রোতা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ। এই পরস্পর বিরোধী দুইটি বিষয় হাস্যকর ও অপ্রয়োজনীয় বলে পাঠক মনে করে। ফলে পাঠকের কাছে পিতামহ ভীষ্মের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব দেখা যেতে পারে, আবার বিভিন্ন শাস্ত্র জ্ঞানে শাস্ত্রজ্ঞ ও নিপুণ যুধিষ্ঠিরও ভীষ্মের উক্তি বিনা সমালোচনায় মেনেও নেয়। আমরা বুঝতে পারি গুপ্তযুগ থেকে যে সামাজিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল; সেখানে নারীর সামাজিক অবনমন এবং পুরুষ কর্তৃক অবদমন লক্ষণীয়। মূলত সেই কারণেই সামাজিকভাবে নারীর একটি চিত্রকল্প বা ইমেজ নির্মাণের প্রয়াসটি এই পর্বগুলিতে পাওয়া যায়। তবে উদ্দেশ্য যাই হোক, শরশয্যায় শুয়ে পিতামহের নারী সম্পর্কে এইরূপ উক্তি পাঠক মনে বিভ্রান্তি তৈরি করে। পাঠকের প্রতিক্রিয়া এখানে একেবারেই একমুখী হয় না। এরকম অনেক শ্লোকেই নিম্নবর্গের প্রতি হীনতা, রাজার প্রতি প্রজাদের বশ্যতা, পুরুষের প্রতি নারীর আনুগত্য, সম্ভোগের আনন্দ, নিয়তির প্রতি পুরুষকারের সম্বন্ধ প্রভৃতি-উপস্থাপন করা হয়েছে। মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ মানুষের পৌত্রের হাতে শেষ উত্তরাধিকার তুলে দেওয়ার যথার্থ নমুনা কি এটি? পাঠকের কাছে এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর থাকে না।

আবার মহাভারতের *শান্তিপর্বে* অন্য একটি জায়গাতে মানুষকে ঈশ্বরের ওপরেও স্থান দিয়েছে এই ভীষ্মই। ভাবতে অবাক লাগে যে এতক্ষণ ভীষ্ম নিম্নবর্গ, নারী প্রভৃতির সামাজিক অবস্থান নিয়ে সমালোচনা করে এসেছে; সেই একই ব্যক্তি এখন আবার মানুষের স্থান সবার উপরে-এই কথা যুধিষ্ঠিরকে বলছে।

> তাই এক জায়গায় প্রায় অপ্রাসঙ্গিক তাবেই সহসা ভীষ্ম বলেন, ‘গোপন একটা রহস্য তোমাকে বলি। যুধিষ্ঠির, মানুষের চেয়ে বড় কোনও কিছুই নেই।’ [৩]

আবার দেবতার ক্ষমতা, কাজের ত্রুটি প্রভৃতি বিষয়েও একাধিক প্রশ্ন এবং সংকট উঠে এসেছে এই মহাভারতেই। দেবতারা সর্বদাই সঠিক, কোনও ত্রুটিপূর্ণ কর্ম তাদের পক্ষে হওয়া সম্ভব নয়- দেবতার উপর মানুষের এই বিশ্বাস মহাভারতেই ফাটল ধরেছে। প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর *বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য* নামক প্রবন্ধ সংকলনের বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে বৈদিক যুগ ও সমাজের সংশয়ের নানা আখ্যান বলেছেন। সেখানে আমরা দেখেছি দেবতার প্রতি ভক্তি সহকারে পূজা ও যাগ-যজ্ঞ করা সত্ত্বেও অনেক সময় মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত ফল পায়নি।[৪] এই নিয়ে বিস্তারিত যুক্তিপূর্ণ আলোচনার শেষে আমরা দেখেছি যম ও নচিকেতার মধ্যে হওয়া কথোপকথন।[৫] সংশয়ের চূড়ান্ত রূপ আমরা সেখানে পেয়েছিলাম। মহাভারতের মধ্যেও এরকম কিছু সংশয়, সংকট ও দ্বন্দ্ব প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন :

> ঋষি অণীমাণ্ডব্য মৌন অবলম্বন করে তপস্যা করছিলেন নিজের কুটীরে। কয়েকজন চোরকে নগররক্ষীরা তাড়া করতে তারা নিরুপায় হয়ে চুপি চুপি চোরাই মাল ঋষির কুটীরে রেখে পালিয়ে যায়।

....তখন অণীমাণ্ডব্য ধর্মকে উদ্দেশ করে অভিশাপ দিয়ে বলেন, অজ্ঞান বালকের লঘু পাপে এই গুরুদণ্ড বিধান করার অপরাধে ধর্মকে মর্তে জন্মাতে হবে শূদ্রযোনিতে। ধর্ম শূদ্ররূপে অবতীর্ণ হলেন, বিদুর রূপে।[৬]

এই অভিশাপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মহাভারতে। কারণ পাঠক ও শ্রোতার মনে আজন্ম লালিত বিশ্বাসে এটি কুঠারাঘাত করেছে। ধর্ম নিজে দেবতা হয়েও সে অন্যায় করেছে। আবার দেবতার অন্যায়ের সাজা একজন মানুষ দিচ্ছে। এখানে একজন সৎ ঋষি মানুষ দেবতার দণ্ডদাতা হয়ে দেবতার উপরে স্থান পেল। মহাভারতের আদিপর্বে এইরকম আরেকটি উপকাহিনি পাওয়া যায় :

যমরাজের দূতেরা এক ব্যক্তিকে পরলোকে নিয়ে গেল; তাকে দেখে যম বললেন, 'ভুল হয়ে গেছে। এরা অর্থাৎ যমদূতেরা নামসাদৃশ্যে ভুল লোককে ধরে এনেছে।' পরে লোকটির কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে তাকে মর্তে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।[৭]

প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য এই সকল দৃষ্টান্তগুলি তুলে ধরার দ্বারাই আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন যে মানুষের মনের গভীরতম বিশ্বাসটি মহাভারতের মতো রামায়ণে পাঠক বা শ্রোতার কাছে এত জটিল হয়ে ওঠে না। রামায়ণের পাঠক বা শ্রোতা তার পূর্ব প্রত্যয়গুলির সমর্থন খুঁজে পায় মহাকাব্যে, কাব্যটি তার কাছে সহজেই সন্তোষ ও প্রশংসার আধার হয়ে ওঠে। অন্যদিকে মহাভারত তার পাঠককে প্রত্যয়ের প্রান্তে বরাবরের মতো দাঁড় করায়। ফলস্বরূপ পাঠক বা শ্রোতার প্রতিক্রিয়া মহাভারতে দ্বিখণ্ডিত। এইসব সত্ত্বেও প্রাবন্ধিক মহাভারতের সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, যথেষ্ট ধৈর্য ও বিবেচনার দ্বারা মহাভারত পাঠ করা গেলে আপাতত প্রত্যয়-ধ্বংসের অপরদিকে এক গভীরতর উপলব্ধিতে পৌঁছানো যায়, যেখানে জীবনের জটিলতার বহুবিধ ব্যাখ্যা মেলে।

মহাভারতের পাঠকের মনের মধ্যে যখন দ্রৌপদী সহ চার পাণ্ডবের মৃত্যুর কারণটি যথার্থ বলে মনে হয় না, পুরো বিষয়টিতে পাঠক বা শ্রোতা যখন প্রতি পদে পদে অসামঞ্জস্যতা দেখতে পায়। তখন আমাদের যুক্তিবাদী মনে প্রশ্ন জাগে পাশাখেলা, দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর কারণ হিসেবে অর্ধসত্য উচ্চারণ করা সহ অন্যান্য গুরুতর অপরাধের কারণে যুধিষ্ঠিরের মৃত্যু স্বর্গ আরোহণকালে হল না কেন? যুক্তিবাদী পাঠক বা শ্রোতার কাছে আপাত ভাবে এই প্রশ্নের কোনও উত্তর মেলে না। পাঠক এইখানে এসে যুধিষ্ঠিরের নিষ্পাপ ধর্মাত্মতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়। বিভিন্ন শাস্ত্রের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, পাশা খেলা গুরুতর অন্যায় কাজ- এগুলি জেনেও যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুর দখলের লোভে শকুনির সঙ্গে পাশা খেলেছে। ফলস্বরূপ পাশা খেলায় হার এবং প্রকাশ্য রাজসভায় দুঃশাসন দ্বারা দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা। এই উপাখ্যানের মধ্যেই নিহিত আছে মহাভারত সম্পর্কে জনসাধারণের সংবেদনে একটা গুরুতর প্রত্যবায়। দ্রৌপদী যে প্রকাশ্য

রাজসভায় লাঞ্ছিত হল সেই বিষয়ে সেরকম কোনও সরব প্রতিবাদ হল না। বিদুর ও বিকর্ণ প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রতিপত্তি ছিল না। ফলে যুধিষ্ঠিরের জন্যই এক অর্থে এই লাঞ্ছনার অভিঘাত পাঠকের বিবেক ও বোধের কাছে তীব্রতর হল। এদিক থেকে ধর্মরাজের অপরাধ গুরুতর। আবার পাঁচ ভাইয়ের স্ত্রীকে একা যুধিষ্ঠির কীভাবে পণ রাখে? যে পাশা খেলায় নিজেকেই হারিয়েছে, নিঃস্ব হয়েছে, সে কীভাবে নিজের স্ত্রীকে পণ রাখতে পারে? ফলে তার স্বশরীরে স্বর্গে যাওরার প্রশ্নই আসে না। অথচ মহাভারত যুধিষ্ঠিরকে 'ধর্মাত্মা' হিসাবেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য এরপর খুবই যত্নসহকারে আমাদের দেখাতে পেরেছেন যে নানাবিধ দোষ ও পাপ কর্ম সচেতনভাবে করা সত্ত্বেও যুধিষ্ঠিরই কেন 'ধর্মাত্মা'। যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের মূল্যায়ন করতে গিয়ে কেবলমাত্র এই স্থানটিতেই প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সহমত হতে পেরেছেন।

যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে একাধিক বিচ্যুতি ছিল, এ কথা সত্য। মহাভারতে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে দেখতে চাইলে যুধিষ্ঠিরের অপরাধগুলি একেবারেই ক্ষমার অযোগ্য। মূলত যুধিষ্ঠিরের মাত্রাতিরিক্ত লোভের কারণেই পাণ্ডবদের পাশা খেলায় হার এবং পরবর্তীতে যেটির শেষ পরিণতি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। কিন্তু মহাভারতের এই সমস্ত ঘটনাগুলি পাঠকের মনে সংকট ও চিন্তার উদ্রেক করলেও শেষ পর্যন্ত আমরা যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের এমন কিছু বিষয় দেখতে পাই, শেষ পর্যন্ত যা যুধিষ্ঠিরকে 'ধর্মাত্মা/ধর্মপুত্র' নামে অভিহিত করতে একপ্রকার বাধ্য থাকে মহাভারতকার। এখানে অবশ্যই বলতে হয় যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে যুধিষ্ঠিরের মনের মধ্যে হওয়া অন্তর্দ্বন্দ্ব, আচার্যদের পায়ে ধরে যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি কামনা করা যুধিষ্ঠিরের কথা এবং সামান্য পাঁচটি গ্রামের বিনিময়ে সিংহাসনের ন্যায় সঙ্গত অধিকারের দাবিকে তুচ্ছ জ্ঞান করা ধর্মপুত্রের কথা। এই যে সামগ্রিকভাবে পুরো যুদ্ধ বিষয়টাতেই তার অসম্মতি, এখানেই যুধিষ্ঠির মহাভারতের অন্যান্য চরিত্র অপেক্ষা আলাদা হয়ে যায়। আপাতত লাভ, যশ, খ্যাতি ও সাম্রাজ্য পরিচালনার লোভকে ছাপিয়ে সে দেখতে পেয়েছে নরহত্যা পাপ। মূলত এই কারণেই শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার অধিকারী। মহাভারত জীবনের চূড়ান্ত শিখরে এইভাবে মানবতার জয়গান করেছে। প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য এইভাবে মহাভারতের বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার দিকটি দেখতে চেয়েছেন। ফলে কোনওরকম ভাবেই পাঠকের প্রতিক্রিয়া সহজ হয়ে ওঠে না। অন্যদিকে রামায়ণে স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি নিয়ে দুরূহ জটিল বোধ নেই। সেখানে কর্তব্য এবং অকর্তব্য অধিকাংশ স্থানেই সরলরৈখিক। রামায়ণে বালীকে হত্যা, শম্বুক বধ এবং সীতাকে পরিত্যাগ-মূলত এই তিনটি ঘটনা ছাড়া কোনও গভীর নৈতিক সংকট দেখা যায় না। তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য এই বিষয়গুলি যত্নসহকারে উত্থাপন করতে পেরেছেন।

এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচনার পাশাপাশি প্রাবন্ধিকের নজর এড়িয়ে যায়নি মহাভারতের একাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির উপর। সুকুমারী ভট্টাচার্যের নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ সংকলনটির মধ্যেই উঠে এসেছে জতুগৃহের প্রসঙ্গ, একলব্যের প্রতি হওয়া অবিচার, পিতামহ ভীষ্মের নিজ কৌমার্য রক্ষার প্রতিজ্ঞা ও তার ফলে সৃষ্ট সংকট, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধের প্রতি আপাত অনীহা এবং সেই কারণে সৃষ্ট সংকট, প্রতিনায়ক কর্ণের মৃত্যুতে পাঠক বা শ্রোতার মিশ্র প্রতিক্রিয়া, শল্যের ও দুর্যোধনের হত্যাকে নিয়ে একাধিক বিতর্ক, মহাভারতে অন্তর্দ্বন্দ্ব, মহাভারতে নৈতিক অভিঘাত,সংশয়ের উজ্জ্বলতা এবং এইরকম আরও একাধিক প্রসঙ্গ যেগুলি পাঠকের ভাবনাতে বহু প্রতিক্রিয়ার আবির্ভাব ঘটায়।

জতুগৃহের এই পরিকল্পিত হত্যার পরে সুকুমারী ভট্টাচার্য একলব্যের বিষয়েও অনুরূপ একটি টানাপোড়েন দেখাতে চেয়েছেন। আমরা জানি যে অর্জুনের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দ্রোণাচার্য। অর্জুনকে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রতিনিয়ত আচার্য দ্রোণ চেষ্টা করে গেছে। ফলে সেদিক থেকে বিষয়টিকে কিছুটা মানা গেলেও শুধুমাত্র নিম্নবর্গ চণ্ডাল হওয়ার কারণে একলব্যের এমন পরিণতি একেবারেই মহাভারতের পাঠক বা শ্রোতা মানতে পারে না। চণ্ডাল নিম্নবর্গের মানুষ হওয়ার কারণে জীবনের আপেক্ষিক মূল্য কম। মহাভারতের পাঠক বা শ্রোতা একলব্যের গুরুদক্ষিণা প্রদান এবং দ্রোণাচার্যের দক্ষিণা গ্রহণ-এই বিষয়টিকে সহজ স্বাভাবিক হিসাবে গ্রহণ করতে একেবারেই অক্ষম।

আবার গুরু দ্রোণাচার্যের মৃত্যুতেও মহাভারতের পাঠক বা শ্রোতার প্রতিক্রিয়া সহজ হয় না। দ্রোণাচার্যের মৃত্যু ঘটছে একটি মিথ্যা উক্তির কারণে, এই ক্ষেত্রে পাঠকের সহানুভূতি সহজেই দ্রোণের অভিমুখে যায়। কিন্তু সেও তো জীবনে একাধিকবার অসত্যের আশ্রয় নিয়েছে, কাজেই মিথ্যার দ্বারা দ্রোণের মৃত্যু যেন কোনও এক নৈতিক সুবিচারের ক্ষেত্রে পাঠক বা শ্রোতা মেনেও নেয়। যুদ্ধের শুরুতে যে দ্রোণাচার্য যুধিষ্ঠিরের আবেদনে সাড়া দেয়নি, সে সমস্ত দায়বদ্ধতা অস্বীকার করল কেবলমাত্র পুত্র-স্নেহের বশে। অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদে সে যুদ্ধ বিমুখ হয়ে গেল। সমস্ত বিষয়টির মধ্যে একটা করুণ দিক থাকা সত্ত্বেও একজন ক্ষত্রিয় বীরের পক্ষে একটি অনৌচিত্যও আছে। তাই দ্রোণাচার্যের মৃত্যুতে পাঠকের প্রতিক্রিয়া বহুমাত্রিক। নৈতিকতা ও আবেগের দিক থেকে দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া পাঠক বা শ্রোতার কাছে ভিন্ন। রামায়ণে কোনও মৃত্যুতেই এত বহুমুখী দ্যোতনা নেই।

প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য এরকম আরও বেশ কিছু সংকট ও দ্বন্দ্ব আমাদের দেখাতে পেরেছেন। যেগুলির মধ্যে অন্যতম পিতামহ ভীষ্মের আজীবন অবিবাহিত কুমার থাকতে চাওয়ার ইচ্ছে। প্রাবন্ধিক যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন যে, মহাভারতের এইরকম চরিত্রগুলির মানসিক দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েনের কারণেই মহাভারতের মতো মহাকাব্যের সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে। ভীষ্ম শান্তনুর সুখের

জন্য নিজে আজীবন কুমার থাকার বচনে আবদ্ধ হল, বাবার প্রেমকে সার্থক করার জন্য ভাবী বিমাতার কাছে চিরকৌমার্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া, এটি এতটাই অমানবিক যে পাঠক ও শ্রোতার কাছে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।

ভীষ্ম চরিত্রের এই দ্বিধা ও সংকট একান্তই মৌলিক এবং নিরতিশয় জটিল। এই টানাপোড়েন তাকে রামায়ণের বিভীষণের থেকে আলাদা করেছে। বিভীষণের কাছে রাবণ ছিল অন্যায়কারী ও পরস্ত্রী অপহরণকারী। তাই ধর্মের প্রতিভূ রামের নিকটে থেকেই ধর্মযুদ্ধে বিজয় কামনা করেছিল বিভীষণ। এখানে বিভীষণের বিবেকের দ্বন্দ্ব খুবই সরলরৈখিক। অন্যদিকে ভীষ্ম এই তীব্র মানব সংহারক যুদ্ধ না চাইলেও নিজ কর্তব্য মনে করে করতে বাধ্য হয়েছে। সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেছেন:

> যুদ্ধের ঠিক পূর্বমুহূর্তে যুধিষ্ঠির ছুটে এসে ভীষ্মের পায়ে পড়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে মিনতি করলেন। ভীষ্ম উত্তর দিলেন: 'মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কখনও মানুষের দাস নয়। এ কথা সত্য,মহারাজ, অর্থের জন্যেই আমি কৌরবপক্ষে আবদ্ধ। তাই এখন ক্লীবের মতো বলছি যুধিষ্ঠির, এ ছাড়া অন্য কিছু চাও।'[৮]

এই উক্তির মধ্যে দিয়ে দুইটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, ভীষ্ম একেবারেই যুদ্ধ চায় না। দ্বিতীয়ত, হস্তিনাপুরের কাছে রাজার সিংহাসন রক্ষার জন্য পূর্বপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ভীষ্ম আবার জানিয়েছে যুদ্ধের দিনগুলিতে অসংখ্য পাণ্ডব সৈন্য নিধন করলেও পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধ করবে না। অর্থাৎ কৌরবের আশ্রয়ে থেকে তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করবে। যুদ্ধে কৌরব পক্ষের প্রধান সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছে করে পাণ্ডবদের কোনও ক্ষতিসাধন না করা সেনাপতির কর্তব্যে প্রধান একটি ত্রুটি, কৌরবদের প্রতি ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা। এদিক থেকে সুকুমারী ভট্টাচার্য রামায়ণের বিভীষণের সঙ্গে ভীষ্মের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে চরিত্রটির দ্বান্দ্বিক ও জটিল দিকটি উপস্থাপন করেছেন। চরিত্রের এই সংকটময় পরিস্থিতি শুধুমাত্র মহাভারতেই মেলে, তাই মহাভারতে পাঠক বা শ্রোতা জীবনদর্শনের একটি পাঠ পেয়ে থাকে।

মহাভারতে কর্ণ এবং দুর্যোধনের মৃত্যুতেও পাঠক বা শ্রোতার মনের মধ্যে এক টানাপোড়েন কাজ করে। প্রাবন্ধিকের সঙ্গে আমরা সহমত যে কর্ণের জীবনের উপাখ্যানটি অত্যন্ত মর্মবিদারক, কারণ ক্ষত্রিয় হিসাবে জন্মালেও সারা জীবন সে সমাজের থেকে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। অস্ত্রশিক্ষা সে সহজে পায়নি। পরশুরামের কাছে অসত্য পরিচয়ে বিদ্যাশিক্ষা ও ব্রাহ্মণের কাছে না জেনে গোহত্যার জন্য মর্মান্তিক অভিশাপ পাওয়ার কারণে পাঠকের কাছে কর্ণের প্রতি অবশ্যই সহানুভূতি জন্মায়। কিন্তু দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার প্রতিশোধ নিতে যখন কর্ণ দ্যূতসভায় দ্রৌপদীকে 'দাসী ও বহুভোগ্যা' বলে অভিহিত করল, তখনই কর্ণ বীরের মর্যাদা থেকে

আপনিই বিচ্যুত হয়ে নেমে এল অমার্জিত কামুকের পর্যায়ে। অভিমুন্য বধের সময় কর্ণ সক্রিয় ছিল, তাই কর্ণপুত্র বৃষসেনকে যখন অর্জুন হত্যা করে তখন পাঠক বা শ্রোতার সহানুভূতি প্রতিহত হয়। পাণ্ডব পক্ষের সমস্ত প্রলোভন থাকলেও কর্ণ যখন দুর্যোধনের পক্ষেই থাকতে চাইল, সেই সময়ে মহাভারতের পাঠকের হৃদয়ে দ্বিধাহীন ভাবে কর্ণের স্থান হয়। জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সময়ে একগুচ্ছ অভিশাপের হঠাৎ নেমে আসা এবং অন্যায় যুদ্ধে কর্ণের পরাজয়ের কারণে পাঠকের সহানুভূতি স্বাভাবিকভাবেই তার দিকে যায়। কিন্তু কৌরবদের সঙ্গে মিলিতভাবে কর্ণ পাণ্ডবদের প্রতি একগুচ্ছ অত্যাচার ও অবিচার করেছে। যেগুলির মধ্যে অন্যতম- জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ও শকুনির সঙ্গে মিলিতভাবে নানা কুপরিকল্পনা প্রভৃতি। আবার কর্ণ প্রান্তিক সমাজের প্রতিনিধি না হওয়া সত্ত্বেও আজীবন সূতপুত্র হিসাবে ব্রাহ্মণ্য সমাজের কাছে প্রতিনিয়ত হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে, যা একেবারেই কাম্য নয়। তাই সুকুমারী ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন যে কর্ণের মৃত্যু আমাদের মানবিক সংবেদনে একটি জটিলতার সৃষ্টি করে।

মহাভারতকে নিয়ে প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্যের এই সকল বৌদ্ধিক অন্বেষণগুলি আমাদের মহাভারত চর্চায় নানাভাবে সমৃদ্ধ করে। মহাভারতের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি বিভিন্ন অভিমুখ থেকে বিশ্লেষণ করে প্রাবন্ধিক বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই মহাকাব্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংকট ও জটিলতা প্রতিটি স্তরে স্তরে জড়িয়ে থাকার কারণেই জীবনের মহত্তম সত্যে পৌঁছাতে তা পথ দেখায়।

সূচি :

১। ভট্টাচার্য, সুকুমারী; আপেক্ষিক মূল্যায়নে রামায়ণ ও মহাভারত, *প্রবন্ধ সংগ্রহ* ২, গাঙচিল, কলকাতা-১১১, সেপ্তেম্বের-২০১২, পৃষ্ঠা-২৮৮

২। পূর্বোক্ত- ২৯২

৩। পূর্বোক্ত- ২৯২

৪। ভট্টাচার্য, সুকুমারী; বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য, *প্রবন্ধ সংগ্রহ* ২, গাঙচিল, কলকাতা-১১১, সেপ্তেম্বের-২০১২, পৃষ্ঠা-১১১-১২৯

৫। পূর্বোক্ত-২২১

৬। ভট্টাচার্য, সুকুমারী; আপেক্ষিক মূল্যায়নে রামায়ণ ও মহাভারত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ২৯৩

৭। ভট্টাচার্য, সুকুমারী; আপেক্ষিক মূল্যায়নে রামায়ণ ও মহাভারত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২৯৩

৮ । ভট্টাচার্য, সুকুমারী; আপেক্ষিক মূল্যায়নে রামায়ণ ও মহাভারত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩১০

কল্পবিজ্ঞানের আলোকে প্রকাশ কুমার মাইতি’র ‘মেধা বৃদ্ধির দাওয়াই’

দীপান্বিতা কাঁড়ার
গবেষক, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপঃ এক কথায় কল্পনা ও বিজ্ঞানের সুদৃঢ় মেলবন্ধনে সৃষ্টি রচনাকে আমরা কল্পবিজ্ঞান বলে থাকি। সাহিত্যিক প্রকাশ কুমার মাইতি’র **‘মেধা বৃদ্ধির দাওয়াই’** কল্পবিজ্ঞানের অন্যতম একটি গল্প-সংকলনের নিদর্শন। এই গল্প সংকলনে মোট **১১**টি গল্প আমরা পাই। গল্পগুলির ঘটনা শোনা যায় গল্পকথক পরাণ চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের মুখে এবং এই গল্পগুলির শ্রোতা হল কিছু কিশোর-কিশোরী। তারা হল- বাঁশি, মানু এছাড়া পাশের বাড়ির পিংকি, মান্তু। সম্পর্কে পরাণ ভট্টাচার্য তাদের দাদু এবং অসাধারণ সব কল্প-গল্পের খনির ভাণ্ডার। আমরা জানতে পারি, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী সব তার ঘোরা, ধার্মিক, ভোজন রসিক, পরাজয় বলে কোনো শব্দ তার ডিকশনারিতে নেই। যা কেউ কোনদিন করতে পারে না তা তিনি করে থাকেন অনায়াসে। যেমন- ডিসেম্বর মাসের সেই ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডায় গঙ্গোত্রী থেকে কেদার-বদ্রীর পথে গমন, রূপকুন্ডের রহস্য সন্ধান, ইয়েতির অভিযানে যাওয়া, পিগমীদের সভ্যতা ঘুরে আসা, শ্বেত ভাল্লুকের পরিচয় কিংবা তারসা দ্বীপের রহস্য ভেদ ইত্যাদি অসাধারণ সব ঘটনার সাক্ষী পরাণ দাদু। এইসব অসাধারণ ঘটনা দক্ষতার সঙ্গে গল্পে উপস্থাপনায় লেখকের কৃতিত্ব অসামান্য। বিজ্ঞানের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণে গল্প গুলির মধ্য দিয়ে যে যে বিষয়গুলি উঠে আসছে তা আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যক্ত করার চেষ্টা করলাম।

সূচক শব্দঃ বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ, ইয়েতি বিষয়ক কল্পগল্প, জ্যোতির্বিজ্ঞান, মাটির অতল গভীরের সভ্যতা, তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাব, অদ্ভুত প্রাণী বিষয়ক।

মূল আলোচনাঃ আলোচনাটির সুবিধার্থে গল্পগুলির মধ্যে যে যে বিষয়গুলি কল্পনা ও বিজ্ঞানের সংমিশ্রণে উপস্থাপিত হয়েছে সে বিষয়গুলি কে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করে মূল আলোচনায় অগ্রসর হলাম।

- **জীববিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ বিষয়ক গল্প-**

কল্পবিজ্ঞানের অসাধারণ চিন্তাভাবনা লেখক এই গল্পসংকলনের প্রথম গল্প **‘মেধা বৃদ্ধির দাওয়াই’** এর মধ্যে উপস্থাপন করেছেন। স্থানীয় মানুষের মধ্যে রূপকুন্ডকে নিয়ে যে অপদেবতার বিশ্বাস রয়েছে তার রহস্য ভেদ করতে পরান দাদু সেখানে উপস্থিত। নিশুত রাতে কখনো গগনভেদী কান্নার সুর আবার কখনো হাসির আওয়াজে তিনি ভয় না পেয়ে রূপকুন্ডের রহস্যভেদ করেছেন। রূপকুন্ডের জলে নরকঙ্কালের ভেসে থাকার বিষয়ে কারণ হিসেবে তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নরকঙ্কাল ভাষার প্রসঙ্গে জলের

ঘনত্ব বেশি বা কঙ্কালের অংশবিশেষ বরফের সঙ্গে জমে থাকার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের তথ্য ও সূত্র মেনে বলা হয়েছে। এছাড়া আমরা জানতে পারি, শ্রীধরপাণি দত্ত তার পরিবারের পুরুষানুক্রমে বরফের গুহায় এক নিভৃত গবেষণায় নিমগ্ন- মেধা বৃদ্ধি ও অমরত্বের মহৌষধ প্রস্তুতির পরীক্ষা। মেধা বৃদ্ধির জন্য এই বরফের ভিতর জন্মানো বিলুপ্ত প্রজাতির শ্যাওলা স্বর্ণকন্যা ও মানুষের মাথার খুলিতে অক্সিপিটাল লোবের নিচে থাকা বিশেষ গ্রন্থির তাজা রস মিশিয়ে তৈরি এই মহৌষধ। এমন মহৌষধের মাধ্যমে ভারত জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারলেও নরহত্যার মতন এমন পৈশাচিক গবেষণাকে আমরা মানতে পারি না। তাই পরান দাদু ধিক্কার জানিয়েছেন এমন ঔষধকে এবং তিনি তা সংগ্রহও করেন নি। লেখক কল্পনার অসাধারণ মায়াজালে বিজ্ঞানের দৃঢ় মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। লেখক একই সঙ্গে শ্রোতাদের নীতি শিক্ষাও দিয়েছেন- যে নিজের স্মৃতি শক্তির উপর বিশ্বাস রাখা। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের পাশাপাশি লেখক সচেতন ভাবে অপপ্রয়োগ বিষয়টি পাঠক মহলে তুলে ধরেছেন।

- **ইয়েতি বিষয়ক কল্প-গল্প-**

'ইয়েতির গ্রামে' গল্পে লেখক হিমালয়ে ইয়েতির খোঁজে দুঃসাহসিক অভিযান করেন কিন্তু সেখানে ইয়েতির দেখা না মেলায় পরাণ দাদু হাজির হয়েছেন সিয়াচেনে। সিয়াচেনের অসাধারণ ভৌগোলিক বর্ণনা লেখকের মধ্যে দিয়ে পাই,-

> **"জম্মু কাশ্মীর ছাড়িয়ে চীন সীমান্তে। ভারতের ম্যাপের একেবারে উপরের অংশে- উত্তরের চিন আর পূর্বে আকসাই চিন। পশ্চিমে পাক অধিকৃত কাশ্মীর।"[১]**

এ থেকে বোঝা যায় পরান দাদুর বিশ্ব মানচিত্র বেশ নখদর্পণে। ইয়েতির প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন পনেরো কুড়ি ফুট লম্বা, সারা গায়ের লোম দ্বারা আবৃত, পরনে কেবল কোমরে পশুর ছালের মতো কিছু একটা, এরা থাকার জন্য তৈরি করেছে উঁচু-উঁচু বরফের বাড়ি। এছাড়া এদের কাছে আছে উন্নত যন্ত্রপাতি যার সাহায্যে এদের ভাষা পরাণ দাদু সহজে বুঝতে পেরেছিল। তারা পরান দাদুর কানে পরিয়ে দিয়েছে স্পঞ্জের মত নরম একটা বস্তু। যার দ্বারা তিনি ইয়েতিদের কথা সহজে বুঝেছেন আবার তার ভাষা রূপান্তরিত হয়েছে ইয়েতিদের ভাষায় অনেকটা ঠিক আধুনিক গুগল ট্রান্সমিটারের মতন মুহূর্তে ভাষা পরিবর্তন বা ভাষায় রূপান্তর ঘটেছে। এছাড়াও তারা মানুষের কার্যকলাপের দ্বারা পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে ইয়েতিদের মাধ্যমে লেখক-পাঠকদের সচেতন করেছেন। লেখক বিষ গ্যাসের বৃদ্ধি, পৃথিবীর জল স্তর বৃদ্ধি, চাঁদে আবর্জনা ফেলে আসা বিষয়গুলোর মাধ্যমে দূষণের কুফলের প্রভাব বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

- **অ্যাস্ট্রোফিজিক্স বা জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক কল্প-গল্প-**

'গুম্ফা পাহাড়ের বিজ্ঞানী' গল্পটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান নির্ভর একটি গল্প। লেখক খুব সুন্দরভাবে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স অর্থাৎ জ্যোর্তিবিজ্ঞানের তথ্য-সূত্রের মধ্য দিয়ে গল্পটির

উপস্থাপনা করেছেন। অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের বিজ্ঞানী গণপতি দিবাকরের গভীর জঙ্গলে বিজ্ঞানের সাধনার চিত্র লেখক পাঠকদের সামনে উপস্থাপনা করেছেন। ইউরোপ-আমেরিকা যা আবিষ্কার করছে তার ৩০/৩৫ বছর আগে গল্পে গণপতি দিবাকর তা আবিষ্কার করেছে-

> **"Surface temperature 11000F...Mercury's speed 1, 72, 248 km/hr; live volcanos are found in a Jupiter's moon.**
> **...Venus rotates on its own axis over aperiod of 243 days. Saturn has 33 moons."**[২]

এছাড়া তার নতুন প্রজেক্টের কাজ চলছে স্যাটেলাইট নিয়ে। 'আর-স্যাট টু'- যার মধ্যে স্পেস টেলিস্কোপ, জাইরোস্কোপ, রেকর্ডার, রেডিও ট্রান্সমিটার সকল সরঞ্জাম উপস্থিত। তার আবিষ্কৃত টেলিস্কোপ হুবেল-স্পিৎজার থেকেও উন্নত। এছাড়া তিনি 'আর-স্যাট চার' মহাকাশে পাঠিয়েছে যা পৃথিবী ছাড়িয়ে বৃহস্পতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, খবর পাঠিয়েছে বৃহস্পতির একটা চাঁদে প্রতিনিয়ত অগ্নুৎপাত চলছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি শেষে উন্মাদ হয়ে যান এবং সেই কারণ বশত নিজের গবেষণা কেন্দ্র বিস্ফোরণ করে নিজের সাথে সাথে সব গবেষণার চিহ্ন মাটিতে ধূলিসাৎ করে ফেলেন। এছাড়া গল্পের লেখক পরাণ দাদুর মধ্যে দিয়ে আকাশের নীল হওয়ার কারণ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও বিক্ষেপণের প্রসঙ্গ এনেছেন তা বিজ্ঞানসম্মত। আমরা জানি, আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে বিক্ষেপণের ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক। যে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি তার বিক্ষেপণ কম। যেমন- লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি তার বিক্ষেপণ কম কিন্তু বেগুনি ও নীল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম তাই বিক্ষেপণ বেশি। তবে প্রশ্ন হতেই পারে আকাশকে আমরা বেগুনি দেখি না কেন? নীল কেন দেখি! কিন্তু এর উত্তর রয়েছে, নীল আমাদের চোখে বেশি সংবেদনশীল তাই আমরা নীল রং এর দেখি।

- **মাটির তলে কাল্পনিক উন্নত সভ্যতা বিষয়ক গল্প-**

'কালাহারি অতলে' এই গল্পে গল্পকার পাঠকদের নিয়ে বিচরণ করেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মরুভূমিতে- প্রথম চীনের আটাকানা মরুভূমিতে, উত্তর-পশ্চিমে সিন কিয়ান প্রদেশে তাকলামাকান মরুভূমিতে, পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম গোবি মরুভূমিতে এবং অবশেষে পৌঁছেছেন বৎসোয়ানার কালাহারি মরুভূমিতে। গল্পকার পরান দাদুর মধ্যে দিয়ে গোবি মরুভূমির মঙ্গোলীয়দের অদ্ভুত কুঁড়েঘর, গিরগিটিকে পুজো করার বর্ণনা আমরা পেয়েছি। লেখক পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করেছেন সবচেয়ে অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য বিষয়- কালাহারি মরুভূমির অনেক তলদেশে পিগমীদের সুসভ্য দেশের বর্ণনা। তারা বিজ্ঞানের আধুনিক প্রযুক্তিকে খুব সচেতনতার সাথে তাদের অঞ্চলে ব্যবহার করছে। তারা সৌরশক্তিকে অর্থাৎ Solar Energy-কে কাজে লাগিয়ে আলো জ্বালাচ্ছে,

কলকারখানা চালাচ্ছে এমনকি সোলার ব্যাটারিতে সেখানে সমস্ত গাড়ি চলে। পেট্রোল-ডিজেল, রাসায়নিক সার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গল্পকার পিগমীদের দ্বারা আমাদের সচেতন করেছেন রাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয় দূষণের ভয়াবহ পরিণামের বিষয় সম্পর্কে। বর্তমানে যা পৃথিবীর অন্যতম সমস্যা। পিগমীরা বলেছে-

"তাদের গলায় প্রতিবাদের ঝড়- কোনটাকে বলছ আধুনিক? রাসায়নিক দূষণ আর তেজস্ক্রিয় দূষণের ফল যে কত মারাত্মক সে তোমরা বুঝবে কবে? তোমাদের ভুলের পরিণামে আর কয়েক দশকের মধ্যে সাহারা আর কালাহারি একসাথে জুড়ে গিয়ে হবে একটাই মরুভূমি।... একটু ছায়ার আশায় দৌড়াবে কুকুরের মত জিভ বের করে। কোথাও পাবে না এক ফোটা জল। তাই মাটির তলায় বানিয়েছি এই সভ্যতা।"[৩]

গল্পকার এই গল্পের মধ্য দিয়ে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা জানিয়েছেন। আমরা জানি, পৃথিবীতে সকল শক্তির উৎস সূর্য। সমস্ত পৃথিবীতে এই শক্তির ভাণ্ডার অফুরান। সৌরশক্তি হলো **পুনর্নবীকরণযোগ্য** শক্তির আধার। কয়লা, জীবাশ্ম জ্বালানির মতন এর **ভাণ্ডার সীমিত বা** Non-Renewable নয়। সৌর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা অনায়াসেই সৌর বিদ্যুৎ, সোলার কুকার(রান্নার ক্ষেত্রে), সোলার ব্যাটারি(গাড়ির ক্ষেত্রে), সোলার প্ল্যান(কলকারখানার ক্ষেত্রে), হর্টি কালচার পদ্ধতি(চাষের ক্ষেত্রে) প্রভৃতি সৌরশক্তিকে বিভিন্ন কাজে লাগানো যায়। পিগমীদের সৌর শক্তির ব্যবহার দ্বারা লেখক পাঠক মহলে এই সম্পর্কে জাগ্রত করেছেন।

- **<u>তেজস্ক্রিয় রশ্মির কুপ্রভাব ও কল্পবিজ্ঞানের গল্প-</u>**

'নীল আগুনের গোলা'- এই গল্পে গল্পকার পাঠকদের নিয়ে যান চীনের ড্রাগন-এর কাছে। একই সাথে জানতে পারি- ঐতিহাসিক সিল্করুট, নুব্রাভ্যালির ভৌগোলিক বর্ণনা, বিভিন্ন প্রজাতির অর্কিডের ধারণা। গল্পকার মূলত **তেজস্ক্রিয় রশ্মির** দীর্ঘদিন ধরে কুপ্রভাব কোন প্রাণীর শরীরে পড়লে তা কতটা ভয়ানক হতে পারে সেই সম্পর্কে সচেতন করেছেন। আকসাই চীনের ড্রাগনের বসবাস অঞ্চলের পাশে থাকা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবে সামান্য প্রাণী তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে এমন মারাত্মক রূপ ধারণ করবে তা মনে করা হয়েছে। ড্রাগনের মুখ থেকে নীল আগুনের গোলা বেরিয়ে আসা তারই ফল। সেজন্যই বান্টা ও গেসকুর মৃত্যুর পর নীল বর্ণের হয়। গল্পে পাই-

> **"মজার বিষয় কি জানো ভট্টাচাজ, খুব অল্প মাত্রায় তেজস্ক্রিয় রশ্মির কোন প্রাণীর শরীরে অনেক দিন ধরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করলে তার মৃত্যু হবে না। তবে প্রভাবিত হবে তার সোমাটিক সেল। ক্রমশ তা বড় হতে থাকবে- ভয়ঙ্কর ভাবে।"**[৪]

- **<u>অদ্ভুত প্রাণী বিষয়ক কল্প-গল্প-</u>**

'টেরোসরের পালক'- এই গল্পে পরান দাদুর দুঃসাহসিক অভিযান ব্রাজিলে। সেখানে তিনি নিয়ে যান প্রায় সাড়ে ছ' কোটি বছর আগে বিলুপ্ত টেরোসরের কাছে। সেই সুদূর

ক্রিটেশিয়াস যুগে। আছে পৃথিবীর আদিলগ্নের বিভিন্ন প্রাণী- যেমন ডাইনোসর, সামুদ্রিক সরীসৃপ মোসাসর, প্লেসিওসর, অসংখ্য সরীসৃপ। পরাণ দাদুর অসাধারণ বর্ণনা-

> **"অনেকখানি উটপাখির মতো চেহারা। কিন্তু মুখের দিকটা কুমিরের মতো লম্বা। দু'পাটি সাদা ধারালো দাঁত চকচক করছে। লেজটা সিংহের মত। তবে লোম নয় পালকে ভরা। পিঠে পালকের মাঝে কুমিরের মতো কাঁটা। পা দুটো পাখির মতো। ডানাগুলো বড় বড় পালকে ভরা"**[৫]

কল্পবিজ্ঞানের গল্পে পৃথিবীর আদিলগ্ন থেকে এইসব প্রাণীদের বর্ণনা আমরা বারবার পেয়েছি সাহিত্যিক সুকুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনায়। এছাড়া এই গল্পে গল্পকার ১৭000 প্রজাপতির মিলন-ভূমি ভ্যালি অফ বাটার-ফ্লাই-এর প্রসঙ্গ এনেছেন।

এছাড়া এই গল্প-সংকলনে আরো কয়েকটি গল্প রয়েছে। যেমন- **'ভীম গলদার খড়গ'** যেখানে নিকোবারের দক্ষিণপ্রান্তে পর্তুগীজদের ডুবে যাওয়া জাহাজের সন্ধান করতে গিয়ে ৪২ কিলো ওজনের গলদা চিংড়ির পরিচয় পাই। আবার **'শ্বেত ভালুকের খপ্পরে'**-গল্পে সুমেরু অঞ্চলের বিলুপ্তপ্রায় সাদা ভাল্লুকের পরিচয় করায় লেখক। **'তারসা দ্বীপের আলো'** গল্পটিতে লেখক মহামূল্যবান রত্ন হীরের প্রসঙ্গ এনেছেন। পৃথিবীর অনেক মূল্যবান সম্পদ যে এখনো অসংখ্য ছড়িয়ে আছে অজানা দ্বীপে এই প্রসঙ্গটি গল্পে আমরা জানতে পাই। **'নরখাদক তান্ত্রিক'** গল্পে বীভৎস রসের প্রকাশ হয়েছে এবং গল্পে তন্ত্রসাধনার অলৌকিক মায়াজাল বর্ণিত হয়েছে। এই সংকলনের শেষ গল্প **'কোমোডের ডিম'** পটভূমি ইস্টটিমর, রাজধানীর আমাদের পরিচিত রাজধানীর কাছাকাছি নাম- দিলি। সেই ইন্দোনেশিয়ার ভয়ংকর সরীসৃপের মুখোমুখি হয় পরাণ দাদু সেখানেই তিনি কোমোডের ডিম দেখতে পায়।

'মেধা বৃদ্ধির দাওয়াই'- গল্প সংকলনের প্রতিটি গল্প অসাধারণ ও চমকপ্রদ। লেখক গল্পগুলিতে কল্পবিজ্ঞানের নানা বিষয়ের সচেতন প্রয়োগ করেছেন। লেখকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে জানা যায়, পরান দাদুর মতন দাদু সম্পর্কীয় এক দাদু প্রতি পুজোর ছুটিতে তাঁদের বাড়িতে আসতেন এবং তখন ছোটবেলায় লেখকদের ভাই-বোনেদের আড্ডা জম-জমাট হতো। এই দাদু বিজ্ঞানের নানা বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। এছাড়া লেখকের খেলার মাঠে হঠাৎ দেখা যেমন- এরোপ্লেনের কোন অংশে সূর্যালোকের বিকিরণ সেই সূত্র ধরেই তাঁর অসাধারণ সৃষ্টি 'তারসা দ্বীপের আলো' গল্পটি। এমনভাবে প্রতিটি গল্পেরই মূল ভিত্তিতে এমন কোনো না কোনো ঘটনা বিদ্যমান। যা লেখককে কল্পবিজ্ঞানের গল্প রচনার প্রেরণা যুগিয়েছিল। এক কথায় বলা যায়, লেখকের এই প্রয়াস সফল ও সাহিত্যিক মহলে সমাদৃত।

তথ্যসূত্রঃ

১. প্রকাশ কুমার মাইতি, ‘মেধা বৃদ্ধির দাওয়াই’, চিত্রাঙ্গী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ২৯
২. তদেব, পৃ. ৩৬
৩. তদেব, পৃ. ৬০
৪. তদেব, পৃ. ৮১
৫. তদেব, পৃ. ৮৮

রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক জ্ঞানের আলোকে শশাঙ্ক ও হর্ষবর্ধনের দ্বন্দ্ব বিচার

ধৃতি মোহন বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
সঞ্জয় কলেজ অব এডুকেশন, পাঁশকুড়া

সারাংশ : প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে শশাঙ্ক এবং হর্ষবর্ধন দুটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। শশাঙ্ককে আমরা সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধের শ্রেষ্ঠ নরপতি বলতে পারি। তিনিই প্রথম বাঙালি শাসক যিনি সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তা বাস্তবসম্মত রূপ প্রদান করেছিলেন। অপরদিকে হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব কোন অংশে কম নয়। পিতা , জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভগ্নিপতির মৃত্যুর পর তিনি কঠোর হস্তে নিজের সাম্রাজ্য ও পরিবারকে আগলে রাখেন। শশাঙ্ক এবং হর্ষবর্ধন উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব এক আলাদা মাত্র এনেছে এ কথা বলাই চলে।
সূচক শব্দ : হর্ষবর্ধন, শশাঙ্ক , গৌড়, কনৌজ, হিউয়েন সাং,বানভট্ট।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর পরবর্তী গুপ্ত নামধারী রাজাগণ গৌড়ে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করতেন। উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ নিয়ে গৌড় জনপদ গঠিত ছিল। গুপ্তরাজ বৈনো গুপ্তের মৃত্যুর পর থেকে কনৌজের মৌখুরি রাজগণ গৌড় দখলের চেষ্টা করেন। এই কারণে পরবর্তী গুপ্ত দের সাথে মৌখরীদের নিরন্তর যুদ্ধ চলে। সেই সঙ্গে চালুক্য বংশীয় রাজাগনও বারবার গুপ্তদের আক্রমণ করতে থাকে। ফলে গুপ্তগণ ক্রমশ হীনবল হয়ে পড়েন। সেই সুযোগে শশাঙ্ক গৌড়ে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে। বাঙালি রাজাদের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম নরপতি। গৌড় রাজ শশাঙ্কের শাসনকালকে বাংলার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য যুগ বলা চলে। এই সময় বাংলায় কেবলমাত্র একটি স্বাধীন শক্তিশালী রাজ্য স্থাপিত হয়নি, বাংলা উত্তর ভারতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব প্রাধান্য বিস্তার করে।

গৌড়বঙ্গের প্রথম স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাজা হিসেবে শশাঙ্ক বিবেচিত। ৬০৬ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময়ে তিনি যে স্বাধীন গৌড়বঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন মুর্শিদাবাদ জেলার কান সোনা তার রাজধানী পদবাচ্য হয়। মোটামুটি ভাবে দক্ষিনে দাঁতন, উৎকল এবং গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত অঙ্গদ রাজ্য তার রাজ্যভুক্ত হয়। রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন- "গৌড়বঙ্গের বাহিরে রাজ্য বিস্তারের পূর্বে শশাঙ্ক সম্ভবত সমগ্র বঙ্গদেশের ওপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন"।

শশাঙ্কের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের মূলত বানভট্টের হর্ষ চরিত ও হিউয়েন সাঙ এর বিবরণের উপর নির্ভর করতে হয়। অবশ্য এ যাবত পাওয়া

তথ্যসূত্রগুলি থেকে শশাঙ্কের জীবনের প্রাথমিক পর্ব সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। বিহারের সাসারাম জেলার রোটাসগড় গিরি দুর্গ গাত্রে উৎকীর্ণ সেই মহাসামন্ত শশাঙ্ক এই লেখাটির ভিত্তিতে বিনয় চন্দ্র সেন এবং রমেশ চন্দ্র মজুমদার মনে করেন "শশাঙ্ক পরবর্তী গুপ্তরাজ মহাসেন গুপ্তের মহাসামন্ত ছিলেন "। ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার এই প্রসঙ্গে বলেছেন পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ শশাঙ্কের কূটনৈতিক সম্পর্ক ও তার সামরিক জোটবদ্ধতার বিষয়টি এই ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলে ।

ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে এই সকল লেখকেরা ছিলেন পক্ষপাত দুষ্ট। কারণ বানভট্ট ছিলেন শশাঙ্কের বিরোধী ও হিউয়েন সাং ছিলেন হর্ষবর্ধনের সাহায্যপ্রাপ্ত। এই কারণে উভয়ের বিবৃতি পক্ষপাত মূলক ছিল বলে মনে হয়। এছাড়া বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ আর্য মঞ্জুশ্রী মূল কল্প হতেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। শশাঙ্কের কিছু মুদ্রা বাংলা বিশেষত গঞ্জামে পাওয়া যায়। ডক্টর বি.সি. সেন খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়সীমাকে বঙ্গদেশের ইতিহাসে "ব্যর্থতার যুগ " ১ বলে অভিহিত করেছেন। এই ব্যর্থতার মধ্যে একমাত্র সার্থক ব্যক্তি ছিলেন গৌড় রাজ শশাঙ্ক।

শশাঙ্কের বংশপরিচয় বা বাল্যজীবন সম্পর্কে সঠিক কিছুই জানা যায় না। শশাঙ্কের কিছু মুদ্রায় নরেন্দ্র গুপ্ত বা নরেন্দ্র আদিত্য নামটি পাওয়া গেছে। এ থেকে অনেকে মনে করেন তিনি গুপ্ত বংশীয় শাসক ছিলেন। কিন্তু রহিতেশ্বর বা রোটাস গড় গিরি-গাত্রে শ্রী মহা সামন্ত শশাঙ্ক এই নামটি খোদিত আছে। এখানে সম্ভবত গৌড় রাজ শশাঙ্কের কথাই বলা হয়েছে। তা যদি হয় তাহলে শশাঙ্ক প্রথম জীবনে একজন সামন্ত নরপতি ছিলেন বলা যায়। এখন প্রশ্ন তার প্রভু কে ছিলেন? ডক্টর বি সি সেন, ডি .সি গাঙ্গুলী প্রমুখ মনে করেন যে শশাঙ্ক অবন্তি বর্মনের অধীন সামন্ত নরপতি ছিলেন। কিন্তু ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগে পরবর্তী গুপ্ত রাজ মহাসেন গুপ্ত মগধে রাজত্ব করতেন। সুতরাং শশাঙ্ক এরই অধীন সামন্ত নরপতি ছিলেন বলে মনে হয়।

বানভট্ট ও হিউয়েন সাং এর রচনায় জানা যায় শশাঙ্ক গৌরধিপতি ছিলেন। কিন্তু ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগে পরবর্তী গুপ্ত রাজ মহাসেন গুপ্ত মগধে রাজত্ব করতেন। সুতরাং শশাঙ্ক এরই অধীন সামন্ত নরপতি ছিলেন বলে মনে হয়।

বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে শশাঙ্ক কোনরূপ আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করেননি, হর্ষচরিত ও সি ইউ কি সূত্রে জানা গেছে মৌখরি দের হাত থেকে নিজের রাজ্য রক্ষার বিষয়ে শশাঙ্ক পুরোপুরি সচেতন ছিলেন ।মৌখুরি রাজ গ্রহবর্মনের সঙ্গে থানেশ্বরের রাজকন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ হলে শশাঙ্ক কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়েন। সেহেতু তিনি মালব রাজ দেবগুপ্তর সঙ্গে জোট বন্ধ হন।

বানভট্ট ও হিউয়েন সাং এর রচনায় জানা যায় শশাঙ্ক গৌড়াধিপতি ছিলেন। কর্ণসুবর্ণে তার রাজধানী ছিল। কর্ণসুবর্ণ ঠিক কোথায় অবস্থিত ছিল তা সঠিকভাবে বলা

যায় না। তবে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর থেকে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত রাঙ্গামাটি নামক স্থানটিকে অনেকে কর্ণসুবর্ণ বলে মনে করে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংস স্তুপ এর ওপর গড়ে ওঠা উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির অন্যতম হলো থানেশ্বর। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ৬০৬ থেকে ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দ থানেশ্বর সহ উত্তর ভারতের এক বিশাল অংশ রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

উত্তর ভারতের এক বিশেষ রাজনৈতিক সংকটকালে হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহন করেন। গৌড় রাজ শশাঙ্ক কর্তৃক রাজ্যবর্ধনের হত্যা সূত্রে হর্ষবর্ধন কনৌজ অভিমুখে অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে থানেশ্বর, কামরূপ জোট গড়ে ওঠায় শশাঙ্ক কনৌজ হতে গৌড়ে সরে যান। ভগিনী রাজশ্রীকে উদ্ধারের পর হর্ষবর্ধন এক বিশাল বাহিনী নিয়ে কনৌজে গিয়ে উপস্থিত হন। বানভট্ট লিখেছেন হর্ষের উপস্থিতি সূত্রে কনৌজ রাহু মুক্ত হয়। হিউয়েন সাং লিখেছেন হর্ষবর্ধন কনৌজের সিংহাসনে আরোহন করেননি। ফাচিং লিখেছেন হর্ষবর্ধন প্রথমে কনৌজের রাজ ক্ষমতা র দাবিদারদের ঠেকিয়ে রাখার জন্য রাজ্যশ্রী র প্রতিনিধি হিসেবে কনৌজ শাসন করতে থাকেন। পরে কনৌজে নিজে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে শিলাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন। এভাবে রাজপুত্র হর্ষবর্ধন সম্রাট হর্ষবর্ধনে পরিণত হন। এখন থেকে কনৌজ তার রাজনৈতিক কর্মকেন্দ্র হয়ে ওঠে। অতঃপর হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন।

সাম্রাজ্য সংগঠনের প্রথম পর্যায়ে শশাঙ্ক বঙ্গদেশের সর্বত্র নিজ অধিকার সু প্রতিষ্ঠিত করেন। বঙ্গদেশের পাঁচটি জনপদের মধ্যে পুণ্ড বর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত, ক জঙ্গল এই চারটি তিনি তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তবে বঙ্গ তার অধিকারের ছিল কিনা সে বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই। শশাঙ্ক প্রথমদিকে ছিলেন গৌড়াদীপ অর্থাৎ মালদা ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে গৌড় রাজ্যের অধিপতি। গোটা বঙ্গদেশ জয় করার পর পরবর্তীকালে সমগ্র বঙ্গের অধিপতি হন।

শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের সীমা সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমা উড়িষ্যা জেলার মহেন্দ্র পর্বত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে শশাঙ্কের উত্থানের পূর্বে মেদিনীপুর ও গয়া জেলার মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে স্থানীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর অঞ্চল শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা বলা যায় না। তিনি দক্ষিণ উড়িষ্যা, নিজের রাজ্য অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এইভাবে দাঁতন অর্থাৎ দণ্ডভক্তি ও উৎকল শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। শশাঙ্কের পূর্বে আর কোন পূর্ব ভারতীয় শাসক এত বৃহৎ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

দক্ষিণ-পূর্ব ভারত বিজয়ের পর শশাঙ্ক পশ্চিমে সাম্রাজ্য প্রসারের জন্য অগ্রসর হন তিনি মগধ বারানসি জয় করেন। তিনি ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ মৌখ রী দের

বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে নিজেও শক্তি বৃদ্ধির জন্য মালব রাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে তিনি মিত্রতা স্থাপন করেন।

শশাঙ্ক বারানসী জয় করে বিজয় বাহিনীর নিয়ে অগ্রসর হতে থাকলে তার মিত্র মালব রাজ দেব গুপ্তর সঙ্গে তিনি মিত্রতা স্থাপন করেন।

দেবগুপ্ত ও কনৌজের বিরুদ্ধে সৈন্যসহ অগ্রসর হন। শুধু তাই নয় তিনি সৈন্যসহ থানেশ্বর অভিমুখী অগ্রসর হন। রাজ্যবর্ধন কনৌজের গ্রহ বর্মনের বিপর্যয়ের খবর পেয়ে ভাই হর্ষবর্ধনকে সিংহাসনে স্থাপন করে ভগ্নিপতির হত্যাকারীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ ও রাজ্যশ্রী কে কারামুক্ত করার জন্য সৈন্যসহ যাত্রা করেন। রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তের সঙ্গে প্রথমে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন ও তাকে পরাজিত ও নিহত করেন। এরপর রাজ্যবর্ধন কনৌজের দিকে অগ্রসর হওয়ার মুখে শশাঙ্কের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই যুদ্ধে শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে পরাজিত ও নিহত করে মিত্র দেবগুপ্ত হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

শশাঙ্কের সঙ্গে পথ মধ্যে রাজ্যবর্ধনের সাক্ষাৎকার, যুদ্ধ ও পরিণামে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু সম্পর্কে তথ্যাদি তিনটি সূত্র থেকে জানা যায়-- ১) বানভট্টের হর্ষচরিত।
২) হিউয়েন সাং এর বিবরণী।
৩) হর্ষবর্ধনের শিলালিপি।

হর্ষচরিত ও সি ইউ কি র বিবরণ এবং হর্ষবর্ধনের বাঁশ খেরা ও মধুবন লেখ দুইটি সূত্রে জানা গেছে দেবগুপ্ত ও শশাঙ্কের যৌথ আক্রমণে কনৌজ রাজ গ্রহ বর্মা নিহত হন। ইতিমধ্যে স্থানেশ্বর হতে পুষ্যভূতি রাজ রাজ্য বর্ধন কনৌজ অভিমুখে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে তিনি দেব গুপ্তকে পরাজিত ও হত্যা করেন। অতঃপর তিনি কনৌজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বানভট্ট লিখেছেন মিথ্যা উপচারে আশ্বস্ত হয়ে রাজ্যবর্ধন নিরস্ত্র অবস্থায় শশাঙ্কের ভবনে গমন করেন এবং সেখানে তিনি নিহত হন। এর বিপরীতে হিউয়েন সাং লিখেছেন গৌড় রাজের মন্ত্রীবর্গ রাজ্যবর্ধনকে একটি সভায় আহ্বান করে হত্যা করেন। উপরে লিখিত তথ্যসূত্র গুলির পরস্পর বিরোধী বিবরণ থেকে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু সম্পর্কে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তবে এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে হয় শশাঙ্কের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অথবা অন্য কোনোভাবে রাজ্যবর্ধন নিহত হয়েছিল।

শশাঙ্ক, হর্ষ ও রাজ্যবর্ধনের যুদ্ধ নিয়ে বিবিধ মন্তব্য রয়েছে এবং নানাভাবে এটিকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। শশাঙ্কের সঙ্গে হর্ষবর্ধনের কোন সম্মুখ যুদ্ধ হয়েছিল কিনা কিংবা যুদ্ধ হলেও ওই যুদ্ধের ফল কি হয়েছিল এ বিষয়ে বানভট্ট কোন কথাই লেখেন নি। পরবর্তীকালে রচিত গ্রন্থ আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্পে বলা হয়েছে হর্ষবর্ধন কর্ণসুবর্ণ আক্রমণ করে শশাঙ্ককে পরাজিত করেন এবং তিনি শশাঙ্ককে এই মর্মে অঙ্গীকার করতে বাধ্য করেন যে, গৌড় রাজ নিজ রাজ্যের বাইরের কোন ভূখণ্ডে আধিপত্য স্থাপনের বিষয়ে প্রয়াসী হবেন না। এছাড়া গ্রন্থটিতে আরও বলা হয়েছে পূর্ব

ভারত জয়ের অতি অল্পকাল পরে হর্ষবর্ধন নিজের রাজ্য ফিরে পান। ডক্টর মজুমদার, ডক্টর সেন, ডক্টর গাঙ্গুলী প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্পের এই তথ্যটি র কোন গুরুত্ব দেননি। শশাঙ্কের গঞ্জাম লেখ টির ভিত্তিতে তাদের সিদ্ধান্ত হলো ৬১৯ খ্রিস্টাব্দ এবং এমনকি তৎপরবর্তী কালেও শশাঙ্কের রাজ্য সীমার কোনরকম পরিবর্তন ঘটেনি। আর হর্ষবর্ধন যদি ৬১৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে গৌড়বঙ্গে কোন অভিযান চালনা করেন তাহলে ওই অভিযানের রাজনৈতিক ফল নিতান্তই নগণ্য হয়েছিল। আর যদি ধরে নেয়া যায় ওই অভিযান কালে শশাঙ্ক পরাজিত হয়েছিলেন তাহলেও ওই পরাজয় নিতান্তই সাময়িক ছিল।

শশাঙ্কের মেদিনীপুর লেখটি র(৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ) ভিত্তিতে রাধাগোবিন্দ বসাক লিখেছেন সম্ভবত ৬১৯ থেকে ৬২৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময় হর্ষবর্ধনের একক অভিযান কিংবা হর্ষবর্ধন ও প্রভাকর বর্ধনের যুক্ত আক্রমণের ফলে শশাঙ্ক এক সামন্ত শাসকে পরিণত হয়েছিলেন। কেননা মেদিনীপুর লেখটিতে শশাঙ্ক মহারাজাধিরাজ অভিধা টি ব্যবহার করেননি। এছাড়া শশাঙ্কের আলোচ্য পর্বের স্বর্ণমুদ্রা গুলি অধিক খাদ যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু গঞ্জাম লেখনীর ভিত্তিতে ডঃ মজুমদার দেখিয়েছেন 619 খ্রিস্টাব্দে শশাঙ্ক গৌড়বঙ্গ ,দক্ষিণ বিহার এবং উড়িষ্যার উপর পূর্ণ আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন। এছাড়া হিউ এন সাং ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে মগধে এসে লক্ষ্য করেন সম্প্রতি শশাঙ্ক বোধি বৃক্ষ ছেদন করেছেন। মা তোয়াল্লিন লিখেছেন ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে হর্ষ মগধ গৌড় ,ওড়িষ্যা ও কঙ্গদ জয় করেছিলেন। অবশ্য এর পূর্বে শশাঙ্কের ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু হয়েছিল।

শশাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযানের পর হর্ষবর্ধন বলভির মৈত্রকদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। ওই সংঘর্ষের ফলে বলভির রাজ ধ্রুবসেন পরাজিত হয়ে হর্ষবর্ধনের আনুগত্য স্বীকার করেন। অল্প কাল পরে হর্ষবর্ধন ধ্রুবসেনের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দেন। এই সূত্রে আনন্দপুর কচ্ছ এবং কাথিওয়ার প্রভৃতি অঞ্চল গুলি হর্ষবর্ধনের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে।

হর্ষের পশ্চিম ভারত অভিযান কালে গুজরাট, মালব ও গুজর রাজ্যগুলি আতঙ্কিত হয়ে চালুক্য রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর আনুগত্যাধীন হয়ে পড়ে। এই সূত্রে হর্ষ ও পুলকেশীর মধ্যে বিরোধ বাধে এবং হর্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ঐতিহাসিক স্মিথ লিখেছেন - "নর্মদা উপত্যকায় অনুষ্ঠিত এক যুদ্ধে হর্ষ পরাজিত হন।"

অবশ্য সমগ্র বিষয়টির ক্রিটিকাল এনালাইসিস করলে একথা বলা যেতেই পারে হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের রাজ্য আক্রমণ করলেও তিনি বিশেষ কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। বিনয় চন্দ্র সেন লিখেছেন ---"নিতান্তই যদি শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনের হাতে পরাজিত হন তাহলেও তিনি মৃত্যুর পূর্বকাল পর্যন্ত গৌড়, মগধ , দন্ডভূক্তি ,উৎকল ও কঙ্গোদ নিজ অধিকারে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।"

এই প্রসঙ্গে আরো বলা যেতে পারে ---

ক) ৬১৯ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ গঞ্জাম লেখ সূত্রে স্পষ্ট হয় এ সময় গৌড়বঙ্গ, মগধ, দক্ষিণবঙ্গ ,বিহার ও উড়িষ্যা শশাঙ্কের অধিকারভুক্ত ছিল।

খ) মগধে এসে (৬৩৭ থেকে ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ) হিউয়েন সাং দেখেছিলেন অতি সম্প্রতি শশাঙ্ক বোধিবৃক্ষ ছেদন করেছেন। অতএব শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষের অভিযান তার রাজ্যের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে নি।

গ) মা তোয়ান লিন লিখেছেন - হর্ষ মগধের রাজা অভিধা গ্রহণ করেছিলেন ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে শশাঙ্ক যে মারা গিয়েছিলেন সেটা এক কথাতেই সকল পন্ডিতেরা স্বীকার করে নিয়েছেন।

বানভট্টের হর্ষচরিত অনুযায়ী শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে নিজের শিবিরে আহ্বান করে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেন। হিউয়েন সাং এর বর্ণনা অনুযায়ী নিজ মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেন। হর্ষবর্ধনের শিলালিপি থেকে জানা যায় রাজ্যবর্ধন শত্রু শিবিরে নিহত হন। এইভাবে নানা বিবরণ থেকে প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করা খুবই কষ্টকর। রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে ---"সমসাময়িক কোনো বাঙালির রচনা এ বিষয়ে উল্লেখ থাকলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হত।"

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর শশাঙ্ক থানেশ্বর অভি মুখে অগ্রসর হননি। তিনি গ্রহ বর্মনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরসেন কে নিজের অধীনে রেখে কনৌজের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ডক্টর রাধা গোবিন্দ বসাক লিখেছেন - " কামরূপ রাজ ভাস্কর বর্মার সঙ্গে পুষ্যভূতি রাজ হর্ষবর্ধনের মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার খবর জেনে শশাঙ্ক কনৌজ ছেড়ে গৌড়ে চলে আসেন। " বানভট্ট বলেন-" রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর খবর জেনে হর্ষবর্ধন এই কঠোর প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি শশাঙ্ককে পরাস্ত করবেন অন্যথায় তিনি প্রাণ ত্যাগ করবেন"

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর হর্ষ বর্ধন থানেশ্বর ও কনৌজের রাজা হন। তিনি ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে শশাঙ্কের শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে কামরূপ রাজ ভাস্কর বর্মন হর্ষবর্ধনের সাথে যোগ দেন। রাজ্যবর্ধনের ১০ হাজার সেনার অবশিষ্টাংশ সেনাপতি ভণ্ডির অধীনে প্রত্যাগমন করছিল। পথে হর্ষের সাথে দেখা হলে হর্ষ ভন্ডির ওপর বাহিনীর ভার দিয়ে প্রথমে রাজ্যশ্রী কে উদ্ধার করেন। তারপর গঙ্গা তীরে ভন্ডির বাহিনীর সাথে মিলিত হন। তারপর পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ কোন পথে অগ্রসর হয়েছিল সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। বানভট্ট বা হিউয়েন সাং কারো লেখাতেই শশাঙ্কের সঙ্গে হর্ষ র যুদ্ধ বা ফলাফলের কোন উল্লেখ নেই। একমাত্র আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্পে বলা হয়েছে যে অসাধারণ পরাক্রমশালী রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন বহু সৈন্যসহ বিখ্যাত সোমের অর্থাৎ শশাঙ্কের রাজধানী পুন্ডনগর এর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তিনি দুর্বৃত্ত সোম কে পরাজিত করেন ও নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।

কিন্তু আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্পের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে পন্ডিতগণ প্রশ্ন তুলেছেন। ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে এই গ্রন্থ ছিল কতগুলি কিংবদন্তির সমাবেশ মাত্র তিনি বলেছেন -" it would be extremely unsafe to accept the statement recorded in this book as historical." তাছাড়া পুণ্ড্র নগরী শশাঙ্কের রাজধানী ছিল না; কিংবা হর্ষ ওই নগরীতে কোন অভিযান করেছিলেন বলে হিউয়েন সাং তার বর্ণনায় উল্লেখ করেননি। সুতরাং হর্ষ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে তেমন কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেননি বলে মনে হয়। কারণ হিউয়েন সাং এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত মগধ শশাঙ্কের অধীনস্থ ছিল। ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে- "স্থায়ী ফলের দিক হতে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষের অভিযান নিষ্ফলা ছিল বলা চলে।" ২ সুতরাং শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তার পুত্র মানবদেবকে পরাজিত করে হর্ষ ও ভাস্কর বর্মন বাংলাদেশ ভাগ করে নেন। চালুক্য শিলালিপিতে অবশ্য হর্ষবর্ধনকে "উত্তর পথনাথ" ৩ বলা হয়েছে।

শশাঙ্ক ছিলেন শৈব হিউ এন সাং এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে তিনি বৌদ্ধদের ওপর নানারকম অত্যাচার করেছিলেন যেমন -----

১) কুশিনগর বিহার থেকে বৌদ্ধ গণের বিতারণ।

২) পাটলীপুত্রে বুদ্ধের চরণ চিহ্ন অঙ্কিত প্রস্তরখন্ড গঙ্গা জলে বিসর্জন ।

৩) বোধি বৃক্ষচ্ছেদ ও

৪) একটি বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের অপচেষ্টা।

এইসব কারণে বানভট্ট তাকে গৌরাধম, গৌড় ভুজঙ্গ ইত্যাদি নামে ব্যঙ্গ করেছেন । বাস্তবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কোন রাজারই এই ধরনের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার অভাব খুবই দুর্লভ ঘটনা ।এজন্য কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন হয়তো মগধের বা শশাঙ্কের রাজ্যের অন্য অঞ্চলের সম্রাট হর্ষবর্ধনের প্রতি এতই সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল যে তারা নিজেও দেশের রাজার বিরুদ্ধাচারণেও কুণ্ঠিত হতো না। এদিকে যেহেতু শশাঙ্কের সঙ্গে হর্ষবর্ধনের দীর্ঘ সংগ্রাম চলেছিল তাই হর্ষবর্ধনের অনুরাগী বৌদ্ধ প্রজাদের প্রতি তিনি সর্বদা সদয় আচরণ করতে পারেননি । তাছাড়া শশাঙ্কের এই বৌদ্ধ নির্যাতনের কাহিনী কিছুটা অতিরঞ্জিত বলেও মনে হয়। কারণ হিউয়েন সাং এর বিবরণ থেকেই জানা যায় যে তিনি তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধ স্তুপ দেখেছিলেন ও তখন গৌড়ের বৌদ্ধ মঠে বহু বৌদ্ধ নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করতেন।

প্রাচীন বঙ্গের একজন খ্যাতিমান শাসক হলেন শশাঙ্ক। তাকে বাংলার প্রথম সার্বভৌম শাসক বলা হয়ে থাকে। ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে তিনি প্রথম আর্যাবর্তে বাঙ্গালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন ও এই স্বপ্নকে আংশিকভাবে কার্যে পরিণত করেন। প্রকৃতপক্ষে এক অতি সাধারণ অবস্থা থেকে জীবনের দৌড় শুরু করে তিনি স্বাধীন রাজ্যের শাসকের সম্মান লাভ করেছিলেন। সমকালীন ভারতের তিন

প্রধান শক্তি কনৌজ ,থানেশ্বর কামরূপ ও তাদের মিলিত জোটকে পরাস্ত করে তিনি ভারতের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করেন ও ভবিষ্যৎ বাঙালি শাসকদের জন্য উত্তর ভারতের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পথটি কে প্রশস্ত করেন। তিনি যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন তারই উপর পাল যুগের রাজারা সৌধ নির্মাণ করেছিলেন। ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদারের ভাষায় বলা যায় --- " He thus laid the foundation of that policy on which the palas later built up their vast empire"

উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তি হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে তিনি প্রথম প্রমাণ করেছিলেন যে গৌড়ের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিকে কোনমতেই অবহেলা করা সম্ভব নয়। লোকশ্রুতি অনুযায়ী হর্ষবর্ধন বিশ হাজার অশ্বারোহী ৫০ হাজার পদাতিক ও ৫ হাজার হাতির এক বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন । ৪   এই বাহিনীকেও শশাঙ্ক রীতিমতো চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন।

তার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের সার্বভৌম চরিত্র সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে সম্পূর্ণ এক নতুন রাষ্ট্রীয় শাসন তিনি গৌড়ের জন্য প্রবর্তন করেছিলেন। এই প্রশাসনিক কাঠামোতে গুপ্তদের অনুকরণ থাকলেও তার আদর্শের অভিনবত্ব ও প্রতিফলিত। নতুন নতুন রাজ কর্মচারী ও শাসন বিভাগের তিনি সূচনা করেছিলেন। নীহাররঞ্জন রায় একে "গৌড় তন্ত্র "বলে অভিহিত করেছেন। গৌড় তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল রাজনৈতিক স্বতন্ত্রতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক দায় দায়িত্ব সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় সচেতনতা বৃদ্ধি। এই সূত্রে তিনি সার্বভৌমত্বের শিরোপা ভূষিত।

শশাঙ্কের কৃতিত্ব বিচারে তার কূটনৈতিক জ্ঞান স্মরণীয়। পশ্চিম দিকে শশাঙ্ক যে রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হন তা মৌখরিদের মনঃপুত ছিল না। তাই শশাঙ্কের বিরুদ্ধে থানেশ্বর ও কামরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তার জীবদ্দশায় উত্তর ভারতে পরাক্রমশালী নৃপতি হর্ষবর্ধনও তার মিত্র জোট শশাঙ্কের কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

শশাঙ্ককে নিঃসন্দেহে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি বলা যায়। একজন পরাক্রমশালী শাসকের সাম্রাজ্য সংগঠনের অসাধারণ দক্ষতার স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠার বিরল প্রতিভায় ও ভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতায় শশাঙ্ক প্রাচীন বঙ্গের প্রথম সার্বভৌম নৃপতি রূপে সম্মানিত হওয়ার যোগ্য। ডক্টর মজুমদার বলেছেন যে--- "শশাঙ্কের যদি বানভট্ট ও হিউয়েন সাং এর মতো হিতৈষী জীবনীকার থাকতো তাহলে তাকেও হয়তো হর্ষবর্ধনের মতো উজ্জ্বল মনে হতো।"

শশাঙ্ক সম্পর্কে শেষ কথা বলা যেতে পারে যে অসামান্য সামরিক দক্ষতা গুণে তিনি গৌড় , মগধ সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। এবং তিনি আমৃত্যু থানেশ্বর,কনৌজ এবং কামরূপ শক্তি জোটের বিরুদ্ধে নিজ ও রাজ্যের স্বাধীন অস্তিত্ব অটুট রাখেন। রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন শশাঙ্ক হলেন সেই প্রথম বাঙালি যিনি আর্যাবর্তে বাঙালির সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিছুটা হলেও সে স্বপ্নকে তিনি অবশ্যই বাস্তবসম্মত রূপ দিতে পেরেছিলেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । প্রজাহিতৈষী শশাঙ্ক তার

রাজধানী কর্ণসুবর্ণকে সম্পদময়ী নগরীতে পরিণত করেন।স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি ও গঠন করেন।

হর্ষবর্ধন ও উত্তর ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। ডক্টর রাধাকুমার মুখোপাধ্যায় র মতে-" হর্ষের মধ্যে অশোক ও সমুদ্রগুপ্তের গুণাবলীর এক অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় ।" ৫ তার পরম বৈরী চালুক্য রাজশক্তি ও তাকে "সকল উত্তর পথনাথ "অভিধায় ভূষিত করেছে। শিক্ষা সাহিত্যের প্রতি তার অনুরাগ সর্বজনবিদিত। নাগানন্দ ,রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা নামে তিনটি সংস্কৃত নাটক তিনি রচনা করেন। তার সভাকবি বানভট্ট কাদম্বরী ও হর্ষচরিত রচনা করেন। এ যুগে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বৌদ্ধ বিদ্যা চর্চার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে শশাঙ্ক ও হর্ষবর্ধনের দ্বন্দ্ব এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

পরিশেষে বলা চলে শশাঙ্ক বাঙালি জাতির গর্ব এটা আমাদের স্বীকার করা উচিত। বিতর্ক সত্ত্বেও অনেকেই স্বীকার করেন -"Shashanka ,is credited with creating the bengali calendar." 6
অপরদিকে হর্ষবর্ধনের ও উদার মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় প্রয়াগের দান সূত্রে।

তথ্যসূত্র :

১. সুনীল চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস দ্বিতীয় খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, জানুয়ারি ২০০২ / ই, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৭৬

২. ভারত ইতিহাস পরিক্রমা, প্রভাতাংশু মাইতি, শ্রীধর প্রকাশনী, আগস্ট ২০০২, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩০৮

৩. ভারতের ইতিহাস ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, নিখিল সুর ,ইমন কল্যাণ জানা ও নির্মল মন্ডল। সেপ্টেম্বর ২০১০, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫৪

৪. ভারতবর্ষের ইতিহাস, কো.আন্তোনোভা, গ্রি. কতোভস্কি, প্রগতি প্রকাশন মস্কো, ১৯৮২,পৃষ্ঠা ২৫০

৫. স্বদেশ পরিচয়, জীবন মুখোপাধ্যায়, নবভারতি প্রকাশন কলকাতা ২০০৩, পৃষ্ঠা-১০৪

৬. Nitish K. Sengupta(2011) land of two Rivers:A history of Bengal from Mahabharat to Mujib . Penguin books India. page 96-98

মল্লিকা সেনগুপ্তের উপন্যাসে পুরুষ

শর্মী বন্দ্যোপাধ্যায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ,বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বিংশ শতাব্দীর লেখিকাদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে মল্লিকা সেনগুপ্তের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। আটের দশক থেকে তিনি সাহিত্যসাধনা শুরু করেন। লেখিকা হিসাবে তিনি সাহিত্যে সংযোজন করেছেন চোদ্দটি কাব্যগ্রন্থ, তিনটি উপন্যাস ও তিনটি প্রবন্ধগ্রন্থ। নারীচেতনা তাঁর রচনার মূল বৈশিষ্ট্য। আবহমানকালের নারীর দুঃখ-যন্ত্রণার কথা রূপ পেয়েছে তাঁর লেখনীতে।এই নারীসমাজের যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি পুরুষদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। সমাজে নারীর অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন পুরুষ কখনো নারীকে কোণঠাসা করে অন্তঃপুরে বন্দী করেছে, আবার পুরুষই সেই বন্ধন থেকে নারীকে মুক্ত করে তাকে সমাজে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হয়েছে। পুরুষের এই দুই বিপরীতধর্মী রূপকেই তিনি তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। নারীভাবনার আলোকে তিনি রচনা করেছেন মোট তিনটি উপন্যাস। এই তিনটি উপন্যাসে তিনি পুরুষের ভূমিকাকে কী দৃষ্টিতে দেখেছেন তাই এই প্রবন্ধে আমি আলোচনা করতে প্রয়াসী হয়েছি।

সূচক শব্দ : নারীচেতনা, পুরুষ, লিঙ্গবৈষম্য, রামচন্দ্র, সীতা, কাদম্বরী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূল আলোচনা :

নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। দুজনেই সমাজের অঙ্গ। তবুও প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকালে বিচরণ করলে দেখা যায় সমাজে তাদের অবস্থান এক নয়। সমাজে এই লিঙ্গবৈষম্যতার বিরুদ্ধে ‘নারীবাদ’ নামক আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে। পরবর্তীকালে এটি শুধু আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। সাহিত্যেও এর প্রভাব দেখা দিল। ফলে সৃষ্টি হল নারীচেতনামূলক সাহিত্যের। বিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে নারীকে নিয়ে যেসকল লেখক-লেখিকা কলম ধরেছিলেন তাঁদের মধ্যে মল্লিকা সেনগুপ্ত অন্যতম। ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি রচনা করেছেন তিনটি উপন্যাস।এই তিনটি উপন্যাসে তিনটি ভিন্ন সময়কালের নারীদের কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন এবং নারীদের অবস্থার পেছনে পুরুষের ভূমিকা কেমন ছিল তা চরিত্রগুলির মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মল্লিকা সেনগুপ্তের প্রথম উপন্যাস ‘সীতায়ন’। উপন্যাসটি ১৯৯৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। রামের জীবনের কাহিনি নিয়ে বাল্মীকি রচনা করেছিলেন রামায়ণ। প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ পড়ে লেখিকা অনুভব করেছিলেন যে রামায়ণ শুধু আসলে রামের কাহিনি নয়, এই কাব্যের ছত্রে ছত্রে রয়েছে সীতার অশ্রুজলের ইতিহাস। তাই

রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের কিছু ঘটনা অবলম্বনে তিনি রচনা করলেন 'সীতায়ন'। রামের সীতা বিসর্জনের সিদ্ধান্ত থেকে শুরু করে সীতার পাতালপ্রবেশ পর্যন্ত কাহিনি এই উপন্যাসে রয়েছে। উপন্যাসের সীতা চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মল্লিকা সেনগুপ্ত যেসব পুরুষ চরিত্রের অবতারণা করেছেন তারা হলেন শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও বাল্মীকি। এছাড়াও এই উপন্যাসে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মতো কিছু অপ্রধান পুরুষ চরিত্র রয়েছে।

'সীতায়ন' উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম পুরুষ চরিত্র হলেন শ্রীরামচন্দ্র। রাম আদর্শ রাজা, প্রজানুরঞ্জক, প্রজার কল্যাণই তার জীবন ও রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু রামচন্দ্র এই প্রজার কল্যাণ করতে গিয়ে নিজের স্ত্রী সীতার ওপরে চরম অন্যায় করেছিলেন। তাঁর অবিবেচনা প্রসূত কিছু সিদ্ধান্তে সীতার জীবনে ঘনিয়ে এসেছিল চরম দুর্ভোগ। সীতা ছিলেন আদর্শ পত্নী। তাই স্বামীর বনবাস যাওয়ার সময় তিনি নির্দ্বিধায় স্বামীর অনুগামিনী হয়েছিলেন। কিন্তু সেই বনবাস কালে রামচন্দ্রের কিছু কার্যকলাপের জন্য তাঁর জীবন অন্যদিকে মোড় নিল। এই বনবাসের সময় রাম ও লক্ষ্মণের অনার্য বিদ্বেষের কারণে অনার্য বালিকা শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন করার জন্য রাবণ দ্বারা সীতা অপহৃতা হলেন, লঙ্কাপুরীতে অনেক দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে হল তাঁকে। পুনরুদ্ধার হবার পরে সবার সামনে তাঁকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হল । যা ছিল তার পক্ষে চরম অপমানজনক। এরপরেও তিনি নিস্তার পান নি। সন্তানসম্ভবা সীতাকে নিয়ে প্রজাদের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হলে রামচন্দ্র আবার তাঁকে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে ত্যাগ করলেন। এই অরণ্যে থাকাকালীন রামচন্দ্র কিন্তু একবারের জন্যও সীতার ও নিজের সন্তানদের খোঁজখবর নেননি এবং তারা বেঁচে আছেন কিনা জানতে চাননি। সন্তানদের নিয়ে বাল্মিকীর আশ্রমে দুঃখকে নিত্যসঙ্গী করে যখন সীতা দিন কাটাচ্ছিলেন তখনই অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রয়োজনে আবার তাঁর ডাক পড়ল। এতদিন পরে আবার রামচন্দ্র সীতাকে বাধ্য করলেন অগ্নিপরীক্ষা দেওয়ার জন্য। কিন্তু সীতা আর এই অপমান সহ্য করতে না পেরে নিজের জন্মকে ধিক্কার জানিয়ে পৃথিবী মায়ের কাছেই ফিরে গেলেন। যে রামরাজ্যের কথা আজও প্রবাদ হয়ে আছে সেই রামরাজ্যেই রাজ মহিষীর কোনো সম্মান ছিল না। শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ নৃপতি হয়ে উঠলেও আদর্শ স্বামী হয়ে উঠতে পারেননি। স্ত্রীর প্রতি বারবার অন্যায় করে তাঁকে মৃত্যুর দিকে তিনি ঠেলে দিয়েছেন।

উপন্যাসের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল লক্ষ্মণ। তিনি আদর্শ ভ্রাতা এবং আদর্শ দেবর। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর উপর তাঁর অগাধ ভক্তি ছিল। কিন্তু এই ভ্রাতৃবধূর উপর যখন অন্যায় হয়েছে তখন তিনি কোন প্রতিবাদ করেননি। অন্ধ ভ্রাতৃস্নেহে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি তাই সীতাকে অগ্রজের কথামত তপোবন দেখানোর ছলে অরণ্যে ছেড়ে আসেন। অগ্রজের কথা অমান্য না করে তার অন্যায় সিদ্ধান্তগুলোকে তিনি মেনে নিয়েছেন।একবারের জন্যও ভ্রাতার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেননি। উপরন্তু প্রজা এবং

অনার্যদের দোষ দিয়েছেন। তিনিও সীতা ও তাঁর সন্তানদের কোন খোঁজ খবর নেওয়ার প্রয়োজন বোধ কররেননি।

'সীতায়ন' উপন্যাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো রামচন্দ্রের ভ্রাতা শত্রুঘ্ন। রঘুবংশের আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের মতোই প্রজার কল্যাণ তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল। তাই ব্রাহ্মণদের লবণাসুরের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি তাকে বধ করতে চলে যান। এই সময় বাল্মীকির আশ্রমে গিয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি জানতেন এই অরণ্যেই তাঁর ভ্রাতৃবধূ রয়েছেন এবং সেইরাত্রে তার দুটি সন্তান জন্মেছে। কিন্তু সবকিছু জেনে বুঝেও শুধুমাত্র ভ্রাতৃ নির্দেশ পালন করার জন্য শত্রুঘ্ন তাদের কোনো কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করেননি। ভ্রাতুষ্পুত্রদের মুখদর্শনের করার কথাও তার একবারও মনে হয়নি। ভ্রাতৃস্নেহে অন্ধ হয়ে তিনিও একপ্রকার সীতার সঙ্গে অন্যায় করেছেন। বাল্মীকিরও এই উদাসীনতা দেখে তাঁকে হৃদয়হীন মনে হয়েছে।

'সীতায়ন' উপন্যাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য পুরুষ চরিত্র হলেন বাল্মীকি। গোটা উপন্যাস জুড়েই তাঁর উপস্থিতি লক্ষ্য করার মতো। 'রামায়ণ' এবং 'সীতায়ন' দুই জায়গায় বাল্মীকি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর আশ্রমের কাছেই লক্ষ্মণ সীতাকে ত্যাগ করে আসেন। বাল্মীকি আশ্রমে সীতাকে কন্যার মত পালন করেছেন, গর্ভাবস্থায় পিতার মতো তাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন, সীতার প্রতিটি যন্ত্রণার কথা তিনি মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এত কিছুর পরেও তিনি পুরুষতন্ত্রের মোড়ক থেকে বেরোতে পারেননি। সীতা দুঃখ যন্ত্রণার কথা তাঁর কাছে ব্যক্ত করতে গিয়ে যখন স্বামীর সমালোচনা করেছেন তখন তিনি সীতাকে বাধা দিয়েছেন এবং স্ত্রীর আদর্শ-কর্তব্য সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তবুও এই উপন্যাসে অন্যান্য পুরুষ চরিত্রগুলি চেয়ে বাল্মীকি অনেক বেশি মানবিক কারণ তিনি সীতাকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু রামচন্দ্রের ও অন্যান্য ঋষিদের সিদ্ধান্তের কাছে তিনি হার মেনে যান, যার ফলশ্রুতি সীতার জীবনে চরম পরিণতি এনে দেয়।

মল্লিকা সেনগুপ্তের দ্বিতীয় উপন্যাস 'শ্লীলতাহানির পরে'। 'সীতায়ন' উপন্যাস প্রকাশিত হবার এক বছর পর উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। প্রথম উপন্যাসের পটভূমি থেকে সরে গিয়ে এক ভিন্ন সময়কাল নিয়ে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। তবে দুই উপন্যাসেরই মূল বিষয় নারীর অবমাননা। এই উপন্যাসের পটভূমি আধুনিক শহর কলকাতা। উপন্যাসের নামকরণ দেখেই বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া যায়। শ্লীলতাহানি একটি নারীর কাছে চরম অপমান। কিন্তু শ্লীলতাহানিতে একটি নারীর যেরকম অপমান হয় তার চেয়েও বেশি অপমান হয় সে বিচার চাইতে গেলে।ঠিক এই ঘটনাগুলি নিয়েই মল্লিকা সেনগুপ্ত উপন্যাসটি রচনা করেছেন।

উপন্যাসটির পুরুষ চরিত্রগুলি হল বিজন রায়, ব্রতীন, সংলাপ এবং রাজকুমার। এছাড়া কিছু অপ্রধান পুরুষ চরিত্র এই উপন্যাসে রয়েছে। উপন্যাসটিতে মন্দিরা নামে একজন নারী রাজনীতিতে সদ্য যোগদান করে জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য নারীর

অবমাননার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং এক নির্যাতিতা মালতির কেসটা সে নিতে চায়।এই মন্দিরার স্বামী বিজন রায়। বিজন রায় কলকাতার এক বহুজাতিক সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সে কামুক, মিথ্যাবাদী এবং সুবিধাবাদী। যেকোন উপায়ে সে নারীর ঘনিষ্ঠ হতে চায়। নারী দেহই তার একমাত্র কাম্য বস্তু। তাই সে তার অফিসে কর্মরত রিকি সেন নামে তার কন্যাসমা অধস্তন এক মহিলাকে বার বার উত্যক্ত করে এবং তাকে নিজের আয়ত্তে আনার জন্য চাঁদিপুরে ট্যুরের আয়োজন করে। সেখানে ভয় দেখিয়ে তাকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে ধরা পড়ে। এতকিছু হয়ে যাওয়ার পরও সে একের পর এক মিথ্যা বলে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পালিয়ে বেড়ায়। নিজের স্ত্রীর কাছে মিথ্যা কথা বলে সুবিধা নিতে চায়। পৃথিবীতে বিজন রায়ের মতো মানুষের অভাব নেই এবং এইধরনের মানুষের জন্যই একজন নারীর সুস্থ সুন্দর জীবন এক নিমেষে কীভাবে শেষ হয়ে যায় তা লেখিকা এই উপন্যাসের মাধ্যমে পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

উপন্যাসটির দ্বিতীয় পুরুষ চরিত্র হলো ব্রতীন। সে সম্পর্কে রিকির জামাইবাবু, রিকির একমাত্র দিদির স্বামী। মাতা পিতাহীন রিকির একমাত্র আত্মীয় তারা। কিন্তু রিকি শ্লীলতাহানির মতো চরম অপমানের প্রতিবাদ করতে চাইলে ব্রতীন কিন্তু রাজি হয়নি এবং সে রিকিকে থানায় রিপোর্ট করতে বাধা দেয়। ব্রতীনের মধ্যে মধ্যবিত্ত মানসিকতা লক্ষ্য করার মতো। কারণ একজন মেয়ে হয়ে সে প্রতিবাদ করবে একথা সে সমর্থন করতে পারেনি।

এই উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র সংলাপ বসু। রিকির বন্ধু সে।রিকিকে শ্লীলতাহানির সময় সে উদ্ধারও করে। কিন্তু প্রতক্ষ্যদর্শী হয়েও সে থানায় সাক্ষী দিতে অসম্মত হয়েছিল। শুধু তাই নয় থানায় অভিযোগ জানানোর ব্যাপারে রিকিকে বাধা দিয়েছিল।পরবর্তীকালে বাধা কাটিয়ে সে যখন এগিয়ে আসে তখন অনেক দেরি হয়ে যায়। তাঁর এইরকম আচরণে রিকি আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

রাজকুমার নামক চরিত্রটি এই উপন্যাসের সবচেয়ে উন্নত মানসিকতার চরিত্র। রাজকুমার একজন সাংবাদিক সে তাদের পূর্বপরিচিত নয় তবুও চাঁদিপুরে গিয়ে ক্ষণিক পরিচয়ে রিকির বন্ধু হয়ে ওঠে। রিকির অপমানের কথা জেনে সে প্রথম রিকিকে থানায় অভিযোগ করতে বল্রে, রিকির পাশে থাকে।কিন্তু পরবর্তীকালেও সে চাইলেও সংবাদমাধ্যমে রিকির খবর ছাপতে পারেনা।সবকিছু ছেড়ে যদি রাজকুমারের মতো চরিত্র শেষ পর্যন্ত রিকি পাশে দাঁড়াতে পারতো তাহলে এই রিকির মতো মেয়েদেরকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হত না।

পুরুষেরা সব সময় যে নারীদেরকে লাঞ্ছিত করেছে তা নয় অনেক ক্ষেত্রে তারাই নারীদের কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে সমাজে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠা করেছে। ঊনবিংশ শতকে নারী জাগরণের ইতিহাসে পুরুষেরা মুখ্য ভূমিকা পালন

করেছিল। এই সময়ের ইতিহাস ঘেঁটে দেখলে এরকমই কিছু আলোকিত পুরুষের সন্ধান পাওয়া যায়। মল্লিকা সেনগুপ্তর তৃতীয় এবং শেষ উপন্যাস 'কবির বউঠান'। এই উপন্যাসে পুরুষের মঙ্গলময় দিকটি উদ্ভাসিত হয়েছে। দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে হসপিটালের বেডে কেমো নিতে নিতে জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে মল্লিকা রচনা করলেন এই উপন্যাস। এই 'কবির বউঠান' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখিকা শুধু ঠাকুরবাড়ির আধুনিকা নারীদের রূপটি তুলে ধরেছেন তা নয়, সেই যুগের আলোকিত পুরুষদের কথাও ব্যক্ত করেছেন। ঠাকুর বাড়ির নারীদের চরিত্র পরিস্ফুটনে যেসকল পুরুষেরা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁদের কথা এই উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে। এই উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য পুরুষ চরিত্রগুলি হল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জানকীনাথ ঘোষাল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঠাকুরবাড়ির উল্লেখযোগ্য পুরুষ চরিত্র হলেন রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি রামমোহন রায়ের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ঠাকুরবাড়ির বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হয়েও সেই বিষয়ের প্রতি তাঁর সেরকম আকর্ষণ ছিল না। তিনি ছিলেন সংস্কৃতিমনস্ক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি তার আকর্ষণ ছিল। ধর্ম বিষয়ে ছিল তার অগাধ পাণ্ডিত্য। তিনি ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং ছোট থেকেই ব্রাহ্ম ধর্মের বিভিন্ন ভালো গুণগুলিকে তিনি তাঁর পুত্র-কন্যার মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। তাই পুত্রদের সঙ্গে কন্যা ও পুত্রবধূদেরও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করবার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণভাবে নারী প্রগতিশীল বলা যায় না।কারণ পুত্রবধূ কাদম্বরীর আত্মহত্যার সমস্ত প্রমাণ পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়ে তিনি তাঁর প্রতি অবিচার করেছিলেন। এক নিরপরাধ নারীর মৃত্যুর থেকেও পরিবারের সম্মান তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। কোনো প্রতিবাদ তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি।

ঠাকুরবাড়ির প্রগতিশীল পুরুষদের মধ্যে যার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো তিনি হলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি প্রথম ভারতীয় যিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু শুধু বিদেশে গিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, সেই দেশের সংস্কৃতির ভালো দিকগুলি তিনি গ্রহণ করে এ দেশের নারীদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন এবং তা শুরু করেছিলেন নিজের স্ত্রীকে দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই তিনি দেখেছিলেন অতিরিক্ত অলংকার ও শাড়ির ভার বহন করতে গিয়েই নারীদের আসল সৌন্দর্য ঢাকা পড়ে যায়। অন্তঃপুরে আবদ্ধ থেকে তাদের প্রতিভাগুলি থেকে যায় অপ্রকাশিত। তাই নারীদের আধুনিক করার জন্য তিনি উঠে পড়ে লেগেছিলেন। স্ত্রী স্বাধীনতার প্রতি ছোট থেকেই তার আগ্রহ ছিল, তাই নিজের স্ত্রীকে বিলেতি আদবকায়দায় তিনি গড়তে চেয়েছিলেন। বোম্বাই থাকাকালীন তিনি নিজের স্ত্রীকে সেখানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তাকে অন্তঃপুরের বাইরে বার করার জন্য তার

মায়ের সাথেও তাঁর মতানৈক্য হয়েছিল। তবুও তিনি হাল ছাড়েন নি। তাঁর জন্যই তাঁর স্ত্রী অলোকসামান্যা নারী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন এবং ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য নারীদের পথ দেখিয়েছিলেন। সেই যুগের নারীদের প্রগতিশীল করে গড়ে তোলার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অনস্বীকার্য ছিল।

ঠাকুরবাড়ির আরো একজন গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ চরিত্র হলেন জানকীনাথ ঘোষাল। তিনি রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারীর স্বামী ছিলেন। সেই যুগে তার স্ত্রীর প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশে তিনি পূর্ণ সহায়তা করেছিলেন। মল্লিকা সেনগুপ্ত নিজে বলেছেন 'সেই বিরল সৌভাগ্যবতীদের একজন ছিলেন স্বর্ণকুমারী যার লেখিকা হওয়ার পথে গোলাপের পাপড়ি বিছিয়ে দিয়েছিলেন তার স্বামী'।১ স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্যসাধনায় তার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানদের তিনি নিজের কাছেই বেশি রাখতেন যাতে তারা স্বর্ণকুমারীর লেখালেখির বিষয়ে কোনো বাধা সৃষ্টি না করতে পারে। নিজে বিদেশে থাকাকালীন নিজের স্ত্রীকে জ্ঞানদানন্দিনীর কাছে পাঠিয়েছিলেন যাতে তার স্ত্রী বাইরে গিয়ে সেই সংস্কৃতি গ্রহণ করতে পারে। স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখিকা হয়ে ওঠার পেছনে তাঁর অবদান ছিল অনেকখানি।

ঠাকুরবাড়ির অন্য এক ভিন্নধর্মী পুরুষ ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।এই পরিবারের অন্য পুরুষদের মত তিনিও ছিলেন বহু প্রতিভার অধিকারী। নাট্যকার হিসাবে বাংলা সাহিত্যে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু নারী স্বাধীনতার ব্যাপারে তিনি খুব বেশি কিছু ভাবেননি। তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভাব ছিল। অন্যের দ্বারা যেকোনো সময় তিনি প্রভাবিত হতেন। প্রথমদিকে বৌঠানের প্রতি অভিভূত হয়ে তাঁর মত করে নিজের স্ত্রীকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাদম্বরীও নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর কার্যকলাপের জন্যই কাদম্বরীর জীবনে আসে করুণ পরিণতি। স্ত্রীর প্রতি উদাসীনতা, অন্য নারীর সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্ক তাঁর স্ত্রীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। কাদম্বরীর মতো এক প্রতিভাময়ী নারীর অকালে চলে যাওয়ার জন্য তিনি অনেকাংশে দায়ী ছিলেন।

ঠাকুর পরিবারের অন্যতম আলোকিত পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবারের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন। তাঁর খ্যাতির আলোকেই ঠাকুরবাড়ি নতুন করে আলোকিত হয়েছিল। এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপস্থিতি কিছুটা পরের দিকে। শৈশবে মাকে হারিয়ে তিনি তাঁর নতুন বৌঠান কাদম্বরীর স্নেহ লাভ করেছিলেন। ক্রমেই বৌঠান তাঁর সাহিত্যচর্চার সঙ্গী হয়ে ওঠে। এরই মাঝে তাঁর বিবাহ হয়। সাহিত্যচর্চাও নতুন উদ্যমে চলতে থাকে। কিন্তু একদিকে স্বামীর উদাসীনতা, সন্তানহীনতা ও একাকীত্ব কাদম্বরী যে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলেন তা হয়তো তাঁর চোখে পড়েনি। অগ্রজের অবমাননা তাঁর বৌঠানকে যে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে তা তিনি যদি অনুভব করে নতুন দাদার কাছে ব্যক্ত করতে পারতেন তাহলে কাদম্বরীর জীবন অকালে ঝড়ে যেতনা। তবে বৌঠানের

মৃত্যু তাঁকে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল এবং এই ঘটনা তাঁকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল অনেকখানি। ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেইজন্য তিনি ফিরে গিয়েছিলেন অন্তঃপুরে, নিজের স্ত্রী মৃণালিনীর কাছে এবং সংসার জীবনের সূচনা করেছিলেন।

মল্লিকা সেনগুপ্তের তিনটি উপন্যাস বিশ্লেষণ করে দেখা গেল নারীদের জীবনে উত্থান-পতনে পুরুষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । যেমন 'সীতায়ন' উপন্যাসে একমাত্র রামচন্দ্রের অবিবেচনার কারণে সীতার জীবনে করুণ পরিণতি নেমে এসেছে। 'শ্লীলতাহানির পরে' উপন্যাসে বিজন রায়ের মত কামুক পুরুষের জন্যই রিকির জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। আবার 'কবির বউঠান' উপন্যাসে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো প্রগতিশীল পুরুষের জন্যই নারী জাগরণের সূচনা ঘটেছে। লেখিকা পুরুষের ভালো মন্দ দুরকম চরিত্রকেই উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন। অহেতুক পুরুষবিদ্বেষ মল্লিকা সেনগুপ্তের মানবীচেতনার বৈশিষ্ট্য ছিল না। পুরুষ নয়, পুরুষতন্ত্রকে তিনি নারীর অবনতির কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। পুরুষতন্ত্রের বিভিন্ন সংস্কারের বশবর্তী হয়ে নারী ও পুরুষ উভয়ে মিলে নারীর মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে। তাই পুরুষতন্ত্রের বেড়াজাল ভেঙে দিয়ে এক লিঙ্গবৈষম্যহীন সমাজ তৈরি করতে চেয়েছেন লেখিকা যেখানে নারী ও পুরুষ উভয়েই উভয়ের সহায়ক হয়ে উঠবে।

তথ্যসূত্র:

১।   সরকার সুবোধ (সম্পাদক), 'মল্লিকা সেনগুপ্ত গদ্যসমগ্র', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১২, পৃষ্ঠা-২৯৬

সহায়ক গ্রন্থ:

১।   বসু রাজশেখর, 'বাল্মীকি রামায়ণের সারানুবাদ', এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড,নবম মুদ্রণ ১৩৯০

২।   সরকার সুবোধ (সম্পাদক), 'মল্লিকা সেনগুপ্ত গদ্যসমগ্র', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১২

৩।   বসু রাজশ্রী ও চক্রবর্তী বাসবী , 'প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা' ,কলকাতা,উর্বী প্রকাশন , জুন ২০০৮

পুরুলিয়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

নীলাঞ্জন চাকী
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
ছাতনা চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া

সারসংক্ষেপ: পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমের সর্বশেষ জেলা পুরুলিয়া ১৯৫৬ সালে ১লা নভেম্বর মানভূম জেলা ভেঙে গঠিত হয়। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে এই জেলা মূলত কোল সংস্কৃতির 'হড়মিতান' সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও সভ্যতার অংশ। তাই ঔপনিবেশিক আমলের প্রথম ভাগ থেকেই এখানে বিভিন্ন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন যথা- চূয়াড় বিদ্রোহ, ভূমিজ বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষজন নেতৃত্ব প্রদান করে। পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে মানভূম জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিভিন্ন ঔপনিবেশিক সরকার বিরোধী আন্দোলন সারা মানভূম জেলা জুড়ে সংগঠিত হতে থাকে। ১৯৪৬ সালের পর থেকে শুরু হয় 'বঙ্গভুক্তি আন্দোলন'। বিধানচন্দ্র রায় ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারকে যুক্ত করে 'পূর্বপ্রদেশ' নামক নতুন প্রদেশ গঠন করে হিন্দিভাষা চালু হবে ঠিক করলে আবার আন্দোলন শুরু হয়। বাংলাভাষাকেই মাতৃভাষার মর্যাদারক্ষা করার জন্য শুরু হয় 'টুসু সত্যাগ্রহ'। তথাপি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি, লোকসেবক সংঘ ও অন্যান্য সংগঠন মিলিতভাবে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কাছে মেমোরেণ্ডাম পেশ করলে পুরুলিয়ার ১৯৫৬ সালে বঙ্গভুক্তি ঘটে।

সূচক শব্দ : জঙ্গল মহল, হড়মিতান, ক্ষত্রিয়করণ

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলির মধ্যে জঙ্গলাকীর্ণ অনুর্বর ও আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে পুরুলিয়ার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের অনুন্নত জেলা পুরুলিয়া মানভূম জেলা থেকে বিভক্ত হয়ে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর গঠিত হয়।[১]- ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্বাংশ হিসাবে গড়ে ওঠার দরুণ এই অঞ্চল ভৌগোলিক দিক থেকে পাহাড় ও জঙ্গল অধ্যুষিত। তবে মধ্যযুগে এই ছোটনাগপুর অঞ্চল মানভূম, শিখরভূম ও বরাভূম এই তিনটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিলো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এই তিনটি রাজ্য নিয়ে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে 'জঙ্গলমহল' জেলা তৈরি করা হয় এবং পরবর্তীকালে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ধলভূম, ধানবাদ, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার পশ্চিমের কিছু অঞ্চল নিয়ে মানভূম জেলা গঠিত হয় যার সদর কার্যালয় ছিলো মানবাজার। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে আবার সদর কার্যালয় পরিবর্তন করে পুরুলিয়াতে করা হয়। ১৮৭৯ সালে মানভূম জেলাকে আরও বিভক্ত করে আয়তন কমিয়ে শুধুমাত্র পুরুলিয়া ও ধানবাদ দুটি

মহকুমা রাখা হয়। ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর এই মানভূম জেলা ভেঙে ধানবাদ, চাষ ও চন্দনকিয়ারী অঞ্চল নিয়ে ধানবাদ জেলা ও অপর দিকে বাকি অংশকে পুরুলিয়ার সাথে যুক্ত করে পুরুলিয়া জেলা তৈরি করা হয়।[২] চাণ্ডিল, পটমদা, ইচাগড় ইত্যাদি জায়গা সিংভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। মানভূম জেলা সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হয়। পুরুলিয়া জেলার মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মানুষ তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। পুরুলিয়া জেলাকে এককথায় মিশ্রসংস্কৃতি বা বিপরীতধর্মী সংস্কৃতির মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়।

মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠন:

১৯৫৬ সালে নভেম্বর মাসে মানভূম জেলা ভেঙে পুরুলিয়া জেলার উদ্ভব ঘটলেও মানভূম জেলার অধিবাসীবৃন্দ ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেছে এবং মুখ্যভূমিকা পালন করেছে। ১৯১১ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল অবধি মানভূমের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, অতুলচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ। বিংশ শতকের প্রথম থেকেই পুরুলিয়া শহরকে কেন্দ্র করে পুরো মানভূম জেলায় যে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিলো সেখানে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ বিপুলভাবে অংশগ্রহণ করেছিলো। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যদিয়েই মানভূম জেলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।[৩] মানভূমে অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নিবারণ দাশগুপ্ত। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে উচ্চশিক্ষা শেষ করে তিনি মেদিনীপুরে স্কুলের সাব-ইন্সপেক্টর হিসাবে কর্মরত ছিলেন। মেদিনীপুর জেলাতেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে তিনি জড়িয়ে পড়েন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মানভূমে বদলি হয়ে আসারপর তিনি সম্পূর্ণভাবে রাজনীতিতে মনোনিবেশ করেন। কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে গৃহীত অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে মানভূম তথা পুরুলিয়া সদরেও পৌছেছিলো।[৪] নিবারণচন্দ্র ১৯২১ সালে সরকারি চাকুরী থেকে পদত্যাগ করেন।

নিবারণচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনে তার একনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন অতুলচন্দ্র ঘোষ। পুরুলিয়া সদরকোর্টে ওকালতি করতে গিয়ে তিনি নিবারণচন্দ্রের সাহচর্যে আসেন এবং তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ওকালতি ছেড়ে দিয়ে সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। মানভূমে সম্পূর্ণভাবে এঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় কংগ্রেসের শিকড় শক্তভাবে প্রোথিত হয়েছিলো। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত নডিহা ও নীলকুঠিডাঙ্গায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত করার জন্য দুটি দপ্তর খুলেছিলেন। এই দুটি কেন্দ্রের নাম দিয়েছিলেন 'শিল্পাশ্রম'।[৫] পরবর্তীকালে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে এই আশ্রমটি স্থানান্তরিত হয়ে চলে আসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নিজ বাসভবনে যা বর্তমানে নিস্তারিণী মহিলা মহবিদ্যালয় নামে খ্যাত। পরে আবার ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে 'শিল্পাশ্রম' কেন্দ্র স্থায়ীভাবে উঠে আসে নিবারণচন্দ্রের অনুগামী হরিপদ দাঁ

মহাশয়ের তেলকলপাড়ার বাড়িতে। 'শিল্পাশ্রম' স্বাধীনতা সংগ্রামী ও কংগ্রেসকর্মীদের এক মিলনস্থল হয়ে ওঠে। এই আশ্রমের মূলত দেখাশোনা করতেন অতুলচন্দ্র ঘোষের সহধর্মিনী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ। লাবণ্যপ্রভা ধীরেধীরে নারীদের স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত করার ক্ষেত্রেও প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে জাতীয় ব্রিটিশ বিরোধী চিন্তাভাবনার উন্মেষ ঘটানোর জন্য নিবারণচন্দ্র স্থাপন করেছিলেন 'তিলক জাতীয় বিদ্যালয়'।[৬]

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসের দ্বাদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পুরুলিয়া শহরে ১৯২৫ সালের ১২-১৫ ই সেপ্টেম্বর। মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বে সমস্ত প্রথম সারির কংগ্রেস নেতাগণ পুরুলিয়া শহরে মিলিত হয়েছিলেন। পুরুলিয়ার জেলা স্কুলের পেছনে যে কংগ্রেসের জেলা কমিটি গঠন হয়েছিল সেই মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত ও অতুলচন্দ্র ঘোষ। জনসাধারণের জন্য একটি মুখপাত্র প্রকাশ করা হয় যার নাম---- 'মুক্তি' এবং একটি ছাপাখানা স্থাপন করা হয়-- 'দেশবন্ধু প্রেস'।[৭] ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের সাইমন কমিশনের বয়কট করার সাথে সাথে মানভূমের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষ সর্বতোভাবে আন্দোলন যোগদান করে। বয়কটের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হওয়ার পর মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের জেলা সম্মেলন আয়োজন করে এবং সেখানে সভাপতিত্ব করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। সমিতির সভাপতি ছিলেন অন্নদাকুমার চক্রবর্তী। অন্নদাকুমার চক্রবর্তী পরবর্তীকালে 'তরুণ শক্তি' নামে এক ব্রিটিশ বিরোধী পত্রিকা সম্পাদনা করতেন।[৮]

অসহযোগ আন্দোলন থেকে আইন অমান্য আন্দোলন:

অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে শুরু করে সাইমন কমিশন বয়কট করা অবধি সময়কালে মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি সর্বসম্মতভাবে আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় জেলা কংগ্রেস সেই আন্দোলনের ভাবধারা শহর থেকে গ্রামে এমনকি আদিবাসী এলাকাতেও প্রসারিত করেছিলো। এরই মধ্যে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ঝালদার জমিদার ব্রিটিশদের সমর্থনকারী রাজা উদ্ধবচন্দ্রের প্ররোচনায় খুন হন যুব কংগ্রেস নেতা সত্যকিংকর দত্ত। হত্যাকারী ছিলেন হরিঠাকুর। সত্যকিংকর বাগমুণ্ডি, আড়ষা, গড় জয়পুর, ঝালদা অঞ্চলে কৃষক ও আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজে নিমজ্জিত ছিলেন। এইসময় 'মুক্তি পত্রিকাতে ব্রিটিশ বিরোধী সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করার জন্য পুলিশ নিবারণ দাশগুপ্তকে গ্রেপ্তার করে। অপরদিকে 'তরুণশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকর ছিলে অন্নদাকুমার চক্রবর্তী ও কুমুদ বিকাশ রায়। ব্রিটিশ সরকার বিরোধী লেখা প্রকাশ করার জন্য এই দুইজনের কারাবাস হয়। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সরকার বিরোধী বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, শিউশরণ লাল জয়সোয়াল এবং

বীররাঘব আচারিয়া গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং আদিবাসীদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব প্রচারকরার জন্য রেবতীকান্ত চট্টোপাধ্যায়-ও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।[৯] ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট টেলর ও পুলিশ আধিকারিক চার্চার রামচন্দ্রপুর আশ্রমে পৌঁছে অন্নদাকুমার চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করেন সরকারী বিরোধী কার্যকলাপের জন্য। অন্নদাকুমারের সাথে আরও কিছু রাজনৈতিক কর্মীগণ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন গোবর্ধননাথ, গুরুচরণ ভূমিজ প্রমুখ। আইন অমান্য আন্দোলন চলার সময় মানভূম জেলার সমুদ্র না থাকার দরুন মানভূম জেলা কংগ্রেসের সদস্য অরুণচন্দ্র ঘোষ ও সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী তেরোজন স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে কাঁথি থানায় যান এবং সেখানে লবণ তৈরি করেন। পুরুলিয়াতে ফিরে এসে তারা দেশপ্রেম স্বরূপ এই ঘটনা স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করেন।[১০] ফলে ব্রিটিশ জেলাপ্রশাসন জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ অশোক চৌধুরী, চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত, হীরেন মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে।

মানভূম সিংভূম জেলায় কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলন কর্মসূচী সাফল্যের সাথে রূপায়িত হয়। সরকার জাতীয় কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করারসাথে সাথে মানভূম জেলা ও পুরুলিয়া শহরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। সরকারের নির্দেশে 'দেশবন্ধু প্রেস' ও 'মুক্তি' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। 'শিল্পাশ্রম' সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে শশধর গাঙ্গুলী, অতুলচন্দ্র ঘোষ, নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত সকলেই আইন অমান্য করে কারাবরণ করলেন। মহিলারাও এই আন্দোলনে যোগদান করার জন্য লাবণ্যপ্রভা ঘোষের নেতৃত্বে মহিলা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবীরা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কারাবরণ করেন। লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, বাসন্তী দেবী ও উর্মিলা ঘোষের প্রায় দুইবছর কারাদণ্ড হয়। মহিলারাও সমবেতভাবে আইনঅমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২৮ সালে মানভূমে গঠিত হয়েছিলো মহিলাসভা এবং তার সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবী।[১১] ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে মানভূম কংগ্রেস থেকে লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনে একজন মহিলা নেত্রী প্রতিনিধি হিসেবে গিয়েছিলেন তার নাম শেফালিকা বসু। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে সারাভারত আইন অমান্য আন্দোলনে ভাটাপড়ার দরুন মানভূম অঞ্চলেও আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। ১৯৩৩ সালের মাঝামাঝি নিবারণ দাশগুপ্ত কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করতে গেলে মহাত্মাগান্ধী তাঁকে দেখতে আসেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে শিল্পাশ্রমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মানভূম জেলা কংগ্রেস নিবারণ দাশগুপ্তকে 'ঋষি' নামে অভিহিত করে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নিবারণ দাশগুপ্তের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন।

ভারতছাড়ো আন্দোলন :

১৯৪২ সালের ভারতছাড়ো আন্দোলন দেশের অন্যান্য স্থানের মতন মানভূম ও পুরুলিয়াতেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সারাভারত কংগ্রেস কমিটি আগস্ট মাসের ৮ই আগস্ট যে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূচনা করেছিলো তার ঠিক দুইদিন পর পুলিশ শিল্পাশ্রমকে ঘিরে রেখে লাবণ্যপ্রভাব ঘোষ, রামকিংকর মাহাতো ও অরুণচন্দ্র ঘোষ

প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দদের গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করে। তবুও পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে কিছু কংগ্রেস কর্মী আন্দোলন বজায় রাখার জন্য আদ্রায় এক গুপ্ত স্থানে সভায় মিলিত হতেন। নিবারণচন্দ্রের পুত্র চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত, কন্যা বাসন্তী দেবী ও তাঁর স্বামী সুবোধ রায় সবাই একত্র হয়ে মিলিত হয়ে ঠিক করেন যে সারা মানভূম অঞ্চলে তারা আন্দোলন ছড়িয়ে দেবেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং টেলিফোনের তার কেটে দেওয়া হবে, রাস্তাঘাট ও সেতু-পুল ধ্বংস করে দেওয়া হবে।[১২] আদ্রার বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বান্দোয়ন থানা আক্রমণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ভজহরি মাহাতো ও কুশধ্বজ মাহাতো। বরাবাজার থানা আক্রমণের দায়িত্ব পরে ধনঞ্জয় ও ভীম মাহাতোর উপর এবং মানবাজার থানা সত্যকিংকর মাহাতো, হুড়া থানার আক্রমণের দায়িত্ব দেওয়া হলো কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরীর উপর। ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে জিতানে ভজহরি মাহাতোর বাড়িতে গোপন বৈঠক করা হয়। সেখানে ঠিক হয় যে, আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর সারা মানভূম জেলা ও পুরুলিয়া সদরে কংগ্রেসের অগ্রণী কর্মীগণ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নাশকতামূলক কাজে নেতৃত্ব দেবেন। জিতান পুরুলিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিচিতি লাভ করবে। মানভূম জেলার উত্তরাংশে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে তেমন প্রত্যাশা মতন সাড়া মেলেনি। কাশীপুর, আদ্রা, আনাড়া ও রঘুনাথপুর অঞ্চলে রাস্তা ভেঙে ফেলা হয়েছিলো আবার কোথাও টেলিগ্রামের তার বিছিন্ন করার মতন কিছু ঘটনা ঘটেছিল। পুঞ্চা, বলরামপুর ও হুড়াতে টেলিফোনের তার ছেঁড়া এবং টেলিগ্রামের তাঁর ছিঁড়ে দেওয়া ও পথ অবরোধের মতন ঘটনা ঘটলেও তা সম্পূর্ণভাবে সমানভাবে ব্যাপৃত হয়নি। তবে দক্ষিণ দিকের থানাগুলি বিশেষ করে বরাবাজার, বাগমুণ্ডি, ও মানবাজার থানার ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য এসেছিলো। বরাবাজার থানা আক্রমণের দায়িত্ব ছিলো মদন মাহাতো ও ধনঞ্জয় মাহাতোর উপর।[১৩] আগের দিন অর্থাৎ ২৮শে সেপ্টেম্বর কংগ্রেস কর্মীরা হাটেবাজারে ঘোষণা করে যে ইংরাজ সরকারকে যেন আর খাজনা না দেওয়া হয়। ২৮শে সেপ্টেম্বর রাত থেকেই জাহানাবাদের অতুলাশ্রমে কংগ্রেস অভিযানকারীরা মিলিত হয়ে জমায়েত করে থানা চত্বরে। থানার পুলিশ কর্মচারীগণ ভয় পেয়ে গেলে তাদের বেঁধে রাখা হয় এবং থানায় লুটপাঠ চালানো হয়। কাগজ পত্রে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। বরাবাজার থানা প্রায় সাতদিন ইংরেজ প্রশাসনমুক্ত ছিলো। এই অভিযানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন বিপুলাংশে যোগদান করে। দামু শবর, রাম শবর ও লক্ষ্মণ শবরের নেতৃত্বে খাড়িয়া শবরের একটা অংশ অভিযানে যোগদান করেছিলো।[১৪]

বান্দোয়ান থানা দখলের অভিযান হয়েছিলো ২৪ শে সেপ্টেম্বর। এখানে নেতৃত্ব দিয়েচিলো গৌর মাহাতো, বাবুরাম মাহাতো, ও ভজহরি মাহাত। এই অভিযানে ধাদকা ও কুইলাপাল অঞ্চলের অধিকাংশ লোক যোগ দিয়েছিলো। টাটকো নদীর সেতু ভাঙতে গেলে কংগ্রেকর্মীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে গুরুচরণ ভূমিজ, রতন

মাঝি, মুড়িরাম মাহাতো প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ আহত হন। তাও অভিযোগকারীরা নিরুৎসাহিত না হয়ে দৃঢ়ভাবে বান্দোয়ান থানা দখল করে তা পুলিশ মুক্ত করেন।[১৫] বান্দোয়ান থানা মুক্ত করতে ব্রিটিশ প্রশাসনের কিছুদিন সময় লেগেছিলো। বাগমুণ্ডি থানা ও ডাকঘর সাফল্যের সাথে ঘেরাও কর্মসূচী সাফল্যমণ্ডিত করার পর মানবাজার থানা অবরোধের ক্ষেত্রে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিলো। ২৯শে সেপ্টেম্বর সারারাত ধরে আশেপাশের গ্রাম থেকে কংগ্রেস কর্মীরা চেলুয়া গ্রামের মাঠে জমায়েত হয়েছিল। ৩০শে সেপ্টেম্বর বহু কংগ্রেস কর্মীগণ মানবাজার থানা ঘেরাও করে তখন অকস্মাৎ পুলিশ কোনরকম সতর্ক না করে গুলি চালাতে থাকে। চুনারাম মাহাতো নামক কংগ্রেস কর্মী সেখানেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। অন্যদিকে গুরুতর আহত হয়েছিলেন হেমচন্দ্র মাহাত। প্রায় দেড়শো লোক গুলিতে আহত হয়। পুরুলিয়ার সরকারি হাসপাতালে গোবিন্দ মাহাতোর মৃত্যু ঘটে। জেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হেমচন্দ্র মাহাত বাঁকুড়ার রামকোট গ্রামে ড. মহন্ত চৌধুরীর গৃহে ওঠেন। পুলিশ হেমচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করতে না পারলেও গান্ধীজীর নির্দেশে তিনি পুলিশের কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেন।[১৬] সরকারি অত্যাচারকে ভ্রূক্ষেপ না করে মানবাজার গুলি চালানোর প্রতিবাদে ৬ই অক্টোবর পুরুলিয়া শহরে হরতাল পালিত হয়। অক্টোবর মাসের শেষের দিক থেকে মানভূম মেলায় গণ আন্দোলন স্তিমিত হতে থাকে। এর প্রধান কারণ একদিকে পুলিশের অত্যাচার এবং অন্যদিকে যারা নেতৃত্ব দেবেন তাদের অধিকাংশই তখন ইংরেজ সরকারের নজরবন্দি। বহু কংগ্রেসী নেতাগণ কারাগার বন্দী। তবে ১৯৪২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর মানভূমের ডেপুটি কমিশনার বিহারের মুখ্যসচিবকে পত্রে লেখেন যে, পরিস্থিতি কিছুটা আয়ত্তে এলেও তা কিন্তু সাময়িক। কারণ মানুষের জনরোষ এবং আন্দোলন কিন্তু তখনও থামেনি সম্পূর্ণভাবে।[১৭] ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা গভীরভাবে বিদ্যমান এবং যেকোন সময় সেই বিদ্বেষ আবার পুনরায় জেগে উঠবে।

উপসংহার :

পুরো ভারতবর্ষের মতো মানভূম তথা পুরুলিয়া জেলাও স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বানে যোগদান করেছিলো এবং বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী মৃত্যুবরণ ও করেছিলেন নিজের মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার জন্য। মানভূমের সংগ্রামী আন্দোলনে পুলিশি অত্যাচারের কাহিনী সঠিকভাবে বিবরণ করা যাবে না। তবে মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্ব হল যে, সকল স্তরের বিভিন্ন জাতি ধর্ম ও আদিবাসী মানুষও সমানভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করে। বরাবাজার থানায় নিরীহ শবর মানুষরাও অত্যাচার এর হাত থেকে রেহাই পায়নি। ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে সহমত যে, মানভূমের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর সামাজিক বিন্যাস ও মূল্যবোধের ক্রিয়াবাদই যে তাদের নিজের বর্ণগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যবোধকে বজায় রেখে একটি সংহত সংস্কৃতি ও গোষ্ঠী চেতনার উদ্ভব ঘটিয়েছে।[১৮] ঔপনিবেশিকতার শিকড় যতই সময়ের সাথে সাথে দৃঢ়

হতে থাকে ততই আদিবাসীদের রাজনৈতিক বিন্যাস, সামাজিক কাঠামো, অর্থনৈতিক ও ভূমিব্যবস্থা প্রভৃতি পরিবর্তন হতে শুরু করে। মানভূম অঞ্চলের শিখরভূম, বরাভূম, সিংভূম, পাতকুম, সাতভূম নিয়ে গঠিত অঞ্চল আপন মহিমায় উজ্জ্বল। অরণ্যবেষ্টিত মানভূমের আরণ্যক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হলো বিভিন্ন আদিবাসী জাতি গোষ্ঠীর মানুষ যেমন মুণ্ডা, ভূমিজ, খেড়িয়া, সাঁওতাল, বীরহোড়, মাল, ও কুর্মী-মাহাতগণ।[১৯] মানভূম জেলায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই জঙ্গলমহল' অঞ্চলে আদিবাসীদের নেতৃত্বে বিভিন্ন বিদ্রোহ শুরু হয়েছিলো। ১৮৩২-৩৩ খ্রিস্টাব্দে বরাভূমের জমিদার গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে ঘাটওয়াল উপজাতি গোষ্ঠীর বিদ্রোহ সূচনা করে যা 'গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা' নামে খ্যাত।[২০] ভূমিজ সম্প্রদায়ের মানুষজন ও এই বিদ্রোহে যোগদান করে। এরও পূর্বে ১৭৬০ এর দশকে এই জঙ্গলমহল অঞ্চলে চূয়াড় বিদ্রোহের দামামা বেজে ওঠে বা ব্রিটিশদের কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতি, ভূমি বিন্যাস ও অরণ্যনীতির বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে চূয়াড় বিদ্রোহের সূচনা থেকে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহ অবধি যে প্রায় দুই দশক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিলো তা সেখানে মানভূম অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর মানুষরাই নেতৃত্ব প্রদান ও যোগদান করেছিলো।[২১] তাই লড়াই ও সংগ্রামের ঐতিহ্যের প্রধান উৎসভূমি যে মানভূম জেলা তথা পরবর্তীকালে পুরুলিয়া জেলা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র

১. Ray, B., Census 1961 Purulia, West Bengal District Census Hand Book, Government of West Bengal Publication, 1961
২. চৌধুরী কমল, পুরুলিয়ার ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৮৫
৩. মাহাত, পশুপতি প্রসাদ, ঝাড়খণ্ড : সমাজ ও বিদ্রোহ আন্দোলন, বুকপোস্ট, পৃ. ২২
৪. চৌধুরী কমল, পুরুলিয়ার ইতিহাস, পৃ. ২৬৭
৫. জানা, দেবপ্রসাদ, অহল্যাভূমি পুরুলিয়া, দীপ প্রকাশন, পৃ. ২৩
৬. জানা, দেবপ্রসাদ, পূর্বোক্ত।
৭. মাহত পশুপতি প্রসাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৭
৯. জানা দেবপ্রসাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪
১০. মিত্র, সুনেত্রা, সদর, মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলন, পৃ. ৩৭
১১. জানা, দেবপ্রসাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪
১২. ভট্টাচার্য তরুণদেব, পুরুলিয়া, ফার্মা কে এল এম, পৃ. ১০৩

১৩. মাহাতো, ভজহরি, স্বাধীনতা আন্দোলনে রক্তে রাঙা মানভূম, পৃ. ৪৯
১৪. জানা, দেবপ্রসাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫
১৫. পূর্বোক্ত।
১৬. মাহাত পশুপতি প্রসাদ, পুরুলিয়া : ইতিহাস ও সংস্কৃতি, কলকাতা, পৃ. ২৭৭
১৭. মাহাতো, ভজহরি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০
১৮. মাহাত, পশুপতি প্রসাদ, ঝাড়খণ্ড : সমাজ বিদ্রোহ-আন্দোলন, পৃ. ৬২
১৯. সেন, শুচিব্রত, ভারতের আদিবাসী, পৃ. ৬৫
২০. পূর্বোক্ত
২১. মাহাত, পশুপতিপ্রসাদ, পুরুলিয়া : ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পৃ. ২৭৩

ভারতের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিকতাবাদ: একটি তাত্ত্বিক আলোচনা

জ্যোতি মিত্র
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়, ভূপতিনগর, পূর্ব মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ:- ভারত বহু বিচিত্র সংস্কৃতিসম্পন্ন ও প্রাচীন সভ্যতার দেশ। বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, জাতি, বর্ণের সমন্বয় ঘটেছে এই দেশে। এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, শিখ ও জৈন ধর্মের মানুষেরা পাশাপাশি বসবাস করে ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে মিশে গিয়েছে। তবুও এই ঐক্যের মাঝে আমরা ভারতবাসীরা বিচ্ছেদের বেদনায় আজ জর্জরিত। সুতরাং যে শক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে আমাদের ঐক্য ও সংহতিকে বিপন্ন করে তুলেছে তাদের মধ্যে আঞ্চলিকতাবাদ হল অন্যতম। মূলত বহুত্ববাদী সমাজের জন্যই ভারতে দেখা দিয়েছে আঞ্চলিকতাবাদ। কাজেই ভারতীয় আঞ্চলিকতাবাদকে একটি বহুমাত্রিক ঘটনা বলা যায়। কারণ হিসেবে বলা যায় যে, এই বহুত্ববাদী সমাজে বিভিন্ন উপাদানের বিকাশ বা উন্নয়ন সমানভাবে ঘটেনি। তবে, ভারতীয় আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিকতাবাদ আলোচনা করার পূর্বে আঞ্চলিকতাবাদ বিষয়টি কি তা জানা প্রয়োজন। আক্ষরিক অর্থে আঞ্চলিকতাবাদ হল নিজের অঞ্চলের প্রতি আনুগত্যকে বোঝায় অর্থাৎ জাতি বা দেশের প্রতি আনুগত্যের পাশাপাশি যখন অঞ্চলভিত্তিক আনুগত্য গড়ে ওঠে তখন আঞ্চলিকতাবাদের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন কারণে এই ধরণের আনুগত্য গড়ে উঠতে পারে, যথা-কোনো ভাষা সম্প্রদায়, নৃকুলগোষ্ঠী বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা কোন এক বিশেষ অঞ্চলে অধিক সংখ্যায় যখন বসবাস করে, তখন সে অঞ্চলকে তারা নিজেদের এলাকা বলে ভাবতে শেখে। সেই এলাকার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে মিশে গিয়ে তারা একটি স্বতন্ত্র সত্তারূপে আবির্ভূত হয়। সুতরাং ভারতবর্ষের মতো দেশে আঞ্চলিকতাবাদের প্রসারের ফলে জাতীয় সংহতি ও ঐক্য কিভাবে বিনষ্ট হয় বা সমাজের অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষদের কিভাবে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় প্রভৃতি দিকগুলি যথার্থভাবে আলোচনা বা অনুসন্ধান করাই হলো আমার গবেষণামূলক প্রবন্ধের মূল বিবেচ্য বিষয়।
মূল শব্দ :- জর্জরিত, বহুত্ববাদী, বহুমাত্রিক, আনুগত্য, নৃকুলগোষ্ঠী।
মূল বিষয়:- বলা যায় যে, কোন রাষ্ট্রের অধিবাসীরা একটি জাতীয় ভূখণ্ডে বসবাস করে। স্বাভাবিক কারণে সেই ভূখণ্ডের প্রতি অধিবাসীদের একটা ভালবাসা বোধ তৈরি হয়। যেমন- আমরা ভারতীয় নাগরিক হিসেবে আমাদের ভারতের প্রতি একটা শ্রদ্ধা ও ভালবাসা রয়েছে। আবার, ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল ও ছোট ছোট ভৌগোলিক

এলাকা রয়েছে। সুতরাং তাদেরও নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি যে রয়েছে তা লক্ষ্য করা গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার মানুষেরা সংস্কৃতিগত, ভাষাগত বা গোষ্ঠীগত কারণে তাদের অঞ্চলের প্রতি এক বিশেষ আনুগত্য দেখায়। এই বিশেষ আনুগত্যের ফলে সৃষ্টি হয় আঞ্চলিকতাবাদ। তবে নিজেদের সংস্কৃতি, ভাষা বা অঞ্চলের প্রতি আনুগত্য থাকাটা দোষের নয়। কিন্তু সেই আনুগত্য যখন সংকীর্ণরূপ ধারণ করে, অঞ্চলের স্বার্থকে বড় করে দেখা হয় তখন জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষিত হয় এবং সেটি ভারতের ঐক্যের পথে একটি বিরাট অন্তরায় বলে মনে করা হয়। সেক্ষেত্রে নিজেদের অঞ্চলকে একান্তভাবে তারা আপন বলে মনে করে। সুতরাং সেই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষদের বহিরাগত বলে মনে করে। আবার, ভারতবর্ষে একাধিক উপ-অঞ্চল রয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপ-অঞ্চল রয়েছে, যাদের মধ্যেও ঐক্যরূপতা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এই প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের এক একটি জনগোষ্ঠীর মানুষ ছড়িয়ে রয়েছে। এই জনগোষ্ঠী নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় এবং অর্থনৈতিক বিকাশের ব্যাপারে সবসময় উদ্যোগী থেকেছে।[১] সুতরাং ভারতীয় আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিকতাবাদের উদ্ভব ও প্রসার এবং এর ফলস্বরূপ যে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে তা গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করাই হলো আমার গবেষণামূলক প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতের সমাজ-সংস্কৃতিতে আঞ্চলিকতাবাদের প্রসার:- তবে মূল উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর পূর্বে গবেষণার স্বার্থে যে বিষয়টি আলোচনা করা প্রয়োজন তা হল ভারতবর্ষের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতাবাদের অস্তিত্ব কি পূর্বে ছিল? অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগেও আঞ্চলিকতাবাদের ধারণা ছিল। তৎকালীন বিভিন্ন শাসকই নিজ নিজ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের প্রেক্ষাপটে নিজ নিজ অঞ্চলকে একটি পৃথক প্রশাসনিক একক হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন পুরাণে বিশেষত বায়ু পুরাণে ভারতবর্ষকে সাতটি অঞ্চলে বিভক্ত করে মোট ১৬৫ টি পৃথক ভৌগোলিক সীমানাভিত্তিক জনপদ গঠন করার কথা বলা হয়েছিল। প্রতিটি জনপদের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা এলাকা ছিল। তবে প্রতিটি জনপদের মানুষের মধ্যে পৃথক পৃথক ভাষা, রীতিনীতি, প্রথা, সংস্কৃতি যে ছিল এমনটা বলা যায় না, বরং প্রতিটি জনপদের জনগোষ্ঠীর মধ্যে বংশগত, ভাষাগত, সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি সম্পর্কিত এবং রাজনৈতিক মর্যাদার এক সংমিশ্রণ তৈরি হয়েছিল। আবার, মধ্যযুগের মুঘল আমলে আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' এবং 'তুজক-ই-জাহাঙ্গিরী' অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের আত্মজীবন থেকে জানা যায় যে, এই সময় সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ঐক্যরূপতার ভিত্তিতে ভারতের নানা অঞ্চলকে সুবা ও প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল। সুতরাং মুঘল আমলে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐক্যরূপতার প্রেক্ষাপটে ভারতের

ভৌগোলিক এলাকায় এক আঞ্চলিক বিভক্তিকরণ ঘটেছিল।[২] তাছাড়া, ব্রিটিশরা আমাদের ভারতবর্ষে প্রবেশ করার পর পরই লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে, তারা বংশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সমাজ ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের বিষয়গুলি নস্যাৎ করে দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করেছিল। অর্থাৎ ব্রিটিশ যুগে ভারতের এক একটি প্রদেশে একাধিক জনগোষ্ঠীর সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। যেমন- মাদ্রাজ প্রদেশে তামিল, তেলেগু ও মালায়াম অঞ্চলকে। আবার, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয় মারাঠি, গুজরাটি ও কান্নাডা অঞ্চলকে।[৩] এর ফলস্বরূপ ব্রিটিশ যুগেও ভারতের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আঞ্চলিকতার বিভাজন অনেকখানি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে।

ভারতে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আঞ্চলিকতাবাদ:- ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ে তিনটি স্তরের মধ্যে দিয়ে আঞ্চলিকতাবাদের প্রসার ঘটেছে, যথা- ১৯৪৭-১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রথম স্তর, ১৯৭১-১৯৯০ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় স্তর, ১৯৯০-আজ পর্যন্ত তৃতীয় স্তর।[৪] সুতরাং এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতবর্ষ যখন পরাধীন ছিল, তখনই ব্রিটিশ শাসকরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের স্বার্থে আঞ্চলিকতার ধ্যান-ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। স্বাধীনতার পর যখন সংবিধান রচনা করা হয়, তখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের জাতীয়তাবাদী আদর্শে চালিত করার চেষ্টা করা হয়, যাতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ অখন্ড ভারতের অধিবাসী হিসেবে নিজেদের ভাবতে শেখে। তার জন্য এক নাগরিকত্বের ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই সংবিধানবিদদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আঞ্চলিকতাবাদ পূর্ণমাত্রায় দেখা দিতে দেরি হয়নি। সুতরাং কেউ কেউ ১৯৫৬ সালে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবিকে স্বাধীনতার পরে আঞ্চলিকতাবাদের প্রথম প্রকাশ বলে মনে করেছেন। তবে সম্ভবত মনে করা হয় ১৯৬০ সালে তামিলনাড়ুতে দ্রাবিড় মুনাথা কাজাঘাম পার্টির কাছে কংগ্রেসের পরাস্ত হওয়ার ঘটনার পর থেকেই আঞ্চলিকতাবাদ যে প্রসার লাভ করতে থাকে তা বলা যায়।[৫]

এ প্রসঙ্গে আঞ্চলিকতাবাদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইকবাল নারাইন তাঁর লেখা ‘’Regionalism: A conceptual Analysis in the Indian context” শীর্ষক নামক এক রচনায় বলেছেন, আঞ্চলিকতাবাদের দুটি দিক রয়েছে। নেতিবাচক দিক থেকে আঞ্চলিকতাবাদ দেশের পরিবর্তে নিজের অঞ্চলকে বড় করে দেখে। আর ইতিবাচক দিক থেকে আঞ্চলিকতাবাদ নিজেদের অঞ্চল, সংস্কৃতি, ভাষা প্রভৃতিকে ভালোবাসে এবং তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ভারতে আঞ্চলিকতাবাদ অনেক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয়েছে।[৬]

বহুমাত্রিক ঘটনারূপে ভাষাভিত্তিক আঞ্চলিকতাবাদের প্রসার:-ভারতের ন্যায় এক উপমহাদেশে বহু ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি বজায় থাকায় স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় আঞ্চলিকতাবাদ একটি বহুমাত্রিক ঘটনারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভারতে আঞ্চলিকতাবাদ নানারূপে দেখা গিয়েছে। প্রথমত, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষাগত আঞ্চলিকতার প্রকাশ দেখা যায়। তার কারণ, ভারতের প্রধান প্রধান ভাষা সম্প্রদায়সমূহ এক একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সন্নিবিষ্ট হয়ে রয়েছে অর্থাৎ বাঙালিরা পশ্চিমবঙ্গে, তামিলরা তামিলনাড়ুতে, মালয়ামিরা কেরালাতে, অথবা মারাঠিরা মহারাষ্ট্রে সন্নিবিষ্ট হয়ে রয়েছে। এই ভাষা সম্প্রদায়সমূহ নিজ নিজ এলাকা সম্পর্কে সচেতন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অনতিকালের মধ্যেই এই কারণে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবি উঠেছে। শেষ পর্যন্ত জনগণের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৪ সালে ‘রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন’ গঠন করেছে। কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালে ‘রাজ্য পুনর্গঠন আইন’ গৃহীত হবার পর রাজ্যগুলি মোটামুটিভাবে ভাষার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এই ভাষাভিত্তিক রাজ্যগুলি নিজেদের ক্ষমতাকে প্রসারণের জন্য আঞ্চলিকতাবাদের জিগির তোলে। ১৯৬০ সালে বোম্বাই প্রদেশকে ভাষার ভিত্তিতে ভেঙে গুজরাট ও মহারাষ্ট্র নামে দুটি আলাদা অঙ্গরাজ্য গঠন করা হয়। ১৯৬৬ সালে পাঞ্জাবকে ভেঙে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা দুটি রাজ্য গড়ে তোলা হয়। ১৯৭১ সালে হিমাচল প্রদেশকে এবং ১৯৭২ সালে মেঘালয়, মণিপুর ও ত্রিপুরাকে পূর্ণ রাজ্যের পর্যায়ে উন্নীত করা হয়।[৭] আবার, পরবর্তীকালে সাঁওতাল ভাষাভাষীদের দাবিকে মেনে নিয়ে ২০০২ সালে ঝাড়খন্ড নামক রাজ্য গঠন করা হয়।

এছাড়া, বেশিরভাগ রাজ্য সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাকে রাজ্য সরকারের ভাষার মর্যাদা দেওয়ায় আঞ্চলিকতাবাদের প্রসার ঘটে। ১৯৬৫ সালে সরকারি ভাষা হিসেবে কেবলমাত্র হিন্দীকে গুরুত্ব দেওয়া হলে, দক্ষিণ ভারতের কোথাও কোথাও ভাষাকেন্দ্রিক বিরোধ তৈরি হয়। অসম ভাষাকে কেন্দ্র করে অসমীয়া ও বাঙালীদের মধ্যে তিনবার বিরোধ বেধে যায় ১৯৫১, ১৯৬১ ও ১৯৭২ সালে। কর্ণাটক রাজ্যে মারাঠি ও কামারী গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ ভাষাগত আঞ্চলিকতাবাদের প্রসার ঘটায় তা বলা যায়। বলা হয় যে, সংবিধান প্রবর্তনের প্রথম ১৫ বছর পর্যন্ত হিন্দীর সঙ্গে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার প্রচলিত থাকবে। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে তামিলনাড়ু হিন্দী ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে এখনও গ্রহণ করতে পারেনি। আবার, অসমের দুটি জেলার জনগোষ্ঠী সম্প্রদায় কারবি কে তাদের সরকারি ভাষা হিসেবে দাবি করে এবং এই দাবিকে কেন্দ্র করে সেই অঞ্চলকে পৃথক অঙ্গরাজ্যের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলা হয।[৮] এইভাবে আঞ্চলিকতার প্রবণতা তৈরি হয়।

মনস্তাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্যবোধের নিরিখে আঞ্চলিকতাবাদ:-দ্বিতীয়ত, মনস্তাত্ত্বিকভিত্তিক আঞ্চলিকতাবাদের কথা বলা যায়, যা অনেক সময় কোন অঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, গৌরবকথা প্রভৃতির ভিত্তিতে সেই অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে এক ধরণের

মনস্তাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্ম দেয়, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে আঞ্চলিকতাবাদের আকার ধারণ করে। উদাহরণ হিসেবে দ্রাবিড়স্থানের দাবির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্রাবিড় কাজাঘাম দল ষাটের দশকে স্বতন্ত্র দ্রাবিড় অঞ্চল গঠনের দাবি তোলে। এই দলের মতে, উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহ দক্ষিণ ভারতের ওপর দীর্ঘকাল ধরে শাসন ও শোষণ চালিয়ে এসেছে। সুতরাং একমাত্র স্বতন্ত্র দ্রাবিড় স্থান গঠনের মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতীয়দের মুক্তি সম্ভব বলে এরা মনে করেন। আবার, পাঞ্জাবে যে খালিস্তানি আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলন তৈরি হয়েছে তার পিছনে মনস্তাত্ত্বিক বিষয় কাজ করছে। বলা যায় যে, কংগ্রেস সরকারের অনমনীয় নীতি শিখদের মনে গভীর ফেলেছে। তারই ফলস্বরূপ শিখদের মধ্যে আঞ্চলিকতাবাদী মনোভাব দেখা দিয়েছে।[৯]

ভূখণ্ডগত আঞ্চলিকতাবাদের বিকাশ:-তৃতীয় উপাদানের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, যখন কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড অথবা বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে দেশের অভ্যন্তরে পৃথক রাজ্য বা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবি ওঠে। উদাহরণস্বরূপ বিদর্ভ রাজ্য গঠনের দাবির কথা বলা যেতে পারে। মারাঠি ভাষা হলেও ঐতিহাসিক বিদর্ভ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে একটি স্বাতন্ত্র্যবোধ আছে। তারই ভিত্তিতে সম্প্রতি বিদর্ভ রাজ্য গঠনের দাবি উঠেছে। মহারাষ্ট্রকে ভেঙে আলাদা বিদর্ভ রাজ্য তৈরি করার দাবির পিছনে রয়েছে আঞ্চলিক অনগ্রসরতার প্রেক্ষাপট। সর্বভারতীয় যে দলগুলি রয়েছে, সেই দলগুলিও পৃথক বিদর্ভ রাজ্য গড়ে ওঠার জন্য স্বীকৃতি দেয়নি।[১০] অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা অঞ্চলের অধিবাসীরাও অনুরূপ দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন করেছে। তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতির নেতৃত্বে অন্ধপ্রদেশকে ভেঙে তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের যে দাবি তৈরি হয়েছে, তার পিছনে মূল কারণ হলো, আঞ্চলিক অনগ্রসরতার প্রেক্ষাপট। সেই কারণে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। ১৯৫৫ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন যে প্রতিবেদন সরকারের কাছে পাঠায় তাতে তেলেঙ্গানাকে আলাদা রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সুপারিশ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তেলেঙ্গানাকে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচন হওয়ার আগে কংগ্রেস দল তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতির সঙ্গে জোট তৈরি করে এবং ক্ষমতায় তারা এলে পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্যের দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে স্থায়ী সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে 'মূলকি আইন' প্রণীত হওয়ায় এ আন্দোলন কিছুটা পরিমাণে প্রশমিত হয়েছে।[১১] এছাড়া, ১৯৫৬ সালের পর থেকে বিভিন্ন রাজ্যগুলোর মধ্যে সীমান্ত নিয়ে বিরোধ তৈরি হলে তা আঞ্চলিকতাবাদে পর্যবসিত হতে দেখা গিয়েছে। বর্তমানে কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে বেলগাঁওকে কেন্দ্র করে পাঞ্জাব ও হরিয়ানার মধ্যে বিরোধ চলছে। আবার, একাধিক রাজ্যের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর জলবন্টনকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিকতাবাদ দেখা দিয়েছে। যেমন- গোদাবরীর জলবন্টনকে কেন্দ্র করে অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও কর্ণাটকের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়েছে। তাছাড়া,

কাবেরী নদীর জলবন্টন নিয়ে দক্ষিণ ভারতের তিনটি রাজ্যের মধ্যে প্রচন্ড বিরোধ দেখা দিয়েছে।[১২]

অর্থনৈতিক দাবিভিত্তিক আঞ্চলিকতাবাদ:-চতুর্থ ক্ষেত্রে বলা যায়, বর্তমানে ভারতে যে সব আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে তার বেশিরভাগটা মূলত অর্থনৈতিক দাবির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অঙ্গরাজ্যগুলির অধিকতর ক্ষমতার দাবিতে আন্দোলন, সংরক্ষণজনিত আন্দোলন, কৃষক ও শ্রমিকদের আন্দোলন, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের আন্দোলন প্রভৃতি অর্থনৈতিক আন্দোলনের মূল রয়েছে অর্থনৈতিক বিষয়টি। কেননা, ভারতের মতন উন্নয়নশীল দেশে সম্পদের অভাব রয়েছে বলে জনগণের মধ্যে মাঝে মাঝে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে ভূমিপুত্র মনোভাব, যা একই অঞ্চলে বসবাসকারী বাইরের লোকদের বিরোধী বলে মনে করে। মূলত অনগ্রসর অঞ্চলের অধিবাসীরা অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের সুবিধাগুলি কিছু বিত্তবাণদের হাতে রয়ে গিয়েছে। তাছাড়া, বর্তমানে ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলির অবস্থা আরও খারাপ। উন্নয়নমূলক কাজের বেশিরভাগ দায়িত্ব এই রাজ্যগুলির উপর ন্যস্ত থাকলেও এমন বহু রাজ্য আছে যাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্পদের অভাব রয়েছে। ফলত কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর তাদের নির্ভরশীল থাকতে হয়। অনুন্নত রাজ্যগুলির অভিযোগ যে, উন্নত রাজ্যগুলির তুলনায় তারা কম পরিমাণে আর্থিক অনুদান পায়। ফলত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই বৈষম্য আঞ্চলিকতাবাদের অভিব্যক্তি ঘটায়।[১৩] পরিসংখ্যানে লক্ষ্য করা যায়, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের গড় আয় বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ, অসম প্রভৃতি রাজ্যের তুলনায় বেশ সমৃদ্ধ। এইসব অনুন্নত অঞ্চলের নেতৃবৃন্দগণ জনগণের বঞ্চনা ও দুর্দশাকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিকতা গড়ে তুলতে বেশি উৎসাহী। অর্থাৎ কোন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে যদি এরূপ ধারণা তৈরি হয় যে, তারা বিভিন্নভাবে ভারত সরকার কর্তৃক বঞ্চিত হচ্ছে, তখন সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে আঞ্চলিকতাবোধ আরও তীব্র হয়ে ওঠে।[১৪] ভারতীয় সংবিধানের ১৪-১৮ নং ধারায় সাম্যের কথা বলা হলেও এখনও পর্যন্ত এই দেশে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসেও লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ভারতের ২০% মানুষ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলেও ৮০% মানুষ তা থেকে এখনও বঞ্চিত।[১৫] ফলত ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে ব্যবধান ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এর ফলশ্রুতিতে আঞ্চলিকতার প্রসার যে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘটছে তা গবেষণায় সহজে ধরা পড়ে।

রাজনৈতিক আঞ্চলিকতাবাদের প্রসার:-পঞ্চম ক্ষেত্রে বলা যায় যে, রাজনৈতিক আঞ্চলিকতাবাদ মূলত বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল, আঞ্চলিক গোষ্ঠী ও সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে। বিভিন্ন কারণে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অঞ্চলভিত্তিক রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে, যথা- তামিলনাড়ুতে ডি.এম.কে., অন্ধ্রতে

তেলেগু দেশম, পাঞ্জাবে অকালি দল, অসমের অসম গণপরিষদ প্রভৃতি। এই সকল দল অধিকতর রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য সংবিধান সংশোধনের দাবি করে। অকালি দল চারটি ক্ষমতা ব্যতিরেকে বাকি ক্ষমতাসমূহ রাজ্যগুলিকে দেওয়ার দাবি তোলে। সম্প্রতি স্বতন্ত্র গোর্খাল্যান্ড রাজ্য গঠনের দাবি এসেছে গোর্খা লিবারেশন ফন্টের কাছ থেকে। সুভাষ ঘিসিং এর তত্ত্বাবধানে এই সংগঠন বহুদিন ধরে আলাদা রাজ্য গঠনের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে অর্থাৎ ২০০৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার গোর্খা পার্বত্য পরিষদের স্বশাসনকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলেছে। বলা হয় যে, তাদের ষষ্ঠ তপশিলের মধ্যে নিয়ে এসে ক্ষমতা দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গের গোর্খা লীগের উদ্দেশ্য হলো দার্জিলিং জেলায় ভারতীয় নেপালীদের জন্য গোর্খাল্যান্ড গড়ে তোলা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে সুভাষ ঘিসিং- এর মধ্যে একটি সমঝোতা পত্র বর্তমানে স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু এত সবকিছু হওয়ার পর তারা গোর্খাল্যান্ডের দাবি থেকে কখনোই পিছুপা হবে না বলে জানিয়েছেন।[১৬]

প্রতিবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং আঞ্চলিকতাবাদ:-এছাড়া, রাজনৈতিক আঞ্চলিকতাবাদ কখনও কখনও প্রতিবাদী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠতে পারে। অসম এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরণের আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। এই আন্দোলন অনেক সময় হিংসাত্মক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে জঙ্গি বা বিচ্ছিন্নতাবাদ এর চেহারা নেয়। বিংশ শতাব্দী ষাটের দশকের প্রথমদিকে অসমের পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাদের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র আন্দোলনে শামিল হয়। ভারত সরকারের নমনীয় নীতির ফলস্বরূপ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বেশি দিন টিকে থাকতে পারেনি। উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগা উপজাতি জনগোষ্ঠীর আন্দোলনও ছিল এক জঙ্গি আন্দোলন। ১৯৬৩ সালে নাগাল্যান্ড রাজ্য গঠনের পরও তাদের ক্ষোভ প্রশমিত হয়নি। ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে নাগা নেতাদের সঙ্গে সরকার আলোচনায় বসে। কিন্তু এই আন্দোলনের কোন স্থায়ী সমাধান আজও হয়নি। নাগা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বর্তমানে ২০০৩ সালে NSCN নামে পরিচিতি লাভ করে।[১৭] অনুরূপভাবে ১৯৪৭ সালে মেঘালয়কে পৃথক অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার পর এই অঞ্চলে খাসি ও গারো আদিবাসীদের ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হয়। তারা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯৭২ সালের মেঘালয় রাজ্যটি গঠন করা হয় খাসি, জয়ন্তিকা প্রভৃতি উপজাতিদের নিয়ে।

মিজো উপজাতিদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন:-আবার, মিজো উপজাতিদের আন্দোলন সংগঠিত হয় ১৯৫৯ সালে। ১৯৬৬ সালে লালডেঙ্গার নেতৃত্বে 'মিজো জাতীয় ফ্রন্ট' মিজো আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি নিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে শামিল হয়। এই আন্দোলন প্রকৃতগতভাবে গেরিলা যুদ্ধে পরিণত হয়। ১৯৮৬ সালে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে লালডেঙ্গার এক

ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই নেতা বৃহত্তর মিজোরাম, মিজোরামের জন্য পৃথক সংবিধান, পৃথক পতাকা প্রভৃতির দাবি করে। তথাপি সরকারের সঙ্গে তাঁর আলোচনার ফলশ্রুতিতে মিজোরামের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে তাকে পৃথক রাজ্যের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।[১৮]

ঝাড়খন্ড আদিবাসীদের আন্দোলন অঞ্চলভিত্তিক:-ভারতের পূর্বাঞ্চলে বিহার সংলগ্ন ঝাড়খন্ড অঞ্চলের আন্দোলন হল একটি অঞ্চলভিত্তিক আন্দোলন। এই আন্দোলন ছিল মূলত অনুন্নয়ন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন। ঝাড়খন্ড আন্দোলনকে বাস্তবমুখী করতে এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ঝাড়খন্ড বলতে বুঝিয়েছেন এই অঞ্চলের বসবাসকারী অদিবাসীগণকে, যারা ঝাড়খণ্ডের উৎসবে অংশগ্রহণ করেন, যারা ঐ অঞ্চলের সাহিত্য-সংস্কৃতির অংশীদার হিসাবে নিজেদেরকে দাবি করে। মূলত এই ব্যাখ্যায় আঞ্চলিক পরিচয়কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। **১৯৩৯** সাল থেকে আদিবাসী মহাসভা একটি আলাদা অঙ্গরাজ্যের দাবি করে। ২০০০ সালে নভেম্বরে ঝাড়খন্ড রাজ্য গঠিত হওয়ার পর এখনও আন্দোলন চলছে। ঝাড়খন্ড পার্টি, ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা, ঝাড়খন্ড পিপলস পার্টি প্রভৃতি সংগঠন এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। এই আন্দোলন ক্রমশ জয়পাল সিং এর নেতৃত্বে অঞ্চলভিত্তিক আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের পিছনে যে কারণগুলি ছিল তা হল আদিবাসীদের জমি এবং বনজ সম্পদ থেকে বিচ্যুত করার সমস্যা; বহিরাগত অ-আদিবাসীদের অনুপ্রবেশ; কাজের খোঁজে এই অঞ্চলের মানুষদের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া; আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক শুদ্ধতা ও অঞ্চলের মানুষদের সাংস্কৃতিক পরিচিতি রক্ষার সমস্যা ইত্যাদি। এই সমস্যা কাটিয়ে উঠে ২০০০ সালের ১৫ই নভেম্বর ঝাড়খন্ড একটি পৃথক রাজ্যের মর্যাদা পায়।[১৯]

ছত্তিশগড় ও উত্তরাখণ্ডকে পৃথক রাজ্যের স্বীকৃতি:- আবার, ২০০০ সালেই মধ্যপ্রদেশ ভেঙে ছত্তিশগড় এবং উত্তরপ্রদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে উত্তরাঞ্চল এই দুটি অঞ্চলভিত্তিক রাজ্য গঠিত হয়েছে। মূলত এই দুটি রাজ্যে গঠিত হয়েছে আঞ্চলিক সমস্যার নিরিখে। অনগ্রসরতা ছত্তিশগড় রাজ্যের মূল সমস্যা। **১৯৫৬** সালে ছত্তিশগড় মহাসভা গঠিত হয়। সেখানেও পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি তোলা হয়। **১৯৯০** সালে কংগ্রেস, বিজেপি প্রভৃতি দল ছত্তিশগড়ের জন্য আলাদা রাজ্যের দাবিকে সমর্থন করে। ছত্তিশগড় ২০০০ সালের পৃথক রাজ্যের স্বীকৃতি পেলেও পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য এই অঞ্চলে এখনও সেই রকম উন্নয়ন চোখে পড়েনি। আবার, এই একই বছরে ৮ই নভেম্বর হিমালয়ের পাদদেশে উত্তরাঞ্চল রাজ্যটি গঠিত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের আটটি পাহাড় নিয়ে গঠিত রাজ্যটি উত্তরাঞ্চল নামে নামকরণ করা হলেও **১৯৫২** সাল থেকে পৃথক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন চলাকালীন সরকারের তরফ থেকে চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল যে, নতুন রাজ্যের নাম হবে উত্তরাখন্ড। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক পিসি. যোশী অঞ্চলের জাতিগোষ্ঠীগত এবং সাংস্কৃতিক দিকটি বজায় রাখার জন্য ঐ একই দাবি তোলেন। কিন্তু উত্তরাখন্ড নামের মধ্যে যেহেতু ‘খন্ড’ কথাটি রয়েছে, সেহেতু

অনেকে এতে আপত্তি জানায়। ১৯৯৬ সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়া পৃথক রাজ্য হিসেবে উত্তরাখন্ডের দাবিকে সম্মতি দেয়। পরবর্তীকালে ২০০২ সালে উত্তরাখণ্ড রাজ্যটি পৃথক রাজ্যের স্বীকৃতি লাভ করে।[২০]

মণিপুরের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে আঞ্চলিকতা:- লক্ষ্যণীয়, মণিপুরের উত্তর-পূর্বাঞ্চল আদিবাসীদের এক প্রাচীন সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে। এখানকার ইতিহাস অন্যান্য আদিবাসী আন্দোলন এর থেকে কিছুটা আলাদা প্রকৃতির। মণিপুরের রাজা ১৮৯১ সাল নাগাদ ব্রিটিশ শাসকের কাছে আত্মসমর্পণ করে। মণিপুরকে স্বাধীনতার প্রাক্কালে Part-c এর মর্যাদা দেওয়া হয়। মণিপুর আদিবাসীদের মূল দাবি ছিল ইম্ফলে অবস্থিত দুর্গটি সরকার এই আদিবাসীদের হাতে দেবে। এই দুর্গের স্থানান্তর নিয়েও একসময় বিরোধ তৈরি হয়। সরকার ‘Armed Forces Special Power Act’ পাশ করে দুর্গটিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। পরবর্তীকালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এই দুর্গ ফিরিয়ে দিতে উদ্যত হন। ২০০৪ সালে AFSPA তুলে দেওয়ার দাবিতে পুনরায় অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়। কিন্তু মণিপুরের আদিবাসীদের বর্তমান দাবি হলো এ রাজ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে যেন শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে।[২১] সুতরাং দেখা যায় যে, বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি আঞ্চলিকতা প্রসারে সাহায্য করেছে।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও আঞ্চলিকতা:-ভারতে আধুনিক প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাও আঞ্চলিকতাবাদের বিস্তারে সাহায্য করেছে। বহু অঙ্গরাজ্য আঞ্চলিক ভাষায় কোন বিশেষ অঞ্চলের ইতিহাস ও সাহিত্য-সংস্কৃতির পঠনের উপর গুরুত্ব দেয়। শিক্ষাব্যবস্থায় আঞ্চলিকীকরণের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা আঞ্চলিক স্বার্থের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বহু রাজ্যের পাঠ্যপুস্তকে আঞ্চলিক জন নেতাদের বড় করে দেখানো হয়। ফলত পাঠ্যপুস্তকগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক ধরণের সংকীর্ণ আঞ্চলিক মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। শিশু মনে যে আঞ্চলিকতার বীজ বপন করা হয়, বড় হয়ে তা জন্ম দেয় ‘Sons of the soil’- এর মনোভাব।[২২]

ভারতবর্ষের যে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলি রয়েছে তারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় আঞ্চলিক আন্দোলনগুলিকে গুরুত্ব দিয়েছে। ফলত জাতীয় স্বার্থ ও ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়েছে। আবার, অনেক সময় দেখা গেছে এই আঞ্চলিক দলগুলি জাতীয় স্বার্থ ও উন্নয়নকে অবহেলা করে দেশের ঐক্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এমনকি আঞ্চলিকতাবোধ অনেক সময় উগ্র আকার ধারণ করে ভারতের জাতীয় ঐক্যকে বিপন্ন করে তুলেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আঞ্চলিকতাবোধ বিচ্ছিন্নতাবাদ এর আকার নিয়ে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে।[২৩]

মূল্যায়ন:- উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের প্রসারের ফলে যে সমস্যা বর্তমান দিনে দেখা দিয়েছে, তার সমাধান এত দ্রুত করা সম্ভব নয়। তবে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' রক্ষা করার যে চেষ্টা ভারতবর্ষে করা হয়েছে, সেখানে আঞ্চলিক মনোভাব গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক। ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চলে অধিবাসীদের যখন উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়, শোষণ ও বঞ্চনার শিকার যখন তারা হয় এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষায় সরকার যখন ব্যর্থ হয় তখনই আঞ্চলিকতার প্রসার ঘটে। সুতরাং এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে যদি চিরকাল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে দেওয়া হয় তাহলে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটবে না। তথাপি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন না করে তাদের প্রতি সহযোগীতামূলক এক মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে। এরই পাশাপাশি আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করে ভূমিপুত্রদের কর্মে নিয়োগ এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন তা হল স্থানীয় উপসংস্কৃতির আনুগত্যের উপরে ভারতীয় সত্তাকে স্থান দিতে হবে। সেক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্যের দূরীকরণ ঘটিয়ে উন্নয়নের মাত্রা সুনিশ্চিতকরণ করার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া, সরকার যদি এই আদিবাসীদের ন্যায্য দাবি পূরণের মাধ্যমে তাদের আন্দোলনের পথ থেকে সরিয়ে আনতে পারে তাহলে সমস্যার সমাধান কিছুটা হলেও করা যেতে পারে। এছাড়া, অঙ্গরাজ্যগুলির শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যক্রমে আঞ্চলিক স্বার্থের পরিবর্তে জাতীয় স্বার্থ ও মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়া, আন্দোলনকারীদের দাবিদাওয়াকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে বিচার বিবেচনা করতে হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে অঞ্চলের আয়তন, উন্নয়নের মাত্রা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ইত্যাদি বজায় রেখে সরকার যদি রাজ্য পুনর্গঠন এর কর্মসূচি নেয় তাহলে আঞ্চলিক মানসিকতার প্রাদুর্ভাব দূরীভূত হবে। সুতরাং আমার গবেষণামূলক প্রবন্ধের সার্থকতা তখনই লাভ করবে যখন সমাজের বুদ্ধিজীবী, প্রশাসন ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষ উদ্যোগ নেবে যে, অঞ্চলের উন্নতির স্বার্থে আঞ্চলিকতা যেন বিচ্ছিন্নতাবাদে পরিণত না হয়। আর তা নাহলে আঞ্চলিকতাবাদ ভারতের জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের পথে এক বিপদজ্জনক দিক বলে চিহ্নিত হবে।

তথ্যসূত্র:-

১. মহাপাত্র, অনাদিকুমার, ভারতীয় রাজনীতিক কাঠামো ও প্রক্রিয়া, বি.বি.কুন্ডু, গ্র্যান্ডসন্স, নবম সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০২২, পৃ. ২৮৩

২. মহাপাত্র, অনাদিকুমার, ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, সুহৃদ পাবলিকেশন, সপ্তম সংস্করণ, কলকাতা, মার্চ, ২০০৯, পৃ. ৫৪১

৩. মহাপাত্র, অনাদিকুমার, ভারতীয় রাজনীতিক কাঠামো ও প্রক্রিয়া, বি.বি.কুন্ডু, গ্র্যান্ডসন্স, নবম সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০২২, পৃ. ২৮৪

৪. মহাপাত্র, অনাদিকুমার, ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, সুহৃদ পাবলিকেশন, সপ্তম সংস্করণ, কলকাতা, মার্চ, ২০০৯, পৃ. ৫৪৩
৫. নাগ, গৌরীশংকর, সরকার, অশোক, চক্রবর্তী, হিমাচল, ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, দে বুক কনসার্ন, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, আগস্ট, ২০১০, পৃ. ৩৪৫
৬. মহাপাত্র, অনাদিকুমার, ভারতীয় রাজনীতিক কাঠামো ও প্রক্রিয়া, বি.বি.কুন্ডু, গ্র্যান্ডসন্স, নবম সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০২২,পৃ. ২৮৪
৭. দালাল, প্রণবকুমার, ভারতীয় সংবিধান ও রাজনীতি, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, জানুয়ারি. ২০২০, পৃ. ৩৯৯
৮. পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ৩৯৯
৯. কর্মকার, শ্যামলচন্দ্র, ভারতের সংবিধান ও রাজনীতি, দে বুক কনসার্ন, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, মার্চ, ২০১২, পৃ. ২৩৫
১০. ঘোষ, অরুণাভ, ভারতীয় রাজনীতির বিতর্কিত বিষয়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি, ২০১০, পৃ. ৯০
১১. ব্যানার্জী, ড. মলয়, ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রতিক প্রবণতা, বিজয়া পাবলিশিং হাউস, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, জুলাই, ২০০৯, পৃ. ১৬২-১৬৩
১২. কর্মকার, শ্যামলচন্দ্র, ভারতের সংবিধান ও রাজনীতি, দে বুক কনসার্ন, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, মার্চ, ২০১২, পৃ.২৩৫
১৩. দালাল, প্রণবকুমার, ভারতীয় সংবিধান ও রাজনীতি, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, জানুয়ারি. ২০২০, পৃ. ৩৯৮-৩৯৯
১৪. প্রামাণিক, নিমাই, ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির রূপরেখা, ছায়া প্রকাশনী, দশম সংস্করণ, কলকাতা, এপ্রিল, ২০১০ পৃ. ৭২১
১৫. প্রামাণিক, অতসী, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলী, ছায়া প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০২,পৃ.৬৫
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলানাথ, মুখোপাধ্যায়, অমলকুমার, ভারত ও বিশ্ব: সমাজ, রাজনীতি ও রাজনৈতিক সংগঠন, শ্রীধর পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, এপ্রিল, ২০১৮, পৃ. ২০৬
১৭. Ahuja, Ram, society in India, Rawat publications, 2nd edition, Jaipur, 2011, p. 283-284.
১৮. ঘোষ, বিপত্তারণ, রায়, সুধীর, ভারতের সংবিধান এবং এর ক্রমবিবর্তন, প্রগতিশীল প্রকাশক, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা -৯, জানুয়ারি, ২০১১, পৃ. ৩৭৭
১৯. ঘোষ, অরুণাভ, ভারতীয় রাজনীতির বিতর্কিত বিষয়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি, ২০১০, পৃ.৮৫- ৮৬

২০. পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ৮৭- ৮৮

২১. ব্যানার্জী, ড. মলয়, ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রতিক প্রবণতা, বিজয়া পাবলিশিং হাউস, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, জুলাই, ২০০৯, পৃ. ১৫১

২২. পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ১৫৭

২৩. মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রাণী, মুখোপাধ্যায়, শক্তি, ভারতের সংবিধান ও শাসনব্যবস্থা, দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, এপ্রিল, ২০০৬, পৃ. ৩০৪

তারাশঙ্কর : দেশ-কাল ও ধাত্রীদেবতা উপন্যাস

সদানন্দ বেরা
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মালদা উইমেন্স কলেজ, মালদা

সারসংক্ষেপ: তারাশঙ্করের জন্মপল্লী লাভপুর ছিল জমিদার প্রধান গ্রাম। তারাশঙ্করের পিতৃবংশ এই জমিদারির একটি শরীক ছিল। নিজবংশের ক্ষয়ধরা সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্য তিনি নিজের চোখে দেখেছেন এবং সাহিত্যিক হিসাবে পদে পদে তা স্বীকার করে নিয়েছেন। অপরদিকে তাঁর সাহিত্য জীবনে প্রভাব ফেলেছিল পিতৃপুরুষের কাহিনিকথা। ছোটবেলা থেকে পিতাকে হারানোর পর তিনি মা-পিসীমার কোলে মানুষ হয়েছিলেন। মা-পিসীমার দ্বন্দ্বের মাঝখানে প্রত্যক্ষ রাজনীতির উত্তাপ লেগেছিল তাঁর চিন্তা ও চেতনায়। দেশকালের এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসটি লেখা। এই উপন্যাসে লেখক শিবনাথকে শৈশব-কৈশোর থেকে পরিণতমনস্ক করে গড়ে তুলেছেন নিজের আত্মকথার মধ্যদিয়ে।
সূচকশব্দ: পারিবারিক জীবন, দেশপ্রেম, সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়, উদীয়মান ধনতন্ত্র, সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন, অহিংস কংগ্রেসী আন্দোলন, গণ-আন্দোলন, সমাজতন্ত্র।

কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখব তাঁর জন্মভূমি বীরভূমের লাভপুর একসময় ছিল জঙ্গলাকীর্ণ অনার্য আদিম সভ্যতার বাস। পরবর্তীকালে আর্য-সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে ঐ অঞ্চলে। তারই উত্তরাধিকার বহন করে আসছে সেই অঞ্চলের উপেক্ষিত জনসমাজ। এদের মধ্যে হাড়ি, ডোম, বাগদী, বাউরী, পোটোরাই প্রধান। অসংখ্য উপজাতির মধ্যে আছে ভল্লা, কাহার, রাজবংশী, জেলে, সাঁওতাল, সাপুড়ে-মাঝি প্রভৃতি। এরাই তারাশঙ্কর গল্পে-উপন্যাসে স্থান অধিকার করে আছে। এদের জীবনের অকৃত্রিম রূপ-রেখা তারাশঙ্করকে নগরজীবনের কবি-সাহিত্যিকদের থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে বহুকাল। তারাশঙ্কর তাঁর শৈশবকাল থেকে দেখে এসেছেন এই দুই বংশের প্রতিদ্বন্দ্বী চেহারা। তিনি অনুভব করেছিলেন নিজবংশের ক্ষয়ধরা সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের সঙ্গে নতুন গড়ে ওঠা ধনতান্ত্রিক বংশের রজত কৌলীন্যের দ্বন্দ্ব। কালের বিধানে তিনি বংশ কৌলীন্যের পরাজয়কে পদে পদে স্বীকার করে নিয়েছেন।[১]

অপরদিকে তাঁর সাহিত্য জীবনে অপরিসীম প্রভাব ফেলেছিল পিতৃপুরুষের কাহিনিকথা। অতিশৈশবে পিতাকে হারানোর পর সাহিত্যিক তারাশঙ্কর স্বামী সন্তানহারা পিসীমার কোলে মানুষ হয়েছেন। পিসীমা তাঁকে জমিদারি আভিজাত্যের মধ্যে বড় করে তুলতে চান। কিন্ত মা তাঁকে 'আকাশলোকে' বেড়ে চলার মন্ত্র দেন। স্বদেশমন্ত্রে

তারাশঙ্কর প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে। পরবর্তীতে দেখি 'প্রত্যক্ষ রাজনীতির প্রখর উত্তাপ' লেগেছিল তাঁর মানসলোকে। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশীয় মানুষের স্বার্থপরতা তাঁর বিবেকী মনকে আঘাত দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল অন্যপথে,-

> " সত্যাগ্রহ আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়ে জেল খাটতেই তারাশঙ্কর বুঝে গিয়েছিলেন রাজনীতি তাঁর পথ নয়, এবার থেকে সাহিত্য হবে তাঁর সাধনা। জেলের মধ্যেও কংগ্রেস নেতা কর্মীদের গ্রুপবাজিতে তিনি বিরক্ত এবং বিবিক্ত হয়ে পড়েন।"[২.]

এইভাবে পারিবারিক ও রাজনৈতিক সত্যাসত্য তাঁর জীবনকে সাহিত্য সাধনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। সেই সঙ্গে তারাশঙ্কর আ-শৈশব দেখে এসেছেন তাঁর জন্মভূমি লাভপুরকে। সেখানকার অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য নিম্নবর্গের মানুষদের তিনি ভালোবেসেছেন। তাদের দৈনন্দিন জীবনের বহুল ঘটনার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। এদের জীবনাচরণ কত নির্ভেজাল ভাবে সত্যি হতে পারে তাই নিয়ে তিনি বাংলা গল্প-উপন্যাসে বিচিত্র কাহিনিকথা বয়ন করেছেন।

> " নিজে অভিজাত বর্গের সন্তান হয়েও তারাশঙ্কর সহানুভূতি ও করুণায় ওই ব্রাত্য, ওই মন্ত্রহীন নিপীড়িত মানুষদেরই জীবনের শরিক হতে চেয়েছেন। কর্মে ও কথায় ওই মাটির সন্তানদের সঙ্গেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তাঁর আত্মার আত্মীয়তা।"[৩.]

অপরদিকে প্রথম সমরোত্তর বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা মানুষকে ক্রমশ পরিবর্তনমুখী করে তুলছিল। কৃষিভিত্তিক গামীণ সমাজ ক্রমশ নগরমুখী হচ্ছে। কারণ একান্নবর্তী পরিবারগুলিতে অন্নবস্ত্রের টান পড়তে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে ভূ-সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে পরিবারের ভাঙনদশা গ্রামীণ মানুষকে চাকুরি অনুসন্ধিৎসু করে তুলছিল। চাকুরির সন্ধানে যারা একবার কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন তাঁদের বেশিরভাগ মানুষ আর স্থায়ীভাবে গ্রামে ফিরে যাননি। কারণ, "পশ্চিমবঙ্গে শরতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, পল্লীসমাজের নিরুদ্যম অকর্মণ্যতা এবং জমির ভাগা-ভাগির ফলে দেশে যাওয়ার আবশ্যকতা দিনে দিনে কমিয়া আসিতে লাগিল। সুতরাং যাহার কিছুমাত্র উপায় ছিল সে শহরে মুখ্যত কলিকাতায় বারোমাস বাসিন্দা হইল।"[৪.]

অপরদিকে নতুন নতুন গড়ে ওঠা কলকারখানাকে কেন্দ্র করে নগর কলকাতায় ক্রমশ গ্রামীণ মানুষের ভীড় দিকে দিকে বাড়তে থাকে। এইসময়ে একদল তরুণ লেখক 'কল্লোল', 'কালিকলম' ও 'প্রগতি' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সমাজজীবনের এই বাস্তব সমস্যাকে সাহিত্যে তুলে ধরার তাগিদ অনুভব করলেন। এঁদের শৈশব কেটেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিতে, আর যৌবনের প্রথম দিনগুলো ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিল যুদ্ধের ভয়াবহতায়। যে কারণে জীবনের কোথাও কোনো আলো, আশা-আশ্বাস এঁদেরকে সেদিন পথের সন্ধান দেয়নি। তাই তাঁরা প্রচলিত সামাজিক অর্থনৈতিক ও

সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। মানুষের সমগ্র দিকের উপর তাঁদের সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর কবিতার ভাষায় বলেন-

" মানুষের মানে চাই
গোটা মানুষের মানে।
রক্ত-মাংস হাড়-মেদ মজ্জা।
ক্ষুধা তৃষ্ণা লোভ কাম হিংসা সমেত
গোটা মানুষের মানে চাই।"[৫.]

জগৎ-জীবনের প্রত্যেকটি দিককে তাঁরা যাচাই করে সাহিত্যে মূল্য দিতে শুরু করলেন। এই বিদ্রোহের মূলে ছিল প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে অস্বীকার করার তাগিদ। বিশেষত 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তরুণ সাহিত্যিকরা মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তের সংশয়, হতাশা এবং অবক্ষয়কে স্থান দিলেন সাহিত্যের পাতায়। বস্তিবাসী জীবনের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জৈববৃত্তির কথা উঠে এল এঁদের আলোচনায়। এই সময় তারাশঙ্করের লেখা ফেরত এসেছিল এই সময়ের অভিজাত পত্রিকা 'প্রবাসী' থেকে। বিনা বিচারে লেখা ফেরত আসায় তারাশঙ্করকে মানসিক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। তারাশঙ্করের রচনায় নতুন সুর ধ্বনিত হল 'কল্লোল' পত্রিকায়। কিন্তু তারাশঙ্কর 'কল্লোল' গোষ্ঠীভুক্ত লেখক নন। চিন্তায়, চেতনায় মাটি ঘেঁষা মানুষের কথাকার তারাশঙ্কর। কল্লোলের লেখকেরা নাগরিক চেতনা ও শহুরে মন দিয়ে পল্লীগ্রামকে বুঝতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারাশঙ্করের গ্রামীণ চেতনা তাঁর জীবন চেতনারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তিনি স্বীকার করেছিলেন-

" কল্লোল, কালিকলম, এমনিভাবে গুণগ্রাহিতার পরিচয় না
দিলে আমি চলতাম অন্যপথে। রাজনীতির পথে।"[৬.]

মাটিই তাঁকে পথ দেখিয়েছে। মাটির অত্যন্ত কাছাকাছি যারা বাস করে; সেই সব মানুষই তাঁকে তার জীবন পথের নির্দেশ দিয়েছে। যথাযথ কারণেই সাহিত্যের আলোচক রথীন্দ্রনাথ রায় বলেছেনঃ

" যে অঞ্চল তাঁর ধাত্রী, তাকে তিনি রূপ দিয়েছেন নানা ভাষায়, বিচিত্র ভঙ্গিতে।

জনশ্রুতি কিংবদন্তী দিয়ে ঘেরা অস্পষ্ট অতীত থেকে শুরু করে বর্তমানের জীবন ধারা ও ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতগুলি তাঁর রচনায় সমন্বিত হয়ে এক মহাকাব্যোচিত সমগ্রতা লাভ করেছে।"[৭.]

শুধু তাই নয়, পুরাতনের ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে নতুন কালের পদধ্বনি তিনি শুনেছেন। মধ্যযুগীয় জমিদারি প্রথা ক্রমশ ভেঙে পড়ছে, তার উপর নির্মিত হচ্ছে অর্থবান ধনীদের প্রাসাদমঞ্চ। এই পরিবর্তনকে নির্বিকার চিত্তে মেনে নিতে হয়েছে জমিদার পরিবারের সন্তান তারাশঙ্করকে।

'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে তারাশঙ্করের জীবন জিজ্ঞাসা গড়ে উঠেছে বিশ শতকের প্রথম দুই-তিন দশকের বাংলাদেশের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে। এই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে লেখক দেখেছেন পুরোনো জমিদার মধ্যবিত্তে পরিণত হয়েছে। কিন্তু অভ্যস্ত প্রথা ও সংস্কার তার মন থেকে মুছে যায় নি। অন্যদিকে, কলকারখানাকে কেন্দ্র করে নতুন অর্থবান শ্রেণি গড়ে উঠেছে। ফলে তৈরি হচ্ছে নতুন-পুরাতনের দ্বন্দ্ব। অপরদিকে, পরাধীন দেশ স্বাধীন হবে, দেশের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে হাজারো স্বপ্ন গড়ে উঠেছে স্বদেশী মানুষের মনে। দেশ-কালের এইরকম একটি অবস্থার মধ্যে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর মনেপ্রাণে তাঁর মাতৃভূমি লাভপুরকে ভালোবেসেছেন। লাভপুর গ্রামের দর্পণেই যেন তিনি সারা ভারতবর্ষকে দেখেছেন। জীবন সংগ্রামের প্রয়োজনীয় রস ও রসদ তাঁর জন্মভূমি থেকে তিনি অর্জন করেছেন। তাঁর নিজের কথায়-

> " মাটির ভূমির যেমন তৃপ্তি আপন বক্ষের শস্যে, অন্নে, জলে, বাতাসে – অকৃপণ দাক্ষিণ্যে মানুষকে পুষ্ট করায়, তেমনি আরও একটি গভীর তৃপ্তি এই মাটির আছে, সেটি ওই মাটির বুকের সমাজের সংস্কার সংস্কৃতি থেকে সন্তানের মনটিকে পুষ্ট করায় লাভপুরে আমার জীবন কেটেছিল, এক নাগাড়ে বিয়াল্লিশ বৎসর পর্যন্ত। এখানেই এই মনটি পেয়েছিলাম।"[৮.]

'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে শিবনাথের জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে মূলত দুটি ধারা লক্ষ করা যায়। একটি হলো তার পারিবারিক জীবনের ধারা; অপরটি শিবনাথের স্বদেশ ভাবনার ধারা বা স্বদেশপ্রেমের ধারা। শিবনাথের পারিবারিক জীবনকথা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখা যায়, শিবনাথ শৈশবে পিতাকে হারিয়েছে। ফলে এই পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছে স্বামী সন্তান হারা পিসীমা শৈলজা ও মা জ্যোতির্ময়ী। পরিবার জীবনে শিবনাথের শিক্ষা হয়েছে বিচিত্রভাবে। শিবনাথের মা শিবনাথকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' পড়ে শুনিয়েছেন, হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছেন। তাঁর মা তাঁকে দেশে ঘরে ঝগড়া করতে বারণ করে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। 'একগ্রামে বাড়ি, ভাইয়ের মত সকলে।' পক্ষান্তরে পিসীমা বলেছেন,

> " বেশ করেছে। ওদের বাপেরা চিরকাল আমাদের হিংসে করে এসেছে।
> এখনও অপমান করার সুযোগ পেলে ছাড়ে না।"[৯.]

প্রত্যুত্তরে মা জ্যোতির্ময়ী হেসে মৃদুস্বরে বলেন,

" না না ঠাকুরঝি; দেশে ঘরে ঝগড়া করাকি ভাল? তা হলে
জানোয়ার আর মানুষের তফাৎ কি?"[১০.]

এইভাবে দেখা যায় মা শিবুকে যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষা দেন। কিন্তু পিসীমা শিবুকে পিতৃপুরুষের সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের কথা শোনানঃ

" মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের, না খাব উচ্ছিষ্টভাত, না দিব চরণে হাত।"[১১.]

পিসীমার অভিপ্রায় শিবনাথ তার পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিক, জমিদারি দেখাশোনা করুক। স্বয়ং নিজে হাতে ধরে শিবুকে কাছারি ঘরে বসিয়ে দিয়ে তাঁর অভিপ্রায়ের অবসান ঘটাতে চান-

" দুটি কথা মনে রেখো, কারও কাছে মাথা নীচু কর না, আর পিতৃপুরুষের
কীর্তিবৃত্তি লোপ করো না।"[১২.]

অপরদিকে মা জ্যোতির্ময়ী শৈলজা ঠাকরুনকে অনুরোধ করেন-

"আজ থেকে শিবুকে সংসারের মধ্যে টেনে নিয়ে এসো না ভাই, ওকে লেখাপড়া শিখতে দাও।"[১৩.]

শিবনাথ দাম্পত্য জীবনে সুখী নয়। বিয়ে হয়েছে কৈশোরকালে, ছাত্রাবস্থাতেই। শিবনাথের অর্ধাঙ্গিনী গৌরী ধনী ব্যবসায়ী লক্ষপতি পরিবারের কন্যা। বিবাহ বিষয়ে শিবনাথের কিছুমাত্র অনাসক্তি ছিল না, শুধু গৃহশিক্ষক রামরতন বাবুর অমতের জন্য সে প্রথমে আপত্তি করেছিল। নয় বছরের বালিকা গৌরীর সঙ্গে যখন তার বিবাহ হয়, তখন বিবাহের সামাজিক ও ধর্মীয় তাৎপর্য বুঝতে পারার ক্ষমতা তার ছিল না।

গৌরীর নিদারুণ স্বার্থপরতা ও বৈষয়িকতা বারবার শিবনাথের আদর্শময় কর্মজীবনকে আঘাত করেছে। ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধিতে গৌরী এতই খন্ডিত যে উচ্চতর আদর্শের কোন মূল্যই তার কাছে নেই। যে কারণে মহৎপ্রাণ শিবনাথকে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে ফেরার পর ব্যঙ্গ করে কলহপ্রিয়া মুখরা গৌরী বলেছে, 'কত টাকা নিয়ে এলে, দাও আমি আঁচল পেতে বসে আছি।'

শুধু তাই নয়, স্বামীকে সে উৎসাহিত করেছে,- " মামাদের আপিসে তুমি চাকরি কর। এখন যদি ব্যবসা কর মামারা টাকা দেবে। পরে তুমি শোধ দিও।"[১৪.]

কিন্তু শিবনাথের ছিল আভিজাত্য বংশমর্যাদাবোধ এবং শিক্ষা-দীক্ষা। যা তাকে উচ্চতর আদর্শবোধে উদ্দীপ্ত করেছে। যে কারণে স্ত্রীকে সে বলেছে,

" আমার জীবনে অর্থ-উপার্জনই সবচেয়ে বড় জিনিস নয়।
তার চেয়ে বড় কাজ আমি করতে চাই।"[১৫.]

গ্রাম-সমাজ-দেশ ও জাতিকে নিয়ে যে চিন্তার জগতে তার মুক্ত বিহার, গৌরী সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। তাই গৌরী শিবনাথকে ছেড়ে চলে গেছে মামার কাছে। আত্মমর্যাদা সম্পন্ন শিবনাথ এতে ভেঙে পড়ে নি, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লেখক শিবনাথের মনের কথাকে লিপিবদ্ধ করেছেন এইভাবে-

" গৌরী যদি তাহার জীবনে নিজের জীবন দুটি নদীর জলধারার মতো মিশাইয়া দিতে পারিত, এতবড় বিস্তীর্ণ দেশ-মা-ধরিত্রীর প্রসারিত বক্ষ, তাহারই মধ্যে তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে স্তন্যপায়ী শিশুর মতো মায়ের বুক হইতে রস সংগ্রহ করিত।"[১৬.]

এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, শিবনাথ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হতে চায় নি। স্ত্রীকে ভালবাসতে এবং দাম্পত্য দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছে। 'ভিক্ষে করতে হলে আমিই

করে নিয়ে এসে তোমাকে খাওয়াব।' স্ত্রী সন্তানসম্ভবা জেনে গৌরীকে বিপুল শক্তিশালী বলে মনে হয়েছে শিবনাথের। মামার বাড়িতে থেকে গৌরী জানতে পেরেছে দেশ সেবার জন্য তার স্বামীদেবতা কারাবন্দি হয়েছেন। প্রাথমিকভাবে এই সংবাদ গৌরীকে বিমূঢ় করলেও পরবর্তী ক্ষেত্রে এক নতুন গৌরীকে আমরা দেখতে পাই। স্বামীর আদর্শকে সে শ্রদ্ধা করতে এবং ভালবাসতে শুরু করে। সে বুঝেছিল এখানে অর্থ থাকলেও সম্মান নেই। নিজের জেদ ও মিথ্যা অভিমানে যার কাছ থেকে সে দূরে চলে এসেছে সেই স্বামীই তার আশ্রয়। সন্তানের আবির্ভাবে তাদের দু-জনের মধ্যে সম্পর্কের যে সেতু গড়ে উঠেছে তার জোর অনেক বেশি।

শিবনাথের জীবন-পর্বের অপর পর্যায়টি হলো, রাজনৈতিক কর্ম-আন্দোলনের পর্যায়। এই পর্যায়টির সঙ্গে কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের রাজনৈতিক জীবন-দর্শন গভীরভাবে মিশে আছে। সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন এবং অহিংস কংগ্রেসী আন্দোলন – এই দুই ধারাতেই তিনি যুক্ত ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবে, স্বাধীন ভারতবর্ষকে দেখে যাওয়ার স্বপ্ন শিবনাথের মধ্যে শৈশব-কৈশোরেই জন্ম নিয়েছিল। ছোটবেলা মা তাকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' পড়ে শোনান। মাতৃভূমিকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে মানুষকে ভালোবাসার কথা বলেন তিনি-

> " মা বলিলেন, দেশ কি মাটি শিবনাথ? দেশকে খুঁজতে হয় গ্রামের বসতির মধ্যে, শহরের মধ্যে।"[১৭.]

পটোপাড়ার সাদৃশ্যে মা শিবনাথকে দেখান, আগে পটোরা গান করত, পুতুল বেচত, দিন-রাত হাসি-আনন্দে মুখর হয়ে থাকত, কিন্তু বর্তমানে পটোদের কি দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা। মায়ের মুখের কথায় শিবনাথ অবাক হয়ে থাকে। মায়ের এই আদর্শে শিবনাথ স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়। উপন্যাসের কাহিনির মধ্যে দেখা যায়,- কলেরাপীড়িত গ্রামে সেবাকর্মে তার পরিচয় ঘটে কলকাতা থেকে আগত সুশীল ও পুর্ণের সঙ্গে। দেশের পরাধীনতায় এরাও পীড়িত। তাই পরবর্তী ক্ষেত্রে সুশীলের আহ্বানে শিবনাথ কলকাতায় যায় পড়াশুনার জন্য।

কলকাতায় এসে শিবনাথ সুশীল-পূর্ণের কর্মান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। দেশের স্বাধীনতার জন্য এদের কর্মপ্রচেষ্টাকে শিবনাথ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে। দেশপ্রেমের উত্তেজনায় নিজের সোনার চেন,ঘড়ি, বোতাম, আংটি ও অর্থ সুশীলের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু পূর্ণের সঙ্গে সাঁওতাল পরগণার নিবিড় অরণ্যে ঘেরা আশ্রমে যে স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষটার মুখোমুখি হয়েছে তাতে তার জীবন-ভাবনা বহুলাংশে বদলে গেছে। তাঁর মুখে শিবনাথ শুনেছে-

"ব্রাহ্মণ্যধর্মের জন্মভূমি আর্য-সভ্যতার গৌরবময়ী ভারতের বুকে শুধু শূদ্র আর শূদ্র অনার্য আর অনার্য।.............. এই অবস্থা নিয়ে স্বাধীনতা অভিযানে অগ্রসর হওয়ার নাম উন্মত্ততা ছাড়া আর কিছু নয়।"[১৮.]

এই কথা শোনার পর শিবনাথ দেখেছে পূর্ণের রিভলবারের গুলি তাঁর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে ‘ট্রেটার’, অথচ এই মানুষটাই ভবিষ্যত দ্রষ্টার মতো মৃত্যু নিশ্চিত জেনে পূর্বেই একটি চিঠি লিখে রেখে গেছেন – ‘আমার কৃত কর্মের জন্যই জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে। তাই আমি আত্মহত্যা করিতেছি।’ এই ঘটনা শিবনাথের চিন্তায় জগতে নাড়া দিয়েছে।

এরপর শিবনাথের মাতৃবিয়োগ ঘটেছে। দেখি, পরপর দুটি মৃত্যুর ঘটনা তাকে যেন বৃহৎ উপলব্ধির জগতে পৌঁছে দিয়েছে। সমগ্র ধরিত্রীকে সে যেন প্রত্যক্ষ করেছে। সেই সঙ্গে মা জ্যোতির্ময়ীকে নৈশ-প্রকৃতির মতো মর্মসংগীতময়ী রূপে দেখতে চেয়েছে।

সাঁওতাল পরগণা থেকে ফেরায় পথে তার বারবার মাকে মনে পড়ছিল। তার মনে হচ্ছিল ট্রেনের সঙ্গে সমান গতিতে মা যেন ছুটে চলেছেন। শিবনাথের উপলব্ধিতে মা ও মাটি একাকার হয়ে গেছে। দেশ ও মা এই দুই তার জীবন সাধনার অঙ্গ ছিল। মায়ের মৃত্যুর পর তাই সে আর কলকাতায় ফিরে যায় নি। গ্রামে দরিদ্র প্রজাদের সেবা করতে চেয়েছে। খরা, অনাবৃষ্টিতে রিক্ত, নিঃস্ব গ্রামের মানুষদের কথা ভেবে পুকুরের পাড়কেটে জমিতে জল দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। এতে অনেক টাকার মাছ নষ্ট করতে সে দ্বিধা করেনি; শুধু তাই নয়, প্রজাদের খাজনা মুকুব করার চেষ্টাও করেছে। আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মেঘের উদয় দেখে উল্লসিত হয়েছে শিবনাথ। ভেবেছে-

> “ আঃ! দেশ বাঁচিবে; চৌচির মাটি আবার শান্ত-স্নিগ্ধ অখণ্ড হইয়া উঠিবে। সেই কোমল স্নিগ্ধ মাটির বুকে মানুষ আবার বুক দিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবে স্তন্যপায়ী শিশুর মত।
>
> আবার মা হইবেন সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা।”[১৯.]

গ্রামের রিক্ত দৈন্য রূপের মধ্যে শিবনাথ স্বদেশের হাহাকার শুনেছে, তৃষ্ণার্ত মাটি কথা বলেছে-

> “ মনে হল, মাটি যেন কথা কইছে, জল শুকিয়ে মাঠের জমি ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে, মানুষ যেমন তেষ্টায় হা-হা করে, মাঠের মাটির মধ্যে তেমনই শব্দ অবিরাম উঠেছে।”[২০.]

মৃত্তিকার আবরণের নীচে শিবনাথ অনুভব করেছে জাগ্রত ধরিত্রী দেবতাকে। চিন্ময়ী মা তার কাছে মৃন্ময়ী মায়ের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছেন পরিবার জীবনে শিবনাথ মা মৃন্ময়ীকে হারানোর পর, পিসীমাকে কাশী চলে যেতে দেখার পর এবং সন্তানসম্ভবা গৌরী তাকে ছেড়ে মামার বাড়িতে চলে যাওয়ায় শিবনাথ নতুন কর্মক্ষেত্র হিসাবে ময়ূরাক্ষীর চরভূমিকে বেছে নেয়। এখানে সে কৃষিকাজ শুরু করেছে, নাইট স্কুল ও ডাক্তারখানা চালু করেছে, চরকা ও তাঁত প্রবর্তন করেছে। তাঁতিদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে বলেছে, ‘রাশি রাশি কাপড় চাই’, উপন্যাসের এই অংশে খুব স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লব এবং অহিংস সংগ্রামের

মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শিবনাথের মনের মধ্যে কিছু সময় পর্যন্ত ছিল তার অবসান হয়েছে। সুশীলকে সে বলেছে, 'অহিংসায় আমি বিশ্বাস করি, গণ-আন্দোলন আমি প্রত্যাশা করি, বিশ্বাস করি আমি মানুষকে।' আরো তাকে বলতে শোনা যায়, অহিংস অসহযোগে 'শুধু মরতে হয়, মারতে হয় না।' গ্রামের সাধারণ মানুষকে সে বুঝিয়েছে-

'বিলাতী কাপড়, বিলিতী জিনিস পরো না, মদ খেয়োনা, সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করো না।' মাটির ভিতর যে মাকে শিবনাথ প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিল তা সে দেখতে পেয়েছে, কিন্তু যে মূর্তিতে দেখতে চেয়েছিল, এ মূর্তি সে মূর্তি নয়। মায়ের এ মূর্তি যেন সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আবদ্ধ মাতৃমূর্তি। মা যেন খণ্ডিত হয়েছেন। সমস্যাপূর্ণ পরিবারের এককোণে নিশ্চিন্ত জীবন কাটাচ্ছেন এই মা। তাই মনে হয়েছে-

" সাতকোটি সন্তানেরে হে বঙ্গ জননী,
রেখেছো বাঙালী করে মানুষ করনি।"[২১.]

এক বিরাট মহিমায় দেশমাতৃকাকে দেখতে শিখেছিল শিবনাথ তার মা জ্যোতির্ময়ীর কাছে। তাই শিবনাথ সুশীলকে বলেছে, 'তেত্রিশ কোটি লোকের স্বাধীনতার জন্যে ছেষট্টি কোটি হাত উদ্যত করবার সাধনা আমার সুশীলদা – গণ বিপ্লব।' রাজনীতি শিবনাথের স্বদেশচেতনাকে স্পষ্ট করতে সাহায্য করেছে। তাই দেখা গেছে, যে সহিংস পথে তার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল সেই পথকে চরম বলে শিবনাথের মনে হলেও পরম বলে ভাবতে পারেনি। যে কারণে অহিংস গান্ধীবাদী আদর্শে শিবনাথের রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। উপন্যাসটির পরিণতি অংশে দেখা গেছে শিবনাথ শুধু দেশের স্বাধীনতা চেয়েছে বৃহত্তর কল্যাণের সোপান রূপে। যে কারণে ময়ূরাক্ষীর কৃষিক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবন ছেড়ে শিবনাথ বৃহৎ গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সামিল হয়ে জেলখানায় কারাবরণ করেছে।

এই সংবাদ শুনে পিসীমা কাশী থেকে ফিরেছেন। এসে দেখছেন চারিদিক থেকে যখন উদ্যোগ চলছে ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলে শিবনাথকে জেল থেকে খালাস করার কথা, তখন পিসীমা তাঁর জমিদারি আভিজাত্য নিয়ে বলে বসেন-

" আগে শিবু দেশ দেশ করত, বুঝতাম না, কিন্তু কাশীতে থেকে বুঝে এলাম, এ কত বড় মহৎ কাজ। এর জন্য ঘাট মানতে বলতে তো আমি পারব না বাবা।"[২২.]

শুধু তাই নয় অনেক কালের অভিমান ও অদর্শনের পর শিবনাথের জন্য ক্রন্দনরতা স্ত্রী গৌরীকে তিনি বলেছেন, 'কাঁদছ কেন? শিবু তো আমার ছোট কাজ করে জেলে যায় নি। বরং ভগবানের কাছে তার মঙ্গল কামনা কর। দু-বছর,দশবছর – এই জীবনেই যেন জয় নিয়ে ফিরে আসে।' এ আমরা কোন পিসীমাকে দেখছি? এই পিসীমা তাঁর জমিদারি দর্প ও অহংকার থেকে নেমে এসে অনেকটা উদারচেতা এবং স্বদেশপ্রেমিক জমিদার রমণীতে পরিণত হয়েছেন। আর গৌরী, সে তার অশিক্ষা এবং আদর্শহীন জীবন যাপন থেকে শিখেছে মহৎপ্রাণ স্বামীকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতে। তাই

কোলে শিশু সন্তানকে নিয়ে পিসীমার সঙ্গে গেছে জেলে বন্দি স্বামী শিবনাথের সঙ্গে দেখা করতে। স্ত্রীর কোলে শিশুপুত্রকে দেখে শিবনাথ পিসীমাকে অনুরোধ করে বলেছে, 'শিবনাথ তাহার শিবুকে হাত দিয়া আদর করিয়া বলিল, তুমি ওকে যেন আমার মত করেই মানুষ করো পিসীমা।' পিসীমাকে শিবনাথ এই মহৎ দায়িত্ব দেওয়ার পর বলেছে,-

> " এখান থেকেই প্রণাম করছি পিসীমা। মনে মনে সে বলল, সমস্ত জীবের ধাত্রী যিনি ধরিত্রী; জাতির মধ্যে তিনিতো দেশ। মানুষের কাছে তিনি বাস্তু; সেই বাস্তুর মূর্তিমতী দেবতা তুমি, তোমাকে যে সে বাস্তুর বংশের কল্যাণ করতেই হবে। এইতো তোমার ধর্ম। তুমিইতো আমায় বাস্তুকে চিনিয়েছ, তাতেই চিনেছি দেশকে। আশীর্বাদ কর, ধরিত্রীকে চিনে যেন তোমায় চেনা শেষ করতে পারি।"[২৩.]

পিসীমা শেষ পর্যন্ত শিবনাথের জীবনে আদর্শ দেশমাতাতে পরিণত হয়েছেন। শিশুপুত্রকে লক্ষ্য করে, পিসীমার উদ্দেশ্যে, শিবনাথের কথায় দেখা যায়-

> " অনাদিকালের ধরিত্রী জননীর বুকে শিশু-সৃষ্টি ধীরে ধীরে লালিত হইয়া বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহারই হাতে সবকিছু সঁপিয়া নিশ্চিত নির্ভরতায় মানুষ অখণ্ডকাল অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, মানুষের হাতে ভার দিয়ে রাখিয়া যাওয়ার সকল মিথ্যার মধ্যে ওই রাখিয়া যাওয়াই তো আসল সত্য।"[২৪.]

যে ভাবে পিতা কৃষ্ণদাসবাবু কিশোরপুত্র শিবনাথকে রেখে গিয়েছিলেন পিসীমা শৈলজার হাতে, সেই একই ভাবে শিবনাথ চায় তার শিশুপুত্রও পিসীমার কোলে পিতার মত বড় হবে এবং পিতার অসম্পূর্ণ কর্ম পরিপূর্ণ করে তুলবে। সেদিক থেকে প্রত্যক্ষভাবে পিসীমা এই উপন্যাসের 'ধাত্রীদেবতা'। তবে পরোক্ষভাবে মা জ্যোতির্ময়ীও ধাত্রীদেবতার দাবিদার।

শিবনাথের জীবনে এক ধাত্রী জননী জ্যোতির্ময়ী তাকে দিয়েছিলেন মাটি ও মানুষকে চেনার উদার দৃষ্টি, আর এক ধাত্রী পালনকর্ত্রী পিসিমা শৈলজা তাকে চিনিয়েছিলেন বাস্তু তথা মৃত্তিকার অধিকারবোধ। এই দুই প্রেরণা থেকে শিবনাথ চিনেছিল তার স্বদেশকে তথা দেশমাতাকে। এই দেশমাতাই প্রকৃত অর্থে ধাত্রীদেবতা।

গ্রন্থসূত্র

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার কালের কথা, তারাশঙ্কর – রচনাবলী, – দশমখন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দশমমুদ্রণ, ১৪১৯, পৃঃ ৩৫০-৩৫৫, দ্রষ্টব্য।

২। পল্লব সেনগুপ্ত ও অন্যান্য সম্পাদিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, কলিকাতা, মার্চ ১৯৯৯, পৃঃ১৭৩
৩। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ' প্রথমখন্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ষষ্ঠমুদ্রণ ২০০০, পৃঃ ২৯-৩০।
৪। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পঞ্চমখন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলকাতা, পৃঃ ২৭১।
৫। প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪, পৃঃ ৩১।
৬। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার সাহিত্য জীবন, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ – ১৩৬০, পৃঃ ৩৩।
৭। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত তারাশঙ্কর অন্বেষা, গ্রন্থে রথীন্দ্রনাথ রায় রচিত 'গল্পকার তারাশঙ্কর' প্রবন্ধ। রমাপ্রকাশনী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃঃ ১৮৫।
৮। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত তারাশঙ্কর অন্বেষা, গ্রন্থের উদ্ধৃত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় – আমার কথা, শনি বারের চিঠি, তারাশঙ্কর সংখ্যা, রমা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ ১১৪
৯। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাত্রীদেবতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ঊনবিংশ মুদ্রণ – আশ্বিন, ১৪০৮। পৃঃ ১০
১০। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাত্রীদেবতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০
১১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাত্রীদেবতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩
১২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাত্রীদেবতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫
১৩। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাত্রীদেবতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৬
১৪। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাত্রীদেবতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৩
১৫। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাত্রীদেবতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৪
১৬। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাত্রীদেবতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯১
১৭। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাত্রীদেবতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৩
১৮। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাত্রীদেবতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৬
১৯। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাত্রীদেবতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৩
২০। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাত্রীদেবতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৭
২১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাত্রীদেবতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০২ উদ্ধৃত।
২২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাত্রীদেবতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২২
২৩। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাত্রীদেবতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৪
২৪। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাত্রীদেবতা, তদেব, পৃঃ ২২৪

সমাজ শিক্ষায় বিবেকানন্দ : দেশাত্মবোধের প্রেক্ষিতে

তারক নাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, হরিণঘাটা মহাবিদ্যালয়, নদীয়া

বিষয় সংক্ষেপ (Abstract) : স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন তেজস্বী, স্বাধীনচেতা, বিজ্ঞানমনস্ক, সত্যানুসন্ধানী, অনুসন্ধিৎসু ও ব্যক্তিত্ববান যুগন্ধর মহাপুরুষ। বাঙালি হয়ে বাংলার প্রেক্ষাপটে না ভেবে সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষকে আত্মশক্তিতে জাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। সন্ন্যাসী হয়ে সমাজ শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি। সন্ন্যাসী অর্থে ত্যাগী ও সংসারের মায়া কাটানোর পরিবর্তে দেশোদ্ধারের ভূমিকা পালন, জাতির নিজ নিজ সংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়া, দেশের তরুণ সমাজকে প্রকৃত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে উপযুক্ত হয়ে ওঠা, নারী শিক্ষার প্রতি সদর্থক মনোভাব, ভীরুতা-দুর্বলতার বদলে মানুষের আত্মশক্তিতে জাগরণ, মানসিক স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের সংস্কার দূরে ঠেলে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠা ইত্যাদি ভাবধারার আদর্শ মানুষের মধ্যে প্রবাহিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। কর্মে, বক্তব্যে ও লিখিত নিদর্শনে কেমন করে তিনি একজন আদর্শ সমাজ শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছিলেন তা এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে তুলে ধরা হবে।

সূচক শব্দ (Key words) : সামাজিক, দেশাত্মবোধ, আত্মশক্তি, প্রেক্ষাপট।

মূল প্রবন্ধ :

বিবেকানন্দ একদিকে সন্ন্যাসী, ধর্মপ্রাণ মানুষ, অন্যদিকে স্বদেশপ্রেমী, বাস্তববাদী ও যুক্তিবাদী পুরুষ। তিনি ছিলেন জনজাগরণের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর চিন্তা-চেতনা, জ্ঞানযোগ-কর্মযোগ নতুন পথের সন্ধান দেয়, সাহিত্যের ভাষা নতুন যুগের পথ রচনা করে এবং তাঁর বাণী মানুষকে উজ্জীবিত করে। একাধারে তিনি মানবতাবাদের মূর্ত প্রতীক, জনজাগরণের নব্য পথপ্রদর্শক ও বিশ্বপ্রেমিক। দেশ ও দশের সার্বিক উন্নতির জন্য তিনি সদা চিন্তিত থাকতেন। সামাজিক শিক্ষায় বিবেকানন্দের অবদান নির্ণয় করতে গেলে ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-চেতনাকে উপলব্ধি করতে হবে, সাহিত্যের মাধ্যমে যে বাণী প্রচার করেছেন তা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং পরিব্রাজক রূপে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভ্রমণকালে যে সব বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তা নিগুঢ় বিশ্লেষণ করে অগ্রসর হতে হবে।

বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন কিন্তু সন্ন্যাসী সম্পর্কে আমরা যা বুঝে থাকি তিনি তা ছিলেন না। গৈরিক বসন পরিহিত হয়ে ঈশ্বরের আরাধনায় নিমগ্ন থাকলেও অন্তরঙ্গে তিনি ছিলেন বাস্তববাদী মানুষ। ঈশ্বরকে পাবার জন্য যত না সাধনা করেছেন, সাধারণ অবহেলিত মানুষের মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন অনেক বেশী। তাঁর ঈশ্বর সন্ধান

শেষ পর্যন্ত সমাজসত্যের সন্ধান ও মানব কল্যাণে রূপান্তরিত হয়েছিল। এজন্যই তিনি বলেছিলেন, 'I am a socialist'. বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হলেও নিজ মুক্তির বদলে জনসাধারণের সামাজিক উন্নতি নিয়ে ভাবতেন। তাই নির্জন মন্দিরে বা গিরিগুহায় গিয়ে ঈশ্বরের সাধনা না করে বিশ্বের সাধারণ মানুষের শিক্ষার মাধ্যমে মুক্তির পথ অনুসন্ধানকেই শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। বিবেকানন্দের সন্ন্যাসধর্ম ধর্মাচার পালনের উদ্দেশ্যে নয়, তীর্থস্থান ভ্রমণে, পূণ্যার্জনের লক্ষ্যে নয়, শুধুমাত্র হিন্দুধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নয়, সমগ্র ভারতবর্ষকে জানবার জন্য — ভারতবর্ষের গৌরব ও ঐতিহ্যের দিকগুলি তুলে ধরে এবং দুর্বলতার দিকগুলি অন্বেষণ করে নব্যমানবতাবাদের পথ অনুসন্ধানই তাঁর লক্ষ্য ছিল। হিন্দু সন্ন্যাসীর পোষাক পরলেও সর্বধর্মের প্রতিই তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। সাধু সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণা হল তাঁরা ত্যাগী, ধার্মিক ও সংসার বিমুখ হবেন। বিবেকানন্দ প্রথাগতভাবে সংসারী না হলেও বিশ্বসংসারে মানুষের সামাজিক কল্যাণ ও শান্তির জন্য যে বার্তা রেখে গেছেন তাতে তাঁর সংসার প্রেমী গুণেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তিনি বলেছেন, একজন সংসারী ব্যক্তির পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করে যাওয়াটাই হল তার কাছে বড় ধর্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন তেজস্বী, স্বাধীনচেতা, বিজ্ঞানমনস্ক, সত্যানুসন্ধানী, অনুসন্ধিৎসু ও ব্যক্তিত্ববান জ্যোতিষ্ক। তরুণদের সাহস, শক্তি ও বীরত্বকে তিনি খুবই পছন্দ করতেন। তাদের কর্মঠ ও জ্ঞানান্বেষণে ব্রতী হবার উপদেশ তিনি বারংবার দিতেন। মনে করতেন ভারতীয় যুব সমাজ যদি ভারতের ইতিহাস সঠিকভাবে না জানতে পারে তাহলে আত্মশক্তিতে জাগ্রত হতে পারবে না। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ভারতের যথার্থ ইতিহাস রচিত হয়নি বলে আক্ষেপ করেছিলেন, তেমনি বিবেকানন্দও মনে করতেন ভারতের বিজয় গাথা ও বীরত্বের ইতিহাস রচিত না হলে লোকসাধারণের উন্নতি সম্ভব নয়। ভারতের ইতিহাস রচনায় বিদেশীদের যে অবদান আছে তাতে ভারতবাসীর বীরত্ব ও মহত্বের কথা সেভাবে উল্লিখিত হয়নি। দেশীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি-পরম্পরা নিয়ে ভারতীয়রা যখন নিজ দেশের ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করবে তখনই প্রকৃত ইতিহাস রচিত হবে। তিনি বলেছেন, "ইংরেজরা আমাদের দেশের যে ইতিহাস লিখেছে, তাতে আমাদের মনে দুর্বলতা না এসে যায় না; কেননা তারা শুধু আমাদের অবনতির কথাই বলে। সেসব বিদেশীরা আমাদের রীতিনীতির, আমাদের ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে অতি অল্পই পরিচিত, তারা কেমন করে বিশ্বাস্য ও নিরপেক্ষভাবে ভারতের ইতিহাস লিখবে ? কাজেই স্বভাবতই বহু ভ্রান্ত ধারণা ও অল্পসিদ্ধান্ত এসে গেছে। .... ভারতের ইতিহাস ভারতীয়দেরই রচনা করতে হবে। ..... কারো ছেলে হারিয়ে গেলে সে যেমন তাকে না পাওয়া পর্যন্ত শান্ত হতে পারে না, তেমনি যতক্ষণ ভারতের গৌরবময় অতীতকে সামনে পুনরুজ্জীবিত না করতে পাচ্ছ ততক্ষণ তোমরা থেমো না। তাই হবে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা এবং এই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত জাতীয়তাবোধ জেগে উঠবে।"[১]

জাতীয় শক্তি জাগরণের জন্য দরকার নিজস্ব ইতিহাস সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান ও নিজ দেশের বিশ্বাস-রীতি-নীতি-প্রথা-কৃত্য-উৎসব-অনুষ্ঠান সম্পর্কে সম্যক ধারণা। দেশের যুবসমাজ বর্তমানের শক্তি ও ভবিষ্যতের সম্বল — তারা যদি দেশীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাস যথাযথ জানতে না পারে তাহলে দেশের কল্যাণ সাধন সম্ভব নয় এবং জাতীয় জাগরণও সম্ভব হবে না। এজন্য বিবেকানন্দ যুবসমাজকে ইতিহাস চর্চার পাশাপাশি যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞান চর্চারও পরামর্শ দিয়েছেন। "তিনি সমাজবেত্তা, ধর্মের সংগঠক, ব্যক্তিগত চরিত্রের নিয়ামক এবং সর্বোপরি সেবাধর্মের জীবন্ত বিগ্রহ। কিন্তু তাঁর যাবতীয় কর্মপ্রবাহ, লোকহিতৈষণা, অধ্যাত্মসংস্কার — সমস্ত কিছুর মূলে আছে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে প্রকৃত ভারতবর্ষকে উপলব্ধির চেষ্টা। ... ভারতবর্ষের জীবন, ইতিহাস ও সাধনার বিকাশধারা, পরিবর্তন ও পরিণাম বুঝতে গেলে তার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের গতিপথটি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন এবং স্বাভাবিক ভাবেই স্বামীজী ভারতবর্ষের ধ্যান ও কর্মের মূল প্রেরণা বুঝতে চেয়েছিলেন ইতিহাসের কালক্রম অবলম্বন করে।"[২]

স্বামী বিবেকানন্দ নতুন পথের দিশারী — সাহিত্যে, শিল্পে ও আধ্যাত্মিক সমাজদর্শনেও তিনি এক পথ প্রদর্শক ব্যক্তিত্ব। সাহিত্য রচনার মধ্যেও তাঁর দেশাত্মবোধের জাগরণী বাণী বলিষ্ঠ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। প্রথাগতভাবে সাহিত্য সৃষ্টির অভিপ্রায় নিয়ে তিনি কলম ধরেননি। ব্যক্তি মতাদর্শ ও মানবতাবাদের বাণী প্রচারের জন্য তিনি লেখনীর আশ্রয় নেন। সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যের তিনি একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। কালিদাস, জয়দেব, ভারতচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, দীনবন্ধু প্রমুখ লেখকের সাহিত্য পাঠ করেছিলেন। শেলী, মিল্টন, ও শেক্সপিয়রের গ্রন্থও তাঁর প্রিয় ছিল। তিনি মনে করতেন সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্যই হল কোন না কোন আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য কল্পনা, বাস্তবতা এবং লেখকের অন্তরাত্মার প্রতিফলন আদর্শবাদের মাধ্যমে প্রকাশিত করে থাকেন কালজয়ী লেখকেরা। তিনি বলেছেন, "...যে সাহিত্য চরিত্র গঠনে সাহায্য করে না, যে সাহিত্য ক্লীবতাকে প্রশয় দেয়, ভাষার অতি মাধুর্য যেখানে ভাবকে আচ্ছন্ন করে, যে সাহিত্য রুচিবিগর্হিত, যার মধ্যে বলিষ্ঠতা, ওজস্বিতা, আদর্শবাদের অভাব, সে সাহিত্য .... অন্য বৃহত্তর গুণের উপস্থিতি সত্ত্বেও সর্বৈবনিন্দনীয়।"[৩]

এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। লেখকের ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ সাহিত্যে থাকলেও মনুষ্যসমাজের চিত্ত জাগরণ ও সাহসিকতার সঙ্গে কর্মোদ্দীপনার বলিষ্ঠ প্রত্যয় সাহিত্যে থাকতে হয় — এরকম উদ্দেশ্যের প্রতিফলন বিবেকানন্দের সাহিত্যে দেখা যায়। তাই দেখি বিবেকানন্দের সাহিত্যে ঝরঝরে ভাষার মধ্য দিয়ে দেশাত্মবোধের জাগরণ ঘটানো হয়েছে। সকল ভীরুতা, জড়তা ও দুর্বলতাকে দূরে ঠেলে আত্মবিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে বলেছেন স্বামীজী। "বীর হ – সর্বদা বল অভী! সকলকে শোনা মা ভৈঃ মা ভৈঃ – ভয়ই

মৃত্যু, ভয়ই পাপ, ভয়ই নরক, ভয়ই অধর্ম, ভয়ই ব্যভিচার। বিবেকানন্দ তাঁর সাহিত্যে ভীরুতার বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করেছেন এবং মহা-অভয় এবং অভীকমন্ত্র প্রচার করেছেন। তাঁর রচনাবলী, মন্তব্যসমূহ, কথোপকথন থেকে তাঁর সাহিত্যাদর্শ স্পষ্ট হয়ে যায়।"[৪]

বিবেকানন্দ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে স্বদেশ ও বিদেশের তুলনামূলক আলোচনা করে নব পথের সন্ধান দিয়েছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ভাল-মন্দ, গ্রহণীয়-বর্জনীয় ও ভারতীয়দের অন্তর্নিহিত সমস্যা তুলে ধরে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। গোঁড়াপন্থী মানুষের দল যারা অতীতের দোহাই দিয়ে পায়ে বেড়ি পরে বসে থাকেন তাদের নিজ অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে বলেছেন। আর যারা ইংরেজদের বুলি আওড়ে আধুনিক মনস্কতার ভান করেন তাদের সেই গড্ডলিকা স্রোতে ভেসে থাকাকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। অন্ধ অনুকরণ নয়, জ্ঞান ও নিষ্ঠার সঙ্গে যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি মেনে নিজ কর্মের মাধ্যমে এগিয়ে চলার শক্তি জাগিয়ে ছিলেন স্বামীজী। বলেছেন, "এক হাত লাফাতে পারনা, লঙ্কা পার হবে। কাজের কথা ? দুটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পার না, দুটো লোকের সঙ্গে একবুদ্ধি হয়ে একটা সাধারণ হিতকর কাজ করতে পার না — মোক্ষ নিয়ে দৌড়ুচ্ছ।"[৫]

সকলে মিলে সহমত পোষণ করে হিতকর্মে নিয়োজিত থাকাই পক্ষান্তরে দেশ সেবা করা। বিবেকানন্দের জীবন প্রত্যক্ষ করলে ও তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করলে মহান মানবতাবাদের পরিচয় পাওয়া যায়।

'পরিব্রাজক' গ্রন্থে গঙ্গার বর্ণনা দিতে গিয়ে সুজলা-সুফলা বাংলাদেশের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে তাঁর মাতৃভক্তি ও স্বদেশ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বিদেশ থেকে ফিরে বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যকে যেন তিনি নতুনভাবে আবিষ্কার করলেন। নীল আকাশের কোলে সাদাটে মেঘের আনাগোনা, নারকেল, খেজুর, বাঁশ, আম, লিচু, জাম, কাঁঠাল গাছের উল্লেখ করে প্রকৃতির যে সরস বর্ণনা দিয়েছেন তা পড়তে পড়তে জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের কথা সহজেই স্মৃতিপথে উদিত হয়। জীবনানন্দ বাংলার মুখ দেখে পৃথিবীর রূপ খুঁজতে চাননি, পরিব্রাজক বিবেকানন্দ বিদেশের রূপ দেখে এসে বাংলার রূপসৌন্দর্যে বিভোর হয়ে লিখলেন, "এই অনন্তশস্যশ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাঙলা দেশের একটি রূপ আছে। যে রূপ কিছু আছে মলয়ালমে (মালাবার), আর কিছু কাশ্মীরে। .... সে নীলনীল আকাশ, তার কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ-ঝোপ তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ-লক্ষ চামরের মতো হেলাচ্ছে, তার নীচে ফিকে ঘন ঈষৎ পীতাভ, একটু কাল মেশানো ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি ঢালা ঢালা আম-লিচু-জাম-কাঁঠাল-পাতাই পাতা — গাছ ডাল পালা আর দেখা যাচ্ছে না, আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলাচ্ছে, দুলছে, আর সকলের নীচে — যার কাছে ইয়ারকান্দি ইরানী তুর্কিস্তানী গালচে-দুলচে কোথাও হার মেনে যায় !"[৬]

বিবেকানন্দের কবিপ্রাণ যেন এখানে জাগ্রত হয়ে উঠেছে। তাঁর সৌন্দর্যপিয়াসী মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, বলেছেন, দৈত্য দানবের হাতে পড়ে ঐসব জায়গায় ইঁটের পাঁজা ও কলের চিমনি তৈরী হয়ে সেসব সৌন্দর্য একদিন হারিয়ে যাবে। ভালবাসা না থাকলে হারানোর বেদনা বা আশঙ্কা প্রকট হয়ে ওঠে না। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের চিত্তে স্বদেশ প্রীতি শুধুমাত্র ধর্মপ্রচারের মধ্য দিয়েই বিস্তার ঘটেনি প্রকৃতির ভাবতন্ময় বর্ণনার মধ্যেও প্রকাশিত হয়েছে। সন্ন্যাসী মানে সংসার বিবাগী, উদাসী, আত্মভোলা, নির্বিকার, ত্যাগী ব্যক্তি — এই প্রথাগত ধারণা পাল্টে যায় বিবেকানন্দের জীবনদর্শন ও লেখনী পর্যালোচনা করলে। তিনি যে দেশে গেছেন সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রা এমনকি সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলিও খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছেন কখনো নিজের মত করে, কখনো বা যাদের জীবনযাত্রা অবলোকন করছেন তাদের মত করে। এইজন্যই সকলের চোখে তিনি স্বামীজী। মানবজীবনমুখী উদার চিত্ত বিবেকানন্দের স্বদেশ প্রেম এইভাবে বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের মাঝে তিনি আপন হৃদয়ের সাড়া পেয়েছেন।

সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর তিনি নিজ কৌতূহল নিবৃত্তি করার জন্য পরিব্রাজক হিসাবে সারা ভারতে ভ্রমণ করলেন। ধর্মের আরাধনা ও পূণ্যার্জনের লক্ষ্যকে দূরে রেখে নিজ দেশকে ভালভাবে চেনার জন্য দেশবাসীর জীবনধারা ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে অবলোকন করতে লাগলেন। পরিব্রজ্যা রূপে কাশী, বারাণসী, অযোধ্যা, আগ্রা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, হৃষিকেশ, বৈদ্যনাথ, প্রয়াগ, শ্রীনগর, মীরাট, জয়পুর, খেতড়ী, আজমীর, বোম্বে, পুণা, বেলগাঁও, গোয়া, ত্রিবান্দম, কন্যাকুমারী, পণ্ডিচেরী, হায়দ্রাবাদ — ভারতবর্ষের এরকম বহু স্থানে গিয়ে সেইসব অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকা-রীতি-নীতি-বিশ্বাস-সংস্কার-প্রথা-শিল্প-সংস্কৃতি-অর্থনীতি অর্থাৎ সমাজ ও সংসার জীবনের খুঁটিনাটি দিকগুলি নিয়েও তিনি পর্যালোচনা করেছিলেন। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন ভারতের কোথায় দুর্বলতা ও কোথায় ভারতের শক্তি নিহিত আছে।

ভারতের মানুষ সৎ কিন্তু দুর্বল, ত্যাগী কিন্তু ক্ষুধার্ত, সাহসী কিন্তু আত্মবিশ্বাসের অভাব, ঐতিহ্য সম্পর্কে আগ্রহী কিন্তু বিজ্ঞাননিষ্ঠ চেতনার অভাব — এইসব সত্যকে উপলব্ধি করে তিনি বিচলিত হয়ে ওঠেন। দরিদ্র সাধারণ মানুষের মধ্যে নিষ্ঠা ও ভক্তি-প্রাণতা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। "ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-মূর্খ, উচ্চবর্ণ ও অন্ত্যজ – সকলকে তিনি অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছেন। যেমন দেখেছেন দরিদ্র, মূর্খ সাধারণ মানুষের হৃদয়বত্তা, তেমনি দেখেছেন শিক্ষিত মানুষের স্বার্থপরতা। যেমন দেখেছেন প্রকৃত ধর্মের প্রেম মহিমাময় রূপ, তেমনি দেখেছেন ধর্মের নামে সঙ্কীর্ণতা, আচার-সর্বস্বতা ও নিষ্ঠুরতা।"[৭]

তাই তাঁর কাছে মানুষ, ভগবান ও স্বদেশ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তথাকথিত উচ্চবর্ণ বলে পরিচিত মানুষেরা যাদেরকে মূর্খ বলে দূরে সরিয়ে রেখেছে, অস্পৃশ্য বলে অচ্ছুৎ মনে করেছে তাদেরকেও তিনি সমান গুরুত্ব দিয়ে সমাজের

উন্নতিবিধানে সামিল হতে বলেছেন। পল্লীর কুটীরে বাস করা মানুষের অন্তরের মহানুভবতা তিনি প্রত্যক্ষ করে বলেছেন, “...নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভূনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে বাজার থেকে।’’[৮] বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন জনসাধারণের সার্বিক জাগরণ ব্যতীত ভারতের উন্নতি সম্ভব নয়। লোকসাধারণের প্রতি তাঁর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অন্ত ছিল না। তাই কখনো অতীতের গৌরবময় দিনের কথা স্মরণ করে পরম্পরা সম্পর্কে সকলকে সচেতন করেছেন, কখনো মানুষের দুর্বলতা, ভীরুতা ইত্যাদি থেকে বেরিয়ে এসে কর্মী হবার আহবান জানিয়েছেন। লোকসাধারণের আত্মবিশ্বাস জাগানো ও কর্মোদ্দীপনায় সামিল করার জন্য বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন মাতৃভূমির জাগরণ সম্ভব হবে যদি দারিদ্র দূর করে তাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালানো যায়। মানুষের মধ্যে শক্তিহীনতার মূল সমস্যা তিনি উপলব্ধি করে তার পথ বাতলে দিয়েছেন। এজন্যই তিনি মহাপুরুষ ও সমাজ শিক্ষক — তাঁর দেশাত্মবোধ শুধুমাত্র ভাষার গাম্ভীর্যপূর্ণ উক্তির মধ্যে সীমিত নয়, মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে তার বিবেকসত্তার জাগরণই বিবেকানন্দের লক্ষ্য ছিল।

বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে কখনো ‘বীর’ সম্বোধন করে জাগাতে চেয়েছেন, কখনো ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করে জেগে উঠতে বলেছেন, কখনোবা প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের তুলনা করে ভাল দিকগুলি গ্রহণ করতে বলেছেন। যেমন আমেরিকায় জনৈক মহিলার কারাগারে বন্দীদের প্রতি সহনশীল ও সদয় ব্যবহার দেখে ভারতের কারাগারে বন্দী কয়েদিদের কথা তাঁর মনে আসে। ভারতে কয়েদীদের প্রতি নির্দয়, নিষ্ঠুর ও অমানবিক ব্যবহারের কথা মনে আসায় তাঁর হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্যে বিত্তশালী মানুষের সম্পদের প্রাচুর্যতা দেখে ভারতের দীন দুঃখী মানুষের অন্নের জন্য হাহাকারের কথা ভেবে বিচলিত হন। দিশাহারা লোকসাধারণকে তিনি লুপ্ত বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার সাহস জুগিয়েছিলেন এবং গুরুত্ব দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার মন্ত্র দিয়েছিলেন।

অতীত নিয়ে গর্ব করার মধ্যে বীরত্ব নেই, অতীতকে হৃদয়ে রেখে যদি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা যায় তবেই আসবে সাফল্য এবং সৃষ্টি হবে নতুন ইতিহাস। এজন্য তিনি মানুষকে কর্ম করার মধ্য দিয়ে জীবনে শুধু এগিয়ে যেতে বলেছেন। এ যেন বার্গসঁর গতিতত্ত্বের প্রতিধ্বনি — ‘চরৈবেতি চরৈবেতি’। রবীন্দ্রনাথও যুবসমাজকে গোঁড়ামী ও সংস্কার ঠেলে এগিয়ে যেতে বলেছেন, ‘শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও / উদ্দাম উধাও – / ফিরে নাহি চাও,’।[৯] স্রোতহীন নদীতে যেমন আগাছা জন্মে নদীর সত্তাকে খাটো করে তেমনি কর্মহীন অলস জীবন-যাত্রীরা কোনদিনই দেশ ও দশের কল্যাণে আসতে পারে না। যারা নিজ পরিবার পরিজনদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে না বা ভালোবাসতে পারে না তারা স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও

ভালোবাসা জানাবে কী করে ? এজন্যই বিবেকানন্দ বলেছেন, "আমি এই যুবকদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আর শুধু ইহারাই নহে, ভারতের নগরে নগরে আরও শত শত যুবক আমার সহিত যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। ইহারা দূর্দমনীয় তরঙ্গাকারে ভারতভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে এবং যাহারা সর্বাপেক্ষা দীনহীন ও পদদলিত – তাহাদের দ্বারে দ্বারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নীতি, ধর্ম ও শিক্ষা বহন করিয়া লইয়া যাইবে – ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রত, ইহা আমি সাধন করিব কিংবা মৃত্যুকে বরণ করিব।"[১০] একতার মন্ত্রে যুবসমাজকে দীক্ষিত করতে চান, কর্মের দ্বারা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে চান, জ্ঞানের আলো জ্বালানোর মাধ্যমে বহুযুগের সংস্কার ভেঙে দিতে চান কর্মযোগী বীরেশ্বর বিবেকানন্দ। সন্ন্যাস জীবনের প্রথম দিকে তিনি নিজ মুক্তির অন্বেষণ করছিলেন কিন্তু যখন পরিব্রাজক রূপে দেশের জনসাধারণের স্বরূপ অনুধাবন করলেন তখন তাদের উন্নতির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন — এই মুক্তি হল দারিদ্র ও অজ্ঞানতা থেকে মুক্তি। আজীবন তিনি জীবনের জয়গান গেয়েছেন, মানবতার জয়গান গেয়েছেন — এইভাবে সমাজ শিক্ষক, মানবপ্রেমিক থেকে দেশপ্রেমিক এবং দেশপ্রেমিক থেকে বিশ্বপ্রেমিক রূপে বিবেকানন্দ সকলের হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করেছেন।

স্বামীজী জাতি-ধর্ম-বর্ণের উর্দ্ধে উঠে মানবধর্মের জয়গান করেছেন। হিন্দু-মুসলিম-শিখ-খ্রীষ্টান-বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে অবিভক্ত ভারতবর্ষের লাহোরে গিয়ে নানক, গুরুগোবিন্দ সিংহের মতাদর্শ ও আত্মত্যাগের বাণী তুলে একতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। জাতীয় সংহতি ছাড়া ভারতের উন্নয়ন সম্ভব নয় — সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তা উপলব্ধি করেছিলেন। হিন্দু-মুসলিমের অন্তর্ঘাতের চোরাস্রোত সমাজে বয়ে চলেছে — এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ভারতীয় ঐক্যশক্তিকে বিনষ্ট করছে। এই সত্যকে উপলব্ধি করে তিনি মুসলমান সমাজে আকবর ও শাজাহানের প্রসঙ্গ তুলে সাম্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববন্ধন ও একতার বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছিলেন। তিনি মুসলমানদের আতিথেয়তা গ্রহণেও দ্বিধা বোধ করতেন না এবং জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। জাতীয় উন্নতি, প্রগতি ও একতার পথে অস্পৃশ্যতা এক বাধার প্রাচীর — অস্পৃশ্যতার চাদর খুলে ফেলে কর্মোদ্যোগী হয়ে আত্মার বিকাশ ঘটাতে বলেছেন। স্বামীজী শিষ্য বন্ধুদের নিকট পত্রের মাধ্যমে এই বেদনার কথা আক্রমনাত্মক ভাষায় লিপিবদ্ধ করে বলেছেন, "ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদা। জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্গ — আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা, দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র, সহজ ব্রহ্মজ্ঞান।"[১১] নিজ উদ্দেশ্য সাধনে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে। এজন্য তিনি রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার উপরও জোর দিয়েছেন।

বিবেকানন্দের স্বদেশভাবনা শুধুমাত্র পুরুষদের বল ও বীর্যে উচ্চারিত নয়, নারী পুরুষের অগ্রসরতাকেই তিনি সমান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নারীশক্তি বিকাশে তিনি অতীত ঐতিহ্যকে যেমন স্মরণ করেছেন তেমনি বর্তমান ও ভবিষ্যতে নারীর ভূমিকা সমাজে কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি দেখেছিলেন পাশ্চাত্ত্য দেশে নারীরা শিক্ষা-দীক্ষায়, স্বাধীন জীবনযাত্রায় কত উন্নত, আর ভারতের বেশীরভাগ নারীরা কত দীন হীন জীবন নির্বাহ করছেন। তিনি মনে করতেন নারীদের প্রকৃত মর্যাদা প্রদান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন হল নিজের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মত বিবেকানন্দও সমাজ ও দেশের উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা গ্রহণকে গুরুত্বপ্রদান করেছেন। যেদিন নারী পুরুষ উভয়ে জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা সমান তালে তাল মিলিয়ে ও কাঁধ মিলিয়ে সমাজের উন্নয়নমূলক কাজে সামিল হবে সেদিন ভারতবর্ষ অনেকাংশে এগিয়ে যাবে। বিবেকানন্দ বলেছেন, "...আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল – আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।"[১২]

তথাকথিত গোঁড়াপন্থীদের মধ্যস্থতায় নারী শিক্ষার বিস্তারে অনেক প্রশ্ন চিহ্ন এসেছিল। তারা মনে করতেন নারীরা শিক্ষিত হলে অন্তঃপুরের শান্তি বিঘ্নিত হবে। এমনকি কোন ধরনের শিক্ষা নারীদের সহায়ক হবে সে বিষয়েও বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। এই প্রসঙ্গেও বিবেকানন্দ সমাজ শিক্ষকের ন্যায় পথ নির্ণয় করে বলেছিলেন, "তোমাদের নারীগণকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও। তারপর তাহারাই বলিবে, কোন জাতীয় সংস্কার তাহাদের পক্ষে আবশ্যক।"[১৩] মেয়েদের লজ্জা, বিনয় ইত্যাদি কোমল প্রবৃত্তির সঙ্গে জ্ঞান, যুক্তি ও বুদ্ধির বিদ্যা সংযোজিত হলে তারা স্বনির্ভর হবে। সীতা, সাবিত্রী, মৈত্রেয়ী, দময়ন্তী প্রভৃতি নারীর আদর্শ অনুসরণ করে চিরকাল চলতে হবে কেন? নারী-পুরুষে ভেদাভেদ না করে, সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত করে কর্মোদ্দীপনায় যুক্ত করতে হবে, তারপর নারীর ভাগ্য নারীরাই রচনা করবে। "স্বামীজীর বাণীতেই সর্বপ্রথম নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা বা জাগরণের পরিচয় লাভ করি। আধ্যাত্মিক জাগরণের মাধ্যমেই জগতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ বা পূর্ণ স্বাধীনতার লাভ সম্ভব। ... তাঁর বিশ্বাস ছিল, যে নারী যত বড় হবেন, তিনি ততই নারী সুলভ দুর্বলতাগুলি অতিক্রম করতে সমর্থ হবেন।"[১৪] পতিব্রতার আদর্শ, ত্যাগের নিষ্ঠা, উদার মাতৃহৃদয়, সোনার সংসার গড়ার কারিগর রূপেই শুধু নারীকে দেখলে হবে না, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে সমাজ গঠনের কাজে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিতে হবে।

বিবেকানন্দ আধুনিক যুক্তিবাদী মন নিয়ে সমাজ সংস্কার করতে চেয়েছিলেন এবং সব ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায়ের ভালো দিকগুলি গ্রহণ করে জড়তামুক্ত সমাজগঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি জনগণের অজ্ঞানতা দূর করার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গঠন ছাড়া আর কোন বৃহৎ পদক্ষেপ নেননি, দারিদ্র দূরীকরণ ও আর্থিক উন্নতির জন্যও কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেননি কিন্তু সমাজ শিক্ষক রূপে যে মন্ত্রে মানুষকে দীক্ষিত করেছেন তা পালন করলে ভবিষ্যতে সুফল অবশ্যম্ভাবী। দেশকে

শক্তিশালী করতে গেলে দরকার শারীরিক ও মানসিক শক্তির উন্নতি, জাতীয় ইতিহাস-সংস্কৃতি সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান, বিজ্ঞাননিষ্ঠ শিক্ষা, দারিদ্র দূরীকরণ এবং জাতীয় ঐক্য — এসব দিকগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চললে ভারতীয় জীবনধারার যে উন্নতি ঘটবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় বিবেকানন্দের পূর্বে আর কোন মনীষী বলেননি। গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সুস্পষ্ট বাস্তববোধ দিয়ে জাতি, সমাজ ও স্বদেশ সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি বিবেকানন্দ রেখেছেন তা গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবন করে যদি জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চার করা যায় তবে তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে।

তথ্যসূত্র :

1. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, সম্পাদক, পরিব্রাজক স্বামীজী দেশে ও বিদেশে, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৩১।
2. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ ও স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, সম্পাদক, চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ২১৯।
3. সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সম্পাদক, বিবেকানন্দ স্মৃতি, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ২২৭।
4. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩।
5. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬।
6. সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ, অনুবাদ ও সম্পাদক, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, ১ম খন্ড, কামিনী প্রকাশালয়, ১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৫৪।
7. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, সম্পাদক, পরিব্রাজক স্বামীজী দেশে ও বিদেশে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।
8. সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২।
9. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, ‘বলাকা’ কাব্যের ‘চঞ্চলা’ কবিতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা, চৈত্র ১৪০০, পৃ. ৪৪৪।
10. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, সপ্তম খন্ড, চতুর্থ সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ৮২।
11. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

12. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮।
13. প্রাগুক্ত, দশম খন্ড, পৃ. ২২১।
14. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ ও স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, সম্পাদক, চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪।

রবীন্দ্রনাথের দেনাপাওনা : অকালে নিরুপমার বিসর্জন

সিদ্ধার্থ ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট নাম। ছোটগল্পকার হিসেবে তার পরিচিতি বিশ্ববন্দিত। তার অনন্য অসাধারণ প্রতিভার স্পর্শে বাংলা ছোটগল্প যথাযোগ্য মর্যাদা পায়। রবীন্দ্র ছোটগল্পগুলি আজও বিশ্বসাহিত্যে মহার্ঘ্যসম্পদ হিসেবে বিবেচিত। তার অসংখ্য প্রশংসিত ছোটগল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি গল্প 'দেনাপাওনা'। বহুকাল ধরে সমাজে যে সমস্ত নৃশংস, অমানবিক প্রথা চলে আসছে তার মধ্যে পণ প্রথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পণপ্রথার বিষময় ফলের কারণে সমাজ নিরুপমাদের মতো মেয়েদের অকালে চলে যেতে হয়। সে বিষয়েই উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ। নিষ্ঠুর পণপ্রথার কবলে পড়ে নববধূদের চরম দুঃসহ অত্যাচারের শিকার হতে হয়। সে কথাই দেনাপাওনা গল্পের মূল উপজীব্য। পণপ্রথা আজকের দিনে এক সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধিতে প্রভাবিত হয়ে কত অর্থবান শিক্ষিত মানুষ তাদের ঘরের বধূকে নির্যাতন করে তার ইয়ত্তা নেই। বর্তমান সময়ে এই সমস্যা ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। প্রতিদিনই শত শত নিরুপমাদের বিসর্জন হয়, তবু সুসভ্য সমাজের প্রতিনিধিরা এর প্রতিকার করতে ব্যর্থ। অসহায় বধূদের ভার আক্রান্ত আর্তনাদে আজকের আকাশ বাতাস অণুরণিত।

মূল শব্দ : 'দেনাপাওনা', 'পণপ্রথা', নিরুপমা, রামসুন্দর, রায়বাহাদুর, নির্যাতন প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

"অসংখ্য ছোট ছোট লিরিক লিখেছি, বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন কবি এত লেখেন নি, কিন্তু আমার অবাক লাগে, তোমরা যখন বলো যে, আমার গল্পগুচ্ছ গীতধর্মী। এক সময়ে ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনযাত্রা। একটি মেয়ে নৌকা করে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল, তার বন্ধুরা ঘাটে নাইতে নাইতে বলাবলি করতে লাগল, আহা যে পাগলাটে মেয়ে, শ্বশুর বাড়ি গিয়ে ওর কি না জানি দশা হবে কিম্বা ধরো একটা খ্যাপাটে ছেলে সারা গ্রাম দুষ্টুমির চোটে মাতিয়ে বেড়ায়। তাকে হঠাৎ একদিন চলে যেতে হলো শহরে তার মামার কাছে। এইটুকু চোখে দেখেছি, বাকিটা নিয়েছি কল্পনা করে। ...যা-কিছু লিখেছি নিজে দেখেছি। মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ...ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে, আমি যে ছোট ছোট গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালী সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।"

১২৯৮ বঙ্গাব্দের জ্যোষ্ঠ সংখ্যায় আলোচ্য গল্পটির প্রকাশ। রবীন্দ্র প্রতিভা বিস্ময়কর। তার বিচক্ষণতাই ছোটগল্পগুলি এক নব রূপ পেয়েছে। ভৌতিক, আধ্যাত্মিক, প্রকৃতি, সমাজ, সমাজ সমস্যা, পারিবারিক নানা ঘটনা তার গল্পে ফিরে ফিরে এসেছে। শিলাইদহের পল্লীজীবন, পদ্মা তীরবর্তী বিচিত্র ঘটনা তার গল্পে উপাদান সরবরাহ করেছে। সুখ, দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা মিলেমিশে তার গল্প পরিপূর্ণতা পায়।

'ভিখারিণী', 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা' দিয়ে গল্প লেখা শুরু করে মহীরূহের ন্যায় গল্প উপহার দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। হিতবাদীর সম্পাদক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের অনুরোধে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প 'দেনাপাওনার' আত্মপ্রকাশ হয়। তৎকালীন অর্থলোলুপ সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাত ছিল গল্পের বিষয়বস্তু। বিবাহ যেখানে দুটি হৃদয়ের মেলবন্ধন, ভালোবাসার আশ্রয়, - এ সমস্ত কিছুকেই নিস্ফল করে দেয় রায়বাহাদুরের মতো পরিবারেরা। পণের টাকায় যাদের একমাত্র প্রার্থনা, বাকি সব তুচ্ছ। স্নেহ, মায়া, মমতা সবকিছুকে উপেক্ষা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না, তথাকথিত সভ্য এই মানুষগুলো। সমাজের এই নিষ্ঠুর দিকটিকেই তুলে ধরেছেন প্রথিতযশা গল্পকার।

দিবারাত্রি শ্বাশুরির ঔদাসীন্য ফুলের মতো নিরুপমাকে শুকিয়ে যেতে বাধ্য করে। হাজার অপমান বুক পেতে সহ্য করেও কখনো নিজের নারীত্বকে বিকিয়ে দেয়নি সে; প্রতিবাদী সত্ত্বার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তার। সে যখন জানতে পেরেছে তার কারণেই তার প্রিয়জন পথে বসেছে তখন পিতার প্রতি তার প্রশ্নবাণ – 'তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম! না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না। তাছাড়া আমার স্বামী তো এ টাকা চান না।''

রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' ছোটগল্পটি পণপ্রথার অশুভ ইতিহাসের জীবন্ত দলিল। এ গল্প শুধু এক নিরুপমার নয় আবার এক রামসুন্দরের নয় – এরকম বহু অসহায় পিতা কন্যা রয়েছে সমাজে। যারা দারিদ্র্যতার কারণে সামাজিক ভাবে নানা আঘাত পায়। এখন বিবাহ শুধু দুটো হৃদয়ে মিল নয়, এখনকার বিবাহের ভবিষ্যত নির্ধারণ হয় দেনাপাওনার নিরিখে। পাত্রপক্ষের পিতা পুত্রের জন্ম থেকেই পাওনাদার হিসেবে বিবেচিত, অপর পক্ষে – কন্যার পিতা দেনাদার হিসেবেই পরিগণিত হয়ে থাকে।

গল্পের শুরুতেই আমরা দেখি রামসুন্দর মিত্র পাঁচ ছেলের পর কন্যা জন্মালে অনেক খুশি হয়ে তার কন্যার নাম রাখে নিরুপমা। নিরুপমা কথার অর্থ যার উপমা নেই। মেয়ে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রামসুন্দরের খুশি ফিকে হতে শুরু করে। অনেক কষ্টে দরিদ্র পিতা পাত্র সন্ধান পেলেও বিবাহ রাত্রেই এক চরম গোলোযোগের শিকার হতে হয়। বিবাহের সমস্ত পণ না দিতে পারার কারণে পুত্রের পিতা রায়বাহাদুর

বিবাহের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। নিষ্ঠুর ভাগ্যবিধাতা খানিকটা প্রসন্ন হলে রায়বাহাদুরের পুত্র বিবাহে রাজি হয়ে যায় এবং বলে ওঠে – "কেনা বেচা দরদামের কথা আমি বুঝি না; বিবাহ করিতে আসিয়াছি বিবাহ করিয়া যাইব।

সে যাত্রাই রামসুন্দর বেঁচে গেলেও তার কন্যা নিরুপমা বাঁচেনি চরম অত্যাচারের হাত থেকে। দিনের পর দিন শ্বশুরবাড়ীতে নিরুপমার উপর মানসিক পীড়ন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সমস্ত কিছু জেনে বুঝেও নিশ্চুপ থাকতে হয় নিঃস্ব পিতা রামসুন্দরকে। শ্বশুরবাড়িতে সে তার আদরের মেয়েকে ভালো করে চোখের দেখাও দেখতে পাই না। কুটুম্বগৃহের এই অপমান রামসুন্দরকে 'বড্ড বেদনা দেয়। "রামসুন্দর স্থির করিলেন, যেমন করিয়া হউক টাকাটা শোধ করিয়া দিতে হইবে।"

পিতৃগৃহের নিন্দা ক্রমেই নিরুপমার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। অনেক আশা নিয়ে এক নববধূ তার শ্বশুরবাড়িতে পা দেয়, সেই আশা আজ নিরুপমার জীবনে অভিশাপ বয়ে আনে। এক অসহায় পিতা ছটফট করতে থাকে তার কন্যার নির্যাতন দেখে। "নিজের কন্যার উপরে পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রাখিতে হইয়াছে।" এমনই এক জটিল সমস্যা তৈরি হয়েছে।

কন্যার দর্শন পেতেও পিতাকে ভিক্ষা চাইতে হয়। রায়বাহাদুরের পরিবার কন্যার মাপকাঠি হিসেবে পণের টাকাকেই প্রাধান্য দেয়, তাইতো নিরুপমার এত অসহনীয় বেদনা। আলোচ্য গল্পে শুধুমাত্র নিরুপমার দুঃখ যন্ত্রণায় প্রকাশ পায়নি সঙ্গে রামসুন্দরের অসহায়তা, দৈন্যতাও ফুটে উঠেছে। নিরুপমার মতো রামসুন্দরও তিলে তিলে যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছে। পরিবারে কারোর কথা চিন্তা না করে নিরুপমাকে বাঁচাতে চেয়েছে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের হাত থেকে। বারবার প্রত্যাখ্যান হওয়া পিতা মেয়ের ঘরে গেছে এক অদম্য উৎসাহে পণের টাকা জোগাড় করে। "আজ তাঁহার সে সংকোচভাব নাই; দ্বাররক্ষী এবং ভৃত্যদের মুখের প্রতি সে চকিত সলজ্জ দৃষ্টিপাত দূর হইয়া গিয়াছে, যেন আপনার গৃহে প্রবেশ করিলেন... আনন্দে দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বাপও কাঁদে, মেয়েও কাঁদে; দুইজনে কেহ আর কথা কহিতে পারে না।" এত চেষ্টা করেও রামসুন্দর এবারও ব্যর্থ হয় তার বড় পুত্র হরমোহন তাঁহার দুটি ছোটো ছেলে নিয়ে নিরুপমার শ্বশুরবাড়িতে এসে রামসুন্দরের পিতৃসত্য পালনে ব্যাঘাত ঘটায়।

এরপর থেকেই নিরুপমার শ্বশুরবাড়ি তার কাছে শরশয্যা হয়ে ওঠে। বাপের বাড়ির কারোর সঙ্গেই আর দেখা করতে দেয় না রায়বাহাদুরের পরিবার। অবহেলা, অযত্নে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নিরুপমা কঠিন রোগ বাধিয়ে মৃত্যুবরণ করে। নিরুপমার মৃত্যুর পর শ্বশুরবাড়িতে তার মর্যাদার গরিমা বৃদ্ধি পায়। মহাসমারোহে তার অন্তোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এক নিরুপমার মৃত্যু সভ্য সমাজের কাছে হাজারো প্রশ্নবান তুলে দেয়। যে মেয়েটি বেঁচে থাকতে সামান্য সহানুভূতি, শ্রদ্ধা পায়নি, মৃত্যুর পর তাকে নিয়েই অর্থবান পরিবারের প্রতিযোগিতা। সমাজের কাছে নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ

করতে নির্লজ্জ পন্থা বেছে নেয়। নিরুপমার অসুখ করলে যে শ্বশুর বাড়ির লোক তার চিকিৎসা পর্যন্ত করায়নি, তারাই মৃত্যুর পর লোক দেখানো নানা হীনতার আশ্রয় নিয়েছে।

অর্থলোলুপ সমাজের যান্ত্রিকতার নগ্ন রূপটিকে সমাজ সচেতন গল্পকার নিপুণতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টি পরিপূর্ণতা পেয়েছে আলোচ্য ছোটগল্পে। সাহিত্যে গ্রন্থে তিনি লিখেছেন ''আমি যে ছোটগল্প লিখেছি, বাঙালি সমাজের বাস্তবের জীবনের ছবি প্রথম তাতেই ধরা পড়ে।' এছাড়া ছিন্নপত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন – ''বঙ্কিমবাবু ঊনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র আধুনিক বাঙালির কথা যেখানে বলেছেন সেখানে কৃতকার্য হয়েছেন, কিন্তু যেখানে পুরাতন বাঙালির কথা বলতে গিয়েছেন সেখানে তাঁকে অনেক বানাতে হয়েছে : চন্দ্রশেখর, প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড়ো বড়ো মানুষ এঁকেছেন কিন্তু বাঙালি আঁকতে পারেন নি। আমাদের চির পরিচিত ধৈর্যশীল, স্বজন বৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী প্রচণ্ড কর্মশীল পৃথিবীর এক প্রান্তবাসী – শান্ত বাঙালির সেই কাহিনি কেউ ভালো করে বলে নি।' বাঙালি ঘরের নানা উপকরণ রবীন্দ্র গল্প জুড়ে আছে। নানা সামাজিক সমস্যা তার গল্পকে বনাঢ্যরূপ দান করেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সমাজ সমস্যার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিল 'দেনাপাওনা' গল্পটি।

গল্পে কোথাও বর্ণনার বাহুল্য চোখে পড়ে না। অনেকগুলো চরিত্র থাকলেও গল্পের একমুখী গতিতে কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি। কাহিনির পরিসমাপ্তিতে ট্র্যাজিক রস সৃষ্টি গল্পটিকে এক অনন্য মর্যাদা দান করে।

ক্ষেত্রগুপ্ত তার 'রবীন্দ্রগল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে গল্পের পরিসমাপ্তি নিয়ে বলেছেন ''গল্পশেষে তার ক্ষণিক উপস্থিতি শূন্য, ব্যর্থ ও শুষ্ক হাহাকারের মতো বেজেছে – এদিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠি আসিল, আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছি অতএব অবিলম্বে আমার স্ত্রীকে এখানে পাঠাইবে।' (নিরুর মৃত্যুর পর এ চিঠি পৌছায়) ... কারণ গল্পটি আদ্যন্ত পরিকল্পনা মাফিক এগিয়েছে। - কোথাও মনের উৎসে বা প্রতিফলিত ঘটনায় জট পাকায়নি বিরোধী কোনো সম্ভাবনা দেখা যায়নি।'' ক্ষেত্রগুপ্ত আরো বলেন – ''দরিদ্র বাঙালি ভদ্রলোকের কন্যাদায়, পণ প্রথার অমানবিক নৃশংসতা বেশ স্বাভাবিক ভাবে আঁকা হয়েছে। পিতার অসহায় কুণ্ঠিত বাৎসল্য, রায়বাহাদুর এবং তার গৃহিণীর লুব্ধ গর্বিত ধনস্ফীত দংস্ট্রা লেখক কুন্ঠাহীন ভাবে একে দেখিয়েছেন। নারীঘাতী এই সামাজিক বিধিকে তিনি ভৎসনা করেছেন এবং গল্পের শেষ বাক্যে ব্যঙ্গের তীরকে উদ্যত রেখেছেন। সুনির্বাচিত দু-একটি ঘটনা, মানস প্রতিক্রিয়ার সংযত কিছু বিবরণ, একমুখী পরিণতি কাহিনিকে সংক্ষিপ্ত মার্জিত কান্তি দিয়েছে। গল্পের মধ্যে অনেকখানি বেদনা থাকলেও তাকে তরল ও উচ্ছ্বসিত হবার সুযোগ দেননি লেখক। প্রথম থেকেই ভারাক্রান্ত কাহিনী কথনে ব্যঙ্গ ও কৌতুকাশ্রয়ী ভাষা ব্যবহার অশ্রু শোষণের কাজে লেগেছে।''

পথপ্রথাকে ধর্মস্বীকৃত বলে চালানোর অপচেষ্টা বহুকাল ধরেই চলে আসছে। অতীতে গো-দান, ভূ-দান, সালাঙ্কারা কন্যা দানের কথা পাই বিভিন্নভাবে, তবে পাত্রপক্ষের ব্যবসায়িক দরকষাকষি সেদিন ছিল না। তথাকথিত উপজাতি সমাজে হাঁস, মুরগী, ছাগল, গরু, রেডিও, সাইকেল দানের কথা আছে কিন্তু অর্থনৈতিক লেনদেনের কোনো ব্যাপার নেই। পণপ্রথা আজ সমাজের মারাত্মক ক্ষত। এর বীজ বপন হয়েছিল ইংরেজ আমলেই। চতুর ইংরেজ সব কিছুর বিচার করত ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে, আজ একবিংশ শতাব্দীতেও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি একই রকম রয়ে গেছে। সামাজিক এই ব্যভিচারের নিদর্শন মেলে সংবাদপত্রের পাতা, টিভি, মিডিয়ার খবর পরিবশনের মাধ্যমে।

নিরুপমার মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? এই প্রশ্ন সভ্য সমাজের কাছে রবীন্দ্রনাথের। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় কাউকেই দোষারোপ করা যায় না। আবার এদিকে নিরুপমার মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, রোগে জর্জরিত হয়ে মৃত্যু। এই রোগে শারীরিক উৎপীড়নের চেয়ে মানসিক নিপীড়ন বেশি ছিল। শরীরে আঘাতে চিকিৎসা সম্ভব, মনে আঘাত লাগলে কোনো কিছুই সম্ভব নয়। তাইতো শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে নিরুপমা মৃত্যু মুখে পতিত হয়। অর্থলোলুপ সুসভ্য সমাজের প্রতিনিধিরা তাকে বাঁচাতে দেয়নি, বাঁচার অধিকার টুকু কেড়ে নিয়েছিল। গল্পকার Narrative Style'এর মাধ্যমে সমাজ সমস্যার এক দানবীয় অভিশাপকে নিপুন তুলির মাধ্যমে অঙ্কন করেছেন।

নিরুপমার মৃত্যুর জন্য রামসুন্দর তার দায় এড়াতে পারে না। রামসুন্দরের বেশ কিছু ভুল সিদ্ধান্ত তার মেয়ের জীবনকে তছনছ করে দেয়। রামসুন্দর যে যে ভুলগুলি করেছিল তা নিম্নরূপ –

ক. রামসুন্দর নিজের ,আর্থিক অবস্থা চিন্তা না করে তার কন্যার বিবাহ ঠিক করেছিল।

খ. বিবাহের দিন বরপণ জোগাড় করতে ব্যর্থ হয়েও সে সংবাদ আগে পাত্রপক্ষকে জানায়নি।

গ. পিতার উপর পুত্রের বিদ্রোহী মনোভাবের সুযোগ তিনি নিয়েছেন।

ঘ. সব কিছুর মধ্যে রামসুন্দরের একটু চালাকিও ছিল। তিনি জানতেন কখনই এত অর্থ তার পক্ষে জোগাড় করা কখনই সম্ভব নয় তবু বিবাহ সমন্ধ পাকা করেছিলেন।

ঙ. বনেদী বংশের সঙ্গে আত্মীয়তা করার লোভ শেষ পর্যন্ত দুঃসহ পরিণতির বীজ বপণ করেছিল।

নিরুপমার মৃত্যুতে রায়বাহাদুরের ভূমিকাও কম নয়। লোভী এই মানুষটি পণের টাকা হাতাতে না পেরে তার স্ত্রীর অত্যাচারকে প্রশয় দিতে শুরু করে। রায়বাহাদুরের পরোক্ষ প্রশয় না পেলে কখনই তার স্ত্রী এতটা বাড়াবাড়ি করতে পারত না। নিরুপমার মৃত্যুতে যার ভূমিকা সবচেয়ে বেশী সে হল তার দানবী শাশুড়ী। অর্থের লোভ মানুষকে কতটা স্বার্থপর, হীন করে তোলে রায়বাহাদুরের স্ত্রী তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বধূর মৃত্যুর

আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তার মুখ একটা ভালো কথা বার হয়নি। বধূর মৃত্যুর পর মনের আনন্দে আবার ছেলের বিবাহ দিতে চেয়েছেন। নিরুপমার পিশাচী শ্বাশুড়ীই নিরুপমার অকালে চলে যাওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ।

তথ্যসূত্র :

১. রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয়, পৃ. ৫৩৮-৫৩৯
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, সাহিত্যম্, কলকাতা, ২০০৩, পৃষ্ঠা ২০।
৩. তদেব, পৃ. ২১।
৪. তদেব, পৃ. ২২।
৫. তদেব, পৃ. ২৩।
৬. তদেব, পৃ. ২৪।
৭. ক্ষেত্রগুপ্ত, রবীন্দ্রগল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থনিলয়, আগস্ট, ১৯৯১, পৃ. ৮।
৮. সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ।
সহায়ক গ্রন্থাবলী :
১. প্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প'।
২. তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রগল্প বারেবারে ফিরে দেখা।
৩. শীতল চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের অন্দরমহল।

সুধামুখীর স্বপ্ন

বৈশালী বিশ্বাস
গবেষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

সারসংক্ষেপ: এই প্রবন্ধটি এক দলিত নারীর লেখা এক আশ্চর্য আত্মজীবনী বিশ্লেষণ করবে। দলিত নারী এবং নারীর অধিকারের প্রসঙ্গ, লিঙ্গবৈষম্য এবং তার সাথে দলিত মানুষের মধ্যে দলিত মানুষদের দ্বারা শিক্ষাবিস্তারের মতো বিষয়ের বহু না জানা, অনালোচিত প্রসঙ্গ উঠে আসবে এই নারীর যাপিত জীবনের আলোচনার সূত্রে। এই আত্মজীবনীটির বিশ্লেষণ দলিত জীবনকে বিশেষত দলিত নারীর প্রসঙ্গকে প্রচলিত নিয়মের থেকে বেরিয়ে একটু অন্য আলোকে দেখার চেষ্টা করবে।
সূচক শব্দ: দলিত, নারী, আত্মজীবনী, শিক্ষাবিস্তার, ব্রাহ্মণ্যবাদ, লিঙ্গবৈষম্য

সত্যবতীর স্বপ্ন মরে গিয়েছিল। লাল চেলিপড়া ছোট্ট সুবর্ণ আর ফিরতে পারেনি বিদ্যালয়ে। যদি ফিরতে পারত, তবে? কথায় আছে "truth is more stranger than fiction' তাই সত্যবতী না পারলেও সুধামুখী পেরেছিল। এই সুধামুখী গোস্বামী সত্তরের দশকে জীবনের শেষপ্রান্তে বসে লিখছেন আশ্চর্য এক স্মৃতিকথা 'আত্মজীবনীর মতো'। ওনার দাবিমত সময়টা বিশ শতকের তৃতীয় দশক। সেই সময় দাঁড়িয়ে যখন মেয়েদের শিক্ষার হারই নগণ্য, মেয়েদের ঘরের বাইরে কাজ করা বিশেষ ক্লাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তখন উনি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা। বিখ্যাত লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর প্রায় সমবয়সী উনি। তবে তাঁর আত্মজীবনী এক আশ্চর্য দলিল এইজন্যও যে, তিনি কেবল একা একা আলো হয়ে ওঠেননি বরং নিজের লোকেদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য পাড়ি দেন নিজের গ্রামে, শহরের ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের আরামের চাকরি ছেড়ে। 'নিজের লোক' বলতে কি বোঝালেন তিনি?

কলকাতা শহর থেকে দূরে হিদিয়া গ্রামে এক নমঃশূদ্র ঘরে জন্ম তাঁর। সেই ঘরে যাকে উনিশ বিশ শতকে বারবার ছোটলোক বলা হয়েছে। বাবা চাষী, লেখাপড়ার তেমন চল নেই। তবু বাধাও নেই। তাই আদরের নাতনীর বায়না রাখতে ঠাকুমা স্কুলে ভর্তি করে দেয়। লিখতে পড়তে শিখবে। কিন্তু সে তো সুবর্ণর মতো ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে নয়, তাই নারীজন্মের অভিশাপের সাথে আরো এক অভিশাপ বইতে হয় তাঁকে, দলিত হওয়ার অভিযোগ। তিনি লিখছেন গ্রামে কিছু মানুষ ছাড়া বাকিদের ইঁট দিয়ে বাড়ি বারণ ছিল। তাই তাঁর বাবার ইঁটের বাড়ি করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে নিষেধ তিনি শোনেন তবু সেই বাড়ি করার আট মাসের মধ্যে লেখিকার বাবার মৃত্যু হয়। তিনি লিখেছেন "যদি ইট পোড়াতেন তবে সবার বদ্ধমূল ধারণা হত ওই কাজের জন্যই তার

অকাল মৃত্যু হয়েছে"[১]। গায়ত্রী দেবী আসলে তিনি স্পিভাকের কথামতো 'দলিতেরও দলিত।' প্যাট্রিয়াকা হিলসের মতানুসারে বলা যায় তাঁর ক্লাস, কাস্ট এবং জেন্ডার তাঁকে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে এক বিশেষ standpoint থেকে দেখতে শেখায়। কেমন সেই বিশেষত্ব?

তাঁর বিয়ে হয়ে যায় মাত্র ৮ বছর বয়সে। সে সময়ে যে এই সিদ্ধান্ত খুব একটা নতুন ব্যাপার ছিল না। তাঁর বাবা তাঁর পড়াশোনায় যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু আমাদের সমাজে এটা ভাবার চল ছিলো না যে মেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। তিনি শিক্ষিত মেয়ের জন্য শিক্ষিত ভালো ছেলে খুঁজেছিলেন। অত্যন্ত শিক্ষিত, রুচিসম্মত ঠাকুরবাড়ির সরলা দেবী ছাড়া বাকি মহিলাদের আত্মজীবনীতে শিক্ষা, স্বাধীনতার কথা এলেও, আত্মপরিচয়ের জন্য লড়াই চোখে পড়ে না। তাই গ্রামের অশিক্ষিত পরিবারের বাবার এই সিদ্ধান্ত খুব একটা পৈশাচিক ছিল না।

আমাদের জানা গল্পটা বদলায় এরপরে। এই বনমালী গোস্বামীর সাথে বিয়ের পরেও তাঁর মানবিক ইচ্ছেগুলোকে মরতে দিলেন না বনমালী। অনেকটা জ্ঞানদানন্দিনীর ঢঙে তিনি গল্প বললেও এটা বুঝতে হবে যে তাঁরা ঠাকুরবাড়ির ক্লাসে অবস্থান করতেন না। সুধামুখীদের সাধারণ কৃষক পরিবার। অন্যদিকে পিতা-মাতা হীন বনমালী বহুদিন দাদার গলগ্রহ হয়ে থেকে এবার পড়াশোনা করে বড় কিছু হতে চান। তার ওপর শ্বশুরের অকালমৃত্যুর জন্য খুব আদরের শিক্ষাজীবন ছেড়ে কাজে নামতে হয় বনমালীকে। তবু বনমালী তাঁর শিক্ষাবিস্তারের স্বপ্ন মরতে দেননি আর পাশের মানুষটিকে খোলা দরজাটা দিয়েছিলেন যা বাকিদের মতো দরজা বন্ধা করে দেননি। তাই সেইটুকু সুযোগে সহযোদ্ধা হয়ে উঠেছিলেন সুধামুখী। সেই চিত্রাঙ্গদার মত পাশে থেকেছেন, সংকটে থেকেছেন, সুখে দুঃখে সহচরী হয়েছেন। অনেকটা সাবিত্রীবাঈ ফুলের মতো। তিনিও তো নিচু জাতের মেয়ে ছিলেন, দলিত মেয়ে।

পাঠশালা শেষ হলে জ্যোতিরাওয়ের মতই বনমালী সুধামুখীকে উঁচু বিদ্যালয়ে ভর্তি করান। পেশায় শিক্ষক বনমালী স্ত্রীকে নিজের স্কুলে ভর্তি করলে নিন্দার শেষ থাকে না। সুধামুখী লিখছেন, "যখন শ্রী গোস্বামী ও আমি ঐ রাস্তা দিয়ে যেতাম তখন পাশের গ্রামের মানুষেরা টিটকারী দিয়ে বলত "ঐ দেখ সাহেব মেম যাচ্ছে"[২]। তবু দমে যাননি তাঁরা। গ্রাম থেকে বেরিয়ে প্রচলিত নিয়ম বদলে সুধামুখীর শিক্ষার জন্য তাঁরা শহরে আসেন। হিস্টোরিয়ার সাথে লড়াই করে পরীক্ষা দেন এই মেধাবিনী। ১৯২৮ এ করপোরেশন স্কুল, পরে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে চাকরি পান। তাঁদের সম্মিলিত আয়ে তাঁদের ভালো চলে গেলেও তাঁরা কিছুদিন পরেই উচ্চশিক্ষার প্রস্তাব ফেলে গ্রামে পাড়ি দেন নিজের সমাজের উন্নতি করতে।

"উচ্চশিক্ষা পেতে হলে নিজের সমাজের উন্নতি কয়েক বছর পিছিয়ে যেতে হবে"।[৩]

ফুলে দম্পতি যেমন নিজেরা স্কুল স্থাপন করেছিল এই দুটি মানুষ সেই কাজ না করে গ্রামে স্থাপিত হওয়া কিন্তু শিক্ষক না পাওয়া বহু বিদ্যালয়কে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। মালিয়াট, গ্রামে 'প্রাণকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়', বাকরি গ্রামের 'রাজমোহন উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে' বিদ্যালয়ে পড়ান। বিখ্যাত সাহিত্যিক মহীতোষ বিশ্বাসও তাঁর আত্মকথা 'দিন এল দিন গেল' -তে স্থানীয় দুজন শিক্ষকের কথা বলতে গিয়ে অঙ্কের দিদিমণি হিসেবে সুধামুখী গোস্বামীর কথা বলেন। তিনি একজায়গায় এও বলেন যে তাঁর গ্রামে মেয়ে-শিক্ষক এতটাই আশ্চর্য বিষয় ছিল যে তিনি তাকেও 'স্যার' বলেই ডাকতেন। শিক্ষিকা শুধরে দিয়ে ম্যাডাম বলে ডাকতে বললে তা হয়ে দাঁড়ায় 'মাসিমা'। ছাত্রের সেই ডাক আনন্দে মেনে নেন সুধামুখী গোস্বামী।

ভারতে Gender roles–এ বৈষম্য এখনও এই একবিংশ শতকেও এক জ্বলন্ত সত্য। তাই লেবার ফোর্সে ফিমেল পার্টিশিপেশন রেট ২৫.১%(Periodic Labour Force Survey (PLFS) annual report for July 2020-June 2021)।[৪] এখনো রেনু খাতুনের মতো ঘটনা হয়, শুধু আমাদের দেশে নয় বহু বহু দেশে। দেশের সমাজ সংস্কৃতি এই সবকিছুর মূলেই তো কতগুলো মানুষ আর মানসিকতা। কতদিন আগে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন,

"এরা এ বি পোরে বিবি সেজে
বিলিতি বোল কবেই কবে"।[৫]

তিনি সত্যবাদী আর পুরোনো দিনের মানুষ ছিলেন তাই আশঙ্কাকে প্রকাশ করেছেন সোজা করে। আমাদের ধারণা আজও বদলায়নি। করোনার সময় 13% নারীকে তাঁদের labour force থেকে সরে যেতে হয়েছে অন্যদিকে পুরুষেরা সরেছেন মাত্র 2%(economist Mitali Nikore told IndiaSpend)[৬]।এই সবকিছুর জন্য দায়ী আমাদের সমাজে বিদ্যমান gender roles। যা ঠিক করে দেয় ছেলে এবং মেয়ে কি কি কাজ করতে পারে, পারে না, এমনকি কি কি বিষয় নিয়ে তাঁরা পড়তে পারে তাই পর্যন্ত। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের একজন গবেষক ক্যাথরিন.বি.কফম্যান দেখিয়েছেন যে কেবল সমাজ এই বিভেদ চাপিয়ে দেয় তাই নয়, সমাজ প্রসূত এই ধারণা তাঁদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দেয়, ফলে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী না হলে তাঁরা শিক্ষার ও কাজে যোগদানের ক্ষেত্রে সমাজ নির্ধারিত সিদ্ধান্তই নেয়,ফলে রটনা হয় 'মেয়েরা অঙ্কটা পারে না'...ইত্যাদি, ইত্যাদি। তিনি বললেন,"Our beliefs about ourselves are important in shaping all kinds of important decisions, such as what colleges we apply to, which career paths we choose, and whether we are willing to contribute ideas in the workplace or try to compete for a promotion'[৭]। কতদিন আগেই সুধামুখী বলছেন 'অংকটা আমি বেশ ভালোই পারি,এই আত্মবিশ্বাসটা বাঁচিয়ে রাখার দায় তো আমরা নিতেই পারি ।' 'Equity

Begins at home'। তারপর তো বাইরের লড়াই রয়েছে, কর্মক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিকতার সাথে লড়াই, বেতনের পার্থক্য, মহিলাকে কোন কোন কাজের জন্য অযোগ্য ভাবা। বলাই বাহুল্য, সুধামুখী তার পরিবার থেকে এই সঙ্গটা পেয়েছিলেন।

সাবিত্রীবাঈ ফুলেকে নাকি দুটো করে শাড়ি নিয়ে যেতে হতো। রাস্তায় সমাজের ধামাধরারা এটা ওটা ছুঁড়বেন বলে। তবু প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে তাঁর কাজ করে গেছেন তিনি। বলেছেন, 'Go get education'[৮]। সুধামুখীর গ্রামের লোকের সভা বসেছিল সে পড়তে বাইরে যাবে শুনে। New Ilania সাবিত্রীবাঈয়ের জন্য মুক্তাবাঈ এর দলিত নারীর স্বর কন্ঠ পেল। উনিশ শতকের শেষ দিকেই ওই কিশোরী জোড় গলায় জানাল মাহার জাতির ওপর ব্রাহ্মণ্যবাদী অত্যাচারের বাস্তবচিত্র। তাই শিক্ষা দরকার এবং এই শিক্ষাদান তখনই কিছুটা ফলপ্রসূ হতে পারে যখন শিক্ষাদাত্রী সেই শিক্ষার্থীদের জাতগত, লিঙ্গগত সামাজিক অবস্থানের খানিকটা কাছাকাছি অবস্থান করছে। কারণ Pierre Bourdieu-এর Cultural and Social reproduction theory বলছে, যে কোন শিক্ষাব্যবস্থাতে শিক্ষা আসলে dominant culture এর মানুষের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।[৯]তাই গবেষণা বলছে যে 'দলিত মানুষ', যাদের মধ্যে নারী পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষার সাথে যোগাযোগ কম তাঁদের মধ্যে শিক্ষার উপযোগীতাকে বোঝাতে পারে তাঁদের অবস্থান থেকে আসা 'তাঁদের লোক'। আম্বেদকর বলেছিলেন 'pay back to your society'। এই দায়িত্ব জ্যোতিরাও সাবিত্রীবাঈ এর মতোই পালন করেছেন, বনমালী গোস্বামী আর সুধামুখী গোস্বামী। কারণ উভয়ই তাঁরা নিজেদের জন্মসূত্রে জানতেন সমাজে জল অচল হওয়া মানসিকভাবে কতটা হীনমন্যতার জন্ম দিতে পারে। তাঁরা এই হীনমন্যতা দূর করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের ল্যাবরেটরি গল্পের নন্দকিশোরের বক্তব্যমত সুধামুখী বনমালী নিজেদের জাত আলাদা হতে দেননি, ঘর ও বাহিরের রেখা টানেননি তাঁদের মধ্যে। পথ কখনই সহজ ছিল না তবু একসাথে একে অপরের সাথে এগিয়ে গেছেন তাঁরা। তাই কক্ষনও এমনকি বনমালীর তেভাগার সময়ে অযথা গ্রেপ্তারীতেও তাঁদের সংসার ভেঙে পড়েনি। ছেলেমেয়েকে নিয়ে কাঁটাতাঁর পেরিয়ে সুধামুখী আবার এক উদ্বাস্তু কলোনির স্কুলে পড়াতে থাকেন আর বনমালীকে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে পারেন। 'বাড়ির কর্তার' গ্রেপ্তারী সংসার ও স্বপ্নকে গুঁড়িয়ে দিতে পারে না।

আসলে কোথাও তাঁরা জানতেন একদিন এই ভয় কাটবেই। বনমালী গোস্বামী তাঁর আত্মকথা 'অরব বেলায় পাড়ি'তে বেশ মজা করে লিখেছেন যে গ্রামের বাইরে বাণীবন বিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে একবছর পর ছুটিতে তাঁর স্ত্রী এলে তিনি দেখলেন এবার আর নিন্দা নয় বরং লোকে তাঁদের দেখতে এলো। লিখলেন, 'বাণীবন ভীতি কেটে গেছে'।[১০]

ভীতি কি কাটে পুরো? নাকি জন্ম নেয় রাগ, প্রতিহিংসার? ভেঙে প্রমাণ করলে বহুযুগের sexism নতুন রূপ নেয়। মালিয়াট গ্রামে চাকরি করার সময় সুধামুখী ছিলেন

ওই অঞ্চলের প্রথম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক,পুরুষ-নারী নির্বিশেষে। তাই কিছু শিক্ষিত যুবক এই হারকে মানতে পারে না। অন্য বিদ্যালয় খুলে ছাত্রীদের ভয় দেখিয়ে নতুন বিদ্যালয়ে আসতে বলা,ভুল খবর দিয়ে পুলিশে নালিশ পর্যন্ত হয়। তবু তাঁরা জিততে পারেনা নতুন দিদিমণির কাছে। সুধামুখী লিখছেন এই ঘটনার পর তাঁরা ভয় পেয়ে বহুদিন সেই আবাসিক স্কুলে ছাত্রীদের নিয়ে হলঘরে রাত কাটিয়েছেন, পাহারা দিয়েছেন কিন্তু ওই যুবকদের শাস্তি দেবার জন্য অনেকে মিথ্যে চুরির গল্প বানাতে বললে তিনি রাজি হননা। আলোর সাথে কোন অন্ধকারের আপস করতে চাননি তিনি

অর্ধেক নারী আর অর্ধেক নর তো ভাবেনি আমাদের সমাজ, একপ্রান্তে পুরুষ আর অন্যদিকে প্রকৃতির অংশ নারী। তাই বারবার বলা হয় যে নারী তো কেবল অন্দরের কথা বলে, বাহিরের সঙ্গে তাঁদের দেখাই হয় নি। অনন্দাশঙ্কর রায়ের ‘পথে প্রবাসে’-এতে দেখি যে তিনি পাশ্চাত্যের কর্মজীবী নারী দেখে অবাক হয়েছিলেন। বিশ্বযুদ্ধের পর পুনরায় গড়ে তোলার কাজে বিশ্বযজ্ঞে হাত লাগিয়েছেন নারীরা। দলিত মেয়েরা কাজ অবশ্য করে কিন্তু ওঁরা তো কাজ করে মাঠে প্রান্তরে। মৈত্রেয়ী তো দূরের অতীত, যে জাতির বেদ ছুঁতে মানা তাঁদের মেয়েরা পড়াবে কেমন করে? চুনি কোটালকে মরতে হয়, সমাজ বাধ্য করায়। কিন্তু দলিত নারীবাদীরা অন্য কথা বলেন। সুষমা মৈত্র সরকার, বামার মতো দলিত নারীরাই তো বলছেন, আমরাই পারি বাঁধন ভাঙতে, ভেঙেছিও, শুধু নানা স্তরের বাধা পিছিয়ে দিচ্ছে। প্রান্তিক অবস্থান থেকেই তো পরিবর্তন আনা যায়। তাই অদ্ভুতভাবে এক শতক আগে এই নারী এখন বাহিরের জীবনে নতুন জীবন তৈরির কারিগরিতে হাত লাগিয়েছেন। 'আত্মজীবনীর মতো' সেই শিক্ষকজীবনের কাহিনী। মেয়েমানুষ নয় এক পূর্ণ মানুষের জীবনের চালচিত্র। এটাই হয়ত এই জীবনের বিশেষত্ব।

নারীবাদী মানে চিরকাল একটা বিরক্তিকর ছবি আমাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। সুবর্ণলতার বিদ্রোহ তাঁর সন্তানদের বিরক্ত করে তোলে। আমরা বুঝি না ওটা শিকলের কষ্ট। বামার ‘সংগতি’র ছোট্ট মারিয়াম্মার দুঃখ। তাই এই stereotype ভাঙার জন্য নাইজেরিয়ার লেখক, সমাজকর্মী Chimamanda Ngozi Adichie নিজেকে বলতে চান ‘Happy African feminist, who does not hate men’।[১১] তিনি তাই বলছেন ‘We should all be feminist’। তাঁর মতে এটা তো কোন লড়াই নয়, বরং সভ্যতার প্রায় প্রথমের একটা ভুল বিভেদ শেষ করার জন্য আহ্বান। নারীর নয়, পুরুষের নয়, দলিতের নয়, ব্রাহ্মণের নয় সকলের একটা পৃথিবী গড়ে তোলার জন্যই তো এতো লড়াই লড়েছেন কত মানুষ। যেই পৃথিবীতে যেমন সুবর্ণলতা থাকবে না, তেমন Sojourner Truth-এর মতো কেউ বলতে বাধ্য হবে না ‘A’int I a woman?’। ১৮৫১, ওহিও শহরে ওই প্রাক্তন দাস মহিলার মত কেউ গর্জে উঠতে বাধ্য হবে না, “I have plowed and reaped and husked and chopped and

mowed, and can any man do more than that? I am as strong as any man that is now'[১২]। ভারতে দলিত মহিলাদের তাঁদের কথা আলাদা করে বলতে হবে না। এতো জটিলতা আসবেই না যদি আমরা একে অপরের শত্রু না হয়ে পাশে দাঁড়াতে পারি। সুধামুখী- বনমালীর মতো, সাবিত্রিবাঈ- জ্যোতিরাও-এর মতো।

দলিত মানুষের জীবন যেমন অনেক অবদমনের গল্প বলে, তেমন এক দলিত নারীর আত্মজীবনী, 'আত্মজীবনীর মতো' এক স্বপ্নের গল্পও বলে। হয়ত খুব বড় নয়, ছোট্ট পরিবর্তন। Patriarchal ego আর সমাজের gender roles পেরিয়ে কটা পদক্ষেপ, সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁরা, নিজের জন্য নয়, নিজের লোকেদের শিক্ষিত করার স্বপ্ন দেখে। তবু সেই ছোট্ট চেষ্টার কথা ছড়িয়ে পড়লে, জীবনে জীবনে অন্তর্ভুক্ত হলে আসতেই পারত বড় ঢেউ। হেজেমনি শাসিত বাংলায় সেদিন অনেকেই জানেননি সে কথা। তবু আজ এই বিভেদের ভারতে সেই মানবজীবন জানাটা খুব দরকার। জীবন তো তত্ত্বের, তথ্যের চেয়ে অনেক বেশি বাঙ্ময়। কেউ বলতেই পারে 'এরকম আর কজন আছে!', এরকম আরও কিছু মানুষ আসতেই পারে একসাথে, হাতে হাত ধরে সাম্যের জন্য লড়তে। তাইতো জন লেলন গেয়ে গেছেন,

"You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one"

গ্রন্থসূত্র:

১। সুধামুখী গোস্বামী, 'আত্মজীবনীর মতো', কলকাতা, বাণী আর্ট প্রেস ,২০১০ , -পাতা ৩

২। তদেব, পাতা ১৩-

৩। তদেব, পাতা২৫-

৪। https://www.newindianexpress.com/business/2022/jun/15/female-labour-participation-rises-to-251-per-centin-2020-21-2465779.html

৫। http://www.milansagar.com/kobi_8/ishwar_gupta/kobi-ishwargupta.html

৬। https://www.business-standard.com/article/current-affairs/covid-impact-women-workforce-disappearing-most-affected-in-urban-india-120121500259_1.html

৭। https://hbswk.hbs.edu/item/how-gender-stereotypes-less-than-br-greater-than-kill-a-woman-s-less-than-br-greater-than-self-confidence

৮। দেবী চ্যাটার্জী, ‘সাবিত্রিবাঈ ফুলে‘জীবন ও মনন-, পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চ, কলকাতা, ২০২১, পাতা-২৩

৯। Bourdieu, Pierre. [1979] 1984. *Distinction: a Social Critique of the Judgment of Taste*, translated by R. Nice. Harvard University Press.

১০। বনমালী গোস্বামী, ‘অরব বেলায় পাড়ি‘, কলকাতা, বাণী আর্ট প্রেস ,২০১০ , -পাতা ৬৬

১১। https://www.youtube.com/watch?v=hg3umXU_qWc, সময়-৩.৩৪ মিনিট

১২। *Sojourner Truth, ‘I am a woman’s rights’, Ain't I a Woman?,Penguin Classics, 2020,*

সুশীল জানার ছোটগল্প : একটি আলোচনা

সুজাতা দাস
স্নাতকোত্তর, বিশ্বভারতী

সারসংক্ষেপ : চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের প্রায় অনালোচিত কথাকার সুশীল জানা তাঁর লেখায় সেই সময়ের মানুষের জীবনকথা তুলে ধরেছেন। যুদ্ধ, মন্বন্তর, তেভাগা আন্দোলন, স্বাধীনতা ইত্যাদি ঘটনার সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রা, সুখ-দুঃখ, শোষণ-বঞ্চনা, বেঁচে থাকার লড়াই, নারীর জাগরণও উঠে এসেছে স্বাভাবিকভাবেই। লেখক তিনটি ভিন্ন সমাজ জীবনের কথা বলেছেন তাঁর গল্পগুলিতে। গল্পসংকলনের অন্তর্গত গল্পগুলির নামকরণেও এনেছেন অভিনবত্ব। তাঁর গল্প বয়নের ভঙ্গিটিও অনাড়ম্বর। সহজ-সরল ভাষায় দৈনন্দিন জীবন, বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনচর্যা লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর ছোটগল্পে। নানা কারণেই তাই, সুশীল জানার ছোটগল্প নিয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

মূলশব্দ : ছোটগল্প, সুশীল জানা, চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশক, মন্বন্তর, মানুষ, জীবনযাত্রা, ফসল, ক্ষুধা, বন্ধুত্ব, স্বপ্ন, অনিশ্চয়তা, আত্মপ্রতিষ্ঠা, পেশা, শোষক শ্রেণি, সংগ্রাম।

বাংলা কথাসাহিত্যে স্বল্পালোচিত কথাকার সুশীল জানা। কিন্তু মানের উৎকর্ষের দিক থেকে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য আলোচনার অপেক্ষা রাখে। যদিও কথাসাহিত্য ছাড়াও কবিতা, অনুবাদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার পরিচয় তিনি দিয়ে গেছেন, তবু যেন কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর সৃজনী প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে সবচেয়ে বেশি। এখানে অবশ্য তাঁর ছোটগল্প নিয়েই আলোচনা করব।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প 'শেষ রজনী' (১৩৪২ বঙ্গাব্দ) 'উত্তরা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম ছোটগল্প সংকলন 'পদচিহ্ন' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে। পরে 'শেওলা' (১৯৪৬), 'গ্রাম নগর' (১৯৪৯), 'ঘরের ঠিকানা' (১৯৫৩), 'দ্বিতীয় জীবন' (১৯৫৭), 'চিরদিনের কাহিনী' (১৯৫৭), 'শ্রেষ্ঠগল্প' (১৯৫৭) এবং 'নগরে প্রান্তরে' (১৯৮৩) প্রকাশিত হয়। কিশোর উপযোগী বেশ কিছু ছোটগল্পও তিনি রচনা করেন। এছাড়াও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের গল্পসম্ভার থেকে বেশকিছু কাহিনি অবলম্বনে নিজস্ব ভঙ্গিতে লিখেছেন 'গল্পময় ভারত', যা দুটি খণ্ডে প্রকাশিত। তাঁর ও সৌরী ঘটকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ছোটগল্পের সংকলন 'মানুষের গল্প'।

সুশীল জানার প্রথম ছোটগল্প সংকলন 'পদচিহ্ন'-এ স্থান পেয়েছে 'কীট', 'ফসল', 'বিষ', 'দাগ', 'কুকুর', 'সালতামামি' ইত্যাদি গল্প। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের সাহিত্যে মানুষের ভিন্ন জীবনযাত্রা, ভিন্ন প্রকৃতি, শ্রেণি সংগ্রামকে তুলে ধরেছেন তিনি।

এরমধ্যেই মানুষের জীবনযাত্রায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত স্নেহ, প্রেম, মমতা প্রভৃতিকেও অনুভববেদ্য করে তুলেছেন পাঠকের কাছে।

'ফসল' গল্পে দেখা যায়- লক্ষ্মণ নামে এক চাষী দিন গুণছে নতুন ধান ঘরে তোলার জন্য। গ্রামের আর সকল চাষীর মত সেও কাস্তে বানাতে দিয়ে এসেছে গিরিশ কামারের কাছে। কিন্তু গ্রামের প্রভাবশালী চৌধুরীরা কাস্তের পরিবর্তে বল্লম বানানোর নির্দেশ দিয়ে গেছে চাষীদের ধান কেড়ে নেওয়ার জন্য। লক্ষ্মণ চাষীর অনুভবে- "উত্তরে হাওয়ার ঝলকে ধানের শীষগুলি ঝর্ ঝর্ করছে বহু দূর থেকে বহু দূরে - কানে এসে লাগছে লক্ষ্মণের। চোখে তার হৈমন্তিকা, কাস্তে আর সোনার ধান।"[১] গল্পের শেষে দেখা যায় তার স্বপ্ন সত্যি হয় না- পা কেটে যায় বল্লমে। গিরিশের উঠোনে জড়ো করা কাঁচা সোনার মত ধানগুলি লাল হয়ে যায় রক্তে। শোষণের চিত্রটি লক্ষিত হয় এখানে।

'পদচিহ্ন' গল্প সংকলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'কুকুর'। গল্পটিতে দুর্ভিক্ষের সময়ের মানুষদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের কথা তুলে ধরা হয়েছে। মাধব ও তার বউ ময়না গুদামে চাল চুরি করতে যাচ্ছে। সেখানে একদিকে ময়নার সম্মানহানি ঘটছে এবং অন্যদিকে ময়নার কচি ছেলেকে কুকুরে ছিঁড়ে খাচ্ছে। শুধুমাত্র কিছু চালের আশায় মাধব চুপ করে থাকছে। শেষে যখন মাধব কয়েকটা কুকুরের গরগরানি আর ধারালো দাঁতের মাঝখানে ছটফট করতে থাকে, চালগুদামের সেপাই ইসমাইল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে- 'কাকে গুলি করবে সে? মানুষ না কুকুর?'[২] সেই সময়ের মানুষের চরম দুরবস্থার কথা লক্ষিত হচ্ছে এখানে। সুশীল জানার লেখনী এবং প্রকাশভঙ্গিও এখানে চমৎকার।

সুশীল জানার দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'শেওলা'। এই গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'মাঝি' গল্পে দেখা যায়, পারুলের স্বামী মাঝি সুমন্ত্রের অকালমৃত্যুর পরও পারুল সুমন্ত্রকে দেখতে পায়। এরজন্য সুমন্ত্রের মা ভবানী পারুলকে মাদুলি এনে দেয়। এরপর থেকে আর তার অশরীরীকে দেখা যায় না। কিন্তু ভবানী ও পারুল দুজনেই চায় সেই অশরীরীর আভাস। গল্প শেষ হয় পারুলের মাদুলি ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। গল্পটিকে মনস্তাত্ত্বিক গল্পও বলা চলে। পারুল ও ভবানীর মনের পরিবর্তনের দিকটি এখানে লক্ষণীয়।

অধ্যাপক ড. নীহারকান্তি মণ্ডল সুশীল জানা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন- "চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের সাহিত্যে মানুষের জীবনযাত্রাকে শ্রেণী সংঘাতের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। ...জীবন, ক্ষুধা, প্রেম, সন্তানস্নেহ, আদর্শ যা কিছু মানুষের আছে, তা সমাজ ব্যবস্থায় কতটা অবহেলিত সেটা তিনি অনুভব করেছিলেন। সেই অনুভববেদ্য ভাবনার দলিল তাঁর গল্পগুলি।'[৩] সুশীল জানার 'গ্রাম নগর' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'সাঙাৎ' গল্পে রয়েছে জীবন, ক্ষুধা, প্রেম, বন্ধুত্ব এবং নারীকে কেন্দ্র করে দুই বন্ধুর বিবাদের কথা। ভবানী ও কেদার দুই বন্ধু। ভবানীর ছিল দোকান আর কেদারের ছিল নৌকা।

সেই সূত্রেই তাদের আলাপ। কিন্তু যুদ্ধের সময় কেদারের নৌকা বেচতে হয়েছে। আর বন্যা, দুর্ভিক্ষের সময় ভবানীর দোকান তুলতে হয়েছে। তাই তারা দুজনেই সদাশিবের নৌকায় কাজ করে। কাজের জন্য তাদের নৌকা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। তাদের দুজনেরই ভোমরাকে ভালো লাগে। কিন্তু ভোমরার বাবা তাদের কারোর সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিতে চায়নি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতিও বদলেছে। কেদার এক টাকার বিনিময়ে ভ্রমরের সঙ্গে সময় কাটিয়ে এসে ভবানীকে বলেছে- ' ভোমরা তো এখন বাজারের মেয়েছেলে।' এটা শুনে ভবানী ও কেদারের মধ্যে মারামারি শুরু হয়। কেদারের হাতে ভবানীর মৃত্যু হয়। পরদিন সকালে নৌকা খোলার সময় কেদারের ক্ষেপে যাওয়া বেপরোয়া মূর্তি দেখা যায়। সে তার বন্ধুকে খুঁজতে থাকে।

সুশীল জানার একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ 'ঘরের ঠিকানা'। এই গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত গল্পগুলির নামকরণে রয়েছে বিশেষত্ব। 'ঘরের ঠিকানা' নামক গল্পটিকে বাদ দিয়ে অন্যান্য কয়েকটি গল্পের নাম হল- 'বেটা', 'বহিন', 'আম্মা', 'বেটি', 'বউ' প্রভৃতি। অর্থাৎ গল্পগুলির নামকরণ সম্পর্ককেন্দ্রিক। 'ঘরের ঠিকানা' গল্পে এক বালককে অন্যান্য গল্পের চরিত্ররা যেমন- 'বেটা' গল্পের ধরিছন মুচি', 'বহিন' গল্পের রঙ্গী, 'বেটি' গল্পের পান্তি, 'বউ' গল্পের অর্জুন মণ্ডলের বউ, 'আম্মা' গল্পের আন্দি প্রমুখেরা তাদের ঘরে নিয়ে যেতে চায়। ছেলেটাকে সবাই ঘিরে ধরে যেন বলছে- “কিছুই হারায়নি- কিছুই খোওয়া যায়নি তোর, না মানুষজন, না তোর মাঠ-জংগলের স্বপ্ন। এই রাঙা মাটির সীমা থেকে নোনা মাটির দেশ সাগরের ধার পর্যন্ত- ঘর আছে তোর, আছে বাপ-মা, বোন-বেটি, ভাই-বন্ধু- যা চাস। চল মোর সঙ্গে।”[৫]

'ঘরের ঠিকানা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'আম্মা' গল্পটি বিশেষ তাৎপর্যবহ। 'আম্মা' গল্প অবলম্বনে তৈরি গৌতম ঘোষ পরিচালিত ছবি 'দখল' শ্রেষ্ঠ কাহিনিচিত্র হিসাবে ভারত সরকারের স্বর্ণকমল লাভ করে ১৯৮৪ সালে। এই গল্পটিতে গল্পকার কাকমারা সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন। কাক বলি দিয়ে এরা কাকের মাংস খায় পরম উল্লাসে। সেই থেকেই এদের নাম হয়েছে কাকমারা। হয়তো বুনো পাখির অ-সহজলভ্যতার কারণে কাকই এদের ভোজ্য তালিকায় স্থান পেয়েছে। এই জাতির পুরুষ-নারীরা বেদের মতো গ্রামে-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায়। পুরুষেরা পাখি শিকার করে, ভেল্কি-ভোজবাজি দেখায়, আর গাঁজার নেশা করে। যদিও এদের মাতৃভাষা তেলেগু, তবে স্থানীয় ভাষায় সুন্দর কথা বলতে পারে। সমালোচকের কথায়- 'এ গল্পে চাষির ফসল দাবির সংগ্রাম নেই, আছে আত্মপ্রতিষ্ঠার, অধিকারের জোর বজায়ের সংগ্রাম।'[৬] এই গল্পে কাকমারা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি মেয়ে আন্দি ভালোবেসে বিয়ে করে জগা চাষির সঙ্গে। কিন্তু অন্ত্যজ বলে সমাজে স্বীকৃতি না পেয়ে ঘর বাঁধে এক চরে 'মুড়াকাটি' প্রজা হিসাবে, অর্থাৎ বনবাদা কেটে যারা আবাদ করে প্রথমে এসে। কিন্তু সাপের কামড়ে জগার মৃত্যুর পর জমিদারের লোকেরা জমি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। মিথ্যে অপবাদ দেয় আন্দির নামে। তার নিজের জাতি কাকমারারা তাকে আশ্রয়ও দিতে চায়। কিন্তু

আন্দি তার এই স্বচ্ছল জীবন ছেড়ে অনিশ্চিত জীবনে ফিরে যেতে চায় না। সবশেষে তার ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আন্দি তবু অটল থাকে। আত্মপ্রতিষ্ঠার জেদ তার চোখে ঝলক দেয়। সংগ্রামী নারীর অসাধারণ আত্মতেজের আভাস পাওয়া যায় গল্পে। গল্পকারের রচনার শিল্পকুশলতাও গল্পটির উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করেছে।

সুশীল জানা রচিত ‘বউ’ গল্পটিতে তেভাগা আন্দোলনের কথা রয়েছে। তেভাগা আন্দোলনের জনপ্রিয় নেতা অর্জুনকে তার বাসর ঘর আর নতুন বউ ছেড়ে পালিয়ে যাবার কথা বলতে আসে ভিন গাঁয়ের এক ছেলে। কারণ অর্জুনকে ধরার জন্য তার বিয়ের সময়ের মত এই সুযোগ জমিদারের চর, পুলিশ, গোয়েন্দারা ছাড়তে চায় না। দীর্ঘদিন ধরে তারা অর্জুনকে ধরতে চেয়েও পারেনি। আর অর্জুনের মত তেভাগার নেতাকে ধরতে না পারলেও তাদের স্বস্তি নেই। দুর্ভাগ্যবশত অর্জুন এবার পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে। তার ধরা পড়ার খবর শুনে অগণিত মানুষের কন্ঠ সম্মিলিত ঐকতানের মত ধ্বনিত হয়। ভয় পাওয়া পুলিশের দল রাইফেলের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলে যায়। সেই গুলিতে মারা যায় অর্জুনের বউ। জমি ও নিজস্ব পুরুষটির প্রতি ভালোবাসা একসঙ্গে মিলে গেছে এ গল্পে।

‘দ্বিতীয় জীবন’ গল্পসংকলনের ‘এক যে ছিল প্রজা’ গল্পটি মন্বন্তরের পর একটা চরে বসবাসকারী কয়েকজন মানুষের কাহিনি। গল্পের শুরুর বাক্যটি হল- ‘দিন তো নয় – দুঃস্বপ্ন।’[৭] দুঃস্বপ্ন দিয়ে কয়েকটা মানুষের দিন শুরু হচ্ছে। পাঁচ-ছ’টা প্রাণী একটা ঘরে কোনোরকমে মাথা গুঁজে যেন মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুণছে। পাঁচ জন পুরুষ আর একজন গর্ভভারাতুর ক্লান্ত ভীরু মেয়ে এই চালার সদস্য। বান আর মারী মড়কের পরে অবশিষ্ট এই কয়েকজন একটি চালাতেই আশ্রয় নিয়েছে। কুসংস্কার, বাঘের ভয় তাদের একত্র রাখতে সহায়তা করেছে। কিন্তু একটি বাচ্চার জন্ম নির্ভরতা আনে স্বার্থপর, মৃত্যুভীত মানুষগুলির মধ্যে। চৌকিদার তার পাকানো খাতা বের করে বলে- ‘এতদিন শুধু মরা মানুষের নাম লিখেছি- এখন নতুন জন্মের নাম তবু লিখি একটা।’[৮] তবে শেষপর্যন্ত এই নির্ভরতা স্থায়ী হয় না। বাচ্চাটিকে মড়কের পরের নরমাংসের স্বাদ পাওয়া ধূর্ত শেয়ালেরা টেনে নিয়ে গিয়ে ছিঁড়ে খায়। অবশিষ্ট মানুষগুলির জীবনে আবার অনিশ্চয়তা নেমে আসে।

সুশীল জানার ‘চিরদিনের কাহিনী’ গল্প সংকলনের গল্পগুলির নামকরণ করা হয়েছে পেশাকে কেন্দ্র করে। যেমন- ‘অধর মাঝি’, ‘রাজমিস্ত্রী ঈশা খাঁ’, ‘বেয়ারা রাধাকান্ত’, ‘কম্পোজিটার ভূতনাথ’, ‘পিয়ন বজরঙ্গলাল’ ইত্যাদি। বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষের জীবনযাত্রার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন লেখক এই গল্পগুলিতে।

‘রাজমিস্ত্রী ঈশা খাঁ’ গল্পে বর্ণিত হয়েছে এক রাজমিস্ত্রীর জীবন-কথা। ঈশা খাঁ শহরে কাজ করতে যায়। গ্রামে থাকে বৃদ্ধা মা ও স্ত্রী। দু বছর পর গ্রামে ফিরে আসে সে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কোঠাবাড়ির মত লাল-নীল পেন্সিল দিয়ে একটা প্ল্যান এঁকে

স্ত্রী ফতেমাকে দেখায়। রাজমিস্ত্রী হলেও তার নিজের বাড়ি নেই, ভাড়াবাড়িতে থাকে। সে স্বপ্ন দেখে নিজের মত করে একটা বাড়ি বানাবার। তবে হাতে তার টাকা বেশি নেই। তিনতলা থেকে পড়ে গিয়ে তিন মাস হাসপাতালে ছিল সে। তাতেই অনেক টাকা বেরিয়ে গেছে ঈশার। এবার শহরে কাজ করতে যাওয়ার সময় স্ত্রী ফতেমা তার সঙ্গী হয়। শহরে গিয়ে ঈশা ফতেমাকে তার নিজের হাতে বানানো বড় বড় ইমারতগুলো দেখাতে দেখাতে যায়। কিন্তু তারা নিজের চালাটুকুর সামনে এসে স্তব্ধ হয়ে যায়। আগুন লেগে পুড়ে গেছে সব। বস্তি উচ্ছেদ করে দিয়েছে মালিক। ফতেমার চোখে ভেসে ওঠে, 'সেই ছক কাটা কাগজ- ডোবা, তালগাছ, ভাঙা কুঁড়ে একটা- সব যেন ঘুরতে ঘুরতে তালগোল পাকিয়ে ভেঙে দুমড়ে যায় আলোয় আলো এই শহরের রাজপথে।'[৯]

'বেয়ারা রাধাকান্ত' গল্পে দেখা যায় কলেজের অধ্যাপক এবং এক বেয়ারার কথোপকথন। রাধাকান্তের বেয়ারার চাকরির অল্প বেতনে পেট ভরে না। কাজেই চা, চিনি সরিয়ে কিছুটা মুনাফা করার চেষ্টা করে সে। কিন্তু হঠাৎই সে গল্পকথক অধ্যাপককে তাকে নিয়ে গল্প লিখতে বলে। সামান্য এক বেসরকারী কলেজের বেয়ারার মুখে এই কথা শুনে অধ্যাপক কিছুটা অবাক হন। পরে রাধাকান্তের মুখ থেকে শোনা যায় গতকাল তার অসুস্থ ছেলে মারা গেছে। অভাবের সংসারে ওষুধ বলতে ছিল কলের জলের সঙ্গে চিনির মিশ্রণ। এক বাবার করুণ আর্তি প্রকাশিত হয়েছে এখানে। নিজেকে সে খুনী বলেও আখ্যা দিয়েছে। এক বেয়ারার জবানীতে তার নিজের জীবন বিবৃত হয়েছে গল্পটিতে।

'নগরে প্রান্তরে' গল্প সংকলনের অন্তর্গত একটি গল্প হল 'ভেট জমি'। এই গল্পে অনঙ্গ চৌধুরীর দুবার বিয়ে, দুবার ডিভোর্স। সরকারি নির্দেশানুযায়ী পঁচিশ একরের বেশি জমি থাকলে তা সরকারের হবে। আর এই 'ভেট' বা ভেস্ট জমিগুলি বিলিয়ে দেওয়া হবে গরীব রায়তদের মধ্যে। কিন্তু অনঙ্গ চৌধুরীর পঁচিশ একরের বেশি জমি থাকলেও তার এক বিঘা জমিও ভেস্ট হল না। কারণ সম্পত্তি কৌশল করে বউদের নামে রেখে দেয় সে। ডিভোর্স ব্যাপারটিও সাজানো। শোষক শ্রেণির স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে গল্পটিতে।

সমালোচকের মতে, সুশীল জানা, "প্রকৃতই একজন সমাজ সেবকের মতো স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ভারতবর্ষের গ্রামবাংলার রূপ এবং স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের গ্রামবাংলার রূপ দেখেছেন, মননের টেবিলে ফেলে বিশ্লেষণ করেছেন, তারপর ভাষার ভাস্কর্যে শিল্পের তাজমহল বানিয়েছেন। এই কাজে তাঁকে সক্রিয় সাহায্য করেছে নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি।"[১০] সুশীল জানার গল্পে গ্রামজীবন, নগরজীবন, যাযাবর জীবনের কথা উঠে এসেছে। বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের উত্তাল সময়ে যখন মন্বন্তর, দেশভাগ, স্বাধীনতালাভের মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি ঘটছে, সেই সময়ের মানুষের অবস্থা, তাদের চিন্তা-চেতনার প্রকাশও লক্ষিত

হচ্ছে তাঁর ছোটগল্পে। সর্বোপরি তিনি মানুষের কথা বলেছেন। দৈনন্দিন জীবনের আপাত-তুচ্ছ ঘটনাগুলিও মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে।

তথ্যসূত্র :

১. সুমিতা চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘সুশীল জানার গল্পসমগ্র, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০১৯, পৃ. ৩৬।

২. তদেব, পৃ. ৮৩।

৩. সুপর্ণা, ৫৯ সংখ্যা, সম্পাদিকা নীলাশা দাস, মুরলীধর গার্লস কলেজ, ২০০৮, পৃ. ৪০।

৪. পূর্বোক্ত, সুমিতা চক্রবর্তী গল্পসমগ্র, পৃ. ১৬৯।

৫. তদেব, পৃ. ২২৭।

৬. অন্তর্মুখ, পর্ব-৬, সংখ্যা-২, শতবর্ষে সুশীল জানা, সম্পাদক, খোকন কুমার বাগ, ‘সাম্পান’, বাদশাহী রোড, ভাঙ্গাকুঠি, বর্ধমান, পৃ. ৩৩।

৭. পূর্বোক্ত, সুমিতা চক্রবর্তী, গল্পসমগ্র, পৃ. ৩০২।

৮. তদেব, পৃ. ৩০৭।

৯. তদেব, পৃ. ৩২৯।

১০. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ও জ্যোতিপ্রসাদ রায় সম্পাদিত, ছোটগল্প : বিকাশ, পরিণতি ও উপলব্ধি, সাহিত্য সঙ্গী, বামা পুস্তকালয়, ১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০৪, পৃ. ২৮২।

অতিমারির প্রেক্ষাপটে কবি কৃষ্ণরাম দাসের শীতলামঙ্গল

শুকদেব ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

সারাংশ: প্রাগানুধিক বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য ধারার মূল বিষয় ছিল- দৈব শক্তির মহিমা প্রচার । ভয় এবং বিস্ময় থেকেই মানুষ শরণাপন্ন হয়েছিল দেবদেবীর। এদেশে একটা সময় বসন্ত রোগ মহামারি আকার ধারণ করে। বসন্ত রোগ থেকেই মুক্তি পেতে মানুষ আরাধনা শুরু করে দেবী শীতলার । রচিত হয় দেবী শীতলার মঙ্গল গান। এই মঙ্গলকাব্যধারার আদি কবি কৃষ্ণরাম দাস।

সূচক শব্দ: মঙ্গলকাব্য, আতিমারি, মড়ক, বসন্ত, শীতলামঙ্গল, কৃষ্ণরাম দাস।

মূল আলোচনা:

বৈশ্বিক মহামারি বা অতিমারি বা সর্বমারি বলতে বহুসংখ্যক মানুষকে আক্রমণকারী কোনও রোগের একাধিক মহাদেশ বা বিশ্বব্যাপী একটি বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়াকে বোঝায়।মহামারি’র সঙ্গে বাঙালির পরিচয় আবহমানকালের। তবে বাঙালির কাছে তার নাম ‘মহামারি’ ছিল না, ছিল ‘মড়ক’। মহামারি এদেশের ইতিহাসে আর পাঁচটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মত বারে বারে নানাভাবে এসেছে। আদিম যুগ থেকেই বিভিন্ন সংক্রামক রোগ মহামারি রূপে বিস্তার লাভ করেছে। স্প্যানিশ ফ্লু, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, গুটিবসন্ত, কলেরা, হাম প্রভৃতি রোগ নানা সময়ে মহামারির আকার ধারণ করেছে। আসলে আমাদের সভ্যতা যত উন্নত হয়েছে, মহামারির প্রবণতা তত বেড়েছে। কারণ সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে জনসংখ্যার ঘনত্বও বেড়েছে পৃথিবীতে। ফলে যেকোন রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকিও তৈরি হয়েছে।

খ্রিষ্টপূর্ব ৪৩০ অব্দে বর্তমানের লিবিয়া, ইথিওপিয়া, মিশর এবং গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে ছড়িয়ে পড়েছিল এক ধরনের টাইফয়েড জ্বর। এই জ্বরে ওই অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মারা যায়। ৫৪১ খ্রিষ্টাব্দে মিশর থেকে পুরো পৃথিবীতে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে জাস্টিনিয়ান প্লেগ। এতে মারা যায় প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ। ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে ছড়িয়ে পড়া বুবোনিক প্লেগে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের মৃত্যু হয়েছিল। ১৬৬৫ সালে এই বুবোনিক প্লেগেই লন্ডনের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশের মৃত্যু হয়। ১৮৫৫ সাল চীন থেকে সূত্রপাত তৃতীয় প্লেগ মহামারি। পরে তা ভারত ও হংকংয়ে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় দেড় কোটি মানুষ এই মহামারির শিকার হয়েছিল।

১৮১৭ সালে কলেরা ছড়িয়ে প্রথম মহামারির শুরুটা হয়েছিল রাশিয়ায়। পরে তা স্পেন, আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, চীন, জাপান, ইতালি, জার্মানি, ভারত ও আমেরিকাতেও মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে। ওই সময় সারা পৃথিবীতে অগণিত

মানুষের মৃত্যু হয়। পরবর্তী সময় প্রায় দেড়শ বছর ধরে কলেরা বিভিন্ন সময়ে কয়েক দফা মহামারি আকারে দেখা দেয়। ১৮৮৯ সালে সাইবেরিয়া ও কাজাখস্তানে সূত্রপাত হয় রাশিয়ান ফ্লু'র। পরে তা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পরে। এই ফ্লুতে প্রায় সাড়ে তিন লাখ মানুষ মারা যায়। ১৯১৮ সাল স্প্যানিশ ফ্লুতে প্রায় ৫০ কোটি লোক আক্রান্ত হয়। আর এই মহামারিতে বিশ্বব্যাপী প্রায় পাঁচ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৫৭ সালে হংকংয়ে প্রথম এশিয়ান ফ্লু দেখা দেয়। এই ফ্লুটি দ্বিতীয়বার ছড়ায় ১৯৫৮ সালে। এতে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১১ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। **১**

বসন্ত Variola ও Varicella নামক ভাইরাসঘটিত সংক্রামক ছোঁয়াচে রোগ, যা ভ্যারিওলা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয় ।

এই ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে প্রথমে এক ধরনের গুটি বের হয় যা পরবর্তী সময়ে তিল বা দাগ (macules), কুড়ি (papules), ফোস্কা (vesicles), পুঁজবটিকা (pustules) এবং খোসা বা আবরণ (crusts) ইত্যাদি পর্যায়ের মাধ্যমে দেহে লক্ষণ প্রকাশ করে। সারা শরীরের ত্বকে এবং চোখে মারাত্মক ক্ষতের আবির্ভাব এই রোগের প্রধান উপসর্গ যা কখনও কখনও অন্ধত্বের কারণ ঘটায়। গুটিবসন্তের মহামারি ভারতীয় মহাদেশে বিশেষ বিশেষ ঋতুতে দেখা যেত। এক সময়ে এদেশে অসংখ্য মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে । অণুজীববাহিত সংক্রামক রোগের টিকা আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এই রোগের বিশাল অবদান রয়েছে যেহেতু ১৭৯৬ সালে গুটিবসন্তের বিরুদ্ধে এডওয়ার্ড জেনার সর্বপ্রথম টিকা আবিষ্কার করেন এবং তখন থেকেই সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে টিকা পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়। ক্রমাগত টিকাকরণের ফলে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে "হু" (WHO) পৃথিবী কে গুটি বসন্ত মুক্ত ঘোষণা করতে সক্ষম হয়েছে। **২**

যদিও জেনার সাহেবের বসন্ত টিকা আবিষ্কারের পূর্বেই ভারতীয় উপমহাদেশে বসন্ত রোগের লোকজ চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। আবু বকর মুহম্মদ ইবন জাকারিয়া অল রিজভি(৮৩৫ – ৯২৩খ্রি)র রচনা কিতাব অলজাদারি ওয়লহাসবা (On the variola and the measles) চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এতে প্রথম লিখিত রয়েছে গুটি বসন্তের বিভিন্ন উপসর্গ এবং তার নিদান। তবে চিনে এর আগেও স্পষ্টভাবে এই রোগের কথা লিখিত হয়েছে। ৩৪০ সনের অসামান্য বৈদ্যক কো হাং-এর চৌ হৌ পেই চি ফ্যাং (Handy therapies for emergencies) এবং ৫০০ সালে নতুন করে সম্পাদনা করেন থাও হাং চিং। অনেকের ধারণা ভারতই চিনের আগে টিকা দেওয়ার প্রচলন শুরু করে।

তবে টিকা দেওয়ার ইতিহাসের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে। কুর্ট পোলক (Kurt Pollack,. The Healers, the Doctor, then and now. English Edition. Pp. 37-8.) অতীতে ভারতে টিকা দেওয়ার প্রচলন ছিল বিষয়ে লিখছেন,

preventive inoculation against the smallpox, which was practiced in China from the 11th century, apparently came from India[আসলে বাংলা]। ৩

টীকা আবিষ্কারের ইতিহাস যায় হোক না কেন বঙ্গদেশে বসন্ত রোগের হাত থেকে মুক্তি পেতে মানুষ দেবী শীতলার আরাধনা শুরু করেছিল, যা আজও প্রচলিত রয়েছে। ফলে সেদিন সাধারণ মানুষের কাছে বসন্ত রোগ পরিচিতি পেয়েছিল 'মায়ের দয়া' হিসাবে। শুধু বঙ্গদেশেই নয়, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্রই বিভিন্ন নামে দেবী শীতলার পূজা হয়ে থাকে । শীতলা - আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিষ-চিকিৎসা প্রকরণে বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও রোগপ্রশমনকর্ত্রী দেবী । কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর এক অতি প্রাচীন শীতলা মন্দির আছে । ময়ূরভঞ্জ Archaeological Survey তেও কয়েকটি শীতলা মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। 'ভাব-প্রকাশ' ' এ বসন্ত রোগ হল- 'শীতলা' ।

'দেব্যাশীতলয়াক্রান্ত মসুর্যৈব হি শীতলা
জ্বরয়েচ্চ তথা ভূতাধিষ্ঠিত বিষমজ্বরঃ ।

অর্থাৎ "শীতলা দেবী কর্তৃক আক্রান্ত যে মসূরিকা তাহাই শীতলা নামে অভিহিত হইয়া থাকে । ভূতাধিষ্ঠিত বিষমজ্বর যেরূপ ইহাও তদ্রুপ জানিবে ।"

ভাব -প্রকাশের মসুরিকা চিকিৎসায় (২ য় খণ্ড ৪ র্থ ভাগ) শীতলা দেবীর স্তব বর্ণনায় বলা হয়েছে যে , স্কন্দ পুরাণের 'কাশীখণ্ড' থেকে এই শীতলাস্তব গ্রহণ করা হল। দেবী শীতলার পূজারীদের মতে - দেবীর বর্তমান পূজা বিধান পিচ্ছিলাতন্ত্র থেকে সংকলিত ও ধ্যান মন্ত্র স্কন্দপুরাণ থেকে গৃহীত। আসলে দেবী শীতলা লৌকিক দেবী ,পরবর্তীকালে বিভিন্ন পুরাণ এবং তন্ত্রে সংযুক্ত করে হিন্দু পৌরাণিক অভিজাত্য লাভের চেষ্টা হয়েছে। পিচ্ছিলাতন্ত্রে দেবীর ধ্যান এই প্রকার-

"ওঁ নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্ ।
মার্জন্যা পূর্ণকুম্ভামমৃতময় জলং তাপশান্ত্যৈ ক্ষিপন্তীম্ ।।
দিগবস্ত্রাং মূর্ধি শূর্পাং কণকমণিগণৈর্ভূষিতাঙ্গীং ত্রিনেত্রাম্ ।
বিস্ফোটাদ্যুগ্রতাপ প্রশমনকরীং শীতলাং তাং ভজামি ।। " **৪**

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেন বৌদ্ধ সমাজের 'হারীতী'-ই বাংলার লোক সমাজে দেবী শীতলা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন । অনিমেষকান্তি পাল মিশরের **'শেট'** দেবীর সঙ্গে শীতলার মিল খুঁজে পেয়েছেন । অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবী পর্ণশবরী'র সঙ্গে সাযুজ্য লক্ষ করেছেন । কেউ কেউ দেবী শীতলা কে দক্ষিণ ভারতের শীতলম্মার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছেন। তবে দেবী শীতলার স্বরূপ সম্পর্কিত আলোচনায় সকলেই দেবীর প্রাচীনতা নিয়ে সহমত পোষণ করেছেন ।

বাংলা এবং বাংলার বাইরে অধিকাংশ জায়গাতেই দেবী শীতলার পূজার পাশাপাশি দেবীর প্রশস্তিমূলক কথকতা, গান এবং লোকনৃত্যের প্রচলন আছে । এই

প্রশস্তিমূলক গান ই কালক্রমে কবির হাতে শীতলামঙ্গল কাব্য রূপে পরিণতি লাভ করে।

শীতলামঙ্গলের কোন কেন্দ্রীয় কাহিনি পাওয়া যায় না ।একাধিক কবি বিভিন্ন পালায় দেবী শীতলার আখ্যান কে নির্মাণ করেছেন। কবি কৃষ্ণরাম দাসের **শীতলামঙ্গল** কাব্যটি তিনটি পালায় বিভক্ত যথা- মদন দাস জগাতির পালা, কাজির পালা ও হৃষিকেশ সাধুর উপাখ্যান। তিনটি পালাতেই দেবী শীতলা কে বসন্ত রোগ মুক্তির দেবী হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে।

মদন দাস জগাতির পালা:

মুড়াঘাটের শুল্ক আদায়ের কাজ করে মদন দাস । বসন্তরায় ছলনা করবার জন্য ব্যাপারীর বেশে বিভিন্ন রোগে পণ্য সামগ্রীর আকার ধারণ করে মদন দাসের ঘাটে হাজির হলেন । বলদের পিঠে পণ্যসামগ্রীগুলি চাপিয়ে মদন দাসকে কিছু না বলে বসন্তরায় নদী পার হওয়ার চেষ্টা করতেই পাইক - পেয়াদা নিয়ে মদন দাস বসন্তরায়ের পথ আটকালেন । ফলে প্রথমে বচসা , তারপর উভয়পক্ষে গালাগালি শুরু হল । অবশেষে মদনের আদেশে পেয়াদা বসন্তরায়ের সমস্ত সামগ্রীগুলি লুট করে নেয়। সেসব জিনিস খাওয়া মাত্রই সকলে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইল । স্বয়ং মদন দাস রোগযন্ত্রণায় পরিত্রাহি ডাকতে শুরু করে-

কাতর মদন দাস কহে করপুটে ।
করিলাম অনেক দোষ তোমার নিকটে।।
কোন মহাশয় তুমি পরিচয় করো।
পূজিব চরণযুগ যদি ব্যাধি হরো।**৫**

মদন দাসের কাতর প্রার্থনা শুনে কৃপাপরবশ হয়ে পুনরায় বসত্তরায় হাজির হলেন আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন-

- শীতলার পুত্র আমি বসন্তঈশ্বর ।। **৬**

অবশেষে বসন্তরায়ের কৃপায় সকলে রোগমুক্ত হয়ে মহা - আড়ম্বরে শীতলার পূজা করল ।

কাজীর পালা:

স্বর্গে শীতলাদেবীর কানে গেল, সারা পৃথিবীতে কেবল দুইজন তাঁর পূজা করে না । একজন মুসলমান কাজী, অন্যজন উজানি নগরের রাজা চন্দ্রশিখর । প্রথমে শীতলাদেবী কাজিকে শিক্ষা দিতে উদ্যত হলেন । সমস্ত ব্যাধিকে হাজির করে বসত্তরায় কাজির পাড়া আক্রমণ করলেন । কাজির পাড়ায় হাহাকার পড়ে গেল । মানুষ - পশু সকলেই আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে, কেউ কেউ মারা যাচ্ছে । স্বয়ং কাজির অবস্থা হল অত্যন্ত শোচনীয় । প্রথমে জ্বরবান বৈদ্যের বেশে এসে ছলনা করে গেল , তারপর

ব্রাহ্মণ বেশে এসে রোগ সরিয়ে দিলে ব্রাহ্মণের উপদেশে রোগমুক্ত কাজি পরমভক্তিভরে শীতলার পূজা দিল -

এখন বুঝিলেম ভাবি   শীতলা পরম দেবী
পূজিব তাহার পদযুগ । **৭**

হৃষিকেশ সাধুর উপাখ্যান:

একদিন রাজসভায় হৃষীকেশ সাধুর ডাক পড়ল । রাজার শীতলাপূজা করবার খুব ইচ্ছা । সেজন্য হিরণ্যপাটন থেকে মাণিক আনার জন্য ঘরে বৃদ্ধ পিতামাতাকে রেখে সাধু হিরণ্যপাটন অভিমুখে যাত্রা শুরু করে । অনেক পথঘাট , বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সাধুর তরী মায়াদহে প্রবেশ করেলে শীতলা সমুদ্রের মাঝে পুরী নির্মাণ করে সাধুকে ছলনা করলেন । সেই ঘটনার কথা হিরণ্যপাটনে চন্দ্রশিখর রাজার কাছে বলে বিপদে পড়ল । অবশেষে সাধুর চৌতিশা স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে শীতলা সাধু কে মুক্তির জন্য প্রথমে রাজাকে স্বপ্নাদেশ দিলেন । কিন্তু রাজা স্বপ্নাদেশ না মানায় ব্যাধির দল নিয়ে রাজপুরী আক্রমণ করলেন । ব্যাধির যন্ত্রণায় রাজার চেতনা হল তখন সাধুকে মুক্তি দিয়ে তার সঙ্গে নিজের কন্যার বিয়ে দিলেন এবং সাধু নির্বিঘ্নে দেশে ফিরে এল। **৮**

একথা ঠিক যে- মানুষ, দেবতার পূজা সব যুগে সব কালেই নিজের প্রয়োজনে করে থাকে, দেবী শীতলার পুজোও মানুষ সেদিন করেছিল নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার দায় থেকেই। নাগরিক সমাজ প্রয়োজন ফুরোলেই ভুলে যেতে পারে কিন্তু গ্রামীণ সমাজ, সেখানকার সাধারণ মানুষ কৃতজ্ঞতাবশত তা ধরে থাকে সামাজিক ক্রিয়া কর্মে - যাপিত জীবনে । আর এই কারণেই আজও গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় পূজা পেয়ে থাকে দেবী শীতলা, আজও চামর দোলাতে দোলাতে গায়কের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় দেবী শীতলার গান- মায়ের গান।

তথ্যসূত্র :

১. বসন্ত থেমে গেছে, বাউরি বাতাস জেগে করোনাকাল, প্রতীক মাহমুদ, সারা বাংলা,১০ এপ্রিল ২০২০, sarabangla.net
২. উকিপিডিয়া- বসন্ত রোগ
৩. শুধু বসন্ত রোগ চিকিৎসা নয়, মধ্যবিত্ত বাঙালি ভুলে গিয়েছে নিজস্ব রোগ সারাবার পরম্পরা, বিশ্বেন্দু নন্দ, pagefournews.com, ১ মার্চ ২০২২
৪. বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, কলিকাতা বুক হাউস,১৩৪৬ পৃ: ৪৮৮
৫. কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, সম্পাদনা : শ্রী সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য , ক. বি ২০১১, পৃ: ২৫৬
৬. ঐ, পৃ: ২৫৬

৭. ঐ, পৃ: ২৬৩

৮. ঐ, পৃ : ২৮৫

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা:

১. বাংলার লৌকিক দেবতা, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

২. শীতলামঙ্গল সমগ্র , দশদিশি ৩৩ ও ৩৪ সংখ্যা,

৩. কোর , মহামারি সংখ্যা, শারদ ২০২০

ভগীরথ মিশ্রের 'চারণভূমি' : ভকত সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা

সুতনু দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
মেদিনীপুর সিটি কলেজ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : এযাবৎ উপেক্ষিত থাকা বিচিত্র পেশার সঙ্গে জড়িত মানুষদের উপন্যাসে অন্তর্ভুক্তিকরণ ঘটিয়ে সত্তর উত্তর বাংলা ঔপন্যাসিকেরা বাংলা উপন্যাসে এক পালাবদলের সূচনা করেন। এই সময়ের অন্যতম কথাকার ভগীরথ মিশ্র তাঁর 'চারণভূমি' (১৯৯৪) উপন্যাসে এমন এক সম্প্রদায়ের চিত্র অঙ্কন করেছেন যা বাংলা সাহিত্যে বিরল। ভেড়াচারোয়া ভকত সম্প্রদায়কে নিয়ে লেখা আলোচ্য উপন্যাসে ভকতদের ভ্রাম্যমাণ জীবন সংগ্রামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা ফুটে উঠেছে।

তৎকালীন বিহারের রাঁচি-হাজারিবাগ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-বর্ধমানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খোলা আকাশের নীচে সারাবছর ভেড়ার পেছনে বিচরণশীল ভকতদের 'থিতু' হওয়ার অবকাশ নেই। কিংবদন্তি অনুসারে, পুরাকালে পরশুরামের হাত থেকে বাঁচতে ভেড়াচারোয়া হয়ে তাদের যে পথ চলা শুরু হয়েছিল তা বংশ পরম্পরায় হয়ে আসছে। তাদের এই ভ্রাম্যমাণ যাযাবর জীবনে তারা অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। তবে সমস্ত প্রতিকূলতাকে দূরে সরিয়ে রেখে তারা এগিয়ে চলে নতুন কোনো ডেরার সন্ধানে। এইভাবে লোকালয় থেকে দূরে খোলা আকাশের নীচে, পাহাড়ে, অরণ্যে, বিস্তীর্ণ ধূ-ধূ সমভূমিতে আবহমানকাল ধরে বিচরণশীল ভকতদের জীবন-জীবিকার স্বরূপ উদ্ঘাটন হয়েছে এই উপন্যাসে।

সূচক শব্দ : সত্তর দশক, ভেড়াচারোয়া, ভকত সম্প্রদায়, যাযাবর জীবন।

মূল আলোচনা : কেবল দূর থেকে অনুধাবন নয়; বরং অন্ত্যজ জীবনের সান্নিধ্যে থেকে তাদের জীবনকথা নিয়ে যেসব সাহিত্যিক বাংলা শিল্প-সংস্কৃতির ধারাকে পুষ্ট করেছেন, তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ভগীরথ মিশ্র। সত্তর-আশির দশকে বাংলা সাহিত্যে পদার্পণ করে ভগীরথ মিশ্র তাঁর বেশিরভাগ গল্প-উপন্যাসে শিষ্ট সমাজ গণ্ডীর বাইরে অবস্থান করা ব্রাত্য সমাজের জীবনচর্চার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছেন। যা একান্তই তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার নির্যাস। পেশাসূত্রে বাঁকুড়ায় থাকাকালীন তিনি ভেড়াচারোয়াদের সংস্পর্শে আসেন। এছাড়া ভেড়াচারোয়াদের সম্পর্কে আরও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তাঁর জীবনানুসন্ধানী দৃষ্টি পাড়ি দেয় তৎকালীন বিহারের রাঁচি, হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চলে। সেই অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনী নিয়েই তিনি রচনা করেছেন 'চারণভূমি' (১৯৯৪) উপন্যাসটি। তৎকালীন বিহারের রাঁচি-হাজারিবাগ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-

বর্ধমান অঞ্চলে সারাবছর ভ্রাম্যমাণ ভেড়াচারোয়া বা মেষপালকদের জীবনচিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ধরা পড়েছে এই উপন্যাসে।

'চারণভূমি' উপন্যাস লোকালয় থেকে দূরে খোলা আকাশের নীচে, পাহাড়ে, অরণ্যে, বিস্তীর্ণ ধূ-ধূ সমভূমিতে গোঠ ভর্তি প্রায় হাজার দেড়েক ভেড়ার পেছনে চিরকাল বিচরণশীল ভেড়াচারোয়া 'ভকত' সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্যময় জীবন আলেখ্য। যাযাবর শ্রেণির এই ভেড়াচারোয়ারা আবহমানকাল ধরে বাংলা-বিহারের এক বিশাল এলাকা জুড়ে ঘুরতে ঘুরতে গাঁয়ের সরল, সাধারণ মানুষজনের সাথে স্বার্থবিহীন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। বিচরণশীল এই জীবনে ভকতদের কারোর কারোর মনে এক জায়গায় পাকাপাকি ভাবে 'থিতু' হওয়ার বাসনা জাগলেও তার উপায় নেই। কেননা, তারা ক্ষুধা, ঋণ, দায়বদ্ধতা প্রভৃতি হরেক রকমের শিকলে বন্দি। পুরাকালে পরশুরামের হাত থেকে প্রাণে বাঁচতে ক্ষত্রিয় জীবন ত্যাগ করে ভেড়াচারোয়া হয়ে তাদের যে পথ চলা শুরু তা বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। সেখানে 'থিতু' হওয়ার অবকাশ নেই। বছরের পর বছর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বাংলা-বিহারের বিশাল এলাকা জুড়ে গোঠ ভর্তি ভেড়ার পেছনে বংশ পরম্পরায় ছুটে বেড়ায় দাহো ভকত, রামনা ভকত, ভিখারী ভকতরা। গোঠের ভেড়াদের মতোই তাদের জীবনচক্র। যেমন গোঠের ভেড়ারা কোনোদিন গোয়ালের মুখ দেখেনি। তারা খোলা আকাশের নীচেই জন্মায়, সেখানেই মারা যায় কিংবা বিক্রি হয়ে যায়। তেমনি তাদের পেছনে ঘুরে বেড়ানো গোঠের ডেরোয়াহা দাহো ভকত, ম্যাড়াল রামনা ভকত, বাগাল ভিখারী ভকত, মুনসী ভকত, হাঁদু ভকতদের জীবনের পনেরো আনাই কেটে যায় গোঠে। উপন্যাসে ভকতদের এই জীবনচক্রের যে বৃত্তান্ত লেখক দিয়েছেন, সেখানে আমরা দেখতে পাই –

> "গোঠই তাদের ঘর-সংসার, ইহকাল-পরকাল। বিয়ে-সাদি একটা করে হয়ত যে-যার মুলুকে, ক্কচিৎ কদাচিৎ যায়ও ঘরোয়ালির কাছে, আণ্ডা-বাচ্চাও পয়দা হয়, কিন্তু এদের আসল সংসারটি গড়ে ওঠে ফাঁকা জমিনে, টাঁড়ে-টিঁপুরে, পাহাড়ে-জঙ্গলে। বছরে হয়ত এক-আধবার গেল মুলুকে, বিবি-বাচ্চার হাল-হদিশ নিয়ে এল, কিছু গেঁহু কিংবা জনার কিনে দেয়ে এল দু'এক মাসের মতো, ব্যাস, ওদের জীবনের বাকি অংশটি পড়ে থাকে গোঠে। ভেড়াদের পেছনে ক্ষয় হয়। ক্ষয় হয় রাস্তার কিনারে, পাহাড়ের ঢালে, রাঁচী থেকে পুরুল্যা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি...। আবার হুগলি থেকে রাঁচী, হাজারিবাগ, হাটিয়া, দুমকা...। জীবনচক্রে, ঋতুচক্রে এরা পাক খায় আজীবনকাল, বংশ পরম্পরায়।"১

রাসায়নিক সার নয়, বরং ভেড়ার মল-মূত্র জমিতে পড়লে পরবর্তী কয়েক বছর জমিতে সার দিতে হবে না। জমির উর্বরতার পাশাপাশি ফলনও হবে খুব ভালো। সম্পন্ন

গৃহস্থেরা তাই তাদের জমিতে কিছুদিনের জন্য ভেড়াচারোয়াদের ডেরা বাঁধতে বলে। জমিতে ডেরা স্থাপনের জন্য গোঠের মোড়লের সঙ্গে জমির মালিকের চুক্তি হয়। এসব কাজে গোঠের মোড়ল কে চতুর হতে হয়, অন্যথায় জমির মালিকেরা তাদের কম উপঢৌকন দিয়ে জমিতে ডেরা পাতিয়ে নেয়। চুক্তি শেষ হলে গোটা গোঠটাই আবার পাড়ি দেয় নতুন কোনো ডেরার সন্ধানে। এই ধারাবাহিক পরিক্রমা কেবল ভকত সম্প্রদায়েই নেই; দাহো ভকতের বাবা নন্দলাল ভকতের মতে, গোটা মনুষ্য সমাজটাই খাদ্য-বাসস্থান-কর্মের তাড়নায় 'জন্ম-যাযাবর'।

যেকোনো গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবনের মতো ভ্রাম্যমাণ এই গোঠেও প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব রয়েছে। সারাবছর নিরাপদে সমস্ত বিপদ থেকে বাঁচিয়ে গোঠকে নির্দিষ্ট পথে চালনা থেকে শুরু করে ডেরা বাঁধবার জন্য জমির মালিকের সঙ্গে চুক্তির দায়িত্ব থাকে গোঠের ম্যাড়াল রামনা ভকতের ওপর। গোঠের বাগাল মুনসী ভকত, ভিখারী ভকত, হাঁদু ভকত, হঠাৎ ভকতেরা সারাদিন ভেড়াদের চরিয়ে সন্ধ্যার মুখে গোঠে ফেরে। গোঠে ফিরেও তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। অসুস্থ ভেড়াকে বেছে পথ্য খাওয়ানো, তাদের ক্ষতস্থান পরিচর্যা করা, রাতের বেলা প্রত্যেক প্রহরে পালা করে জেগে থেকে ক্লান্ত ভেড়াগুলোকে ঘুম থেকে তুলে জমিতে মল-মূত্র ত্যাগ করানো সবই বাগালদের করতে হয়। সকালে বাগালরা বাঘা নিয়ে বেরিয়ে গেলে গোঠের ডেরোয়াহা দাহো ভকত সারাদিন ডেরা আগলে বসে থাকে। গোঠের মধ্যে প্রত্যেকে সমাজবদ্ধ ভাবে থাকলেও ভেড়া চরানো নিয়ে বাগালদের ভেতর একটা গুপ্ত প্রতিযোগিতা চলে। ভেড়াদের প্রিয় খাদ্য চাকোড় গাছের পাতা, যা খেলে তাদের শরীর-স্বাস্থ্য ভালো হয়। বাগালদের কাছে এই চাকোড় গাছের সন্ধান পাওয়া অনেকটা 'সোনার খনি'র সন্ধান পাওয়ার মতো। কালভদ্রে কোনো বাগাল এই চাকোড় গাছের ডালের পেলে সে সর্বদা সর্তক থাকত যাতে অন্য কোনো বাগাল তার এই আবিষ্কৃত 'সোনার খনি' তে এসে ভাগ না বসায়। কেননা, একসাথে থাকলেও প্রত্যেক বাঘার বাগালেরা চায় তাদের বাঘার ভেড়াগুলো যেন গোঠের অন্য বাঘার ভেড়াগুলোর থেকে স্বাস্থ্যবান হয়। স্বাস্থ্যবান ভেড়া দেখে গোঠের মালিক খুশি হয়ে হয়তো প্রয়োজনে তাদের বেতন বাড়াতে পারে। এই আশায় বাগালেরা রোজ ভেড়া নিয়ে দু-তিন ক্রোশ দূরবর্তী স্থানে পাড়ি দেয়। সারাবছর এইভাবে ভেড়াদের পেছনে ছুটতে ছুটতে ভেড়াদের সাথে তাদের একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভেড়াদের পেটের মধ্যেকার দূষিত মল পরিষ্কার করে তাদের ক্ষিধে বাড়ানোর জন্য মাসে অন্তত একবার তাদের খারি নুন খাওয়ানো হয়। এই প্রসঙ্গে ভকতদের সঙ্গে অবোধ ভেড়াদের আত্মিকতার এক টুকরো চিত্রের বিবরণ দিয়েছেন লেখক –

> "তারপরই বাগালরা বসে যাবে পৃথক পৃথক আলের ওপর, সঙ্গে রাখবে খারি-নুন, বদনায় জল, বসে বসে নিজের বাঘার ভেড়াগুলোকে নাম ধরে ডাকতে থাকবে একের পর এক। আয়, খাঁদি, শিংরি, ভোলি, আয়,

> কাজরি, লেংড়ি, আয়, আয়, হৌ-হৌ হুড়ুর...র...র। নির্দিষ্ট বোল আছে প্রত্যেক বাগালের, ভেড়ার কান তার বোলে অভ্যস্ত। ঐ বোল শুনে, আর খারি-নুনের লোভে ভেড়াগুলো একে একে চলে আসবে তার বাগালের কাছে। বাগাল তখন তাদের মুখে এক চিমটে খারি-নুন দিয়ে এক চোল জল দেবে মুখে।"২

আবার এই আত্মিকতার বিপরীত মেরুতে গিয়ে লেখক মানুষের লুঠ মনোবৃত্তির চিত্র অঙ্কন করেছেন ভেড়াদের 'মুড়করাই' করার প্রসঙ্গে। মাঘ মাসের শিরি-পঞ্চমীর দিন সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে পূজার আয়োজন করে আলের কিনারে পরমান্ন খেয়ে উৎসবের মেজাজে 'মুড়করাই' এর পর্ব শুরু হয়, যা গোটা মাঘ-ফ্লাগুন মাস ধরে চলে। শীতকালে 'মুড়করাই' করলে ভেড়ার দেহ থেকে যে পশম পাওয়া যায় তা বছরের অন্য সময়ের তুলনায় অনেক নরম হয়, যা বাজারে ভালো দামে বিক্রি হয়। তাছাড়া শীতের সময় ভেড়াদের শরীরে চর্বি জমে, চর্বিওয়ালা ভেড়ার কদর বেশি। তাই এই দু-মাসে ভেড়া বিক্রির আগে তাদের শরীর থেকে পশম ছেঁটে নিতে হয়। এইসব দেখে মুনসী ভকত ভাবে –

> "শীতের বিরুদ্ধে যুঝবার উদ্দেশ্যে উপরওয়ালা ভেড়াদিগের গায়ে পশম দিলেন। মানুষ কিনা কেড়ে নিল তা, গায়ের জোরে। এখন এই অবোলা জীবগুলো কি করে বাঁচে? সত্যি! কোনও বিচার নেই এই মানুষ জাতটার, কোন বিবেচনা নাই। পদিনা ভকত ঠিকই বলে, মানুষ হল লুঠেরার জাত। লুঠেরাবৃত্তি উয়ার রক্তে!"৩

আমরা জানি, বন্টনের বৈষম্যের কারণে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলেও সমাজের সকল মানুষ তাতে উপকৃত হয় না। এই উপন্যাসেও দেখা যায় যে ভেড়াদের থেকে শীতের সঙ্গে লড়াই করবার সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র কেড়ে নিয়ে ভকতরা গোঠ মালিকের মুখে চওড়া হাসি ফোটালেও তাদের যাযাবর জীবনে নতুনত্বের কোনো ছোঁয়া লাগে না। অবোধ ভেড়াদের মতো তাদেরও প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে যেতে হয় নিরন্তর। খোলা আকাশের নীচে রাঢ়ের রুক্ষভূমিতে গ্রীষ্মে তাদের লড়াই প্রচন্ড দাবদাহের সঙ্গে। আবার বর্ষায় তাদের আশ্রয় নিতে হয় কাছাকাছি কোনো পাহাড়ে। মূলত বর্ষাকালই ভকত জীবনের কাছে দুর্বিষহ সময়। সেখানে বেঁচে থাকবার জন্য তাদের রীতিমতো সংগ্রাম করতে হয়। সমতলে খাদ্যের বিলাসিতা না থাকলেও জমির মালিকের থেকে সিধেপাতি পাওয়া যায়, তাছাড়া দু-চার ক্রোশের মধ্যে দোকান-বাজারও মেলে। কিন্তু ঘোর বর্ষার দিনে এসব কিছুই পাওয়া যায় না। যেহেতু পাহাড়ে ক্ষেতি-জমিন নেই, তাই এই সময় তাদের মুড়ি, চিঁড়া, শুকনো চাল, বনের ফল-পাকুড়, কন্দ-মূল খেয়ে কোনোক্রমে টিকে থাকতে হয়। তাছাড়া পাহাড়ে বসবাসযোগ্য সমতল ভূমির অভাব, ঢালু ভূমিগুলি বর্ষায় আগাছায় ভরে ওঠে এবং তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে সাপ, বিছে, পিঁপড়ে সহ নানারকম

পোকামাকড় – যাদের কাছে ভকতেরা খুবই অসহায়। তবে এত প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও গোঠের মালিকেরা যখন গোঠের খোঁজখবর নিতে এসে গোঠে রাত কাটায় তখন ভকতরা যেন খানিকটা উৎসবের আমেজে মেতে উঠে। সেদিন তারা কিছু ভেড়াকে খাসি করে সেই অন্ডকোষগুলো ভালো করে তেল-মশলা দিয়ে রান্না করে ধোঁয়া ওঠা গরম ভাতের সঙ্গে সারিবদ্ধ ভাবে একসাথে বসে তৃপ্তির সহিত নৈশভোজ করে।

ভকতদের লড়াই কেবল প্রকৃতির সঙ্গেই নয়, তাদের লড়াই মানুষের সঙ্গেও। কেননা, শাসক-শোষকের দ্বন্ধে মানুষই সর্বদা শাসকশ্রেণির শীর্ষস্থানে রয়েছে। ভেড়া চরাতে গিয়ে তারা কখনও নিজেদের অজান্তে ফরেস্ট গার্ডদের হাতে ধরা পড়ে, আবার কখনও জমির মালিকই ভক্ষক সেজে বিনে পয়সায় তাদের কিছু ভেড়া ভেট হিসেবে নিতে চায়। তাছাড়া চোর-ডাকাতের উপদ্রব তো আছেই। তাই আসন্ন বিপদকে দূরে সরিয়ে রাখতে তারা সবার অলক্ষ্যে আবার পাড়ি দেয় অন্য কোনো স্থানে। এইভাবে খোলা আকাশের নীচে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বছরের পর বছর চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে বসবাস করতে করতে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কারের বীজ প্রস্ফুটিত হতে থাকে। ফলে-

> “তারা কথায় কথায় পুজো লাগায়, মানসিক করে, অশুভ শক্তিগুলিকে তুষ্ট করবার জন্য হরেক কিসিমের টোটকা, মন্ত্র, তেলপড়া, জলপড়া, এসব তাদের দৈনন্দিন আচারের মধ্যেই পড়ে। চারপাশে আকাশ-বাতাস, গাছপালা, পশু-পাখির মধ্যে অশুভ লক্ষণগুলি আবিষ্কার করে, পড়তে চেষ্টা করে জল-স্থল-আকাশের দুর্বোধ্য সঙ্কেতগুলিকে।”৪

ঘর-সংসার ছেড়ে বংশ পরম্পরায় এভাবে চলতে চলতে ভকতরা নিজেদের মুলুকে কোনো উৎসব পার্বণে সামিল হতে পারে না। তবুও তাদের এই যাযাবর জীবনে তারা খুবই সাধারণ ভাবে ছট পরব করে, রামনবমীর ব্রত পালন করে, বুটের ছাতু ভক্ষণ করে পয়লা বৈশাখের সাতোয়ান পরবে সামিল হয়ে নিজেদের বিশ্বাস-সংস্কারকে লালন করে চলেছে ভিন্ন মুলুকে এসেও।

ভকতেরা মূলত রাঁচি, হাজারিবাগ, গয়া, আরা জেলার বাসিন্দা হলেও বিগত কয়েক দশক ধরে তাদের একটি অংশ বাঁকুড়ার লোকপুরে বাস করছে। সাতের দশকের নানা অভিঘাত গ্রাম বাংলার চেনা চরিত্রের যে বদল ঘটিয়েছিল, তা এড়িয়ে যেতে পারেনি বাঁকুড়ার লোকপুরের ভকতপাড়া। কমিউনিস্ট সরকার থাকায় সবাই সরকারি রেটে মজুরি চায়, সুযোগ-সুবিধা চায়। ফলে এদের দিয়ে গোঠ মালিকের চলে না। তারা বিহার মুলুকের ভেড়া-চারোয়া চায়। যারা কষ্টসহিষ্ণু আর ভরসাযোগ্য হয়। অন্যদিকে শহুরে আধুনিকতা বাংলার গ্রাম জীবনে প্রবেশ করায় বাঁকুড়ার ভকতপাড়ার নতুন নতুন বাগালদের কারোরই ভেড়াদের প্রতি কোনো মমত্ববোধ, মালিকের প্রতি প্রভুত্ববোধ থাকে না, তারা কেউই ভেড়াকে আর খাসি করতে চায় না। সর্বোপরি, বংশ

পরম্পরায় চলে আসা ভেড়াচারোয়াদের ভ্রাম্যমাণ জীবন তারা আর বহন করতে চায় না। লেখকের ভাষায় তারা 'বাবু বাগাল'। যারা শহুরে আদবকায়দার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারা অন্য বৃত্তি গ্রহণ করতে চায়, পাকাপাকি ভাবে ‘থিতু’ হতে চায়। ঘর-সংসার করতে চায়। কিন্তু সবাই ভকত জন্মের বিধিলিপি খন্ডন করতে পারে না। বিহার মুলুকের মুনসীও পারেনি। রুকমিনিয়ার “মুলুক ছোড়কে মাৎ যাঈহ মুনসী, ইঁহা ঠাহার যা, মৎ যাই হ”৫ এই মিনতি সত্ত্বেও গোঠের মালিক শ্রীকৃষ্ণ ভকতের থেকে বাপ ভিখারী ভকতের নেওয়া কর্জের বোঝা কমাতে বাধ্য হয়েই মুনসী পা বাড়ায় এই যাযাবর জীবনে।

উপন্যাসে ভকতদের এই ভ্রাম্যমাণ যাযাবর জীবন চিত্রণ করতে গিয়ে লেখক আয়ত্ত করেছেন তাদের কথ্য ভাষাকে। বর্ণনা, সংলাপের ভাষা থেকে শুরু করে উপন্যাসে ব্যবহৃত গানে লেখক ভকতদের আদি বাসস্থান রাঁচি, হাজারিবাগ, গয়া অঞ্চলের ভাষা ব্যবহৃত করেছেন। পদিনা ভকতের গলায়-

“ভাগকে পিঁজড়া মে আদমি রহেলা
লুহা কা পিঁজড়া মে চিড়িয়া,
তো ভি আদমিলোক শোচ লেত বা
বাঁধ লেঙ্গে স্বরগ কা সিঁড়িয়া....। ” ৬

গানে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখকের সদা সচেতন দৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

সবশেষে বলা যায়, ভগীরথ মিশ্র তাঁর ‘চারণভূমি’ উপন্যাসে নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনাদর্শ দিয়ে এমন এক সম্প্রদায়ের জীবনচর্যাকে তুলে ধরেছেন, যা আধুনিক সমাজে লালিত হওয়া অনেকের কাছে অজানা ছিল। ভকত সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা নিয়ে গোটা একটা উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে এর আগে রচিত না হওয়ায় ‘চারণভূমি’ উপন্যাস পাঠকালে পাঠকেরা ভকতদের জীবনচর্যার অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকের পরিচয় পেয়েছে এবং উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সুন্দর, সাবলীল বিন্যাসের উপর ভর করে বিচরণ করেছে ভকতদের অন্তঃপুরে।

তথ্যসূত্র :

১. মিশ্র ভগীরথ, 'দুটি উপন্যাস : চারণভূমি/জানগুরু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৪৫
২. তদেব, পৃ. ৯৫
৩. তদেব, পৃ. ১৫৯
৪. তদেব, পৃ. ২৩
৫. তদেব, পৃ. ১৫
৬. তদেব, পৃ. ৪২

বিমূর্তে মূর্ত যাপন: সংযোগের অনুভূতি বিচ্ছিন্নতায়

শুভদীপ মুখার্জী
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ,
গভর্মেন্ট জেনারেল ডিগ্রী কলেজ মানবাজার-২, পুরুলিয়া

সারাংশ (Abstract): বাস্তব-অবাস্তব বা মূর্ততা- বিমূর্ততা এসবের সাথে সকলেই আমরা কমবেশি পরিচিত। যেখানে গাঁজাখুরি, উদ্ভট কথা, ইত্যাদি অবাস্তবতা মাত্র। বছর কয়েক আগেও ঘুড়ি ওড়ানো, খোলাংকুচি খেলা, কাগজের নৌকা ভাসানো, বা কাদামাঠে ক্রিকেট খেলা, ছিল বাস্তবের মাঝে; কিন্তু আজ তা যেন বেচেঁ রয়েছে অবাস্তবের বাস্তবতায়। যেখানে পড়াশুনা, খেলা, গল্প হয় ডিজিটাল স্ক্রিনে। যেখানে বৈভব আছে, যুক্তি আছে কিন্তু সময়ের অবকাশ নেই! জীবন যাপিত হয় রঙিন প্রোগ্রামিং এর ভাষায়। মানুষ অর্থের ডিজিটাল ওঠানামা তেই তৃপ্ত! ব্যক্তিগত জীবনেও তাই! জন্মদিন, বিজয়ার বা ঈদের শুভেচ্ছা এমনকি জামাইষষ্ঠী পালনেও মুঠোফোনের দাপাদাপি। মিটিং-মিছিল হোক বা প্রতিবাদের ভাষা, বা দুর্নীতি হোক বা বঞ্চনার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা বিবৃতি গুলি ঘোরে শুধু ডিজিটাল স্ক্রিনের উপরিপর্দায়। শিক্ষাতেও বিমূর্ততার রাজত্ব- ডিজিটাল স্টাডির রমরমা! এসবের মাঝেও মানুষের একটি জীবন রয়েছে, যেখানে সে বড় হয়ে ওঠে, লড়াই করে প্রতিদিন বিভিন্ন সংগ্রামের বিরুদ্ধে। প্রশ্ন এই হতাশা কাটিয়ে আশার আলোকবর্তিকার সন্ধান দেবেন কে? দিলেও কিভাবে? মানব যেখানে যন্ত্র, সেখানে (বি)মূর্তের মূর্ততা প্রাপ্তি ঘটবে কি ভাবে?

মূলশব্দ (Key Word): বাস্তব-অবাস্তব (মূর্ত/বিমূর্ত), বাস্তব, অবাস্তব, ডিজিটাল স্ক্রিন, বৈভব, যুক্তি, অবকাশ, সোশ্যাল, সোসাইটি, সোশ্যাল মিডিয়া, বিমূর্ত পরিসংখ্যান, জীবন, লড়াই, সংগ্রাম, আশার আলোকবর্তিকার সন্ধান, মোবাইল ফোন, শৈশবের পা, সবুজ ঘাসের স্পর্শ, আদান-প্রদান,, (বি)মূর্তের, মূর্ততা প্রাপ্তি ।

মূল আলোচনা (Discussion):

বাস্তব-অবাস্তব (মূর্ত/বিমূর্ত) শব্দ যুগলের সাথে আমরা সকলেই কম বেশি পরিচিত। গাঁজাখুরি বকিস না তো, যতসব উদ্ভট কথা! 'গাজাখুরি', 'উদ্ভট' নিছকই সেখানে অবাস্তবতা মাত্র। বৃষ্টি-বাদলের স্যাঁতস্যাঁতে কাদামাখা মেঠো পথে, তাল কুড়িয়ে ঘরে ফেরা, বাস্তবের বাস্তব চিত্র। বাস্তবের সে পথে আমরা ছোট থেকে বড় হই - সুখ দুঃখের ডালি নিয়ে। মানুষ আসে, মানুষ যায়, সমাজ, সভ্যতা এগিয়ে চলে; পুরানো খোলস ছাড়িয়ে নতুন মোড়কের সন্ধানে! আর আঙ্গুলের ছাপে, দোয়াতের কালিমাখা পেন নিয়ে যখন গল্পের ভাবনা শুরু হয়, তখন পেনের অভিমুখ পশ্চাৎ গমন ধারণ করে আমাদের নিয়ে যায় সেই খোলসের অতীতে, যেখানে ঘাসের উপরে শিশিরবিন্দু স্পর্শমাখা খালি পা নিয়ে ঘুড়ি ওড়ানো, বা খোলাংকুচি খেলা, কাগজের নৌকা বানিয়ে

জলে ভাসানো, ধুলোমাখা শরীরে কাদামাঠে ক্রিকেট খেলা, বর্ষার অগুনতি বারি-বিন্দু বর্ষণের মাঝে পায়ে ফুটবল নিয়ে এগিয়ে চলা! এসবই ছিল বাস্তবের মাঝে; এখনো তা রয়েছে অসীম আনন্দের অতীত স্মৃতিরূপে। আজও ছেলেমেয়েরা বাস্তবেই বড় হয়, কিন্তু অবাস্তবের বাস্তবতায়। তারা খেলা করে, গল্প করে, পড়াশোনা করে ডিজিটাল স্ক্রিনে চোখ মেলে। কর্ম আর রোজগারের এই ইঁদুর দৌড়ে সে বড় হয়, কথা বলে তার প্রতিষ্ঠিত অফিসার বাবা বা কর্মমুখর মায়ের সাথে। তাদের গল্প ও সাক্ষাৎও হয়, তবে বাস্তবের ভাব আদান-প্রদানে নয়; অবাস্তবতার বাস্তবের ডিজিটাল স্ক্রিনের মুখোমুখি আলাপচারিতা-য়। বড় হয়ে ওঠার এই অবাস্তবতার ডিজিটাল স্ক্রিন আর যান্ত্রিকতার মধ্যে, কখন যে সে নিজেই যান্ত্রিক হয়ে পড়ে সে নিজেও অবগত থাকে না বরং অবাস্তবতা তাকে বাস্তবে যান্ত্রিক জীবন উপহার দেয়, যেখানে অবাস্তব জীবনকেই সে বাস্তব জীবন রূপে বরণ করে নিয়ে অভ্যস্ত হতে থাকে এক বির্মূর্ত জীবন যাপনে।

সভ্যতা এগিয়েছে প্রযুক্তিতে, বৈভবে, গতিতে। আমাদের অতীতে হয়তো এত গতিময়তা ছিল না, এত বৈভবতা বা প্রযুক্তির দাপাদাপিও সেখানে বেশ কমই ছিল। ঘড়ির কাটার সেই অতীতের সেকেন্ডের যে গতি ছিল, আজও সেই গতিই একই রয়েছে কিন্তু সমাজ ও মানুষ গতি বাড়িয়েছে। এখন তার বৈভব আছে, যুক্তি আছে কিন্তু সময়ের অবকাশ নেই! একদিন সে সোশ্যাল হয়েছিল সোসাইটি বানিয়ে, আজও সে সোশ্যাল; তবে সোসাইটিতে নয়, সোশ্যাল মিডিয়ায়! অতীতে অতিথিদের আনাগোনা ছিল, পুজো বা উৎসবের কোন একদিনে আনন্দ হত বাস্তবের মাটিতে, সেখানে সামনের মানুষটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুটো সুখ-দুঃখের কথা আদান-প্রদানের সময়ের অবকাশ ছিল অনেক বেশি। এখনো মানুষ বাস্তবে আনন্দ করে, কিন্তু আনন্দের আনন্দ অনুভব এর থেকে, আনন্দের আনন্দ ক্যামেরাবন্দি করে রাখাই তার প্রধান অভিপ্রায় হয়ে দাঁড়ায়। বাস্তব পেরিয়ে, বর্তমান পেরিয়ে, যখন কোন একদিন অতীত হয়ে যায় সবকিছু, তখন সে নিজেকে খোঁজে বহু দণ্ডায়মান মুখের মাঝে! নিজের মুখটা জুম করে অনুভব করে অতীত মুহূর্তের আনন্দ, এক কৃত্তিম অনুভবতায়! যৌথ পরিবার গুলো ভেঙে কবে একক পরিবারের রূপ নিয়ে নিয়েছে, যৌথ আনন্দ গুলো ভেঙ্গে কবে একক আনন্দের রূপ নিয়েছে, যৌথ ভাবনা গুলো ভেঙ্গে কবে একক ভাবনার রূপ কবে নিয়ে নিয়েছে, আমরা কেউ বলতে পারবোনা। এখন ছেলেরা বড় হয়, পিতা-মাতারা বৃদ্ধাশ্রমে কাটায়, আর কৈশোর, যৌবনের জীবন যাপিত হয় ফেসবুক, হোয়াটস্ অ্যাপ বা ইনস্টার রঙিন প্রোগ্রামিং এর ভাষায়। যেখানে প্রতিটি মুহূর্তের সূক্ষ্মতম মুহূর্ত ও অনুভূতি গুলিও তার ক্যামেরাবন্দি থাকে, ফুটে ওঠে, প্রকাশ পায় হাজারো তালুর ডিজিটাল স্ক্রিনে। যেখানে একটি লাইক প্রাপ্তিতে তার আনন্দ, একটি কুৎসিত মন্তব্যে তার অবসন্নতা। প্রচুর বন্ধু তার, কিন্তু অবসাদের চরমতম পর্যায়ে এসে, চরমতম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, বাস্তবের বাস্তবতায় সে কাউকে পায় না; নিজের মধ্যে অন্তঃসারশূন্য এক শূন্যতা ছাড়া।

আমরা নিজের অজান্তেই যেন কোন না কোনভাবে মূর্ত বা বাস্তব জগত থেকে, কোথাও না কোথাও নিজেদের একটা বিমুর্ত জগতে ঠেলে দিচ্ছি। এবং প্রতি মুহূর্তে তার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি, যেখানে জীবন ঘুড়ির লাটাইটা যেন বিমূর্তের একান্ত হস্তগত। এমন মানুষও রয়েছেন যারা টাকা বাড়িয়েই চলেছেন নিরন্তর - ব্যাংক ব্যালেন্সের অর্থগুলির ভার্চুয়ালি কয়েকটি সংখ্যা ওঠানামা দেখেই তারা তৃপ্ত! জীবনশৈলীর কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে, কেবল অর্থ সংখ্যার ডিজিটাল ওঠা নামাতেই তাদের তৃপ্তি ও জীবন ধন্য হয়। এভাবেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন, যেখানে কোথাও তিনি অর্থের ব্যক্তিগত, পরিবারগত বা সমাজগত কাজে লাগানোর প্রয়োজন বোধ করেন না! বিপুল অর্থের বিমূর্ত পরিসংখ্যান ডিজিটাল স্ক্রিনে দেখেই তার সন্তুষ্টি, বাস্তবের খরচের তালিকাটি শূন্যে রেখেই তিনি দেহ ত্যাগ করেন!

মিটিং-মিছিল বা প্রতিবাদের ভাষা গুলিও আজ বাস্তবের মাটি ছাড়িয়ে বিমূর্ততা লাভ করেছে। যেখানে দুর্নীতি, বঞ্চনা, নির্যাতন, অব্যবস্থা বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে কোটি কোটি বিবৃতি ডিজিটাল স্ক্রিনের উপরিপর্দায়। আর ফরওারডের মাধ্যমে তা শুধু ঘুরতে থাকে এক স্ক্রিন থেকে অন্য স্ক্রিনে। অপরাধ-অপরাধী, দর্শক-শ্রোতা, শোষিত-শোষক, বিচারকর্তা, লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষক-অধ্যাপক, শিল্পী সকলের কাছেই তা ঘুরে বেড়ায় কিন্তু থেকে যায় বিমুর্ত রূপেই। মূর্ত হয়ে তা কখনো বাস্তবের মাটিকে পরিবর্তন করেনা! মানুষ এই বিমুর্ত জীবনকেই যাপন করে, সে এসবই অভ্যস্ত, সন্তুষ্ট, ও পরিতৃপ্ত! তাই শোষণ বা অপরাধ বা অন্যায় দেখে সে আর অবাক হয় না, বরং তৈরি করে কল্পকাহিনী, ব্যঙ্গ বা কৌতুকরুপী বিদ্রূপাত্মক ভাষা। আর এক স্ক্রিন থেকে অন্য স্ক্রিনে পাঠিয়ে, নিজ চেতনের বিমূর্ত জগতে নিজেকে মূর্ত প্রতিবাদী রূপে অনুভব করেই তার প্রশান্তি। তাই বাস্তবের মাটিতে আমরা আর মূর্ত আচরণ করি না, খুব বেশি হলে একটা ছবি বা ভিডিও বা চারটি কষ্টসাধ্য চারটি লাইন লিখি, যদি একটু ভাইরাল হয়!

ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রেও তাই! আমরা জন্মদিনে কেকের ছবি পাঠিয়ে উইশ করি, পুরানো ছবি পোস্ট করে অভিনন্দন জানাই, মুঠোফোনেই ঈদের শুভেচ্ছা বা বিজয়ার প্রণাম জানাই ও আশীর্বাদ গ্রহণ করি। আর অবসরের তীব্র সময় অভাবে, ব্যস্ততার চরমতম রূপে জামাইষষ্ঠীও পালিত হয়- মুঠোফোনের স্ক্রিনে চারটি কোণের দৃশ্য কলিংএ; জামাই, বধু, শ্বশুর-শাশুড়ি ভার্চুয়াল উপস্থিতির মাধ্যমে। পরে তা স্ক্রিনশট রূপ দেহ লাভ করে, এবং স্ট্যাটাস বা সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট রূপে দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে প্রাণ প্রতিষ্ঠা পায়। পরে লাইকস, কমেন্টস, শেয়ার বা দৃশ্য সংখ্যার বৃদ্ধিতেই জামাই বা নববধূর অপার-আনন্দ অনুভবের ডালি পূর্ন হয়!

শিক্ষাকেই বা বাদ-দি কি করে! সেখানেও বিমূর্ততার রাজত্ব! ক্লাসরুম স্টাডিজ এর স্থানে এখন তো ডিজিটাল স্টাডির রমরমা! ছাত্র-শিক্ষকের ব্যক্তিগত স্নেহ সমন্বিত ভাবের আদান-প্রদানের সেই মূল্য শিক্ষার পরিবর্তে, স্যাটেলাইট, কেবেল বা অন্তর্জালিক

ডেটার মাধ্যমে বিমূর্ত শিক্ষা প্রবেশ করে চলেছে ঘরে ঘরে। পরীক্ষা পদ্ধতিও ডিজিটাল, মূল্যায়ন পদ্ধতিও ডিজিটাল! মার্কশিটও ডিজিটাল! এভাবেই মুহূর্তের বিচ্ছিন্নতায় যাপিত বিমুর্তের সংযোগানুভূতি; বিমূর্তের প্রতীকে সেখানে মূর্তের মূর্ততা প্রাপ্তি! মূর্তের বিচ্ছিন্নতায় বিমূর্তের যাপন; বিমুর্ত শুধু সেখানে মূর্তের প্রতিচ্ছবি মাত্র!

এসবের মাঝেও মানুষের একটি জীবন রয়েছে, যেখানে সে বড় হয়ে ওঠে, লড়াই করে প্রতিদিন বিভিন্ন সংগ্রামের বিরুদ্ধে। যেখানে বাসে ভিড়ে ঠাসা মানুষের মাঝে বা রেলের কোন এক ফাঁকা বগির কাঠের চেয়ারে জানলার ধারে বসে, তার কঠিন সংগ্রামের-কষ্টানুভূতি,অবসাদ ও বিষন্নতাগুলি ডিজিটাল স্ক্রিনে ফুটে ওঠে না। সেগুলো শোনার ও সমব্যাথী হওয়ার মানুষও তার থাকে না তার পাশে! তাই তার বাহ্যরূপ প্রচ্ছন্ন খুশিতেভরা, আনন্দময় রূপে অবভাসিত হলেও, সেই খোলসের ভিতরে বাসকরা তার সন্তোষহীন মনন যখন অবসন্নতার অন্তিম সহ্যসীমানা অতিক্রম করে আশা-নিরাশা ও বাঁচার সকল পথকে অবরুদ্ধ বলে মনে করে, তখন বাস্তবতা তাকে আর বাঁচতে শেখায় না বরং ঠেলে দেয় এক অকল্পনীয় কঠোরতম আত্মহননের সিদ্ধান্তে- ''মৃত্যুর 'ভ্রমিত-শান্তির' জগতে''!

কিন্তু এ তো গেল হতাশার কথা! এখন প্রশ্ন আশার আলোকবর্তিকার সন্ধান দেবে কে? দিলেও কিভাবে? পিছিয়ে যাওয়ার তো কোনো সুযোগ নেই! এই জটিল যন্ত্র ব্যবস্থাতেই বেঁচে থাকতে হবে। কিন্তু এসবের মধ্যেও ট্যাব, কম্পিউটার বা হাতের সেলফোনের বাইরে জীবনকে একটু উপলব্ধি করতে হবে। কবির কবিতা বা গান, গল্প, বা উপন্যাসেও উপমা থাকে - সেখানে কোথাও আনন্দের অভিব্যক্তি, বা কোথাও কঠোর শ্লেষে চরিত্র বা বিষয় হয়ে ওঠে জীবন্ত। তাই সাহিত্যের রূপকেও বিমূর্ততা থাকে, কিন্তু সেই বিমুর্ততার আপন মূল্য রয়েছে। সকল কিছুরই একটা নিজস্ব মূল্য থাকে, সেটা থাকাও স্বাভাবিক আর সাহিত্য সমাজেরই দর্পণ, যে আরশিতে আপাত বিমুর্ত গল্প বা চরিত্র আসলে মূর্ত সমস্যার প্রতিই আলোকপাত মাত্র! চিত্র পরিচালক তো মনের আঙিনার রূপরেখায় তার মত করে একটা ছবি তৈরি করেন। তাতেও তো একটা বার্তা থাকে, যা কোন না কোন ভাবে কিন্তু জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। চিত্রশিল্পীও আপন তুলির স্পর্শে, প্রতিবাদী রূপক আলেখ্যের মাধ্যমে প্রতিবাদ করেন। এই সকল নান্দনিকতায় বিমূর্তের মধ্যে মূর্তের প্রতি তাদের দৃষ্টি থাকে, যেখানে তাঁরা জীবনকে বাস্তবের মাটিতে রাখেন এবং অবলোকন করেন। এভাবে বিমুর্ত আঁখিরও মূর্ততা প্রাপ্তি সম্ভব!

তাই যন্ত্রের নিয়মকে জীবনে না বেঁধে, জীবনের দৃষ্টিতে যন্ত্রকে সাথে রেখেই ভার্চুয়াল আসক্তির বেড়া ভেঙে জীবনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভাবতে হবে মোবাইল ফোনে মাথা, চোখ বা আঙুল রেখে নয়, বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতের শৈশবের পাগুলি যেন সবুজ ঘাসের স্পর্শ পায়। পরিবারের সাথে, রাতের ডিনার টেবিলে অন্তরে জাবর

কাটা কষ্টগুলোর যেন একটু অন্তত পারস্পরিক আদান-প্রদানের সুযোগ থাকে। আর মূল্যবোধের শিক্ষাটিকেও শৈশব, কৈশোর, যৌবনে স্থান, কাল, পাত্রসাপেক্ষে জীবন ও মনোনয়নের সাথে যুক্ত করতে হবে, তাহলেই হয়তো (বি)মূর্তের মূর্ততা প্রাপ্তি ঘটতে পারে!

অদ্ভুতময়তায় আবিষ্ট চেতনা: প্রসঙ্গ রবীন্দ্র ছোটগল্প

বিশ্বজিৎ সাউ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গনে আধুনিক ছোটগল্পের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিনৈপুণ্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছে। তাঁর রচিত অধিকাংশ ছোটগল্পগুলির মধ্যে কবিত্বময়তা ও গীতিধর্মিতার স্পর্শানুভূতি রয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সহস্র তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনার আবর্ত, মনের চঞ্চলতা, দ্বন্দ্ব, কল্পনানুভূতির সূক্ষ্ম ভাবরস তাঁর গল্পগুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর কতগুলি গল্পে মানব মনের অবচেতনে ক্রিয়াশীল বিক্ষেপের প্রতিফলনও দেখতে পাই। সাধারণত যে সমস্ত ঘটনাগুলি আমদের স্বাভাবিক জীবন প্রবাহের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না বা সচরাচর ঘটে না সেই সমস্ত বিষয়গুলিকে অদ্ভুত রূপে কল্পনা করে থাকি। এই সমস্ত আকস্মিক, বিস্ময়কর, অসাধারণ ঘটনা দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশ অদ্ভুতময়তার সীমাকে ছুঁয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নির্বাচিত কয়েকটি ছোটগল্পের মধ্যে যেগুলিতে অদ্ভুতময়তার লক্ষণ রয়েছে সেগুলির আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সূচক শব্দ: অতিপ্রাকৃত, ভৌতিক, মোহ, রোমাঞ্চ, কঙ্কাল, অদ্ভুত

মূল আলোচনা:

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার দ্বারা তৈরি হয়ে যায় নি। দীর্ঘকাল যাবৎ ধীরে ধীরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমে আবর্তিত হয়ে আজকের পৃথিবীতে পরিণত হয়েছে। তবে কিছু কিছু জিনিসের উদ্ভব সম্পর্কে অনেক অলৌকিক কল্পনা প্রচলিত রয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতির অপার সৃষ্টি সমুহের মধ্যে কিছু কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা আমদের মনের মধ্যে অবস্থিত যুক্তির ভিতকে নাড়িয়ে তোলে। এই যুক্তির ভিত আবার ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন ধরণের হয়। সমাজে অবস্থিত মানুষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুটি দিক রয়েছে। বাইরে থেকে ঘটে যাওয়া ক্রিয়াকলাপ আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। কিন্তু মানুষের মনের ভেতরের ঘটে যাওয়া চেতনার স্রোতের খবর উপলব্ধি করতে পারিনা। কেবল কল্পনাশক্তির দ্বারা অনুভব করি মাত্র। এছাড়াও মনের অবচেতনার গহীন স্তরে নানারূপ অদ্ভুত, অসাধারণ বিষয়ের খেলা চলে প্রতিনিয়ত। যা মানুষের বাইরের জগৎকেও প্রভাবিত করতে সক্ষম। রবীন্দ্র ছোটগল্পগুলির মধ্যে যেগুলির কাহিনীতে মানবমনের মগ্নচৈতন্যের আকস্মিকতা ও অদ্ভুতময়তার নিদর্শন রয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করলাম।

'জীবিত ও মৃত' ছোটগল্পটি ১২৯৯ বঙ্গাব্দে সাধনা পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এই ছোটগল্পে মরা মানুষের জীবিত হয়ে ওঠা ও তার ফলে সৃষ্ট নানা অদ্ভুত ঝামেলার কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। রানীহাটের জমিদার শারদাশংকরের ভাইয়ের স্ত্রী হলেন বিধবা কাদম্বিনী। কাদম্বিনী সহায় সম্বলহীন ছিলেন।তাই তার ভাশুরের সংসারের ছোটছেলের দেখাশোনা করে বড়ো করার দায়িত্ব পান। কারণ শারদাশংকরবাবুর স্ত্রীর ছোটছেলে হওয়ার পর রোগভোগে পড়েন। সেই খোকা কাদম্বিনীর অতি স্নেহভাজন ছিল। একদিন শ্রাবণ মাসের রাতে বিধবা কাদম্বিনীর মৃত্যু হয়। শারদাশংকরবাবু বিশেষ আয়োজন ছাড়াই চারজন ব্রাহ্মণ কর্মচারী লাগিয়ে মৃতদেহ সৎকার করার জন্য শ্মশানে পাঠিয়ে দেন। লোকবসতি থেকে দূরে অবস্থিত শ্মশানে একটি বটগাছ, একটি ঘর এবং একটি পুষ্করিণী রয়েছে। মৃতদেহ পোড়ানোর কাঠ আসতে দেরি করছে দেখে, চারজনের মধ্যে দুজন কাঠের সন্ধানে গেল। বাকি দুজন মৃতদেহ আগলে শ্মশানের ঘরের মধ্যে বসে থাকলো। প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যেই কোন না কোন একটি ভয়ের কারণ থাকে। সে ভূত হোক কিংবা বন্যপ্রাণী। তবে বেশিরভাগ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে মৃতদেহ থেকে জাত ভূতের ভয় দেখা যায়। আর যেহেতু শ্মশানে মৃতদেহ পোড়ানো হয়, তাই এখানে মানুষের অতৃপ্ত আত্মার ভিড় বেশি থাকে। তাই বেশিরভাগ মানুষেরই শ্মশানে গা ছম্‌ছম্‌ করা ভয় উৎপন্ন হয়। কাদম্বিনীর মৃতদেহ আগলে বসে থাকা দুজনেরও হাল্কা ভয় করছিল। তার উপরে আবার সেই নির্জন ঘরের মধ্যে হঠাৎ করে অদ্ভুতভাবে মৃতদেহের খাট নড়ার শব্দ হল। মনে হল যেন মৃতদেহ পাশ ফিরলো- "কোথাও কিছু শব্দ নেই– কেবল পুষ্করিণীতীর হইতে অবিশ্রাম ঝিল্লি এবং ভেকের ডাক শুনা যাইতেছে। এমন সময় মনে হইল, যেন খাটটা ঈষৎ নড়িল, যেন মৃতদেহ পাশ ফিরিয়া শুইল।"[১]দুজন ব্রাহ্মণ কর্মচারী বিধু এবং বনমালী রাম নাম জপ করতে আরম্ভ করলো। কারণ হিন্দুদের ক্ষেত্রে ভূতের ভয় থেকে উদ্ধারকারী হিসেবে রামের নামই সাধারণত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যখন ঘরের মধ্যে অদ্ভুত ভাবে দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ এলো, তখন দুজন রাম নামের উপর ভরসা না করে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গ্রামের দিকে দৌড়ে পালাল। পথে কাঠ আনতে যাওয়া দুজনের সঙ্গে দেখা হল। ঘটনার কথা তাদেরকে জানাল। তারপর তারা চারজন মিলে এসে দেখল খাটে মৃতদেহ নেই। এই অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড দেখে তারা হতচকিত হয়ে পড়ল। ভয়ে মৃতদেহের বেশি খোঁজ না করে শারদাশংকরবাবুর কাছে খবর দিল মৃতদেহ সৎকার করা হয়ে গেছে। অদ্ভুতভাবে মৃত কাদম্বিনী চোখ মেলে দেখল সে শ্মশানের মধ্যে চলে এসেছে। চারিদিকে ঘন অন্ধকার, কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার চিন্তা করলো। তারপর ভাবলো সে তো সবার কাছে মৃত, সমাজের অমঙ্গল হতে পারে। কাদম্বিনীর মৃত্যু ও পরে জীবিত হওয়া সম্পর্কে লেখক বলেছেন- "জীবনের যখন কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না তখনো অনেক সময় জীবন প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, এবং সময়মত পুনর্বার মৃতবৎ দেহে তাহার কার্য আরম্ভ হয়। কাদম্বিনীও মরে

নাই- হঠাৎ কী কারণে তাহার জীবনের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।”[২]ভরা শ্রাবণের অন্ধকারময় রাতে কাদামাখা কাপড়ে পাগলির মতো বেশে নিরুপায় হয়ে বাল্যসই যোগমায়ার ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল। সেখানে কয়েকদিন কাটানোর পর কাদম্বিনীর চেতনার অন্ত:স্থলে ভয়ের উদ্রেক হতে লাগলো এই ভেবে যে, সে একজন মৃত মানুষ। নিজের সম্পর্কে এইরূপ সন্দেহ থাকার জন্য সে যোগমায়ার সাথে ঠিকমতো মিশতে পারেনি। ভয়ের কারণে যখন তখন রাতের বেলা সে চিৎকার করে কান্নাকাটি করতো। এরূপ আরও নানারকম আচরণের ত্রুটি দেখার পর যোগমায়ার স্বামী কাদম্বিনীর শ্বশুরবাড়িতে খোঁজ নেওয়ার জন্য নিজে গেল। সেখানে গিয়ে জানতে পারলো যে কাদম্বিনী তাঁর বাড়িতে আসার ঠিক আগের দিন সন্ধ্যায় মারা গেছে। এই খবর পাওয়ার পর কেউ আর তাকে বিশ্বাস করতে পারলো না। সবাই ভাবলো এ হল সেই কাদম্বিনীর প্রেতাত্মা। যে অদ্ভুতভাবে সশরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধুমাত্র কোলে পিঠে মানুষ করা খোকা অনুভব করলো পূর্বের কাদম্বিনীকে, কিন্তু তারও মন ভয়ে আলোড়িত হয়ে গেল। তারপর নিজের জীবিত থাকার প্রমাণ হিসেবে কাঁসার বাটি মাথায় ঠুকিয়ে রক্ত বার করলো। তারপরও কোনোরূপ বিশ্বাস অর্জন করাতে না পেরে পুকুরের জলে ঝাঁপ দিয়ে মারা গেল। বিস্ময়কর এই গল্পের শেষে লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি উল্লেখযোগ্য লাইন ব্যবহার করেছেন- “কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।”[৩]লেখক কাদম্বিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে জীবন ও মৃত্যুর টানাপোড়েনে একটি অদ্ভুত মানসিক দ্বন্দ্বের ভয়াবহ চিত্র অঙ্কন করেছেন। আলোচ্য গল্পে মৃত কাদম্বিনীর জীবিত হয়ে ওঠা এবং পরবর্তীতে নিজেকে অন্তরে মৃত মনে করার ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতি, অদ্ভুতময়তার উদ্রেক করে পাঠকের মনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি অন্যতম ছোটগল্প হল ‘নিশীথে’। গল্পটি ১৩০১ বঙ্গাব্দে সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পের প্রধান চরিত্র হলেন কথক দক্ষিণাচরণবাবু। গল্পটি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অদ্ভুতময় কিছু কাহিনী নিয়ে রচিত। দক্ষিণাচরণবাবু প্রায়শয়ই নানারকম ভীতি এবং কাল্পনিক কৌতূহলের ঘোরে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে রাতে গিয়ে জ্বালাতন করে। এরকম একদিন গিয়ে ডাক্তারকে নিজের যে কাহিনী বলেছিল তারই বিবরণ রয়েছে গল্পে। গল্পটিতে রহস্যময় অলৌকিকতা, অদ্ভুতময়তা ও অদ্ভুতরস সমৃদ্ধ একটি অবচেতন মনের কল্পনা রয়েছে। দক্ষিণাচরণবাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী গৃহকলায় সুনিপুণ ছিলেন। স্বামীর অসুস্থতায় তিনি প্রাণপণ লড়াই করে সেবা করেছেন। তারপর তাঁর স্ত্রীরও গর্ভাবস্থায় কঠিন অসুখ হয় এবং মৃত সন্তান প্রসব করে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন দক্ষিণাচরণবাবু প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি খুব যত্ন সহকারে স্ত্রীয়ের সেবা করে সুস্থ করে তুলবেন। স্ত্রীয়ের চিকিৎসার জন্য হারান ডাক্তারকে নিয়োজিত করেন। কিছুদিন স্ত্রীয়ের সেবা করার পরও রোগ উপশমের কোনোরূপ সম্ভাবনা গেল না। এদিকে দক্ষিণাচরণবাবু সেবাকর্ম

করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলেন। জীবনের একঘেয়েমির গণ্ডি অতিক্রম করতে চাইলেন। আর তখনই হারান ডাক্তারের মেয়ে মনোরমার সাথে আলাপ হল। শুরু হল সেবা কর্মে ব্যাঘাত। নিজের প্রতিজ্ঞা ভুলতে থাকলেন আসতে আসতে করে মনোরমার সাহচর্য লাভ করার পর। মনোরমার সাথে কিছুদিন সময় কাটানোর পর ভালো লাগতে শুরু করে। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর প্রতি সেবা যত্নের ক্ষেত্রে ভাটা পড়তে থাকে। প্রথম পক্ষের স্ত্রী একদিন তাঁকে দ্বিতীয় বিয়ে করার কথা বলেন। তখন তিনি চরম মানসিক দ্বন্দ্ব ও দ্বিধার মধ্যে পড়ে যান। নিজের ব্যাক্তিত্বের জোরে বলেন- "এ জীবনে আর কাহাকেও ভালোবাসিতে পারিব না।"[৪]সেবা কর্মে ভাটা পড়ার জন্য স্ত্রীয়ের ওষুধ খাওয়ার বেনিয়ম হতে থাকলো। একদিন হারাণ ডাক্তারের কন্যা মনোরমা তাঁর স্ত্রীকে দেখতে আসেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মনোরমাকে দেখিয়ে স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করে- "ও কে, ও কে গো।"[৫]দক্ষিণাচরণবাবু প্রথমে ঘাবড়ে গিয়ে চেনেন না বলেন; পরক্ষনেই পরিচয় দেন যে তিনি হলেন হারাণবাবুর কন্যা। তাঁর এই দোলাচল অবস্থার কারণ বুঝতে বাকি থাকে না প্রথম স্ত্রীয়ের। একদিন হারাণ ডাক্তারের দেওয়া মালিশ করবার নীল শিশির ওষুধ পান করে প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তারপর মনোরমাকে তিনি বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রীয়ের প্রতি ভালোবাসার কারণে তিনি মনোরমাকে বেশি ঘনিষ্ট করে তুলতে পারেন নি। তাই তিনি যখন একটু নির্জনে প্রেমালাপ করতে চাইতেন, মনোরমা আগ্রহী হত না। তিনি নিজের অন্তরের অতৃপ্তি নিয়ে থাকতেন। একদিন সন্ধ্যায় বরানগরের বাগানে মনোরমার সঙ্গে বেড়ানোর সময় অন্ধকারে প্রথম স্ত্রীয়ের আবছা মূর্তিকে অনুভব করেন। তাঁর অবচেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই মূর্তি যেন তাকে আলিঙ্গন করতে চায়, কিন্তু পারে না। অন্তরের মধ্যে একটি বিবেক পীড়িত পাপবোধের ক্রিয়া চলতে থাকে। দক্ষিণাচরণবাবুর মনে পড়ে যায় কিছুদিন আগে কাউকে তিনি তাঁর ভালবাসার কথা বলেছিলেন। তাই তাঁর অবচেতন অন্তরাত্মা মনোরমাকে নিবিড় করে কাছে টানতে পারছে না। মানব মনের অদ্ভুত দোলাচলতার স্পষ্ট রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক দক্ষিণাচরণবাবুর মধ্য দিয়ে। দক্ষিণাচরণবাবুর অবচেতন মন নির্জন জনমানবহীন প্রান্তরের মধ্যে শুনতে পায়- 'ও কে, ও কে, ও কে গো' ধ্বনি। মনোরমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় নিশুতি রাতে তিনি তাঁর কল্পনায় শুনতে পান- 'ও কে, ও কে, ও কে গো' শব্দ। কোন এক অদ্ভুত মায়ার বাঁধনে তিনি ধরাশায়ী হয়েছেন, যার ফলে হৃদয়ের অভ্যন্তরে তিনি ক্রমাগত এই ধ্বনি শুনে চলেছেন। অনেক সমালোচক ছোটগল্পটিকে অতিপ্রাকৃত রসের বলেছেন। ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে রচিত বলেও অনেকে দাবী করেন। অনেকে 'নিশীথে' কে ভূতের গল্পও বলেছেন। গল্পটির মধ্যে প্রত্যেকটি প্রধান ঘটনাই ঘটেছে সন্ধ্যাবেলা বা গভীর রাতে। রাতের অন্ধকারই দক্ষিণাচরণবাবুর দ্বিতীয় বিয়ে করা নিয়ে যে পাপবোধ সেটিকে জানান দেয়। ভালোবাসার একই উক্তি দুজন ভিন্ন নারীকে বলতে গিয়ে দক্ষিণাচরণবাবু নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন। মনের এই পাপবোধ তাঁর মগ্নচৈতন্যের

দ্বারে কষাঘাত করেছে। লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুনিপুণ ভাবে 'নিশীথে' ছোটগল্পে অদ্ভুময়তার নিদর্শন দিয়েছেন জমিদার দক্ষিণাচরণবাবুর স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে।

'ক্ষুধিত পাষাণ' ছোটগল্পটি প্রকাশিত হয় ১৩০২ বঙ্গাব্দে সাধনা পত্রিকায়। এই গল্পে তুলার মাশুল আদায় করার কাজে কথক বরীচে নিযুক্ত হন। শুস্তা নদীর পাড়ে পাথর দিয়ে তৈরি ঘাটের উপরের একটি অদ্ভুতময় শ্বেতপাথর নির্মিত বাড়ির মায়াজাল ক্ষমতা আলোচ্য গল্পের বিষয়। প্রাসাদসম এই বাড়ির কাছাকাছি কোন লোকালয় নেই। বরীচের তুলা কেনাবেচার হাট এবং জনবসতির গ্রাম অনেকটা দূরে অবস্থিত। প্রায় আড়াইশো বছর আগে দ্বিতীয় শা-মামুদ নিরিবিলিতে অবসরযাপন ও বিলাসব্যসনের জন্য এই প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন। এখন সেটি তুলার মাশুল আদায়কারীর একটি 'অতিবৃহৎ' ও নির্জন বাসযোগ্য বাড়ি। বাড়িতে কাজকর্ম করা লোকেরা কেউ রাতে এখানে থাকে না। এই প্রাসাদসম বাড়ি এখন মায়াবি অট্টালিকায় পরিণত হয়েছে। এখানে বাস করলে বাড়ির লালায়িত নিশ্বাস বসবাসকারীকে মায়ার অদ্ভুত বন্ধনে আবদ্ধ করে তোলে ধীরে ধীরে। রহস্যময় গোলকধাঁধার চারিদিকে তখন পাগল হয়ে ঘুরতে হয়। বিভিন্ন গ্রহেরা যেভাবে এক অদৃশ্য শক্তির টানে নক্ষত্রমন্ডলে ঘুরতে থাকে; তেমনি এই বাড়ি অদৃশ্য ঐন্দ্রজালিকের মতো মেহের আলিকে বশীভূত করেছে এবং কথককে ক্রমশ তার চৌম্বকক্ষেত্রের দিকে আকর্ষিত করে চলেছে। এই প্রাসাদ বাড়ির এরূপ অদ্ভুত ইন্দ্রজালের কারণ হল- "অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত-সেই-সকল চিত্তদাহে, সেই-সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত তৃষার্ত হইয়া আছে, সজীব মানুষ পাইলে তাকে লালায়িত পিশাচীর মতো খাইয়া ফেলিতে চায়। যাহারা ত্রিরাত্রি ওই প্রাসাদে বাস করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেবল মেহের আলি পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এ পর্যন্ত আর কেহ তাহার গ্রাস এড়াইতে পারে নাই।"[৬]এই পাষাণ বাড়ির প্রতিটি কক্ষের মধ্যে অদ্ভুত রকমের মায়ার আকর্ষণ আছে। সামনে শুস্তা নদীর জলে কল্‌কল্‌ শব্দ, সিঁড়ির নির্জনতা, কক্ষের পৈশাচিক মায়ার বাঁধন থেকে মেহের আলি বেরিয়ে আসতে পারলেও আকর্ষণ থেকে উদ্ধার পায় নি। তাই প্রতিদিন সকালেই জনহীন বাড়ির পাশের রাস্তায় সে পাগলের মতো চিৎকার ও অন্যকে সচেতন করে বেড়ায়- "তফাৎ যাও, তফাৎ যাও! সব ঝুঁট হ্যায়, সব ঝুঁট হ্যায়।"[৭]তুলার মাশুল আদায় করতে আসা ভদ্রলোকের কাছে এই প্রাসাদটি নেশার মতো হতে শুরু করলো। একদিন বিকেলে তিনি ঘাটের নীচে বসেছেন, সন্ধ্যার দিকে ফিরে আসবেন, এমন সময়ে তিনি সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন; কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। তার পর অনেক গুলি পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। তাঁর মনে হল একদল নারী যেন নদীর জলে স্নান করতে নেমেছে কিন্তু বাস্তবে কেউ কোথাও নেই। কথকের কল্পনা অনুভব ও বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিল। পরের দিন অফিস থেকে ফিরে কক্ষে প্রবেশ করেই তিনি অনুভব

করলেন যে তিনি ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে কারা যেন সভা ভঙ্গ করে চলে গেল। বাস্তবে কাউকেই দেখতে পেলেন না- "যেন হঠাৎ সভা ভঙ্গ করিয়া চারিদিকের দরজা জানালা ঘর পথ বারান্দা দিয়া কে কোন্ দিকে পলাইল তাহার ঠিকানা নাই। আমি কোথাও কিছু না দেখিতে পাইয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। শরীর একপ্রকার আবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। যেন বহু দিবসের লুপ্তাবশিষ্ঠ মাথাঘষা ও আতরের মৃদু গন্ধ আমার নাসার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।"[৮]তারপর থেকে প্রতিটি রাতে স্বপ্নময় কল্পনার ইন্দ্রজাল কথককে আষ্টেপৃষ্টে ক্রমশ ধরেছে নানাভাবে। প্রাসাদসম প্রস্তর বাড়িটি ক্রমে জীবন্ত হয়ে কথককে নেশার মতো টানতে লাগলো। প্রাসাদের প্রতি যে এই মোহ তৈরি হচ্ছে, তা ভেবে আবার পরদিন সকালে হাস্যকর মনে হত। তারপর আবার সন্ধ্যা নামলেই প্রাসাদের আকর্ষণকে উপেক্ষা করতেপারত না। গভীর রাতে ঝম্‌ঝম্ শব্দ, নুপুরের শব্দ, রমনীর উপস্থিতি ও নানারকম অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার কল্পনায় বিভোর কথকের অবচেতন মন পাঠকের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। একদিন অমাবস্যার রাত, আকাশে মেঘের ঘনঘটা, কথক অনুভব করলেন- "একজন রমণী পালঙ্কের তলদেশে গালিচার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই দৃঢ়বদ্ধমুষ্টিতেআপনার আলুলায়িত কেশজাল টানিয়া ছিঁড়িতেছে, তাহার গৌরবর্ণ ললাট দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে, কখনো সে শুষ্ক তীব্র অট্টহাস্যে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, কখনো ফুলিয়া-ফুলিয়া ফাটিয়া-ফাটিয়া কাঁদিতেছে, দুই হস্তে বক্ষের কাঁচুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অনাবৃত বক্ষে আঘাত করিতেছে, মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাতাস গর্জন করিয়া আসিতেছে এবং মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে।"[৯]কথকের বিভোর ভঙ্গ হয় পাগল মেহের আলির চিৎকারে- "তফাৎ যাও, তফাৎ যাও! সব ঝুঁট হ্যায়, সব ঝুঁট হ্যায়।"[১০]সব মিলিয়ে 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে স্বপ্ন, প্রেমের পরাকাষ্ঠা, অতিপ্রাকৃত ঘটনা, মনের অবচেতনার ভাব প্রবাহ প্রভৃতি দ্বারা লেখক এক সুন্দর অদ্ভুতময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। গল্পটি সম্পর্কে অনেক সমালোচকের ভিন্নমত থাকলেও আমার মতে এটি মূলত অদ্ভুতময়ছোটগল্প।

'মণিহারা' গল্পে সুর্যাস্তের সময় একটি প্রাচীন ক্ষয়প্রাপ্ত বাঁধানো নদী ঘাটের কাছে নৌকাতে ফণিভূষণ অপেক্ষা করছিল। এমন সময় একজন নৌকাযাত্রী ভদ্রলোকের সাথে তাঁর আলাপ শুরু হয়। ফণিভূষণ একটি জীর্ন ঘরে রাত্রিবাস করবেন বলে স্থির করেন। এই জীর্ন বাড়ির পনেরো বছর আগের ঘটনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভদ্রলোক। ভদ্রলোক এখানকারই একজন স্কুল মাস্টার। প্রায় পনেরো বছর আগের কয়েকদিনের ঘটে যাওয়া অদ্ভুতুড়ে অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা রয়েছে গল্পে। গল্পের কাহিনী যতই সমাপ্তির পথে অগ্রসর হয়েছে ততই রহস্যের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। ফণিভূষণ সাহা হলেন উচ্চশিক্ষিত ব্যবসায়ী মানুষ। তাঁর জন্ম হয় ফুলবেড়েতে কিন্তু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠা এখানে ছিল। উত্তরাধিকার সুত্রে অনেক বড় ব্যবসা এবং সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী মণিমালিকা ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী আধুনিকা। তিনি

স্বল্পভাষী এবং খুব মিতব্যয়ী ছিলেন। সংসারের সমস্ত রকম কাজকর্মে অভ্যস্ত ছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার ক্ষেত্রে কোন অভাব ছিল না। একটাই অভাব ছিল সংসারে সেটা হল মণিমালিকা সন্তানলাভ করেনি। লেখকের কথায়- "ঘনপল্লবিত অতিসতেজ লতার মতো বিধাতা মণিমালিকাকে নিষ্ফলা করিয়া রাখিলেন, তাহাকে সন্তান হইতে বঞ্চিত করিলেন। অর্থাৎ তাহাকে এমন একটা-কিছু দিলেন না যাহাকে আপন লোহার সিন্ধুকের মণিমাণিক্য অপেক্ষা বেশি করিয়া বুঝিতে পারে, যাহা বসন্ত প্রভাতের নবসূর্যের মত আপন কোমল উত্তাপে তাহার হৃদয়ের বরফপিণ্ডটা গলাইয়া সংসারের উপর একটা স্নেহনির্ঝর বহাইয়া দেয়।"[১১] ফণিভূষণ স্ত্রীর এই অভাববোধ এবং সন্তানহীনতার ব্যাথা দূর করার জন্য না চাইতেই সোনার গয়না, বাজুবন্ধ ও দামি শাড়ি উপহার হিসেবে প্রায়শই এনে দিত। আর মণিমালিকা সেই সব অলংকার আগলে রাখত অত্যন্ত যত্ন করে। এই সমস্ত গয়না ও অলংকারের প্রতি ক্রমশ স্নেহ মায়া বাড়তে থাকল। রূপবতী মণিমালিকার সৌন্দর্য ও তার অলংকারেরপ্রাচুর্য ক্রমে বিকশিত হতে থাকল। এক সময় ফণিভূষণের ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিল। এই সংকটকালীন সময়ে প্রায় লাখ দেড়েক টাকার খুব প্রয়োজন হল। তাই নিরুপায় হয়ে স্ত্রীকে কিছু গয়না বন্ধক রাখার কথা জিজ্ঞেস করে সে। স্ত্রীর কাছে কোন সদুত্তর না পাওয়ায় সে টাকা সংগ্রহের জন্য কলকাতায় যায়। এদিকে মণিমালিকা গোমস্তা মধুর সাথে পরামর্শ করে সমস্ত অলংকার নিয়ে পিত্রালয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়। মধুও গয়না পত্র লুট করার উদ্দেশ্য নিয়ে মনিমালিকার সঙ্গে যায়। ফণিভূষণ স্ত্রীকে যথার্থ রূপে ভালোবেসেছে, কিন্তু স্ত্রীর এরূপ অদ্ভুত আচরণে খুবই মর্মাহত। তারপর থেকে শুরু হয় ফণিভূষণের অভিমানের পালা। সে অভিমান বেশিদিন ধরে রাখতে পারলো না। স্ত্রীয়ের ফিরে আসার অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে না থেকে ফণিভূষণ নানা দিকে খোঁজ করার জন্য লোক পাঠালো। মণিমালিকার পিত্রালয়ে খোঁজ নিয়ে জানলো সেখানে যায়নি। গোমস্তা মধুরও কোন খোঁজ মিললো না। ফণিভূষণের মন হতাশায় ভেঙে পড়ল। এদিকে মধু মণিমালিকাকে হত্যা করে, তার সমস্ত গয়না নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ফণিভূষণ মণিমালিকার অনুপস্থিতি অনুভব করতে থাকলো ক্রমশ। স্ত্রী বিরহে এতটাই আবিষ্ট হল যে, নানারকম অদ্ভুতময় কল্পনা তাকে গ্রাস করলো। তার অবচেতন মনের মধ্যে কেবল মণিমালিকার ফিরে আসার নুপুর নিক্কনের সুর বাজতে থাকলো। স্বপ্নে বিভোর হয়ে ঘুমের মধ্যে মণিমালিকার উপস্থিতি অনুভব করলো। উপহার দেওয়া গয়নার ঝম্ ঝম্ শব্দ শুনে ঘুমের মধ্যে মণিমালিকার মোহে আবদ্ধ হল। একদিন মধ্যরাতে বৃষ্টি থামার পরে সে অদ্ভুতভাবে ঠক্ ঠক্ শব্দের সঙ্গে ঝম্ ঝম্ শব্দ শুনতে পেল। অবচেতন মনের মধ্যে মণিমালিকার আগমনের আনন্দ অনুভব করে পুলকিত হয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলল। লেখকের কথায়- "শব্দটা ক্রমে ঘাটের সর্বোচ্চ সোপানতল ছাড়িয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল। দেউড়ি বন্ধ করিয়া

দারোয়ান যাত্রা শুনতে গিয়াছিল। তখন সেই রুদ্ধদ্বারের উপরে ঠক্‌ঠক্‌ ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া ঘা পড়িতে লাগিল, যেন অলংকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা শক্ত জিনিস দ্বারের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। নির্বাণদীপ কক্ষগুলি পার হইয়া অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রুদ্ধদ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার বাহির হইতে তালাবন্ধ ছিল। ফণিভূষণ প্রাণপনে দুই হাতে সেই দ্বার নাড়া দিতেই সেই সংঘাতে এবং তাহার শব্দএ চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিতে পাইল, সে নিদ্রিত অবস্থায় উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল। তাহার সর্বশরীর ঘর্মাক্ত, হাত পা বরফের মতো ঠাণ্ডা এবং হৃৎপিণ্ড নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো স্ফুরিত হইতেছে। স্বপ্ন ভাঙিয়া দেখিল, বাহিরে আর কোনো শব্দ নাই, কেবল শ্রাবণের ধারা তখনো ঝর্‌ঝর্‌ শব্দে পড়িতেছিল এবং তাহারই সহিত মিশ্রিত হইয়া শুনা যাইতেছিল যাত্রার ছেলেরা ভোরের সুরে তান ধরিয়াছে।"[১২]এই রকম করে রাতের পর রাত ফণিভূষণ ক্রমশ অদ্ভুতময়তায় আবিষ্ট হতে থাকল। অতিপ্রাকৃত এইসব ঘটনার দ্বারা একদিন সে মণিমালিকার কঙ্কালের প্রতি অলৌকিকভাবে আকৃষ্ট হয়ে নদীর শীতল জলে তলিয়ে গেল। লেখকের কথায়- "কঙ্কাল নদীতে নামিল, অনুবর্তী ফণিভূষণও জলে পা দিল। জলস্পর্শ করিবা মাত্র ফণিভূষণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। সম্মুখে আর তাহার পথপদর্শক নাই, কেবল নদীর পরপারে গাছগুলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া এবং তাহাদের মাথার উপরে খণ্ড চাঁদ শান্ত অবাকভাবে চাহিয়া আছে। আপাদমস্তক বারংবার শিহরিয়া শিহরিয়া স্খলিতপদে ফণিভূষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া গেল। যদিও সাঁতার জানিত কিন্তু স্নায়ু তাহার বশ মানিল না, স্বপ্নের মধ্য হইতে কেবল মুহূর্তমাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলস্পর্শ সুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল।"[১৩]উপহার দেওয়া সোনাদানা মণিমানিক্যের জন্যই ফণিভূষণের জীবন থেকে মণিমালিকার মোহ জন্মায় এবং তা থেকে বিচ্ছেদ হয়। গল্পটিতে রহস্যময় অদ্ভুত অতিপ্রাকৃতের নিদর্শন রয়েছে। গল্পের শেষের দিকে ক্রমশ বিস্ময়কর রোমাঞ্চ পাঠকমনে অদ্ভুতময়তার প্রবাহ সঞ্চার করে।

'কঙ্কাল' ছোটগল্পটি প্রকাশিত হয় **১২৯৮** বঙ্গাব্দে সাধনা পত্রিকাতে। এই গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অলৌকিক একটি কঙ্কালের বিগত জীবনের কাহিনী সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কাহিনীতে একজন অপূর্ব রূপবতী যুবতি মৃতা নারীর জীবনে ঘটে যাওয়া নানারূপ অদ্ভুত ঘটনা স্থানলাভ করেছে। গল্পের শুরুতে আমরা দেখি- 'আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম তাহার পাশের ঘরের দেয়ালে একটি আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলানো থাকিত। রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলা খট্‌খট্‌ শব্দ করিয়া নড়িত।"[১৪]গল্পের কথক একদিন ওই কঙ্কাল ঝোলানো ঘরে রাতে ঘুমোতে যান। ওইদিন তার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। মধ্যরাতে কথকের অবচেতন মনের মধ্যে সেই কঙ্কালের জীবিত কালের বিষয় কল্পনা করছেন। এমন সময় তার মনে হল কোন একজন মশারির চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং কিছু খুঁজছে। সঙ্গে সঙ্গে একটি অদ্ভুতময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়, গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ভয় থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য

তাই তিনি জিজ্ঞেস করেন 'কে ও!' প্রশ্নের পর উত্তর আসে- "আমি। আমার সেই কঙ্কালটা কোথায় গেছে তাই খুঁজিতে আসিয়াছি।"[১৫]তারপর চলল পূর্ব জীবনের ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার কাল্পনিক সংলাপ। সবমিলিয়ে আলোচ্য গল্পে অতিপ্রাকৃত ভৌতিক কাহিনী রয়েছে যা পাঠকের মনে বিস্ময়বোধের সঞ্চার করে।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, জীবিত ও মৃত, সাহিত্যম্, দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৪১৫; পৃ৯৭।

২. তদেব, পৃ ৯৭।

৩. তদেব, পৃ ১০৪।

৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, নিশীথে, সাহিত্যম্, দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৪১৫; পৃ ২৪২।

৫. তদেব, পৃ ২৪৩।

৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, ক্ষুধিত পাষাণ, সাহিত্যম্, দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৪১৫; পৃ ২৯৬।

৭. তদেব, পৃ ২৯৫।

৮. তদেব, পৃ ২৯১।

৯. তদেব, পৃ ২৯৫।

১০. তদেব, পৃ ২৯৬।

১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মণিহারা, সাহিত্যম্, দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৪১৫; পৃ ৩৫৯।

১২. তদেব, পৃ ৩৬৪, ৩৬৫।

১৩. তদেব, পৃ ৩৬৭।

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, কঙ্কাল, সাহিত্যম্, দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৪১৫; পৃ ৬৬।

১৫. তদেব, পৃ.৬৬।

অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্পে নিম্নবর্গের স্বরূপ সন্ধান : সামাজিক নিপীড়নে নিম্নবর্গের ভূমিকা

প্রতাপ বিশ্বাস
গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়মঠ

সারসংক্ষেপঃ ইতিহাস সবসময়ই সচল। সময়ের ঘূর্ণাবর্তে তার বদল ঘটে প্রতিনিয়ত। ইতিহাসকে কোনও নির্দিষ্ট পরিধিতে আটকে রাখা সম্ভব নয়, তার সমাপ্তি বলেও কিছু হয় না। ইতিহাসের চলমানতার গতিপথে উৎপাদন বা প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থানের সম্পর্ক অনুসারে উচ্চ-নিম্ন, বিত্ত-বর্ণের এক ভিন্ন মানদণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক মানদণ্ডে তৈরি হয়েছে বর্তমান সময়ের বহু আলোচিত বিষয় – বর্তমান পরিভাষায় যার নাম 'সাবলটার্ন' বা 'নিম্নবর্গ'। সাহিত্যের প্রাঙ্গনে বারেবারেই উঠে এসেছে এই শ্রেণির মানুষের প্রসঙ্গ। অনিল ঘড়াই এমনই একজন সাহিত্যিক, যিনি এই নিম্নবর্গের মানুষদেরকে নিয়ে কলম ধরেছন, তুলে এনেছেন তাদের জীবনের বাস্তবচিত্র।

সূচক শব্দঃ ভীরু, ইতিহাস, শূদ্র, শ্রমিক, বৈষম্য, শোষণ।

মূল আলোচনাঃ

সমাজবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে নিম্নবর্গ আজ একটি প্রধান আলোচনার বিষয় হওয়ায়, উচ্চবর্গের রাজনীতি ও ভাবাদর্শের মধ্যে নিম্নবর্গের অবস্থান ঠিক কোথায় তা স্পষ্ট করে দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গের মানুষেরা উপস্থাপিত হয় ভীরু, উচ্চবর্গের অনুগত প্রাণী হিসেবে। উচ্চবর্গ তখনই নিম্নবর্গকে প্রতিপক্ষ হিসেবে মান্যতা দেয় যখন তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। "একমাত্র প্রকাশ্য রাজনৈতিক বিরোধ, বিশেষ করে বিদ্রোহের সময়েই শাসকগোষ্ঠী তাকে সক্রিয় প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রাহ্য করে।"[১] ইতিহাসের কর্তব্য সত্যকে উপস্থাপিত করা। কিন্তু তা সম্ভব হয় না, কারণ ইতিহাসের স্পন্দন নিয়ন্ত্রিত হয় উচ্চবর্গের অঙ্গুলিহেলনে।

আর্যজাতি আগমনের পূর্বে সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল, ভীল প্রভৃতি শ্রেণির মানুষেরাই ছিল এদেশের আদি অধিবাসী। পরবর্তীকালে তারাই অসভ্য, দাস শ্রেণির মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হয়। আর্য সমাজব্যবস্থায় তারাই শূদ্র বা নিম্নবর্গ হিসেবে পরিচিত। মনুসংহিতার নির্দেশ অনুসারে, "যে পথ দিয়ে উচ্চবর্ণের লোকেরা যাতায়াত করে, সেই পথে শূদ্রের মৃতদেহ বহন করা চলবে না(৫/৯২)। ......অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নেই।"[২] সমাজপতিরা শোষণের এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করে রেখেছিলেন যাতে একটি শ্রেণি চিরকাল তাদের অধীনে থেকে তাদের ভার বহন করে চলে। "জাতের নামে শুধু শ্রমবিভাগ করেই ব্রাহ্মণ্য সমাজপতিরা ক্ষান্ত

হননি,.........তাদের শ্রমের মুনাফাটুকুও যাতে ঘরে বসে নির্বিবাদে চেটেপুটে ভোগ করা যায়, তার সর্ববিধ ব্যবস্থা তাঁরা পাকা করে রেখেছিলেন।"[৩]

বিশ শতকের শেষদিকে এদেশে সাবলটার্ন সম্পর্কিত চর্চা শুরু হলেও বাংলা সাহিত্যের প্রাগাধুনিক পর্ব থেকেই শ্রেণি বিভাজন, বৈষম্য, নিম্নবর্গের প্রতি অবমাননার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত সর্বত্রই নিম্নবর্গের কথা উঠে এসেছে।

পরবর্তী সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্র, শরৎসাহিত্য সবস্থানেই নিম্নবর্গের বিচরণ লক্ষণীয়। বাংলা সাহিত্যে বিষয় ভাবনায়, দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপনে বাঁকবদল ঘটে কল্লোল পত্রিকার হাত ধরে। রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে দূরে সরে এসে নিম্নবর্গের মানুষের জীবনদর্শনে তারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রমুখরা প্রত্যেকেই সমাজের প্রতিষ্ঠিত জীবনযাপন থেকে সরে চোখ রেখেছেন বস্তি অঞ্চলে, জীবনের অন্ধকারময় গলিতে। শহরের পাঁকমাখা জীবনের তিক্ততা প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের সাহিত্যে। "প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাংলার আর্থিক সামাজিক জীবনে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল তা ভেঙে দিয়েছিল অনেক সনাতন মূল্যবোধ। শূদ্র ব্রাহ্মণের বিভেদও মুছে যাচ্ছিল অনেক জায়গায়।"[৪] এই পরিবর্তনের ধারাকেই সাহিত্য জগতে তুলে নিয়ে এলেন তরুণ সাহিত্যিকেরা। বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের জীবনচিত্রের রূপনির্মাণে মানিক, বিভূতি, তারাশঙ্করের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এছাড়া নিম্নবর্গের আখ্যান নির্মাণে যাঁরা সক্রিয়তা দান করেছেন, তাঁদের মধ্যে সতীনাথ ভাদুড়ী, অদ্বৈত মল্লবর্মন, কমলকুমার মজুমদার, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, মহাশ্বেতা দেবী, সমরেশ বসু প্রমুখ স্মরণীয়। 'আরণ্যক', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'অরণ্যের অধিকার', 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', 'তিতাস একটি নদীর নাম' – প্রভৃতি উপন্যাসে উঠে এসেছে নিম্নবর্গীয় সমাজজীবনের জীবন্ত চিত্র। সাম্প্রতিক এ ধারায় আছেন অভিজিৎ সেন, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনী বেরা প্রমুখ। উঠে এসেছে শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্র।

অনিল ঘড়াই এমন একজন লেখক যিনি সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া নিম্নবর্গীয় সমাজ থেকে উঠে এসেছেন। তাঁর সাহিত্য ও নিম্নবর্গ পরস্পর সম্পৃক্ত একটি বিষয়। সমাজ পিরামিডের নিচুতলায় বাস করা মানুষের জীবনযাপন, আচার-আচরণ, সংস্কৃতির খুঁটিনাটি বর্ণনার পাশাপাশি তাদের দৈনন্দিন দাসত্ব, শোষণ, বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অস্তিত্ববান তাঁর সাহিত্য। কখনো প্রতিরোধ প্রবণতায়, কখনো বা রাজনৈতিক চরিত্র নির্মাণে নিম্নবর্গের নিজস্ব চেতনার রূপরেখা ধরা পড়েছে তাঁর সাহিত্যে। দুঃখ-দারিদ্র আজও যাদের নিত্যসঙ্গী অথচ আজও যারা বিবেকী ও সৎ - লেখক তাদের গান গেয়েছেন, ছবি এঁকেছেন, গল্প শুনিয়েছেন। আধুনিক সভ্য পৃথিবীর বিপরীতে নিতান্ত এক অন্ধকারময় জগতে ভীত সন্ত্রস্ত জীবন কাটায় নিম্নবর্গ।

দারিদ্র্যের সর্বনিম্ন পর্যায়ের মানুষগুলোর পেশাগত পরিচয় থাকে অত্যন্ত অনুজ্জ্বল। অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্পে যারা উঠে এসেছে তারা কেউ ভাগাড়জীবী, কেউ পেশায় ডোম, কেউ বা থাকে রেললাইনের ঝুপড়িতে। অনিল ঘড়াই যে ধরনের জীবিকার খোঁজ রাখেন তার সঙ্গে পরিচিত নই আমরা অনেকেই। হাতির পায়ের ছাপ নকল করা বা কাকমারা যে জীবিকাভুক্ত হতে পারে, অনিল ঘড়াইয়ের সাহিত্য পড়ে তা জানা যায়। নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ, সিংভূম সহ বিস্তৃত অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের কথা উঠে এসেছে অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্পে। নিম্নবর্গচর্চা তাঁর কাছে কোনও রোমান্টিক বিলাস নয়। সমাজ-কাঠামোর তলানিতে থাকা মানুষগুলোর জীবনচর্যা দরদের ঘনিষ্ঠ উত্তাপে তুলে ধরেছেন লেখক। দারিদ্র্যের কাছে পরাজিত হতে হতে এদের বুকের ছাতি গড়ে ওঠার সুযোগ হয় না, তাই তারা পিঠে হাত বুলিয়েও শিরদাঁড়ার অস্তিত্ব খুঁজে পায় না। পিঁপড়ের সমতুল্য গরীব অসহায় মানুষের জীবন বৈষম্যের চাকায় কতভাবে যে পিষ্ট হচ্ছে তার কোনও হিসাব নেই।

নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকগণ নিম্নবর্গের নিজস্ব কণ্ঠস্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, ইতিহাস থেকে নিম্নবর্গের যে কণ্ঠস্বর উঠে আসে সেটি তার স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারী স্বর নয়, অন্যের নির্মাণ। “ইতিহাসের দলিলে যে-কণ্ঠস্বরই শুনি না কেন, তা নিম্নবর্গের কথা নয়, অন্যের নির্মাণ।”[৫] কিন্তু সাহিত্য যখন তৈরি হয় দায়বদ্ধতার স্তর থেকে ; তখন অধীনস্ত হয়ে বেঁচে থেকেও নিম্নবর্গের কণ্ঠস্বরে সরব হয়ে উঠতে পারে সাহিত্যের পাতা। অনিল ঘড়াইয়ের সাহিত্যে যারা উঠে এসেছে তাদের নাম কোথাও ভিক্ষাস্বর, কোথাও চৈতনবুড়ো, কোথাও বা জার্মান। চেতনার বিশেষ স্তর থেকে উঠে আসা চরিত্রের নামই তো চৈতনবুড়ো। আবার হিটলারের মতো প্রতিহিংসাত্মক সংকল্পের প্রতিভূ হয়ে ওঠে যে চরিত্র তার নাম অবশ্যই জার্মান। কখনো আবার ভিক্ষালব্ধ হয়ে বেঁচে থাকার মধ্যেও যে রুখে দাঁড়ানোর স্বর ফুঁসে উঠতে পারে তার নাম ভিক্ষাস্বর। অনিল ঘড়াইয়ের সাহিত্য নিম্নবর্গের ঝুঁকে পড়া চিত্রায়িত করার পাশাপাশি তাদের একক চৈতন্যে জ্বলে ওঠাটুকুও তুলে ধরে। তাঁর ‘কাকমারা’, ‘ভোটবুড়া’, ‘জার্মানের মা’ প্রভৃতি গল্পে এভাবে উঠে এসেছে নিম্নবর্গের প্রতিরোধের এক অনন্য ভাষা ও ভঙ্গিমা।

খাওয়ার জন্য বাঁচা, বাঁচার জন্য খাওয়া- এই হল নিম্নবর্গের জীবন। তবুও এরা বাঁচে, এদের জীবনেও প্রেম আসে। ‘কাকমারা’ গল্পে দেখা যায়, ভুখা পেটের দায়ে ঘরের বউকে বাঁধা দিতে হয়েছে মহাজনের কাছে। এ-প্রথা চলে আসছে চিরকাল ধরে। ভিক্ষাস্বরের বাপের কথাতেই তাঁর প্রমাণ মেলে, ভিক্ষাস্বরের বউই শুধু নয়, বাঁধা দেওয়া হয়েছে তার মাকেও – “দশ রুপিয়ার জন্যি তুর মা মহাজনের ঘরেই মারা গেলো।”[৬] দারিদ্র্যের কাছে পরাজিত হতে হতে যেখানে নিম্নবর্গের মানুষের মেরুদণ্ডটাই ভেঙে যায়। কিন্তু জীবনের নিত্যসঙ্গী দারিদ্রকে স্বীকার করে নিয়েও তাঁর সাহিত্যে দেখা যায় প্রেম-প্রণয়ের খেলা। দারিদ্র্যের প্রতিকূলতার মধ্যেও লেখক তৈরি করতে চেয়েছেন

নিম্নবর্গের নারী পুরুষের মধ্যে রোমান্টিকতার আবেশ। জীবনের উত্থান-পতন, চেতনার বহিঃপ্রকাশ, জীবন সংগ্রাম সমস্ত কিছুর পাশাপাশি অনিল ঘড়াই নিম্নবর্গের জীবনে রেখে যেতে চেয়েছেন রোমান্টিকতার এক ছটাক রঙিন মুহূর্ত। এদের জীবনেও প্রেম আসে, তাই শিকারের মুহূর্তেও ভিক্ষাস্বর ডুবে থাকে স্ত্রী পার্বতীকে নিয়ে রোমান্টিক আবেশে। দুটি কাকের মুখোমুখি বসে থাকা ভিক্ষাস্বরের দৃষ্টিতে তৈরি করেছে পার্বতীর জন্য প্রণয়মুগ্ধতা। বউয়ের জন্য তাই সে নিয়ে আসে লাল টুকটুকে শাড়ি।

নিম্নবর্গের ইতিহাস বলে, "পুরুষশাসিত সমাজে সব নারীই এক অর্থে নিম্নবর্গ।"[৭] নিম্নবর্গের নির্মাণ দেখতে হলে সমাজে নারীর অধীনতা যেমন বিশ্লেষণের বিষয়, ঠিক তেমনই নিম্নবর্গীয় নারীর অধীনতার বিষয়টিও লক্ষণীয়। পুরুষশাসিত সমাজে তথা পুরুষশাসিত নিম্নবর্গীয় সমাজে মেয়েদের বেঁচে থাকাটা বরাবরই পরমুখাপেক্ষী, অধীনস্ত হয়ে বেঁচে থাকা। ভুখা পেটের দায়ে অনায়াসেই বাঁধা দেওয়া যায় ঘরের বউকে। এই প্রথম নয়, এ প্রথা বংশ পরম্পরায় চলে আসছে কাকমারা সম্প্রদায়ের মধ্যে। গল্পে ভিক্ষাস্বরের বাপকে তাই বলতে শোনা যায়, "চাউল চাপাটি আর এই ভুখা পেটের লাগি তোর মাকে বানধা দিলাম। এ আমার জাতকা রেওয়াজ।"[৮] সেই রেওয়াজে বাঁধা পড়েছে ভিক্ষাস্বরের বৌ পার্বতীও। মাত্র দশ পয়সা আর বিশ সের চালের জন্য ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘরের বউকে বাঁধা দেওয়া হয় নারীলোলুপ মহাজনের ঘরে। গল্পের নায়ক ভিক্ষাস্বরও এই প্রথার বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেনি। এই জাল কেটে বেরিয়ে আসতে পারেনি ভিক্ষাস্বরের মা বা বৌ কেউই। তার মা মরেছে মহাজনের ঘরেই, পার্বতীও শিকার হয়েছে মহাজনের লোভের।

ভিক্ষাস্বর এই প্রথার বাইরে বেরিয়ে আসতে না পারলেও বউয়ের উপরে হওয়া অত্যাচারের প্রতিবাদ সে করেছে, শোধ নিয়েছে। মনের এত দিনের সুপ্ত বাসনার পরিতৃপ্তি ঘটেছে তার। লাল রং যতখানি আগুনের শক্তি ধরে ঠিক ততখানি ক্রোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে ভিক্ষাস্বরের মধ্যে। মহাজনের নিগ্রহের হাত থেকে স্ত্রীকে বাঁচাতে ভিক্ষাস্বর ব্যবহার করে তার কাকামারার ফাঁসজাল। আসলে, ভিক্ষাস্বরের ক্ষোভের ফাঁসজালে অনেক আগেই আটকে পড়েছে মহাজন। শিকারের জন্য নির্বাচিত সবচেয়ে বড় দাঁড়কাকটি ভিক্ষাস্বরের দৃষ্টিতে গ্রামের অত্যাচারী মহাজন। সে জীবনে অনেক কাক শিকার করেছে বটে কিন্তু তার মোক্ষম শিকার অবশ্যই স্ত্রীর উপর অত্যাচারী মহাজনই।

অনিল ঘড়াইয়ের সাহিত্যের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে বার্ধক্য। সমাজে মেয়েদের মতো বৃদ্ধরাও এক অর্থে অবহেলিত। বয়সের ভারে যাবতীয় অবমাননা তথা নিগ্রহ নেমে আসে তাদের উপরে। বৃদ্ধ পিতা বা মাতা সবাই অধীনস্থ। এই অধীন হয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে থাকে তিল তিল যন্ত্রণা। 'ভোটবুড়া' গল্পে দেখা যায় যে বুড়োটি দারিদ্র্য ও বয়সের ভারে গোটা সমাজের কাছে অবাঞ্ছিত, লেখকের ভাষায় অচল পয়সা,

ভোটের বাজারে সেই বুড়োটিই কিন্তু হয়ে ওঠে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান। প্রাচীনত্ব আর নিম্নবর্গের তকমাধারী চৈতনবুড়ো তখন ভোট রাজনীতিতে রাজার রাজা, সেই অচল পয়সাই তখন বিকোয় সোনার দামে। সারাবছর একটুকরো মাছের আশায় ফ্যাঁ ফ্যাঁ করে ঘুরে বেড়ানো অপয়া চৈতনবুড়ো ভোটের বাজারে পয়মন্ত ভোটবুড়া। না চাইতেই তখন চলে আসে চাল, টাকা, মাছ আরও কতকিছু।

রাজনীতির মজার খেলা চৈতনবুড়োর নিম্নবর্গীয় চৈতন্যে তৈরি করে সূক্ষ্ম বাঁকবদল। ভোট বাবুদের মুখে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছুড়ে দিয়ে বিরুদ্ধতার এক নতুন দিক দেখিয়েছে চৈতনবুড়ো। এবং তাদের কাছ থেকে আদায় করা হাজার টাকা নাতনি ছুটুর জন্য রেখে দিয়ে সে রেখে গেলো ভালোবাসা ও মানবিকতার একটুকরো আবেদন। আর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, সেটি হল রাজনীতির নাটকীয় বিভঙ্গে নিম্নবর্গের সাহসী বিরুদ্ধাঘাত। আরও একটি জবাব অবশ্য চৈতনবুড়ো রেখে যায়, এবং সেটি রাজনৈতিক বাবুদের জন্য। ঘর ছাড়ার আগে দাওয়ার উপরে রেখে যায় ভোট বাবুদের দেওয়া জুতো জোড়া। পরিবর্তে তুলে নেয় নিজের খাটো ধুতি আর ফতুয়া। এ যেন ভোট বাবুদের রাজনৈতিক ভণ্ডামির বিরুদ্ধে মোক্ষম চপেটাঘাত। চৈতনবুড়ো তুলে নিয়েছে নিজের জীর্ণ বাঁশিখানা। আসলে, চৈতন্যের বিশেষ স্তর থেকে উঠে আসা চরিত্রের নামই তো চৈতনবুড়ো। নিম্নবর্গের চৈতন্যের এই প্রতিরোধ প্রবণতা থেকে এভাবে উঠে এসেছে অনিল ঘড়াইয়ের সাহিত্য।

‘জার্মানের মা’ গল্পে দেখা যায়, অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে জার্মানের বাপকে। দীর্ঘদিন ধরে জ্বরে আক্রান্ত জার্মানের গায়ের উত্তাপ আসলে প্রবল প্রতিহিংসা থেকে জাত। বারো বছরের নাবালক যে ছেলেটি কাঁচা বয়সেই বাপের হত্যার সাক্ষী হয়ে থাকে, তার মধ্যে প্রতিহিংসা তো জন্মাবেই। জার্মান নামটিও তাই হিটলারের মতো প্রতিহিংসাত্মক সংকল্পের প্রতীকী হয়ে ওঠে। তাই বাপের হত্যাকারী হারা ঘোষের খুনি মুখের আদলটা সে ভুলতে পারে না কিছুতেই। বাপের হত্যার প্রতিশোধ হত্যা দিয়েই নিতে চায় সে। “মেলা-খেলায় সে সুযোগ খোঁজে, তার হাতের ধার হেঁসুয়া আঁধার পথেও ঝলসে ওঠে আদিম ক্রোধে।”[৯]

জার্মানের মায়ের নিস্ফল আক্রোশ আর শাপ শাপান্তের মধ্যে নিম্নবর্গীয় নারীর অসহায় রূপটিও প্রকট হয়ে ওঠে। স্বামীর হত্যাকারীকে সঠিক শাস্তি দিতে না পারার ক্ষোভে প্রায় প্রতি ভোরেই কান্না ঠেলে আসে রম্ভাধাইয়ের গলায়। নিস্ফল আক্রোশে সে অভিশাপ দিতে থাকে হারা ঘোষের পরিবারের উদ্দেশ্যে – “মরবি, মুখে অক্ত উঠে মরবি। ধড়ফড়িয়ে মরবি। ওলাউঠায় মরবি।”[১০] অসহায় নারীকে ঠকাতে চায় সবাই। নিজের স্বামীর হেফাজতের ভাগাড়টা জ্ঞাতিভাই রামফল ঠকিয়ে নিতে চায়। ভাগ দেবার অঙ্গীকার করেও সে নির্দ্বিধায় ঠকিয়ে যায় রম্ভাধাইকে।

কিন্তু প্রতিহিংসার সন্ত্রাস দিয়ে নয়, জীবন চেতনার এক নতুন মূল্যায়নে বড়ো হয়ে উঠেছে গল্পটি। জার্মানের বাপের হত্যাকারী হারা ঘোষকে দুর্যোগের দিনে সাহায্য

করে জার্মানের মা ছুড়ে দিয়েছে একটি নীরব প্রশ্ন – বিবেক ও মনুষ্যত্বের প্রশ্ন। হারা ঘোষের সদ্যোজাতকে বাঁচিয়ে জার্মানের মা দিতে চেয়েছে বিরুদ্ধতার এক নতুন ভাষা। জার্মানের মা বলে – "কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিল। পরে সেই কৃষ্ণই কংসকে বধ করে।"[১১] আসলে, হিংসার বদলে প্রতিহিংসা নয়, দারিদ্র্য আর নিপীড়নের কাছে পদানত হয়েও নিম্নবর্গের চৈতন্যের এই বিপ্লবে ব্যতিক্রমী হয়ে জেগে থাকে অনিল ঘড়াইয়ের সাহিত্য।

'লাশ খালাস' গল্পে এসে দেখা যায়, নিধু ডোম বেত নুয়ানো এক ছিপছিপে মানুষ। কারণ নিধু ডোমের মতো নিম্নবর্গীয় মানুষের কাছে বেঁচে থাকা, "মানে পেটপুরে খাওয়া,...নেশার সময় বাণ্ডিল দেড়েক বিড়ি, সের খানেক পাচুয়া।"[১২] নিধু ডোম তাই পিঠে হাত বুলিয়েও কিছুতেই শিরদাঁড়ার অস্তিত্ব খুঁজে পায় না। মরা পেটের জন্য শিরদাঁড়াটাই জল হয়ে যায়। বিপ্লবী তপাবাবু যখন নিধু খুড়োর কাছে প্রশ্ন তোলে – "পশুর মতো বেঁচে থাকতে তোমার ভালো লাগে নিধুখুড়ো?"[১৩] তপাবাবুর সেই রক্তরাঙ্গা চোখ আর তার দেওয়া কালো অস্ত্রের ভাষা তখন নতুন করে জাগিয়ে তোলে নিধু খুড়োকে। খড়ের গাদা থেকে চালের হাড়িতে সে আশ্রয় দেয় অস্ত্রটিকে। তখন নিধু খুড়োর পেট পুরে খেয়ে বেঁচে থাকা জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে যায় অস্ত্রটি। প্রশাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে নিধুখুড়ো এই প্রথম কেঁচোর মতো বেঁচে থাকার পরিবর্তে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াল। কাতার দড়ি খুলে তপাবাবুর মতো দেখতে লাশটিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে নেমে এল মস্ত ছাতির গাঙ-এ। ঢেউয়ের মাথায় বাবুটিকে ভাসিয়ে দিয়ে টানটান হয়ে দাঁড়ালো বেত নুয়ানো ছিপছিপে মানুষটা। অনিল ঘড়াই তাঁর সাহিত্যে দারিদ্র্যের মধ্যেও নিম্নবর্গীয় মানুষের এই সোজা হয়ে দাঁড়ানোটা তুলে ধরতে চেয়েছেন।

অনিল ঘড়াইয়ের সাহিত্য পাঠককে কোনও বৃহৎ পৃথিবীর খোঁজ দেয় না, দেয়নি কোনও বৃহৎ রাজনৈতিক ধারণাও। 'পিঁপড়ের জীবন' গল্পে যখন বলা হয় – "ধসের মুখে দাঁড়িয়ে আছি গো, কখন যে খাদের নীচে ঠিকরে পড়ব জানি না।"[১৪] তখন এই ধসের মুখে দাঁড়িয়ে থাকাটা কোনও দেশকালের অবস্থান বা কোনও জিওগ্রাফিকাল ম্যাপের নিদর্শন নয়। এই ধসের মুখে দাঁড়িয়ে থাকাটা নিম্নবর্গের অবস্থানের গ্রাফকে নির্দেশ করে, নির্দেশ করে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রভু ও অধীনের দাঁড়িপাল্লার একদিক ঝুঁকে পড়াকে। 'পিঁপড়ের জীবন' গল্পে দেখা যায়, মানুষের জীবনটা আসলে পিঁপড়ের সমতুল্য। পিঁপড়ের মতো অসহায় গরীব মানুষের জীবনও আসলে বৈষম্যের চাকায় যে কতভাবে পিষ্ট হচ্ছে, তার কোন হিসেব নেই। তাই পিঁপড়ের ডিম সংগ্রহের অপরাধে গ্রামপ্রধান যখন সাধনকে শাস্তি দিতে চায়, পরিবেশের ইকো সিস্টেম নষ্ট করার জন্য দায়ী করে সাধনকে, তখন সাধনের চৈতন্যের মধ্যে কাজ করে পিঁপড়ের ক্ষুদ্র দংশন। কারণ অনিল ঘড়াইয়ের সাহিত্যে বৃহৎভাবে জ্বলে ওঠা না থাকলেও আছে

পিঁপড়ের মতো এই ক্ষুদ্র দংশন। সাধন হঠাৎ বলে ওঠে – "দিনভর আমরা কত পিঁপড়ে পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলি ! বাবু গো – সব কিছুর যদি চুলচেরা হিসেব থাকতো তাহলে গরিবগুলো না খেতে পেয়ে মরত না।"[১৫] চৈতন্যের এই একক জাগরণে সাধন শেষপর্যন্ত এক পিঁপড়ে পাওয়া ভূত। সে হয়ে উঠেছে মহাজনের প্রতিদ্বন্দ্বী। মহাজনের মুখের উপরে সে জানায়, "ভগবান হাত পা দিয়েছে, মুনিশ খেটে খাব, না পারলে জু নেব ঘরে বসে তবুও কারও ঘর ভেঙে নিজের পেট ভরাতে পারব না।"[১৬]

ব্যাপক কোনও আন্দোলন বা বিদ্রোহ-বিপ্লবের প্রবণতা নিয়ে অনিল ঘড়াইয়ের সাহিত্য উঠে আসেনি বটে, কিন্তু তাঁর সাহিত্যে আছে একক চৈতন্যের স্ফুরণ। আছে চরিত্রের জীবনবোধে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাঁক বদল তাঁর সাহিত্যে যারা উঠে এসেছে তাদের জীবনের প্রধান চালিকাশক্তি দারিদ্র্য। আর এই দারিদ্র্যের মধ্য দিয়েও তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে নিম্নবর্গীয় চৈতন্যের জাগরণ। তাদেরকে দাঁড় করিয়েছে বৃহৎ পৃথিবীর অঙ্গনে। কোনও তাত্ত্বিক মতাদর্শের উদ্ভব বা প্রেরণা তাদের মধ্যে কাজ করেনি বটে, কিন্তু নিম্নবর্গীয় জীবনের বহুমুখী অভিঘাত থেকে জন্ম নেওয়া জীবনসম্পৃক্ত দার্শনিক প্রত্যয় চালিত করেছে তাদেরকে।

তথ্যসূত্র :

১। ভদ্র, গৌতম এবং চট্টোপাধ্যায় পার্থ। নিম্নবর্গের ইতিহাস । কলকাতা : আনন্দ, ১৯৯৮। পৃঃ ৮

২। ঘোষ, অভ্র (সম্পা)। পরিচয়। প্রসঙ্গ দলিত। কলকাতা, নভেম্বর ২০-২১। পৃ. ৩৬

৩। বিশ্বাস, অধীর (সম্পা)। গাঙচিল। দলিত সংখ্যা। কলকাতা, এপ্রিল ২০১৯। পৃ. ৮৬

৪। সিংহ, কঙ্কর। আমি শূদ্র, আমি মন্ত্রহীন। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন। কলকাতা, নভেম্বর, ২০০২। পৃ. ৫৩

৫। ভদ্র, গৌতম এবং চট্টোপাধ্যায় পার্থ। নিম্নবর্গের ইতিহাস । কলকাতা : আনন্দ, ১৯৯৮। পৃঃ ১৭

৬। ঘড়াই, অনিল । অনিল ঘড়াইয়ের শ্রেষ্ঠ গল্প। কলকাতা : দে'জ পাবলিকেশন, ২০০৪। পৃঃ ২৫

৭। ভদ্র, গৌতম এবং চট্টোপাধ্যায় পার্থ। নিম্নবর্গের ইতিহাস । কলকাতা : আনন্দ, ১৯৯৮। পৃঃ ২০

৮। ঘড়াই, অনিল। অনিল ঘড়াইয়ের শ্রেষ্ঠ গল্প। কলকাতা : দে'জ পাবলিকেশন, ২০০৪। পৃঃ ২৫

৯। ঘড়াই, অনিল। সেরা পঞ্চাশটি গল্প। কলকাতা : দে'জ পাবলিকেশন, ২০১৪। পৃঃ ১১৬

১০। ঐ, পৃঃ ১১২

১১। ঐ, পৃঃ ১২৪

১২। ঘড়াই, অনিল। অনিল ঘড়াইয়ের শ্রেষ্ঠ গল্প। কলকাতা : দে'জ পাবলিকেশন, ২০১৪। পৃঃ ১১৫

১৩। ঐ, পৃঃ ১১৪

১৪। ঘড়াই, অনিল। সেরা পঞ্চাশটি গল্প । কলকাতা : দে'জ পাবলিকেশন, ২০১৪। পৃঃ ২৪৩

১৫। ঐ, পৃঃ ২৪৮

১৬। ঐ, পৃঃ ২৫১

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। ঘড়াই, অনিল । অনিল ঘড়াইয়ের শ্রেষ্ঠ গল্প । কলকাতা : দে'জ পাবলিকেশন, ২০১৪।

২। ঘড়াই, অনিল । সেরা পঞ্চাশটি গল্প । কলকাতা : দে'জ পাবলিকেশন, ২০১৪।

৩। ঘোষ অভ্র (সম্পা)। পরিচয়। প্রসঙ্গ দলিত। কলকাতা, নভেম্বর ২০-২১।

৫। বিশ্বাস অধীর (সম্পা)। গাঙচিল। দলিত সংখ্যা। কলকাতা, এপ্রিল ২০১৯।

৬। ভদ্র, গৌতম এবং চট্টোপাধ্যায় পার্থ । নিম্নবর্গের ইতিহাস । কলকাতা : আনন্দ, ১৯৯৮।

৭। সিংহ কঙ্কর। আমি শূদ্র,আমি মন্ত্রহীন। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন। কলকাতা, নভেম্বর, ২০০২।

শরৎচন্দ্রের নির্বাচিত গল্পে সামাজিক অনুশাসন

সমরেশ বাগ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : সমাজ জীবনে মানুষকে চলতে গেলে বিভিন্ন নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। মানুষ তার ইচ্ছা মতো যে কোন ক্রিয়াকলাপ করতে পারে না সমাজের বুকে। প্রয়োজনে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন ব্যবস্থা আছে, শাসন ব্যবস্থা আছে। ঠিক তেমনি শরৎ সাহিত্যে তৎকালীন সমাজের একপ্রকার অনুশাসন ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়, যা মূলত চালিত হত জমিদার বা সমাজপতিদের দ্বারা। আমারা এখানে তৎকালীন সমাজে চালিত নিয়ম-কানন নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

মূল শব্দ : সমাজ, অনুশাসন, পথ- নির্দেশ, অনুপমার প্রেম, বিলাসী, মহেশ, একাদশী বৈরাগী

মূল আলোচনা :

সাধারণত সামাজ বলতে মানুষের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে বোঝায়। কিন্তু আমরা মানুষের সঙ্গে মানুষের সকল প্রকার সম্পর্ককে সামাজিক সম্পর্ক বলতে পারি না। কারণ সেই সম্পর্ক যদি পারস্পরিক উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে গড়ে না ওঠে তবে তাকে সমাজ বলা যায় না। সমাজ অভিজ্ঞ ম্যাকাইভার সমাজ বলতে সামাজিক সম্পর্কের সামগ্রিক দিককে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে যখন একাধিক ব্যক্তি একত্রে বসবাস করে তখন তাদের মধ্যে বিভিন্ন পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধন সৃষ্টি হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্য বোধ না থাকলে কখনও সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। তাঁর সমাজ সম্পর্কিত মন্তব্যটি হল – সমাজ হলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে প্রথা প্রণালী, কর্তৃত্ব, ও পারস্পরিক সাহায্য, বিভিন্ন দল ও শ্রেণী, মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রন ও স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকে ও রক্ষিত হয়। তাঁর মতে এ ব্যবস্থা নিয়ত পরিবর্তনশীল ও জটিল। আর ঐ জটিল পরিবর্তনশীল ও জটিল ব্যবস্থারই অপর নাম সমাজ।

সমাজ বিজ্ঞানিগণ ব্যপক অর্থে সমাজকে বলেছেন সামাজিক সম্পর্ক। অর্থাৎ সমাজ অন্তর্ভুক্ত মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে সমাজ বলে উল্লেখ করেছেন। সমাজবিজ্ঞানি জিসবার্ট (Jisbert) বলেছেন সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের একটি জটিল জাল। যে জালের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং ঘনিষ্ঠ থাকে।

আর সামাজিক অনুশাসন হল একটি পন্থা যার দ্বারা সমাজ অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিবর্গকে একটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ সমাজ জীবনে মানুষ পুরোপুরি স্বাধীন বা মুক্ত নয়। বরং তাকে সমাজ জীবনে চলতে গেলে অনেক নিয়ম-কানুন, আদেশ-উপদেশ, আজ্ঞা-বিধান, ইত্যাদি শৃঙ্খলা মেনে সমাজে বসবাস করতে হয়।

রুশো যেমন তাঁর সমাজ সম্পর্কে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেছেন "মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন কিন্তু জীবনের সর্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলিত"[১] এই আবদ্ধতা মূলত সমাজের শৃঙ্খলাকে বাজায় রাখার জন্য, মানুষকে বিশৃঙ্খলতা থেকে বিরত রাখার জন্য।

নিয়ন্ত্রণহীন কোন গাড়ির মত মানব সমাজও অনিয়ন্ত্রিত হয়ে চলতে পারে না। সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমাজবদ্ধ মানুষ তাই সভ্যতার শুরু থেকেই অনুভব করে আসছে। ব্যক্তি ও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের আচরণকে কিছু নিয়মনীতি ও পদ্ধতির সহায়তায় নিয়ন্ত্রিত রাখার এই প্রয়াস মানব সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিক। যা সামাজিক ভারসাম্য এবং সামাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে সাহায্য করে। এটাই হল সামাজিক অনুশাসন।

তবে এই অনুশাসন ব্যবস্থা আমরা দু'রকম ভাবে পেয়ে থাকি যথা - মৌখিক অনুশাসন আর অন্যটি হল লিখিত অনুশাসন। বর্তমান যুগে আমরা লিখিত অনুশাসনের দ্বারা চালিত হলেও শরৎ সাহিত্যে তৎকালীন সময়ে আমরা মৌখিক অনুশাসনের চিত্র দেখতে পাচ্ছি যা মূলত চালিত হত গ্রামের জমিদার বা সমাজপতিদের দ্বারা। তবে এই অনুশাসন ব্যবস্থা কতটা সমাজ বা গোষ্ঠীর কিংবা ব্যক্তির সুস্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা পরবর্তীতে আলোচনার বিষয়। আমরা শরৎচন্দ্রের নির্বাচিত গল্পে কীভাবে এই সামাজিক অনুশাসনের চিত্র উঠে এসেছে তা নিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

শরৎচন্দ্রের 'পথ-নির্দেশ' গল্পে আমরা দেখতে পাই সুলোচনা তার স্বামীর মৃত্যুর পর সর্বস্ব হারিয়ে তেরো বছরের মেয়ে হেমনলিনীকে নিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে আমহার্স্ট স্ট্রিটের গুণেন্দ্রর কাছে। পূর্ব পরিচয় এটুকুই তারা একসময় তাদের পাশের বাড়িতে থাকত আর যখন শিশুবস্থায় গুণেন্দ্রর মা মারা যায় তখন এই সুলোচনাই তার পরিচর্যা করেছিল। তবে মেয়ে হেমনলিনীর এরকম অপরিচিতের বাড়িতে আসার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তবু মায়ের কথায় বাধ্য হয়ে আসতে হয়। কারণ সুলোচনা জানে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সামর্থ তার নেই। আর মেয়ের উপযুক্ত বয়সে বিয়ে দিতে না পারলে সে কথা সমাজের মানুষ মেনে নেবে না। ফলে তাদের সমাজের মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে। এটাই সমাজের নিয়ম। আর সেই কথাই মা ও কন্যার কথোপকথনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। "হেম বলিল, বিয়ে নাই দিলে? (মায়ের উত্তর) জাত যাবে যে ... তা হলেও গাঁ ছাড়তে হবে। জাত গেলে কেউ উঠান ঝাঁট দিতেও ডাকবে না"[২]

এরপর সুলোচনা যখন কন্যা হেমের সাথে গুণেন্দ্রর পরিচয় করিয়ে দেয় তখনও তাকে এক সামাজিক অনুশাসনের বসবর্তী হয়ে বলতে শোনা যায় "গুণী, হেমকে তোর হাতেই দিতাম, যদি না দেশাচারে নিষেধ থাকত"[৩] এরপর যখন হেম ও গুণেন্দ্রর পরিচয় স্বাভাবিক হয়েছে, দু'জনের মধ্যে একটা আদরের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তখনও গুণেন্দ্রর ব্রাহ্ম হওয়ার ফলে মা ও মেয়ের কাছে সামাজিক নিয়ম নীতির কারণে একটা দূরত্ব থেকেই গেছে। তাই গল্পে দেখা যায় গুণেন্দ্র আদালত থেকে ফিরে একটা বই

নিতে পড়ার ঘরে ঢুকতে গেলে ভিতর থেকে হেমকে বলতে শোনা যায় এখন খাচ্ছি ঘরে এসো না। এর উত্তরে করুণ কণ্ঠে যখন গুণেন্দ্র বলে আমি গেলেই কি তোমার খাওয়া নষ্ট হবে? তখনও হেমকে বলতে দেখা যায় সারা ঘরময় কার্পেট পাতা। তখন গুণেন্দ্রকে ব্যথিত কণ্ঠে বলতে শোনা যায় "তোমার দাসী মানদা ঢুকলে জাত যায় না, আমি কি তার চেয়ে ছোট?"[৪] এই ঘটনার পর হেম তার ভুল বুঝতে পেরে প্রতিকার স্বরূপ পরের দিন গুণেন্দ্রর ভাত খেয়ে ওঠা পাতে ভাত খেতে বসলে সুলোচনাকে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে বলতে দেখা যায় "ওযে গুণীর এঁটো পাত; যা, কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে আয়"[৫]

এরপর আমরা যদি 'অনুপমার প্রেম' গল্পটির দিকে তাকাই তাহলে সামাজিক অনুশাসনের আর এক ছবি আমাদের নজরে আসে। গল্পে আমরা দেখতে পাই অনেক সাধ্যসাধনার পর অনুপমার সাথে সুরেশের বিয়ে ঠিক হয়েছে। সব কিছু প্রস্তুত বিবাহের অয়োজন রীতিমতো তুঙ্গে, এমন সময় সমস্যা তৈরি হয় বরকে না পাওয়া নিয়ে। বরকে খোঁজাখুজি, ভাগ্যকে দোষারোপ ইত্যাদি করতে করতে যখন লগ্ন পেরিয়ে যায় যায় তখন গৃহিণীর উৎকণ্ঠিত মন্তব্যে কর্তাকে বলতে দেখা যায় "এই হতভাগা মেয়ের জন্য বৃদ্ধবয়সে আমার মান গেল, যশ গেল, জাতি গেল, এখন একঘরে হয়ে থাকতে হবে"[৬] অর্থাৎ পাত্রের নোংরা চালাকির শিকার হয়ে মেয়ে লগ্নভ্রষ্ট হতে চলেছে বলে কেবল মেয়ে নয় গোটা পরিবারকে সমাজচ্যুত হতে হবে।

এর পরের অংশে গল্পের আরো চরমতম পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। জাতি কুল মান রক্ষা করার জন্য এগার বছরের অনুপমার সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্র তুলে আনা হয় বহুকাল বিপত্নীক থাকা বৃদ্ধ কাশরোগাকান্ত রামদুলালকে। বর দেখে মেয়ে কেঁদে বাপের কাছে আত্মহত্যা করার কথা জানালে তার বাবাকে বলতে দেখা যায় "যা ইচ্ছে হয় কাল খেয়ো মা, আজ বিয়ে দিয়ে আমার জাত বাঁচাই, তারপর যেমন খুশি করো, বিষ খেও, জলে ডুবে ম'রো, আমি একবারও বারণ করব না" [৭] সমাজের বুকে জাতিকে রক্ষা করার এই নিয়ম বড় কঠিন নিয়ম। পরিবার বা কোন সদস্য এই নিয়ম নীতি বা অনুশাসনের ফলে আহত বা ক্ষত বিক্ষত হোক তাতে কিছু যায় আসে না, চরম সত্য হত জাতি ধর্ম সম্মান, যা কোন সদস্য বা পরিবার অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ, আর তাকে রক্ষা করাই কর্তব্য।

এরপর আমরা যদি শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী' গল্পের দিকে তাকাই তাহলে সামাজিক অনুশাসনের আর এক চিত্র দেখতে পাই। গল্পে দেখতে পাই পিতা মাতা হারা এক ছেলে মৃত্যুঞ্জয় শারীরিক অসুস্থতার কারণে দীর্ঘদিন মৃত্যুর সাথে যুঝে এবং এক সাপুড়ে কন্যার বহুদিনের প্রচেষ্টায় প্রাণ ফিরে পেলে, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিজেকে দান করে বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। আর এখানেই সমস্যা তৈরি হয়। যখন সে দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে এক দীর্ঘ আমবাগানের শেষ প্রান্তে পড়েছিল তখন গ্রামবাসীর সময় বা সুচিন্তা হয়নি মৃত্যুমুখী ছেলেটার কিছু পরিচর্যা করা হোক। কিন্তু যেই দেখা গেল এক

সাপুড়ে কন্যা তার সর্ব শক্তি দিয়ে এই প্রাণটাকে বাঁচিয়ে তুলেছে এবং দু'জনে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। তখনই মৃত্যুঞ্জয় তুলনামূলক উচ্চজাতি হয়ে নিচ এক সাপুড়ে কন্যার সাথে বিয়ে করা এবং সেই স্ত্রীর হাতে রাঁধা ভাত খেয়ে জাতিকে জলাঞ্জলি দেওয়ার অপরাধে গ্রামের কিছু লোক একজোট হয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাকে ঘরে আটকে রেখে সাপুড়ে কন্যা বিলাসীকে টানতে টানতে গ্রাম থেকে বাইরে বার করে দেয়।

আমরা 'মহেশ' গল্পে দেখতে পাই গফুর এক মুসলমান প্রজা হয়ে হিন্দু জমিদারের অধীনে বসবাস করে। গফুরের পরিবারে আছে এক বছর দশেকের মেয়ে আর সন্তানসম একটি ষাঁড়। গফুর তার অভাবের কারণে যেমন পিতা কন্যা দু'বেলা পেট ভরে খেতে পারে না তেমনি বাড়িতে খড় না থাকায় সন্তানসম মহেশকে পেট ভরে খেতে দিতে পারে না। আর না খেতে পেয়ে অবুঝ মহেশ দড়ি ছিঁড়ে পেটের জ্বালায় অন্যের বাগান ঢুকে গাছপালা খেলে, কিংবা জমিদারের বাগানে ঢুকে কিছু ক্ষতি করলে তাকে তার জন্য লাঞ্ছিত হতে হয়, অথবা খোঁয়াড়ে দেওয়ার কারণে জরিমানা দিয়ে ছাড়িয়ে আনতে হয়। এত কিছুর পরেও গফুর যখন মহেশকে আর খেতে দিতে না পারার কারণে বেচে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন হিন্দু জমিদারের অধীনে বাসরত প্রজার প্রতি জমিদারের অনুশাসনের চিত্রটি দেখা যায় "শিবুবাবু চোখ রাঙ্গা করিয়া কহিলেন, গফরা তোকে যে আমি কি সাজা দেব ভেবে পাইনে। কোথায় বাস করে আছিস, জানিস?"[৮]

শুধু তাই নয় যখন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে সমস্ত পুকুর খাল শুকিয়ে গ্রামবাসীর পিপাসার জল সর্বত্র পাওয়া যায় না, তখনও হিন্দু জমিদারের অধীনে মুলসমান প্রজা বলে জাতিগত বৈষম্যের কারণে গফুর কন্যা আমিনা সকলের সাথে গিয়ে জল নিতে পারে না। তাকে দূরে কোথায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় অন্যের দয়াভিক্ষার আশায়। যদি কেউ পাত্রে জল ঢেলে দেয়।

আর একটি গল্প 'একাদশী বৈরাগী' তে দেখা যায় একাদশী তার বৈমাত্রেয় বোনকে খুব ছোটবেলা থেকে কষ্ট করে লালনপালন করে বড় করে তোলে। যথাসময়ে বিয়ে দিলেও খুব অল্প বয়সেই বিধবা হয়ে ঘরে ফেরে। তাতেও খুব ক্ষতি হয়নি, দাদার সংসারে আদর যত্নে থাকতে থাকে। কিন্তু বয়স ও বুদ্ধির দোষে কুল ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলে দাদা আবার অনেক চেষ্টাচরিত্রে ঘরে ফিরিয়ে আনল বটে কিন্তু গ্রামসমাজ আর তাদের মেনে নিল না। ফলে গ্রামের লোকের নিষ্ঠুর অনুশাসনে আসতে আসতে ধোপা, নাপিত, মুদি প্রভৃতি বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে একাদশীকে বাধ্য হতে হয় বসতি উঠিয়ে অন্য গ্রামে বাস করতে।

উপরিউক্ত কয়েকটি গল্পের সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে দেখতে পেলাম তৎকালীন সমাজে, সমাজ পরিচালনার নাম করে যে অনুশাসন ব্যবস্থা পরিচালিত

হচ্ছিল তা মূলত শোষণেরই আর এক রূপ। সহায় সম্বলহীন পরিবারের কন্যার বিয়ে দিতে না পারলে তাকে একঘরে করা, বিবাহদিনে বর না এলে পরিবারের জাতি বাঁচাতে প্রয়োজনে বৃদ্ধের সাথে বিয়ে দিয়ে মেয়েকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া, পরিবারের কোন সদস্য ভুল করলে সেই পরিবারের ধোপা, নাপিত, মুদি বন্ধ করে দেওয়া কিংবা নিচু জাতের কোন মেয়ের সাথে বিয়ে করলে জাতিচ্যুত হওয়া অথবা ভিন্ন জাতের মানুষ বলে প্রয়োজনের জলটুকু সবার সাথে নিতে না পারা ইত্যাদি এটা কোন অনুশাসন নয় অনুশাসন হল সেটাই যেটা সাধারণ মানুষকে একত্রে সুষ্ঠ সুন্দরভাবে বাঁচতে সাহায্য করে। যা মানুষকে পৃথক করে না বরং সকলকে একই ছাতার নিচে নিয়ে আসে। সেটাই হল প্রকৃত অনুশাসন। তাই শরৎ সাহিত্যের তৎকালীন সমাজের শাসন ব্যবস্থা আজকের দিনে মূল্যহীন।

তথ্যসূত্র :

১. ড. এ. এফ. ইমাম আলি এবং ড. মীজানুর রহমান মিয়া (সম্পাদনা), সমাজচিন্তা ও সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ, নভেল পাবলিশিং হাউস, আগস্ট, ২০০৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৭

২. চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশরৎ চন্দ্র, ‘শরৎ গল্প সমগ্র’, পতিতপাবন পাবলিশার, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ, মার্চ, ২০২১, পৃ- ৭২

৩. তদেব, পৃ – ৭৫

৪. তদেব, পৃ – ৮০

৫. তদেব, পৃ –৮০

৬. তদেব, পৃ – ২৩৬

৭. তদেব, পৃ – ২৩৬-২৩৭

৮. তদেব, পৃ –৩০৯

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে দেশাত্মবোধক সংগীতের স্ফূরণ ও বিবর্তন: একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

দেবলীনা ভট্টাচার্য্য
স্যাক্ট, ইতিহাস বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে যে নতুন রাষ্ট্রনৈতিক জাতীয় চেতনারসূত্রপাত হয় তার বৈশিষ্ট্য হল স্বাদেশিকতার স্ফূরণ ও রাজনৈতিক চেতনারউদ্বোধন। এই জাতীয়তাভাব ও রাজনৈতিক আন্দোলন অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতবর্ষে বিশেষ কতগুলি কারণে এই জাতীয়তাবোধের স্ফূরণ ও প্রসার ঘটতে থাকে। ইংরেজ শাসনের ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পোস্টঅফিস প্রভৃতির সহায়তায় এই বিশাল উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে যাতায়াতের সুবিধা ও যোগাযোগের ব্যবস্থার প্রবর্তন এক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। ইংরেজ ভারতবর্ষের বংশভিত্তিক বৃত্তিগত অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে দিয়ে সামাজিক ব্যবস্থায়যে বিপর্যয় নিয়ে আসে তাতে জীবিকার নতুন শর্তেই জাতীয় চেতনার বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে। বিভিন্ন প্রজা বিদ্রোহ ও ইংরেজদের নিপীড়ন যেমনসাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিবাদী ঐক্য গড়ে তোলে তেমনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও অবদমনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটতে থাকে। বস্তুত সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) এবং নীল বিদ্রোহের (১৮৬০) পর থেকে বুদ্ধিজীবী মহলে এক ধরনের জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়েছিল যা পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। বাংলাদেশের তৎকালীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগামী পুরুষদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ডিরোজিও (১৮০৯-৩১), বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৬-১৯২৬) এবং ঠাকুর পরিবারের দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৫) ও রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) প্রমূখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের এই জাতীয় আন্দোলনের বাংলাদেশের সংস্কার আন্দোলনে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। অতিক্ষীণ ধারায় একে বাংলা তথা ভারতবর্ষের বুকে প্রবাহিত হতে দেখা গেছে। ইউরোপে যেমন দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য, সংগীত, সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি অর্থনীতি সমস্ত দিকেই নবজাগৃতির প্রাণশক্তির দুর্বার আত্মপ্রকাশ ঘটতে দেখা যায়, এদেশে তেমন ঘটেনি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর পর দেশে এক নতুন জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল।এরই একটি অংশ ইংরেজ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহের মুৎসুদ্দীগিরি অথবাসরকারি চাকরি করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ভারতের কৃষক বিদ্রোহ

এবং ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় বিদ্রোহের প্রতি বুদ্ধিজীবীদের উপেক্ষার মানসিকতার জন্য জনসাধারণের মনে তাঁদের সম্পর্কে একটা সন্দেহের মনোভাব গড়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ শাসনে দেশের সাধারণও কৃষিজীবী মানুষের জীবনে দুঃখ কষ্ট তখন অবর্ণনীয় আকার ধারণকরেছিল, এরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সারা দেশব্যাপী বিক্ষিপ্তকৃষক বিদ্রোহ এবং সিপাহী বিদ্রোহ আংশিকভাবে জাতীয় বিদ্রোহের রূপপরিগ্রহ করেছিল।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল্য বিচারে বলা যায় যে, ভারতেরপ্রথম দিকের রাজনৈতিক সংগঠন ছিল 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫১) 'ইন্ডিয়ান লিগ' (১৮৭৫) এবং 'ভারত সভা' (১৮৭৬) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। এগুলির ছিল মূলত ধনী অভিজাত সম্প্রদায় এবং উচ্চ সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত আধা-রাজনৈতিক সংগঠন। এদের মধ্যে'ভারতসভা'ই ছিল কিছুটা রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন। তবে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ববৃন্দের মধ্যে অন্যতম রাজনারায়ণ বসুরনাম, এদেশে প্রথম প্রকাশ্যে জাতীয়তাভাব প্রচারের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুর পরিবারের দ্বিজেন্দ্রনাথ , গণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং নবগোপাল মিত্র কে নিয়ে রাজনারায়ণেরই উদ্যোমে সংগঠিত হয়েছিল প্রথম "স্বাদেসিকদের সভা" এর প্রায় কয়েক বছর পরেমূলত ঠাকুর পরিবারের প্রধান পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা হয় 'হিন্দুমেলা'র (১২ এপ্রিল ১৮৬৭)। চৈত্র সংক্রান্তির দিন বেলগাছিয়ারডানকিন সাহেবের বাগানে এই মেলার উদ্বোধন হয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার এতবছর পূর্বে তৎকালীন বাঙালি সমাজ এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সর্বভারতীয়ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দুমেলার উদ্যোক্তারা সাবলম্বন ওসর্বক্ষেত্রে জাতীয় বিকাশের কথা চিন্তা করেছিলেন। ধনী, অভিজাত শ্রেণী, মধ্যবিত্ত, কৃষক, কারিগর, শিল্পী, মজুর এককথায়বলা যায় যে, দেশের আপামর জনসাধারণকে তাঁরা হিন্দুমেলার প্রাঙ্গণেএকত্রিত করবার যে প্রয়াস ও পরিকল্পনা করেছিলেন তা অভূতপূর্ব ও ভারতবর্ষের ইতিহাসে নজিরবিহীন। এই শতকের ষষ্ঠ ও সপ্তম দশক থেকেজাতীয় আন্দোলনের ভাবধারা রূপ দিতে শুরু করেছিল। রঙ্গলাল ওমধুসূদনের কাব্য নাটকে তার প্রকাশ ঘটেছিল। কবি রঙ্গলালের কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে—

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চাই হে কে বাঁচিতে চাহে,
দাসত্ব শৃঙ্খল বলকে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়.......' *১

স্বাদেশিকতার জোয়ার লেগেছিল দীনবন্ধুর নাটকেও। তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটক বিদেশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। নীল বিদ্রোহেরপ্রভাবে সারা বাংলা যখন উত্তাল, কৃষকের অভ্যুত্থানে যখন বাংলার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মনেও বিপুল সাড়া জেগেছিল, এমন একটা সময়ে দীনবন্ধুমিত্রের এই নাটক অসমসাহসিকতার পরিচয় বহন করেছিল।এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল'(১৮৭৬)

পাস। ১৮৮০-১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অস্ত্র আইন, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, বিচার বৈষম্য নিয়ে কুলি আইনের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। বস্তুত এই পর্বে রচিত স্বদেশী সাহিত্য, সংগীতের মধ্যবিত্ত মানসিকতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলা তথা ভারতবর্ষের জাতীয়তাভাব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুমেলার মধ্যে যে চেতনার সংহত হয়েছিল, সেই চেতনার পরোক্ষ অভিব্যক্তিই এই সময়কার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কিরণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের ‘ভারতমাতা’ (১৮৭৩), হরলাল রায়ের ‘বঙ্গের সুখাবসান’(১৮৭৪), জোতিরিন্দ্রনাথের ‘পুরুবিক্রম’(১৮৭৪) প্রভৃতি নাটকের মধ্যে স্বদেশিকতার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’-এ (১৮৮২) মূলত স্বাদেশিকতার প্রেরণাই উদ্বুদ্ধ করেছে। *2

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে প্রথম ব্যাপক রাজনৈতিক গণআন্দোলন সূচনা হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রথম গৃহীত হয় লর্ড কার্জনের শাসনকালে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে। একই দিনে ভারত সরকার সাক্ষরিত এক পত্রে বাংলার সরকারের কাছে প্রস্তাব করা হয় যে, চট্টগ্রাম বিভাগ ও ময়মনসিংহ জেলা আসামের সঙ্গে যুক্ত হোক। এই প্রস্তাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গে এক তুমুল আন্দোলন শুরু হয়। জেলায় জেলায় সভা-সমিতি করে সরকারি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথের ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে অর্থাৎ এর পরের বছরই লর্ড কার্জন বাংলায় ভাইসরয় হন। ‘বয়কট’ মন্ত্র প্রচারে মতিলাল ঘোষ (১৮৪৭-১৯২২), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫), কৃষ্ণ কুমার মিত্র (১৮৫২-১৯৩৬) ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন নিজেদের পত্রিকার মাধ্যমে। ১৬ই অক্টোবর বঙ্গবিভাগের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৭ই আগস্ট কলকাতার টাউন হলে এক ঐতিহাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পৌরহিত্যে অবিসংবাদিতভাবে ‘বয়কট’ প্রস্তাব গৃহীত হয়। পূর্বঘোষণা অনুযায়ী ১৬ই অক্টোবর বাংলাদেশ দ্বিখন্ডিত হয়। বাঙালি জাতির নবজাগ্রত স্বদেশপ্রেম এই অপমানজনক পরিস্থিতিকে রোধ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে ১৬ই অক্টোবর (৩০ শে আশ্বিন, ১৩১২) বঙ্গচ্ছেদ ঘোষণার দিন রাখীবন্ধন উৎসবে বাঙালি ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছিল। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের হাতে রাখী পরানো হয়েছিল। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল’ গানটি। *৩।

বস্তুত, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ছিল জাতীয় আন্দোলন। বিশেষ কোনও শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে পূর্ববাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা

ছাড়াও পাঞ্জাব, বোম্বাই ও মাদ্রাজ, প্রেসিডেন্সি ইত্যাদি অঞ্চলে এই আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের এই যুগে সঙ্গীত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। নবগোপাল মিত্র প্রবর্তিত ও রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তার জ্যোতিদাদার একান্ত আগ্রহে সংবর্ধিত হিন্দুমেলার প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বদেশী আচরণের সঙ্গে স্বদেশীয় পণ্য ব্যবহার এবং মানুষের মিলন, ঐক্য ও সংহতি অর্থাৎ গঠনমূলক স্বদেশিকতা, এই যুগে সমগ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষের স্বাদেশিকতার জোয়ার এসেছিল বিশেষ করে কবিতা ও গানে অগ্রণী বাংলাদেশে এসেছিল গানের জোয়ার। দেশবাসীকে উদ্বোধিত করার ক্ষেত্রে স্বদেশীগান এক অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, বলাবাহুল্য এই স্বদেশী গান সৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদান সর্বাপেক্ষা বেশি। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন— “বহু বৎসর আগে তাঁহার বাল্যকালে সঞ্জীবনী সভা’র উত্তেজনায় তিনি যে গান রচিয়েছিলেন...... সে গানের মধ্যে এই স্বদেশী যুগের অরুনাভর দীপ্তি ছিল, গানটি সুপরিচিত— ‘তোমারই তরে মা’। *৪ এর কিছুকাল আগে ১২৭৬ বঙ্গাব্দের রবীন্দ্রনাথ ‘একসূত্রে বাঁধিয়াছি’ গানটি রচনা করেন। ১২৯৩ সালে কলকাতায় প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশনে গীত হয়। ‘আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে’। তিনি স্বয়ং গানটি সভায় গেয়েছিলেন। *৫

একই সময়ে প্রায় আরও দুটি গান রচনা করেন তিনি— ‘কেন চেয়ে আছ গো মা’ এবং ‘আমায় বোলো না গাহিতে’। এইভাবে প্রথম বয়সে সাধারণত প্রয়োজনে, কখনও প্রেরণায় কবি সংগীত রচনা করেছিলেন। তাঁর স্বদেশ সংগীতের অধিকাংশেরই ঐতিহাসিক পটভূমিকা খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতেই “সে সব গানের ঐতিহাসিক পটভূমি নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেও উহাদের রসধর্ম কখনো নষ্ট হয় নাই, কারণ বিশেষকে ছাপাইয়া উহার ভাব স্থান-কাল নির্বিশেষে চিরন্তনতা লাভ করিয়াছে”। *৬

তার স্বদেশ সংগীত পারিবারিক ও নাগরিক সীমানা থেকে বহুগুণ সম্প্রসারিত করে সর্বকালের জাতীয় সম্পদে পরিণত হয়েছে। বলাবাহুল্য, তাঁর স্বদেশ ভাবনা ও চিন্তার মধ্যে কিছু বিশিষ্টতা বর্তমান। দেশপ্রেমে ও স্বদেশ জননীকে নিরীক্ষণের ভঙ্গি ও আদর্শে, তাঁর মাতৃ সম্বোধনে, আক্ষেপও বিলাপে, তাঁর নিবিড় গভীর প্রীতির আশ্বাস মন্ত্রে এই বিশিষ্টতা ফুটে উঠে বারংবার। তাঁর এই সঙ্গীতগুলি পরবর্তী সংগীত রচয়িতাদের পদে পদে প্রভাবিত ও প্রবুদ্ধ করেছে। তিনি যেমনভাবে লোকসংগীতের সুরে স্বদেশী গানের রূপগত পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা আজও অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি।

তবে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এবং সমসাময়িক সময়েও অনেকে স্বদেশী সংগীত রচনা করে জনমানসকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এই স্বদেশী সংগীত সৃষ্টিতে ঠাকুর পরিবারের কৃতিত্ব ছিল সর্বাধিক। বিশেষত দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী

দেবী ও রবীন্দ্রনাথ এবং পরবর্তীতে স্বর্ণকুমারীর কন্যা সরলা দেবীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের—

'মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারি
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচনবারি
চন্দ্রাজিনি- কান্তি নিরিখেয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি?
এ দুঃখ তোমার হায় সহিতে না পারি'। *৭

গণেন্দ্রনাথের রচিত গান:—

"লজ্জায় ভারতযশ গাইব কি করে,
লুঠিতেছে পরে এই রত্নের আকারে"।......*৮

এই গানটি হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে গীত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের একটি স্বদেশ সংগীত সেকালে বহুল সমাদৃত হয়। বহু মানুষের চিত্ত আলোড়িত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও গানটির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

"মিলে সবে ভারত সন্তান
একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান"।। *৯

হিন্দুমেলার প্রত্যেকটি অধিবেশনের প্রারম্ভে এই সঙ্গীত সমবেতভাবে গাওয়া হত। বাল্যকাল থেকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তিনিই সুপ্ত প্রতিভার সূত্রগুলিকে সঞ্জীবিত করেছিলেন। — তাঁর শ্রেষ্ঠ স্বদেশীগান হল:—

"চল রে চল সবে ভারত সন্তান,
মাতৃভূমি করে আহ্বান"।*১০

এই সময় সরলা দেবী রচনা করেন:—

'অতীত গৌরব বাহিনি মম বাণি! গাহ আজি হিন্দুস্থান! মহাসভা
উন্মাদিনী মম বাণি! গাহ আজি হিন্দুস্তান!
.......বঙ্গ, বিহার,উৎকল,মাদ্রাজ,মারাঠা,গুর্জর, পাঞ্জাব রাজপুতান।
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাবে, ' নমো হিন্দুস্থান'। *১১

'ভারতী'(মাঘ১৩০৮)পত্রিকায় প্রকাশিত গানটির পাদটীকায় আছে—
"এই সঙ্গীতটি জাতীয় মহাসমিতির সপ্তদশ অধিবেশনে ১৯০১খিষ্টাব্দে বাংলা,বিহার,আসাম,মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হিন্দু, পার্সি, জৈন, খ্রিস্টান ও মুসলমান সকল ধর্মাবলম্বী ৫৬ সংখ্যক গায়কগণ কতৃক সমস্বরে গীত হয়"।*১২

'বন্দেমাতরাম' ছাড়া আর কোন বাঙালি সংগীতকারের গান বোধ হয় তখনও সর্বভারতীয় শিল্পীদের দ্বারা সমবেত কণ্ঠে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গীত হয় নি।

এই গানে ভারতের জাতীয় সংহতি প্রথম বলিষ্ঠভাবে রাজনৈতিক সচেতনতা সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা, সকল ধর্ম সহিষ্ণুতা, অসাম্প্রদায়িকতা, ভেদবুদ্ধিহীন প্রাদেশিক ঐক্য সরলাদেবী তাঁর অসাধারণ গানটিতে বেঁধে দিয়েছেন। হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্যন্ত স্বদেশী সংগীত রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ ঘোষ, রাধানাথ মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন বসু প্রমুখ, মুদ্রাশাসন আইন, দিল্লি দরবার, নব্যবঙ্গের প্রতি, ভিক্টোরিয়ার প্রতি,জাতীয় মহাসমিতি ইত্যাদি বিভিন্ন সমসাময়িক ঘটনাকে ভিত্তি করে বিভিন্ন সংগীত রচয়িতাগণ স্বদেশ সংগীত রচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দেমাতরাম’ গানে তিনি দেশমাতাকে বন্দনা করেছেন যেখানে ‘মা’ একদিকে যেমন ‘সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্য-শ্যামলা, বঙ্গভূমি অন্যদিকে আবার ‘দশপ্রহরণ ধারিণী দুর্গা’।

কাব্যসংগীতের ইতিহাসে কবি ও সুরকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভূমিকা গৌরবময় এবং বিশেষত স্বদেশ চেতনাশ্রয়ী সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁর আসন খুবই সমুন্নত। দ্বিজেন্দ্রলাল উনিশ শতকের শেষ দশক থেকেই নানা ধরনের গীত রচনায় খ্যাতি অর্জন করেন। ইতিমধ্যে বাংলামঞ্চের অভিনয় শিল্পেও তিনি নতুন যুগের প্রবর্তন করেছিলেন এবং তাঁর নাটকের মধ্যে দিয়ে তাঁর বহু গান আরো দ্রুত জনমানসে সমাদৃত হয়ে উঠেছিল। তাঁর সঙ্গীত মাধ্যম নাটকগুলি অধিকাংশই ইতিহাস অবলম্বনে রচিত ইতিহাসের পটভূমিকায় স্বদেশচেতনার সঞ্চারও সেই সূত্রেই ঐতিহাসিক পাত্র-পাত্রীর কন্ঠে দ্বিজেন্দ্রলাল তার জনপ্রিয় স্বদেশী গানগুলি আরোপ করেছিলেন ‘একবার গাল ভরা মা ডাকে’ ‘তুমি তো মা সেই’, ‘ভারত আমার ভারতবর্ষ’, ‘ধনধান্য পুষ্পেভরা’ সঙ্গীতগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বঙ্গভঙ্গের তীব্র উন্মাদনা তাঁর সঙ্গীতে সঞ্চারিত হয়েছিল। তৎকালীন দৈন্যের কথা স্মরণ করে আত্মধিক্কার অতীত গৌরবের স্মরণে উত্তেজন, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বদেশ সংগীতের ভাববস্তু। *১৩।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল সেই সময় রজনীকান্ত সেন ও তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের মিশ্র মানসিকতায় যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন তিনি। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশের লোক দেশীয় শিল্পের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল কিন্তু বিদেশী কাপড় পরিধান অভ্যস্ত অভিজাত বাঙালি সেই মুহূর্তের শুভাগমনকে যথোচিত আদর সম্ভাষণ জানাতে পারেনি।

এই সময় রজনীকান্ত সেন লিখলেন—

“মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়/মাথায় তুলে নেরে ভাই
দীন দুঃখিনি মা যে তোদের/এর বেশি আর সাধ্য নাই”। *১৪

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই গান সম্পর্কে বলেছিলেন— ১৩১২ সালে ভাদ্র মাসে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ ঘটনার কয়েকদিন পরে কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ধরিয়া কতগুলি যুবক

নগ্নপদে মায়ের দেওয়া মোটাকাপড় গান গাইয়া যাইতেছিল। এখনো মনে আছে গান শুনিয়া আমার রোমাঞ্চ উপস্থিত হইয়াছিল। *১৫

আত্মবিস্মৃতি বাঙালি গানে যেন চেতনা ফিরে পেয়েছিল। মূলত এই গানটি বাঙালিকে দেশীয় শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হতে বহুলাংশে সাহায্য। তাঁর অন্যান্য স্বদেশবিষয়ক সংগীতগুলিতেও এই দেশাত্মবোধের ভাব বিরাজমান। গানটিতে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে কবির আর্তি প্রকাশপেয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনে,শিক্ষা বিস্তারে, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সাধনে অতুলপ্রসাদ সেনের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের ঢেউ সুদূর লক্ষৌয়ে তাঁর চেতনাতে আঘাত হেনেছিল। এই জাগরণে তিনি উৎসাহিত হয়ে ছুটে আসেন বাংলাদেশে, ১৯০৫-১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত অসংখ্য স্বদেশগীত সংকলনে তাঁর নাম একটি অপরিহার্য স্থান নিয়েছিল। তাঁর রচিত স্বদেশ গীতগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘উঠ গো ভারত লক্ষ্মী’, ‘মোদের গরব মোদের আশা’, ‘বল বল বল সবে’, ‘হও ধরমেতে ধীর’ ‘দেখ মা এবার দুয়ার খুলে’, প্রভৃতি। *১৬

কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন এক যুগ সন্ধিক্ষণে, যখন ইংরেজ শাসনাধীন ভারতে ধীরে ধীরে স্বাধীনতার জন্য জাগরণ দেখা দিচ্ছে। নাটকে, উপন্যাসে, কাব্যে, সঙ্গীতে এক নতুন চিন্তার ঝড় উঠেছিল। মানবতাবাদের সঙ্গে দেশাত্মবোধের মিলনে সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর স্বদেশ সংগীত গুলি। তাঁর সংগীত, কাব্যে প্রকাশ ঘটল লাঞ্ছিত মানবতার বিদ্রোহ-অভিমান, অত্যাচার। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ-এর রচনাতে জাতীয় জাগরণের উদাত্ত আহ্বান আছে। কিন্তু এতে প্রত্যক্ষভাবে বৈপ্লবিক চেতনার আভাস ঘটেনি। তাঁর লেখনীতে ছিল দৃঢ় বাস্তবতার প্রকাশ। তাঁর ‘কারার ঐ লৌহকপাট’, ‘শিকল পরা হল মোদের’, ‘চল চলচল’,প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য স্বদেশ সংগীত। *১৭

১৯ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে যে জাতীয়তাবোধের সুপ্তবিকাশ পরিলক্ষিত হতে শুরু করেছিল,বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, স্বদেশী আন্দোলন কালে তার স্পূরণ এই দীর্ঘ বিবর্তনের পথ আমাদের সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে সংগীতের বিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে আলোচনার দাবীদার। সংগীতের কথা, সুর, ভাব-ব্যঞ্জনা, গায়ন পদ্ধতি এমনকি শ্রোতৃবৃন্দেরও বিবর্তন স্পষ্ট এই যুগে। সঙ্গীত তার শ্রেণীবিভাজন থেকে বেরিয়ে এসে জনমানসের কাছে খুব সহজে পৌঁছে গিয়েছিল এই সময়। রাগাশ্রয়ী সংগীতের সাথে মাটির সুর, লোকসুর এইসময় সংগীতকে সমৃদ্ধ করেছিল। তাই এই বিবর্তনের ফলস্বরূপ যে স্বদেশ সংগীতের উদ্ভব হয়েছিল তা আজও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য উজ্জল।

তথ্য নির্দেশিকা:

১) বিপিনবিহারী গুপ্ত, আত্মচরিত, পৃষ্ঠা ২০৮, কলিকাতা।

২) যোগেশচন্দ্র বাগল, হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত, পৃষ্ঠা ৬-৭, কলকাতা।

৩) প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবিজীবনী, খন্ড তৃতীয় পৃষ্ঠা ২৭, কলকাতা।

৪) প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবিজীবনী, খন্ড তৃতীয়, পৃষ্ঠা ৩২, কলকাতা।

৫) যোগেশচন্দ্র বাগল হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত পৃষ্ঠা ১৫,কলকাতা।

৬) প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবিজীবনী, খন্ড তৃতীয়, পৃষ্ঠা ৩৬, কলকাতা।

৭) সরলাদেবী, শত গান পৃষ্ঠা ৪।

৮) সরলাদেবী শত গান পৃষ্ঠা ৫।

৯) নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবাণী পৃষ্ঠা১৫ কলকাতা।

১০) সরলা দেবী শত গান পৃষ্ঠা ১৮,

১১) সরলা দেবী শত গান পৃষ্ঠা ১৮ কলকাতা।

১২) ডঃ সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়,রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বদেশচেতনা পৃষ্ঠা ৪১ কলকাতা।

১৩) দিলীপ কুমার রায়, সঙ্গিতকি, পৃষ্ঠা ৭৪

১৪) নলিনীরঞ্জন পন্ডিত, কান্তকবি রজনীকান্ত, পৃষ্ঠা ৫৩

১৫) নলিনী রঞ্জন পন্ডিত, কান্তকবি রজনীকান্ত, পৃষ্ঠা ৫৪

১৬) অরুণকুমার বসু, প্রবন্ধ- কবি অতুলপ্রসাদ সেন, রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা, কার্তিক- পৌষ, পৃষ্ঠা ৩১৫

১৭) ভাস্কর বসু, প্রবন্ধ-নজরুলের দেশোদ্দীপনার গান, বিশ্ববীণা, ৫ ম বর্ষ ,১ম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, পৃষ্ঠা ৫২।

তুলসীদাস ও সতীনাথের জীবনরসে সম্পৃক্ত "ঢোঁড়াই রামকথা"

পায়েল বাগচী
স্টেট এডেড কলেজ টিচার
শ্রী চৈতন্য কলেজ, হাবড়া

সারসংক্ষেপ: বাংলা কথাসাহিত্যের বহুল চর্চিত রাজনৈতিক উপন্যাস "ঢোঁড়াই চরিত মানস"এই নামের সাথে জড়িয়ে আছে একটি বিরাট প্রেক্ষাপট। হিন্দু শাস্ত্রের স্মৃতি বর্গের অন্তর্গত মহাকাব্য রামায়ণ ও সেই কাব্যের নায়ক রাম এই মূল ভাবনা থেকে কাহিনী সূত্র গ্রহণ করে, গোস্বামী তুলসী দাস অবধি ভাষায় সম্রাট আকবরের সময়কালে রচনা করেন "রামচরিত মানস"। উত্তর ভারতের ধর্ম অনুগত সাধারন মানুষের কাছে রামচরিত মানুষ একটি বিরাট আদর্শের জায়গা, সতীনাথ ভাদুড়ী এই রামচরিতের আদর্শেই নায়ক করতে চেয়েছেন তার ঢোঁড়াই-কে। সতীনাথের ডায়েরিতে তার এই চিন্তা ভাবনার সহজ স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। শুধুমাত্র দেবতা রাম নয়, ঢোঁড়াই চরিত্রে আর যে দুজন ব্যক্তিত্বের ছায়া ফুটে উঠেছে তাদের কথা আমরা জানিনা, এদের একজন মধ্যযুগের মহাকবি গোস্বামী তুলসীদাস আর একজন বিশ শতকের কথা সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ী। উপন্যাসের নায়ক ঢোঁড়াই চরিত্রে তার স্রষ্টার নিজের জীবন ও পুরাতনকালের এক জনপ্রিয় কবি ও তার জীবন কথাকে খুঁজে নেওয়াই আমাদের আলোচনার মূল উপজীব্য।

সূচক শব্দ: সতীনাথ ভাদুড়ী , রাম, রামায়ণ, ঢোঁড়াই, সত্যাগ্রহ, ভারত ছাড়ো, রাজনীতি, উপন্যাস, সৃষ্টি।

মূল আলোচনা:

পূর্ণিয়া জেলা স্কুলের "ক্লাসকি রোশনি"সতীনাথ ভাদুড়ীর "রোশনি" সাহিত্য ক্ষেত্রেও ছিল অম্লান। সতীনাথের প্রতিভার বিদ্যুৎ চমক জন্ম দিয়েছে বাংলা কথা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় রাজনৈতিক উপন্যাস ঢোঁড়াই চরিত মানসের। ১৯৪৯ এ উপন্যাসটির প্রথম খন্ড প্রকাশিত হওয়ার এক বছর পরে ১৯৫১ তে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় খন্ড ও সেইসঙ্গে এক ভিন্ন ধারার উপন্যাস হিসাবে বহুল চর্চিত ও সমালোচিত হতে থাকে বাংলা কথাসাহিত্য অঙ্গন জুড়ে। উপন্যাসের নামটি যে তুলসীদাস রচিত রাম কথকথা "রামচরিত মানস"-কে অনুসরণ করেছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। একই সঙ্গে সতীনাথ সচেতনভাবেই উপন্যাসের নায়ক ঢোঁড়াই চরিত্রের জীবন কথা অঙ্কনে অনুসরণ করেছেন রামচরিত মানসের রচয়িতা তুলসীদাসের ব্যক্তি জীবনকে।একটু গোপনে হলেও,নায়ক ঢোঁড়াই চরিত্রের কাঠামো নির্মাণে ছাপ রয়েছে সতীনাথের নিজস্ব জীবন ও

রাজনৈতিক আদর্শের।অন্যদিকে রক্তমাংসের ব্যক্তি ঢোঁড়াই ও মহাকাব্যের নায়ক দেবতা রাম কে উপন্যাসিক কিভাবে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন তার একটা সহজ জবাবদিহি সতীনাথ নিজের ডায়েরিতেই করেছেন-

> "তৎমা টুলিতে ঢোঁড়াই নামের একজন লোক সত্যিই ছিল।...বহু মূর্তিতে আমি ঢোঁড়াইকে দেখেছি, তাকে ভিক্ষা করতে দেখেছি, ঘর ছাইতে দেখেছি, গরুর গাড়ি চালাতে দেখেছি...শ্রী রামচন্দ্রের চেয়ে ছোট আদর্শে উত্তর ভারতের সাধারণ লোকের মন ভরে না। রামায়ণের দিকে আমার নজর পড়েছিল আরো একটি কারণে আমাদের দেশের সাধারণ লোকের গভীর ধর্মপরায়নতার সাথে রামায়ণের কাঠামোতে ফেলা বই বেমানান হবে না, এই ছিল আমার ধারণা।"-(১)

বিশ শতকের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি ঢোঁড়াই ও দেবতা রামকে বাঁধা- উপন্যাসিকের এই সরল ভাবনার মধ্যে নিভৃতে রয়ে গেছে এক অতীত মোহ ও বর্তমান সময়ে অভিঘাত। উপন্যাসের নায়ক ঢোঁড়াই তাই অতীতের পথ ধরে হেঁটে এসে দাঁড়িয়েছে বর্তমানে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে। ঢোঁড়াই শুধু মাত্র রাম হয়ে থেকে যায়নি এক জীবনে রেখেছে তুলসীদাস ও সতীনাথের সাথে তার জীবন রেশ। তুলসী দাস এর সাথে যে জীবনের মিল রেখেছে ঢোঁড়াই তুলসীদাস শিষ্য বেণীমাধব দাস রচিত "গোঁসাই চরিত"গ্রন্থে মেলে সেই কাহিনি সূত্র। অভুক্ত মূল নক্ষত্রে জন্ম বলে পিতা আত্মারাম তুলসীদাস কে শিশুকালে ত্যাগ করেছিলেন। অসহায় মা হুলসী ছেলেকে দান করেছিলেন দাসী মুনিয়াকে। পালিত মা মুনিয়া ও গর্ভদাত্রী মা হুলসী উভয়ে ইহলোক ত্যাগ করলে তুলসীদাসের ঠাঁই হয় সন্ন্যাসী গুরু নরসিংহ দাশের কাছে, এখানেই তুলসীদাস পান রামায়ণ ও শাস্ত্র শিক্ষা। উপন্যাসের নায়ক ঢোঁড়াই-এর বাল্য কাহিনিতে প্রায় একই টানাপোড়েন লক্ষণীয়। শিশুকালে পিতৃহারা ঢোঁড়াই কে তার মা বুধনী দ্বিতীয় বিবাহ কালে ত্যাগ করতে বাধ্য হয় কারণ নতুন পিতা বাবুলালের ঢোঁড়াইকে গ্রহণের অনীহা-

> "বাবুলালটা আবার এরই মধ্যে ডিস্টিবোর্ডে ভাইচেয়ারম্যান সাহেবের চাপরাসীর কাজ পেয়ে গেল।...বুধনীকে সে বিয়ে করতে চায়, কিন্ত তিন বছরের ঢোঁড়াইয়ের ভার নিতে চায় না।'চুমৌনা'করতে ইচ্ছে হয় করো,না করতে ইচ্ছে হয় করোনা;তা বলে পরের ছেলের ভার নিচ্ছি না।"-(২)

ঢোঁড়াইয়ের ঠাঁই হয় তৎমাদের একমাত্র বাওয়া বা সন্ন্যাসী বৌকার কাছে।সেখানেই শুরু হয় তার রামায়ণ শিক্ষা ও নতুন জীবন-

১."ঢোঁড়াই তখন আঙুল চোষা ভুলে বাওয়ার ত্রিশূল টা নিয়ে খেলা করছে। বাওয়া দেখে যে তার গভীর নাভিকুন্ডের উপরে তিনটি রেখা পড়েছে। ঠিক বালক শ্রী রামচন্দ্রজীর যেমন ছিল।"-(৩)

২." কটি কিঙ্কিনী উদয় ত্রয় রো
নাভি গঁভীর জান্ জিন্ হা দেখা।"-(৪)

তুলসী দাসের জীবন অনুসরণে ঢোঁড়াইয়ের জীবনে দ্বিতীয় মাতা মুনিয়ার ভূমিকা এসেছে এক পুরুষের মধ্য দিয়ে। পরিজনহীন বৌকা বাওয়া অনাথা ঢোঁড়াই কে আগলে রেখেছে মায়ের মতো করেই-

"বাওয়া স্বপাক খেত চিরকাল। তবে ঢোঁড়াইয়ের ছোঁয়া খেতে তার কোনদিন দ্বিধা হয়নি। রামচন্দ্রজী যাকে ছেলে বলে কোলে তুলে দিয়েছেন তার বেলায় খুব কি ছোঁয়াছুঁয়ির কথা ওঠে।"-(৫)

'গোঁসাই চরিত'থেকে জানা যায় পালক পিতা নরসিংহ দাস তুলসীকে বিবাহ দিয়েছিলেন রূপসী রত্নাবলীর সাথে। আর এই রত্নাবলীতেই মগ্ন হয়ে তুলসীদাস প্রথম যৌবনে ভুলে বসে ছিলেন নিজ পিতা নরসিংহ দাস ও জগত পিতা ভগবান রামচন্দ্রকে। বিদুষী রত্নাবলী স্বামীর এই রূপ মুগ্ধতাকে কঠোর আঘাত হেনে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ধর্মের পথে। রত্নাবলীর প্রত্যাখ্যানেই চৈতন্য ফিরে আসে তুলসী দাসের। তুলসীদাস পুনরায় ভগবান রামচন্দ্রের চরণে নিবেদিত সাধক জীবন যাপন করতে শুরু করেন-

"এই হাড় মাংসের দেহটার পেছনে যে আসক্তি যে অনুরাগ আজ অবধি দেখিয়েছো; তা ভগবান রামচন্দ্রের চরণে নিবেদন করলে বেঁচে যেতে, পেতে পারতে সর্ব সিদ্ধি।আজ থেকে তোমার উন্মত্ততা থেকে আমায় বাঁচাও।আমায় তুমি মুক্তি দাও।"-(৬)

উপন্যাসে দেখা যায়। পালক পিতা বৌকা বাওয়া সমৃদ্ধির রামায়ণের ছবি ভরা পাতায় দেখতে চেয়েছেন ঢোঁড়াই কে। ঢোঁড়াইয়ের ইচ্ছাতেই আজীবন সংসার ত্যাগী বাওয়া ঢোঁড়াইয়ের বিবাহ দিয়েছেন সুন্দরী রামিয়ার সাথে। রামিয়াতে মগ্ন ঢোঁড়াই তুলসীদাসের মতোই ক্ষণিকের উন্মত্ততায় ভুলেছে পিতা বৌকা বাওয়াকে ও "ঢোঁড়াই ভকত"হয়ে কাটানো জীবনকেও-

"বহুদিন প্রতীক্ষার পর বাওয়া ফেরে না। কী জানি কেন, ঢোঁড়াই নিজেকে এর জন্য দায়ী মনে করে, সত্যিই কি সে দোষী?"-(৭)

দেরিতে হলেও রামিয়ার প্রত্যাখানে চেতনা ফিরেছে ঢোঁড়াইয়ের। নিঃসঙ্গ বৌকা বাওয়া ঢোঁড়াইয়ের বিরহে তৎমাটুলি ছেড়েছে বহু আগেই আর শেষমেষ রামিয়া হারা ঢোঁড়াই জাতের প্রতি অভিমানে ও জীবনের প্রতি তীব্র ঘৃণায় ত্যাগ করেছে তৎমাটুলি। পরাজিত ঢোঁড়াই জীবনে রয়ে গেছে কেবল রাম, রামায়ণ ও পাক্কি-

"রবিয়ার বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়েছে ঢোঁড়াই অন্ধকারের মধ্যে।যে দুনিয়া তার বিরুদ্ধে গিয়েছে সম্পর্ক কি তার সে দুনিয়ার সঙ্গে।"-(৮)

এই পর্যন্ত ঢোঁরাই রাম কথা তুলসীদাসের জীবনে খুঁজে নিয়েছে নিজের জীবন কথার আশ্রয়। অজস্র অভিজ্ঞতার অভিঘাতে সত্য যুগের রাম কলি যুগের ঢোঁড়াই জন্মে হয়ে উঠেছে পরিবর্তিত জীবন কথার নায়ক। পরিবর্তন ঢোঁড়াই জীবনের মূল কথা আর তাই এক পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি সাহসী ঢোঁড়াই বিশ শতকের অনুষঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে সমকালীন বিরাট রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে।রাজনীতির সূত্র ধরেই তুলসী দাসের ব্যক্তি জীবনের ছায়াপথ থেকে সরে এসে নায়ক ঢোঁড়াই প্রবেশ করেছে তার স্রষ্টা সতীনাথের জীবন আদর্শের পথে-

" 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'একটি ধ্রুপদী পুরাণের গায়ে ক্রমশ বিদ্যুতের চাবুক হেনে প্রায় তারই প্রতিভাসে ব্রাত্য জীবন ও ক্রান্তিকালীন দেশ কালের অন্য এক পুরাণ গড়ে নিয়েছে।"-(৯)

ঢোঁড়াই রামের জীবনে এই নতুন কালের ছাপ লেখক বুলিয়ে দিতে পেরেছেন আত্মজীবনের অনুসঙ্গে। রোজা-রোজগার-রামায়ণের পরিচিত জগৎ থেকে ধীরে ধীরে ঘটনা অনুষঙ্গে ঘর ছাড়া 'ঢোঁড়াই ভকত' প্রবেশ করেছে কংগ্রেসী রাজনীতির ভুলভুলাইয়াতে। ঠিক এমন ভাবেই গৃহ বিমুখ সতীনাথ ব্যক্তি জীবনে জড়িয়ে পড়েছিলেন রাজনীতিতে। ১৯২৪ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় "ডিভিশনাল স্কলারশিপ" পেয়ে সতীনাথ পড়তে এসেছিলেন পাটনায়। ১৯৩১ সালে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর মেধাবী সতীনাথ আইন পরীক্ষাতেও সম্মানের সাথে পাস করে ফিরে আসেন পূর্ণিয়ার বাড়িতে। বিহার তথা ভারত বর্ষ জুড়ে তখন চলছে আইন অমান্য আন্দোলনের (১৯৩০-৩২) তাপপ্রবাহ। কমিউনিস্ট নেতা মানবেন্দ্র রায়ের লেখায় অনুপ্রাণিত সতীনাথ "রেডিক্যাল হিউম্যানিস্ট" পার্টি থেকে ধীরে ধীরে আকর্ষিত হয়ে পড়েন কংগ্রেসি রাজনীতিতে। ১৯৪৯ এর 27 সেপ্টেম্বর সংসার ও পেশা ত্যাগ করে সতীনাথ যুক্ত হয়ে পড়েন সক্রিয় রাজনীতিতে। ১৯৪০ সালে প্রথম জেলে যাত্রা সতীনাথের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের জন্য।

উপন্যাসে ঢোঁড়াই জীবনেও এই পরিবর্তনের জোয়ার লক্ষণীয়। জমি জাতির রাজ্যের বঞ্চিত মানুষগুলিকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতেই উপন্যাসের শুরুতে ঢোঁড়ইকে দেখা গেছে রাম রাজ্যের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতে। মহৎমাজির রাম রাজ্যে অবহেলিত, বঞ্চিতদের হবে স্থান সকলের অগ্রে এই ভাবনা থেকেই সক্রিয় কংগ্রেসী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে ঢোঁড়াই। কংগ্রেসী রাজনীতির ওঠানামার পথেই ঘটনা সূত্রে ঢোঁড়াই প্রবেশ করেছে ক্রান্তিকারী মতবাদের সুরঙ্গে হয়ে উঠেছে ক্রান্তিকারী নেতা "রামায়ণজী"-

"অনেকগুলো জায়গায় দলের কেন্দ্র হয়েছে। নিত্য নতুন নতুন ইস্কুলিয়ারা আসছে দলে ভর্তি হতে।...সবচেয়ে বড় কথা, ঢোঁড়াই নতুন নাম পেয়েছে তার নাম হয়েছে রামায়ণজী।"-(১০)

ঢোঁড়াইয়ের স্রষ্টা সতীনাথ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের এক অসন্তোষজনক বাঁকে এসে ভাবতে শুরু করেছিলেন "ঢোঁড়াই চরিত মানস"-উপন্যাসের প্লট আর তাই উপন্যাসের নায়ক ঢোঁড়াইকে তিনি গড়ে তুলেছেন ভারতীয় কংগ্রেসি রাজনীতির কাদামাটিতে –

"১৮ই আগস্ট এর প্রতিবাদে সতীনাথ ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত হন।...আর মনে মনে সাজিয়ে নিতে শুরু করলেন ঢোঁড়াই চরিত মানসের মতো মহাকাব্যিক উপন্যাসের প্লট।"-(১১)

১৯৪২ এর ২৬ ও ২৭ আগস্ট তারিখে পূর্ণিয়া থেকে যে ১৫ জন কংগ্রেস নেতার কংগ্রেসি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবার জন্য গ্রেফতারি হয়, সতীনাথ ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। উপন্যাসের নায়ক ঢোঁড়াইকেও দেখা গেছে কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসেবে-

"সাদা বাক্সের গান তো নয়, রাম রাজ্য কায়েম করবার গান; রামচন্দ্রজী মহৎমাজীর নামেই মহিমা প্রচারের ভজন.. থামতে ইচ্ছা হয় না, ঠেলে নিয়ে যায়।"-(১২)

সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জোয়ারও এইভাবে ঠেলে নিয়ে চলেছিল সতীনাথকে। সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলনে শুরুতেই সতীনাথ প্রবেশ না করলেও পূর্ণিয়ায় প্রবাহিত সত্যাগ্রহের উষ্ণ হওয়া বোঝার মতো চেতনা তাঁর ছিল, তাই সত্যাগ্রহ কালে তাঁর ভূমিকা ছিল সাহসীর। পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের জন্য ১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম জেলে যেতে হয় সতীনাথকে। উপন্যাসের ঢোঁড়াইয়ের প্রথম গ্রেফতারনামা প্রকাশিত হয়েছে এমনই এক সাহসী পদক্ষেপের প্রত্যুত্তরে। ইংরেজ পরিচালিত তিতলি কুঠি সদলবলে দহনের অপরাধে ঢোঁড়াই পড়েছে গোরা সাহেবের রোষে-

"যেদিন বড় দারোগা সাহেব কে সঙ্গে করে গোরারা আসে বিসকান্ধায় সেদিন সকালেই ঢোঁড়াই পালিয়ে এসেছিল কুশী পার হয়ে, 'আজাদ দস্তা'য়।"-(১৩)

কংগ্রেসী আন্দোলনের ব্যর্থতা রাজনৈতিক জীবনের শেষ দিকে যেমনভাবে হতাশ করেছিল সতীনাথকে ঠিক একইভাবে স্বদেশী আন্দোলনের লক্ষ্যহীনতা ও রাজনৈতিক আদর্শের অন্তঃসারশূন্যতা হতাশ করেছে ক্রান্তিকারী 'রামায়নজী' ওরফে ঢোঁড়াইকে। স্বাধীনতা যত এগিয়ে এসেছে ঢোঁড়াই বুঝেছে এ বিপ্লব আদতে ফাঁপা বাঁশের মতো। এই মানসিক অশান্তি থেকে মুক্তি পেতেই ঢোঁড়াই আড়াল খুঁজেছে রামায়ণে ঠিক যেমন ভাবে সতীনাথ আড়াল খুঁজেছিলেন সাহিত্যে-

"এই অস্থির অনিশ্চিত জীবনে সূক্ষ্ম অনুভূতি গুলি ক্রমে ভোঁতা হয়ে আসে...উৎসাহের ফেনা মরে গেছে...রামায়ণজী দিন দিন নিজেকে গুটিয়ে নেয় রামায়ণ খানার মধ্যে।"-(১৪)

নির্ভেজাল দেশপ্রেমিক সতীনাথ যে অবসাদ থেকে কংগ্রেস ছাড়েন স্বাধীনতার পরবর্তীতে ১৯৪৮ সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন-

"স্বাধীনতা তো পাওয়া গেছে, কংগ্রেসের এখন রাজকাজ ছাড়া উপায় নেই।"-

সতীনাথের রাজ কাজের প্রতি অনীহা আদতে অসমাপ্ত বিপ্লবের প্রতি অনীহা,এ কথা বুঝতে পাঠকের কোনভাবেই সমস্যা হবার কথা নয়।

রাজনীতির ভন্ডামি ও চুক্তিতে পাওয়া স্বাধীনতা,বিপ্লবের বন্ধ্যাত্ব কোনটাই মেনে নিতে পারেননি সতীনাথ তাই স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই রাজনীতি ফেলে মগ্ন হয়ে থেকেছেন আত্ম অনুসন্ধানে।তাঁর সৃষ্ট ঢোঁড়াই সেই একই কারণে ক্রমাগত আত্ম অনুসন্ধানের পথকে খুঁজে নিয়েছে রাম কথার মধ্যে-

"রামায়ণজী বুঝতে পারেনি,কখন সে গুনগুন করে রামায়ণের চৌপাই গাইতে আরম্ভ করেছে।"-(১৫)

অর্থাৎ রাজনৈতিক সতীনাথের জীবন ছায়ার আগ্রাসন থেকে কথা সাহিত্যিক সতীনাথ ঢোঁড়াইকে সরিয়ে নিয়ে আসছেন আবার তুলসীদাসের জীবন কথায়। সতীনাথ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন সাহিত্যে তুলসীদাস আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন পুনরায় রাম পদ সেবায় আর ঢোঁড়াই রামপদ থেকে আশ্রয় খুঁজেছে প্রথমে রাজনীতির রাম রাজ্য রচনার স্বপ্নে আর সব শেষে ক্রান্তিকারীর পঁচে যাওয়া খোলস নিজের হাতে জ্বালিয়ে দিয়ে "ঢোঁড়াই ভকত" আশ্রয় পেয়েছে শূন্যতায়-

"সর্বগ্রাসী শূন্যতার মধ্যে এই পথটা তবু পা রাখবার একটু শক্ত জমি...সব পুঁজি খাওয়ানোর পরে তার মনে পড়েছে বহুদিন আগের জমানো বাতায় গোঁজা পয়সার কথা।ঢোঁড়াই চলেছে সারেন্ডার করতে এস-ডি-ও সাহেবের কাছে।"-(১৬)

এখানেই প্রশ্ন আসে উপন্যাসিক ঢোঁড়াইয়ের শেষ পরিণতি রচনায় ব্যক্তি জীবনে তুলসীদাস কিংবা আত্মজীবনে সতীনাথের ছাপ রাখলেন না কেন? কারণ হয়তো এটাই যে প্রতিটি মানুষেরই আত্মচরিত্র ধারণের জন্য সৃষ্টি হয় নিজস্ব কিছু খোপ। এক খোপের তরোয়াল যেমন অন্য খোপে আঁটে না ঠিক তেমনি এক জীবনের গল্প অন্য জীবনের সাথে কিছুটা মিল রাখলেও সম্পূর্ণভাবে এক হয়ে যেতে পারে না। গোস্বামী পুরুষ তুলসীদাস ছিলেন ভক্ত মানুষ তাই রাম পদে তার মিলে ছিল আশ্রয়, কথা সাহিত্যিক সতীনাথ ছিলেন অসামান্য প্রতিভাবান একজন শিল্পী সুতরাং সাহিত্য চর্চার অঙ্গনে মিলেছে তাঁর স্থিতি। তৎমাদের দামাল ছেলে- উপন্যাসের নায়ক ঢোঁড়াইয়ের রাম পদে অবিচল ভক্তি থাকলেও তার চরিত্র সম্পূর্ণভাবে সন্ন্যাসী পুরুষ তুলসী দাসের অনুরূপ হয়ে উঠতে পারেনি আর তাই রামভক্তিতেই তার পরিণতির ইচ্ছা থাকলেও দেখাতে পারেননি কথাসাহিত্যিক।অন্যদিকে নিজ ব্যক্তি জীবনের আভাস ঢোঁড়াই জীবনে রেখে তিনি রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ ঢোঁড়াই কে দেখিয়েছেন রাজনীতি ত্যাগের পথ,শেষ পর্যন্ত কিন্ত সতীনাথের জীবন খোপে আটকে রাখেননি ঢোঁড়াই কে কারণ যতোই

সতীনাথের হাতে জন্ম নিক ঢোঁড়াই তবুও তার রয়েছে এক স্বাধীন সত্তা আর সেই স্বাধীন মানুষ হিসাবেই ঢোঁড়াই তার শেষ পরিচয় রেখেছে উপন্যাসে ও পাঠক মনে-

“বুড়ো এতোয়ারী ধাঙড় থাকলে ফোঁকলা দাঁতে হেসে বলত,'ঢোঁড়াইরা ঢোঁড়া সাপের জাত। যতোই খাবলাক,ছোবল মারুক,তড়পাক,এক মরলে যদি ওদের বিষ দাঁত গজায়।“-(১৭)

তথ্যসূত্র:

১. গ্রন্থ প্রসঙ্গে, শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য, সতীনাথ রচনাবলী দ্বিতীয় খন্ড, মিত্র ঘোষ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৬২-৪৬৫

২. ঢোঁড়াই চরিত মানস,সতীনাথ ভাদুড়ী, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২

৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২

৪. রামচরিত মানস, গোস্বামী তুলসী দাস,বালঃকান্ড

৫. ঢোঁড়াই চরিত মানস, সতীনাথ ভাদুড়ী, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০৪

৬. ভারতের সাধক, তৃতীয় খন্ড, শংকর নাথ রায়, করুণা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০৮

৭. ঢোঁড়াই চরিত মানস, সতীনাথ ভাদুড়ী, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১০

৮. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২৬

৯. সতীনাথ ভাদুড়ী পুরাণের বিপরীতে আখ্যানের পথচলা, শুভময় মন্ডল, আকাদেমি পত্রিকা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮৬

১০. ঢোঁড়াই চরিত মানস, সতীনাথ ভাদুড়ী, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২২৩

১১. সতীনাথ ভাদুড়ী: অন্বেষণে ও অনুভবে, সম্পাদনায় ড.তরুণ মুখোপাধ্যায়,পান্ডুলিপি প্রকাশনী, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২

১২. ঢোঁড়াই চরিত মানস, সতীনাথ ভাদুড়ী, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮৮

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২১৯

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৩৯

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৪৫

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৫৪

১৭. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৫৫

কাঞ্চনজঙ্ঘা : চিত্রনাট্যের বীক্ষণে ভাষা ও সংস্কৃতি

তপন কুমার বালা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়, কেশবপুর, হুগলী

সারসংক্ষেপ : সমাজের অন্যতম শক্তিশালী মিডিয়া হল চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র সমাজে সাংস্কৃতিবান মানুষ তৈরি করে, শিল্প নির্মাণ করে, জীবনবোধের সন্ধান দেয় এবং শিল্পরূপ প্রতিষ্ঠা করে। চিত্রনাট্য হল চলচ্চিত্রের বা সিনেমার মেরুদণ্ড। বিচিত্র স্রষ্টা, সাহিত্যিক ও বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় দুই ধরনের চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। প্রথম ধরনের চিত্রনাট্যের উদাহরণ হল 'পথের পাঁচালী'। সত্যজিৎ রায় তাঁর ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ নামক চলচ্চিত্রটিতে নিজস্ব শিল্পবোধ ও গভীর জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা দ্বিতীয় শ্রেণির চিত্রনাট্য।

মূলশব্দ : ১) কাঞ্চনজঙ্ঘা, ২) চলচ্চিত্র, ৩) চিত্রনাট্য, ৪)মিডিয়া, ৫) ভাষা, ৬) সংস্কৃতি ও ৭) শিল্প।

মূল আলোচনাঃ

সমাজের অন্যতম শক্তিশালী মিডিয়া হল চলচ্চিত্র। কোন বিষয়কে অতিসহজে এই মিডিয়ার সাহায্যে সার্থকভাবে আবেদনসহ ফুটিয়ে তোলা যায়। প্রকাশভঙ্গিতে থাকে অপরূপ শিল্পবোধ।এর ছবির ভাষায় ভাষার প্রাচীর ধুয়ে মুছে যায়। কথায়, ছবিতে, সংগীতে, অভিনয়ে এবং সৃজনশীলতার অভিনবত্বে এই অপরূপ শিল্প মাধ্যম মানুষের মনকে কর্ষণ করেছে। মধ্যকথা চলচ্চিত্র সমাজে সাংস্কৃতিবান মানুষ তৈরি করে, শিল্প নির্মাণ করে, জীবনবোধের সন্ধান দেয় এবং শিল্পরূপ প্রতিষ্ঠা করে।

সুতরাং বলা যায় চলচ্চিত্র একটি মৌলিক শিল্প। অন্যান্য শিল্পের মতো চলচ্চিত্রের আছে নিজস্ব আঙ্গিক ও প্রকাশ এবং থাকে বিশ্বজনীন ভাষা ও বাঙ্ময় আবেদন। এই কারণেই সিনেমার প্রতি মানুষের রয়েছে তীব্র আকর্ষণ এবং অপ্রতিরোধ্য মোহ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন—

> “চলচ্চিত্রের আঙ্গিকে কেবল নিরস, নিষ্প্রাণ ছবি নয়, বাঙ্ময় ছবি। অর্থাৎ ছবিত্ববোধই ছবির শেষ নয়, তার মধ্যে থাকে আলাদা এক দ্যোতনা। এখানে মুখ্য হল ছবির অর্থ। আর ধ্বনি হল এই ইমেজেরই পরিপূরক। এক ছাড়া অন্যের অস্তিত্ব নেই। এককথায় বলতে গেলে চোখ-কান দুটিই খুলে রেখে চলচ্চিত্রকে অনুভব করতে হবে। না হলে চলচ্চিত্রের ভাষা বোঝা কঠিন। অনেক ক্ষেত্রেই দৃশ্যে কোনও ধ্বনি না রেখে নৈঃশব্দ্যের মাধ্যমেই তার বক্তব্য বোঝানো হয়।“[১]

চিত্রনাট্য হল চলচ্চিত্রের বা সিনেমার মেরুদণ্ড। ছবি তৈরির কাজে চিত্রনাট্য রচনা প্রাথমিক উপাদান। এই চিত্রনাট্য অনুযায়ী বিভিন্ন পরিবেশ-নির্দেশ বা দৃশ্য (Sets) তৈরি করতে হয় এবং সেই অনুযায়ী অভিনেতা, অভিনেত্রীকে দিয়ে অভিনয় করানো হয় এবং অভিনয়ের সময় দৃশ্য গ্রহণ (Shooting) করা হয়। পরে খণ্ড খণ্ড ভাবে তোলা ছবিকে চিত্রনাট্য অনুযায়ী সাজানো (Editing) হয়। অনেকে মনে করেন চলচ্চিত্র নাটকেরই অন্য একটি রূপ। আবার কেউ কেউ মনে করেন নাটকের রেকর্ডকৃত রূপই হচ্ছে চলচ্চিত্র। কিন্তু তা সর্বত্র সত্য নয়। এই উভয় মাধ্যমের মধ্যেও বিভেদের তীব্র লক্ষণ লক্ষ করা যায়। জনৈক সমালোচকের মতে--

> "রঙ্গমঞ্চের নাটক আর রজতপটের নাটক বিভিন্ন ধরনের। এ দুয়ের কাহিনি গঠন, রূপকীর্তি ও নাট্যরীতি পৃথক। চিত্রগ্রহণের আলাদা টেকনিক। তাই সাধারণ নাটককে চলচ্চিত্রে উপযোগী করার জন্য চিত্রনাট্যের বিশেষ ঢঙে তাকে সাজিয়ে নিতে হয়। নাটক মুখ্যত সংলাপ ভিত্তিক। সোচ্চারিত সংলাপের প্রয়োজনীয়তা নাটকের অনিবার্য theatrical obligations এর অন্যতম"[২]

সুতরাং চিত্রনাট্য হল মূল অবলম্বন। যা চলচ্চিত্রে সমগ্র কলা কুশলীরা পরিচালকের নির্দেশে যৌথভাবে চলচ্চিত্রে আবদ্ধ করেন। অর্থাৎ ভাল চিত্রনাট্য ছাড়া ভাল সিনেমা তৈরি করা সম্ভব নয়। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের ভাষায়-

> "চিত্রনাট্য লেখার জন্য জানতে হয় সিনেমার ভাষা, সাহিত্যের ভাষা থেকে যা বহুযোজন দূরে। চিত্রনাট্যকারকে তার হাতের আঙুলের মতো ঘনিষ্ঠভাবে চিনতে হয় মুভি ক্যামেরার সর্বাসর্ব বুঝতে হয় ফ্লিম এডিটিং এর মর্মার্থ, ছুঁতে জানতে হয় শব্দ ও নৈঃশব্দ্যের স্বরকে।"[৩]

কোন কোন চলচ্চিত্র সমালোচক চিত্রনাট্যকারের কর্তব্যকে এইভাবে বিন্যস্ত করেছেন বিষয় বস্তু নির্ধারণ, বৃত্তগঠন এবং কাহিনিকে ক্যামেরার নিজের ভাষায় রূপান্তরিত করা। প্রত্যেক শিল্পীরই নানারকম মাধ্যম আছে, যেমন মঞ্চনাট্য, গীতিনাট্য, টি.ভি. নাট্য। তেমনি চিত্রনাট্যকারকেও ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারের সঙ্গে তার পার্থক্যের ব্যাপারটি বুঝতে হয়। এ সম্পর্কে ম্যানভেল বলেছেন- **"The film is factional medium but it is not novel, it is a dramatic medium but it is not a Drama"**. কাজেই চিত্রার্পিত প্রতিটি মুহূর্তকে কায়িক-সাত্বিক ও বাচনিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চিত্রনাট্যে রূপায়িত করতে হবে। চিত্রের ভাষাতেই চিত্র নাট্যকারকে প্রধানত চিন্তা ও কল্পনা করতে হয়। বলা ভাল --

> "লেখকের হাতে যেমন কথা, চলচ্চিত্র রচয়িতার হাতে তেমনি ছবি ও শব্দ। এই দুটি মিলে যে ভাষা তা ব্যবহারে যদি মুন্সিয়ানার অভাব

> দেখা দেয় এবং এর ব্যাকরণ যদি রচয়িতার হাতে না থাকে তাহলে ছবি ভালো হবে না। এত যে লেখা হয়, তার মধ্যে ক'টা লেখাই বা সত্যিকারের সাহিত্য হয়ে ওঠে। শিল্পী আগে, তারপর শিল্প। চলচ্চিত্রে যে অন্য শিল্প-সাহিত্যের লক্ষণ আছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। চলচ্চিত্র তৈরি হয় নাটকের দ্বন্দ্ব, উপন্যাসের কাহিনি, পরিবেশের বর্ণনা, সঙ্গীতের গতি ও ছন্দ সব কিছু মিলিয়েই। কিন্তু ধ্বনি ও ইমেজের যে ভাষা, দেখানো শোনানোর বাইরে প্রকাশ নেই তা একেবারে স্বতন্ত্র ভাষা। ফলে বক্তব্য এক হলেও বলার ভঙ্গীর পার্থক্য থাকতে হয়। এই ভঙ্গীর বৈচিত্র্যই হল চলচ্চিত্রের আঙ্গিক বা চিত্রভাষা।"[৪]

চলচ্চিত্রই একমাত্র মাধ্যম যার দ্বারা ছবি ও কথাকে একসঙ্গে প্রকাশ করা যায়। আবার প্রয়োজন হলে এখানে বাচনিক (verbal) জ্ঞাপনকে অবাচনিক (Non-verbal) জ্ঞাপনে পরিণত করা যায়। শুধু তাই নয়, কথার বদলে অঙ্গভঙ্গি ও অভিব্যক্তি দিয়ে চলচ্চিত্রকে সমস্ত দর্শকের কাছে সহজবোধ্য করে তোলা যায়। ভাষাগত কোন বাধা এখানে দর্শকদের কাছে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। প্রচার ও শিক্ষার এক শক্তিশালী মাধ্যম চলচ্চিত্র। বাচনিক বার্তার সঙ্গে (Verbal Message) দৃশ্য বার্তার (Visual Message) সংমিশ্রণে অধীত বিষয় ও বস্তু সম্পর্কে তার একটা প্রত্যক্ষ ধা্রণা জন্মায়। তাকে কখনওই কল্পনার উপর নির্ভর করতে হয় না। জনগণের কাছে কোন বার্তা (Message) চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সহজে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। বলা ভাল--

> "চলচ্চিত্রের নিজস্ব এক অব্যক্ত ভাষা আছে যা বিশ্বের কোনও ব্যক্তি বুঝতে সমর্থ। নানান সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতার উর্ধ্বে চলচ্চিত্রের সেই ভাষাই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করতে পারে। চলচ্চিত্রের এই নিজস্ব ভাষার জোরেই হিন্দি ছায়াছবির ভাষা বুঝলেও তা এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য মানুষের কাছে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। চলচ্চিত্র তাই আন্তর্জাতিক মানব গোষ্ঠীর মধ্যে ভাবগত আত্মীয়তা **(Emotional relationship)** গড়ে তোলে।"[৫]

চলচ্চিত্র উপন্যাস নয়। উপন্যাসে ঔপন্যাসিক যে ভাবে Plot সাজান; চলচ্চিত্রে সে ভাবে Plot সাজানো হয় না। সর্বদা মনে রাখতে হবে এখানে বর্ণনার অবকাশ কম। চলচ্চিত্রে Time ও Space এর কথা মাথায় রাখতে হয়। অনেক দিনের ঘটনাকে ৯০ বা ১২০ মিনিটের মধ্যে দেখাতে হয়। চিত্রনাট্য রচনার সময় শুধু নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করলে চলে না। তাকে চলচ্চিত্রের ভাষায় প্রকাশ করার জন্য অতি নাটকীয়তা থেকে মুক্ত হতে হয়। চলচ্চিত্রের প্রধান উপাদান Script বা পাণ্ডুলিপি। তা কোন গল্প হতে পারে আবার কোন তথ্য বা দলিলও হতে পারে। কিন্তু সমস্ত ছবিই

Script-কে অনুসরণ করে গড়ে ওঠে। কাহিনি চিত্রের ক্ষেত্রে Script-কে চিত্রনাট্য বলা হয়। সেখানে কিছু না কিছু নাটকীয় উপাদান থাকে। প্রথাসিদ্ধ চলচ্চিত্রে কাহিনির উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। ভিন্নধর্মী চলচ্চিত্রে কাহিনির নাটকীয়তা ও গল্পের ঠাশবুনুনির উপর জোর দেওয়া হয় না। এ সব ছবিতে আঙ্গিক ও পরিচালকের বক্তব্যই প্রধান। উল্লেখ্য—

> "সাধারণ দর্শকের চোখে চলচ্চিত্র, নাটকের দ্বিমাত্রিক পর্দায় প্রক্ষেপিত রূপ। সিনেমাকে এভাবে নাটকেরই ভিন্নরূপ হিসেবে মনে করার সহজ কারণটা এই, আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত চলচ্চিত্রকাররা সিনেমার বিভিন্ন কলাকৌশলের সাহায্য নিয়ে পর্দায় নাটকই দেখাতে চেয়েছেন। এটা অবশ্য সব সময়ে ও সকলের কাছে স্পষ্ট ছিল যে চিত্রায়িত নাটক মঞ্চস্থ নাটক থেকে আলাদা এবং নাটকের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্কের ভিত্তিতে চলচ্চিত্রের ব্যাকরণ রচনা করা সম্ভব। এমন ছবিও দেখা যায় যা মঞ্চস্থ নাটকের চেয়ে তেমন আলাদা কিছু নয়। আবার এমন ছবি আছে যা অনেক কম নাট্যধর্মী এবং প্রায় পুরোপুরি চলচ্চিত্র সুলভ। অ কাহিনিচিত্র, যেমন তথ্যচিত্র, বৈজ্ঞানিক চিত্র ও তথাকথিত 'আর্টফিল্ম' এই আলোচনার বাইরে থাকবে। সেগুলির আঙ্গিক স্বতন্ত্র।"[৬]

চিত্রনাট্য তত্ত্ববিদ আইজেন স্টাইন তিনটি বিষয়ের উপর চিত্রনাট্যকারের ভাবনা সুনির্দিষ্ট করেছেন--

১। নাট্যরচনা তত্ত্ব

২। অভিনয় কৌশল

৩। মন্তাজ

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে মন্তাজ হল স্নায়ুস্বরূপ। মন্তাজ হল দুটি শটকে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া। ছবির এডিটিং-এর সময় মধ্যবর্তী অনেক অংশ ছেঁটে ফেলে দুটি পরস্পর নিবদ্ধ অংশকে জোড়া হয়। তবে বিখ্যাত রুশ চিত্র পরিচালক আইজেন স্টাইন—মন্তাজকে ছবির বিশেষ মাত্রা হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁর মতে দুটি শটের মধ্যে সংঘর্ষে তৃতীয় একটি আবেদন সৃষ্টি করা মন্তাজের লক্ষ। লক্ষণীয় বিষয় হল—

> "শটের পর শট দিয়ে পরিচালক একটি দৃশ্যভাবনাকে প্রকাশ করেন। দৃশ্যভাবনা বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন পরিপ্রেক্ষিতের। বিভিন্ন শটের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্মাণের মধ্য দিয়ে তৈরি হয় পরিপ্রেক্ষিত এবং তা পরিণামে বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে লজিক্যাল যোগসূত্র স্থাপন করে মন্তাজ তৈরি করে। একটি দৃশ্যায়নকে

> সঠিকভাবে বুঝতে গেলে, উপলব্ধি করতে গেলে এবং উপভোগ করতে গেলে পরিপ্রেক্ষিতের সাহায্য প্রয়োজন। পরিপ্রেক্ষিতটি বোঝা গেলে বিষয়টিও নিঃসন্দেহে বোঝা যাবে। এই পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করা হয়। দৃশ্য পরিকল্পনা, সংলাপ নির্মাণ, অভিনয়ের মাত্রা নির্ধারণ ও আবহসংগীত সংযোজন করে সৃষ্টি করা যায় পরিপ্রেক্ষিতকে। পথের পাঁচালীর পরিপ্রেক্ষিত তৈরি হয়েছে দৃশ্য পরিকল্পনায়, অভিনয়ে, সংগীত, শিল্প নির্দেশনায় এবং সংলাপে।"[৭]

কাঞ্চনজঙ্ঘার পরিপ্রেক্ষিতও তৈরি হয়েছে এই একই পথ অনুসরণ করে।

চলচ্চিত্র ক্যামেরা চিত্র-লেখনী এবং মাইক্রোফোন হল শব্দ-লেখনী আর চিত্রনাট্যকারের লেখনী হল যুগপৎ ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন। ক্যামেরা দ্রুত সঞ্চালনের কারণেই চিত্রনাট্যকারকে দেশ-কালের বৃত্ত অধিক পরিমাণে অন্তর্ভূক্ত করার সুযোগ নিতে হয়। এখানেই মঞ্চনাটকের সঙ্গে তার তফাৎ। যদিও আজকাল ঘূর্ণায়মান মঞ্চ কোথাও কোথাও আছে। কিন্তু চিত্রনাট্যের কাছে পৌঁছাতে পারে না। বলা ভাল--

> "মঞ্চ নাটক দেখবার সময় যেমন চরিত্র নির্ভর সংলাপের অতীত ভিন্ন এক ভাষা ব্যঞ্জনার সন্ধানে অনুসন্ধিৎসু দর্শকের নিবিষ্টচিত্ততা লক্ষ্য করা যায়, চলচ্চিত্রের দর্শকমানসেও এই একই ক্রিয়া কিছুটা ভিন্নতর পন্থায় অনবরত চলতে থাকে। এখানেও ভাষা বলতে কেবল চরিত্রের মুখের ভাষাকেই বোঝায় না। মানুষের সঙ্গে সংযোগ সাধনে তাকে শিল্পিত শর্ত বা Cinematic শর্তসমূহ পূরণ করে চলতে হয়।"[৮]

চিত্রনাট্য হল দৃশ্য উপন্যাস। উপন্যাসে অধিক-এর বর্ণনাধর্মী। কাজেই ঔপন্যাসিক নিজের ভাষ্য রচনাও করতে পারে। কিন্তু চিত্রনাট্যকারকে কেবল চিত্রের ভাষার উপর নির্ভর করতে হয়। দূর্গার মৃত্যুর পর হরিহর যখন সর্বজায়ার মুখোমুখী তখন কেবল দারিদ্র্যের দৃশ্য। রবিশঙ্করের সেতার এবং সর্বজায়ার কান্নার মধ্যেই চিত্রনাট্যের সংলাপ ঝরে পড়ে। এই যে দ্যোতনা সৃষ্টির সুযোগ তা চলচ্চিত্রে Clouse up-এর মধ্য দিয়ে যতটা পরিস্ফূটিত, মঞ্চ নাটকে তা হতে পারে না। চিত্রনাট্যের সংলাপকে যেমন সংক্ষিপ্ত ও ব্যঞ্জনা গর্ভ হতে হবে, তেমনি ছবির Shot-দৃশ্যগুলিও অতিদ্রুত পরিবর্তিত হবে।

চলচ্চিত্রে সঙ্গীত একটা বড়ভূমিকা পালন করে। সঙ্গীত ছাড়া চলচ্চিত্র বিশেষ করে বাংলা চলচ্চিত্র যেমন অসম্পূর্ণ। নির্বাক যুগে সিনেমায় কোন শব্দই ছিল না চলচ্চিত্রে শব্দ আসার পরেই আসে আবহসঙ্গীত ও সঙ্গীতের প্রভাব। সংলাপবিহীন বিভিন্ন দৃশ্য দর্শকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। সেজন্য সংলাপহীন দৃশ্যগুলিকে আবহসঙ্গীতের সাহায্যে বাঙ্ময় করে তোলা হয়। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন শটে সংলাপের মধ্যেও Music

ব্যবহার করা হয় ছবির পরিবেশকে আরও অর্থবহ করে তোলার জন্য। উল্লেখ্য, ছবিতে একই আবহসঙ্গীত অনেক সময় বারবার আসে। এটি Theme Music হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন তপন সিংহের 'আপনজন' ছবিতে ‘ওঠ গো ভারতলক্ষ্মী' গানটির যন্ত্রসঙ্গীত আবহসঙ্গীত হিসাবে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক সময় আবহসঙ্গীত বন্ধ রেখে নৈঃশব্দ্যের সৃষ্টি করে পরিচালক শূন্যতাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে চান। তাই এই নৈঃশব্দ্যও বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

বিচিত্র স্রষ্টা, সাহিত্যিক ও বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় দুই ধরনের চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। প্রথম ধরনের চিত্রনাট্যের উদাহরণ হল 'পথের পাঁচালী'। এই চিত্রনাট্যে প্রত্যেকটি Shot স্কেচ করে আঁকা এবং তার পাশাপাশি দৃশ্যবিবরণ ও সংলাপ লেখা। প্রসঙ্গত জনৈক সমালোচকের মন্তব্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

> “পথের পাচালীর পরিচালক সত্যজিৎ রায় তার প্রথম সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমেই বাঙলার সমাজ প্রকৃত, বাঙালির জীবনযাত্রা, সংসার, সংস্কৃতি এবং বৃহৎ এই বাঙলার এক হত-দরিদ্র জনপদের অভাব-অনটন ও দরিদ্র্ক্লিষ্ট কিছুসংখ্যক নিরন্ন মানুষের রূপ চলচ্চিত্রে মাধ্যমে তুলে ধরে তৎকালীন নাট্যধর্মীতা থেকে চলচ্চিত্রকে মুক্ত করেন। বাঙলার দারিদ্র্যভরা, শতছিন্ন, নিরন্ন এবং অভাবী মানুষ ও সমাজের প্রতিরূপ নির্মাণে এবং একই সাথে এদেশের প্রাকৃতিক ঋতু পরিবর্তনের বিষয়টি পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চলচ্চৈত্রিক ভাষায় ধারণপূর্বক বিশ্বচলচ্চিত্র আসরে প্রদর্শনের মাধ্যমে একজন বাঙালি পরিচালকের আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার ইতিহাস রচনা করেন ।"[৯]

সত্যজিৎ কবিতার মতো হৃদয়ানুভূতিসম্পন্ন কিছু রোমান্টিক ছবিও তৈরি করেছেন। কিন্তু তার সঙ্গে মিশে আছে কালচেতনা ও সমাজচেতনা। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছবি হল কাঞ্চনজঙ্ঘা। উল্লেখ্য, তাঁর-

> "চলচ্চিত্র চলমান জীবন প্রবাহের খণ্ড কাহিনি। তিনি কোনও বিশেষ মতবাদে বিশ্বাস করেন না। প্রাত্যহীক জীবনে শিল্পীর চোখে না উদ্ভাসিত হয় তাই তিনি চিত্রায়িত করেন। বহুল প্রচলিত উপন্যাসগুলিকে তিনি চলচ্চিত্রের ভাষা দেন। কারণ চলচ্চিত্র এক স্বতন্ত্র গণমাধ্যম।"[১০]

‘কাঞ্চনজঙ্ঘা' দ্বিতীয় শ্রেণির চিত্রনাট্য। এতে স্কেচ্ এঁকে Shot বোঝানো হয়নি। কিন্তু সংলাপযুক্ত ও সংলাপবিহীন প্রত্যেকটি Sequence ও Shot-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কোন কোন দৃশ্য ক্ষণস্থায়ী ও সংলাপ বর্জিত। শুধু ঘটনাস্থল ও পাত্র-পাত্রীর নীরব ক্রিয়ার বিবরণে পূর্ণ। দৃশ্যগুলির পরিচয় বিশদ। তাতে পরিবেশ

সময়, পাত্র-পাত্রীদের চেহারা; মানসিকতা ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার অনুপঙ্খ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র চিত্রনাট্যকে টানটান সংলাপ এবং বিশদ দৃশ্য বিবরণ—এই দুই মিলিয়ে অনুসরণ করতে হয়। তবে এই চিত্রনাট্যে একেবারে শেষ Shot-এ 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র তুষারাবৃত্ত পর্বত চূড়ার ক্লোজআপের ছবি ছাড়া আর কোন ক্যামেরার নির্দেশ নেই। তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সত্যজিৎ রায়ের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি এবং নতুন অধ্যায়ের যুগ সূচিত করে।

বলা প্রয়োজন এটি তাঁর নিজের গল্পের ওপর বানানো প্রথম রঙিন ছবি। ১৯৬২ সালে ছবিটি মুক্তি পায়। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' চিত্রভাষা ও মানবিকতার দিক থেকে সারা বিশ্বের মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিল। শুধু বিষয় উৎকর্ষে নয়, শিল্পের প্রসাদগুণেও শৈলী আঙ্গিক প্রতিন্যাসের অমেয় শক্তির বহিঃপ্রকাশেই তাঁর এই ছবিটি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়। জীবন জগতে, চলচ্চিত্র জগতে, শিল্পের জগতে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' যেন এক দার্শনিক পরিক্রমা।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা' দুই ঘন্টার চিত্রনাট্য। কাহিনির ঘটনা কালও তাই। সব ঘটনাই ঘটেছে দার্জিলিং-এ 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র পাদদেশে-কিছু উইন্ডরেমিয়ার হোটেলে, কিছু ম্যালে, কিছু জলাপাহাড়ের পথে, কিছুটা পার্কে। ফলে চিত্রনাট্য জুড়ে সবসময় একটা চলমানতার ছবি। বোঝা-ই যায়, এই চিত্রনাট্য চলচ্চিত্রের আউটডোর সুটিং বা বহির্দৃশ্য গ্রহণের রীতি অনুযায়ী রচিত।

সত্যজিৎ 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' চিত্রনাট্যটিকে মোটামুটি চল্লিশটি Sequence-এ গেঁথেছেন এবং তাদের ক্যামেরার নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নেওয়া Shot-এ সাজিয়েছেন। এর কাহিনি অনুসরণ করলে দেখা যায়--কলকাতার একটি অভিজাত ধনী পরিবার অপরাহ্ন বেলায় দার্জিলিং-এ মেঘ ও কুয়াশার মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘার রৌদ্রোজ্জ্বল তুষার চূড়া দেখার ইচ্ছা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের জীবনে দুটি ঘন্টার সময়ের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে যায়। পরিবারে আছে ২টি মেয়ে। বড় বোন অনিমার বিবাহপূর্ব প্রেম ও প্রেমিকের চিঠি নিয়ে স্বামী শংকরের সঙ্গে প্রচন্ড বিবাদ বাধে। ব্যাপারটা এতদূর গড়ায় যে, তারা বিবাহ বিচ্ছেদের কথা বলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশাল কাঞ্চনজঙ্ঘার ছায়া তলে এসে শিশুকন্যা টুকলুর কথা ভেবে তারা মিটমাট করে নেয়। অবিবাহিতা ও বিবাহযোগ্য ছোট মেয়ে মনীষা কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে পড়ে। দার্জিলিং-এ তার একটা পাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। পাত্র প্রণব ব্যানার্জী একজন ক্যারিয়ারিস্ট ইঞ্জিনিয়ার, উজ্জ্বল তার ভবিষ্যৎ। কিন্তু তার কর্মজীবন ও বিবাহ সম্পর্কিত মূল্যবোধগুলি মনীষার মূল্যবোধ থেকে আলাদা। প্রণব মনীষার কাছে বিবাহ প্রস্তাব পেশ করতে চায়। কিন্তু মনীষার বাধায় তা প্রতিহিত হয়।

মেয়ে দুটির বাবা দোর্দন্ড প্রতাপ রায়বাহাদুর ইন্দ্রনাথ চৌধুরী অনেকগুলি কোম্পানীর মালিক ও ডিরেক্টর। তিনি প্রবল ইংরেজি ভক্ত। তাঁর মধ্যে ঔপনিবেশিকতার পিছুটান রয়েছে। তার ইচ্ছে ছোট কন্যা ধনী ইঞ্জিনিয়ার প্রণবের

বিবাহ প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। এই প্রথম ডিরেক্টর পরিবার কর্তার ইচ্ছে তাঁর পরিবারে প্রত্যাখ্যাত হয়। কাঞ্চনজঙ্ঘার সান্নিধ্যে এসে মনীষা অন্তরে একটি বিষয়-বিবিক্ত মুক্তির স্বাদ অনুভব করে—সেই তার কাঞ্চনজঙ্খা দর্শন।

পরিবারে মেয়ে দুটির একটি ভাই আছে অনিল। সে স্ফূর্তিবাজ লঘুচিত্ত যুবক---২ ঘন্টার মধ্যে একটি তরুণীকে হারায় এবং অপর একটিকে জুটিয়ে ফেলে। পরিবারের গৃহিনী প্রৌঢ়া লাবণ্য প্রভা সংসারের চাপে এবং স্বামী ব্যক্তিত্ব প্রভাবে গান ভুলেছিলেন। কাঞ্চনজঙ্ঘার উদার পরিবেশ তলে তিনি হারানো গান ফিরে পান, সেই সঙ্গে নিজেকে। তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত 'এ পরবাসে রবে কে হায়' ব্যক্তির আর্তিকে ভাষা দেয়। তিনিই স্বামীর বিরক্তি প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ছোট কন্যা মনীষাকে অভয় যোগান। সে যেন বিয়ের ব্যাপারে নিজের স্বাধীন বিবেচনাকেই মূল্য দেয়।

লাবণ্যের ভাই বিপত্নীক জগদীশ পক্ষি-প্রেমিক এবং পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। তিনি একটি বিশেষ পাখির ডাক অনুসরণে বাইনোকুলার হতে তাকে খুঁজে ফেরেন। মুক্তির প্রতীক এই পাখিটি হয়তো বাস্তবে কোথাও নেই--তারে মনেই নিরন্তর ডাকছে।

এই পরিবারের কাহিনির সঙ্গে কলকাতার এক মধ্যবিত্ত ঘরের তরুণ অশোক যুক্ত হয়। তার কাকা শিবশঙ্কর বাবু ইন্দ্রনাথের পুত্র অনিলের গৃহশিক্ষক ছিলেন। সেই পরিচয়ের সুবাদে তিনিই ইন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন বেকার অশোকের একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে। কিন্তু বিশাল হিমালয়ের ক্রোড়ে। উত্তুঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরের সান্নিধ্যে অশোক ইন্দ্রনাথের করে দেওয়া চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। সে মনীষার বন্ধু হয়ে ওঠে। হয়তো কলকাতায় ফিরে দু'জনে এই বন্ধুত্ব আরো স্থায়ী হবে এবং ভিন্নমাত্রা পাবে।

ইন্দ্রনাথ চিত্রনাট্যের শেষপর্বে দার্জিলিং-এ একা হয়ে যান। চিত্রনাট্যের একেবারে শেষ দিকের Sequence-এ তিনি সকলকে ডেকেও কারো সাড়া পান না। আশোক ও মনীষার প্রত্যাখ্যানের আঘাতে তিনি জীবনের বৃহৎ সত্য প্রথম উপলব্ধি করেন। জোর করে কারও স্বাধীন ইচ্ছার গতিরোধ করা যায় না। এটাই তার অন্তরের দিক থেকে প্রকৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন। যে কাঞ্চনজঙ্ঘা শুধু প্রকৃতির বিশাল ও মহৎ সৌন্দর্যই নয়, জীবনের বৃহৎ সত্যোপলব্ধিরও প্রতীক।

চিত্রনাট্যের শেষ Shot-এ অন্তরের কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনের পর বাস্তবের কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনও ঘটে। এর পরিচয় দিয়ে চিত্রনাট্যকার সত্যজিৎ রায় কবির কলমে লেখেন— "কুয়াসা আর নেই, মেঘও সরে গেছে। সূর্যের শেষ রশ্মি এখন কাঞ্চনজঙ্ঘার উপরে। আবহসংগীত উদাত্ত স্বরে এই অপার্থিব দৃশ্যের শাশ্বত মহিমা ঘোষণা করে।" স্পষ্টতই চিত্রনাট্য এখানে লংশট থেকে ক্লোজ আপে ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ আশ্রয়

করেছে। এর সঙ্গে সঙ্গীত রচনা করেছে হাইল্যান্ডারদের উদাত্ত সঙ্গীত যা আবহসঙ্গীতরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

C.B Thompson-কে ১৯৭২ সালে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ জানিয়ে ছিলেন, তাঁর 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' চলচ্চিত্রের বিষয় হচ্ছে—"An Exploration at people coming out of their shell" অর্থাৎ তাঁর কাছে কাঞ্চনজঙ্ঘা হল 'উদ্ঘাটন'-মানুষগুলির নিজেদের খোলস থেকে বেরিয়ে আসা। প্রকৃত অর্থে দেখাও যায় উদার মহিমান্বিত কাঞ্চনজঙ্ঘা শিখরের সানুদেশে দাঁড়িয়ে অনিমা, শংকর, মনীষা, প্রণব, লাবণ্য, অশোক, ইন্দ্রনাথ প্রমুখ চরিত্র তাঁদের গতানুগতিক দৈনন্দিন পরিচয়ের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে "গুণ্ঠনের আড়ালে নিজস্ব সত্ত্বা"-কে আবিষ্কার করে। চিত্রনাট্য ছাড়া অন্য কোন নাট্যরূপে এই উদ্ঘাটন এবং আবিষ্কার এমন তাৎপর্যময় হয়ে উঠত না।

সুতরাং আলোচনার শেষে আমরা একথা বলতে পারি শিল্প; সাহিত্য বা সংস্কৃতির অপরাপর মাধ্যমের স্রষ্টা যেমন কবি, চিত্রকর সঙ্গীতজ্ঞ বা ভাস্করের মতো চলচ্চিত্রকারও সিনেমায় তাঁর প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে নিজের শিল্পবোধ ও বক্তব্যকে উপস্থাপন করেন। আজ আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার যুগে চলচ্চিত্রের স্রষ্টারা নান্দনিকতা, বিষয় চলচ্চিত্র, ভাষার প্রকাশ, শৈলী প্রভৃতি পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাফল্যের মাধ্যমে বর্তমানের চলচ্চিত্রকে 'অথর্ম ফিল্ম'-এর মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। সত্যজিৎ রায় তাঁর 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' নামক চলচ্চিত্রটিতে নিজস্ব শিল্পবোধ ও গভীর জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছেন। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য বর্ণনায় তাঁর ছবিটি সর্বোৎকৃষ্ট উৎকর্ষতার পরিচয় বহন করে। কাঞ্চনজঙ্ঘায় অণুরনিত হয়েছে সৃষ্টিশীল ব্যঞ্জনা। আর দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে অবিনাশী চিত্রকর্ম। তাই 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' চলচ্চিত্র হয়েও পরিচালকের নান্দনিক শিল্পবোধের প্রগাঢ়তার কারণে তা হয়ে উঠেছে অমর কাব্য। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' চিত্রনাট্যটি শিল্পমাধ্যম হিসাবে এখানেই সার্থক।

তথ্যসূত্রঃ

১। অধাপিকা পিয়ালী চক্রবর্তী ও অধ্যাপক শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, চলচ্চিত্রের অন্তরমহল, কলকাতা, সুহৃদ বুক স্টল,৩ ফাল্গুন, ১৪১৯, পৃ. ১৪৩

২। উবায়েদ উল হক, নাটক ও চলচ্চিত্র, ধ্রুপদী (পাকিস্তান চলচ্চিত্র সংসদ-এর দ্বিতীয় সংকলন), সম্পাদকঃ মাহবুব জামিল ও অন্যান্য, ঢাকা, পৃ. ১৭

৩। "সাহিত্য, সিনেমা ও চিত্রনাট্যের ভাষা", দেশ, ১৫ এপ্রিল, ২০০০

৪। অধাপিকা পিয়ালী চক্রবর্তী ও অধ্যাপক শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, চলচ্চিত্রের অন্তরমহল, কলকাতা, সুহৃদ বুকস্টল,৩ ফাল্গুন, ১৪১৯, পৃ. ১৪৩

৫। ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গণজ্ঞাপন তত্ত্বে ও প্রয়োগে, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ. ২১৯

৬। অধাপিকা পিয়ালী চক্রবর্তী ও অধ্যাপক শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, চলচ্চিত্রের অন্তরমহল, কলকাতা, সুহৃদ বুক স্টল, ৩ ফাল্গুন, ১৪১৯, পৃ. ১৫০
৭। ড.বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য ,জ্ঞা্পন ও গণমাধ্যম , কলকাতা, লিপিকা,২০১৭, পৃ.১৫৪
৮। আহমেদ আমিনুল ইসলাম, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র চলচ্চিত্রে বাংলাদেশ, ঢাকা, ভাষাচিত্র, ২০১৪, পৃ. ১৭
৯। আহমেদ আমিনুল ইসলাম, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র চলচ্চিত্রে বাংলাদেশ, ঢাকা, ভাষাচিত্র, ২০১৪, পৃ. ৩৫-৩৬
১০। ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গণজ্ঞাপন তত্ত্বে ও প্রয়োগে, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ. ২৪৮

নির্বাচিত পত্রিকাসমূহ- একটি সৃষ্টি ও সৃষ্টিক্ষেত্র: সার্ধশতবর্ষের আলোকে

তমা দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : সাহিত্যের সমস্ত আঙ্গিক- কোনো উপন্যাস বা ছোটোগল্প, কোনো প্রবন্ধ বা কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে নামী বা অনামী পত্রিকাতে প্রকাশ পায়। পাণ্ডুলিপিটি লেখকের দরবার থেকে পাঠকের দরবারে পৌঁছনোর আগে গিয়ে উপনীত হয় পত্রিকার আঙ্গিনাতে। পত্রিকাগুলি তাই হয়ে ওঠে এক-একটি সৃষ্টির আঁতুড়ঘর। সম্পাদকের শাসনে-আদরে পাণ্ডুলিপিটির ছাপার অক্ষরদান হয়। আমরা কোনো লেখকের জন্মশতবর্ষ, কোনো গ্রন্থের প্রকাশ বার্ষিকী যখন উদ্‌যাপন করি; সেই গ্রন্থ প্রকাশের স্থান, লেখকের পরিচয়দাতাকারী-মাধ্যম পত্রিকাগুলোর কেন নয়। ১৮৭২ সালে বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে আগত পত্রিকাগুলোর জন্মসার্ধশতবর্ষ দ্বিগুণ শ্রদ্ধান্বিত হয়ে আমাদের স্মরণ করা কর্তব্য।

মূলশব্দ: কষ্টিপাথর, সৃষ্টিক্ষেত্র, কারখানা, শস্যোপাদান, সৃষ্টি-খনিজ, সাহিত্য-ডালা, সৃষ্টি-নিয়ন্তা।

স্রষ্টা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাঁর সৃষ্টিকার্যটি সম্পন্ন করে থাকেন। তাঁর লিখিত সৃষ্টিটি তখনই অমরত্বের শিরোপা পায় যখন সেটিকে পাণ্ডুলিপি থেকে গ্রন্থ আকার দেওয়া হয়। আর এই গ্রন্থাকারে পৌঁছনোর আগে সৃষ্টিকর্মটির অমরত্ব যাচাই হয়ে যায় পত্রিকার কষ্টিপাথরে। প্রথমবার লেখক-পাঠকমনের মিলন সম্পন্ন হয় পত্রিকা নামক সেতুটিরই মধ্য দিয়ে। পত্রিকার হাত ধরেই লেখকের সৃষ্টিটি প্রথম পাঠকহস্তে এসে পৌঁছয়। পাঠকের চাহিদা, সম্পাদকের তাগিদে লেখকের রচনার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এপ্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্য স্মরণীয় “নানারকম গদ্যপদ্য লেখবার এবং ছাপবার যতটা প্রবল ঝোঁক যত বেশি লোকের মধ্যে আজকাল এ দেশে দেখা যায়, তা পূর্বে কখনো দেখা যায় নি। এমন মাস যায় না, যাতে অন্তত একখানি মাসিক পত্রের না আবির্ভাব হয়। এবং সে-সকল মাসিক পত্রে সাহিত্যের সকলরকম মালমসলার কিছু-না-কিছু নমুনা থাকেই থাকে।”[১]পত্রিকাকে তাই বলা যেতে পারে সৃষ্টিক্ষেত্র; সাহিত্য নির্মাণের কারখানা। আর তাই তো লেখকের সৃষ্টিটির সাথে সাথে পত্রিকাটিও পাঠকমনে অমরত্বের আসন লাভ করে।

লেখকের সৃষ্ট রচনা কিংবা সম্পাদকের পত্রিকা দুইই সাহিত্যজগতের সৃষ্টি। দুইই অনেক উদ্দেশ্য নিয়ে, সাহিত্যক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করতে অবতারণা করেছে। সাহিত্যের

বিভিন্ন শস্যোপাদান- কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধের সাথে সাথে তাই পত্রিকাগুলোর সার্ধশতবর্ষও সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমেই আলোচ্য ১৮৭২এর ১২ এপ্রিল কলকাতার ভবানীপুরের ১ পিপুলপাতি লেন থেকে ৩৪ বর্ষীয় যুবক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গদর্শন। কর্মসূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র তখন মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রামদাস সেন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখের সান্নিধ্যে নবরত্ন সভা ও গ্রান্ট হলের আড্ডা সাহিত্য নির্মাণের এক কারখানার ভিত্তি স্থাপনে প্রশ্রয় দেয়।

বঙ্গদর্শন পূর্ববর্তী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধিনী', রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ'তে তত্ত্ব, দর্শন, ইতিহাস প্রাধান্য পেয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছিলেন ধনীদের বই পড়ার সময় বা আগ্রহ নেই, সে দায়িত্ব তাদের সন্তানদের। বাংলা গ্রন্থ শুধুমাত্র সাধারণ স্কুলের ছাত্র-পণ্ডিত, "অপ্রাপ্তবয়ঃ-পৌর-কন্যা" এবং "নিষ্কর্মা রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের" কাছে পাঠ্য। দুই একজন গুণীজন ভূমিকা পর্যন্ত পাঠ করেই ক্ষান্ত হন।"...যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরেজি গ্রন্থের ছায়ামাত্র; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি?"[২] পাঠকসমাজকে বাংলাসাহিত্যের দিকে ফিরিয়ে আনাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য। তিনি বুঝেছিলেন শিক্ষিতদের সঙ্গে অল্পশিক্ষিতদের সহাবস্থানের ব্যবধান কতখানি। "সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ। আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব।"[৩]তাই বলে শুধুমাত্র সুশিক্ষিতদের পাঠোপযোগী করলেই চলবে কেন, সেটি বুঝতে দেরী হয়নি বঙ্কিমচন্দ্রের "এরূপ কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্র লোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।"[৪]তাই বলে সাধারণের জন্য তথাকথিত নিম্নমানের সাধারণ লেখা দিয়ে তিনি বঙ্গদর্শনের পাতা ভরান নি। তিনি তাঁর লেখাকে সেই স্তরে নিয়ে গিয়েছেন যা নিম্নস্তরের পাঠকেরও কাছে এসে পৌঁছবে।

বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের কাছে সাহিত্যভাণ্ডার তো ঋণী রয়েছেই দেশের সামাজিক, রাষ্ট্রিক দিকগুলিও বাদ যায় নি। ভাষা, সঙ্গীত, সাহিত্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব কিছুই বাদ থাকে নি। ইংরেজি না জানা পাঠককে তিনি প্রাচ্যের স্বমহিমায় পাশ্চাত্যের আলোক দান করেছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে এক তটে এনে স্থাপন করেছেন।সম-সাময়িক পত্রিকাগুলো যখন ধর্মবিষয়ক বিতর্কে লিপ্ত; বঙ্কিম-প্রতিভাস্পর্শে বঙ্গদর্শন একের পর এক সৃষ্টি-খনিজ দিয়ে সাহিত্য-ডালা পূর্ণ করে চলল। শুধু শুধু ধর্ম, বিজ্ঞান, তত্ত্ব পাঠকদের সাহিত্যরস মেটানো তো দূরের কথা তাদেরকে পত্রিকা থেকে দূরেই রেখেছিল। বঙ্গদর্শন পাঠকদের সেই অতৃপ্ত চাহিদার বিনাশ করেছিল। নিখুঁত মননশীলতা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বিশ্লেষণ ও সহজ রসবোধের সমন্বয়ে বঙ্গদর্শন পাঠকদের

সাহিত্য আস্বাদ দিতে সফল হয়।এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' স্মরণীয় ''অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়োলোকের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরো বেশি দুঃসহ হইত।''[৫]

বঙ্গদর্শন ছিল বঙ্কিমের সাহিত্য সাধনার পটভূমি। বঙ্গদর্শনের সব্যসাচী সাধক তিনি। প্রথম বছর ১৮৭২এ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারতকলঙ্ক', 'বিষবৃক্ষ', 'ব্যাঘ্রাচার্য্যবৃহল্লাঙ্গুল', 'বিজ্ঞানকৌতুক', 'উত্তরচরিত', 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'বাঙ্গালা ভাষা', 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা অনুষ্ঠান পত্র' প্রভৃতি প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যাঙ্গনের বিভিন্ন আঙ্গিক পূর্ণ করে। বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' বাংলা উপন্যাসের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে, প্রকাশের সার্ধশত বছর পড়েও 'বিষবৃক্ষে'র সে মহিমা আজও অমলিন। প্রবন্ধ সাহিত্যেও বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের অবদান অনস্বীকার্য।

বঙ্কিম সম্পাদিত বঙ্গদর্শন বাংলা সাহিত্যে অনেক লেখককে তাদের কৃতিত্ব উপলব্ধির সুযোগ করে দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠা অলংকৃত করে তাঁরা নিজেদের লেখনী বলিষ্ঠ করেছেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কামিনীকুসুম কবিতা'; অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'উদ্দীপনা'; দীনবন্ধু মিত্রর 'প্রভাত কবিতা', 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ'; রামদাস সেনের 'ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত', 'কালিদাস'; রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'ঊষা কবিতা', 'প্রথম শিক্ষা বীজগণিত'; হুগলী কলেজের বঙ্কিম-সহপাঠী নিমাইচাঁদ শীলের 'ধ্রুবচরিত্র', হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নটনন্দিনী'; তারকনাথ চক্রবর্তীর 'বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ'; প্রাণনাথ পণ্ডিতের 'মেঘদূতম্' প্রথম বছর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৭২ খ্রিঃ জানুয়ারি মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ ও তারাকুমার কবিরত্নের সম্পাদনায় পাক্ষিক 'বিশ্বদর্পণ' প্রকাশিত হয়। ১২৭৯ বৈশাখ ৩য় সংখ্যা থেকে পত্রিকাটি প্রতি মাসে বের হত। ''বালক-বালিকাগণের শিক্ষোপযোগী বিজ্ঞান সাহিত্যাদি বিষয়ক প্রস্তাব এবং রাজনীতি ধর্ম্মনীতি, সামাজিক রীতিনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করা প্রচারকদিগের অভিপ্রেত।''[৬]এছাড়াও কিছু আগে-পরে আরও কিছু পত্রিকা বের হয়। বিশিষ্ট নাট্যকার মনোমোহন বসু সম্পাদিত 'মধ্যস্থ' ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকালে এটি ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। দ্বিতীয় বর্ষের ২৭ সংখ্যা থেকে পত্রিকাটি প্রতি সপ্তাহে বের না হয়ে প্রতি মাসে বের হত। ১২৮২ বঙ্গাব্দ আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত পত্রিকাটি চলেছিল। পত্রিকাটির যথেষ্ঠ সুনাম ছিল। চৈত্র ১২৭৮ সিরাজগঞ্জের কাছে ঘোড়াচরা থেকে চন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মাসিক 'জ্ঞানপ্রভা', শ্রাবণ ১২৭৯ বরিশালের কেওরা থেকে হরকুমার রায়ের পাক্ষিক 'পরিমলবাহিনী', শ্রাবণ ১২৭৯ উমেশ্চন্দ্র মিত্রের 'বঙ্গসুহৃদ', আগস্ট ১৮৭২ সাপ্তাহিক 'ভারত ভৃত্য', ১৪ ভাদ্র ১২৭৯ যদুনাথ চক্রবর্তীর সাপ্তাহিক 'আসাম-মিহির', ১১ আশ্বিন ১২৭৯ জয়নারায়ণ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাসিক 'আর্য্য-প্রবর', আশ্বিন ১২৭৯ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর 'সঙ্গীত-সমালোচনী' উল্লেখযোগ্য।

১৮৭২র আগস্ট মাসে রেভাঃ রাসবিহারী দে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' নামে একটি পত্রিকা বের করেন। ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত এই পত্রিকাটি ছিল একটি মাসিক পত্রিকা। ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলো এখানে পর্যালোচিত হত। বাংলার কৃষকদের দুরবস্থা, স্ত্রীশিক্ষা বিভিন্ন বিষয়ে তিনি কলম ধরেছিলেন তাঁর এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে। ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাসবিহারী দে পত্রিকাটি চালিয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণদাসের সম্পাদনায়১২৭৯ বঙ্গাব্দ আশ্বিন রাজশাহী থেকে 'জ্ঞানাঙ্কুর' প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যে এই পত্রিকাটির গুরুত্ব, ১৮৮২ খ্রিঃ রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'প্রতিবিম্ব'র সাথে একসাথে 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব'এ রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্য 'বনফুল' প্রকাশিত হয়।

অতুল দত্ত লেনের মিনার্ভা প্রেস থেকে ১৮৭২ আগস্ট মাসে শম্ভুচন্দ্র মুখপাধ্যায়ের নব পর্যায় 'মুখার্জিস ম্যাগাজিন ২' প্রকাশিত হয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা থেকে রাজনীতি সব এতে প্রকাশিত হত। 'মুখার্জিস ম্যাগাজিনে'র পাতা সমৃদ্ধ হয়েছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখের লেখনীতে।

১২৭৯ বঙ্গাব্দে রাজা কৃষ্ণনাথের আনুকূল্যে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা', ১২৭৯ বঙ্গাব্দে যশোদানন্দ সরকার সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সমাজ-দর্পণ' উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ বিরোধী লেখালেখির জন্য যে সংবাদপত্রের সংবাদ সংগ্রহ করা হয়েছিল এদু'টিও তার মধ্যে ছিল। 'সমাজ-দর্পণ' আগেও পাক্ষিকভাবে অবিভক্ত বাংলাদেশে বের হত, ব্রিটিশবিরোধী লেখালিখির জন্য সেসময় পত্রিকাটি বন্ধ করতে হয়েছিল।

পত্রিকাগুলোতে সাহিত্য-রাষ্ট্রিক ছাড়াও অপর বিষয়ও প্রকাশিত হত। বৈশাখ ১২৭৯ দুর্গাচরণ গুপ্ত ও সত্যচরণ গুপ্তের সাপ্তাহিক 'পরিদর্শক; এতে "প্রথমাংশে পঞ্জিকা, দ্রব্যাদির আমদানি-রপ্তানি ও বাজারদর, যান-বাহনের ভাড়া উপায়, রাজ আইন সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি... আর দ্বিতীয় অংশে কেবল ব্যাপারগুলি"[৭] প্রকাশিত হত। ২১ বৈশাখ ১২৭৯ 'ধর্ম্মসাধন'এ সঙ্গতের বিবরণ ও ব্রাহ্মমন্দিরের উপদেশের সারাংশ সম্মিলিত হয়েছে। বৈশাখ ১২৭৯ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেদ, স্মৃতি, সাংখ্য, পাতঞ্জল ষড়দর্শন প্রভৃতির বাংলা অনুবাদ মাসিক 'সর্ব্বার্থ'এ, প্রাচীন শাস্ত্র ৩ আষাঢ় ১২৭৯ মাসিক 'হিতব্রত'এ প্রকাশিত।

প্রতিটি সাময়িকপত্র শুধুমাত্র সংবাদ পত্রের ইতিহাসে নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বমহিমায় উজ্জ্বল। বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসের সৃষ্টি-নিয়ন্তা। যেখানে যেটুকু ত্রুটি ছিল তা যেন নিখুঁত প্রলেপে নিরাময় করেছে। বাংলার অতীত ইতিহাস, ভাষা, শিল্প, সংস্কৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করানো থেকে

আধুনিক ভাবাদর্শে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা, বাঙালির সাহিত্যপিপাসা বাড়িয়ে নতুন নতুন সৃষ্টিতে এগিয়ে নিয়ে আসা সবটাই করেছিল এই পত্রিকাগুলো। তবে বেশ কিছু পত্রিকাকেই পৃষ্ঠপোষকদের অনীহার কারণে কিংবা অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে মাঝপথেই থেমে যেতে হয়েছিল। কিন্তু ক্ষণিকের আবির্ভাবেও পত্রিকাগুলির মূল্য থেকে যায়, থেকে গিয়েছে- "এ জগতে কিছুই নিষ্ফল নহে। একখানি সাময়িক পত্রের ক্ষণিক জীবনও নিষ্ফল হইবে না।"[৮]সার্ধশত বছর পরেও পত্রিকাগুলো আমাদের কাছে সমান গুরুত্ব পায় যখন সেই পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত রচনাগুলো আমরা আজও পাঠ করি।

তথ্যসূত্র:

১।। প্রমথ চৌধুরী: 'প্রবন্ধসংগ্রহ', 'বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ', বিশ্বভারতী প্রকাশন, জুন ২০১০, পৃ ৩৪।

২।। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: 'বঙ্কিম রচনাবলী- দ্বিতীয় খণ্ড', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা', প্রথম প্রকাশ, শুভম প্রকাশনী, ৭ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ২০১২, পৃ ৩৩৪।

৩।। তদেব, পৃ ৩৩৭।

৪।। তদেব, পৃ ৩৩৬।

৫।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পৌষ ১৪১০, পৃ ৪৫৩।

৬।। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক-পত্র', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৪২, প্রথম করুণা প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ ১১।

৭।। তদেব, পৃ ১২।

৮।। 'বঙ্কিম রচনাবলী-২য় খণ্ড', ঐ, পৃ ৩৩৮।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ; 'বাংলা সাময়িক পত্র' (অখণ্ড); করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ০৯; প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৪২, প্রথম করুণা প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৩।

২। সেন, সুকুমার; 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'- ৩য় খণ্ড; আনন্দ পাবলিশার্স; দশম মুদ্রণ আশ্বিন ১৪২১।

জীবনানন্দের কাব্য ভাবনা: অস্তিবাদের আলোকে

অচ্যুতানন্দ বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা

সারসংক্ষেপঃ জীবনের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি এবং নিজের উপর বিশ্বাস রেখে জীবনানন্দের পথচলা। তাঁর কাব্য-কবিতায় তিনি নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জীবনের ক্লান্তি ও বিপন্নতাকে অতিক্রম করে জীবনের জয়গাঁথা রচনা করেছেন তিনি। জগতের রূপ-লাবণ্য তিনি দু-চোখ ভরে উপভোগ করতে চেয়ে লিখেছেন

"তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও--আমি এই বাংলার পারে

রয়ে যাব; দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে;" তাই তাঁকে 'মৃত্যু-বিলাসী' কবি বা 'বিপন্ন-বিস্ময়ের' কবি না বলে অস্তিবাদী কবি বলা যেতেই পারে।

সূচক শব্দঃ অস্তিবাদ, anxiety, বিপন্ন-বিস্ময়, existence

মূল প্রবন্ধঃ

এমন কোনো স্রষ্টা নেই যিনি তাঁর সৃষ্টির সার্থকতা চান না। এমন কোনো সৃষ্টি নেই যা সহৃদয় হৃদয়সংবেদী রসিকের সমর্থন প্রত্যাশা করে না। তবুও সব স্রষ্টার কপালে তাঁর প্রত্যাশা মতো প্রাপ্তি জোটে না। ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভার গুণে কালোত্তীর্ণ সৃষ্টির পরেও অনেকেই কালের বালুকাবেলায় প্রতিষ্ঠা পান না। সরস্বতী তাঁকে কৃপা করলেও লক্ষ্মীলাভ থেকে তিনি হন বঞ্চিত। উপেক্ষায় তাঁকে বিদায় নিতে হয়। কীটসের অকাল প্রয়াণে শোকাহত কবি বন্ধু শেলি তাঁর 'এডোনেইস'-এ কীটসের নিষ্ঠুর সমালোচকদের কীটসের মৃত্যুর কারণ বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। জীবনানন্দকেও অকালে চলে যেতে হয়েছিল শিষ্ট-অশিষ্ট সকলের উপেক্ষা মাথায় নিয়ে। জীবদ্দশায় নাম-যশও বিশেষ হয়নি; অর্থ-কড়ির মুখও তেমন দেখতে পারেননি। টলস্টয়েরও বিশ্বাস ছিল 'Critics are the stupid who discuss the wise'. তবুও সহৃদয় সামাজিক তথা সমালোচকদের সমর্থন ছাড়া কোন কবিরই তুষ্টি হয়নি কোনো দিন। নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আশা-নিরাশায় দোদুল্যমানতায় দুলতে দুলতে তাকেও পথ চলতে হয় মূলত দুটি বাধা নিয়ে, তা হল মৃত্যু-চিন্তা ও ভীতি। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'anxiety'। জীবনানন্দের ভাষায় যা 'বিপন্ন বিস্ময়'। তাঁর সেই নায়কটি যার বধু শুয়েছিল পাশে, শিশুটিও ছিল, প্রেম ছিল, আশা ছিল তবুও ফাল্গুনের পঞ্চমীর রাতে আত্মহত্যা করে বসল। প্রশ্ন হল কেন? এই কেন-র উত্তর কি 'anxiety' বা 'বিপন্ন বিস্ময়'। সে-ই বিপন্ন বিস্ময় তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিলতাই জীবন থেকে বিদায় নিয়ে ! তাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে মৃত্যুর শীতল কোলে! কোনো বেদনা তাকে কি ক্লান্ত করে তুলেছিল! কিম্বা প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত করে তুলেছিল তার অস্তিত্বকে! জগত ও

জীবনের পরম সুখানুভুতিও কি তার কাছে তখন বিষাদ মনে হয়েছিল! যা জীবনানন্দের ভাষায়—

“অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরও এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে;
লাশকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের ’পরে।”[১]

—এই ক্লান্তি ও বিপন্নতা থেকেই যার জীবনে প্রেম ছিল, আশা ছিল, ভালোবাসা ছিল তবুও কোনো এক অব্যক্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতেই লাশকাটা ঘরে টেবিলের ওপর শেষ শয্যা নিয়েছিল! এক ‘বিপন্ন বিস্ময়’-এ ‘মরিবার হল তার সাধ’। তবুও মৃত্যু-চিন্তা ও মৃত্যুভয় দিয়ে তো জীবন চলে না। জীবন চলে তার আপন খেয়ালে। বহতা নদীর -মতো সে। মৃত্যুর করাল হাতছানি উপেক্ষা করে মানুষকে জীবন পথের পথিক হতে হয়। জীবনকে ভালোবেসেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

“মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রু-ময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়।”[২]

এটাই তো জীবনের মূল মন্ত্র। জীবনের জয়গাঁথা রচনা করাই মানুষের চিরায়িত সাধনা। নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করতেই তাকে লড়াই করতে হয়। আস্থা রাখতে হয় নিজের উপর। যুগে যুগে কালের নিষ্ঠুর নিপীড়নকে সহ্য করে টিকে থাকতে হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও জীবনের প্রতি ছিলেন গভীর আস্থাশীল ও আশাবাদী। তাঁর মৃত্যু চেতনা তো ঘুরে ফিরে সেই জগত ও জীবনকে ভালোবাসাই চেতনা। ‘মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান’ বলে যিনি মৃত্যুর অনিবার্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন সেই তিনিই আবার বললেন ‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে’। যখনই তিনি মৃত্যুর কথা বলেছেন কিম্বা

এই পৃথিবীর মায়ার বন্ধন কাটিয়ে চলে যাওয়ার কথা ভেবেছেন তখনই তাঁর মনে এসেছে এই পৃথিবীর রূপ-রসমাধুর্য ও স্পর্শের অপরূপতার কথা। জগত ও -গন্ধ-—জীবনকে ভালোবেসেই তো তিনি বলেছিলেন

"যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই—
যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতি সমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই।
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।"[৩]—মনে-মননে-চিন্তনে মৃত্যুচিন্তা যখন স্রষ্টার দেহ ও মনকে ঘিরে ধরে তখনই তিনি তাকিয়ে দেখেন মাটির পৃথিবীর বুকে। ধরনীর রূপ-লাবণ্য তিনি উপলব্ধি করেন প্রতি পলে পলে। উপভোগ করতে চান পৃথিবীর বৃক্ষ-লতা-ফুল-ফলের অপরূপ সৌন্দর্য। জগতের নর-নারীর আনন্দ মুখর কোলাহল দেখে জীবনকে চরিতার্থ করতে চান। তাই তো রবীন্দ্রনাথের সুরে সুর মিলিয়ে জীবনানন্দও বলতে পারেন—

"তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও--আমি এই বাংলার পারে
রয়ে যাব; দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে;
দেখিব খয়েরি ডানা শালিখের সন্ধ্যায় হিম হয়ে আসে,
ধবল রোমের নিচে তাহার হলুদ ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে
নেচে চলে—একবার- দুইবার- তারপর হটাৎ তাহারে
বনের হিজল গাছ ডাক দিয়ে নিয়ে যায় হৃদয়ের পাশে;
দেখিব মেয়েলি হাত সকরুণ-শাদা শাঁখা ধুসর বাতাসে
শঙ্খের মতো কাঁদেঃ সন্ধ্যায় দাঁড়াল সে পুকুর ধারে"[৪]—তিনিও আপন অস্তিত্ব রেখে যেতে চেয়েছেন এই বাংলার বুকে। তিনিও তাকিয়ে দেখলেন এ জগতের দিকে। তবে একথা অনস্বীকার্য তাঁর তাকিয়ে দেখার ভঙ্গিমা আলাদা। সেই স্বতন্ত্র ভঙ্গিমাতেই তিনি আনন্দ পান। এখানেই তাঁর স্বকীয়তা। মৃত্যুচিন্তা যখনই তাঁর মনে-মননে এসেছে গভীর ঘন হয়ে তখনই যেন তিনি জীবনের কথা বেশি করে ভাবতে শুরু করেন এবং খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মৃত্যুর পরে পরপারের কোনো কল্পলোকের স্বর্গীয় সুষমাও তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে পারেনি। বরং ইহলৌকিক জগতের ফুল-পাখি-গাছগাছালি-আলোর নাচন উপভোগ করতে চেয়েছেন—

"যেদিন সরিয়া যাব তোমাদের কাছ থেকে—দূর কুয়াশায়
চলে যাব, সেদিন মরণ এসে অন্ধকারে আমার শরীর
ভিক্ষা করে লয়ে যাবে;-- সেদিন দু-দণ্ড এই বাংলার তীর—
এই নীল বাংলার তীরে শুয়ে একা-একা কি ভাবিব, হায়;
সেদিন রবে না কোনো ক্ষোভ মনে—এই সোঁদা ঘাসের ধুলায়

জীবন যে কাটিয়াছে বাংলায়—চারিদিকে বাঙালির ভিড়
বহুদিন কীরত্ন-ভাসান গান রূপকথা যাত্রা পাঁচালির
নরম নিবিড় ছন্দে যারা আজও শ্রাবণের জীবন গোঙায়।

আমারে দিয়েছে তৃপ্তি;"—এ যেন রবীন্দ্রনাথের সেই অমোঘ আনন্দের নান্দনিকতার সুর--

"এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়
শালের বনের খ্যাপার হাওয়া, এই তো আমার মনকে মাতায়।
রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে হাটের পথিক চলে ধেয়ে
ছোট মেয়ে ধুলায় বসে খেলায় ডালি একলা সাজায়—
সামনে যে এই যা দেখি চোখে আমার বীনা বাজায়।"[৫]-এ তো সেই অস্তিবাদীদের কথার প্রতিধ্বনি। অস্তিবাদীরা বলেন—"If there is no god, there is at least one being whise existence comes before its essence, a being which exists before it can be defined by any conception of it. That being is man or as Heidegger has it, the human reality."[৬]

কোন পরমসত্তার পূর্বনির্ধারিত ধারণার মূর্ত প্রকাশরূপে মানুষ জগতে আবির্ভূত হয় না। কাজেই 'মানুষ' এই খেতাব তাকে অর্জন করতে হয় স্বাধীন প্রচেষ্টার দ্বারা। সে নিজেই নিজের রূপকার। তার জীবন রূপায়ণে পারলৌকিক কোনো শক্তির, স্বর্গীয় কোনো সুখের হাতছানি, পরম শক্তিধর কোনো ঈশ্বরের ভূমিকা থাকতে পারে না। সামাজিক, নৈতিক, পারিপার্শ্বিক ও প্রথাগত এবং সর্বপ্রকার মূল্যের সৃষ্টিকর্তাও সে এবং রক্ষাকর্তাও সে নিজেই। কাজেই নিজের ইচ্ছামত জীবন ও পরিবেশ নির্ধারণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা তার আছে। সেই স্বাধীনতায় সে বলতেই পারে,- 'আমি যে দেখিতে চাই, আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে।' জন্ ম্যাকারও বলেছিলেন—"Existentialism is not necessarily a pessimistic philosophy but its adherents have been realistic- in acknowledging the disorder of human existence."[৭] কথাটি সত্য বটে। বাস্তবিক কোন নৈরাশ্যবাদী দর্শন নয় অস্তিবাদ। অস্তিবাদী দার্শনিকেরা গ্রহণ করেন সেই বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি যার মধ্যে মানুষের স্বাধীনতা আছে। আছে মানব অস্তিত্বের মধ্যে শৃঙ্খলহীনতা। অস্তিবাদীরা একালের জীবনের নিঃসহায়বোধ ও আশাহীনতা কাটিয়ে চলতে পচ্ছন্দ করেন; যাকে বলা যেতে পারে-'a passionate quest for authentic existence' একথা তো সত্য মানুষের একটা জন্মগত অধিকার জন্মায় জগতের সত্য ও সুন্দরের উপর। রহস্যময় জীবনের উপর সে আস্থাশীল হয়ে পড়ে। এই গভীর প্রত্যয়ে জীবন হয়ে ওঠে পূর্ণ। প্রেমে ও একে অপরের সঙ্গে পরম আত্মিক সম্পর্কে এ জীবন হয়ে ওঠে অনুপম। তাই মানুষ চিরদিনই মৃত্যু অনিবার্যতাকে মেনে নিয়েও, মৃত্যুভীতিকে জয় করে নিজের অস্তিত্বকে করে তোলে সত্য-সুন্দর। রবীন্দ্রনাথও মৃত্যু বা নৈরাশ্যের তাঁর বক্তব্য শেষ করেননি; জীবনানন্দ

পারেননি। তাই লাশকাটা ঘরে চিৎ হয়ে টেবিলের উপর শুয়ে পরম শান্তি পেলেও জীবনানন্দের কাব্যের উত্তরণ ঘটেছে সেই সত্য-সুন্দরের মানব অস্তিত্বের সার্থকতায়—

"শীতল চাঁদের মত শিশির ভেজা পথ ধরে
আমরা চলিতে চাই, তারপর যেতে চাই মরে
দিনের আলোয় লাল আগুনের মুখে পুড়ে মাছির মতন!
অগাধ ধানের রসে আমাদের মন
আমরা ভরিতে চাই গেঁয়ো কবি-পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন!"[৮]

প্রথম কাব্যে 'ঝরা পালক'-এ কবির এই উপলব্ধি ফুটে উঠতে পারেনি। 'বনলতা সেন' কাব্য থেকে ধীরে ধীরে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির', এবং 'বেলা অবেলা কালবেলা' কাব্যে মৃত্যুচিন্তা ও মানব অস্তিত্বের সার্থকতা এবং জীবনের সত্য সুন্দরকে নিয়ে তিনি বিবিধ ভাবনা ও দার্শনিক প্রজ্ঞা উচ্চকিত করলেন। এই প্রকৃতির রূপে রসে মুগ্ধ হয়ে প্রেম ও পূর্ণতার অভিলাষী কবি বললেন—

"ফলন্ত মাঠের 'পরে আমরা খুঁজি না আজ মরনে স্থান,
প্রেম আর পিপাসার গান
আমরা গাহিয়া যাই পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন!
ফসল—ধানের ফলে যাহাদের মন
ভরে ওঠে উপেক্ষা করিয়া গেছে সাম্রাজ্যেরে, অবহেলা করে গেছে
পৃথিবীর সব সিংহাসন"[৯]- সত্য কথা বলতে কি, জীবনে দুঃখ, বেদনা, হতাশা আছে বলে জীবনের পরম রমণীয়তাকে অস্বীকার করতে হবে, 'বিপন্ন বিস্ময়'-এ কালের বালুকাবেলায় হারিয়ে যেতে হবে, সত্য-সুন্দর ও আশাকে পরিত্যাগ করতে হবে-- এমন ধারণা জীবনানন্দের ছিল না। এই আদর্শ মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথই একদিন জীবনানন্দকে লিখেছিলেন—"তোমার কবিতাগুলো পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে, তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।" এই আনন্দের চিত্রময়তা রবীন্দ্রনাথের থেকেই পাওয়া। স্বয়ং বিশ্বকবি তো বলেছিলেন—

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে
তবুও শান্তি, তবুও আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।
তবুও প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য চন্দ্র তারা
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে
তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে
নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন লেশ—

সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে।”[১০] যুগে যুগে মানবাত্মার মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা, স্ব-বিরোধিতা ব্যথা ও ক্ষণস্থায়িত্বের হাহাকার আছে, বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের ফ্যাসিবাদের সর্বগ্রাসীকরাল ছায়া বিস্তারের মধ্যে মানুষের যে বেদনা যে কান্না লুকিয়ে আছে সে সব কিছু মেনে নিয়েও জীবনানন্দ সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ওপর আস্থা রেখেই প্রান্তরের কুয়াশাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় যে ভোরের আলো সেই আলোর দিকে গভীর প্রত্যয় নিয়ে তাকিয়ে থেকেছেন। তিনিই সেই প্রাজ্ঞবান দার্শনিক ও স্রষ্টা যিনি সন্ধ্যার সমাগমের ঘরে ফেরার পাখপাখালির ডাকের মধ্যেও জীবনের ঘোষণা শুনতে পান। তিনি সেই কবি যিনি ‘বহুদিন থেকে শান্তি নেই’ জেনেও শান্তির আশায় বুক বেঁধেছেন। তিনিই আবার ‘ধূসর মৃত্যু’-র রূপ দেখেও মৃত্যুকেই জীবনের শেষ সত্য বলে মেনে নিতে পারলেন না; পারলেন না জীবনের চলমানতাকে, নান্দনিক প্রবাহমানতাকে ভুলে যেতে। জীবনের প্রতি আস্থা রেখেই বললেন—

“একবার যখন দেহ থেকে বার হয়ে যাব
আবার কি ফিরে আসব না আমি পৃথিবীতে?
আবার যেন ফিরে আসি
কোনো এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে
কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে!”[১১] এ তো জীবনেরই জয়গান গাওয়া। মরণের পরেও জীবনের সঙ্গীত শোনানো। ফিরে আসতে চেয়েছেন আপনজনের কাছে। জীবনের চরম দুর্দিনে সেই আপনজনকে সেবাযত্ন দিয়ে নিজের পূর্ণতা চেয়েছেন। আস্তিক্যের ভুমিতে দাঁড়িয়ে অস্তিত্বের বাণী যেন শোনালেন তিনি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এত তো জন্মান্তরবাদের কথা। কিন্তু বিষয়টিকে একটু গভীর ও সূক্ষ্মভাবে ভাবলে দেখা যাবে এর সঙ্গে কোনো ধর্ম বিশ্বাস জাত জন্মান্তরবাদের সম্পর্ক নেই। জীবনানন্দের আত্মিকতা এখানে এক নতুন ধরনের সর্বাস্তিবাদের রূপ পরিগ্রহ করেছে। অদৈত্য চেতনায় লালিত হয়েছে অস্তিবাদের মর্মকথা। এ চেতনার স্বরূপ-প্রকৃতি আলাদা। বৈদান্তিক মোক্ষলাভের বদলে আছে বস্তু বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখার অদম্য আকুতি। সেবার মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্ব রেখে যাওয়ার ঐকান্তিক বাসনা। ফিরতে চেয়েছেন তখনই যখন ‘শীতের রাত’। ‘শীতের রাত’ জীবনানন্দের মনোভূমিতে তৈরি করে এক নতুন ধরনের অনুভুতি। শীতের রাতেই তো প্রবল শৈত্যের সঙ্গে উষ্ণতা দেহেমনে নিয়ে আসে পরম পরিতৃপ্তি। - বাধাকে অতিক্রম করে এই যে সুন্দরকে পাওয়া – এখানেই অস্তিবাদের সার্থকতা। এই সার্থকতার আলোকে দাঁড়িয়ে তিনি প্রেমের গান গেয়ে চলেছেন—“প্রেমের প্রাণের শান্তি; তাই রাখিয়াছে ঢেকে

পাখির মায়ের মত প্রেম এসে আমাদের বুকে
সুস্থ করে দিয়ে গেছে আমাদের রক্তের অসুখ!”

-- এখানেই তো ফুটে ওঠে ‘authentic existence’-এর কথা। জাগতিক জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা ব্যথা-বেদনা ভুলে থাকার জন্য সবাইকেই তিনি যেন আহ্বান জানালেন—

“পৃথিবীর যত ব্যথা,- বিরোধ,- বাস্তব
হৃদয় ভুলিয়া যায় সব!
চাহিয়াছে অন্তর যে-ভাষা,
যেই ইচ্ছা,- যেই ভালোবাসা
খুঁজিয়াছে পৃথিবীর পারে-পারে গিয়া,--
স্বপ্নে তাহা সত্য হয়ে উঠেছে ফলিয়া!
মরমের যত তৃষ্ণা আছে,--
তারই খোঁজে ছায়া আর স্বপনের কাছে
তোমরা চলিয়া আস,--
তোমরা চলিয়া আস সব!-[১২]

ভুলে যাও পৃথিবীর ওই- ব্যথা- ব্যাঘাত- বাস্তব!” এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে ‘আমি’-র বদলে ‘আমরা’-র প্রয়োগ। জীবনানন্দের এই ‘আমরা’-র চেতনাকে অনুধাবন করতে পারলে তাঁর নামের পাশে ‘নির্জনতার কবি’, ‘বিপন্ন বিস্ময়’-এর কবি লেখার আগে আমাদের বারবার ভাবতে হবে।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থঋণঃ

১। আট বছর আগের একদিন, মহাপৃথিবী,জীবনানন্দ দাশ,ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পাদিত), জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ, পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল, ২০০৪, ভারবি, কলকাতা,পৃ ২৩৬

২। রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম প্রকাশ ২০০৬, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা,পৃ ৭

৩। রবীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড(, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম প্রকাশ ২০০৬, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ-৩৫

৪। ২ নং কবিতা, রূপসী বংলা,জীবনানন্দ দাশ, ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পাদিত), জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ, পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল, ২০০৪, ভারবি, কলকাতা,পৃ ১৫০

৫। ১০ নং কবিতা ,জীবনানন্দ দাশ,রূপসী বংলা ,ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পাদিত), জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ, পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল, ২০০৪, ভারবি, কলকাতা,পৃ ১৫৪

৬। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় অস্তিত্বচেতনা, রহিম আজিজ, জীবনানন্দ দাশ জীবন ও সাহিত্য, সঙ্কলন ও সম্পাদনা বিশ্বজিৎ ঘোষ, মিজান রহমান, কথাপ্রকাশ, ৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৩য় তলা), ফেব্রুয়ারী ২০০৯, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, পৃ ২০৭

৭। এক আকাশঃ দুই নক্ষত্র তারাশঙ্কর-জীবনানন্দ, বিমল মুখোপাধ্যায়, এবং মুশায়েরা, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, জুলাই ১৯৯৮, , কলকাতা, পৃ ১৩

৮। অবসরের গান, ধূসর পাণ্ডুলিপি,জীবনানন্দ দাশ, ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পাদিত) , জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ, পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল, ২০০৪, ভারবি, কলকাতা,পৃ ২৩৬

৯। পূর্বোক্ত, পৃ ১০৪

১০। গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম সাহিত্যম সং, ১৪০৯, সাহিত্যম, কলকাতা, পৃ ১৩৯

১১। কমলালেবু, বনলতা সেন,জীবনানন্দ দাশ, ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পাদিত) , জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ, পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল, ২০০৪, ভারবি, কলকাতা,পৃ ১৯৯

১২। স্বপ্নের হাতে, ধূসর পাণ্ডুলিপি,জীবনানন্দ দাশ, ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পাদিত) , জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ, পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল, ২০০৪, ভারবি, কলকাতা, পৃ ১৩৯

মেঘালয়ের কয়লা শ্রমিকদের যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবনের আখ্যান: অমিতাভ রায়ের 'জোয়াই'

যাদব মুরারী
সহঃশিক্ষক, নাটাগড় স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সমিতি বিদ্যালয় (উঃমাঃ)
সোদপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা

সারসংক্ষেপঃ পাহাড়, নদী, ঝরনা, জঙ্গল ইত্যাদি সম্পৃক্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সর্বদা সকল মানুষের কাছে উপভোগ্যের বিষয়। ভারতের অন্যতম রাজ্য মেঘালয় অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। শিলং-চেরাপুঞ্জির পরিচিত পর্যটন বৃত্তের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য পাহাড়-নদী-ঝরনা সমৃদ্ধ বিস্তীর্ণ অঞ্চল। অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা ও পর্যটন ব্যবসার রমরমা এই শান্ত পরিবেশে স্থানীয়, গারো, মিকির, লিংগাম, ভই, সিংটেং, ভুটিয়া, আহোম জনজাতির নিজস্ব সমাজজীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে মেঘালয়ের প্রাকৃতিক সম্পদ। এ রাজ্যের পাহাড়-নদীর চারপাশের আনাচে-কানাচে মাটির গভীরে জমে আছে নানারকম খনিজ পদার্থ, যার অন্যতম প্রধান কয়লা। গত চল্লিশ বছর ধরে কয়লামাফিয়ারা প্রশাসনের কিছু মানুষের সক্রিয় সহযোগিতায় অবৈধভাবে কয়লা উত্তোলনের ফলে 'প্রকৃতির রাজকন্যা' মেঘালয়ের পর্যটন শিল্পের আড়ালে বিষিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতি, পরিবেশ ও সমাজ। 'র‍্যাট-হোল মাইনিং'-এ মূলত শিশু-কিশোর শ্রমিকরাই কাজ করে। বাংলাদেশ, নেপাল, আসাম, মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি স্থান থেকে আগত শিশু-কিশোর শ্রমিকরাই জোয়াই শহরের পর্যটনের আড়ালে জুয়া, মদের ঠেক প্রভৃতির মত অসামাজিক বৃত্তে প্রলুব্ধ হয়ে যাচ্ছে। অরণ্য ও পরিবেশ আইনে 'ওপেন কাস্ট মাইনিং' সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হলেও বিকল্প উপায়ে মাটি খুঁড়ে অবৈধভাবে কয়লা উত্তোলন করেন মুনাফালোভীরা। স্বনামধন্য জোয়াই-এ ব্রিটিশদের নজর থাকলেও বর্তমানে স্থানীয় জনজাতিদের জীবন বিপন্ন করে ও শিশু শ্রমিকদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে কালো টাকার সমান্তরাল অর্থনীতি। ১৯৮০-র পর নগদ অর্থ নিয়ন্ত্রিত এক নতুন ধরনের জনজীবন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে; যার মধ্যে উৎপাদন ও বাণিজ্যকরণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা ধরণের অবৈধ কার্যকলাপ, দুর্নীতির চিত্র। বাস্তববাদী লেখক অমিতাভ রায় এই বাস্তব চিত্রই সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন 'জোয়াই' আখ্যানে।

সূচক শব্দঃ সুড়ঙ্গ, শিশু-কিশোর, খনিশ্রমিক, অবৈধ কার্যকলাপ, র‍্যাট-হোল মাইনিং, জনজাতি, ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী।

ভারতবর্ষ বৈচিত্রপূর্ণ দেশ। শুধু ভৌগোলিক দিক দিয়ে নয়; ধর্ম, জাতি, সংস্কৃতি-রীতিনীতি প্রভৃতিতেও বৈচিত্রের সীমা নেই। প্রাকৃতিক শোভায় ঘেরা মেঘালয়ের

চেরাপুঞ্জি-মৌসিনরাম বৃষ্টিবহুল অঞ্চল হলেও আদতে মেঘালয়কে 'মেঘের আলয়' বলা যায় না। শুধুমাত্র বর্তমানে নয়; ব্রিটিশ শাসককুল এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ ছিলেন। এখানকার পাহাড়-নদী-ঝরনা-জঙ্গল পরিবেষ্টিত অঞ্চলের আবহাওয়া ইংরেজদের বসবাসের অনুকূল ছিল। সেইসূত্রেই জয়ন্তিয়া, জোয়াই, ডাউকি প্রভৃতি স্থানকে তাঁরা বেশি গুরুত্ব দিয়ে গড়ে তুলেছেন পর্যটন কেন্দ্র। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের পর ভারত শাসনের দায়িত্ব বেশিরভাগ চলে গেছে ব্রিটিশ সরকারের হাতে। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী এবার কোম্পানী নয়, তাঁরা 'বণিকের মানদন্ড রাজদন্ড'-এ পরিণত করার লক্ষ্যে ভারতীয় উপমহাদেশে উপনিবেশ গড়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হন। শাসন কায়েম করার পরেই ব্রিটিশরা জাঁকিয়ে বসেন জোয়াই, জয়ন্তিয়ার আনাচে-কানাচে খনিজ পদার্থের সন্ধানে। তাঁরা বাংলাদেশ, নেপাল, আসাম, বিহার, মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি প্রতিবেশী স্থান থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করে ক্রীতদাসে পরিণত করেছেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায়----

> "আমাদের সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের ফলে এখনও লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাস আর সমাজে পতিত করে রাখা কোটি কোটি শ্রমজীবী অন্ত্যজ মানুষের অস্তিত্ব রয়েছে, যাঁরা সমস্ত রকমের অধিকারের ব্যাপারে বঞ্চনার শিকার হয়ে পড়ে রয়েছেন। ব্রিটিশ শাসন জমদারিপ্রথা, প্রতিক্রিয়াশীল জাতিবর্ণভেদ প্রথা, ধর্মীয় ধাপ্পাবাজি, আর সুদূর অতীতকাল থেকে চালু থাকা সবরকমের ক্রীতদাসত্বের আর ভূমিদাসত্বের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা ভারতবাসীর গলা টিপে ধরেছে, ভারতের মুক্তির পথে মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"(১)

একবিংশ শতাব্দির আধুনিক সভ্যতায় দাঁড়িয়েও আমরা এই যুক্তিকে অগ্রাহ্য করতে পারিনা। আধুনিক মুনাফালোভী মানুষের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে চলেছে সমাজের প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষ। এরই বাস্তবোচিত চিত্র ফুটে উঠেছে প্রশিক্ষিত আধুনিক মনস্ক লেখক অমিতাভ রায়ের 'জোয়াই'(২০২২) আখ্যানে।

শিলং থেকে যাওয়ার পথে দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে কিছু কিছু জায়গায় বাঁশের ধাঁচা বাধা কপিকল বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তবে ইস্ট এবং ওয়েস্ট জয়ন্তিয়া হিলস জেলা জুড়ে অসংখ্য কয়লা তোলার গর্ত বা খনি গহ্বরগুলি এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ। মেঘালয়ের এগারোটি জেলার মধ্যে ওয়েস্ট জয়ন্তিয়া হিলস-এর জোয়াই অন্যতম সদর শহর। এই জেলায় মাত্র দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার মানুষের বাস। ইস্ট ও ওয়েস্ট জয়ন্তিয়া জেলার বেশিরভাগ মাটির নীচে রয়েছে প্রচুর কালো সোনা বা কয়লা। মেঘালয় রাজ্যে ভারতের সংবিধানের ষষ্ঠ তপসিলের বিধি লাগু রয়েছে। তাই জমির মালিক মাটির গভীরে থাকা কয়লার স্বত্ত্বাধিকারী। কেন্দ্র বা রাজ্য কোন নিয়মেই জোর করে ঐসব জমি অধিগ্রহণ করতে পারেনা। আবার এই দুর্গম জায়গায় আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে কোন নামকরা সংস্থা এগিয়ে আসেনি কয়লা উত্তোলনে। কারণ

এখানকার কয়লার মান ততটা উন্নত নয়। তাই নিরাপত্তাহীন, নিয়ন্ত্রণহীন প্রচলিত পদ্ধতিতে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার ভেতর সুড়ঙ্গ তৈরি করে তুলে আনা হয় কয়লা। যখন যেদিকে কয়লা পাওয়া যায় বালক-কিশোর, খর্বাকায়, শীর্ণ শ্রমিকরা গাঁইতি চালাতে থাকে নির্দ্বিধায়। যেকোন সময় বড়সড় বিপদের সম্ভাবনা ও প্রাণসংশয় থাকলেও অনায়াসে কাজ করতে বাধ্য থাকে এরা। লেখকের কথায়-----

> "সবমিলিয়ে ইঁদুরের গর্তের এ এক পরিবর্তিত সংস্করণ। প্রযুক্তির পরিভাষায়—'র‍্যাট-হোল মাইনিং'। বেশি যন্ত্রপাতি নিয়ে বলিষ্ঠ শ্রমিকের পক্ষে ভেতরে ঢুকে কাজ করা সম্ভব নয়। ছোটখাটো চেহারার রোগাসোগা বালক-কিশোরই জমির ভেতরে যাওয়ার উপযোগী। সেইভাবেই বাছা হয় এইসব খনির শ্রমিক।"(২)

প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, মেঘালয়ের খনিগুলিতে হাজার পঞ্চাশেরও বেশি অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক জীবন সঁপে দিয়েছে অবৈধ কয়লা উত্তোলনের কাজে। পেশাগত দিক দিয়ে দিনমজুর হওয়ায় সামাজিক অধিকার কিংবা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা কোনটিই এরা পায়না। দুর্ঘটনাজনিত কারণে শ্রমিকের মৃত্যু হলে অথবা আহত হলে মালিকপক্ষ খুব সহজভাবে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তবে এবিষয়ে বেশি জানাজানি হয়ে গেলে খেশারত বাবদ কিছু টাকা দিয়ে এদের মুখ বন্ধ করে দিতেও দ্বিধাবোধ করেননা তাঁরা।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম অথবা নথিভুক্ত তথ্যানুযায়ী বিংশ শতাব্দির শেষ ভাগ থেকে এই অবৈধ কারবারের রমরমা বাজার চলে সম্ভবত এটাই মনে করা হয়। সেই কারণেই এইসব 'র‍্যাট-হোল মাইনিং'-এ মাঝে মাঝে বড়সড় বিপর্যয় ঘটে। শ্রমিকদের গাঁইতির আঘাতে অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতরে অজান্তে ভাঙন ধরে নিমেষে ঢোকে নিয়ন্ত্রণহীন জলস্রোত। মাঝেমধ্যেই এইরকম বিপর্যয়ে অগণিত শ্রমিক প্রাণ হারালেও বেশিরভাগ সময় অজানা থকে যায় তাদের পরিচয়। এমনকি নামধাম তো দূরের কথা সঠিক তথ্যকে চাপা দিয়ে এক গোপন ষড়যন্ত্রও করতে পিছপা হননা মালিকপক্ষ। ২০১৪ সালের ১৭ই এপ্রিল কিছু অসরকারি সংস্থার ধারাবাহিক প্রচার ও আইনি ব্যাখ্যার ফলে জাতীয় পরিবেশ আদালত এ অঞ্চলের সমস্ত কয়লা খনিকে অবৈধ ঘোষণা করেন। আইনের চোখে অবৈধ ঘোষিত খনির মালিকরা আদালতের রায়কে কিছুদিন সম্মান দিলেও সুপ্রিমকোর্টে আবেদন করেন যাতে জমে থাকা কয়লা উত্তোলন করে শ্রমিকদের উদ্ধার করা যায়। এর অন্তরালে তাঁরা পুণরায় শ্রমিকদের কাজে লাগিয়ে অর্থলোলুপতার খেলায় মেতে ওঠেন। ফল যা হওয়ার তাই----

> "২০১৮-র ১৩ই ডিসেম্বর। ইস্ট জয়ন্তিয়া জেলার কসান গ্রামের এক খনিতে তলিয়ে গেল পনেরোজন(মতান্তরে ষোলো) শ্রমিক। অভিযোগ, সুড়ঙ্গ কাটতে কাটতে এগিয়ে যাওয়ার সময় শ্রমিকদের গাঁইতি ফাটিয়ে দেয় পাশের নদীর তলদেশ।.........বেআইনি এই

> খনিতে অন্যান্য খনির মত না ছিল কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা না উদ্ধার করার সাজসরঞ্জাম। ফলে হারিয়ে গেল জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রোজগারের সন্ধানে কাজ করতে থাকা এতগুলি বালক-কিশোর। চূড়ান্ত বিচারে এরা বেআইনি কয়লা খনির শ্রমিক।”(৩)

বস্তুত যাদের রক্ত জল করা পরিশ্রমে মালিকপক্ষ সুখের ঘুম ও আয়েশ ভোগ করেন তাদের জীবনের মূল্যই নেই মালিকের কাছে।

মেঘালয়ের প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা জোয়াই শহরের আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ। জোয়াই-এর নিকটেই নারতিয়াং গ্রামে এককালে ছিল জয়ন্তিয়া রাজাদের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। এখানকার নারতিয়াং মনোলিথ ভারতের অন্যতম বিখ্যাত মনোলিথ। ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দ সময়সীমায় রাখা এগুলি আসলে জয়ন্তিয়া রাজাদের যুদ্ধ জয়ের স্মারক। প্রকৃতিবিলাসীরা জোয়াই-এর চারপাশে উপভোগ করেন পাহাড়-নদী-ঝরনা-উপত্যকা যেন সুইজারল্যান্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। এর নিকটে উমগট নদীর ওপর উপমহাদেশের প্রথম ঝুলন্ত সেতু ডাউকি, আসাম ও পূর্ববঙ্গের সংযোগ স্থাপন করেছে। পাহাড়ি নদীর জলধারার ফোয়ারা, ঝরনার ফুলঝুরি, উপত্যকায় গ্রথিত বনবীথি জোয়াই-এর সৌন্দর্য গুণকে বহুমাত্রায় বাড়িয়ে দিয়েছে। কবি-শিল্পীরাও এখানকার সৌন্দর্যে মুগ্ধ। অমিতাভ রায় যথার্থই বলেছেন----

> “এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ। তিনবার শিলং ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এতটাই উজ্জ্বল ছিল যে ১৯২৭-এ তৃতীয় এবং শেষবারের মতো শিলঙ থেকে ফিরে যাওয়ার কিছুদিন বাদে............রচনা করেন শেষের কবিতা। শিলঙ-এর স্মৃতি উজাড় করে লেখা শেষের কবিতার সতেরোটি পরিচ্ছেদের মধ্যে তেরোটিতেই শিলঙ-এর বর্ণনা চিত্রিত। রক্তকরবী নাটক এবং উপন্যাস যোগাযোগ তো তাঁর শিলঙ বাসেরই ফসল।”(৪)

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যই প্রকৃতিকন্যা জোয়াই উত্তরপূর্ব ভারতের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হলেও এখানকার নদী-ঝরনা-পাহাড়ের আড়ালে খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায়। স্থানীয় জনজাতিরাই প্রথম থেকে এখানকার সম্পদ ভোগ করে। তাই ব্রিটিশ প্রশাসক ডেভিড স্কটের রাস্তা করার প্রস্তাবে তারা আপত্তি করেছে। দীর্ঘ দুই দশক ধরে স্কট ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকায় বসবাসকারী মানুষদের সংস্পর্শে এসে স্থানীয় মানুষের সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কৃতি, সংস্কার প্রভৃতি করায়ত্ত করেছেন। স্কটের “প্রশাসকের পোশাকে শুরু হল কূটনৈতিক জীবন।”(৫)

ডেভিড স্কটের কূট বুদ্ধিতে ভর করে নির্মিত রাস্তায় মেঘালয়ের প্রাকৃতিক সম্পদ পার্শ্ববর্তী রাজ্য এমনকি পূর্ববঙ্গে অনায়াসে যাওয়া শুরু করে। স্থানীয় জনজাতির বছর কুড়ির যুবক ইউ তিরথ সিং নিয়মিত রাস্তা তৈরির কাজ তদারকি করে ইংরেজদের দ্বারা পুরস্কৃত হন। স্থানীয় মানুষরা বিট, গাজর, আলু, নাশপাতি প্রভৃতি চাষ

করে যারপরনাই ভীষণ খুশি। জনসেবার আড়ালে ধূর্ত স্কটের প্রাকৃতিক সম্পদের লুঠ করার গোপন ইপ্সা বুঝতে পারেন ইউ তিরথ সিং। ফলে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর ওপর স্থানীয় মানুষদের অবিশ্বাসের ফলে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'কাস্তে' উপন্যাসে যেমন –

> "আসলে যেদিন থেকে সমবায় চিনিকল বা সাখর কারখানার উত্থান, উনিশশো সত্তরের দশক থেকে, আখ হয়ে দাঁড়িয়েছে এরাজ্যের রাজনীতির নিয়ন্ত্রক।"(৬)

তেমনি করে 'জোয়াই' আখ্যানে কয়লাই হচ্ছে এখানকার রাজনীতি ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক। আর ইংরেজ ও বহিরাগত বিনিয়োগকারী কয়লা মাফিয়াদের সমঝোতা ও শোষণের ষড়যন্ত্রে অত্যাচারিত হতে থাকে অন্ত্যজ মানুষগুলি। ইংরেজরা তাদের চুক্তি ভঙ্গ করলে ইউ তিরথ তাঁদের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলেন। কিন্তু স্কট পরিস্থিতির জটিলতা আন্দাজ করে গৌহাটি থেকে ব্রিটিশ ফৌজ আনলেন। তবে ফৌজ আসার আগেই ইউ তিরথের নেতৃত্বে স্থানীয় জনজাতির সমস্ত মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে একটানা চারবছর ধরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নেমে পড়েন। লেখকের ভাষায়----

> "পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকলেই ব্রিটিশ বিতাড়নের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাড়ির শিশুদের নিয়ে বয়স্করা গুহায় আশ্রয় নিলেন। যথেষ্ট পরিমাণে গোলাবারুদ কামান বন্দুক থাকা সত্ত্বেও তির-ধনুক আর তরবারি নিয়ে স্থানীয় পুরুষদের আচমকা আক্রমণ সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে ব্রিটিশ বাহিনী। এও এক রকমের গেরিলাযুদ্ধ।"(৭)

খাসি, গারো, জয়ন্তিয়া পাহাড়ের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে এইসব উপকথা। খাসি-জয়ন্তিয়াকে বিদেশিমুক্ত করার কাজে গারো, মিকির, লিংগাম, ভই, ওয়ার, সিংটেং, ভুটিয়া, আহোমরা টানা কয়েকবছর লড়াই চালিয়ে গেছে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। প্রায় পরাজিত হওয়ার মুখে এসে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর নবনিযুক্ত কর্তারা রণকৌশল পরিবর্তন করে কূটনৈতিক চালে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইউ তিরথ সিং-কে গ্রেপ্তার করেছেন ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে। ঢাকা জেলে বন্দী ইউ তিরথ ১৮৩৫-এর ১৭ই জুলাই ব্রিটিশদের বশ্যতা স্বীকার না করে মৃত্যুবরণ করলে সমাপ্ত হয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অধ্যায়। অনালোচিত এই সংগ্রাম ও বীর যোদ্ধাকে স্মরণ করে প্রতি বছর মেঘালয় সরকার ১৭ই জুলাই ইউ তিরথ সিং পুরস্কার প্রদান করে ও ঐদিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়।

জমির স্বত্ত্বাধিকারীরাই কয়লার মালিক হলেও বহু স্বপ্নপূরণের কাহিনি কখনোই সার্থকতা পায়নি। সেই জমিতেই হারিয়ে গেছে পরিচয়হীন, অজানা শৈশব-কৈশোর। আঞ্চলিক উচ্চবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধিরা রাজশক্তির শাসনানুযায়ী লভ্যাংশের দিকেই নজর দিয়েছেন; মানুষের জীবন সেখানে নগণ্য। প্রসঙ্গতই বিনুর জবানিতে উৎপল দত্ত

বলেছেন----"বহু শতাব্দী পরে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মাটি খুড়ে দেখবে সে ছাঁচ—কুড়িয়ে পাবে আমাদের হাড়—-বলবে গবেষণা করে—পুরাকালে একদল অতিশয় বুদ্ধিসম্পন্ন মর্কট অথবা অর্ধমানব ভূগর্ভে বাস করত।"(৮) বাস্তবিক একথাগুলি অমিতাভ রায় 'জোয়াই' আখ্যানে শ্রমিকদের ফসিল হয়ে যাওয়ার বিষয়টি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

অরণ্য ও পরিবেশ আইনে 'ওপেন-কাস্ট মাইনিং' নিষিদ্ধ হলেও মাটি খুঁড়ে গভীরে যাওয়ার কোন নিষেধাজ্ঞা ছিলনা। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কিছু শ্রেণির মানুষ কয়লাস্তরের সন্ধান পাওয়ার পর ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে মাটির নীচে চলে সমান্তরাল যাত্রা। "সামনে, পিছনে, ডাইনে, বামে যেদিকে মন চায় কয়লাস্তর কাটতে কাটতে এগিয়ে যাওয়ার সময় আপনা থেকেই একটা সুড়ঙ্গ তৈরি হয়ে যায়।"(৯) সুড়ঙ্গের আকার যেহেতু সংকীর্ণ শিশু-কিশোরদেরই কাজে লাগান মালিকশ্রেণি। বহু বাবামায়ের অনটনের সুযোগ নিয়ে শিশু শ্রমিকদের কাজে লাগিয়ে জয়ন্তিয়া পাহাড়ের 'র‍্যাট-হোল মাইনিং' থেকে উত্তোলন করা হয় 'কালো সোনা'। সমাজের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শ্রমকে কাজে লাগিয়ে সকলের জ্ঞাতসারে আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে রমরমিয়ে চলে শিশু পাচার; পক্ষান্তরে শ্রমিক পাচার। ফলে শিশু-কিশোরদের আসল পরিচয় লুপ্ত হয়ে তারা পরিণত হয় 'র‍্যাট-হোল মাইনিং'-এর শ্রমিক। অমিতাভ রায়ের কথায়---

> "তখন নাম, ঠিকানা, হারিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রক্তকরবী নাটকের চরিত্রের মতো ৪৭ফ বা ৬৯ঙ গোছের কোনও এক নির্দিষ্ট নম্বরের শ্রমিকে সেই শিশু বা কিশোর রূপান্তরিত হয়ে যায়।"(১০)

শুধুমাত্র কাজের ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের জীবন দুর্বিষহ, বিপন্ন তা নয়; সাধারণভাবে তাদের বসবাস করতে হয় ত্রিপলের ছাউনিতে। সেখানে নেই কোনও শৌচালয়, নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা। ভাসমান কার্বন কণায় বেশিরভাগ শ্রমিক শ্বাসকষ্ট, যক্ষায় আক্রান্ত। বর্ষাকালে তাদের অবস্থা আরো শোচনীয়; জলে অতিরিক্ত দূষনের কারণে ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, বিভিন্ন ধরণের ত্বকের রোগ ছড়িয়ে পড়ে শ্রমিকদের মধ্যে। তারা বাধ্য হয়ে পানীয় জল কিনে খায়। আবার এর পশ্চাতে গড়ে উঠেছে দালালরাজ, যারা অসদুপায় অবলম্বন করে মুনাফা লুঠছে শ্রমিকদের কাছ থেকে।

গত চল্লিশ বছরে জয়ন্তিয়া পাহাড়ের মানুষের হাতে প্রভূত অর্থের জোগান হলেও জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়েছে সহজেই। প্রসঙ্গতই শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠির দেশ' উপন্যাসের বুড়োশিবের কথায়—

> "দেশে তখন কয়লাকুঠি ছিলনা, গ্রামের লোক গরীব ছিল, মানুষের সুখ ছিল, শান্তি ছিল। এতো লোকও ছিলনা, এতো অশান্তিও ছিলনা।।(১১)

এখানে প্রকৃতপক্ষে অর্থই অনর্থের মূল। শ্রমিকদের হাতে টাকার জোগান থাকলেই তারা মদের ঠেক, জুয়ার ঠেক প্রভৃতির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে রিক্ত-নিঃস্ব মানুষগুলি সহজেই অসামাজিকতার জালে জড়িয়েছে।

মাঝেমাঝেই জোয়াই অঞ্চলের বেআইনি খনিগুলিতে বিষাক্ত রাসায়নিক গ্যাস ও ধসের কারণে দুর্ঘটনা ঘটলে প্রশাসনের কোন কর্তা বা জনপ্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে আসেননা। তার কারণ বেশিরভাগ জনপ্রতিনিধি নাকি ঐসব অবৈধ খনির মালিক। ২০১৯ থেকে ২০২১—এই তিন বছরে ইস্ট জয়ন্তিয়া হিলস জেলার বিভিন্ন এলাকায় পরপর বেশ কয়েকবার দুর্ঘটনায় মারা যায় নাম পরিচয়হীন 'কালো সোনা'র উত্তোলনকারীরা। ইস্ট ও ওয়েস্ট জয়ন্তিয়া হিলস—এই দুই জেলা মিলে কমপক্ষে পাঁচশোর মত অবৈধ কয়লা খনি থেকে নির্বিচারে কয়লা তোলা হয়। সুপ্রিমকোর্টের নিষেধাজ্ঞা ও পরিবেশ আদালতের রায়কে অবমাননা করে রমরমিয়ে চলে 'র‍্যাট-হোল মাইনিং'-গুলি। আমিতাভ রায়ের ভাষায়---

> "জোয়াই ক্লেহরিহাট অথবা ডাউকির রাস্তায় প্রতিদিন সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা কয়লার ট্রাকও বুঝিয়ে দেয় জাতীয় পরিবেশের নিষেধাজ্ঞা কেমনভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।"(১২)

শুধু 'র‍্যাট-হোল মাইনিং' নয়, প্রকৃতির বিচিত্র সম্পদকে অবৈজ্ঞানিকভাবে যথেচ্চ ব্যবহারের ফলে মেঘালয়ের পরিবেশ বিষময় হয়ে উঠেছে। এখানে কয়লাখনির পাশাপাশি গড়ে উঠেছে বড়বড় পাথরের খাদান, চুনাপাথরের খনি, সিমেন্ট কারখানা। এর বিষাক্ত প্রভাবেই ২০০৭ সাল থেকে পাহাড়-নদী-সবুজে ঘেরা মেঘালয়ের লুভা নদীর জলের রঙ নীল হতে শুরু করেছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে অনেক জলজ প্রাণী লুপ্ত হয়ে যাবে বলে পরিবেশবিদদের মত। দূষিত জল ছাড়াও খনির বিষাক্ত গ্যাসে অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য মালিক ও বিনিয়োগকারীরা দৌড়ঝাঁপ করেন। আপাতদৃষ্টিতে মালিক ও বিনিয়োগকারীদের অতিমানবিক মনে হলেও এর অন্তরালে রয়েছে সুগভীর উদ্দেশ্য, যা সাধারণ বুদ্ধির শ্রমিকদের বোঝবার বাইরে। হঠাৎ শ্রমিকের ঘাটতি হলে উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রভাব পড়বে। "কাজেই নিয়ে হয় জোয়াই নয় তো ক্লেহরিঘাট-এ ছোটাছুটি। এর মধ্যে রোগী মারা গেলে আরো এক দফা অশান্তি। মৃতদেহ সমস্যা নয়। সে তো পাহাড়ের খাঁজে কিংবা জঙ্গলের গহনে কিংবা নদীতে ফেলে দিলেই হয়। কিন্তু হঠাৎ করে একজন শ্রমিক কোথায় পাওয়া যাবে?"(১৩)

মুনাফালোভী, মানবতাহীন মালিকরা শ্রমিকদের জীবনকে তুচ্ছ মনে করেছেন নির্দ্বিধায়। যেমন একটি বড় শিল্পের পাশাপাশি গড়ে ওঠে অনুসারী শিল্প; তেমনি কয়লাখনির আশেপাশে বড় রাস্তার ধারে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ধাবা। সেখানে ২৪ ঘন্টা খাবারের পাশাপাশি পাওয়া যায় বিভিন্ন নেশার সামগ্রী। আবার ট্রাক ড্রাইভার, খালাসিদের মনোরঞ্জনের জন্য অনেকস্থানে রয়েছে যুবতি নারীদের জোগান। এদের

পাশাপাশি শিশু-কিশোর শ্রমিকরা সন্ধ্যা নামলে অনায়াসে ঢুকে পড়ে জুয়া, মদ বা লালবাতির ঘরে। সরকারি নির্দেশে কয়লাখনি নিষিদ্ধ হলেও তাদের পরিচয় তারা শ্রমিক। আইনে বলা হয়েছে খনির কয়লা শেষ হওয়ার পর সেগুলিকে ধসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বালি কিংবা অন্য কিছু দিয়ে ভরাট করতে হবে। কিন্তু 'র‍্যাট-হোল মাইনিং' পুরোপুরি অবৈধ হওয়ায় সে ব্যবস্থা কেউ করেননি। ১৯৮০-র আগে এখানকার স্থানীয় জনজাতির মানুষ অন্যের জমিতে অথবা বাগিচায় কাজ করত। খনির দৌলতে তারা পরিণত হয়েছে ছোট দোকানদার বা এইরকমই কোন কাজের লোকে। বাধ্য হয়েছে তারা বহিরাগতদের বশ্যতা স্বীকার করতে। এপ্রসঙ্গে অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'লবণাক্ত' উপন্যাসের ত্রিভুবনের উক্তি উল্লেখযোগ্য-----

> "…….গরিব একজন শ্রমিকের মাথায় টুল, তার উপর আলো চাপিয়ে তাকে দৌড়তে বাধ্য করত আমার সঙ্গে। এতো বেগার। এর বিরোধিতা করেছি আমি সর্বত্র। যদি বোঝা বইতে হয়, আমরা বইব। একজন গরিব মজদুরকে আমরা শ্রম দিতে বাধ্য করতে পারিনা।"

বাস্তবিকভাবে ত্রিভুবনের মতো শিশু শ্রমিকরা বা স্থানীয় কোন মানুষ প্রতিবাদ করতে পারেনি। ফলে প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা স্থানীয় জনজাতির জীবনও এখন শ্রমিকদের মতোই বিপন্ন। আর এই পাহাড়ি সৌন্দর্যময় পরিবেশে জনমানসে ছড়িয়ে রয়েছে বিপর্যস্ত, বিপন্ন জীবনের নানান উপকথা।

সমাজসচেতন শিল্পী মাত্রই গণমুখী জীবন চেতনার যথার্থ চিত্র অঙ্কন করেন। প্রখর বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন লেখক অমিতাভ রায় 'জোয়াই'(২০২২) আখ্যানে 'প্রকৃতির রাণী' মেঘালয়ের জোয়াই শহরের চারপাশে গড়ে ওঠা অবৈধ কয়লাখনির শ্রমিকদের দুর্বিষহ জীবনের বাস্তবোচিত চিত্র অঙ্কন করেছেন। কঠোর সমাজমনস্তত্ত্ব, ক্ষেত্রসমীক্ষানির্ভর এরচনায় লেখক ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী থেকে শুরু করে একবিংশ শতকের দুই দশক পর্যন্ত খনি অঞ্চলের মানুষের জীবন-যন্ত্রণা ও শিশু শ্রমিকদের নির্মম জীবনের ধারাবাহিক বিবরণে এই আখ্যানের উপজীব্য বিষয় করে তুলেছেন। সাম্যবাদ হল গণচেতনার অন্তর্নিহিত ভাবসত্য। কিন্তু বিশ্বপুজি ও বেসরকারিকরণের কর্তৃত্বের বলয়ে শ্রমজীবী মানুষ ক্রমশ নিঃস্ব হচ্ছে। মালিকশ্রেণি সমাজের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শ্রমকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের অর্থলিপ্সা ও ভোগলালসার কাজে ব্যবহার করে শোষণ প্রক্রিয়ার হাড়িকাঠে রক্তাক্ত করছেন তাদের। আর স্বভাবতই মেঘালয়ের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা উপকথা আজ হারিয়ে যাওয়ার পথে। সর্বোপরি 'র‍্যাট-হোল মাইনিং'-এর নিষ্ঠুর দাপটে জয়ন্তিয়া পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বাস্তুতন্ত্র বিপন্ন হয়ে ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্রঃ

১) ‘জাতবর্ণ শ্রেণী এবং সম্পত্তিগত সম্পর্ক’, বিটি রণদিভে, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, নবম মুদ্রণ, ২০১২, পৃ-৭

২) অমিতাভ রায়, ‘জোয়াই’, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, এপ্রিল ২০২২, পৃ-১৫-১৬

৩) তদেব, পৃ-১৭-১৮

৪) তদেব, পৃ-৩১-৩২

৫) তদেব, পৃ-৩৪

৬) অনিতা অগ্নিহোত্রী, ‘কাস্তে’, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ-২৭

৭) অমিতাভ রায়, ‘জোয়াই’, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, এপ্রিল ২০২২, পৃ-৪৪

৮) উৎপল দত্ত, ‘অঙ্গার’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪২৬, পৃ-৮৫

৯) অমিতাভ রায়, ‘জোয়াই’, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, এপ্রিল ২০২২, পৃ-৭৪-৭৫

১০) তদেব, পৃ-৯২

১১) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ‘কয়লাকুঠির দেশ’, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ- ভাদ্র ১৩৬৫, পৃ-১০২

১২) অমিতাভ রায়, ‘জোয়াই’, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, এপ্রিল ২০২২, পৃ-৮৮

১৩) তদেব, পৃ-৯৭

১৪) অনিতা অগ্নিহোত্রী, ‘লবণাক্ত’, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ-৯৪

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকাঃ

১) জহর সেনমজুমদার, ‘নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন’, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৭

২) ডঃ সুবোধ দেবসেন, ‘বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্য সমাজ’, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪ এপ্রিল

৩) গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা, ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, দশম মুদ্রণ, ২০২২

৪) জগদীশ সরদার সম্পাদিত ‘নিম্পলক’, দলিত জীবন ও সংগ্রাম, তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২

দেবারতি মিত্রের কবিতা : প্রেক্ষিতে নাগরিক জীবন-সংস্কৃতি

সত্য দাস
গবেষক
গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : কবি দেবারতির কবিতায় লোকায়ত ভাবনারা প্রত্যক্ষ দর্শনের সূত্র মেনে না আসলেও একজন আদ্যোপান্ত শহুরে বা নাগরিক কবি হওয়ায় এই নগরের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, আলো-অন্ধকার সব উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়। দুরারোগ্য পণ্য ও যৌনতা, শিশুশ্রমিকদের খিমচানো মুখ, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের উড়ন্ত সাপ খোপ – ইত্যাদি সব প্রসঙ্গ কবি একের পর এক তুলে এনেছেন তাঁর কবিতায়। এনেছেন পরিবেশ দূষণ তথা 'প্লাসটিক যুগে' মধ্যে পড়ে মানুষের হাঁসফাঁস অবস্থার কথা। এছাড়া জলাভূমি বন্ধ করে ফ্ল্যাট কালচার তথা বিপন্ন নগরায়ণ যে এই সভ্যতার অভিশাপ তাও তিনি জানিয়েছেন। আবার কখনও দেখেছি শহুরে মানুষদের আন্তরিকতাবিহীন দেখনদারী জৌলুসের বিরুদ্ধে কবি দেবারতির বিদ্রুপের চাবুক ঝলসে উঠেছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অভিঘাত বা শিক্ষিত নাগরিক মানুষের সাহসিকতার ফলে প্রচলিত ভালোবাসার বিপ্রতীপে যে ভালোবাসা এতদিন ঢেকে রাখা হয়েছিল, কবি দেবারতি মিত্র সাহসিকতার সাথে সেই ঢাকনা সরিয়ে হোমোসেক্স বা লেসবিয়ানদের কামনা-বাসনাও তুলে আনছেন, যা একেবারে এই আধুনিক নগরের যাপনচিত্র।

সূচক শব্দ : কবি দেবারতির কবিতায় নগরের আলো-অন্ধকার অর্থাৎ তাদের যৌনতা, কামনা-বাসনা, শিশু শ্রমিক, বিপন্ন নগরায়ণ, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি নগরের আরও নানাবিধ অনুষঙ্গ তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে।

মূল আলোচনা:

কবি দেবারতি মিত্র একসময় তাঁর আত্মচরিত 'জীবনের অন্যান্য ও কবিতা' নামক গ্রন্থে বলেছিলেন –

'কবিতার ব্যাপারে আমি প্রতিপদে জীবনের উপর নির্ভর করি। জীবন আমাকে দিয়ে লিখিয়ে না নিলে আমার পক্ষে এক লাইনও লেখা সম্ভব নয়। জীবনের কোনো ঘটনা, দৃশ্য, কারোর সঙ্গে কথাবার্তা, তর্ক বিতর্ক, পাখির রব, কুকুর বিড়ালের ডাক, এক টুকরো গান আমাকে উস্কে দিলেই তবেই লিখতে পারি।'[১] দেবারতি মিত্রের কাব্যপরিক্রমা করলে পাঠক এই বক্তব্যের সত্যতা অনুধাবন করতে পারবে।

এবার এই বক্তব্যের সূত্র ধরেই আমরা আমাদের আলোচ্য নিবন্ধে খুঁজে দেখবো কবির কবিতায় কীভাবে নাগরিক জীবন উঠে এসেছে। তবে সেই বিষয়ে আলোকপাত করার আগে নাগরিক চেতনার বিপ্রতীপে থাকা লোকায়ত চেতনা নিয়ে কবির কী ভাবনা, সেটা জেনে নেওয়া জরুরী। কারণ লোকায়ত ভাবনা আর নাগরিক চেতনা

অনেকটা মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মতো। একটি জানলে অপরটি সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। তবে তাঁর মতো একজন শহুরে অর্থাৎ আদ্যোপান্ত একজন নাগরিক কবির কবিতায় লোকায়ত ভাবনারা কীভাবে এল, তা যেকোনো অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগবে। আমরাও আমাদের কবির সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারপর্বে ('যোগিয়াবাড়ি' -১৬/১২/২০১৬) এই প্রশ্ন কবির কাছে রেখেছিলাম। সেখানেই জেনেছিলাম কবির কাব্যে এই লোকায়ত ভাবনারা প্রত্যক্ষ দর্শনের সূত্র মেনে আসেনি। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারপর্বে (১৬/১২/২০১৬) আমাদের প্রশ্ন আর কবির উত্তর তুলে ধরলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে-

প্রশ্ন: লোকায়ত মানস, লোকজীবন, লোকায়ত সংস্কৃতিকে একজন নাগরিক কবি হিসাবে আপনি কীভাবে দেখেন, আপনার কবিতায় তা কীভাবে ধরা পড়েছে?

উ: দেখো, নাগরিক কবি বলায় আমার কিন্তু সায় নেই। আমার কবিতায় নগর জীবন কিন্তু তেমনভাবে আসেনি। তবে লোকায়ত মানস, লোকজীবন, লোকায়ত সংস্কৃতি সম্পর্কে খুবই কম জানি। আর যা জানি, তা বেশি পড়া ও শোনা। দেখা কম। কিন্তু গ্রামীন জীবন, তারা কীভাবে বেঁচে থাকে, দেখতে বড় ইচ্ছে হয়, জানতেও ইচ্ছে হয়। কিন্তু আমার সে সুযোগ হয়নি। তবু আমার কবিতায় গ্রামীন সংস্কৃতি, কালচার, লোকাচার কিছু কিছু ফুটে উঠেছে। সেগুলো যা বললাম—হয়তো শুনে, বইপত্র পড়ে। কবি অনুরাধা মহাপাত্রদের মতো অনেকের কাছ থেকে শুনেছি গ্রামের কথা, তাদের প্রচলিত রীতির কথা, বইপত্রও পড়েছি। বইপত্র পড়ে, শুনে, পরে রূপান্তর ঘটেছে – এই যা।[২]

তবে ঘুর পথে আসলেও দেবারতির কবিতায় লোকায়ত ভাবনারা কিন্তু জীবন্ত। যেমন 'ভূতেরা ও খুকি' কবিতায় লোকায়ত ভূতের প্রসঙ্গ এসেছে। লোকায়ত বিশ্বাস অনুযায়ী আমরা জানি ভূতে ধরলে তখন নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী চলা যায় না, ভূত ঘাড়ে চেপে বসে, স্ব-ইচ্ছা নষ্ট হয়ে তখন তার ইচ্ছে অনুযায়ী চলতে হয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে। কিন্তু আমরা দেবারতি মিত্রের কবিতায় যে ভূতকে দিনে–দুপুরে এই কবিতা থেকে সেই কবিতায় ঘুরে বেড়াতে দেখেছি, সে বড় আশ্চর্য ভূত। তাঁর কবিতায় বর্ণিত ভূতেরা কিন্তু ভয় দেখায় না বা কোনো রকম ক্ষতি করার ইচ্ছেও তাদের নেই। যেমন – 'সুধীর বামুনের ভূত কাঞ্চন ফুলের গাছ ঝাঁকাচ্ছে –'[৩] আবার 'ভূতেরা ও খুকি' কবিতায় উল্লিখিত ভূত অনেকটা রূপকথার ভূতের মতো, সে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোর নিত্য সঙ্গী। অচেনা অসুখে ছোটো হয়ে যাওয়া এক মেয়েসত্তা তার সব কথা – 'সেই ভূতেদের কাছে চুপি চুপি বলেছিল।'[৪] তৎক্ষণাৎ আমাদের মনে কৌতূহল জেগে ওঠে। ছোটো হয়ে যাবার পর কী কথা সে বলেছিল ওই ভূতেদের কাছে? কবি দেবারতি শুধু ইঙ্গিতের দখিনা হাওয়াটুকু পাঠক হৃদয়ের চেতনার উপর দিয়ে বইয়ে

দিয়েছেন, সম্পূর্ণ দরজা খুলে দেন নি। একজন মহৎ কবির ধর্মই তাই। সবটা বলে দেন না।

এরকম ভাবে আরও লোকায়ত সংস্কৃতি উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়—

১। 'আমার মা নেই
আমার খাওয়াপরা ঘুচে গেছে
নবান্নের দিন একটা কাকও নামবে না
আমার উঠোনে।'[৫]

২। 'গেঁয়ো লোকে বলে: খুঁতো পশুদেরই শুধু বলি হয়।'[৬]

৩। 'দুঃখ স্বপ্নচারী হাওয়া কেঁপে বলে যায় –
অন্তিম লুপ্তির টানে নেমে আয়,
ও অপয়া নারী।'[৭]

৪। 'ঠাকুমা মরবার পর যেসব হাঁড়িপাতিল ফেলে দিয়েছিলাম,..'[৮]

৫। 'নিশিডাক শুনে কাল রাতদুপুরে ঘুম ভেঙে গেল।'[৯]

৬। 'এ দেশে কি সন্ধেবেলা শাঁখ বাজে না,..।'[১০]

১১। 'মানতের পশুটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে কারা –'[১১]

এইভাবে তাঁর কবিতায় গ্রাম্য উৎসব, সংস্কৃতি, সংস্কার-কুসংস্কার, তাদের লোকবিশ্বাস সবই হাত ধরাধরি করে উঠে আসে।

এবার আসি কবির নগরচেতনার কথায়। নাগরিক কবি হিসাবে সহজেই উঠে এসেছে শহুরে সংস্কৃতি। কবিতায় কান পাতলেই শুনতে পাই চেতনার অবিরাম রক্তক্ষরণ-

'উপসাগরীয় যুদ্ধে সমুদ্রের ধূ ধূ জ্বলন্ত তেল আর
ভেসে ওঠা রাশি রাশি মরা জলজন্তু
দুরারোগ্য পণ্য ও যৌনতা, শিশুশ্রমিকদের খিমচানো মুখ,
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের উড়ন্ত সাপ খোপ।'[১২]

সবই হুড়মুড় করে চলে আসে তাঁর কবিতায়। কবি শুধু নিখুঁত রিপোর্টারের মতো নানা ছবি ক্যামেরাবন্দী করেন। এরকম নগর জীবনের নানা ছবি তুলতে তুলতে সেখানেই দেখা মেলে রিন্টু, তিতিরদের-

'মোটা ভারী অবান্তর বই চাপা পড়ে রিন্টু তিতিরেরা
আর জ্যান্ত ছেলেমেয়ে নয়, একরাশ থ্যাতলানো শিউলিফুল।'[১৩]

এই ইঁদুরদৌড়ের সময়ে, এই প্রতিযোগিতার মরশুমে রিন্টু, তিতিরদের কথা কেউ ভাবেনা, তারা সমাজের একপাশে 'থ্যাতলানো শিউলিফুল'এর মতো ঝরে পড়ে থাকে। শুধু এরাই নয়, উঠে এসেছে শহুরে ফুটপাতবাসীদের যাপনের কথাও --

'মাটির ঢেলার মতো আরেকটাকে ট্যাকে নিয়ে
কালকের কুড়িয়ে আনা কাঠকুটো জ্বালিয়ে
চা তৈরী করেছি...

এই গড়িয়ার বাইপাসে আমরা এক-দেড়মাস ছিলাম।’[১৪]

এ নিছক আত্মিক যোগ নয়, ঐ ব্রাত্য মানুষদের প্রতি ভালোবাসা কতটা গভীরে প্রোথিত ছিল, তার প্রমাণও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা কবিতায়।

দেবারতির ‘ভূতেরা ও খুকি’ কবিতায় দেখি, মেয়েটি আজ এমন এক ‘প্লাসটিক যুগে’র মধ্যে ঢুকে পড়েছে, যেখান থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই। এই প্লাস্টিক যুগ তার জীবনী শক্তির সবটুকু নিংড়ে নিয়ে তাকে রূপান্তর করেছে এক প্রাণহীন অনুভূতিশূন্য প্লাস্টিকের মেয়েতে। আমাদের এই সামাজিক কাঠামোর মধ্যে কবি দেবারতির যে মেয়েসত্তা ঘুরছে ফিরছে - সে মেয়েসত্তা আসলে একটি প্রাণহীন পুতুল মতো অনেকটা। আমরাও বুঝতে পারি- আধুনিক যুগ আমাদের প্লাস্টিকের চিরুনি দিয়েছে, প্লাস্টিকের বালতি দিয়েছে, প্লাস্টিকের মগ দিয়েছে, প্লাস্টিকের ব্যাগ দিয়েছে, প্লাস্টিকের দরজা দিয়েছে। চারিদিকে শুধু প্লাস্টিক আর প্লাস্টিকের পাহাড় প্রমাণ জঞ্জাল। এর মধ্যে বাস করতে করতে, কবি দেবারতির মেয়েসত্তাও ক্রমশ কুঁকড়ে ছোটো হতে শুরু করেছে। ফ্রক ছেড়ে মনের আনন্দে যে মেয়ে একদিন ডানা মেলে শাড়ির দিকে গিয়েছিল, সেই মেয়ে পুরুষের আধিপত্যবাদ ও ভোগপৃথিবীর বহুবিধ সংক্রমণে দিনের পর দিন পর্যুদস্ত হয়ে আবার তাই একান্ত নিরুপায় হয়ে শাড়ি ছেড়ে ফ্রকের দিকেই চলে এসেছে। সে বড় হতে চায় না, শিশু হয়ে থাকতে চায়। এই কবিতা পড়তে পড়তে অধ্যাপক-কবি-সমালোচক জহর সেনমজুমদারের ক্লাসের স্মৃতি ভেসে ওঠে। তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন এই কবিতার সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকা ইকোফেমিনিজম বা পরিবেশকেন্দ্রিক নারীবাদকেও। ইকোফেমিনিষ্টদের মতে, ক্ষমতাবাদী পুরুষের আধিপত্যবাদের কারণেই প্রকৃতি ধ্বংসের দিকে ক্রমঅগ্রসরমান। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে নারীর স্নিগ্ধ সংসর্গ না থাকার জন্যই পরিবেশ দূষণ এমন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। জীবনানন্দ সৃষ্ট ‘বিপন্ন বিস্ময়’ নামক জোট শব্দমালার মতোই তির্যক ও ইঙ্গিতপূর্ণ কবি দেবারতি সৃষ্ট ‘অচেনা অসুখ’ শব্দমালা। যদিও কবিতাটি বারবার পাঠের পর ‘অচেনা অসুখ’ ক্রমশ যেন চেনা হয়ে যেতে থাকে সমকাল বিধৃত এই বাস্তবে। এই নানাবিধ অন্ধকারের হিংস্রতার আগ্রাসনে ছোট হতে হতে কবি দেবারতির মেয়েসত্তা যেই ‘আঙুল প্রমাণ এক প্লাস্টিকের মেয়ে’ হয়ে গেল- তখনই সে মনের দিক থেকে শূন্য ও নির্বান্ধব হয়ে বন্ধু হিসাবে বেছে নিলো ভূতেদের।

কবি দেবারতি মিত্রের কবিতায় নগরচেতনার আরও কয়েকটি উজ্জ্বল উদাহরণ-

১। ‘তোমার কোথাও বীজ নেই, বীজ থাকবে না
মাটি ও জলের এই হিংস্র অভিশাপ....’[১৫]

২। ‘সারা আকাশ চুম্বক পাথর হয়ে ধরে আছে
একতাল লোহা, এই সংসারকে।

জলে ডোবা মানুষের মতো হাঁকপাঁক করতে করতে
কে চেঁচিয়ে উঠল – না!'[১৬]

৩। 'তাহলে গর্তে আসি-
গর্তে শ্বাস, গর্তে বাস, গর্তে হাহাকার-
অখন্ড গোপন কুয়ো, বিন্দুর আকারে ছায়া, সাদা খরগোসের লাফ বৃথা...'[১৭]

৪। 'ঘাসফড়িঙ ঠ্যাং উল্টে মরে পড়ে রইল
পশ্চিম আকাশের নীচে।'[১৮]

তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছেন যে এই ভোগসর্বস্ব যান্ত্রিক প্রতিযোগিতার যুগে কোথাও সৃষ্টিশীলতার বীজ থাকবে না। এমনকি নিঃসীম নীলাকাশ আজ চুম্বক পাথরে পরিণত আর এই নগরের যক্ষপুরীতে প্রতিটি মানুষ বাঁচার জন্য 'জলে ডোবা মানুষের মতো হাঁকপাঁক' করছে। আলো-বাতাস-আনন্দহীন এই নাগরিক সুড়ঙ্গে সমস্ত সৌন্দর্যপ্রিয় খরগোশেরই লাফই বৃথা এবং যে ঘাসফড়িঙের আনন্দময় চলনই তাঁর জীবন ধর্ম, সে আজ হার মেনেছে, জগতসভা থেকে ছুটি নিয়ে পশ্চিম আকাশের নীচে মরে পড়ে আছে। আজকের পৃথিবী সব অর্থেই প্রকৃতির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন বলেই অভিশপ্ত। এখানে তাই প্রকৃতি নেই আর প্রকৃতি নেই বলেই কোথাও অনাবিল সৌন্দর্য এবং জীবনমুখী আস্তিক্যবোধও নেই। হিংস্রতা আজকের পৃথিবীর ধর্ম, নিষ্ঠুরতাই আজকের পৃথিবীর বর্ম। সুতরাং সৃজনেরও কোনো মানে নেই আজ।

অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক। আমাদের জীবনাচরণের পরতে পরতে রয়েছে ব্যঙ্গের অবকাশ। দেবারতি রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপ রতনের মতো খুঁজে বার করেছে সমাজের সেই ব্যঙ্গের ক্ষেত্রগুলি, আর তাকেই সুকৌশলে নান্দনিকতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। যেমন - 'অভিনেত্রীর স্বামী' কবিতায় ফুটে উঠেছে বিপন্ন নগরায়ণের গল্প –

'সে চড়চড় করে বেড়ে উঠছে
প্রমোটারের হাতে পড়া দশতলা ফ্ল্যাট।...
ভাঙা আয়না আমি ফ্ল্যাটের সামনে জলে ডুবে আছি।
নিশ্বাস নিতে পারি না,
শাপলা, পদ্ম আমায় চেনে না, খলসে, ল্যাটা ছোঁয় না।
প্ল্যাস্টিকের প্যাকেট আর জঞ্জালে
লোকে বুজিয়ে দিচ্ছে বাস্তুপুকুর।'[১৯]

তবে এই কবিতা শুধু বাস্তু পুকুর বুজিয়ে চড়চড় করে বেড়ে ওঠা, প্রমোটারের হাতের পড়া এক দশতলা ফ্ল্যাটের গল্প নয় শুধু, এ এখন নগরের সর্বজনীন চিত্র। আবার 'কথার ঠিক বেঠিক' কবিতায় দেখি-

'এই তো সেদিন অঞ্জলিকে বললাম —
কত ঘটা করে লোকে নজরুল জীবনানন্দের শতবার্ষিকী করছে,
একটা উৎসব- টুৎসব না হলে কি ভালো লাগে?

তোর ছেলে রিন্টুর একটা শতবার্ষিকী কর না
সবাই মিলে বেশ হইহই করা যাবে।'[২০]

এইভাবে লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষ অর্থাৎ হৈ হৈ করাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। আর আজকেও যখন দেখি রবীন্দ্রনাথের কিংবা বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষের নামে মোচ্ছব চলে, চলে 'উৎসব-টুৎসব'। পাড়ায় পাড়ায় ক্ষণস্থায়ী মঞ্চে দু-চারটি গান গাইয়ে, ক্যুইজের আসর বসিয়ে সবাই সবার কর্তব্য সারে, তখনই কবিতাটি অন্যমাত্রা পেয়ে যায়। এরমধ্য দিয়ে আন্তরিকতাবিহীন দেখনদারী জৌলুসের বিরুদ্ধে দেবারতির বিদ্রূপের চাবুক ঝলসে উঠেছে। এরপর আসি নগরের অধুনা সংস্কৃতির একটি অন্য বিষয়ে। যদিও একে অধুনা বলা কোনও মতে যায় না, তবে গ্রাম না পারলেও নগরের তথাকথিত কিছু শিক্ষিত মানুষ তাদের মনের সংগোপনে থাকা ইচ্ছে সাহসে ভর করে বলছে, সময়ের নিরিখে একে অধুনাই বলা যায়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অভিঘাত বা শিক্ষিত নাগরিক মানুষের সাহসিকতার ফলে প্রচলিত ভালোবাসার বিপ্রতীপে যে ভালোবাসা এতদিন ঢেকে রাখা হয়েছিল, কবি দেবারতি মিত্র সাহসিকতার সাথে সেই ঢাকনা সরিয়ে হোমোসেক্স বা লেসবিয়ানদের কামনা-বাসনাও তুলে আনছেন, যা একেবারে এই আধুনিক নগরের চিত্র।

'এক মেয়ে আরেক মেয়ের ঘন ছাউনিতে
কথা বলে, গল্প করে চুমু খায়, এ ওকে জড়ায়
ক্রমে এক হয়ে যায় অতসী ও রিয়া।'[২১]

এইভাবে অঘ্রানের জ্যোৎস্নারাতে বনকদমের গন্ধে এই নগরের দুই লেসবিয়ান অতসী ও রিয়া এক হয়ে যায়। আর কবি পরম যত্নে সেই দৃশ্যকে ক্যামেরাবন্দী করে। আবার 'গড়িয়ার মোড়ে' কবিতায় কবি নাগরিক মানুষের ক্লান্তির উদ্ভাসন ঘটিয়েছেন। ফাটা বাঁশে আটকে থাকা দমবন্ধ জীবনকে রূপকের আবডালে অঙ্কন করেছেন-

'হিরুছাগল ম্যা-হ্যা আর ব্যা-হ্যার মাঝামাঝি একটা শব্দ করে
গলার দড়ি ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে...
সামনেই ক্রুসকাঠে যিশুখ্রিস্টের মতো
ওর ভাইয়ের ছাল ছাড়ানো শরীর লটকানো, ...'[২২]

তখন সচেতন পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না এই 'হিরুছাগল' আসলে আমরাই; এই আমরাই প্রতিনিয়ত সামনের ক্রুসকাঠে আমদের পাশের মানুষটির ছাল ছাড়ানো লটকানো দেহকে দেখি। আর ফাঁদে আটকে পড়া পশুর মতো আসন্ন মৃত্যুর প্রহর গুনি আর মাঝে দড়ি ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করি। আসলে এই দড়ি ছেঁড়া বোধ হয় এই নষ্ট ভ্রষ্ট সমাজ থেকে উত্তরণের স্বপ্ন।

তথ্যসূত্র:

১। দেবারতি মিত্র, 'জীবনের অন্যান্য ও কবিতা', প্রথম সংস্করণ-সেপ্টেম্বর ২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা-৭০০০০৯, পৃ-২০২।
২। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার-১৬/১২/২০১৬।
৩। দেবারতি মিত্র, কবিতা সমগ্র, প্রথম সংস্করণ - জানুয়ারি ২০১৬, সিগনেট প্রেস, কোলকাতা-৭০০০০৯, পৃ – ১৪৬।
৪। তদেব, পৃ- ১৩৫।
৫। তদেব, পৃ-১৯০।
৬। তদেব, পৃ- ১৪৩।
৭। তদেব, পৃ- ১৪৪।
৮। তদেব, পৃ- ২৩৩।
৯। তদেব, পৃ- ২৪৪।
১০। তদেব, পৃ- ৩১৯।
১১। তদেব, পৃ- ২৯৪।
১২। তদেব, পৃ- ৩০৬।
১৩। তদেব, পৃ-৩৩৫।
১৪। তদেব, পৃ-৩১০।
১৫। তদেব, পৃ- ১৩৬।
১৬। তদেব, পৃ-১৮৯।
১৭। তদেব, পৃ- ১৪২।
১৮। তদেব, পৃ-১৯০।
১৯। তদেব, পৃ- ৪১০।
২০। তদেব, পৃ-৩২৯।
২১। তদেব, পৃ- ৪০৮।
২২। তদেব, পৃ-৩৪২।

হাসান আজিজুল হকের আত্মজা ও একটি করবী গাছ : পরাজিত বিবেকের আত্মদহন

সাহাবুল মন্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : হাসান আজিজুল হকের শুরু ১৯৬৪ সালে ' সমুদ্রের স্বপ্ন ও শীতের অরণ্য'র মধ্য দিয়ে। এর চার দশকের মাথায় তাঁর 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। কালের হিসেব কষলে সেটা ষাটের দশকের ঘটনা। এ দশকে বাংলা সাহিত্যে বিশেষত, বাংলা ছোটগল্পে ঘটে মৌলিক রূপান্তর। চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশের দশকের লেখকদের লেখার আবেগ আর রোমান্টিকতার ভাবালু অনুষঙ্গ এবং সেইসঙ্গে চিরাচরিত মঙ্গলময়তা থেকে সরে এসে সৃষ্টি হয় বাংলা ছোটগল্পের এক স্বতন্ত্র শিল্পভুবন। তাতে প্রাধান্য পায় দেশভাগের যন্ত্রণা এবং সেইসঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতাপূর্ব অস্থিরতাও বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।ষাটের যে শিল্পপ্রবণতায় যারা একীভূত হয়েছিলেন হাসান আজিজুল হক তাদের মধ্যে নেতৃত্বস্থানীয়। হাসান আজিজুল হকের বিশিষ্টতা এই যে, তিনি দেশভাগের অনুষঙ্গ যেভাবে শিল্পিত করেছেন সে-কালের অনেকের লেখায় তা প্রায় অনুপস্থিত।
সূচক শব্দ: বহুকৌণিক বিদিশা, দ্বিজাতিতত্ত্ব, আত্মবিচ্ছেদ, আত্মিক সংকট, জাতিসত্তা।

হাসান আজিজুল হকের গল্প বিশ্বের বহুকৌণিক বিদিশাকে যদি আমরা ধরার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদেরকে গল্পকার হিসেবে তাঁর উত্থানের ক্রমপরিণতির দিকে নজর দিতে হয়। লেখক হিসাবে হাসান আজিজুল হকের প্রকাশ ঘটে ১৯৬০ সালে 'শকুন' নামে ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে। ছ'য়ের দশকের বাংলাদেশের যে কথাসাহিত্য, সেটি একটি সৃষ্টিমুখর কাল। বাংলাদেশ জুড়ে তখন লিটল ম্যাগাজিন তীব্রতর হয়ে উঠেছে,ছ'য়ের দশকের তরুণ লেখকেরা ছোটগল্পের এক নতুন স্রোতধারা নির্মাণ করতে ততদিনে সমর্থ হয়েছিলেন; অস্থির রাজনৈতিক সময়ে মহম্মদ আলী জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের ফানুসটা ততদিনে ফুটো হয়ে গেছে, ভাষা আন্দোলনে মুখর হয়ে রক্ত ঝরিয়ে বাঙালি ততদিনে নিজের আত্মপরিচয়ের সন্ধান পেয়েছেন, আধা- ঔপনিবেশিক স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা সংঘটিত হতে শুরু করেছেন, খিদে আর দারিদ্র্যের সেই সীমাহীন বিস্তার একদিকে, অন্যদিকে শাসকগোষ্ঠীর অন্তহীন লোভ, পাশাপাশি কালোবাজারি, বেকারত্ব, যৌবনের তীব্র হাহাকার; আর এরই মধ্যে হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মতো বাংলাদেশের ছোটগল্পের ভুবনে আত্মপ্রকাশ করেছেন হাসান আজিজুল হক।বর্ধমানের যবগ্রাম থেকে বরেন্দ্রভূমির রাজশাহীতে গিয়ে

শেষপর্যন্ত থিতু হয়েছিলেন হাসান আজিজুল হক। এই যে মধ্যরাঢ় থেকে বরেন্দ্রভূমির উজানে গিয়ে থিতু হওয়া- এই প্রক্রিয়াটা আসলে তাঁর সারাজীবন ধরে চলেছে। হাসান আজিজুল হক তিনি একদিকে দেখেছেন দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা, ভাষা আন্দোলন, আর এরই মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের কথা সাহিত্যের বদলে যাওয়া ভুবনটাও প্রত্যক্ষ করতে চাইছেন। সময় আর পরিসরের যুগলবন্দীতে এই সময়ে একজন স্রষ্টার নির্মাণ ঘটে চলেছে-সময় একজন স্রষ্টাকে নির্মাণ করে চলেছে।

'সমুদ্রের স্বপ্ন ও শীতের অরণ্য'(১৯৬৪) গল্পগ্রন্থের তিন বছর পর প্রকাশিত ' আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পের নাম গল্প ' আত্মজা ও একটি করবী গাছ'। গল্পটি বাংলা সাহিত্যের গল্পভুবনকে আমূল বদলে দিয়েছিল শৈলী এবং বিষয়ভাবনার নতুনতর বিন্যাস- এই উভয়ের দিক থেকেই। ' আত্মজা ও একটি করবী গাছে'র মতো একটি গল্পে আমরা দেখি যে '৪৭' বা তার পরে চৌদ্দপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে অনিশ্চয়তার পথে ভাসতে ভাসতে যারা একদিন পৌঁছেছিলেন ওপার বাংলায়, বুকের মধ্যে তারাও তো একটি দেশ লালন করে। বা ওপার বাংলা থেকে যে- সমস্ত হিন্দু উদ্বাস্তুরা দলে দলে এসেছিলেন এপার বাংলায় সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে, জমি-জিরেত ছেড়ে, তারাও তো বুকের মধ্যে লালন করেন এক খন্ড সোনার বাংলা। এই দেশহারা মানুষদের কথা, এই উদ্বাস্তু মানুষদের কথা হাসান আজিজুল হক নতুনকরে তুলে আনতে চাইলেন তাঁর ' আত্মজা ও একটি করবী গাছ', গল্পে। গল্পটিতে আমরা দেখতে পাবো তিনি কেবলমাত্র দেশহারা মানুষদের কথা তুলে আনতে চাইছেন না, একইসঙ্গে নতুন আত্মপরিচয়ের সন্ধানকারী মানুষের যে সংকট, সেই সংকটকে তিনি তুলে ধরতে চাইছেন। সেই দেশহারা মানুষদের কান্না আর উৎকণ্ঠার সেইসব ইতিহাস দগদগে হয়েছিল রুকু বা রুকুর বাবার চৈতন্যে।গল্পের চরিত্রদের সংলাপ থেকে বোঝা যায় যে রুকুরা আসলে রাঢ়ভূমি থেকে বরেন্দ্রভূমিতে যাওয়া উদ্বাস্তু মুসলমান। গল্পকার তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের ক্লিন্ন, রুগ্ন যে রূপ,অবক্ষয়ী যে ব্যবস্থা; বাংলাদেশের চলচিত্রের সেই খুঁটিনাটি, বাংলাদেশের সেই বন্ধ্যা সময়ের সন্তান হিসেবে ইনাম-ফেকু-সুহাসদের তিনি পাঠকের সামনে তুলে আনেন।অবক্ষয়ী বন্ধ্যা বাংলাদেশের সন্তান ইনাম- ফেকু- সুহাসরা তাদের দেশের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, সমকালীন সমাজের প্রতি, সময়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ-

"লেহাপড়ার মুহি পেচ্ছাপ- ইনাম বলল। আবার অসহ্য লাগল ওর। তাহলি- ফেকু ভেবেচিন্তে বলল, উঁচো জায়গায় দাঁড়ায়ো সবির ওপর পেচ্ছাপ। কাজ কোয়ানে? জমি নেই খাঁটি, ট্যাহা নেই ব্যবসা করি- কি কলাডা করবানে।"[১]

বৌ-ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই অবক্ষয়ী বাংলাদেশের মানচিত্রে ঢুকে পড়েছে রুকুর অসহায় বাবা। গল্পে রুকুর বাবার কোনো নাম নেই । আপাত অসংলগ্ন অনেক টুকরো টুকরো ঘটনা এই গল্পের আখ্যানের মধ্যে এসে পৌঁছায়। এবং এর মধ্যে থেকেই আমরা দেখতে পাই ধর্ষক- ধর্ষিতা, বিক্রেতা- ক্রেতা, শাসক এবং শোষিত-

এরা সবাই আসলে দাঁড়িয়ে আছে ঐ বন্ধ্যা বাংলাদেশের এক সরলরেখায়, এক অর্থনৈতিক পটভূমিকার উপরে। দুঃসহ দারিদ্র, স্বপ্নহীন গ্লানি পরিকীর্ণ জীবন থেকে বাঁচার জন্য ইনাম- ফেকু- সুহাসরা বেঁছে নিয়েছে অসামাজিক জীবিকা। ধরা পড়ে তারা মার খায়, তবু আবার তারা পকেট মারে- নিজেদের তারা পাল্টায় না। এবং এভাবেই তারা এগিয়ে চলে। হাতসাফাই থেকে গুন্ডামি- সবকিছুতেই তারা নিজেদেরকে পাকিয়ে তুলেছে। নিরাপত্তাহীন জীবনে মাথাপিছু দুটাকা করে দিয়ে রুকুর কাছ থেকে তারা যৌবনের উত্তাপ কেনে। কোনো কোনো দিন ধারেই পেতে চায় সেই নিরাপত্তা। বৌ- ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই বিদেশ বিভূঁইয়ে এসে রুকুর বাবাকে বাঁচতে হবে। রুকুর বাবাকে তাই আপাত ভদ্রতা ও সৌজন্যের মুখোশ পরে নিতে হয় নিজের আত্মজার ধর্ষকদের সামনে। পাকস্থলীর ক্ষুধাকে জয় করতে বিবেকের কাছে পরাজিত হতে হয় রুকুর বাবাকে।হাসান আজিজুল হক তাই লেখেন-

"ঠান্ডা চোখে ইনামকে দেখে, সুহাসকে দেখে, ফেকুকে দেখে, দেখতেই থাকে, বিধঁতেই থাকে, হারিকেনের বাতিটা তোলে কাঁপা হাতে, এসো। তোমরা? ভাবলাম কে আসছে এত রাতে। তা কে আর আসছে এখানে মরতে?"[২]

রুকুর বাবার আপাত এই ভদ্রতার মুখোশটা তাকে পরে নিতে হয়। এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলায় যাওয়া হাজার হাজার মুসলমান উদ্বাস্তুর একজন শ্রেণিপ্রতিনিধি রুকুর বাবা। কতটা অসহায় হলে একজন পিতা তার আত্মজাকে তুলে দিতে বাধ্য হন ধর্ষকদের হাতে- এ ঘটনা পাঠক-সমাজকে শিহরিত করে তোলে। রুকুর বাবার চোখ তাই ঠান্ডা, মুখের আঁকিবুকি দেখে ভয় পায় ইনাম- ফেকু-সুহাসরা-

"ফেকু ভয় পেয়ে গেছে এখন। বুড়োর মুখের দিকে বারবার চেয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চাইছে আর সিঁটিয়ে যাচ্ছে। সুহাস চোখ দুটো গোল গোল করে চেয়ে আছে। বুড়োর মুখ এখন বহুরূপী। সুহাস ভাবছে, বুড়োটা খুন করবেনে মনে হতিছে আমার। আজ ক্যানো যে আলাম। না আসিলেই ভালো হতো।"[৩]

দেশভাগজনিত নৃশংস আত্মবিচ্ছেদের ভয়াবহ মানবিক যাতনার প্রত্যক্ষ শিকার আমাদের ছোটগল্পের এই বরপুত্র।তাই তাঁর সৃষ্টির জমিনের একটি বিস্তৃত জায়গা জুড়ে আছে দেশভাগ ও তার ফলে সৃষ্ট মানুষের আত্মিক সংকট। সুবিধাবাদী ও স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থচিন্তার নির্মম নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে রুকুরা তাদের সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে ওপার বাংলায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। শুধু তো আশ্রয় নেওয়াই নয়, তারা কিভাবে জীবনধারন করবে, কিভাবে তাদের আহার জুটবে, সেদিন কি দেশভাগের হোতারা ভেবেছিল? নিজের আত্মজাকে উদ্বাস্তু জীবনের জীবিকার প্রধান অবলম্বন করা হবে, দেশনায়করা কি সেদিন জেনেছিল? অথচ ধর্মের ভিত্তিতে একটি সুগঠিত জাতিসত্তাকে সেদিন গরু কাটার মতো দুভাগ করে স্বার্থান্বেষী দেশভাগের হোতারা। নিদারুণ অর্থসংকটের কবলে পড়ে হাঁপানী আক্রান্ত রুকুর বাবার বেঁচে

থাকার এই একটি মাত্র পথই বোধহয় নিষ্ঠুর ভাগ্যবিধাতা খুলে রেখেছেন- নিজের আত্মজাকে ধর্ষকদের হাতে তুলে দেবার বিনিময়ে দুটি টাকা পাওয়া। তাই আমাদের মনের গহন কোনে এই একটি প্রশ্ন হয়তো বা বারবার উঠে আসে – হাঁপানী আক্রান্ত এই উদ্বাস্তু প্রবীণের জীবনধর্মের এই নিষ্ঠুর ট্র্যাজেডি ও নির্মম আত্মযন্ত্রণার বিষবাতাস কি স্বাধীনতার সুখকে ছুঁয়ে যায়নি? 'শ্লেষের দলা শ্বাস নালীটাকে একেবারে স্তব্ধ' করে দিলেও এবং 'চোখ কপালে তুলে কাশলে'ও রুকুর বাবাকে ঠিকই এইসব ধর্ষকদের সামনে ভদ্রতার নাটক করতে হয়। অন্যথা, নিজের আত্মজাকে দুই টাকায় বিক্রি করার মতো জঘন্য অপরাধের অপরাধী পিতার এই নির্লজ্জপনা স্বাধীন দেশে চলবে কেন? স্বাধীনতার অপমান মানবে কেন? রুকুর বাবাকে একেবারেই নিজের বিবেককে বিসর্জন দিয়ে নিজের আত্মজাকে দুই টাকার বিনিময়ে বখাটেদের হাতে তুলে দিতে হয়নি। তার ভিতরের বিবেকটা সক্রিয়। তাই, সুহাস ও ফেকুর দুই দুই করে চার টাকা প্রবীণের হাতে দিয়ে ফেকু যখন বলল, 'সুহাস আর আমি দিচ্ছি'। তখন প্রবীণ ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত, চেয়ার থেকে হেলে পড়ে শরীর। জীবন তাকে একজন দক্ষ অভিনেতা বানিয়েছে। মিথ্যা অভিনয়ের এই ছলটুকু করতে পারল নিখুঁতভাবেই-

"দাও। আর কত যে ধার নিতে হবে তোমাদের কাছে। কবেই বা শুধতে পারব এই সব টাকা। সুহাস উঠে দাঁড়ায়। চলে যাবে এখন? এত তাড়াতাড়ি? রুকু রাগ করবে- চা করতে দিলে না ওকে। ওর সাথে দেখা না করে গেলে আর কোনোদিন কথা বলবেনা।"[৪]

নিষ্ঠুর নিয়তির নির্মম পরিহাসে রুকুর বাবা আজ দেশত্যাগী বাস্তুভিটাহারা ভেতর-বাইরে আত্মদ্বন্দে পড়াভূত এক মহান ট্রাজিক নায়ক। বাস্তুভিটাহারা দেশত্যাগী মানুষের একটাই পরিচয় সে একজন "উদ্বাস্তু"। অন্যকোনো পরিচয়ে তাকে আর পরিচিতি করা যায়না, দেশ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সসম্মান উষ্ণতাটুকু ত্যাগ করে এসেছে রুকুর বাবা। এখন তার ভেতর বাইরে মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ। লেখকের ভাষায় "দেশ ছেড়েছে যে তার ভেতর বাইরে নেই। সব এক হয়ে গেছে।"[৫] কৃত্রিম ভদ্রতার আড়ালে নিজের আত্মজাকে বখাটেদের হাতে তুলে দেবার যাতনা অসহ্য হয়ে উঠলেও সামনে শুধুই অন্ধকার। রুকুর বাবার বুকফাটা হাহাকার তার প্রাঙ্গনে লাগানো করবীগাছের সাথেই তুলনীয়।নিয়তির কি নির্মম পরিহাস, সেই বিষ এখন তাকেই গলাধঃকরণ করে নীল হয়ে যন্ত্রনায় কাতরাতে হচ্ছে- "এ গল্পে প্রধান হয়ে উঠেছে ছিন্নমূল বৃদ্ধ পিতার অক্ষমতার অপরিমেয় গ্লানি,করবীর বিষ পান না করেও প্রতিনিয়ত বিষের জ্বালায় জর্জরিত হওয়া, না মরেও মরনাধিক কষ্টে তিলে তিলে দগ্ধ হওয়ার নিষ্কৃতিহীন যন্ত্রণা।"[৬]

জীবন রুকুর বাবাকে একজন দক্ষ অভিনেতা বানিয়েছে। জীবননাট্যের সেই মেকি সংলাপ আজ তাকে বলে যেতে হবে ইনামের কাছে, যে রুকুর যৌবনের উত্তাপ কিনতে দুই টাকা জোগাড় করতে পারিনি। অথচ অন্যদিকে পাশের ঘরে রুকুকে

খাবলে খাচ্ছে ফেকু আর সুহাস। মেয়ের চুড়ির শব্দ, কান্নার শব্দ, বখাটেদের অট্টহাসি পিতার কানে আসছে। ইনামের কাছে করবী গাছের গল্প করতে গিয়ে বারবার শ্লেস্মা এসে কণ্ঠরোধ করে দিচ্ছে। দুর্বল অভিনয়ের এই মেকি পালা যেন শেষ হয়েও হয়না শেষ। মেয়ের চুড়ির শব্দ তার কণ্ঠরোধ করে দিচ্ছে-

"আমি যখন এখানে এলাম ; হাঁপাতে হাঁপাতে, কাঁপতে কাঁপতে সে বলছে, বুঝলে যখন এখানে এলাম.. তার এখানে আসার কথা আর কিছুতেই ফুরোচ্ছে না- সারারাত ধরে সে বলছে, এখানে যখন এলাম-আমি প্রথম একটা করবী গাছ লাগাই.. তখন হু হু করে কে কেঁদে উঠল, চুড়ির শব্দ এলো, এলোমেলো শাড়ির শব্দ আর ইনামের অনুভবে ফুটে উঠল নিটোল সোনারঙের দেহ- সুহাস হাসছে হি হি হি – আমি একটা করবী গাছ লাগাই বুঝলে? বলে থামলো বুড়ো ; কান্না শুনল, হাসি শুনল, ফুলের জন্য নয়, বিচির জন্য ; বুঝেছ, করবী ফুলের বিচির জন্য, চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিতে।"[৭]

'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পে জায়মান সমাজবাস্তবতার ছবি দার্পণিক মেজাজে চিত্রিত-"সমাজ জীবনের অবক্ষয়ের স্বরূপটি অনবদ্য ভঙ্গিতে প্রকাশিত।"[৮] করবী গাছকে ঘিরে বাঙালির সমস্ত রোমান্টিক আবেগকে এখানে হাসান আজিজুল হক ভেঙে খান খান করে দিয়েছেন। ধ্বস্ত- জিরজিরে-দ্বেষটার মধ্য দিয়ে তখন একটা প্রশ্ন উদগত হয়ে উঠতে চায়, আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম? গল্পের পরিণামে গল্পকার সুকঠিন নির্মমতায় ঢেলে দেন নিষ্পেষিত বিবেকের তীব্র ধিক্কার আর তিক্ত বেদনার মন্থনজাত হলাহল এবং সে বিষ মাখানো সুতীক্ষ্ণ ছুরির ফলায় ছিন্নভিন্ন করেন গল্পের সমুদয় কুশীলব, নষ্ট-ভ্রষ্ট সমাজ, আত্মতুষ্ট পাঠক- সবাইকে। বিশিষ্ট বিশ্লেষক ও আলোচক হায়াৎ মামুদের আলোচনায় এ গল্পের অন্তর্নিহিত আবেগ ও তাৎপর্য ধরা পড়ে-

" 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পে দাঙ্গাতাড়িত উদ্বাস্তু বৃদ্ধ বেঁচে থাকার জন্য যখন নিজের কন্যাকে উলঙ্গ সঁপে দেয় তাদের হাতে তখন জীর্ণ আমাদের এই বাংলাদেশের ছবি চোখের সামনে করাল হয়ে দুলতে থাকে।.. আর 'এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? নামক পৌনঃপুনিক অবোধ প্রশ্ন সে কি লজ্জার আমাদের মানবজন্মের অপরাধের, নাকি নিষ্ঠুর ব্যাঙ্গ? হাসান, আমার ধারণা, ইত্যাকার সমুদয় অর্থই এর মধ্যে প্রবিষ্ট করেছেন।"[৯]

পঙ্গু স্বাধীনতা বিকলাঙ্গ প্রজন্মের জন্ম দিয়ে অসুস্থ ও অসম ব্যবস্থার তৈরি করে দিয়েছে, যেখানে তরুণী মেয়ের শরীর বিক্রি করে পিতাকে বেঁচে থাকতে হয়। তরুণী রুকু অখণ্ড বাংলার প্রতীক হয়ে উঠেছে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বাবার ব্যর্থতা ও

স্বার্থের কারণে নিঃশব্দে মেনে নিতে হচ্ছে এই রমণনিপীড়ন। যেভাবে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাঙালিকেও মেনে নিতে হয়েছিল দেশভাগের নাটক, নৃশংস আত্মবিয়োগের ট্রাজেডি।

তথ্যসূত্র:

১. হাসান আজিজুল হক, আত্মজা ও একটি করবী গাছ, গ্রন্থ:আত্মজা ও একটি করবী গাছ, মুক্তধারা, ঢাকা,১৯৬৭, পৃ:১৮

২. তদেব, পৃ:২০

৩. তাদেব, পৃ:২১

৪. তদেব, পৃ:২২

৫. তদেব, পৃ:১৫

৬. সানজিদা আখতার,বাংলা ছোটগল্পে দেশভাগ, বাংলাদে একাডেমী, ঢাকা,২০০০, পৃ:১৮১

৭. হাসান আজিজুল হক,আত্মজা ও একটি করবী গাছ, গ্রন্থ:আত্মজা ও একটি করবী গাছ, মুক্তধারা, ঢাকা,১৯৮৬, পৃ:২৫

৮. আবু জাফর, গল্পকার হাসান আজিজুল হক, প্রকাশক:আবু জাফর, ঢাকা,১৯৮৮, পৃ:১৬

৯. হায়াৎ মামুদ, ঘনিষ্ট কতকথা, প্রকাশক:কামাল বিন মাহতাব, ঢাকা-১, ১৯৭০, পৃ:১০

প্রাচীন বাংলার অবয়বে সামাজিক ইতিহাস নির্মাণ : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘গৌড়মল্লার’ উপন্যাস

অপূর্ব সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বিশশতকে তৃতীয় দশকের বাংলার সঙ্গে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন বাংলার যোগসূত্র খুঁজেছেন তাঁর ‘গৌড়মল্লার’ উপন্যাসে। এসেছে প্রাচীন বাংলার পল্লি মানুষের যাপিত জীবন, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনৈতিক বিধ্বস্ত সমাজ ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের ঐতিহাসিক চরিত্র শশাঙ্ক ও তার পুত্র মানবদেব -এর সাথে হর্ষবর্ধন, ভাস্করবর্মা্র সংঘর্ষ অল্প-বিস্তর এসেছে এই উপন্যাসে। কাল্পনিক চরিত্র মানবদেবের পুত্র ব্রজদেব তার পিতার হিতরাজ্য পুনরুদ্ধারের এক কাল্পনিক চিত্রাঙ্কণ করেছেন ঔপন্যাসিক তৎকালীন সামাজিক- রাজনীতিক প্রেক্ষাপটে। উক্ত প্রবন্ধে ‘গৌড়মল্লার’ উপন্যাসের পুনঃপাঠের দ্বারা তারই স্ববিস্তর বিচার ও বিশ্লেষণ করা হবে।

সূচকশব্দ : ইতিহাস(History), উপন্যাস (Novel), প্রাচীন বাংলা (Ancient Bengali), গৌড়মল্লার (Gauramallar), খাদ্য (Food), রাজনীতি (Politics), সমাজ (The Society), সংস্কৃতি (Culture)

শুরুর কথা :

ইতিহাসের বিষয়কে উপজীব্য করে সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে অনেক ঔপন্যাসিক প্রাচীন বাংলা ও ইতিহাসের নানা অনুষঙ্গকে তাঁদের উপন্যাসে বিষয় হিসেবে গ্রহন করেছেন। এই সব উপন্যাসে প্রাচীন কালের ইতিহাসের অবয়বে উঠে এসেছে প্রাচীনবাংলার সমাজসংস্কৃতি-, রাষ্ট্রঅর্থনীতি-,আচারনীত-ি, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছেদ,তথা সামাজিক ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গচিত্র। উপন্যাসে প্রাচীন বাংলার সামজিক ইতিহাসের উপাদানগুলি ব্যবহার করে ঔপন্যাসিকরা ইতিহাসের ভেতরে বাংলা ও বাঙালির স্বরূপ সন্ধান করেছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রাচীন বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও সমকালীন স্বদেশেকে অবলম্বন করে বেশ কয়েকটি - রচনা করেছেন। কিন্তু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যাউপন্যাস ও গল্প, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এদের সমসাময়িক লেখক হয়েও কেন তিনি ইতিহাসের ভিতর – দিয়ে বাংলা ও বাঙালির সামজিক বাস্তবতার অনুসন্ধানে অগ্রসর হলেন। তা গ্রন্থের ‘পরিশিষ্ট’ অংশে নিজে জানিয়েছেন *ঙ্গালীকে তাহার প্রাচীনআমি বা”* -tradition-*এর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এ চেষ্টা আর কেহ করে না কেন? বাঙালী যতদিন না নিজের বংশগরিমার কথা জানিতে পারিবে ততদিন তাহার চরিত্র গঠিত*

হইবে না, ততদিন তাহার কোনও আশা নেই। যে জাতির ইতিহাস নাই তাহার ভবিষ্যৎ নাই।"[১]

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভাবনা থেকেই-'গৌড়মোল্লার '(১৯৫৪উপন্যাসটি (রচনা করেছেন বলে আমরা ধারণা করতে পারি। সহস্র বছরেরবিবর্তমান বাঙালির ইতিহাস। সেইইতিহাস বর্ণিত ঘটনার অন্তরালে যে অন্তর্বাস্তবতা লুকিয়ে আছে - ধ্যায় চলমান জীবন রূপে সন্নিবিষ্ট করেছেন সেগুলিকে খুঁজে বের করে শরদিন্দু বন্দ্যোপা উপন্যাসটিতে। গৌড়মল্লার উপন্যাসটির কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে শশাঙ্কের মৃত্যুর ৬)৩৭র কিছুকাল পূর্ব থেকে পরবর্তী-(৬৩৮/ ২০ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ বাংলার ইতিহাসে এই সময়টা মাৎস্যন্যায় বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই সময় বাংলার যে রাজনৈতিক ক্ষমতার অদল বদল চলেছিল তার ফলে বাঙালি জন-জীবনে সব দিক থেকে নেমে এসেছিল চূড়ান্ত অবনমন। ঔপন্যাসিক গৌড়মল্লার উপন্যাসে প্রাচীন বাংলাকে তুলে ধরতে গিয়ে এই সময়ের অবক্ষয়কে যেমন রূপায়িত করেছেন তেমনি সামাজিক ইতিহাসের প্রতিটি উপাদানকে নির্দ্বিধায় উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন।

প্রাচীন বাংলার ভিত্তিভূমি গ্রাম। গৌড়মল্লার উপন্যাসটি শুরু হয়েছে শশাঙ্কের রাজত্বকালে গৌড় রাজ্যের এক প্রান্তিক গ্রাম বেতসগ্রামএর বর্ণনা দিয়ে। রাজধ-ানী কর্ণসুবর্ণ থেকে বিশ ক্রোশ দূরে উত্তর পশ্চিমে মৌরী নদীর তীরের অবস্থিত গ্রামটি। নদী ও গ্রামের মধ্যস্থলটুকু ঘন বেতসবনে পূর্ণ বলে গ্রামটির নাম বেতসগ্রাম। ইতিহাসে এই গ্রামটির নাম না থাকলেও সেই সময় বাংলার গ্রামগুলি প্রকৃতিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠত এবং প্রকৃতির অবস্থান ভিত্তিক গ্রামের নামকরণ হত। গ্রামটির অবস্থান সম্পর্কে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন*গ্রামটি আভীরপল্লী" -; নাম বেতসগ্রাম। ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্বেকার গৌড়দেশের এক প্রান্তে মৌরী নদীর তীরে এই ক্ষুদ্র গ্রামের কয়েকটি নরনারীকে লইয়া এই কাহিনী।"*[২]

প্রাচীন বাংলায় ছিল একাধিক নদ নদী । সেই থেকে-বাংলাকে নদীমাতৃক দেশ বলে বর্ণনা করা হয়। উপন্যাসটিতে ময়ূরাক্ষী ও মৌরী নদীর কথা আছে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়*বাংলা দেশের বহুপ্রাচীন মানচিত্রে দেখা যায়" -, সেকালে ময়ূরাক্ষী নদীর একটি সখী নদী ছিল;...কিন্তু আজ হইতে অনুমান ত্রয়োদশ পূর্বে এই নদীর নাম ছিল ময়ূরী, চলতি কথায় মৌরী নদী।মৌরী নদী ময়ূরাক্ষী অপেক্ষা ক্ষীনা। বর্ষার ... কূল ছাপাইয়া যায়'তাহার জল দু, কিন্তু বর্ষাপগমনে আবার জলধারা শীর্ণ ও স্বচ্ছ হইয়া খাতের ক্রোড়ে ফিরিয়া আসে।"*[৩]

এই ভাবেই লেখক প্রাচীন বাংলার নদ-নদী ও তার গতিপথ সম্পর্কেও একটি স্বচ্ছ ধারনা দিয়েছে। ইতিহাসে মৌরী নদীর নাম না থাকলেও ময়ূরাক্ষীর সখীনদী হিসেবে লেখকের দেওয়া মৌরী নামটি আমরা সহজেই গ্রহণ করে নিয়েছি। কোথাও এতটুকু সন্দেহ বা অবিশ্বাস হয়নি। এই নদ নদীর পরিচয় সূত্রেই গৌড়ের রাজধানী-কর্ণসুবর্ণের ভৌগোলিক অবস্থানটাও লেখক স্পষ্ট করেছেন এভাবে-*"গৌড়বঙ্গের*

মহাসমৃদ্ধ রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল ময়ূরাক্ষী, মৌরী ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে।[৪] আবার অন্যস্থানে বলেছেন - *কর্ণসুবর্ণ নগরীর একদিকে ভাগীরথী ও অন্যদিকে ” ময়ূরাক্ষী ময়ূরীর সম্মিলিত ধারার দ্বারা পরিখাকৃত, তাই তাহার আকৃতি ত্রিভুজের ন্যায় ; উত্তরে প্রশস্ত, দক্ষিণে ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া সঙ্গমস্থলে কোনের আকার ধারণ করিয়াছে। নগরের উত্তর প্রান্তে বিস্তীর্ণ প্রাকার স্থলপথে নগরকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে।“*[৫]

প্রাচীন বাংলার বেশিভাগ মানুষ ভুমিকে নির্ভর করে তাঁদের জীবনজ-ীবিকা নির্বাহ করত। তাই উপন্যাসে উল্লিখ বেতসগ্রামে সকলেই ছিল ভূমিজীবী। তবে কর্মকার, কুম্ভকার, তুন্তবায় প্রভৃতি পেশার মানুষের বাসও ছিল। গ্রামটার মানুষের কৃষিকাজ ও গোপালন ছিল প্রধান পেশা। তারা জাতিধর্ম পালন করত অবসর সময়ে। -কারণ, বর্ণভেদ প্রথা তখনও প্রাচীন বাংলায় ততটা প্রকট হয়নি। মূলত উচ্চবিত্তের মধ্যে বর্ণভেদ যতটা ছিল গ্রামীণ নিম্নসমাজেততটা প্রখর ছিলনা। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস'(আদি পর্ব) গ্রন্থে প্রাচীন বাংলায় বর্ণব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন”–*গুপ্ত আমলে আর্যব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-বিন্যাস, ধর্ম, সংস্কার সংস্কৃতি এদেশে সম্যক স্বীকৃতই হয় নাই। ...সেন বর্মন আমলে একদশ) বর্ণসমাজের উচ্চস্তরে আর্যপূর্ব লোক সংস্কৃতির পরাভব প্রায় সম্পূর্ণ (দ্বাদশ শতকে “হয়।*[৬]শশাঙ্কের রাজত্বকালে প্রাচীন বাংলার সমাজ জীবনে বর্ণব্যবস্থা খুব একটা প্রখর ছিল না। তাই ঔপন্যাসিক বেতগ্রামের জাতিভেদ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন - “*গ্রামে জাতিভেদ বেশি প্রখর নয়, সকলে একত্র পানাহার করে; তবে বিবাহের সময় জাতি দেখিতে হয়। তাহাতেও খুব বেশি কড়াকড়ি নাই,...এই রূপ শৈথিল্যের কারণ, যে সময়ের কথা সে সময়ে জাতের বন্ধন বাঙালীর সর্বাঙ্গে এমন নাগপাশা হইয়া বসে নাই।“তাহাদের প্রাণে শিকড় গাড়িতে পারে নাই। বৈদিক সংস্কার এখনও...*[৭]

শুধু জাতি বা বর্ণ ভেদাভেদ নয়-, ধর্মেও প্রাচীন বাংলায় ততটা প্রখর ছিলনা। বস্তুত বৈদিক ও ব্রাহ্মন্য ধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্বে বাংলায় আদিম অধিবাসীদের ধর্মই অনুসৃত হত। অতুল সুর তাঁর ’বাঙালা ও বাঙালির বিবর্তনগ্রন্থে এই সম্পর্কে যা ‘ *দেবীর পূজা-নানারূপ গ্রাম্য দেব”* -বলেছেন তা স্মরণ করা যেতে পারে, *ধ্বজাপূজা, বৃক্ষের পূজা, যাত্রাযাতীয় পর্বাদি। যেমনস্নানযাত্রা-, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা প্রভৃতি এবং ধর্ম ঠাকুর, মনসা, শীতলা, জাঙ্গুলি, পর্ণশবরী প্রভৃতি পূজা ও অম্বুবাচী, অরন্ধন, পৌষপার্বন, নবান্ন ইত্যাদি সমস্তই আমাদের প্রাক্ আর্য জাতিসমূহের কাছে থেকে গৃহীত।*[৮] এই প্রাক্-আর্য ভিত্তির উপরই ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জৈন, আজীবিক, বৌদ্ধধর্ম, বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। এবং এই সমস্ত ধর্ম বহুদিন পাশাপাশি আচরিত হওয়ার ফলে কালের গতিতে আর্যপূর্ব ও আর্যপরবর্তী সংস্কার, বিশ্বাস, আচরণ পদ্ধতি পারস্পরিক মিলেমিশে গিয়েছে। একারণে বৌদ্ধমূর্তিও বৈদিক দেবদেবীর- মত পূজিত হয়েছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় গৌড়মল্লার উপন্যাসে প্রাচীন বাংলার ধর্মের সংমিশ্রণের

রুপটাই তুলে ধরেছেন *তখন কেবল একটি ধ্বজা দেবস্থানের অশ্বত্থ বৃক্ষতলে" - প্রোথিত থাকিত, ওই ধ্বজার মূলেই গ্রামের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদিত হইত। চাতক ঠাকুর তাঁহার আনীত মূর্তি দুটি ধ্বজার দুই পাশে বসাইয়া পূজা আরম্ভ করিয়া ছিলেন। মূর্তি দুটির একটি বুদ্ধমূর্তি এবং অন্যটি বিষ্ণু বিগ্রহ-সে জন্য কাহারও আপত্তি হইল না। বরং একসঙ্গে এক জোড়া দেবতা পাইয়া গ্রামবাসীরা উৎফুল্ল হইল। সেই সময় উপাস্য দেবতা লইয়া বেশি বাছ-বিচার ছিল না; পূজার পাত্র যাহোক একটা থাকিলেই - "হইল।"* এই বর্ণিত দেবস্থানের যিনি পূজারী সেই চাতক ঠাকুরের জাতি পরিচয়ও লেখক মিশ্রনীতি গ্রহণ করেছেন *তিনি ব্রাহ্ম" -ণ কি বৌদ্ধ তাহা কেহ জানে না।"*[১০] শুধু তার জাতি পরিচয়ই মিশ্র নয় তাঁর পূজা পদ্ধতি ও পূজার জন্য আনিত অর্ঘ্য উপকরণও মিশ্র বস্তুই পরিলক্ষিত হয় *অদ্ভুত মানুষ এই দেবস্থানের পূজারী" -; ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া এক হাতে দেবতার ফুল অন্য হাতে মৌরলা মাছ লইয়া ফিরিয়াছেন"।*[১১] এই ভাবেই শরদিন্দু প্রাচীন বাংলার মিশ্র জাতিকে তুলে ধরে সামাজিক বাস্তবতাকে স্বীকার - করেছেন।

প্রাচীন বাংলার প্রধান ভিত্তি ছিল কৃষিকাজ। তাই বাঙালির ঘরে ঘরে এই কৃষিকে কেন্দ্র করেই অধিকাংশ উৎসব-, পালাপার্বন অনুষ্ঠিত হত। যেমন পৌষপার্বন-, নবান্ন, হালচাষ, ইক্ষুপর্ব ইত্যাদি। এই ঐতিহ্যগুলি বাঙালির মর্জ্জায় জড়িয়ে আছে। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর কে কেন্দ্র করে নানা -গ্রন্থে এই রকম কৃষি 'বাঙালীর ইতিহাস' উৎসবের কথা তুলেধরেছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গৌড়মল্লার উপন্যাসে যে ন্দ্র করে এক আনন্দ বেতসগ্রামের কথা বলেছেন সেখানকার মানুষের ইক্ষুকে কে -উৎসবের চিত্র তুলেধরেছেন *"একদিন হেমন্তের পূর্বাহ্নে বেতমগ্রামে ইক্ষুপর্ব আরম্ভ হইয়াছিল।মাঠের কেন্দ্রস্থলে আজ ইক্ষুযন্ত্র ...আজ প্রথম আখ মাড়াই আরম্ভ।.... বুড়া -বসিয়াছে। ইক্ষুযন্ত্রের দেবতা পান্ডাসুর পূজা পাইয়াছে। তারপর গ্রামের ছেলে রম ...রুষ আনন্দে মাতিয়াছে।স্ত্রীপুণীরা নারিকেল ও বিল্বফলের খোলায় স্নিগ্ধ সফেন রস লইয়া সকলে পরস্পরকে দিতেছে। নিজেরাও গলাধঃকরণ করিতেছে। আজিকার রস হইতে গুড় হইবে না; সকলে কেবল রস পান করিয়া আনন্দ করিবে। যুবতীরা নাচিবে, প্রৌঢ়ার অশ্লীল গান গাহিবে, পুরুষেরা ঢোল ডুরকি বেণু বাজাইয়া যথেচ্ছা মাতামাতি করিবে। আজ কাহারও ঘরে হাঁড়ি চড়ে নাই।"*[১২] ঔপন্যাসিক তাঁর নিজস্ব সৃজনকৌশলে প্রাচীন বাংলার কৃষিজীবি মানুষের আনন্দ উৎসব বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রাচীন বাংলা সমাজ সংস্কৃতিকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন।

তৎকালীন প্রাচীন বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি মূলত কৃষিজাত দ্রব্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল ধান,আখ ও পাট। কিংবদন্তি আছে বাংলায় একসময় প্রচুর গুড় উৎপাদিত হতো বলেই গুড় থেকে নাকি বাংলার নাম হয়েছিল গৌড়। প্রাচীন কালে এই সব কৃষিকাজ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের মধ্যে দিয়ে প্রাচীন বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

গৌড়মল্লার উপন্যাসে সেই প্রাচীন বাংলার কৃষিজাত পন্য যে গ্রামীণ ভিত্তি ছিল তারই প্রতিছবি তুলে ধরেছেন-"*ধান্য ইক্ষু গোধন এই তিনটি গ্রামের প্রধান সম্পদ। ধান্য হইতে যে চাউল হয় তাহা গ্রামেই থাকে। বাঙালী চিরদিন অন্নভোজী জীব; ভাত তাহার অন্ন,ভাত তাহার পানীয়। বাঙালীই প্রথম ভারতে ভাত হইতে তীব্র পানীয় প্রস্তুত করতে শিখিয়েছিল। তারপর গোধন হইতে আসে ঘৃত নবনী ...; আর ইক্ষু হইতে গুড়। এই গুড়ই দেশের প্রাণবস্তু; গুড় হইতেই দেশের নাম গৌড়। আভীরগণ ঘৃত নবনী ও গুড় ভারে বহন করিয়া মৌরীর তীরপথ ধরিয়া ভিন্ন গ্রামে যায়, কখনও কর্ণসুবর্ণ পর্যন্ত উপস্থিত হয়। নগরে কড়ি কার্যাপন দ্রক্ষের বিনিময়ে পন্য বিক্রয় করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসে*"।[১৩]ঔপন্যাসিক এই ভাবেই গ্রামীণ অর্থনীতির চিত্র তুলে ধরেছেন। এবং এর পাশাপাশি নগরের অর্থনীতির প্রসঙ্গও এনেছেন। তবে নগরে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে বেশিরভাগই রজকর্মচারী। এছাড়াও স্বর্ণকার, ময়রা, পুরোহিত, চাটুকার,শৌন্ডিক প্রভৃতি প্রেশার লোকও নগরে রয়েছে। নগরের দক্ষিণে মৌরীর পরপারে অধিকাংশই নিম্নশ্রেণির লোকের বাসছিল। নগরে ফল ফুল শাক পত্র যোগান দিয়ে এরা জীবিকা নির্বাহ করত। প্রাচীন বাংলায় গ্রামীন ও নগরের পারস্পরিক দ্রব্য বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে যে একটি সমৃদ্ধ অর্থ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। তারই চাক্ষুস চিত্র বা বর্ণনা শরদিন্দু গৌড়মল্লার উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

প্রাচীন বাংলায় বিশেষ করে শশাঙ্কের আমলে গৌড়ের অর্থনীতির একটা বড় অংশ আসত বহির্বাণিজ্যের হাত ধরে। অর্থাৎ প্রাচীন বাংলায় স্থলপথে ও জলপথে বাইরের দেশ, বিশেষ করে ব্রহ্মদেশ, মলয় উপদ্বীপ,যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে-বহির্বাবাণিজ্য ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। সুক্ষ্ম মসলিন কাপড়, মুক্তা ও নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য ওই দেশগুলিতে বাংলা রপ্তানি করত। প্রাচীন বাংলার জলপথের প্রধান বন্ধর ছিল তাম্রলিপ্ত , যার বর্তমান নাম তমলুক। বাংলায় প্রাচীন নগরগুলি বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদারের কথা স্মরণ করা যেতে পারে - "*বাংলায় বহু নদকায় শিল্নদী থা-পজাত দ্রব্যাদি দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণের যথেষ্ট-সুবিধা ছিল। এ কারণে বাংলার নানা স্থানে হাট ও গঞ্জ এবং নূতন নূতন নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্থলপথে যাইবার জন্য বড় বড় রাস্তা ছিল।বুঝা যায় যে শিল্প ও বাণিজ্য .... "হইতে রাজ্যের যথেষ্ট আয় হইত।*"[১৪]গৌড়মল্লার উপন্যাসে সমৃদ্ধমান কর্ণসুবর্ণ নগরীর বর্ণনা, গঙ্গার ধারের ছোট বড় ঘাটের বর্ণনায়, হাতিঘাটের বর্ণনায়, হাটও সেই স্থানের জিনিসপত্রের বর্ণনায়, ঘাটের সামনে বেঁধে রাখা অগনিত সমুদ্রগামী বাণিজ্যতরীর বর্ণনায় ও বরুণ দত্তের পুরুষানুক্রমে সমুদ্রগামী ব্যবসায়ী বৃত্তির পরিচয় ঔপন্যাসিক যে ভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে প্রাচীন বাংলার শিল্পবাণিজ্যের সমৃদ্ধমান অর্থনৈতিক - ব্যবস্থার কেসূচিত করে। অর্থনৈতিক যেমন সমাজ, দেশ, আইন, রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে শক্ত ভিত্তের উপর দাঁড় করাই তেমনি অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ, অনিয়ন্ত্রিত

প্রশাসনিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে স্তব্ধ করে দেয়। শশাঙ্কের রাজাত্বকালের শেষের দিকে গৌড়ের ক্ষমতা নিয়ে যে রাজনৈতিক অচল অবস্থা তৈরী হয়েছিল, তাতে রাজ্যের বাণিজ্য থেকে জনজীবন এক অন্ধকার গুহার মুখে পতিত হয়েছিল। তারই বাস্তব চিত্র ঔপন্যাসিক উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন-*ড়ের নৌগত বিশ বছরে গৌ" - বাণিজ্য ক্রমশ সংকুচিত হইয়া দক্ষিনে সিংহল ও পূর্বে সুবর্ণভূমি পর্যন্ত দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহাও বুঝি আর থাকে না। আরব জলদস্যুদের দুর্নিবার অভিযান বঙ্গোপসাগরের জল তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে।বাংলার বন্দরে বন্দরে বাঙ্গালীর নৌ...-বাহিনী পঙ্কবদ্ধ হস্তিমূথের ন্যায় নিশ্চল; নদীর মোহনা পার হইয়া সাগরের নীল জলে ভাসিবার সাহস কাহারও নাই।"*[১৫]গৌড়ের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব শুধু নৌবাহীনিতে পড়েছিল তা নয়। প্রায় সমগ্র রাজ্যে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল । ফলে গ্রামীন অর্থনীতিতে নেমে এসেছিল ভাঁটা *"গ্রামবাসীরা আর গ্রামের বাহিরে যায় না।গ্রামের গুড় বাহিরে বিক্রয় .... হয় না। স্বর্ন রৌপেরচলন দেশ হইতে ধীরে ধীরে লুপ্ত হইতেছে; দ্রক্ষ কর্ষাপন দিয়া কেহ আর সহজে পন্য কেনে না;কড়ি এখন প্রধান মুদ্রার স্থান অধিকার করিয়াছে।"*[১৬]

কোনও একটি রাজ্য বা দেশ যখন উন্নতির শিখরে পৌঁছায় তখন সেই রাজ্য বা দেশ কে অন্য শক্তিধর রাজ্য বা দেশ দখল করতে তৎপর হয়। শুরু হয় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। তৈরি হয় অস্থির রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ভেঙে পড়ে অর্থনীতি থেকে শাসন ব্যবস্থা। ইতিহাস একথা স্বীকার করে যে শশাঙ্কের আমলে গৌড়ের রাজ্য সীমা যেমন বেড়েছিল তেমনি গৌড় দেশ হয়ে উঠেছিল অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধমান। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর গৌড়ের সিংহাসন দখল নিয়ে হর্ষবর্ধন, ভাস্করবর্মা ও জয়নাগ যেভাবে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগী হয়ে উঠেছিল তাতে গৌড়ের গৌরব বিশিষ্ট হতে বেশি দেরি লাগেনি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গৌড়মল্লার উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে প্রাচীন বাংলার এই অস্থির রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেই বেছে নিয়েছেন। উপন্যাসে দেখতে পাই শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মানবকে পরাজিত করে ভাস্করর্মা গৌড়ের রাজা হন। পরে ভাস্করবর্মার মৃত্যুতে তাঁর পুত্র অগ্নিবর্মা গৌড়ের সিংহাসনে আসীন হন। কিন্তু অগ্নিবর্মা রাজকার্য বিসর্জন দিয়ে ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে পড়েন। অন্তপুরকে ভোগমন্দিরে পরিণত করে, প্রতি নিয়ত বিভিন্ন রাজপুরুষদের সঙ্গে কোন্দলে জড়িয়ে পড়েন ও বিলাসব্যাসনে অতিরিক্ত অর্থ ব্যায় করে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় তাও উঠে এসেছে - *অগ্নিবর্মা ইন্দ্রিয়াসক্ত"; কুকর্মনিরত, রাজকার্য দেখে না।... রাষ্ট্রের অবস্থা ঘুন-চর্বিত কাষ্ঠের ন্যায়। অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য দুইই উৎসন্নে গিয়েছে। প্রজার মনে সুখ নেই-, ধর্মজ্ঞানও লুপ্তপ্রায়। শশাঙ্কদেবের মৃত্যু পর থেকে দেশের এই দুর্দিন আরম্ভ হয়েছে।"*[১৭] দেশের যখন এই অবস্থা তখন অন্য কেউ এই সুযোগের সৎব্যব-হার করবে। আর ঠিক তাই হল। দক্ষিণের রাজা জয়নাগ কর্নসুবর্ণ হস্তগত করতে নানা কৌশলে নানা জায়গায় গুপ্তচর স্থাপন করেন। অন্যদিকে একই সুযোগ নিয়ে শশাঙ্কদেবের একসময়ের মন্ত্রী কোদণ্ড মিশ্র মানবদেবের পুত্র বজ্রকে নিয়ে রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটবার ষড়যন্ত্র করতে

থাকে। কোদণ্ড মিশ্রের নির্দেশে অন্তরঙ্গ বন্ধু অর্জুনসেন অগ্নিবর্মাকে বিষপান করিয়ে মৃত্যু ঘটান ও রাণী শিখরিনীকে সেনাপতি কোকর্মার হাতে তুলেদেন। এই ভাবে একদিনের জন্য বজ্র গৌড়ের রাজা হলেন ঠিকই, কিন্তু জয়নাগকে গৌড়ের সিংহাস ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল বজ্র। আসলে ঔপন্যাসিক এই ধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতা চিত্র তুলে ধরে ইতিহাসের ভিতর দিয়ে সেই সময়কার বাংলার সাধরণ মানুষকে ধরতে চেয়েছেন। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে কী ভাবে বাংলার অনাবিল, নিস্তরঙ্গ, শান্ত জীবনযাত্রা সম্পন্ন মানুষগুলি জীবনে স্থবিরতা এনেছিল তা রূপদান করেছেন উপন্যাসে। অর্থাৎ সমকালীন রাজনীতির ইতিহাসের আঁচে মানুষের যাপিত জীবনকে সেঁকে প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাসকে নবরূপে বিনির্মাণ ঘটিয়েছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

শেষের কথা :

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গৌড়মল্লার' উপন্যাসটি আলোচনা সূত্রে এটুকু বুঝতে সক্ষম হয়েছি যে, তাঁর এই উপন্যাসটাতে যে সমস্ত ইতিহাস চিহ্নায়ক ব্যক্তিবর্গের কথা নাম মাত্র আছে, তার মধ্যে প্রধান হয়ে উঠেছে বজ্র নামক কল্পিত চরিত্রটি। এই বজ্র চরিত্রকে শরদিন্দু কী অসাধারণ কল্পনা শক্তি ও সৃজনি দক্ষতার দ্বারা ইতিহাস চিহ্নায়ক চরিত্রের সঙ্গে যোগ তৈরি করে এক ইতিহাস বিশ্রুত চরিত্রে পরিণত করেছেন। আর তাই আমাদের মনে হয় না ইতিহাসে বজ্র নামক কোন শশাঙ্কের পৌত্র ছিল না। এখানেই একজন সাহিত্যিক ইতিহাসের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েও নিজস্ব কল্পনা ইতিহাস নির্মাণ করেন। যা কখনো অবাস্তব বলে মনেই হয় না। কারণ তিনি যা নির্মাণ করছেন, তা ঐ ইতিহাস কালের নিরিখেই। কিন্তু ঔপন্যাসিকের নিরীক্ষণ শুধু 'পাথুরে ইতিহাস' নয়। তাই 'গৌড়মল্লার' উপন্যাসে প্রচল ইতিহাসে ঢাকা পড়ে যাওয়া এক প্রাচীন বাংলার প্রান্তিক গ্রাম যেমন পুরো কাহিনির ধারক হয়ে আছে, তেমনি সেই গ্রামের শান্ত, নিস্তরঙ্গ যাপিত জীবনের মানুষজন অনাবিল জীবনধারা উপন্যাসটির থিম হয়ে উঠেছে। আসলে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 'পাথুরে ইতিহাস' -এর মধ্যে প্রাণের ইতিহাস সন্ধান করেছেন। তাই উপন্যাসটি একটি সামগ্রিক সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচায়ক হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :

১. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শরদিন্দু অমনিবাস', তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৪০৪, পৃ. ৬৬২

২. ঐ, পৃ. ১৩১

৩. ঐ, পৃ. ১৩১

৪. ঐ, পৃ. ১৩১

৫. ঐ, পৃ. ১৯৪
৬. নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙালীর ইতিহাস', আদি পর্ব, দ্বিতীয় সং, কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১৭
৭. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩
৮. অতুল সুর, 'বাঙালা ও বাঙালির বিবর্তন', ৩য় সং, কলকাতা: সাহিত্যলোক, ২০০১, পৃ. ১১২
৯. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩
১০. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩
১১. ঐ, পৃ. ১৪২
১২. ঐ, পৃ. ১৩৩
১৩. ঐ, পৃ. ১৩২
১৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, অষ্টম সং, কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৮৮, পৃ. ২০০
১৫. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬
১৬. ঐ, পৃ. ২৬৯
১৭. ঐ, পৃ. ১৯১

গ্রন্থপঞ্জি :

অতুল সুর, 'বাঙালা ও বাঙালির বিবর্তন', ৩য় সং, কলকাতা: সাহিত্যলোক, ২০০১
অশীন দাশগুপ্ত, প্রবন্ধসমগ্র, উমা দাশগুপ্ত (সম্পা) কলকাতা, ২০১৬
নিতাই বসু, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, গ্রন্থতীর্থ, ২০০৬
নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙালীর ইতিহাস', আদি পর্ব, দ্বিতীয় সং, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ১৪০২
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, দেজ পাবলিশিং, ১৩২১
রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, অষ্টম সং, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৮৮
বিজিত দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ
ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থনিলয়, ২০১৫
ক্ষেত্র গুপ্ত, রমনীয় শরদিন্দু, কলকাতা, গ্রন্থনিলয়, ১৪০৮
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শরদিন্দু অমনিবাস', তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৪০৪

পরিমল গোস্বামীর 'মারকে লেঙ্গে' : এক সংকীর্ণ সময়ের প্রতিচ্ছবি

সুকান্ত চ্যাটার্জি
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ :- পরিমল গোস্বামী মূলত একজন দক্ষ সম্পাদক হিসাবে পরিচিত হলেও বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশ করেন প্রবন্ধ ও গল্প রচনার মধ্যে দিয়েই। একদিকে কল্লোল গোষ্ঠী এবং অন্যদিকে 'শনিবারের চিঠি'র দলের বিরোধের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ, পরবর্তীতে শনিবারের চিঠির সম্পাদকও হন। তাঁর লেখা গল্পে সমকালীন সমাজ জীবনের নানান ছবি ফুঠে ওঠে। একদিকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আকাঙ্খা, মানুষের আশা-নিরাশার ছবি যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি কাঙ্খিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী সময়পর্বে মানুষের হতাশা, দুর্দশার ছবিও তিনি তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশভাগের মতো করুণ পরিস্থিতির, শুরু হয়েছে ধর্মে ধর্মে বিরোধ। দাঙ্গা নষ্ট করেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ প্রকট হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ে সমকালীন কলকাতার ছবি তুলে ধরেছেন লেখক। জায়গায় জায়গায় কালোবাজারি, চোরাকারবারির মতো ঘটনা সামনে এসেছে। পকেটমারে দেশ ছেয়ে গেছে। দেশভাগকে কেন্দ্র করে মাথাচাড়া দিয়েছে দালালরাজ। মানুষ বড়ো বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। নৈতিক অবক্ষয়ের এক করুণ ছবি দেখা গেছে পরিমল গোস্বামীর 'মারকে লেঙ্গে' গ্রন্থের গল্পগুলোতে। গল্পগুলিতে সমকালীন সংকীর্ণ সময়ের ছাপ স্পষ্ট।

সূচক শব্দ :- দক্ষ সম্পাদক – নিজস্ব স্বকীয়তা – ইতিহাসবোধ – রাজনীতি – স্বার্থপরতা – ধূর্ততা – প্রতিবাদ – ব্যঙ্গ – জাতীয়তাবাদীচেতনা – মুনাফালোভী – চোরাকারবার – গণরোষ – আপেক্ষিকতা – সর্বমানবচিত্তরঞ্জনকারী – আর্ট – দাঙ্গা – সাম্প্রদায়িকতা – সৌভ্রাতৃত্ব – দালালরাজ – নৈরাশ্যবাদী – সম্প্রীতি – নৈতিক অবক্ষয় – হৃদয়গ্রাহী – বিচারসম্পৃট।

পরিমল গোস্বামী একজন সম্পাদক, সুলেখক হিসাবে পরিচিত। চিত্রকলা, ফটোগ্রাফির উপর তার উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ পিতা বিহারীলাল গোস্বামীর হাত ধরেই। বাবার কথা মত প্রথমে খবরের কাগজে লেখার চেষ্টা করেন, পরবর্তীতে পিতার নির্দেশেই প্রুফ দেখার কাজে মনোনিবেশ করেন। 'উপাসনা' পত্রিকায় ১৩২৭ সালে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ব্যঙ্গ গল্পের সূত্রপাত ঘটান মাসিক 'বসুমতী' পত্রিকায়। একদিকে 'কল্লোল' গোষ্ঠী এবং অন্যদিকে 'শনিবারের চিঠি'র দলের

সাহিত্যিক বিরোধ বিতর্কের আবহাওয়ায় পরিমল গোস্বামী তাঁর নিজস্ব স্বকীয়তার পরিচয় রেখেছেন। পরবর্তীতে দেখা যায় শনিবারের চিঠি'র সম্পাদনার দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর কাঁধে। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদনা করতে গিয়ে এমন এমন সময় গেছে যখন প্রবন্ধ, গল্প, সংবাদ, সাহিত্য পর্যন্ত তিনি লিখেছিলেন। ইতিহাসবোধ, সমকালীন রাজনীতি সম্পর্কে সচেতনতা এবং সেই বিশ্বের পটভূমিকায় বাঙলা ও বাঙালির ছবি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

১৯৪৪-৪৫ এর সময় থেকেই দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমকালীন জীবনযাপনের মধ্যে দুর্নীতি, প্রতিবাদের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অসততা, স্বার্থপরতা, ধূর্ততা সংবেদনশীল লেখকের মনকে পীড়িত করে। বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা আসে ১৯৪৭ এ। স্বাধীনতা শুধু একা আসেনি, সঙ্গে নিয়ে আসে খন্ডিত ভারতের নির্মম বাস্তবতাকে। প্রাপ্ত স্বাধীনতা মানুষের আশা-আকাঙ্খাকে কতটা নিরসন করতে পেরেছিল সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। প্রত্যাশিত 'স্বাধীনতা' কারোর প্রত্যাশাই মেটাতে পারেনি। প্রাপ্ত স্বাধীনতায় জাতীয়তাবাদী চেতনার বদলে সাম্রাজ্যের অহংকারই যেন ধ্বনিত হল। মানুষ আহত হতে থাকল প্রতিদিন, প্রতিরোধের জন্য আঘাত করতে চাইল প্রতিক্ষণ। পরিমল গোস্বামী ঠিক এমনই কঠিন সময়ে তার লেখনীর মধ্যে দিয়ে সমকালীন সমাজজীবনের নানান প্রতিকূল পরিস্থিতির কথা বলেছেন। ১৯৩২ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, ১৯৭৩ পর্যন্ত তিনি নিজস্ব রচনাও গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। উপন্যাস এবং কবিতা ছাড়া সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগেই তাঁর দক্ষতা ছিল সহজ ও সাবলীল।

পরিমল গোস্বামীর রচনায় উঠে এসেছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগের এবং পরের বিভিন্ন ঘটনা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগের মানুষের চাহিদার, সমস্যার যে ছবি ফুটে উঠেছে তা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে বিশেষ কিছু বদল হয়নি। তাঁর রচনায় উঠে এসেছে সমকালীন বাজার অর্থনীতির প্রসঙ্গ, এসেছে কালো-বাজারির কথা, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার কথা ইত্যাদি। কলকাতায় কীভাবে দিনের পর দিন মুনাফালোভী, চোরাকারবারিদের বারবারন্ত বেড়ে উঠেছে তার কথাও এসেছে। পরিমল গোস্বামীর 'মারকে লেঙ্গে' গ্রন্থটি প্রকাশ পায় আষাঢ়, ১৩৫৭ / জুলাই,১৯৫০ সালে। গল্পের সংখ্যা ৩০টি। গ্রন্থের শুরুতেই ভূমিকা অংশে লেখক বলেন- "মারকে লেঙ্গে নীতি বর্তমান নীতি। এই নীতিই প্রতিফলিত দেখা যাবে এই গল্পগুলোতে।"[১] মানুষের কাছ থেকে কীভাবে কী উপায়ে সব কিছুকে ছিনিয়ে নেওয়া যায়, মানুষকে কীভাবে প্রতিনিয়ত ঠকিয়ে তার সমস্ত মূল্যবান সম্পদকে আত্মসাৎ করা যায় এই লোভ মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। গ্রন্থের প্রথম গল্পটির নাম- 'মারকে লেঙ্গে'। যা দীপেন্দ্রকুমার সান্যালের 'অচল পত্র' পত্রিকায়, ১৯৪৭ সালে প্রকাশ পায়। গল্পের শুরুতে দেখা গেছে কলকাতার বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার মাসখানেক ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাদের লুকিয়ে থাকবার সম্ভাব্য কারণ হিসাবে লেখক পরিমল গোস্বামী যে যে সম্ভাবনার কথা বলেছেন তাতে পরোক্ষে

সমাজের প্রচলিত অবস্থার প্রতি সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ প্রতিভাত হয়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের মানুষরা যে চোরাকারবারি শুরু করেছেন তাতে যেকোনো মুহূর্তে তাদের ধরা পড়বার যে ভয় কাজ করছে তাকে দেখানো হয়েছে। তবে মালিকদের ভয় চোরকারবার ধরা পড়বার জন্য নয়, ধর্মঘটীদের অনমনীয় অবস্থানের জন্যও নয়, কোনো পাওনাদের জন্য নয়, এই ভয় কোনো নতুন আইন প্রণয়ণের জন্যও নয়, আদতে এই ভয় 'বিজ্ঞাপন'-এর। সদ্য গজিয়ে ওঠা পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন চেয়ে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকল ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মালিক শ্রেণির দ্বন্ধ। যা একপ্রকার যুদ্ধের রূপ নিয়েছে। লেখক ব্যঙ্গ করে বলেছেন- "শহরে এক নতুন শক্তির উদ্ভব হয়েছে। এই শক্তি নির্মম, নিষ্ঠুর, দুর্বার।এই শক্তি শুধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধেই মাথা তুলেছে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তার কাছে অসহায়।"[২] গল্পটি লেখার সময় বাংলা ভাগ হয়ে গেছে। বিজ্ঞাপনের বারবারন্তকে এই গল্পে দেখানো হয়েছে। প্রচুর নামি-অনামি কাগজ সেই সময় বের হচ্ছে এবং প্রত্যেকের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীদের উপর চলছে জুলুমবাজি। তারা বাধ্য হচ্ছে পত্রিকার সঙ্গে কনট্রাক্ট সই করতে। সম্মিলিত গণরোষের মধ্যে থেকে ভেসে আসছে এক ধ্বনি –'মারকে লেঙ্গে বিজ্ঞাপন'।

'পূর্ণিমা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'অভিনেতা গাধা' গল্পটি। গল্পে গাধা ও বাঘের কাল্পনিক বাক্য বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে বাঙালি সমাজে মানুষের কদর্য দিকগুলির প্রতি নির্দেশ করে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। গাধার জবানিতে লেখক মানুষের কথা বলতে গিয়ে বলেন- "মানুষ নিজেই নিজের পরিচয় জানে না, কারণ সাধুতা, অ-সাধুতা, ন্যায়-অন্যায় কথাগুলি সবই আপেক্ষিক। ক্ষেত্রভেদে অর্থ করতে হয়। কোনো অর্থই Absolute নয়। তার মন অত্যান্ত জটিল, তার আদি-অন্ত নেই। আর এই জটিলতাই তাকে শিল্পীতে পরিণত করেছে।"[৩] মানুষের মধ্যে কোন গুণটি বড়ো মনে হয়েছে ?- এই প্রশ্ন করায় উত্তরে গাধা বলে,-"একটি মানুষ যখন আর একটি মানুষকে এক্সপ্লয়েট করে এটিই তাদের সবচেয়ে বড়ো গুণ।"[৪]

'উদ্দেশ্যমূলক গল্প' প্রকাশিত হয় 'পাথেয় পত্রিকা'য়। 'সর্বমানবচিত্তরঞ্জনকারী' এবং সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যবিহীন আর্ট হল- যাদুবিদ্যার আর্ট। গল্পটি প্রকাশ পায় ১৯৪৬ সালে। কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শেষ হয়েছে এমন সময়ে গল্পটি লেখা। কলকাতার রাস্তায় পকেটমারের উপদ্রব যে কী ভয়ানক হারে বেড়েছে তার কথা আছে। লেখকের মতে, যে যাদুকর রঙ্গমঞ্চে যাদুবিদ্যা দেখিয়ে পকেটের পয়সা টিকিট ঘরের মারফৎ মারেন তিনি বিশুদ্ধ আর্টের শ্রষ্ঠা। আর যিনি কোনো ভূমিকা ছাড়াই ক্ষিপ্র অঙ্গুলি চালনার সাহায্যে সোজাসুজি পকেটে হাত দিয়ে পয়সা মারেন তিনি উদ্দেশ্যমূলক আর্টের শ্রষ্ঠা। গল্পে দেখা যায়, গল্পকার ২ ঘন্টার মধ্যে ২টি পকেটমারের সংশ্রবে এসেছেন। একটিকে তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন, আর একজনকে তিনি প্রশ্রয় দিতে পারেননি। প্রথম যাকে লেখক প্রশ্রয় দিয়েছেন তিনি হলেন দোকানি, লেখক যার কাছে ২৫ টাকার ফাউন্টেন পেন,

৪৫ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করেন। কলমটি নিয়ে বাসে উঠে যিনি কলমটি পকেট থেকে নিয়ে হাওয়া হয়ে যান তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি।

১৯৪৭ এ 'বর্তমান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'এক হো' গল্পটি। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির একেবারে সন্ধিক্ষণে লেখা গল্পটি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগেই যখন দেশভাগের পরিকল্পনা সামনে এসে পড়ে তখন শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সমকালীন সংবাদ পত্রের প্রতি পাতায় উঠে আসে বিচ্ছিন্নতার ছবি, দাঙ্গার ছবি, অত্যাচারের ছবি। এমনই এক প্রেক্ষাপটে কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকা গল্পের চরিত্র বৃন্দাবনের মন পড়ে থাকে পূর্ব পাকিস্থানের পাবনায় অবস্থিত তার পরিবারের জন্য। বৃন্দাবন চায় স্বাধীনতার আগেই স্ত্রী এবং সন্তানদের কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। বৃন্দাবনের মনে দ্বিধা কাজ করে যে সে গেলে আর ফিরে আসতে পারবে না। দিন চলে যায়, আসে বহু প্রতিক্ষীত ১৫ই আগষ্ট। দেশ স্বাধীন হয়। সব শান্ত। কলকাতায় ফিরে এসে শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে বউবাজার অবধি দাঙ্গার ছবি বৃন্দাবনের মনে ভেসে ওঠে। একদিকে 'বন্দে-মাতরম' ধ্বনি তো অন্যদিকে 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি। দুটো মিছিলের মাঝে পড়ে যায়, বৃন্দাবনের মুখ থেকে বের হয় 'বন্দে-আলি' ধ্বনি। বৃন্দাবন সম্ভাব্য প্রাণহানির কথা ভাবতে ভাবতে ভাবলেসহীন হয়ে পড়ে। এমন সময় দেখতে পায় একদল মুসলমান তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, দেখে যে সবাই একে একে কোলাকুলি করছে। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আজ সবাই ঐক্যবদ্ধ। কারোর মনে কোনো দ্বন্ধ নেই, বিভেদ নেই। হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই। গল্পে লেখক এই লোকদেখানো ভ্রাতৃত্ববোধকে ব্যঙ্গ করেছেন।

'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত 'গুহ এন্ড পাল' গল্পে দেখি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে দেশবিভাগের মতো বিষয় যেমন উঠে এসেছে, তেমনি পাঞ্জাব ও পূর্ব পাকিস্থান ভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গের জমির দর কীভাবে হু হু করে বেড়েছে সেটিই দেখানো হয়েছে। বাদা অঞ্চলের একটি প্লটে ২৫ বিঘা পতিত জমি গোবর্ধন গুহ এবং প্রদ্যোত পাল নিতান্তই মাটির দরে পেয়ে দেশের দুঃখমোচনের কাজে যুক্ত হবে বলে ঠিক করে। জমিটা তারা পেয়ে যায় জলের দরে, মাত্র ৫০০ টাকায়। দেশভাগের পরে সেই ২৫ বিঘা জমি ৫০০ খন্ডে ভাগ করা হলো। প্রতি খন্ডে ১ কাঠা। প্রতি কাঠার মূল্য নির্ধারিত হল ৪০০ টাকা। ব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে সমকালীন দালালরাজকে কটাক্ষ করা হয়েছে গল্পে।

'পরাধীনতার ফল' গল্পে (বসুমতী/১৯৪৪) স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে যে যে বিষয় সাধারণ মানুষের চোখে প্রকট হয়ে উঠেছিল তাই নিয়েই গল্পটি। গল্পের চরিত্র মহাদেব বাবু বলেন, বহুদিন কোনো জাতি পরাধীন থাকলে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি তার নষ্ট হয়ে যায়। আপাত লাভকেই সে সবচেয়ে বড়ো লাভ বলে মনে করে। তিনি পরাধীন দেশের বিভিন্ন সমস্যার দিকে আঙুল তুলেছেন, যেমন- ধর্মের নামে জোচ্চুরি, চোরাবাজারের বারবারন্ত, দাম দিয়েও খাঁটি জিনিস না পাওয়া, জিনিসে ভেজাল, ছাত্রদের পড়াশোনায়

ফাঁকি, যানবাহনের প্রতি অনিয়ন্ত্রন, নির্দিষ্ট ভাড়া না থাকা, ঘুষ দিয়ে ট্রেন চড়া ইত্যাদি। এত কিছুর অপ্রাপ্তির কথা বলেও তিনি নিজেকে নৈরাশ্যবাদী বলতে নারাজ, কারণ তিনি বলেন দেশ স্বাধীন হবে, দেশের লোক এই হীনতা থেকে মুক্তি পাবে, এই বিশ্বাস দৃঢ় বলেই তিনি সমস্ত দোষ-ত্রুটি এমনভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন।

'ভোজবাজি' গল্পটি প্রকাশিত হয় বসুমতী পত্রিকায় ১৯৪৭ সালে। গল্পের শুরু ২৫ আগষ্ট ১৯৪৭ সালের ঘটনা। ১০ দিন আগে ভারত-পাকিস্থান ডমিনিয়নের পত্তন হয়েছে। কাশীপুরে গঙ্গার ধারে এক বস্তী। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সবে শেষ হয়েছে। এক নৌকায় এক মুসলমান যাত্রী এবং একজন রুগ্ন নিরাশ্রয় হিন্দু লোক। তাদের পরস্পরের কথায় উঠে এসেছে দাঙ্গার কথা, দামোদরের বন্যার কথা। তারা দুজনেই হাওড়া যাবেন, তারপর বর্ধমান। কথাবার্তায় জানা যায় মুসলমান লোকটি আর কেউ নন, তিনি খোন্দাকার সাহেব, যিনি দাঙ্গার সময় নিজের বাড়ি পর্যন্ত হিন্দুদের দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পত্তি হিন্দুদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি চলেছেন তার কলকাতার আস্তানা ছেড়ে বর্ধমানের ঠিকানায়। পরে মুসলমান লোকটি মুমুর্ষ হিন্দু লোকটির পরিচয় জানতে চাইলে তিনি তার পরিচয় দিয়ে বলেন, তার নাম বিজয় চট্টরাজ। সার্কুলার রোডের একমাত্র সম্বল বাড়িটি তিনি মুসলমানদের দান করে দেন। খোন্দাকার সাহেব বলেন- "আপনি মহাপুরুষ বিজয়বাবু, আপনি রাজা ছিলেন, ফকির হয়ে বস্তিতে উঠেছিলেন – সব শুনেছি আমি, সব মনে পড়েছে আমার।"[৫] একে-অপরকে আলিঙ্গন করেন, গল্পের সমাপ্তি ঘটে। দাঙ্গার ভয়াবহতার মধ্যেও যেন সম্প্রীতির এক সুন্দর ছবি তুলে ধরেছেন লেখক আলোচ্য গল্পে।

পরিমল গোস্বামীর 'মারকে লেঙ্গে' গ্রন্থের গল্পগুলো থেকে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে বেশিরভাগ গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি কেন্দ্রিক নানান সামাজিক পরিস্থিতি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কথা আছে, দাঙ্গা বিধ্বস্ত সময়ের ছবি আছে, মূল্যবৃদ্ধি, চোরাকারবারিদের জুলুম, নৈতিক অবক্ষয়ের ছবি ধরা পড়েছে বেশ কিছু গল্পে। 'মারকে লেঙ্গে'র একেবারে শুরুতেই লেখক জানান, - "অধিকাংশ গল্পের বিষয় বস্তুতেই রচনা-সময়ের ছাপ পড়েছে,-কিন্তু এই সময়ের ছাপ একটু স্বতন্ত্র। কারণ মারকে লেঙ্গেতে যে সময়ের ছাপ পড়েছে তা সংকীর্ণ সময়ের।"[৬] পরিমল গোস্বামী সর্বদাই প্রচার বিমুখ থেকেছেন, তাই তিনি বলেন- "জাত-গল্প-লেখকদের লেখায় যুগের ছাপ পড়ে, এগুলোতে আছে হুজুগের ছাপ।...দ্রুত পরিবর্তনশীল সব হুজুগের পটভূমিতে একটি একটি রচনা জন্মলাভ করেছে।"[৭]

পরিমল গোস্বামীর সাহিত্যকৃতির কথা বলতে গিয়ে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, "একদিকে তিনি সমাজ ও ব্যক্তির চর্য্যা ও চরিত্রের প্রকাশময় কথাসাহিত্যের রচক, অন্যদিকে তিনি বাহ্যত লঘুভাবে রচিত, প্রকট বা প্রচ্ছন্ন হাস্যরসের শুভ্রতায়

উজ্জ্বল, ব্যষ্টি ও সমষ্টির চরিত্র ও চর্য্যার সকৌতুক ও সানুকম্প সমালোচনায় যাহা একাধারে হৃদয়গ্রাহী ও চিন্তোত্তেজক, সেইরূপ বিচার-সম্পূটের প্রবর্তক।”[৮]

পরিমল গোস্বামীর ‘মারকে লেঙ্গে’ গ্রন্থের গল্পগুলিতে দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সামনে এনে পাঠককে সচেতন করে তুলে লেখক যেন সামাজিক দায়িত্বই পালন করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. মারকে লেঙ্গে/পরিমল গোস্বামী/রীডার্স কর্ণার/৫ শঙ্কর ঘোষ লেন/কলকাতা ৬/প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৫৭/ভূমিকাংশ।
২. ঐ/পৃষ্ঠা- ১
৩. ঐ/পৃষ্ঠা-১২-১৩
৪. ঐ/পৃষ্ঠা-১৩
৫. ঐ/পৃষ্ঠা-১০৫
৬. ঐ/ভূমিকাংশ
৭. ঐ/ভূমিকাংশ
৮. পরিমল গোস্বামীর জীবন ও সাহিত্য/ড. প্রতীপ মজুমদার থেকে উদ্ধৃত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি/পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ,১৪০৫/ পৃষ্ঠা-১৩০

সংস্কৃত সাহিত্যে বিজ্ঞানমনস্কতা : একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

দেবশ্রী গিরি
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ,
বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়, পূর্বমেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ (Abstract) : ভারতীয় সভ্যতা প্রাচীন, সমুন্নত ও সমৃদ্ধ সভ্যতা। ভারতবাসীরূপে আমরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ভারতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতির গরিমা আজও স্মরণ করি এবং বিশ্বসভ্যতার প্রাঙ্গণে ভারতীয় সভ্যতার উজ্জ্বল দীপবর্তিকা সগৌরবে প্রতিষ্ঠা করি। ভারতীয় ভাষাসমুহের মধ্যে সংস্কৃত অতি প্রাচীন কালেই সর্বভারতীয় ভাষারূপে স্থান অধিকার করেছিল এবং ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারকও বাহকরূপে পরিচয় দিয়েছে। সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, পরিবেশ, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, শিক্ষাদীক্ষা, নৃত্য-গীতাদি, বানিজ্য, কৃষিকার্য প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করলে সংস্কৃত সাহিত্যের অগ্রগতিও পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক সাহিত্য, বেদোত্তরযুগের খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিকদের সৃষ্টিসম্ভার সংস্কৃত সাহিত্যের অগ্রগতিকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। সংস্কৃত কবি-সাহিত্যিকদের রচনায় কেবলমাত্র সর্বকালের প্রচলিত বিষয়গুলি যেমন- সমাজ, রাজনীতি, দর্শন, অর্থনীতি; সাহিত্যতত্ত্বের বিষয়গুলি যেমন ছন্দ, অলংকার, রস, গুণ, ইত্যাদি ছাড়াও কিছু ভিন্ন ধরণের বা ভিন্ন স্বাদের বিষয়ও তাদের তুলিকার সাহায্যে চিত্রিত করেন যেগুলি দৃষ্টিগোচর করে পাঠকসমাজ ভিন্নস্বাদের রসে আপ্লুত হন। সেইরকম ভিন্নস্বাদের একটি বিষয় হল বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনা যা সংস্কৃত সাহিত্যে মোটেই বিরল নয়।

প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু হল বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে রামায়ণ-মহাভারত, পরবর্তী কবি-সাহিত্যিকদের রচনায় প্রতিফলিত বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলিকে তুলে ধরা এবং আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করা। বৈদিক ঋষিগণ কেবল দেবতাদের খুশী করার জন্যই ব্যস্ত ছিলেন, বিজ্ঞান সম্পর্কে একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিলেন –এ ভ্রান্ত ধারনার অবসান ঘটবে প্রবন্ধটি পাঠ করলে। সর্বোপরি চিকিত্সাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনার দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যের আধুনিকতার দিকটি তুলে ধরা এই প্রবন্ধের প্রচেষ্টা।

মূল শব্দাবলী (Keywords) : বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, বায়ুমণ্ডল, পরমাণু, পরিবেশ।

মানুষের জ্ঞানের পরিধি যেমন অসীম, জ্ঞানের বিষয়ও তেমনি অনন্ত। একে বলা হয় 'Univers of Knowledge' এবং 'Univers of Subjects'। ভাষা আমাদের সর্ববিধ

জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধিকে প্রকাশ করতে সক্ষম। সংস্কৃতভাষা অতি প্রাচীনকালেই সর্বভারতীয় ভাষারূপে বিদ্বানগোষ্ঠীর আনুকূল্যলাভ করেছে। সাহিত্য, সমাজ, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, দর্শন, স্থাপত্য-ভাস্কর্য প্রভৃতি নানা নিদর্শনে পরিপূর্ণ সংস্কৃত সাহিত্য। সংস্কৃত সাহিত্যের বিদগ্ধ বিদ্বান্ গণের লেখণীসমূহ কেবল সাহিত্যতত্ত্ব ও দার্শনিকতত্ত্বে ভরপুর- এমনটা নয়। সংস্কৃত পণ্ডিতগণ অলংকার, রীতি, ছন্দ, রস, ভাব প্রভৃতি পরিস্ফুট করার পাশাপাশি তাদের সৃষ্টিতে এমন অনেক বিষয় তুলে ধরেছেন যেগুলি পাঠকসমাজে তথা সহৃদয়ের কাছে ভিন্ন স্বাদের। তারা তাঁদের সাহিত্যের শৈলি নির্মাণের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক তথ্যকে তুলে ধরেছেন। অতিপ্রাচীনকাল থেকেই বৈজ্ঞানিক মনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিকসাহিত্য, উপনিষদ্, রামায়ণ, আয়ুর্বেদশাস্ত্র, কালিদাসাদির সৃষ্টিসম্ভারে, ভারতীয় দর্শন প্রভৃতিতে সংস্কৃত সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে বৈজ্ঞানিক ধারণার উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে। তবে অতিপ্রাচীনকালে বিজ্ঞান বলতে যা বোঝাতো পরবর্তীকালের কালিদাসাদির কাব্যনাটকাদিতে কিছুটা পরিমার্জিত রূপ পরিগ্রহণ করেছিল। যাই হোক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পথপ্রদর্শকরূপে সংস্কৃতসাহিত্যের অবদান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসাবিজ্ঞান, ভূগোলবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, সৃষ্টিবিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বহু তথ্যে ভরপুর সংস্কৃতসাহিত্য।

চিকিৎসাবিজ্ঞান :

চিকিৎসাবিজ্ঞানের কথা উঠলে সেই আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক সংস্কৃত সাহিত্যেই ফিরে যেতে হয়। ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব হল বেদ। এমন কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান নেই যার অস্তিত্ব বেদে নেই। বেদ চারটি-ঋক-সাম-যজু-অথর্ব। ঋগ্বেদে জ্ঞানকাণ্ডের বর্ণনা আছে। যজুর্বেদে প্রধানতঃ কর্মকাণ্ডের বর্ণনা আছে। সামবেদে গন্ধর্ববিদ্যার বর্ণনা রয়েছে। অথর্ববেদে রোগসমূহের বর্ণনা এবং নিরাকরণে বনস্পতীসমূহের অবদান বর্ণিত হয়েছে। অথর্ববেদে শরীরসৃষ্টি সম্বন্ধে, রোগসমূহের বিষয়ে ঔষধীসমূহের অবদানের বর্ণনা রয়েছে। যেমন-অথর্ববেদের বলা হয়েছে-

"অনু-সূর্যমুদযতাং হৃদ্যোতি হরিমা চ তে।
গো রোহিতস্য বর্ণেন ত্বা পরিদধ্যসি॥"১

অর্থাত্ প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পতিত হয় এবং রক্তবর্ণরূপে দৃশ্যমান হয়। তৎসময়ে বায়ু শীতল, মন্দ ও সুগন্ধরূপে প্রবাহিত হয়। সেই সময় মানসিক ও শারীরিকরূপে রুগ্নকে সতবেদ্য বায়ু ও ভৈষজ্য সেবন করায়। যাতে করে সে স্বাস্থ্যবান হয়। রক্তসঞ্চরণে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় তার বর্ণ সূর্যের মতো রক্তবর্ণ ভাসমান হয়। প্রথম কাণ্ডে ২৩ নং সূক্তে বলা হয়েছে-

"নক্তং জাতাস্যোষধে রামে কৃষ্ণে অসিক্নি চ।
ইদং রজনি বজয় কিলাসং পলিতং চ যত্॥"২

এই ঔষধির কাছে মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে কুষ্ঠরোগ নিরাময়ের জন্য।

মহাভারতে উক্ত হয়েছে- মানুষ দুর্ভাগ্যবশতঃ কখনও কখনও প্রকৃতিবিরুদ্ধ অস্বাস্থ্যকর গুরু খাদ্য অধিকমাত্রায় বারবার গ্রহণ করে। কখনও কখনও অধিক পরিশ্রম করে। কখনও দিনে ঘুমোয়; মলমূত্রের বেগ অবরোধ করে। এভাবে মানুষ স্বয়ং কফ-বাত-পিত্তাদি ত্রিদোষ প্রকটিত করে। মৃত্যুর কারণকে ত্বরান্বিত করে। আধুনিক আয়ুর্বিজ্ঞানমতে যা (acid) অম্ল নামে পরিচিত তা শরীরের পক্ষে হানিকর। মহাভারতে বলা হয়েছে-ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারা এবং সপত্নীসহযোগে AIDS রোগের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়। মহাভারতকালে শল্যচিকিৎসারও প্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। আদিপর্বে দেখা যায়- গান্ধারী যুধিষ্ঠির জন্মসংবাদ শুনে নিজগর্ভে প্রহার করলেন তখন তাঁর গর্ভ থেকে একটি মাংসপিণ্ড বেরিয়ে এল যা লৌহপিণ্ডের মতো কঠোর। তখন মহর্ষি ব্যাস এসে ঘৃতকুণ্ডমধ্যে ঔ মাংসপিণ্ড সুরক্ষিত রাখলেন এবং পরবর্তীকালে সেখান থেকে একশত রাজকুমার এবং একটি কন্যার জন্ম হল। এই ঘটনার দ্বারা অনুমিত হয় যে-তৎকালে Premature Babies রক্ষা করার বিবিধ প্রক্রিয়া জ্ঞাত ছিল। বর্তমানের টেষ্টটিউব বেবির ধারণা ঋগ্বেদেও ছিল-

"সত্রে হ জাদাবিষিতা নমোভিঃ কুম্ভে রেতঃ সিশিচতুঃ সমানম্
ততো হ মান উদিয়ায় মধ্যাত্ ততো জাতমৃশদিমাহুর্বসিষ্টম্॥"৩

অর্থাৎ যজ্ঞে উত্পন্ন মিত্র ও বরুণ স্তুতি দ্বারা প্রার্থিত হয়ে কুম্ভমধ্যে তেজ স্থাপন করেছিলেন। তারপর সেখান থেকে ঋষি বশিষ্ঠ জন্মেছিলেন। এছাড়া চিকিৎসাশাস্ত্রে চরককৃত রচিত 'চরকসংহিতা', সুশ্রুতরচিত 'সুশ্রুতসংহিতা'র বিশিষ্ট অবদান অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

জ্যোতিষ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান :

ষড়বেদাঙ্গের অন্যতম হল জ্যোতিষ-'জ্যোতিষাময়নং চক্ষুঃ'। জ্যোতোষশাস্ত্র বেদবিজ্ঞানের দীপ্তি বলে তা বেদ ইন্দ্রিয়ের চক্ষুস্বরূপ। সূক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায়- জ্যোতিষশাস্ত্র একাধারে দর্শন ও বিজ্ঞানের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত। সৃষ্টিপ্রপঞ্চে অজ্ঞেয় অদৃষ্টের সাক্ষী হল-গ্রহ-নক্ষত্ররাশি ও লগ্ন। ভারতীয় জ্যোতিষ হল কর্মদর্শন ও কর্মবিজ্ঞান। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে-

"সোমেনাদিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী।
অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ॥৪

আর্যভট্টের 'আর্যমহাসিদ্ধান্ত' ও 'আর্যভট্টতন্ত্র', বরাহমিহিরের 'বৃহজ্জাতক' ও 'লঘুজাতক' ইত্যাদি জ্যোতিষের বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ। জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বীজ নিহিত আছে ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে। জ্যোতিষ্কপরিবারের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের স্থান, তাদের গতি ও কার্যবিধি এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে সপ্তর্ষিমণ্ডল দর্শনে ঋষির মনে বিস্ময়বিমুগ্ধ প্রশ্ন জেগেছে-

"অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা নক্তং দদৃশে কুহচিদ্দিবেষুঃ।.

অদদ্ধানি বরুণস্য ব্রতানি বিচাকশচ্চন্দ্রমা নক্তমিতি॥"৫

অর্থাত্ এই যে ঊর্দ্ধে স্থাপিত সপ্তর্ষিমণ্ডল, তা রাত্রিকালে দৃষ্টিগোচর হয়, দিবাভাগে কোথায় অপসৃত হয়। আর্যভট্ট, বরাহমিহির প্রমুখ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অবদান অনস্বীকার্য। বেদে আরও বলা হয়েছে- চাঁদের কোন আলো নেই, সূর্যের কাছ থেকে আলো পেয়ে সে পৃথিবীকে আলোকিত করে-

"অত্রাহ গোরমন্বত ত্বষ্টুরপীচ্যম্। ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে। ত্বষ্ট সূর্য।"৬

নিরুক্তেও একই কথা বলা হয়েছে-

"অথাপ্যস্যৈকো রশ্মিশ্চন্দ্রমসং প্রতি দীপ্তির্ভবতীতি।
সুষুম্ণঃ সূর্যরশ্মিচন্দ্রমা গন্ধর্ব ইত্যপি নিগমো ভবতি।
সোঽপি গৌরুচ্যতে।।"৭

সুষুম্নঃ=সূর্যের একটি রশ্মি। চন্দ্র নিজে জলময়, এর কোন দীপ্তি নেই। সুষুম্নরশ্মি চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে চন্দ্রমন্ডলের দীপ্তি সম্পাদন করে। শুক্লযজুর্বেদেও উল্লিখিত হয়েছে-

"সুষুম্নঃ সূর্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্ব----"৮

মহাকবি কালিদাসও এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটিকে তুলে ধরেছেন-

"পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতেরনুপ্রবেশাদিব বালচন্দ্রমাঃ॥"৯

বালক রঘুর বড় হওয়া নিয়ে বলেছেন-অমাবস্যার পরের দিন থেকে সূর্যরশ্মি চন্দ্রের মধ্যে প্রত্যহ একটু একটু করে প্রবেশ করে চন্দ্রের কলেবরকে বৃদ্ধি করে যা পূর্ণিমায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়-

"দিনে দিনে সা পরিবৃদ্ধমানা
লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা"১০

উমার বৃদ্ধি যেন শশিকলার মতো। আবার চন্দ্র নির্মল হলেও লোকে ভূমিতে পতিত চন্দ্রছায়াকে চাঁদের কলঙ্ক বলে- "ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্বে।' জ্যোতিষশাস্ত্রের আর এক নাম কালবিজ্ঞান বা হোরাশাস্ত্র বা অধ্যাত্মশাস্ত্র। লগধমুনির বক্তব্য থেকে বোঝা যায় কালবিজ্ঞানশাস্ত্র হিসেবে জ্যোতিষশাস্ত্র কতটা সার্থক ছিলো-

"বেদা হি যজ্ঞার্থম্ অভিপ্রবৃত্তাঃ কালানুপূর্বা বিহিতাশ্চ যজ্ঞাঃ।
তস্মাদিদং কালবিজ্ঞানশাস্ত্রং যো জ্যোতিষং বেদ স বেদ যজ্ঞম্॥"১১

ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রকে মূলত তিনভাগে ভাগ করা যায়-গণিতজ্যোতিষ, ফলিতজ্যোতিষ ও জ্যোতিষসংহিতা। গ্রহাদির স্থান, কক্ষ, গতিবেগ ইত্যাদি নির্ণয়ের জন্য গাণিতিক সূত্র, সারণী ইত্যাদি পরিবেশিত হয়েছে । ফলিতজ্যতিষ মূলতঃ আদি জ্যোতিষচর্চা। ভাগ্যফল, আবহাওয়া, প্রজনন ও সৃষ্টি ,সামুদ্রিক বিদ্যা ইত্যাদি বিষয় জ্যোতিষসংহিতায় আলোচিত হয়েছে। কয়েকটি জ্যোতিষগ্রন্থের নাম- ভাস্করাচার্য তাঁর অসাধারণ গ্রন্থ 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' রচনা করেণ। গ্রন্থটির মধ্যে বীজগণিত ও পাটিগণিত রয়েছে।

"নারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ॥"১২

সৌরবছর ও চান্দ্রবছর সম্পর্কে বৈদিক ঋষিদের ধারণা ছিল। সৌরবছর ৩৬৫ দিনে এবং চান্দ্রবছর ৩৫৫ দিনে হয়। প্রতি ৩ বছরে চান্দ্রবছর সৌরবছরের থেকে ৩০ দিন বেশী হয় অর্থাত্ চান্দ্রবছর ১৩ মাস হয়। ত্রয়োদশ মাসটিকে মালমাস বলে। এবিষয়ক ঋকমন্ত্রটি হল-"বেদা মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ। বেদা য উপজায়তে।"১৩ এছাড়া সূর্যের সপ্তরশ্মি, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ, ছয় ঋতু, দ্বাদশ মাস ইত্যাদি অনেক প্রকার বৈজ্ঞানিক তথ্যে পরিপূর্ণ ঋগ্বেদ-

"পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আহুঃ পরে অর্ধে পরীষিণম্।
অথেমে অন্য উপরে বিচক্ষণং সপ্তচক্রে ষলর আহুরর্পিতম্॥"১৪

ভূগোলবিদ্যা :

সুদূর বৈদিকযুগে মেঘসৃষ্টি সম্পর্কে মানুষের যেসব ধারণা ছিল সেখানে বর্তমানের যথার্থ বিজ্ঞানমনস্কতার ছাপ ছিল না। দেবরাজ ইন্দ্র বা পর্জন্যদেবকে মেঘ থেকে জলবর্ষণের কারণরূপে তুলে ধরা হয়েছে। এই জলবর্ষণ হল দেবরাজ ইন্দ্রের বিগলিত করুণা যা সেকালের মানুষের কাছে ছিল আশীর্বাদতুল্য। দেবরাজের সন্তুষ্টিবিধানের দ্বারা তাঁর করুণালাভে মানুষ সমর্থ হতেন এবং ইন্দ্র প্রচুর জলবর্ষণের দ্বারা শস্য উৎপন্ন করার ক্ষেত্রে সহায়তা করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মহাকবি কালিদাস আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মেঘের সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে উক্তি করেছেন-

"ধূমজ্যোতিসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ।"১৫

বাস্তবিকই আজকের বৈজ্ঞানিক ধারণা অনুযায়ী মেঘ প্রকৃতই ধূম, জ্যোতি, সলিল ও মরুতের সমন্বয়ে গঠিত। সমুদ্র, নদ-নদী, জলাশয় প্রভৃতি থেকে সূর্যকিরণে বাষ্পীভূত হয়, উপরে উঠে গিয়ে ঠাণ্ডার সংস্পর্শে এসে ঘনীভূত হয়, ভারী হয় এবং আকাশের গায়ে ভেসে বেড়ায়। জলের এরূপ ঘনীভূত রূপই হল মেঘ। রঘুবংশেও বলা হয়েছে-

"সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ।"১৬

এই মেঘই বৃষ্টির কারণ এবং সেই কারণেই সূর্য সহস্রগুণে বৃষ্টিরূপে দান করার জন্যই পৃথিবী থেকে জল(রস) শুষে নেয়। আবার রঘুবংশীয় মহিষীদের গর্ভলক্ষণ প্রসঙ্গে কালিদাস যে উক্তি করেছেন সেটি অনুরূপ তত্ত্বকেই প্রকাশ করে-

"তাভিঃ গর্ভঃ প্রজাভূত্যৈ দধ্রে দেবাংশ সম্ভবঃ।
সৌরীভিরিব নড়ীভিরমৃতাখ্যাভিরশ্ময়ঃ॥"১৭

এখানেও সূর্যরশ্মির জলময় গর্ভধারণের কথাই বলা হয়েছে। আবার এই কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গে এই তথ্য আরও দৃড়ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে- 'গর্ভং দধত্যর্কনরীচায়াঽমাত্।' এখানেও সূর্যরশ্মি কর্তৃক জলশোষণ করে জলময় গর্ভধারণের কথা বলা হয়েছে। পুরাণসাহিত্যেও বলা হয়েছে মেঘ ধূম, অগ্নি ও বায়ুময় - "নলৈর্বিক্ষিপতেঽভ্রেষু ধূমাগ্ন্যনিলমূর্ত্তিষু।"১৮ মেঘদূতে বলা হয়েছে বর্ষণের পরে মেঘ হাল্কা হয় এবং জলপূর্ণ মেঘকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যেতেপারে না- "অন্তঃসারং ঘন।

তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং।"১৯ বায়ুমণ্ডলের পথ বা স্তর সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানীদের মত ধারণা সংস্কৃতসাহিত্যে একেবারে বিরল ছিল না। কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের সপ্তমাংকে দুষ্যন্ত স্বর্গ থেকে মর্ত্যে প্রত্যাবর্তনকালে ইন্দ্রসারথি মাতলিকে জিজ্ঞাসা করেন-

'কতরস্মিন্ মরুতাং পথি বর্তামহে।'২০

এখানে 'মরিতাং পথি বর্তামহে' অংশের দ্বারা বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহকে বোঝানো হয়েছে। বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলি কালিদাসের যুগে আবহ, প্রবহ, পরিবহ, সুবহ প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। বায়ুপুরাণে সাতটি বায়ুস্তরের উল্লেখ রয়েছে- আবহ, প্রবহ, উদ্বহ, সুবহ, পরিবহ, পরাবহ। দুষ্যন্তের উদ্দেশ্যে মাতলি বলেন-

"ত্রিস্রোতসং বহতি যো গগনপ্রতিষ্ঠাং
জ্যোতীংষি বর্তয়তি চ প্রবিভক্তিরশ্মিঃ।
তস্য ব্যপেতরজসঃ প্রবহস্য বায়ো-
মার্গো দ্বিতীয়হরিবিক্রমপুত এষঃ॥"২১

এখানে মাতলি বলেছেন-প্রবহ নামক বায়ু জ্যোতিষ্কসমূহকে নিজ নিজ কক্ষে আবর্তিত করে। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে যখন সমাজে মানুষ ধর্মপালনে ব্যস্ত তখন কবি যে বৈজ্ঞানিক মনস্কতার দ্বার উদ্ঘাটন করেছিলেন সেই দ্বারে কপাট দেওয়ার ক্ষমতা বোধহয় এযুগের বিজ্ঞানীদের সীমাবদ্ধতার বাইরে। কালিদাসের অলৌকিক কল্পনার বাস্তব রূপায়ন আজকের মহাকাশবিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনার মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এছাড়া 'সূর্যসিদ্ধান্ত', 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' নামক ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যাগ্রন্তে বায়ুর সাতটি স্তরের উল্লেখ রয়েছেগ-আবহ, প্রবহ, উদ্বহ,সংবহ, সুবহ,পরিবহ, পরাবহ। এই গ্রন্থগুলিতেও বলা হয়েছে প্রবহ নামক বায়ু জ্যোতিষ্কসমূহকে স্ব স্ব কক্ষে আবর্তিত করে। রামধনু সৃষ্টি সম্পর্কে সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক উক্তি দেখা যায়। যেমন- বৃহৎসংহিতায় বলা হয়েছে-

"সূর্যস্য বিবিধবর্ণাঃ পবনেন বিঘটিতাঃ করাঃ সাভ্রে।
বিয়তি ধনুঃ সংসচথানাঃ যে দৃশ্যন্তে তদিন্দ্রধনুঃ॥২২

কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকেও সপ্তরশ্মিকে সপ্তসপ্তি বলা হয়েছে-

"উচ্ছেত্তুং প্রভবতি যন্ন সপ্তসপ্তি-
স্তন্নৈশং তিমিরমপাকরোতি চন্দ্রঃ"২৩

বৃষ্টিচক্র সম্বন্ধে বেদে বলা হয়েছে-

"সমানমেতদুদকমুচ্চৈত্যব চাহভিঃ
ভূমিং পর্জন্যা জিম্বন্তি দিবং জিন্বন্ ত্যগ্নয়॥"২৪

অর্থাত্ জলাশয়ের জল সূর্যকিরণে ওপরে উঠে পর্জন্য বা মেঘ সৃষ্টি করে। এবং তারপর মেঘ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা পৃথিবীর বুকে পতিত হয়। অথর্ববেদেও বলা হয়েছে-সূর্যের কিরণ দিয়ে শোষণ করা সমুদ্রাদির জলই বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে ফিরে আসে।-

"প্রজাপতিঃ সলিলাদা সমুদ্রাদাপ ঈরয়ন্নদধিমর্দয়াতি।
প্র ব্যাপতাং বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতোঽর্বাঙেতেন স্তনয়িত্নুনেহি॥"২৫

ঋগ্বেদসংহিতার সূর্যসূক্তে বৈদিক ঋষির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গহির পরিচয় পাওয়া যায়-

"সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।"২৬

নিরুক্তে সূর্যের কাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে- "অথাস্য কর্ম রসাদানং রশ্মিভিশ্চ রসধারণং যচ্চ কিঞ্চিত্ প্রবহ্লিতমাদিত্যকর্মৈব তত্"২৭ অর্থাৎ রশ্মির দ্বারা রসগ্রহণ (জলশোষণ), ধারণ এবং গ্রহনক্ষত্রাদির আচ্ছাদন-এসবই সূর্যের প্রধান কাজ। সূর্যের আগমনে অন্যান্য নক্ষত্ররজি চোরের মতো নিঃশব্দে পলায়ন করে- "অপ ত্যে তাযবো যথা নক্ষত্রা যান্তি..."২৮ সত্যি সত্যি সুগভীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় এখানে রয়েছে।

পদার্থবিদ্যা:

পরমাণুতত্ত্ব বৈশেষিক দর্শনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। ন্যায়, বৌদ্ধ, জৈন ও আয়ুর্বেদেও পরমাণুতত্ত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। তবে বৈশেষিক দর্শনের পরমাণুতত্ত্বের সঙ্গে ন্যায় ব্যতীত অন্যান্য দর্শনের পরমাণুতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ন পার্থক্য রয়েছে। আধুনিককালে বিজ্ঞানে পরমাণুতত্ত্ববিষয়ে বৈশেষিকদর্শনের পরমাণুচিন্তার প্রভাব রয়েছে। অধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের সঙ্গে সেদিনের ঋষির বিশ্লেষণের অনেক পার্থক্য রয়েছে। তবও আধুনিককালেত পরমাণুতত্ত্ব যে সেদিনের পরমাণুতত্ত্বের চিন্তাসূত্র ধরেই অগ্রসর হয়েছে এবং সেদিনের পরমাণুতত্ত্ব যে আজও অভ্রান্ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ন্যায়-বৈশেষিকসম্মত পরমাণু অবিভাজ্য ও নিরবয়ব কণা। বিজ্ঞান দর্শনের পরমাণুকে অতিক্রম করে আরও সূক্ষ্মস্তরে পৌঁছেছে। দর্শনমতে সাবয়ব বস্তর অবিভাজ্য চরম সূক্ষ্ম অংশই হল পরমাণু। ন্যায়-বৈশেষিকমতে চতুর্বিধ পরমাণু (পার্থিব, জলীয়,তৈজস্ ও বায়বীয়) জগতের উপাদানস্বরূপ। ঈশ্বর সৃষ্টির ইচ্ছায় এইসকল পরমাণুসমূহে ক্রিয়া উৎপন্ন করে।

জগতের সৃষ্টি ও বিনাশের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বৈশেষিকগণ পরমাণুতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁদের মতে কার্য উৎপত্তির পূর্বে তাঁর উপাদানকারণে অসত্। এই অসত্ কার্যবাদ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে আরম্ভবাদ। পরমাণু হল জড়বস্তর অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশ। ঐগুলি অতীন্দ্রিয় বলে অনুমানের দ্বারা পরমাণুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। অবয়ব-অবয়বী ধারার বিশ্রান্তি ঘটে পরমাণুতে যা নিরবযব। এই বিশ্রান্তি স্বীকার না করলে মেরুপর্বত ও সর্ষপে কোন ভেদ থাকে না। পরমাণুগুলি নিত্য, নিষ্ক্রিয় ও গতিহীন। জীবের কর্মফলদানের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরমাণুগুলি গতিশীল হয় এবং জগত্ সৃষ্টি করে। প্রথমে দুটি পরমাণু যুক্ত হয়ে দ্ব্যণুক সৃষ্ট হয়। পরমাণু ও দ্ব্যণুক উভয়েই অতীন্দ্রিয় । তিনটি দ্ব্যণুক মিলে হয় ত্রসরেণু। এইভাবে ক্রমে ক্রমে স্থূল বায়ু, জল, পৃথিবী ও তেজের উদ্ভব ঘটে। ত্রসরেণু থেকে স্থূল পৃথিবী পর্যন্ত পদার্থ প্রত্যক্ষগোচর হয়, কারণ তাদের মধ্যে মহৎ পরিমাণ ও উদ্ভূত রূপ থাকে। জৈনমতে

দ্রব্য দুই প্রকার- অস্তিকায় ও নাস্তিকায়। অস্তিকায় দ্যব্য দুই প্রকার- জীব এবং অজীব। অজীব পাঁচ প্রকার-ধর্ম, অধর্ম, পুদ্গল ও কাল। পুদ্গল দুইপ্রকার- অণু বা পরমাণু এবং সংঘাত বা স্কন্ধ। পুদ্গল হল জড় (matter) । যে দ্রব্যকে যুক্ত বা বিযুক্ত করা যায় তা হল পুদ্গল। জড়দ্রব্যকে ভাঙতে ভাঙতে যখন আর ভাঙা যায় না তখন তাকে বলে অণু বা পরমাণু। একাধিক অণু মিলে সংঘাত সৃষ্টি করে।

"যে ঘনা নিবিড়াঃ অব্যবসন্নিবেশাঃ তৈঃ বিশিষ্টেষু স্পর্শাবস্তু।
যথাবত্ স্থাপয়তি পূর্ববদৃজুঃ করোতি।"২৯

এখানে স্থিতিস্থাপক ধর্মের উল্লেখ রয়েছে। ন্যায়দর্শনে লেন্স সম্পর্কিত ধারণাও রয়েছে-

"অপ্রাপ্যগ্রহণং লাচাভ্রপটলস্ফটিকান্তরিতোপলব্ধেঃ"৩০

motion বা গতি সম্পর্কিত ধারণাও রয়েছে-

"গুরুত্ব-প্রযত্ন-সংযোগানাম্ উৎক্ষেপণম্" ।৩১
"মণিগমনং সূচ্যভিসর্পণম্ অকৃষ্টকরণম্" ।৩২

উদ্ভিদবিদ্যা :

"তেন তজ্জলানামাদত্তং জরযত্যন্নিমারুতৌ।
আহারপরিণামাচ্চ স্নেহো বৃদ্ধিশ্চ জায়তে॥"৩৩ অর্থাৎ উদ্ভিদ্ তার মূলের দ্বারা জলশোষণ করে এবং পরিবেশ থেকে সূর্যালোক ও বাতাস গ্রহণ করে, জল, উত্তাপ ও বাতাসের যৌথ সহযোগিতায় উদ্ভিদ তার খাদ্য প্রস্তুত করে। অর্থাৎ এখানে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে।

যন্ত্রবিজ্ঞান:

প্রচলিত আছে যে ইংরেজরা এদেশ থেকে বেদ চুরি করে নিয়ে গিয়ে বেদচর্চার দ্বারা অনেক উন্নত প্রযুক্তির আবিষ্কার করেছিলেন। উড়োজাহাজ ইত্যাদি আবিষ্কারের ধারণা বেদ থেকে পেয়েছিলেন। আধুনিককালে উড়োজাহাজ, তার থেকেও গতিশীল যানের ধারণা সংস্কৃত সাহিত্য থেকে এসেছে একথা মানতে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। রামায়ণ, কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে রথের দ্বারা আকাশপথে যাতায়াতের উদাহরণ থেকে সেই ধারণার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এমনকি দুষ্মেন্তর সাধারণ রথ ও দেবরাজ ইন্দ্রের রথের পার্থক্যও দেখানো হয়েছে।

"উপোঢশব্দা ন রথাঙ্গনেময়ঃ প্রবর্তমানং ন চ দৃশ্যতে রজঃ।
অভূতলস্পর্শতুয়াঽনিরুদ্ধতস্তবাবতীর্ণোঽপি রথো ন লক্ষ্যতে॥৩৪

এখানে দুষ্যন্তের রথ যখন থামে তখন চক্রের প্রান্তভাগের সঙ্গে মৃত্তিকার ঘর্ষণে ধূলি উত্থিত হয়। যখন থামে তখন শব্দের সৃষ্টি হয়, কম্পনহেতু আরোহী যেন একটু ঊর্ধ্বদিকে উৎক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রের রথ এর বিপরীত। এখানে দেখা যাচ্ছে কালিদাসাদির সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা কতটা স্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিকতার দাবী রাখে। এছাড়া ঋগ্বেদে মনের অপেক্ষা বেগবান রথের উল্লেখ রয়েছে-

"যো বামশ্বিনা মনসো জবীয়ান্রথঃ স্বশো বিশ আজিগতি।

যেন গচ্ছথঃ সুকৃতো দুরোণং তেন নরা বর্তিরস্মভ্যং যাতম্॥"৩৫

মন্ত্রটির অর্থ হল-হে অশ্বিদ্বয় তোমাদের মনের অপেক্ষাও বেগবান ও শোভনীয় যে অশ্বযুক্ত রথ সমস্ত প্রজাবর্গের সম্মুখে গমন করে এবং যে রথে শুভকর্মা লোকের গৃহে গমন কর, সেই রথে আমাদের গৃহে এস। আধুনিকযুগে রকেটের ধারণা হয়তো এখান থেকেও নেওয়া হয়েছে।

পরিবেশবিজ্ঞান :

সস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সর্বত্র পরিবেশবিষয়ক ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে কিছু উদাহরণ তুলে ধরলাম যেগুলি বাস্তুতন্ত্র প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সারাবছর কৃষকরা যাতে চাষর জন্য জল পেয়ে থাকে তার জন্য বর্ষার জলের দ্বারা পরিপূর্ণ জলাষয় নির্মাণের উদাহরণ রয়েছে-"সহোদকমাহার্যোদকং বা সেতুং বন্ধয়েত্।"৩৬ পথের ধারে/চারটি রাস্তার সংযোগস্থলে, রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন জায়গায় জলের ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন-

"রথ্যাসু কুটব্রজাঃ সহস্রং তিষ্ঠেয়ুঃ।
চতুষ্পথদ্বার -রাজপরিগ্রহেষু চ।"৩৭

অর্থশাস্ত্রে জলাশয়ের সচেতনতার উপদেশও রয়েছে। কেউ জলাশয়ের বাঁধ ভাঙ্গলে তাকে ঐ জলাশয়ের জলে ডুবিয়ে মারার কথা বলা হয়েছে-"উদকধারণং সেতুং ভিন্দতস্তত্রৈবাপ্সু নিমজ্জনম্"।৩৮ নদীকূপ, তড়াগ প্রভৃতি জলস্থানের রক্ষা নাগরিকদের কর্তব্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে- "নিত্যমুদকস্থানে মার্গভ্রমচ্ছন্নপথবপ্র প্রাকাররক্ষাবেক্ষণং----"।৩৯ পুরাণসাহিত্যেও জলসংরক্ষণের জন্য কূপাদি খননের নির্দেশ রয়েছে-

"কূপবাপীতড়াগানাং প্রতিষ্ঠাং বচ্মি তাং শৃণু।
জলরূপেণ হি হরিঃ সোমো বরুণ উত্তমঃ।।"

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অনুর্বর জমিকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার সফল প্রচেষ্টার সর্বোৎকৃষ্ট উদ্যোগ দেখা যায়। কৃষিকাজের অনুপযুক্ত জমিতে গবাদিপশুর বাসের জন্য বিবীত (তৃণ ও জলযুক্ত স্থান) নির্মাণ করা হত। এইধরণের জমিগুলিতে তপস্বীদের বাসস্থান নির্মাণ করা হত। আবার এইসব জমিতে রাজাদবর বিহারের জন্য মৃগবন নির্মাণ করা হত। এই বনে বিভিন্ন ধরণের ছায়াপ্রদানকারী, ফলদায়ী বৃক্ষ থাকতো। সেখানে বন্যপ্রাণীরা অবাধে দিনযাপন করতো। সেইসব বৃক্ষ ও প্রাণীদের ক্ষতিসাধক করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হতো-"পুরোপবনবনস্পতীনাং পুষ্পফলচ্ছায়াবতাং প্ররোহচ্ছেদনে ষট্পণঃ"।৪০ এভাবে অর্থশাস্ত্রে পরিবেশ তথা বৈজ্ঞানিক দিকের নিদর্শন রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে উপরিউক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও রসায়নবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা প্রভৃতি বহু বৈজ্ঞানিক তথ্যে পরিপূর্ণ আমাদের সস্কৃত সাহিত্য। বেশীরভাগ

মানুষের ধারণা বৈদিক ঋষিগণ কেবল দেবতাদের সন্তোষবিধানে সদা লিপ্ত থাকতেন, সস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসাদির রচনা প্রণয়গাথায় পরিপূর্ণ-এ ধারণার পরিবর্তন এই প্রবন্ধপাঠের দ্বারা হবে –এ আশা করা যেতে পারে। আধুনিক অনেক বৈজ্ঞানিক ধারণার উত্স সস্কৃত সাহিত্য এবং এই আলোচনার দ্বারা এযুগে দাঁড়িয়ে একথা বলা যায় যে বিজ্ঞানচেতনা বা বিজ্ঞানমনস্কতার নিরিখে সংস্কৃত সাহিত্য আধুনিকতার দাবী রাখে – একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১। অথর্ববেদ, প্রথমকাণ্ডপঞ্চম্ অনুবাক, ২২ নং সূক্ত
২। অথর্ববেদ প্রথম কাণ্ড, ২৩ নং সূক্ত
৩। ঋগ্বেদ (৭/৩৩/১৩)
৪। ঋগ্বেদ (১/২৪/১০)
৫। ঋগ্বেদ
৬। ঋগ্বেদ
৭। নিরুক্তম্ (২/১/৬/১০)
৮। শুক্ল.যজু (১৮.৪০)
৯। রঘুবংশম্ (৩/২২)
১০। কুমারসম্ভবম্ (১/২৫
১১। বেদাঙ্গজ্যোতিষ (৩)
১২। রঘুবংশম্ (১৪/৪০)
১৩। ঋকবেদ (১/২৫/৮)।
১৪। ইত্যাদি (১/১৪/১২)
১৫। মেঘদুতম্ (পূর্বমেঘ ৫)
১৬। রঘুবংশম্
১৭। রঘুবংশম্
১৮। বিষ্ণুপুরাণ (২/৯/৯)
১৯। পূর্বমেঘ (২০)
২০। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (সপ্তম অঙ্ক)
২১। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (৭/৬)
২২। বৃহৎসংহিতা, (অধ্যায়৩)

২৩। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (৬/৩০)
২৪। ঋগ্বেদ্ (১/১৬৪/৫১)
২৫। অথর্ব (৪/১৫/১১) (৪/৩/৫/১১)
২৬। ঋকবেদ (১/১১৫/১)
২৭। নিরুক্তম্ (৭/১১/২২)
২৮। ঋকবেদ (১/৫০/২)
২৯। ন্যায়কন্দলী
৩০। ন্যায়দর্শনম্ (৩.৪৫)
৩১। বৈশেষিক দর্শনম্ (১.১.২১)
৩২। বৈশেষিক দর্শনম্ (৫.১.২৫)
৩৩। মহাভারত, শান্তিপর্ব (১৮৪,১৮)
৩৪। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (৭/১০)
৩৫। ঋগ্বেদ (১.১১৭.২)
৩৬। অর্থশাস্ত্রম্ (২/১/২০)
৩৭। অর্থশাস্ত্রম্ (২/৩৬/২২)
৩৮। অর্থশাস্ত্রম্ (৪/১১/১৭)
৩৯। অর্থশাস্ত্রম্ (২/৩৬/৪৩)
৪০। অর্থশাস্ত্রম্ (৩/১৯/৭)।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। সংস্কৃতবাঙময়ে বিজ্ঞানম্, শ্রীকৃষ্ণ সোমবালঃ, দিল্লী সস্কৃত অকাদমী।
২। বেদ-১,২,৩,৪ খণ্ড, হরফ প্রকাশনী।
৩। বেদের পরিচয়- ডঃ যোগিরাজ বসু, ফার্মা কে.এল.প্রাইভেট লিমিটেড।
৪। ন্যায়দর্শনম্, ফণীভূষণ তর্কবাগীষ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্।
৫। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, অনিল চন্দ্র বসু, সস্কৃত বুক ডিপো।
৬। রঘুবংশম্, জনেশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, বি.এন.পাবলিকেশান।
৭। বিশ্বায়ন ভাবনায় কালিদাস সমগ্র, ডঃ সুমিতা বটব্যাল, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।
৮। কৌটীলীয় অর্থশাস্ত্রম্, ডঃ মানবেন্দু মুখোপাধ্যায়।

৯। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্।
১০। সংস্কৃত রচনায় প্রতিফলিত পরিবেশসচেতনতা, বিদ্যুৎ বরণ ঘোষ, সস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।
১১। Science in Sanskrit, Sanskrita Bharati, New Delhi
১২। ভারতীয় দর্শন, জগদীশ্বর সান্ন্যাল, শ্রীভূমি পাবলিশিং হাউস।

বাংলা কথাসাহিত্যে আদিবাসী জনজাতি : প্রসঙ্গ 'অরণ্য-বহ্নি'

বিকাশ কালিন্দী
গবেষক, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসের মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহের পাশাপাশি সাঁওতাল জনজাতির আচার, সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতি দিকের কথা উঠে আসে। বাংলা কথাসাহিত্যে কীভাবে আদিবাসী জনজাতির কথা উঠে এসেছে, পাশাপাশি তার গতিবিধি কীভাবে সাহিত্যের সামনে এগিয়ে গিয়েছে-এসমস্ত নানাবিধ বিষয় আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সুচক শব্দ : বিদ্রোহ, সাবল্টার্ন, ক্ষেত্রসমীক্ষণ, অ্যাকাডেমি সমীক্ষণ, জনজাতি, সংস্কৃতি, আদিবাসী।

মূল আলোচনা :

বাংলাসাহিত্যে কল্লোলের(১৯২৩) তরঙ্গ সাহিত্যের ধারাকে ভিন্ন মাত্রা দান করে। রবীন্দ্র-একাধিপত্যের সাহিত্যক্ষেত্র থেকে সরে এসে কয়েকজন সাহিত্যিক যৌবনের স্পর্ধায় আলাদা পথে হাঁটার কথা চিন্তা করেন। উদ্দেশ্য প্রণোদিত কল্লোলীয় ঘরানা একসময় থেমে গেলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে আঘাত সৃষ্টি করেছিল তার প্রভাবে সাহিত্যের অভিমুখটিকে পাল্টে দিয়েছিল। বাংলা কথাসাহিত্যে যে আঞ্চলিক জীবনভাবনার সুত্রপাত হয়েছিল তারই ফলশ্রুতিতে আদিবাসী চেতনার জন্ম হল। বিভিন্ন অন্ত্যজ সম্প্রদায় এবং আদিবাসী শ্রেণির মানুষেরা গল্প-উপন্যাসে চরিত্র হতে শুরু করল। কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাঁওতাল জনজাতির প্রতি আকর্ষণ তাঁর শৈশবে পিসিমার কাছ থেকে সাঁওতাল বিদ্রোহের গল্প শোনার স্মৃতিমেদুর অভিজ্ঞতা থেকে। 'কৈশোরের-স্মৃতি'(১৯৫৬) গ্রন্থে তারাশঙ্কর স্মৃতিচারণা সূত্রে জানিয়েছেন-"বাল্যকালে পিসিমার কাছে আমি এই সাঁওতাল বিদ্রোহের গল্প শুনতাম। বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকত। শঙ্কাতুর হয়ে উঠত। আমারও রোমাঞ্চ হত মুখে সিঁদুর মেখে, হাতে টাঙি আর তির-ধনুক দিয়ে রক্তমুখ দানবের মতো সাঁওতালদের নাচের কথা শুনে। শাল-জঙ্গলে মাদল বাজত, মশালের আলো জ্বলত চারিদিকে- তারই মধ্যে বিদ্রোহীরা নাচত।"[১] ইংরেজদের সঙ্গে অসম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বিধ্বস্ত সাঁওতাল জাতির নির্মম চিত্র লেখককে এতটাই প্রভাবিত করে যে পরবর্তি সময়ে তা সাহিত্যের আসরে জায়গা করে নেয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'কালিন্দী'(১৯৪০) উপন্যাসে যে সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা বলেছেন সংক্ষিপ্ত পরিসরে, পরবর্তিকালে তিনি সেই বিষয়টিকে সামনে রেখে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন 'অরণ্য-বহ্নি'(১৯৬৬) উপন্যাসে। একদিকে ইংরেজ শাসকের অত্যাচার অপরদিকে দেশীয় জমিদারদের অমানবিক শোষনের ফলে সাঁওতাল বিদ্রোহের সূত্রপাত,

পাশাপাশি সাঁওতাল জনজাতির আচার, সংস্কার, বিশ্বাস, জীবনযাত্রা প্রণালী প্রভৃতি বিষয়গুলিকে ঔপন্যাসিক ছুঁয়ে গিয়ে একটা সার্বিক চিত্র অঙ্কন করেছেন 'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসের মধ্যে। তারাশঙ্করের পূর্বে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে কয়লাকুঠি অঞ্চলের আদিবাসী জনজাতির সুখ, দুঃখ, জীবনযন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'আরণ্যক' (১৯৩৯)-এর মধ্যে দোবরুপান্নাকে সামনে রেখে প্রথম সাঁওতাল জনজাতির কথা বলেছেন।

১৮৭২ এর সেন্সাসে আদিবাসী জনজাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে 'অ্যাব অরিজিন্যাস' বা 'অ্যানিমিস্ট' পরে প্রিমিটিভ ট্রাইবস। আঠারো শতকের শেষদিকে স্যার জন শোরের আমলে সাঁওতাল শব্দটি বেশি প্রচলিত হয়। খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রচার পুস্তিকায় সাঁওতালরা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিক্ষিপ্তভাবে এলেও তাদের সার্বিক প্রকাশ সাঁওতাল বিদ্রোহের পরবর্তি পর্যায়ে(১৮৫৪-'৫৫)। বাংলা সংবাদপত্রে বা ইংরেজ গ্যাজেটিয়ানে সাঁওতালদের বন্য, অসভ্য, জংলী, অনার্য, অসুর বলা হয়েছে। উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জনজাতির উল্লেখ রয়েছে এমন কয়েকটি উপন্যাস ছোটগল্প হল- অবিনাশচন্দ্র দাসের 'পলাশবন', 'অরণ্যবাস', কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভাদুড়ি মশাই', শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'শক্তিকানন', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষকথা', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'ম্যাজিক রিপোর্ট', 'নারীর মন', 'জোহানের বিহা', 'নারীমেধ', 'মরণবরণ', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক', 'বনে পাহাড়ে', 'শিকারে', 'কালচিতি', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দর্পণ', 'তেইশ বছর আগে পরে', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী', 'শিলাসন', আংশিক 'ধাত্রীদেবতা', সতিনাথ ভাদুড়ীর 'বন্যা', রমাপদ চৌধুরীর 'অরণ্য আদিম', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সৈনিক', 'বীতংস', 'মাতালের হাঁট', মহাশ্বেতা দেবীর 'শালগিরার ডাকে', 'সিধুকানুর ডাকে', 'অপারেশন বসাই টুডু', গুনময় মান্নার 'শালবনী', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অরণ্যে দিনরাত্রি', মানব চক্রবর্তীর 'ঝাড়খণ্ড ও তুতুড়ির স্বপ্ন', তপন বন্দ্যোপাধায়ের 'মহুলবনের সেরেঞ' ইত্যাদি।

বাঙালি লেখকেরা প্রথমদিকে সাঁওতাল জাতি তথা আদিবাসী জনজাতি সম্পর্কে কিছু লেখার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। এই উদাসীন থাকার পিছনে কতকগুলো কারণও বর্তমান-

১) বাঙালি হিন্দু যারা সাহিত্যচর্চা করছেন তাদের সঙ্গে ঐ আদিবাসী বিপ্লবীদের নাড়ীর যোগ ছিল না।

২) সাঁওতালদের কৃষ্টি সংস্কৃতি, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে লেখকদের যোগ ছিল না।

৩) শিক্ষিত মানুষের কাছে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল সংবাদপত্র। 'সংবাদ প্রভাকর'এর পৃষ্ঠাতে ঈশ্বরগুপ্ত সাঁওতালদের 'বর্বর জাতি' বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের সম্পর্কে খারাপ খারাপ লেখাও হয়েছে। ফলে শিক্ষিত সমাজ ঐ পত্রের খবর শুনে আঁতকে উঠে।

৪) ভাগনাডিহিতে সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সিধু কানুর বাড়ি। আর এই ভাগনাডিহি পশ্চিমবঙ্গের সীমানার মধ্যেই ছিল না।

৫) যে কোন আন্দোলন বা বিপ্লব তখন প্রসার লাভ করে যখন সেখানে শিক্ষিত মানুষের যোগ থাকে। সাঁওতালদের মধ্যে এই যোগ না থাকায় সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রসার লাভ করেনি।

৬) জল, জমি ও জঙ্গলের প্রশ্নে আদিবাসী জনজাতির যে মৌলিক অধিকারের প্রসঙ্গ, এই অধিকারটিকে সায় দেবার জন্য লোক ছিল না।

১৮৮৫ থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ এই দীর্ঘ ২৬ বছরের ইতিহাসে Tribal Movement নিয়ে কোথাও কোন তথ্য নেই। ১৯২৩ পরবর্তি কল্লোল যুগে আমরা দু'ধরনের লেখক পাচ্ছি-(১) অ্যাকাডেমিক সমীক্ষক লেখক, যারা ঘরে বসে লেখালেখি করছেন, তাঁদের লেখার মধ্যে কল্পনায় বেশি। (২) ক্ষেত্র সমীক্ষক লেখক, যাঁরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখে বাস্তব অভিজ্ঞতায় লেখালেখি করছেন। ১৯২৩ থেকে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের এই সময়পর্বে শৈলজানন্দের মতো একজন লেখক পাচ্ছি যাঁর লেখার মধ্যে ক্ষেত্রসমীক্ষণের বিষয়বস্তু উঠে আসছে। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরীর (ময়ূরাক্ষী, গৃহকপোতী) মতো লেখকদের মধ্যে যুগ্ম সত্তার প্রকাশ দেখা যায়। অর্থাৎ একই সঙ্গে তাঁরা ক্ষেত্রসমীক্ষণ ও অ্যাকাডেমিক সমীক্ষণের কাজটি করছেন। পরবর্তিকালে ১৯৪০-এর পর সারা বিশ্বে সাবল্টার্ন স্টাডিজ বা নিম্নবর্গীয় আখ্যান পাচ্ছি, সেখানে বিষয়বস্তুটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বে ক্ষেত্রসমীক্ষার বিষয়টি ছিল কিন্তু বিষয়টি নিয়ে উপন্যাস লেখা হয়নি। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ'র মধ্যে অঞ্চল সমীক্ষা, অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'নদীপথে', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'র মধ্যে চলারপথে জীবনের সমীক্ষা, সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসের মধ্যে নদীকেন্দ্রিক সমীক্ষা পাই।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অরণ্য-বহ্নি'(১৯৬৬) উপন্যাসটি ১৮৫৪-'৫৫ খ্রিস্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে লিখেছেন। শুধু সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা ই বলেননি একই সঙ্গে সমগ্র সাঁওতাল জনজাতির বিবরণের কথা বলেছেন। তার সঙ্গে তাদের জল, জমি ও জঙ্গলের প্রশ্নে যে মৌলিক অধিকারের লড়াই সেই বিষয়টিও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। 'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসটি লেখা হয়েছে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে কিন্তু এর ঘটনাকাল হচ্ছে ১৮৫৪-'৫৫ খ্রিস্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে সমকালের সময়পর্বটিকে তুলে ধরা। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন লেখক ইতিহাস লিখতে বসেননি, মানবজাতির কথা বলতে চেয়েছেন; উপেক্ষিত জনজাতির কথা। সাঁওতাল সমাজের কথা বলতে গিয়ে পাশাপাশি অন্যান্য সম্প্রদায়ের কথাও বলেছেন। আর এই কাজটি করতে গিয়ে লেখককে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

কারণ লেখক ঐ জনজাতির ছিল না, তাই তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ধর্মীয় প্রসঙ্গে লেখকের অনেক বিষয় অজ্ঞাত ছিল। এই সমস্যাটি মেটানোর জন্য লেখক ১৯৩৯ থেকে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ এই দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন, ভূমিতার সঙ্গে সার্বিক ছবিটা মেলানোর জন্য লেখক বাস্তবে সেই সমস্ত অঞ্চলে পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখেছেন।

'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসের পূর্বে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'আরণ্যক' উপন্যাসের মধ্যে সাঁওতাল সমাজের প্রসঙ্গ বর্তমান। দোবরুপান্নাকে সামনে রেখে সাঁওতাল বিদ্রোহকে দেখিয়েছেন। দোবরুপান্না যেহেতু অরণ্যের মধ্যে বাস করছে তাই তাদের অরণ্যের মধ্যে অধিকার রয়েছে। দ্বিতীয়ত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকের ছায়া রয়েছে উপন্যাসটিতে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আদিবাসীদের অধিকারের ওপর হস্তগত করেছেন। আসলে বিভূতিভূষণ সংকটের কথাটিকে সংকটের মতো করে তুলে ধরেননি, সেখানে মহানজন করে তুলে ধরেছেন। বিভূতিভূষণের ভাষার মধ্যে আমরা অনেকসময় মনে করি যে, সেখানে সমাজ-ধর্ম-সংস্কৃতির ছবি নেই কিন্তু তাঁর সকল রচনাতেই সেই ছবিটি স্পষ্ট। বিভূতিভূষণ আদিবাসী জাতিদের দিয়ে শিক্ষিত মানুষের কাছে একটা বার্তা দিতে চেয়েছিলেন। বাংলা কথাসাহিত্যে তিনিই প্রথম নিম্নবর্গীয় ইতিহাসের দিকে আঙুল তুলেছেন। আদিম আদিবাসী বর্বর মানুষদের সেই অবস্থা করার পিছনে রয়েছে সুশিক্ষিত নাগরিক সমাজের হাত। কল্পনার কথাও রয়েছে, আদিম মানুষগুলোর সঙ্গে নাগরিক মানুষের কথাও সুস্পষ্ট। সর্বোপরি বলা যায় 'আরণ্যক' উপন্যাসের মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহের একটা ছাপ রয়েছে কিন্তু লেখক সেখানে সাঁওতাল সমাজের সামগ্রিক দিকটি তুলে ধরেননি।

এবার আমরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসের বিষয় গভীরে প্রবেশ করে মূল আলোচনার দিকে অগ্রসর হব। ঔপন্যাসিক ১১০ বছর পিছনে সরে এসে সেই তখনকার ঘটনা ও চরিত্র উদ্ঘাটন করেছেন। উপন্যাসের মধ্যে ১৮৫৪-'৫৫ খ্রিস্টাব্দের সাঁওতাল জনজাতিদের বিদ্রোহের কথা রয়েছে। সাঁওতাল জনজাতিদের এই বিদ্রোহের দিকে অগ্রসর হওয়ার কতকগুলি কারণ ছিল। আমরা উপন্যাসের বিষয় অবলম্বনে সেই কারণগুলি খোঁজার চেষ্টা করব-

(১) সাঁওতাল জনজাতিদের জল, জঙ্গল ও জমিনের প্রশ্নে যে মৌলিক অধিকার, সেই অধিকার থেকে বিচ্যুতি করার জন্য বিদ্রোহ করে তারা।

(২)একদিকে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ডিউই-এর মতো সাহেবের অত্যাচার, অন্যদিকে কেনারাম ভকত ও মহেশ দারোগার মতো দিকু মহাজনদের অত্যাচারের ফলে আদিবাসী জনজাতি অস্থির হয়ে উঠে।

(৩) সাঁওতাল জনজাতিরা নির্দিষ্ট পণ্য অর্থাৎ ঘি, ময়ূর পালক, চিতাবাঘের নখ ইত্যাদি দিয়ে লবণের মতো সামান্য জিনিসটুকুও নাহ্য মূল্যে পেত না। অর্থাৎ লেনদেন ব্যবস্থার যে সংকট সেই সংকট থেকে তারা মুক্তি পেতে চেয়েছিল।

(৪) তাছাড়া দশ টাকা ধারের বিনিময়ে নিমু হাঁসদার মতো সাঁওতাল আদিবাসীদের বংশ পরম্পরায় কেনারাম ভকতের মতো দিকু মহাজনের ঘরে মজুরী হয়ে থাকতে হত। সাঁওতাল জনজাতিরা এই চিরদাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল।

উপরিক্ত কারণগুলির জন্য সাঁওতাল আদিবাসীরা সিধু কানুর নেতৃত্বে জহর সরণায় সকলে মিলে সমবেত হয়ে বিদ্রোহের কথা তুলে ধরে এবং সকলে মিলে বিদ্রোহে সামিল হয়। এই বিদ্রোহ করার পিছনে সাঁওতাল জনজাতিরা কতকগুলি প্ররণা পেয়েছিল-

(১) ভৈরবীর তন্ত্রসাধনা।

(২) সিধু কানুর আত্মবিশ্বাস। অর্থাৎ সিধু কানুকে বোঙা বলেছে যে তাদের জয় অবধারিত। এই বিশ্বাস তাদের প্রেরণা জুগিয়েছিল।

(৩) ত্রিভূবন ভট্চাজ সিধু কানুকে দেবী চন্ডীর দূত কালকেতু ও বিরূপাক্ষ মনে করতেন। এই জনশ্রুতি আদিবাসীদের আস্থা জোগায়।

বিভিন্ন কারণ ও প্রেরণার ফলে সাঁওতাল জনজাতিরা যুদ্ধে সামিল হয়। যদিও এই যুদ্ধ ছিল অসম পাহাড়ী গোপন যুদ্ধ। সাঁওতাল জনজাতিরা শেষপর্যন্ত এই যুদ্ধে হারলেও অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করে। যেমন- পিয়ালপুরের যুদ্ধ, সাহেবগঞ্জের যুদ্ধ। শেষ যুদ্ধ ছিল সংগ্রামপুরের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে সাঁওতাল গোষ্ঠী হেরেছিল। এই যুদ্ধে হারার ফলে সাঁওতাল জনজাতির মধ্যে যে বিপর্যস্ত রূপ সেটি দেখে ঔপন্যাসিকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তি সময়ে বিপর্যস্ত হিরোসিমার কথা মনে পড়েছে। সংগ্রামপুরের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে কানু গুলির আঘাতে মারা যায় এবং সিধুকে ফাঁসি দেয়। সিধু কানু মারা গেলেও ইতিহাস থেকে তাদের মুক্তি দেয়নি। অর্থাৎ আদিবাসী জনজাতিদের জল, জঙ্গল ও জমিনের প্রশ্নে যে অধিকার সেই অধিকার থেকে তাদের বিচ্যুতি করা হয়। আর এই অধিকার যতদিন না সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন আদিবাসী জনজাতির বিদ্রোহ চলতেই থাকবে। তাই মহাশ্বেতা দেবীর স্বরে সুর মিলিয়ে বলতে হয়-বিরসার মরণ নেই, উলগুলানের শেষ নেই।

এ তো গেল সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা। এই বিদ্রোহের পাশাপাশি সাঁওতালদের সমাজ ব্যবস্থা এবং সেই সমাজের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিকের কথা তুলে ধরেছেন লেখক। যদিও এইসব বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখক বিস্তারিত না গিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। সাঁওতালদের বিদ্রোহের সময় সাঁওতালদের মধ্যে দুর্গাপূজা প্রচলনের যে তথ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়, গল্পকথকের অভিজ্ঞতায় সেই অতীতের চিহ্ন উদ্ঘাটিত হয়েছে গুহার মধ্যে 'মা বোঙার ঠাঁই'- দুর্গাপূজার স্থান দেখায়। সাঁওতালদের নিজস্ব ধর্মস্থান 'জহর সর্ণা'য় বাজ পড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চুনার মাঝি এবং অন্যান্যরা নিজেদের সংস্কার-বিশ্বাস অনুসারে নানা রকম ব্যাখ্যা দিয়েছে। গাছের ফাটল দিয়ে যে জল পড়ছে তার রঙের ব্যাপারেও ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছে তারা। এতে

তাদের আদিম সংস্কারাচ্ছন্ন মনের একটা আভাস পাওয়া যায়-"লালচে কালচে জল বের হলে সে লক্ষণ শুভ নয়। কালচে কাদাগোলা জল হলে অজন্মা হবে, লালচে হলে মহামারী হবে, সাদা হলে ভাল-সু বর্ষা হবে।"[২]চূড়া মাঝির বৃদ্ধা মা 'জহর সর্না'য় বাজ পড়াকে 'আক্কাই' বা পাপ বলে মনে করেছে। বিদ্রোহে সাঁওতালদের পরাজয়ের মূলে আছে তাদের সরল ধর্মবিশ্বাস-এমন একটা ধারণা তারাশঙ্করের লেখায় উঠে এসেছে- "সাঁওতালরা হারলে অন্ধবিশ্বাসে আর কৌশলের অভাবে। ওদের বিশ্বাস ছিল দেবতার বর ওরা পেয়েছে, ওরা জিতবে। সিধু কানু বিজয়ার দিন বলেছিল-গুলি ইবার আর আমাদের গায়ে বিঁধবে না। দেবতার হুকুমে গুলি জল হয়ে যাবেক।"[৩] এই বিশ্বাসের বশেই যজ্ঞ করতে গিয়ে অর্ধোন্মাদ রুকণী যজ্ঞের আগুনে পুড়ে মারা গেছে। আধুনিক সমরাস্ত্র আর আদিবাসীদের সরল ধর্মবিশ্বাসের লড়াইয়ে কালের নিয়মেই সাঁওতালদের পরাজয় ঘটেছে। সাঁওতালদের খাদ্যাভ্যাসের কিছু আভাস আছে উপন্যাসে। সারাদিন কাজের আগে ভোরবেলায় ফ্যান ভাত খায় তারা। বারহেটের বাজারে আগত সিধু খেতের বুটকলাই সিদ্ধ করে তার সঙ্গে খানিকটা গুড় আর লংকা দিয়ে খাবার খেয়েছে। একজন সাঁওতাল শিকার করা বনবিড়ালের মাংস খেয়েছে। খাওয়ার পদ্ধতিটি এরকম- "বনবিড়ালটিকে পুড়িয়ে ঝলসে এনে তার চামড়া ছাড়িয়ে আবার একবার সেঁকে ঝলসে নিয়ে এল- খানিকটা নুন খানিকটা লঙ্কা বের করে খাজারি অর্থাৎ মুড়ির সঙ্গে হাঁড়িয়া খাওয়া শুরু হল।"[৪] সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর উৎসব-অনুষ্ঠান, নৃত্যগীত, সামাজিক রীতিনীতি উপন্যাসে টুকরো টুকরো বিবরণ রয়েছে। নাচ এবং গান সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে মাদল ও বাঁশি তাদের নিত্যসঙ্গী। সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের গানের পৃথক পৃথক নামের উল্লেখ রয়েছে উপন্যাসে। সাঁওতালদের বিবাহরীতির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। একই গোত্রে বিবাহ সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত নেই। উপন্যাসে দেখা যায় লাল মাঝির বাবা নিয়ম না মেনে হাঁসদা হয়েও হাঁসদা গোত্রের অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করে সমাজের চোখে ছোট হয়েছে। সমাজকে না জানিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে আদিবাসী সমাজে নিন্দনীয় বিষয়। মানকি আর লাল মাঝির বিয়েতে তাই সিধু কানুর বংশের অমর্যাদা হয়। আদিবাসী তথা সাঁওতাল জনজাতির মধ্যে শালিসি সভার আয়োজন সমাজের একটি বিশেষ দিক। অর্থাৎ এই সকল জনজাতি কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে তারা সকলে মিলে শালিসি সভার মধ্য দিয়ে সমস্যার সমাধান করে থাকে। আর এই সভা আয়োজিত হওয়ার পূর্বে শালপাতার নিমন্ত্রণপত্র দেওয়ার যে বিশেষ রীতি এই বিষয়টিও উপন্যাসের মধ্যে লক্ষ করা যায়। আদিবাসী জনজাতিরা যে আদিম সরলতায় পরিপূর্ণ তার একটি বিশেষ রূপ প্রকাশিত যখন প্রস্তাবনা অংশে লেখক দুমকা থেকে সাহেবগঞ্জের দিকে পাড়ি দিতে ছিল তখন তাঁর গাড়ি খারাপ হয়ে যায় এবং সাঁওতাল আদিবাসীরা বিনা পারিশ্রমিকে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। সাঁওতাল জনজাতির যে বেশভূষার বাহার সেই বেশভূষার বিবরণ পাই উপন্যাসের এক জায়গায়

যখন তারা তাদের সমস্যার বিষয়গুলি ত্রিভূবন ভট্চাজকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে পান্টিন সাহেবের কাছে যায়-"...তাদের পোশাকে আজ বাহার দেখা যাচ্ছে। মাথায় বাবরি চুল আচড়ানো-তাতে কেউ বেঁধেছে লাল ন্যাকড়ার ফালি, কারও সাদা কাপড়ের ফালি, তার মধ্যে ফুল গোঁজা, পাখির পালক গোঁজা, ময়ূরের পালক গোঁজা। পরণের কাপড় আজ কৌপিন নয়, খাঁটো গামছা নয়, ছ-সাত হাতি সাঁওতালী তাঁতে বোনা কাপড়। কোমরে এবং বুকে বেলট্ এবং পৈতের ঢঙে আর একখানা চাদর। অনেকের হাতে বালা। গলায় লাল কাঁচের বা পুঁতির মালা। হাতে তীরধনুক। কোমরে গোঁজা বাঁশি। সঙ্গে অনেক মেয়েরা এসেছে। দরবারের শেষে সায়েবকে তারা নাচগান দেখাবে শোনাবে।"[৫]এছাড়া প্রসাধনী দ্রব্য হিসেবে রূপা-দস্তার হাঁসুলি, বালা, পুঁতির মালা প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়। 'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসের মধ্যে লেখক নয়নপালের পটের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এই পটশিল্প গ্রহণ করার পিছনে লেখকের দুটি কারণ রয়েছে- একদিকে ইতিহাসের ফাঁকগুলি যেমন পূর্ণ করেছেন তেমনি অন্যদিকে পটশিল্পের মধ্য দিয়ে লেখক লোকশিল্পের এক বিশেষ দিক উদ্ঘাটন করেছেন। আদিবাসীদের মধ্যে অলৌকিকের ভয় রয়েছে আর এই ভয়ের জন্য তারা তান্ত্রিকতার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ তান্ত্রিকতার সঙ্গে জনজাতির যে বিশেষ যোগ সেই দিকটি উপন্যাসে বর্ণিত। আর ভৈরবী চিন্তাচেতনার মধ্য দিয়ে লেখক সাঁওতাল মিথটাকে মিশিয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও আদিবাসী জনজাতির মধ্যে প্রচলিত লোককথা, রূপকথা, জনশ্রুতি প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। উপন্যাসের ভাষার মধ্যে লেখক তাঁর মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসে আদিবাসী চরিত্রগুলির মুখে সাঁওতালী ভাষার বিভিন্ন শব্দ, আবার কোনসময় তাদের মুখে সাঁওতালী ভাষার পূর্ণ ও অপূর্ণ বাক্য ব্যবহারে আদিবাসী চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে লেখক সাঁওতালী ভাষার শব্দ, পূর্ণ-অপূর্ণ বাক্যগুলির বাংলা রূপ করে দিয়েছেন। 'অরণ্য-বহ্নি'তে ব্যবহৃত সাঁওতালি ভাষা এবং সাঁওতাল-প্রভাবিত আঞ্চলিক বাক্‌ভঙ্গি প্রসঙ্গে ক্ষেত্রগুপ্ত বলেছেন-"রচনাটির আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ভাষা। লেখক নরনারীর মুখে সাঁওতাল ভাষা মাঝে মধ্যে ব্যবহার করেছেন, যেখানে ভাষা সাঁওতালি নয় সেখানেও আছে প্রচুর সাঁওতালি শব্দের প্রয়োগ। সাঁওতালেরা একটা বিশেষ ঢঙে ও উচ্চারণে বাংলা বলে, তা কিছুটা মিশ্র ভাষা-ও বটে। শুধু সংলাপে নয়, বিবরণ বর্ণনায়-ও ঐ দুরকমের ভাষা ঢুকে পড়ছে। বিবরণ-সংলাপের মধ্যে সীমানা ভেঙ্গে পরস্পর মেশামেশি আছে।"[৬]

আলোচ্য আলোচনার শেষে আমরা এই সীদ্ধান্তে পৌঁছায়, কল্লোলের পরবর্তি সময়ে যে অন্ত্যজ শ্রেণির কথা উঠে আসে সেই পথ ধরেই আদিবাসী জনজাতির কথাও ধ্বনিত হয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বে সাঁওতাল জনজাতির কথা পাওয়া গেলেও 'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসের মধ্যেই প্রথম সাঁওতাল জনজাতির পূর্ণাঙ্গ রূপ ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের মধ্যে সাঁওতাল জাতির শোষণ ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে যেমন বিদ্রোহের

কথা পাওয়া যায় তেমনি সাঁওতাল জনজাতির আচার, সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতির চিত্রের মধ্যে আদিবাসী জনজাতির পূর্ণাঙ্গ রূপের পরিচয় মেলে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'আরণ্যক' উপন্যাসের মধ্যে যেখানে আদিবাসী জাতিদের দিয়ে শিক্ষিত মানুষের কাছে একটা বার্তা দিতে চেয়েছিলেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সেই দিকটির পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তি সময়ে মহাশ্বেতা দেবী এই বিষয়টিকে সামনে রেখে আরও দীর্ঘায়িত করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কৈশোর-স্মৃতি', তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা (প্রথমখণ্ড), নিউবেঙ্গল প্রেস প্রাঃলিঃ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ :বৈশাখ ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭৭

২. 'অরণ্য-বহ্নি' তারাশঙ্কর রচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, ভাদ্র ১৮১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩০৯

৩. তদেব, পৃ. ৩৯৫

৪. তদেব, পৃ. ৩১৯

৫. তদেব, পৃ. ৩৪৬

৬. ক্ষেত্র গুপ্ত, 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' (চতুর্থ খণ্ড), গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ২১৪

গ্রন্থপঞ্জি:

১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কৈশোর-স্মৃতি', তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা (প্রথমখণ্ড), নিউবেঙ্গল প্রেস প্রাঃলিঃ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ

২. 'অরণ্য-বহ্নি' তারাশঙ্কর রচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, ভাদ্র ১৮১৬ বঙ্গাব্দ

৩. ক্ষেত্র গুপ্ত, 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' (চতুর্থ খণ্ড), গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০০৮

৪. ঋষিপ্রতিম ঘোষ, তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১২

৫. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১২

৬. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : ২০১৫-২০১৬

৭. মিল্টন বিশ্বাস, সাব-অল্টার্ন তত্ত্ব : উদ্ভব, বিকাশ ও প্রভাব, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল : মার্চ ২০২১

৮. ড. সুবোধ দেবসেন, বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৯
৯. সম্পা- গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নবম মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৮

রাসসুন্দরী দাসী রচিত 'আমার জীবন' : উনিশ শতকের সাধারণ এক রমণীর আত্মদর্শন : নারীদের যন্ত্রণাময় জীবনের প্রতিচ্ছবি

অন্তিমা ভট্টাচার্য
গবেষক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
মেদিনীপুর,পশ্চিম মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ- উনবিংশ শতকের বাংলার সমাজ ছিল ধর্মীয় এবং সামাজিক কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। নারী জাতির আত্মপরিচয় সৃষ্টি ব্যাপারটা তখন ছিল অনেকটা দিবাস্বপ্নের মত। তবে এ কথা ঠিক বিভিন্ন পুরুষ সাহিত্যিকদের লেখনীতে তৎকালীন নারীদের জীবনযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি অনেক সময় বিক্ষিপ্তভাবে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু তখনো পর্যন্ত মধ্যবিত্ত সংসারের বেশিরভাগ নারীরা শিক্ষার আলোর থেকে বহু যোজন দূরে থাকবার ফলে সেই ভাবে সাহিত্যচর্চার সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারেননি।

কিন্তু রাসসুন্দরী দেবী রচিত 'আমার জীবন' গ্রন্থটি এতদিনের সামাজিক পরিকাঠামোর গোড়ায় প্রত্যক্ষ ভাবে আঘাত হানতে সক্ষম হয়। তাঁর হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে প্রথম কোনও মহিলা সাহিত্যিকের আত্মজীবনী প্রকাশ লাভ করে। অদ্ভুত এবং অকৃত্রিম মাধুর্যমন্ডিত এই গ্রন্থটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সনাতন নিয়মতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে এক সাহিত্যিক প্রতিবাদের ভাষা সেদিন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। সংসারের বাহিরেও যে মেয়েদের একটা নিজস্ব জগৎ থাকা দরকার এ কথা কোনদিনই আমাদের সনাতন সমাজ মনে করে নি। কিন্তু মেয়েরা যেমন একদিকে সংসার সামলে সন্তান প্রতিপালন করতে পারে অন্যদিকে তারা পুরুষদের সমকক্ষ হিসাবে সাহিত্য রচনার মাধ্যমে নিজেদের না বলা কথাগুলি সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে পারে- এ কথা তিনি সেদিন প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। যুগের পর যুগ অবহেলিত এবং উপেক্ষিত হতে হতে বাঙালি মেয়েদের পিঠ সেদিন দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছিল। তাই তাদের বিরুদ্ধে বিধি-নিষেধ- উচিত অনুচিত ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা দ্বারা তাদের জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়েছিল। রাসসুন্দরী দেবীর হাত ধরেই সমস্ত নারী জাতির নিভৃত জীবনের অশ্রুময় জীবনযন্ত্রণার ইতিকথা সাহিত্যিকভাবে অমরত্ব লাভ করতে পেরেছিল।

শব্দসূচক- নারী শিক্ষা,ধর্মীয় গোঁড়ামি,সাংস্কৃতিক মূল্যায়ন,নক্সা, নবজাগরণ,পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, সোহাগীর আরশি,যন্ত্রণাদায়ক উপলব্ধি,অবৈজ্ঞানিক,কন্যাদায়, জীবন-দর্শন,যুগসন্ধি,পৌত্তলিকতা, পালাবদল,জীবন-আলেখ্য।

মূল আলোচনা -

১৯ শতক সময়কালটি বাংলার ঐতিহাসিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যায়নের মাপকাঠিতে অন্যতম প্রধান একটি সন্ধিক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হয়। ভারতে নারী শিক্ষার প্রসার তখনো সেইভাবে প্রসারতা লাভ করতে পারেনি। 'আধুনিকতা' এবং 'নবজাগরণ' নামক শব্দ দুটি সবেমাত্র সাধারণ মানুষের জীবনে ঊষাকালের ক্ষীণ আলোক-রশ্মির মত প্রবেশ করতে শুরু করেছে। আচার-সর্বস্ব হিন্দু সমাজের কৌলিন্যপ্রথা, সতীদাহপ্রথা, বাল্যবিবাহপ্রথা, বহুবিবাহপ্রথার মত ধর্মীয় গোঁড়ামির অবসান ঘটিয়ে এই সময়কালে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো বেশ কিছু শিক্ষিত মহাপুরুষরা নারী-জাগরণ সংগঠিত করার জন্য স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ঘটাতে বদ্ধপরিকর হন। এই কালপর্বে দাঁড়িয়ে ৮৮ বৎসরের একজন প্রৌঢ়া রমণী রাসসুন্দরী দেবী তাঁর আত্মস্মৃতির কথাগুলি সমন্বিত করে 'আমার জীবন' নামাঙ্কিত একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করলেন। তাঁর এই গ্রন্থটির মধ্যে সাধুভাষার গদ্যরীতির মাঝে মাঝে ঈশ্বর-স্তুতিমূলক কবিতার ঠাস বুনানী একে অন্য একটি মাত্রায় প্রতিস্থাপিত করতে পেরেছে। বাংলার সমাজ যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, এমনই এক যুগসন্ধিতে নারী জাতির নতুন রূপে পথ চলার শুভ সূচনা হল। যে নারী জাতি এতকাল পর্যন্ত কেবলমাত্র গৃহিণী পরিচয় দ্বারা আবদ্ধ ছিল, প্রথাগত সেই ইতিহাসকে ভেঙে দিয়ে 'সাহিত্যিক' পরিচয় দ্বারা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামের এক রমণী তাঁর অভিনব নারীসত্তার স্বরূপকে উন্মোচিত করলেন সাহিত্য রচনার মাধ্যমে। বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তন ঘটল নতুন এক মনোবিশ্লেষণের পন্থার।

এতদিন পর্যন্ত মেয়েদের দুঃখ-ক্লিষ্ট জীবনের কথা পুরুষ সাহিত্যিকরা করুণার দৃষ্টিতে গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করেছেন - বাংলা সাহিত্যে এমন দৃষ্টান্ত বহু। কিন্তু একজন সাধারণ-গৃহস্থ রমণী হয়ে তিনি সেদিন সমগ্র বাঙালি নারী জাতির প্রতিনিধি স্বরূপ অবহেলিত রমণীদের অশ্রুময় জীবনকথা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট আঙ্গিকের মাধ্যমে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত করলেন। সর্বোপরি এই গ্রন্থটির মধ্যে লেখিকা তাঁর পরিণত জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করে তৎকালীন সমাজে নারীদের অবস্থানকে বিশেষ থেকে সামগ্রিকতাযুক্ত একটি রূপ দান করেছেন। তার ফলস্বরূপ তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ঘটে যাওয়া বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি আজও পাঠকদের মনে ন্যায়-নীতির প্রশ্ন উত্থাপিত করে। তাঁর রচিত এই গ্রন্থটির সাবলীল বর্ণনাভঙ্গি একদিকে যেমন পাঠকদের মনে দার্শনিকতার উদ্ভব ঘটায়, অন্যদিকে ঠিক তেমনি করেই তা তৎকালীন সমাজের নারীজাতির অবস্থানকে বিবেকবোধের কাঠগড়ায় উপনীত করে। তৎকালীন সমাজে নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ অন্তঃপুরবাসিনীদের তমোময় জীবন-আলেখ্যগুলির নব রূপে বিনির্মাণ ঘটেছে তাঁর এই গ্রন্থটির প্রতিটি পাতায়। সেই সময়ে নারীজাতির সকল লজ্জা, ভয়, কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি যদি এই নক্সাটি রচনা না

করতেন, তাহলে হয়তো আজকের এই বিশ্বায়নের যুগে উপস্থিত নারী জাতি নিজেদের অধিকারের স্থানটা অবলীলাক্রমে অর্জন করতে পারত না। বাংলা সাহিত্য তাঁর হাত ধরে সর্বপ্রথম কোনও মহিলা আত্মজীবনীকারের সন্ধান লাভ করেছিল। এ যেন সমগ্র বাঙালি নারী জাতির লাঞ্ছিত জীবনের ঘুরে দাঁড়ানোর এক অদ্ভুত প্রবণতার কাহিনি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গ্রন্থটি পাঠ করে তাঁর মতামত জানিয়ে বলেছিলেন- "এই গ্রন্থখানি একজন রমনীর লেখা। শুধু তাহা নহে, ৮৮ বছরের একজন বর্ষীয়সী প্রাচীনা রমণীর লেখা। তাই বিশেষ কুতূহলী হইয়া আমি এই গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত হই। মনে করিয়াছিলাম যেখানে কোনো ভালো কথা পাইব সেইখানে পেন্সিলের দাগ দিব। পড়িতে পড়িতে দেখি, পেন্সিলের দাগে গ্রন্থ কলেবর ভরিয়া গেল। বস্তুত ইঁহার জীবনের ঘটনাবলী এমন বিস্ময়জনক এবং ইঁহার লেখায় এমন একটি অকৃত্রিম সরল মাধুর্য আছে যে, গ্রন্থখানি পড়িতে বসিয়া শেষ না করিয়া থাকা যায় না।"[১]

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আগমনের প্রভাবে পরাধীনতা এবং কুসংস্কারের কাঠামোর মধ্যে বেড়ে ওঠা নারী জাতির হাড়ে-মজ্জায় আত্ম-সন্ধানী এক সুপ্ত মনোভাব ধীরে ধীরে জাগ্রত হতে শুরু করল। তাঁর গ্রন্থের চিত্রধর্মী ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় তৎকালীন সমাজের রমনীদের জীবনের যে জীবন্ত এবং কষ্টদায়ক প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, তা সত্যিই আমাদের মতো আধুনিক মানসিকতায় শিক্ষিত মানুষের মনে বিস্ময়বোধ সৃষ্টি করে। তাঁর এই গ্রন্থটিতে উঠে এসেছে তৎকালীন পল্লী রমণীদের জীবনব্যাপী বঞ্চনা এবং নিগ্রহের নিগূঢ় বৃত্তান্ত। এই ধরনের উপাদেয় গ্রন্থটি আজকের একবিংশ শতাব্দীতে অবস্থান করেও প্রত্যেকটি নারীর পাঠ করা উচিত। কারণ জীবনের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গ্রাম্য বধূর অবগুণ্ঠন ত্যাগ করে তিনি অকপটে এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ না করলে হয়তো সারা জীবনের জন্য বাংলা সাহিত্যতে একটি বিশেষ পর্ব অধরা থেকে যেত। উনিশ শতকের বাংলার গ্রাম জীবনের যে পারিবারিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চিত্রগুলি তিনি এই গ্রন্থটিতে সহজ, সরল, সাবলীল ভাষায় অঙ্কিত করেছেন - তা সাহিত্যের ইতিহাসে সেই সময়ের একটি প্রামাণ্য দলিল স্বরূপ আজও প্রতিষ্ঠিত।

ইংরেজশাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রচলিত তথাকথিত মূল্যবোধ এবং প্রথাগত সংস্কারের উপর আকস্মিকভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রবল অভিঘাত হানে। বাঙালি সমাজের সাথে সাথে বাংলা সাহিত্যের মধ্যেও বহুমুখী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায় এই শতাব্দী। এই সময়ের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ভয়াবহ নিয়মতান্ত্রিকতার বন্ধনের বেড়াজালে নারী সমাজকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়েছিল। সমাজের চোখে নারী জাতি ছিল দুর্বল, অবলা, অক্ষম। শিক্ষা গ্রহণ করলে রমণীরা বিধবা হবে, সংসারে ঘোর অকল্যাণ নেমে আসবে, স্বামীর প্রাণহানি হবে - এই ছিল তখনকার সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কার। 'মেয়ে ছেলে লেখাপড়া শিখবে - সংসার যে রসাতলে যাবে! লেখাপড়া শিখলে যে সে অচিরে বিধবা হবে, সন্তানবতী

হলে স্তনের দুগ্ধ শুকিয়ে যাবে, অমঙ্গলে সংসার পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে'- এই ধরনের মিথ্যা-অবৈজ্ঞানিক সামাজিক নিয়মের নাম দিয়ে তাদেরকে সমস্ত ধরনের সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছিল এই কালে। পুরুষরা অর্থ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন জীবিকার সাথে যুক্ত থাকবে, সংসারের দেখাশোনা করবে এবং স্ত্রী জাতি পুরুষদের সহধর্মিনী, সহমর্মীনি এবং সহককর্মিনি হিসেবে ঘর-সংসার দেখাশোনা করবে, সন্তান উৎপাদন করবে- এটাই ছিল তখনকার সমাজের নারী জনমের চরম বাস্তবতার চিত্র। প্রাচীন ইতিহাসে লোপামুদ্রা, ঘোষা, অপালা, গার্গী প্রমুখ মহীয়সী নারীদের বিদ্যার আলোকে আলোকিত থাকবার নিদর্শন পাওয়া গেলেও ধীরে ধীরে নারীজাতির উত্থানকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাদেরকে পর্দানশীন করে রাখবার কুটিল চক্রান্ত গ্রহণ করেছিল। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের এই সংস্কারময়তার ভিত্তিতে প্রথম আঘাত হানে ব্রিটেন থেকে আসা মিশনারিরা। এই সময়ে 'ভারতের নবজাগরণের পথিক' রাজা রামমোহন রায় হিন্দুধর্মের সনাতনপন্থার বিরুদ্ধে গিয়ে বাঙালিকে পাশ্চাত্য আলোয় আলোকিত করার উদ্দেশ্যে এক নব পথের সন্ধান দেন। বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তি সেই সময়ে সামাজিক কু-সংস্কারগুলির আধিক্য দেখে অনুভব করতে পেরেছিলেন নারীশিক্ষার প্রসার ব্যতীত বাঙালি জাতির উন্নতি ঘটানো অসম্ভব। কিন্তু সেই মুহূর্তে সমাজ তাঁদের এই ধরনের ভাবনা-চিন্তাগুলিকে সাদরে গ্রহণ করতে পারেনি। বিনয় ঘোষ এর মতে- "আসলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ বাঙ্গালিদের জন্য নতুন এক পথের সন্ধান করেছিল মাত্র। সেই কারণেই এই সময় জোড়া আন্দোলনে আলোড়িত হয়েছিল বাংলার সমস্ত সমাজ-সংসার। ১৯ শতকের গোড়ায় নারী জাতির সামাজিক অবস্থান খুব একটা মজবুত ছিল না। প্রথমদিকে শিক্ষার দরজা পুরুষের জন্য খুললেও মেয়েদের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। কু-সংস্কারের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়াই যেন তাদের বিধিলিপি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মধ্যযুগীয় ভাগ্যবানেদের প্রভাবে নারী তখন ঘরবন্দি, সমাজের কৌলিন্য শাসন এতোটুকু শিথিল হয়নি। সহমরণ প্রথার তখনও বেশ রমরমা। তবু এক সময় কখন যেন ধীর পায়ে নারী এসে দাঁড়াল শিক্ষার পাদপ্রদীপের আলোয়। ১৯ শতকের গোড়ায় পুরুষ মানুষের আধুনিক হয়ে ওঠার ঘটনাটা ছিল সংবাদপত্রের শিরোনামমাত্র, তারপর ধীরে ধীরে তা স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু নারীর বাইরে বেরোনোটা ছিল সত্যিই এক কঠিনতম লড়াই। তবে নারীকেন্দ্রিক ভাবনা যে সমাজে আস্তে আস্তে আস্তে একটা জায়গা করে নিচ্ছিল - এই শতকের আন্দোলনগুলিতে তাদের ব্যাপক উপস্থিতিই সেই ধারণার ইঙ্গিতকে চিহ্নিত করে।"[২] এরূপ অজস্র টানা-পোড়েন এবং নৈতিক বৈপরীত্যের মাধ্যমে বাঙালি জাতি অগ্রসর হয়ে চলছিল উনিশ শতকের সময়পর্বতে । সময়ের প্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে মানুষের বিবেচনা, বিশ্লেষণবোধ অগ্রসরতা লাভ করতে থাকে। আইনগতভাবে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও গ্রামে-গঞ্জে উনিশ শতকের

প্রায় আটের দশক পর্যন্ত সময় ধরে বিভিন্ন স্থানে এই প্রথা বর্তমান ছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেয়েরা স্বেচ্ছায় সতী হলেও বেশিরভাগ সময়ই জোর করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাদেরকে সতীত্বের নামে জীবন্ত স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারত। যদিও হিন্দু কলেজ, শ্রীরামপুর সমাজ, বেথুন কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত সভা, জাতীয় কংগ্রেসের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি এই শতাব্দীতেই তৈরি হয়েছে তবুও উনিশ শতক বাংলার ইতিহাসে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি সময়।

রাসসুন্দরী দেবী তাঁর এই গ্রন্থটিতে নারী জীবনকে চারটি পর্বে ভাগ করে উত্থাপিত করেছেন। একজন গৃহস্থ সাধারণ রমণী তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য - এই চারটি দশায় সংগঠিত বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা স্মৃতির রোমন্থন দ্বারা সমন্বিত করেছেন এই গ্রন্থটিতে। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর বর্ণনাভঙ্গির মৌলিকতায় তার জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে সেই সময়কার সকল নারী সমাজের জীবনচর্যার দর্পণ। তখনকার সময়ে মেয়েদের শৈশব আট-দশ বছরের শেষ হয়ে যেত। তাঁর শৈশবকালের স্মৃতিকে তিনি তাঁর গ্রন্থে এইভাবে বর্ণনা করেছেন- "ছেলেদের জন্য বাংলা স্কুল আমাদের বাড়িতেই ছিল। একজন মেমসাহেব সেই স্কুলে গ্রামের সমস্ত ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইতেন। আমার খুড়া আমাকে কাল রঙের একটা ঘাগড়া পরাইয়া একখানা উড়ানী গায়ে দিয়া সেই স্কুলের মেমসাহেবের কাছে বসাইয়া রাখিতেন। আমি সকল দিবস সেই স্কুলেই থাকিতাম। তখন ছেলেরা ক খ চৌত্রিশ অক্ষর মাটিতে লিখিত, যুক্তাক্ষরও লিখিত ; পরে এক নুড়ি হাতে লইয়া ঐ সকল লেখা উচ্চৈঃস্বরে পড়িত। আমি মনে মনে ঐ সকল পড়াই শিখিতাম।"[৩] তাই হয়তো পরবর্তীকালে তিনি বড় ছেলের চৈতন্যভাগবত পুঁথির পাতা রান্নাঘরে লুকিয়ে রেখেছিলেন অবসর সময় মত পড়বেন বলে। রান্না করার ফাঁকে ফাঁকে সেই পাতার পাঠোদ্ধার করার চেষ্টা করতেন। পুঁথি পড়তে পারলেও ছাপার অক্ষরের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না, তাই পড়তে পারলেও তিনি লিখতে পারতেন না। কিন্তু তার পুত্র কলকাতায় পড়াশুনার জন্য গমন করলে সন্তানের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য তাকে লিখতে শিখতে হল- তখন তাঁর বয়স ২৫ বছরের উপর। এত বছর ধরে তাঁর হৃদয়ে লালিত-পালিত এক সুপ্ত বাসনার পরিপূর্ণতা সম্ভবপর হল। স্বপ্নপূরণের পর তাঁর উপলব্ধি - ' আহা কি আক্ষেপের বিষয়! মেয়েছেলে বলিয়া কি এতই দুর্দশা! চোরের মত যেন বন্দী হইয়াই থাকি, তাই বলে কি বিদ্যাশিক্ষাতেও দোষ? সে যাহা হউক, এখনকার মেয়েছেলেগুলা যে নিষ্কণ্টকে স্বাধীনতায় আছে, তাহা দেখিয়াও মন সন্তুষ্ট হয়। এখন যাহার একটি মেয়েছেলে আছে সে কত যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিখায়। এই লেখাপড়া শিখিবার জন্য আমাদের কত কষ্ট হইয়াছে। আমি যে যৎকিঞ্চিৎ শিখিয়াছি, সে কেবল সম্পূর্ণ পরমেশ্বরের অনুগ্রহে মাত্র।' পড়াশোনা শেখার পরেও তাঁর মনে ভয় ছিল, পাছে কেউ তাঁকে বিদ্যাচর্চার জন্য অপমান করে।

তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় শৈশবের শেষপ্রান্ত থেকেই শুরু করা হতো মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর সামাজিক এবং পারিবারিক পদ্ধতিগুলি। এই সময় থেকে তাকে সংসারে বিভিন্ন ঘরকন্যার, কাজে হাতেখড়ি দেওয়া শুরু করা হতো সংসারের কোন বর্ষীয়সী গৃহিণীর কাছে। 'সোহাগীর আরশি' রাসসুন্দরী দেবী সেদিন উপলব্ধি করেছিলেন 'মেয়েছেলে হওয়া মিছা'। শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সাথে সাথেই তখনকার মেয়েদের সৃষ্টিশীল হৃদয়কে বিশাল কর্মযজ্ঞের হাঁড়িকাঠে বলি দেওয়া হতো। নারীদেরও যে একটা মন আছে, তাদেরও যে একটা অবসরের প্রয়োজন - তৎকালীন সমাজ বা সংসার কিন্তু এই কথাটিকে কোনোভাবেই গুরুত্ব দান করত না। তাই আক্ষেপের স্বরে তিনি বলেছেন -"ওরে আমার মন! তুমি আমাকে একেবারে ভবকূপে ডুবাইয়া রাখিয়াছ। ওরে আমার মন! তোমার কি এই কাজ? মন, আমার সর্বস্বধন তোমার হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। মনরে তোমার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া আমার হৃদয়কম্প হইতেছে। মনরে, এই রত্নপূর্ণ ভারতবর্ষ, এই ভারতবর্ষে কত অমূল্য রত্নের খনি রহিয়াছে। কত শত দরিদ্র আসিয়া এমন যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চিত করিয়া মহাজন হইয়া বসিয়াছেন। আমি নরাধম, মায়ার দাস হইয়া বিষয় গর্তে পড়িয়া আছি। হায়রে, হায়, আমার মানব জনম বৃথা গেল। মনুষ্য জন্ম দুর্লভ জন্ম, সে দুর্লভ মানবদেহ পাইয়া রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দ না ভজিয়া মন, তুমি এই মাকাল ফলে ভুলিয়া রহিয়াছ। আমার জীবনের নিশি শেষ হইয়াছে, আর সময় নাই।"[৪] সেই সময়ে পরিবারের গৃহিণী বাড়ির গৃহকর্তা, তাঁর সন্তানদের, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দেখাশোনা ও পরিচর্যা করতেন। কিন্তু একজন স্বামী হিসাবে স্ত্রীর উপর সামান্যতম দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতেন এমন স্বামীর সংখ্যা তখনকার সমাজে ছিল হাতে গোনা। পুরুষজাতি বেশিরভাগ সময়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ ও বিভিন্ন রকম কারবার নিয়েই ব্যস্ত থাকত।

একজন নারী তখনকার সময়ে ১০-১৫ বার গর্ভধারণ করতে বাধ্য হতেন। তার ফলস্বরূপ তাঁদের জীবন আরো বেশি বিপন্ন হয়ে পড়তো। অন্যদিকে আবার অধিক সংখ্যক সন্তান নারীদের জীবনে নিরন্তর গোলযোগ সৃষ্টি করত। সংসারের সমস্ত দিক দেখাশোনা করার পর, সন্তানদের বায়না মিটিয়ে মায়েদের নিজস্ব কোন শখ-আহ্লাদ আর পূরণ হতো না। সন্তানদের সকলের খাওয়া-ঘুম একসঙ্গে সম্ভবপর হতো না। তাই সমস্ত ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হতো তাদের মায়েদের। আবার কখনও কখনও সন্তানের অকাল মৃত্যুতে তাদের মাতৃহৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে যেত। এর উপর ছিল নারীদের বৈধব্য জীবনের যন্ত্রণাদায়ক উপলব্ধির ইতিকথা। কখনো কখনো মেয়েরা তখন বাল্যকালে বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে প্রেরিত হত। হিন্দু রমণী বিধবা হলে তার হাতের শাঁখা, শরীরের অলংকার, জীবনের সমস্ত শখ- আহ্লাদকে বিসর্জন দিতে হতো। এই সম্পর্কে R.Lewison বলেছেন- " It is the consequence of an unparallel sextual slavery imposed on the Hindu widow women by Men and Society.

My own opinion and that of my friends is that obstacles to the re-marriage of Hindu widows should be fought with removed and the draught act passed into law at once. The majority of the students present on the occasion spoke in favour of re-marriage in the Hindu Society. The needless regulation will be held with enthusiasm be every man possessed of a park of feelings."[৫] কিন্তু সেই যুগে সমাজের কোনও পুরুষ মানুষের স্ত্রী-বিয়োগ ঘটলে বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর পরবর্তী বিবাহ করতে কোনও সামাজিক বিধি-নিষেধ ছিল না। কিন্তু অদ্ভুত নিয়ম প্রচলিত ছিল নারীজাতির ক্ষেত্রে। বিধবা বিবাহের প্রচলন সেই সময়ে আইন করে চালু হলেও স্বামীর মৃত্যু ঘটলে স্ত্রী জাতিরা সংসারে অবাঞ্ছিত হিসাবে বিবেচিত হতো। সমস্ত সমাজ- সংসার থেকে তাদেরকে পৃথক করে রেখে তাদের জীবনকে নরক-যন্ত্রণা দিয়ে অতিষ্ঠ করে তোলা হতো। কখনো কখনো সংসারের লম্পট পুরুষদের পাশবিক অত্যাচারে অবৈজ্ঞানিকভাবে তাদের গর্ভপাত ঘটানোর কাহিনিও তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছিল। নানা ব্রত-উপবাস-আচার-বিচার- পালন ইত্যাদির নামে সংসারে উপেক্ষিত হয়েই তাঁরা তাঁদের বাকি জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হত।

সেযুগে হিন্দু পরিবারের মেয়েরা আদরের তো ছিলই না বরঞ্চ বাবা-মার কাছে তারা ছিল পরিবারের ভারস্বরূপ। তাই বিবাহের মাধ্যমে পাত্রীর পিতা-মাতা তাঁদের 'কন্যাদায়' কর্মটির দ্বারা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করতেন। সংসারের ২৫-৩০ জনের অন্য ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করার পর বেশিরভাগ সময়ই বাড়িতে গৃহিণীদের খাবারে টান পড়ত। এরপর প্রত্যেক গৃহিণীকে বাড়ির বিগ্রহ-সেবার ব্যবস্থা করতে হতো। এর সাথে ছিল নিত্য নৈমিত্তিক অতিথি-সেবার ব্যবস্থা। এরপর সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন নিয়ম-শৃঙ্খলাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁরা পালন করতে বাধ্য হতো। কলুর বলদের মত মেয়েদেরকে মোটা কাপড়ে বুক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে সংসারের সমস্ত কাজ নীরব থেকে বিনা প্রতিবাদে সম্পন্ন করতে হতো। পারিবারিক অনুষ্ঠান বিশেষে কখনো কখনো তাদেরকে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত কাজ করতে হত। কিন্তু এত কিছুর সত্ত্বেও পরিবারে বা সমাজে মেয়েদের কোনও নিজস্ব স্বাধীনতা তখন ছিল না। মেয়েরা প্রথম জীবনে থাকতো পিতৃগৃহের অধীনে, তারপর থাকতো স্বামীর অধীনে এবং তারপর শেষের জীবন থাকতো সন্তানের অধীনে। মেয়েরাও যে সমাজে দশজনের একজন হতে পারে, তাদের দিয়েও যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্যনির্বাহ করা সম্ভব - একথা তখন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বিশ্বাস করতে পারত না। ফলত মেয়েরা সংসারে এবং সমাজে চিরটাকাল ছিল শক্তিশালী পুরুষতান্ত্রিকতার দ্বারা অবহেলিত- অবদমিত।

আপাতদৃষ্টিতে তাই রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনীটি কেবলমাত্র একটি সাধারন গ্রন্থ হয়ে থাকে নি, তা হয়ে উঠেছে তৎকালীন প্রগতিশীল নারীজাতির পরোক্ষ প্রতিবাদের ধারা ভাষ্য। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু ঘটনাগুলিকে

দার্শনিকতার মাপকাঠিতে বিচার ও বিশ্লেষণ করবার অসামান্য ক্ষমতার বলে 'আমার জীবন' নামক গ্রন্থটি খুব স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন সময়ের একজন নারীর মৌলিক রচনাশৈলী ও শিল্পভাবনার পরিচয়বাহী হয়ে উঠতে পেরেছে। আধুনিক এক স্বশিক্ষিত রমণীর হাতে লিপিবদ্ধ হল অন্তঃপুরবাসিনীদের নিভৃত জীবনের ইতিহাস। তাঁদের ঘন যামিনীময় উপেক্ষিত জীবনের 'না বলা বাণী' এতকাল পর পাহাড়ের ঝর্ণার মুক্তধারার মতো উৎসারিত হল। সেই যুগের নারী জীবনের তথাকথিত সমস্ত ভীরুতা কাটিয়ে এক অক্ষয়- অভয় মন্ত্রে তিনি যেভাবে দীক্ষিত হতে পেরেছিলেন - তা আধুনিক সময়ের নিরিখে আজও অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয়। তৎকালীন হিন্দু সমাজের পৌত্তলিকতার সংকীর্ণতা অতিক্রম করে তিনি অধ্যাত্মবাদী জীবন-দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এককথায় বলা যায়, তাঁর হাত ধরেই সেই সময়কার জ্ঞানের আলোয় স্বল্পালোকিত নারী সমাজ পালাবদলের আগামী দিনগুলি প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিল ।

তথ্যসূত্র :

১. বারিদ বরণ ঘোষ (সম্পাদিত), রাসসুন্দরী দাসী আমার জীবন,জানুয়ারি ২০১৭, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট(তৃতীয় সংস্করণ),নয়াদিল্লি,পৃ.- vii

২. স্মৃতিকণা চক্রবর্তী,উনিশ শতকের সংবাদ-সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, রত্নাবলী (দ্বিতীয় খন্ড),তৃতীয় সংস্করণ,২০১৩,কলকাতা-৭০০০০৯,সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার (সম্পাদিত),পৃ.-৮৩১

৩. বারিদ বরণ ঘোষ (সম্পাদিত),রাসসুন্দরী দাসী আমার জীবন,২০১৭,ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট(তৃতীয় সংস্করণ),নয়াদিল্লি,পৃ.-১১৪

৪. বারিদ বরণ ঘোষ (সম্পাদিত),রাসসুন্দরী দাসী আমার জীবন,২০১৭,ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট(তৃতীয় সংস্করণ),নয়াদিল্লি,পৃ.-৮৬

৫. R.Lewison,A history of sexual custom,Fawcett Publication, Minnesota,1964,p.-133

লোকসাংস্কৃতিক ভাবনার আলোকে সেলিম আল দীনের 'প্রাচ্য' নাটক

কমল রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস

সংক্ষিপ্তসার : নাট্যকার সেলিম আল দীনের 'প্রাচ্য' (২০০০) নাটকটিতে আবহমান বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতির নিপুণ চিত্র অনবদ্যরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে। ইউরোপীয় সমাজ বোধ, জীবন দর্শন ও ইউরোপীয় নাটকের রচনারীতির পরিবর্তে এতে প্রাচ্য জীবন দর্শন, সমাজ বোধ ও বাঙালির নিজস্ব পাঁচালি আঙ্গিকের ব্যবহার দেখা যায়। নাট্যকার সেলিম আল দীন মধ্যযুগের পাঁচালির আঙ্গিককে অবলম্বন করে সমকালীন শিল্পবৈশিষ্ট্য ও শিল্পরুচির মাত্রা যোগে রচনা করেন 'প্রাচ্য' নাটক। নাট্যকার গ্রাম বাংলার সংস্কৃতিজাত নানা উপাদানের সার্থক রূপায়ন করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে সেই দিকটিকেই তুলে ধরার চেষ্টা থাকবে।
সূচক শব্দ : লোকখাদ্য, পণপ্রথা, লোকসংগীত, বধূবরণ, লোকবিশ্বাস, প্রবাদ।

বিশ শতকের সত্তর থেকে একুশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের একজন শক্তিশালী নাট্যকার সেলিম আল দীন (১৯৪৯ – ২০০৮)। নাট্যকার ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন নাট্য গবেষক। নাটকের গড়ন-গঠন নিয়ে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। পাশ্চাত্য নাট্যরীতির অন্ধ অনুকৃতিকে পাশ কাটিয়ে এক ভিন্ন নাট্য আঙ্গিকে তিনি নাটক রচনা করে নাট্যসাহিত্যে সমাদৃত হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী স্বাজাত্যবোধের ভাবনায় ভাবিত হয়ে সমকালীন বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য নাট্যকারদের থেকে তিনি স্বতন্ত্র নাট্যরীতিতে নাটক রচনা করে গেছেন। স্বাজাত্যবোধের তীব্রবাসনায় স্বদেশ ও সমকালকে কেন্দ্র করে তাঁর নাট্য-ভাবনা জারিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের শিল্প সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ এবং পাশ্চাত্য প্রভাবমুক্ত করার লক্ষ্যে তিনি শিল্পভাবনায় এক স্বতন্ত্র পথের যাত্রী হন। তাঁর লেখা নাটকগুলির মধ্যে একটি অন্যতম নাটক হল 'প্রাচ্য'। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে এই নাটকটি রচিত, নাটকটির মঞ্চায়ন ও গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল হল ২০০০ খ্রিস্টাব্দ। নাট্য নির্দেশক নাসির উদ্দিন ইউসুফের নির্দেশনায় ও 'ঢাকা থিয়েটার'-এর প্রযোজনায় এটি মঞ্চস্থ হয়। নাটক রচনার প্রথম পর্যায়ে কিছু সংখ্যক নাটকে প্রচলিত নাট্য আঙ্গিককে অনুসরণ করলেও পরবর্তীতে তিনি নাটকের আঙ্গিক নির্মাণে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন পথের যাত্রী। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'প্রাচ্য' নাটকের 'কথাপুচ্ছ' অংশে আলোচ্য নাটকের আঙ্গিক বিষয়ে নাট্যকার জানিয়েছেন— 'প্রাচ্যর আঙ্গিক আমার অন্য উপাখ্যান বনপাংশুল-এর মতোই পাঁচালির প্রেরণাজাত। তবে প্রেরণাজাত বললে বোধ হয় সত্য ভ্রষ্টতা ঘটে। দুটি রচনাতেই আমি

পাঁচালির মহাকাব্যিক আঙ্গিকের শক্তিকে একালের পাশ্চাত্য নিবিষ্ট শিল্পরীতির মুখোমুখি দাঁড় করাতে চেয়েছি...।'[১] বাঙালির চিরায়ত লোকজ অভিনয়রীতিকে আত্মস্থ করে তাকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মঞ্চে রূপদান করাই ছিল 'প্রাচ্য' নাটকে নাট্যকারের উদ্দেশ্য। নাটকের রচনারীতিতে যেমন লোকজ অভিনয়রীতির আঙ্গিককে তিনি গ্রহণ করেছেন, তেমনি অধিকাংশ নাটকের কাহিনি নির্মাণের ক্ষেত্রেও তিনি বাংলাদেশের লোকায়ত সমাজের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর রচিত অধিকাংশ নাটকেই গ্রামীণ মানুষের প্রতিশোধ, নিষ্ঠুরতা, প্রেম-ভালোবাসা, বঞ্চনা, শোষণ ও জীবন সংগ্রামের এক বিরাট ছবির উন্মোচন লক্ষ করা যায়। বাঙালির হাজার বছরের শিল্পরুচির আঙ্গিকের সঙ্গে আধুনিক শিল্পচর্চার মেলবন্ধন ঘটাতে চান তিনি। আলোচ্য 'প্রাচ্য' নাটকে তাঁর এই প্রচেষ্ঠা অনেকাংশেই সার্থক হয়েছে বলে মনে হয়। বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনপ্রবাহের উৎসব-অনুষ্ঠানাদি, বিবাহ, রীতি-নীতি, সাধারণ মানুষের শিল্পরুচি, বিশ্বাস, সংস্কার, ভাষা ও লোকায়ত জীবন পরিবেশ নিয়ে 'প্রাচ্য' নাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। নাটকের অধিকাংশ অংশ জুড়ে রয়েছে গ্রামীণ জীবনপ্রবাহের নানা সাংস্কৃতিক চিত্র। প্রাচ্য জনপদের ঐতিহ্যবাহী লোকায়ত জীবনচর্চার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় সেলিম আল দীনের 'প্রাচ্য' নাটকে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে— মধ্যযুগের পাঁচালির আঙ্গিকে এই নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে আধুনিক লোক জীবনচর্চা। মধ্যযুগে রচিত বাঙালির জনপ্রিয় পুরাণ মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনিকে অবলম্বন করে তিনি অসাধারণ কৌশলে বাঙালির লোকজীবনের আনন্দ উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক সংস্কার, চিরায়ত বিশ্বাস প্রভৃতি লোকজ সংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গ আলোচ্য নাটকে উঠে এসেছে।

বাঙালির অতিপরিচিত একটি পুরাণ কাহিনিকে অবলম্বন করে তাকে সমকালের প্রেক্ষাপটে নাট্যকার পুরাণ কাহিনির পুনঃনির্মাণ করেছেন। মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলা লক্ষীন্দরের গল্পে স্বামী লক্ষীন্দরের সর্প দংশনে মৃত্যু ঘটে অপরদিকে 'প্রাচ্য' নাটকে সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী নোলকের সর্প দংশনে মৃত্যু ঘটে। সয়ফর ও নোলক নামে দুই পাত্র-পাত্রীর বিয়োগাত্মক প্রণয় কাহিনিই 'প্রাচ্য' নাটকের মুখ্য বিষয়। সদ্য বিবাহিত এক নববধূর সর্প দংশনে মৃত্যুর ঘটনা 'প্রাচ্য' নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় হলেও সমগ্র নাটক জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বাংলাদেশের গ্রামীণ লোকজীবনের টুকরো টুকরো ছবি। নাটকের নায়ক চরিত্র সয়ফরচান। শ্রাবণের রাতের ভাসান যাত্রার আসরে দর্শকের সারিতে একঝলকে দেখা নোলক নামের একটি মেয়ের সাথে দরিদ্র সয়ফর চানের বিবাহ। দূরগ্রাম কাজলাকান্দায় সয়ফর চান বিবাহ করতে গিয়েছে। কনের বাড়িতে বিবাহ দৃশ্য দিয়েই নাটকের শুরু। তারপর বরযাত্রীদের কনেসহ ফিরতি যাত্রার বর্ণনাংশ নাটকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। এই বিবাহ উপলক্ষ্যে বর ও কনের বাড়িতে পালন করা হয়েছে বিবাহের নানা মাঙ্গলিক আচার-আচরণ, উৎসব-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি। এবং তার পাশাপাশি নাটকের বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরায় লোকসংস্কৃতির নানা

উপাদান লক্ষ করা যায়। এই নাটকে যেসকল বিবাহসংগীত, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, বিশ্বাস, সংস্কার, সামাজিক প্রথা প্রভৃতি লোকসাংস্কৃতিক চিত্র উঠে এসেছে সেগুলি তুলে ধরাই হল আলোচ্য প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রাবণের এক ভাসান যাত্রার আসরে দেখা নোলক নামের এক মেয়ের সাথে দিনমজুর সয়ফরচানের বিবাহ। সয়ফরচান শামুকভাঙ্গা থেকে দূরগ্রাম কাজলাকান্দায় বিয়ে করতে এসেছে। বর সয়ফরচান কনের বাড়িতে বিবাহ করতে এলে গৃহ প্রবেশের দর হিসেবে কন্যাপক্ষের থেকে বর সয়ফরের কাছে আশি টাকা চাওয়া হয়। বর বিয়ে করতে গেলে গৃহ প্রবেশের দর কষাকষির বিষয়টি আজও গ্রামবাংলার প্রায় সকল বিয়ে বাড়িতেই লক্ষ করা যায়। গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত এই রীতিনীতির ছবিই আলোচ্য নাটকে ফুটে উঠেছে—

'সাঁঝের বিবাহ বরের গৃহ প্রবেশের দর কষাকষি আশি টাকা ...'[২]

'প্রাচ্য' নাটকটিতে বাংলাদেশের একটি গ্রামীণ মুসলিম পরিবারের বিবাহের ছবি রয়েছে। আনাম খাঁর কন্যা নোলক ও সয়ফরচান ছিল মুসলিম পরিবারের সন্তান। মুসলিম বিবাহের রীতি অনুযায়ী বিবাহের সময় সাক্ষীদ্বারা কনেকে বিবাহ কবুল করানো হয়। আলোচ্য নাটকে এই রীতি-নীতির উল্লেখ রয়েছে—

'মধ্যরাতে কলমা কবুল হল নোলক নামের মেয়েটির নাক চোখের মিলিত পানিতে।। ... বিবাহ কবুল হলে চিকনা কাজি সহাস্যমুখে কবুলের তিন সাক্ষীসহ বেরিয়ে আসে। কাবিননামা হাজার টাকা।'[৩]

পৃথিবীর সকল সমাজেই বিবাহ মানেই একটি আনন্দের উৎসবানুষ্ঠান। এই আনন্দ উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিয়ে বাড়িতে নানা ধরনের খাবারের আয়োজন করা হয়ে থাকে। নোলকের পিতা দিনমজুর আনাম খাঁও তার একমাত্র আদরের মেয়ের বিবাহে খাবারের আয়োজনের বিন্দুমাত্র ত্রুটি রাখেনি। আলোচ্য নাটকে উল্লেখিত লোকখাদ্যের চিত্রটি নাট্যকার অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন –

'পুয়া পিঠা নকশী এবং চিতই রসা।
অনেক ভাত সেদ্ধ ডিম লাউরের ঘাটা।।
সঙ্গে ডাল অনেক ঝোল জিভ পুড়া ঝাল।
কুটি কুটি মুরগার গোশ নতুন আলু।।'[৪]

বিবাহ উপলক্ষ্যে অনেক সমাজেই পণপ্রথার প্রচলন রয়েছে। এই প্রথা অনুযায়ী কনে পক্ষের পিতাকে বরপক্ষকে টাকা-পয়সা, ঘর সাজাবার জিনিসপত্র প্রভৃতি দিতে হয়। আলোচ্য নাটকের নোলক ও সয়ফরচানের বিবাহেও নোলকের পিতাকে বিবাহের যৌতুক দিতে হয়েছে। যৌতুক হিসেবে কনে পক্ষের পিতাকে বিবাহের লেপতোষক, রূপার অলঙ্কার, তিনশত টাকা, জুতা, লুঙ্গি, গামছা দিতে হয়েছিল। দরিদ্র আনাম খাঁকে শেষমেষ গরু বিক্রি করে এই লেপতোষকের বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল।

লোকসংস্কৃতির উপাদানের মধ্যে লোক সাহিত্যগত উপাদানই অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে। লোক সাহিত্যগত উপাদানের মধ্যে আবার ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, লোকসংগীত, লোককথা প্রভৃতি শাখা রয়েছে। বিবাহ বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লোকসমাজে নানা ধরনের লোকসংগীতের প্রচলন রয়েছে। এই ধরনের সংগীতগুলিকে এককথায় বিবাহ সংগীত বলা হয়ে থাকে। এই নাটকেও বিবাহ সংগীত রয়েছে। রাত পোহালেই কন্যা নোলককে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে স্বামীগৃহে চলে যেতে হবে। জন্মের পর থেকে যে বাপ-মার বাড়িতে মেয়ের বেড়ে ওঠা সেই জন্মস্থান, বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সব ত্যাগ করে মেয়েদেরকে স্বামী গৃহে যেতে হয়। সমাজের এই নিয়ম অনুযায়ী নোলককে রাত পোহালেই পতিগৃহে যেতে হবে। সেই উপলক্ষ্যে গ্রামের দুটি মেয়ের কণ্ঠে একটি বিবাহ সংক্রান্ত গান শোনা যায়—

'বালিরে তুই কই ছিলি এতদিন।
আমি ছিলাম মায়ের কোলে রে
ছিলাম নিশিদিন।।
কি ছিল বালিরে তোর কাজলাকান্দার ঠাঁই।
আমার ছিল বাপের আদর বইন সোদর ভাই।।
মাও বাপরে ছাড়িয়ারে বালি কোনবা পন্থে যাবি।
ডাকাইত আইস্যা নিয়া গেলরে আঞ্চলে দিল চাবি।।...'[৫]

পৃথিবীর কম-বেশি সকল সমাজেই বিবাহ বাড়িতে বিভিন্ন আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। সয়ফর ও নোলকের বিবাহ অনেষ্ঠানেও এরকম আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নোলকের পিতা আনাম মিয়া পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায় পালকি নৃত্যকদের নিয়ে এসেছে। আজানের শেষে নামাজের পর পালকি নৃত্যকদের মাঙ্গলিক নাচ শুরু হয়। মাঙ্গলিক চিহ্ন হিসেবে পালকি নৃত্যকেরা মুখে চুন এবং কালি মেখেছে। কারণ, পালকি নৃত্যকদের নাচের সঙ্গে যাতে ভূত প্রেত না আসে। শরীরে মাঙ্গলিক চিহ্ন মেখে গানের তালে তালে পালকি নৃত্যকদের তুমুল নাচ শুরু হয় –

'জোলেখা কান্দিয়া বলে ইছপে অপার।
স্বপনে তোমারে দেখি কান্দি একাকার।।
মাঘ মাসে কঠিন শীত লাগে না শরীরে।
অঙ্গারের তাপে নিত্য জ্বলিয়া পড়িরে।।
দারুণ ফাল্গুন মাসে ডাকিলে কোকিল।
মশারি টাঙাইয়া শুই ঘরে দিয়া খিল।। ...'[৬]

পালকি নৃত্যের পরেই নববধূ পালকিতে চড়ে বসে। সমাজের প্রথা অনুযায়ী বিবাহের পরে মেয়েকে তার শ্বশুর বাড়ি যেতে হয়। তাই বিবাহ শেষে এবার বধূর পালকিতে ওঠার পালা। নোলক পালকিতে ওঠে পড়লে এবার পালকি নৃত্যকদের উঠান

প্রদক্ষিণের পালা শুরু হয়। পালকি নৃত্যকেরা পালকি নাচের গানের সাথে সাথে বিবাহ বাড়ির উঠান প্রদক্ষিণ করে চলে।

তিন পাক উঠান প্রদক্ষিণ করে পালকি নৃত্যক ও বর যাত্রীদের দল কনেসহ সয়ফর চানের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। নোলকের শ্বশুর বাড়ি যাত্রার মুহূর্তে সখীরা গান ধরে –

নোলক যায় গো শ্বশুর বাড়ি
শামুকভাঙ্গা গাঁয়।
তারে নি আর ফিরা পাব
ভাই বাপ আর মায়।।'[৭]

আট মাইল পথ অতিক্রম করে পালকি নামানো হয় সয়ফর চানের উঠানে। শুরু হয় বাসর সজ্জা ও বধূবরণের পালা। বধুবরণ ও বাসর সজ্জার ভার ছিল পাড়ার কুমারী মেয়েদের উপর। সয়ফরের বাড়িতে নববধূর আগমন ঘটলে পাড়ার কুমারী মেয়েরা গান ধরে—

'এই না আইলো দামাদ লো
সঙ্গে লইয়া পরী লো।
এই না বাসর আবের পাঙ্খা
মাথার উপরে ধরি লো।।'[৮]

সয়ফর নোলকের বিবাহ অনুষ্ঠানে গ্রামের একজন সুন্দরী মুখরা মহিলা বকশিশের দাবিতে বর-কনের গৃহ প্রবেশের পথ আগলে রাখে। বর-কনের কাছ থেকে বকশিশ দাবির পালা শেষ হলে চলে নানা মাঙ্গলিক স্ত্রী আচার-আচরন—

'একজনা দুর্বাধান চালের গুড়ি
দাদির কাঁপা কাঁপা দুই হাতে
মাথার উপর বুলিয়ে নেয়।
দুই কুমারী বহন করে আনে
শিলের পাটা।
তার উপর দাঁড়ায় নোলক।।...'[৯]

লোকজীবনে সাপকে কেন্দ্র করে নানা রকমের লোকবিশ্বাস রয়েছে। যেগুলি যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ঐতিহ্যগতভাবে চলে আসছে। আলোচ্য নাটকেও এই ধরনের লোকবিশ্বাসের দৃষ্টান্ত রয়েছে।সদ্য বিবাহিতা নববধূ নোলককে বিবাহের বাসর রাতেই সাপে কামড়ায়। এরপর তাকে বাঁচাতে পাড়ার লোকজন সাপের বিষ নামানোর জন্য ওঝার জন্য ছোটাছুটি করে। এই ওঝার প্রতি গ্রামবাংলার লোকেদের অগাধ বিশ্বাস রয়েছে। সাথে সাথে সয়ফরের বাড়ির উঠান লোকে ভর্তি হয়ে যায়। পাড়ার কেউ একজন বলে—

'সাপ আর বাঘ কপালের লিখন।।'[১০]

অর্থাৎ, গ্রামের লোক বিশ্বাস করে যে, কপালে লেখা থাকলেই সাপ মানুষকে কামড়ায়। অপরদিকে আর একজন কেউ বলে ওঠে—

‘ফাল্গুইনা মাসে সাপের বিষ কম। বাঁচবারও পারে।।’[১১]

বিপদে-আপদে এই ধরনের লোকবিশ্বাসই গ্রামবাংলার লোকেদের একমাত্র সহায়। এরপর সাপের বিষের গুপ্ত রহস্য জানা মালেক ওঝার আগমন ঘটে। দংশনকারী সাপটি যাতে সয়ফরের বাড়ি থেকে পালাতে না পারে সেজন্য সে মন্ত্র দিয়ে সয়ফরের বাড়ি বান্ধে। মালেক ওঝা শেষ পর্যন্ত নোলককে বাঁচাতে না পারলে সে রোগীকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত লোকসাহিত্যের একটি অন্যতম শাখা হল প্রবাদ। গ্রামীণ লোকসমাজে নানা ধরনের প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রবাদের মধ্যেদিয়ে লোকমানুষের চিন্তা-চেতনা ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। আলোচ্য নাটকেও প্রবাদের উল্লেখ রয়েছে। গ্রামের দিনমজুরি করে খেটেখাওয়া মানুষ পাম্প সু (একধরনের জুতো) পরতে অভ্যস্ত নয়। বিয়ের রাত থেকে দীর্ঘক্ষণ ধরে সয়ফর মোজা ও পাম্প সু পরাতে বিবাহ শেষে বাড়ি ফেরার পথে দীর্ঘ পথ হাঁটার ফলে সয়ফরের বাম পায়ে ফোস্কা পড়ে যায়। পায়ে ফোস্কা পড়ার কথাটি নোলকের ছোটভাই ইস্রাফিল জানতে পারলে সে সয়ফরকে নিম্নলিখিত প্রবাদটি শোনায়—

‘কুত্তার প্যাটে ঘি হজম হয় না দুলাভাই।।’[১২]

নাট্যকার সেলিম আল দীন এই নাটকে মনসামঙ্গলের বেহুলা লক্ষীন্দর পালার উল্টা কাহিনি রচিত করেছেন। এখানে স্বামীকে নয়, সয়ফর চানের নববধূ নোলককে সাপে কামড়ায়। পৌরাণিক চরিত্র নেতার পরামর্শে বেহুলা তাঁর সকল কর্ম সম্পাদন করে—অপরদিকে ‘প্রাচ্য’-তে সয়ফর নিজ বুদ্ধির সহায়তায় তার কর্তব্য স্থির করেন। বেহুলা তার স্বামীকে জীবন্ত রূপে ফেরৎ পায়—অপরদিকে ‘প্রাচ্য’ -তে সয়ফর তার স্ত্রীকে ফেরৎ পায় না। এখানে সয়ফর তার স্ত্রীকে সাপে কাটার জন্য ভাগ্যকে দায়ী করে নি। সে দংশনকারী সাপটিকে মারার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। সে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য শাবল, ছেনি দিয়ে তার সমগ্র বাড়ির আঁকা-বাঁকা রেখাঙ্কিত পথে খুঁড়তে থাকে। খুঁড়তে খুঁড়তে সে একসময় সেই দংশনকারী সাপটিকে খুঁজে পায়। কিন্তু যখন সে সাপটিকে মারতে উদ্যত হয় ঠিক সেই সময় তার দাদি পেছন থেকে এসে খপ করে তার হাত ধরে এবং বলে –‘না। এইটা বাস্তু সাপ। খবদ্দার।।’[১৩] বাংলার লোকসমাজে এখনও সাপকে দেবতা বলেই গণ্য করা হয়ে থাকে। তারা মনে করে যে, বাড়ির আশেপাশে যে সাপ থাকে সেগুলি বাস্তু সাপ। বাস্তুসাপ বাড়ি পাহারা দেয়। বাস্তুসাপকে আঘাত করা পরিবারের পক্ষে অকল্যাণকর। সাপকে নিয়ে এই ধরনের সামাজিক সংস্কার বাংলার লোকসমাজের একটি অতি প্রচলিত সংস্কার। সমাজের এই প্রচলিত সংস্কারই আলোচ্য নাটকে শেষ পর্যন্ত দংশনকারী সাপটিকে ক্ষমা করেছে।

এইভাবেই নাট্যকার সেলিম আল দীন তাঁর ‘প্রাচ্য’ নাটকে প্রাচ্য জনপদের হাজার বছরের জীবনদর্শনের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। প্রাচ্য জনপদের রীতি-নীতি, আচার, বিশ্বাস, সংস্কার ও সংস্কৃতির নির্যাস স্থান পেয়েছে এ নাটকে। প্রাচ্য জীবনচর্যার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এখানে প্রকৃতি ও মানব সমাজের মধ্যে চলে অজস্র বিনিময়। প্রকৃতির কোলে এখানে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী জগৎ একই সঙ্গে বসবাস করে চলেছে। বেঁচে থাকার সবার সমান অধিকার রয়েছে। নাটকের পরিণতির মধ্য দিয়ে নাট্যকার আমাদের তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। অন্যদিকে পাশ্চাত্য যেখানে প্রাচ্য দর্শনের বিপরীত। সেখানে জীবনে ক্ষমা বড় নয়, প্রতিশোধই প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। সয়ফরের দাদির দংশনকারী সাপটিকে ক্ষমা করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রাচ্য জনপদের এই জীবনদর্শনের কথাই তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য নাটকে।

তথ্যসূত্র:

১। দীন, সেলিম আল। “প্রাচ্য।” *নাটক সমগ্র – ৩*, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ঢাকা, পৃ— ৫৭২।
২। ঐ, পৃ – ১১।
৩। ঐ, পৃ – ১২।
৪। ঐ, পৃ – ১২।
৫। ঐ, পৃ – ১৫।
৬। ঐ, পৃ – ১৬।
৭। ঐ, পৃ – ২৬।
৮। ঐ, পৃ – ৪৮।
৯। ঐ, পৃ – ৫০।
১০। ঐ, পৃ – ৬০।
১১। ঐ, পৃ – ৬০।
১২। ঐ, পৃ – ২৩।
১৩। ঐ, পৃ – ১০১।

প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্প: আত্মপরিচয় সংকট ও বিপন্নতার বহুকৌণিক ভাষ্য

শবনম মুস্তারী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উচ্চতর বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বিভাজিত দেশ মাটি ঘিরে এক আশ্চর্য বিপন্নতা দেখা দিয়েছিল বাস্তুচ্যুত মানুষের জীবনে, হঠাৎ সংজ্ঞা বদলে যাওয়ায় কালকের স্বদেশ বিদেশ হয়ে গেলে বিমূঢ় মানুষ পায়ে পায়ে পেরিয়ে এসেছিলেন চেনা মাটি, গাছপালা, নীল আকাশ। বছরের পর বছর নিরাশ্রয় জীবনকে সঙ্গী করে স্রোতের শ্যাওলার মতো ওই সমস্ত মানুষজন ভেসে বেরিয়েছেন। প্ল্যাটফর্ম থেকে উদ্বাস্তু শিবিরে, চম্পারণ থেকে আন্দামানে, 'দণ্ডকারণ্য থেকে মরিচঝাঁপি'তে, এরপর জবরদখল কিংবা সরাসরি অনুদানে অজস্র উপনগর এবং নয়াবসতের জন্ম হয়েছে ঠিকই কিন্তু ভিতরে ভিতরে গভীর শূন্যতা স্মৃতিমেদুর বিষণ্ণ চোখের মধ্যে বারে বারে ভেসে ওঠে ফেলে আসার স্বভূমি সাতপুরুষের বাস্তুভিটে, তিলে তিলে গড়ে তোলা এক নিজস্ব জীবনের ঘেরাটোপ। স্বভূমি থেকে উৎখাত হবার প্রবল নিরাপত্তাহীনতা, গ্রাম, সমাজ, স্বজন ছেড়ে আসার বেদনাবোধ, আশ্রয়ের সন্ধানে গৃহচ্যুত মানুষের মরিয়া অভিযান, রেলওয়ে এবং মানুষের ঘরবাড়ি গড়ে তোলার যে আখ্যান তার ভিতরে ভিতরে খোঁজ চলে স্বদেশবোধের, আত্মঅস্তিত্বের। অবচেতনায় গাঁথা থাকে দেশবোধের এক অমোঘ ট্যাবু। পেরেস্ত্রৈয়িকা পরবর্তী বিশ্বে, আমেরিকার মেক্সিকান নিষ্কাশন, মায়ানমারের রোহিঙ্গা বিদায়, ইসরায়েল, প্যালেস্টাইন, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া থেকে পলায়ন, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে উত্তর কোরিয়ায় পলায়ন, ইহুদীদের ইতিহাসের কাল পথে লং মার্চ, সবই স্বভূমি চ্যুতির নানা রূপ ও মাত্রা। প্রফুল্ল রায় তাঁর গল্পে বারবার মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে তাদের আত্মিক শিকড়টিকে অনুসন্ধান করেছেন, সমগ্র জীবনব্যাপী অস্থিরতা নিয়ে তিনি এই বোধের অন্তরতম রূপটি খুঁজে দেখেছেন। আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে প্রফুল্ল রায়ের গল্পে সেই শিকড়ের সন্ধান বা আত্মপরিচয়ের সংকটকে তুলে ধরব।

সূচক শব্দ: দেশভাগ, দেশত্যাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, স্বদেশবোধ, ভাষা আন্দোলন, আত্মপরিচয় সংকট, আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা বাসনা।

১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট। একটা মাত্র সরকারি ফতোয়া তথা আইন জারি হওয়ায়, দু-টুকরো হয়ে গেল ভারতবর্ষের অখন্ড মানচিত্র। দেশভাগের চড়া দামে এলো স্বাধীনতা। প্রবল বর্ষায় দু-কূল প্লাবিত নদীস্রোতের মতো, ওপার বাংলা থেকে হু- হু

করে হিন্দু উদ্বাস্তুদের জনস্রোত ঢুকে পড়ল এদেশে। আর ভারত থেকে মুসলমানরা চলে গেল পাকিস্তানে। ১৯৪৭ সালের সেই দেশভাগের সময় পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি থেকে শিকড় ছিঁড়ে, লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের সঙ্গে সীমান্তের এপারে সপরিবারে চলে আসেন কথাসাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বলতে তাঁদের যা কিছু ছিল, ততদিনে সর্বস্ব খোয়া গেছে। গায়ে এঁটে দেওয়া হয়েছে 'শরণার্থী'র মোলায়েম তক্মা। তারপর শুরু অন্তহীন জীবনসংগ্রাম। বেঁচে থাকার লড়াই। পরদিন কীভাবে অন্ন জোগাবেন মুখে, সেই আতঙ্কেই দিন কেটেছে। সে-সব দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার যাবতীয় স্মৃতি ঠাঁই পেয়েছে তাঁর লেখায়।

প্রফুল্ল রায়ের জন্ম ১৯৩৪ সালে। তাঁর সদ্য কৈশোর কালেই ঘটে গিয়েছে বেশ বড়ো বড়ো কয়েকটি ঘটনা যা তাঁকে সেই বয়সেই অভিজ্ঞ ও জিজ্ঞাসু করে তুলেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেরশো পঞ্চাশের মহামন্বন্তর, সেই সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধের চরম বিপর্যয়। তাছাড়া ছেচল্লিশের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ও শেষে দেশভাগ। দেশভাগের কারণে আরও অনেকের সঙ্গে তিনিও তাঁর জন্মভূমি ছেড়ে এই বঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। লিখতে শুরু করে আজও তাঁর লেখার সিংহভাগ জুড়ে আছে দেশভাগের রক্তাক্ত স্মৃতি ও উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণা। দেশভাগের এত বছর পরেও দুই বঙ্গে অশান্তির অবসান হল না। দেশভাগের চড়া দাম দিয়ে পাওয়া স্বাধীনতা যে সাধারণ মানুষের কাছে সুখের হয়নি, সেকথাই বিভিন্ন ছোটোগল্পে, উপন্যাসে আজও বলে চলেছেন তিনি।

আসলে পঞ্চাশের দশকের শেষে যাঁরা সাহিত্যের জগতে এসেছেন তাঁরা কম বেশি সকলেই অনুভব করেছিলেন,

> "আদর্শবাদ, মানবিক মূল্যবোধ ইত্যাদি ব্যাপারগুলোকে ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে দেশের সীমানা পার করে দেওয়া হচ্ছে। রাজনীতির নামে একটা প্রবল পরাক্রান্ত অস্ত্র ক্রমশ চলে যাচ্ছে রোবটের মত যান্ত্রিক, হৃদয়হীন, মাসলম্যানের হাতে।"।

নৈরাশ্য, হতাশ, নৈরাজ্য ঘেরা সমাজ-পরিবেশ, ঘুনধরা সমাজের কাঠামোটা বড়ো বেতো ঘোড়ার মত ধুঁকছে। এই সময়ের লেখকেরা এত অনিশ্চয়তার মধ্যেও কিন্তু মানুষ সম্পর্কে নিরাশ হয়নি। তাই তাঁরা অনুভব করেছিলেন বিপর্যস্ত সমাজজীবনের মৌল রূপান্তরের আশু প্রয়োজন। সুতরাং এই সময়ের লেখা গল্প উপন্যাসকে অবশ্যই সমাজমুখী, জীবনমুখী হতে হবে। গল্প কোনও অর্থেই মনগড়া আর্টফর্ম নয়। গল্পে উপন্যাসে জীবনের বাস্তব প্রাণ স্পন্দন অপরিহার্য। সাধারণ মানুষ, তাদের জীবনসংগ্রাম, সমাজ জীবনে সাধারণ চেহারাটাকে অকৃত্রিমভাবে তুলে ধরতে হবে। সামাজিক অধঃপতনের ভেতর থেকে অমৃত-বিষ দুই-ই তুলে আনতে হবে। যা কিছু লেখা হবে তা হবে বাস্তবসম্মত। লেখক মাত্রই তাঁর সময়, সমাজ ও মানুষের কাছে দায়বদ্ধ।

নৈরাজ্য আর নৈরাশ্যের মধ্যেও মানুষকে স্বমহিমায় আবিষ্কার করতে চেয়েছেন এসময় লেখকেরা। প্রফুল্ল রায় তাদেরই মধ্যে একজন। তিনি বলেছেন:

> "এত ক্ষয় এবং অনিবার্য ধ্বংসের মধ্যেও যেখানে মনুষ্যত্বের এতটুকু স্ফুলিঙ্গ চোখে পড়েছে, আমার লেখায় তা ধরে রাখতে চেয়েছি, কেননা মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধের বিকাশ ছাড়া দেশবাঁচতে পারে না"।

প্রফুল্ল রায়ের জীবন অভিজ্ঞতা ও সৃষ্টির পরিসর দুই-ই বিস্তৃত। একদিকে অবিভক্ত ভারত থেকে বর্তমান ভারত ও অপরদিকে ভারতীয় উপমহাদেশের নানা প্রান্ত সমৃদ্ধ করেছে প্রফুল্ল রায়ের সৃষ্টির জগত। এক বাক্যে বলা যায় গত দেড়শত বছরের ভারতের ইতিহাস কথাবদ্ধ হয়ে আছে তাঁর লেখনীতে। নাগাভূমিকে নিয়ে লেখা 'পূর্বপার্বতী', আন্দামানের পাঠভূমিতে লেখা 'সিন্ধুপারের পাখি' বা দেশভাগের প্রেক্ষিতে 'কেয়াপাতার নৌকো'র মতো উপন্যাস প্রফুল্ল রায় যেমন লিখেছেন, তেমন এদের সমান্তরালে রচনা করেছেন, অসংখ্য ছোটোগল্প, সেই গল্পের জগৎকেই আমরা পরিক্রমণ করব বর্তমান প্রবন্ধে।

প্রফুল্ল রায়ের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'মাঝি', উনিশশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়। গল্পটি রচনার পশ্চাদ্‌পট ছিল অনেকগুলি ঘটনা; উনিশশো ছেচল্লিশে হিন্দু-মুসলমান সংঘাতের সূত্রপাতও সাতচল্লিশে ভারত ভাগ। অজস্র পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের মতো প্রফুল্ল রায় ও সপরিবারে এসেছিলেন এপারে। তারপর কলকাতা বিহার ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে অস্থিরভাবে ঘোরাঘুরি ও শেষে কলকাতায় বাস, এখানকারই সাহিত্যিক সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে শুরু করেন গল্প রচনা। এই সময়কালে তিনি বেশ কয়েকটি গল্প লিখে ফেলেছিলেন। গল্পগুলি 'মাঝি', 'চর', 'একটি আত্মহত্যার কাহিনী','রক্তকমল'। 'দেশ', 'মুখপত্র', 'নতুন সাহিত্য পরিচয়', ইত্যাদি পত্রিকায় গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছিল এবং গল্পকার রূপে প্রফুল্ল রায়কে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল।

উনিশশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দে প্রফুল্ল রায়ের যখন বয়স মাত্র কুড়ি তখন থেকেই সাহিত্যিক রূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তারপর ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশ, কাল, মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তিনি ও নিরন্তর লিখে চলেছেন। শুধু মানুষ নয়, ভারতের বিচিত্র প্রকৃতিকেও তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রফুল্ল রায় যেমন 'মানুষ' বা 'মাঝি'-র মতো মানবিক রসের গল্প লিখেছেন তেমন নির্মাণ করেছেন 'চরাচর'-এর মতো প্রকৃতিশাসিত গল্প। তাঁর রচিত গল্পের বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বিহারের প্রান্তিক মানুষদের কথা, পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি আশ্রিত মানুষদের কথা, ব্যতিক্রমী জীবন ও জীবিকার গল্প, সমাজের প্রান্তবর্তিনী মন্দ মেয়েদের কথা, এছাড়াও রয়েছে মুম্বাই নগরীর রহস্যময় জগতের বিবিধ কাহিনী। আর

রয়েছে ১৯৪৭- এর দাঙ্গা ও দেশভাগের কথা এবং সেই দেশভাগের ক্ষত থেকে জন্ম আত্মপরিচয়হীন কিছু মানুষের গল্প। দেশভাগ নিয়ে আবেগপূর্ণ রোমান্টিক গল্প লেখেনি প্রফুল্ল রায়, বরং সমস্যাটি যে কত গভীর ক্ষত তৈরি করে একদল মানুষকে ক্রমশ 'stateless people' এ পরিণত করেছে, ঠেলে দিয়েছে আত্মপরিচয়হীনতার চরম সংকটে— সেইসব মানুষের অসহায়তার ট্রাজেডি ধরা পড়েছে তাঁর রচনায়। সম্প্রতি প্রকাশিত 'দাঙ্গা দেশভাগ এবং তারপর' প্রফুল্ল রায়কে কথাসাহিত্যিকের তক্‌মা থেকে উত্তীর্ণ করে সমাজ ও ইতিহাসের এবং নিবিড় পর্যবেক্ষক ও ভাষ্যকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি এখানে সেই ভারতীয়-মুসলমান-পাকিস্তানি-বাংলাদেশি এবং ইন্ডিয়ার মাটিতে পা রাখা একদল মানুষের কথা বলেছেন, যারা—

> "ইতিহাসের সেই আদিযুগের দেশহীন পরিচয়হীন অভিযানকারীদের মতো... চলেছে একটি স্বদেশের জন্য একটি সুনিশ্চিত আইডেন্টিটির সন্ধানে।আদৌ তা পাওয়া যাবে কিনা কে বলবে।"

-এই আইডেন্টিটি ক্রাইসিস এবং তার ফলে বিপন্ন মানবজীবনই আজকের আমাদের প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়; এখন আমরা প্রফুল্ল রায়ের সেই সকল গল্পের দিকেই আলোকপাত করব।

'অনুপ্রবেশ' প্রফুল্ল রায়ের কেবল একটি গল্পের নাম নয় অনুপ্রবেশ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের একটি সমস্যা। আর সেই সমস্যাটিকে যথার্থ সমাজ-ঐতিহাসিক-এর দৃষ্টিতে চিহ্নিত করেছেন লেখক। বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারা যখন বিপন্ন, তখন তরুণ ফরিদ এবং শওকতরা লুকিয়ে ভারতে প্রবেশ করে পৌঁছে গিয়েছে বিহারে। সেখানেই একসময় ছিল ফরিদের পূর্বপুরুষেরা। সেইসব জমি-বাড়ি বর্তমানে অন্যদের দ্বারা অধিকৃত। তবে হার মানেননি ফরিদরাও। বিহারে তখন নির্বাচন বা 'চুনাও'। ফরিদদের কোনক্রমে বৈধ কাগজ দিলেই তারা ভোট দিতে পারবে। নিজের ভোট বৃদ্ধির কথা ভেবে ফরিদের রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করে দেন ভোটের অন্যতম প্রার্থী রামবনবাস চৌবে।কয়েকশত অনুপ্রবেশকারীর ভোটে তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে ভেবেই এই ব্যবস্থা হল। ভোটের অন্যপক্ষরা এই নিয়ে আপত্তি জানালেও ফরিদদের রেশন কার্ড বাতিল হল না-

> "ঘণ্টাখানেক বাদে শওকতের সঙ্গে কাঁকুরে ডাঙার মাঝখানে তাদের সৃষ্টি ছাড়া বসতিতে ফিরে যেতে যেতে ফরিদের মাথায় সেই ভাবনাটাই বারবার ঘুরে ঘুরে আসতে থাকে। ব্রিটিশ আমলে তারা ছিল ভারতীয়, তারপর পাকিস্তানী, তারওপর বাংলাদেশি। চুনাও-এর কারণে চল্লিশ বছর বাদে তারা নতুন আইডেনটিটি পেয়ে যায়। এখন তারা আবার ভারতীয়।
>
> দূর মনস্কের মতো হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে চুনাওকে হাজার বার সেলাম জানায় ফরিদ।"

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের খেলায় মানুষের আত্ম-পরিচয় কীভাবে বিপন্ন হয় এবং গণতন্ত্রের, বিধি ব্যবস্থার ছিদ্র ধরে মানুষ কীভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করে তার কৌতুককর অথচ বাস্তব চিত্র এঁকেছেন প্রফুল্ল রায়।

'দেশ নেই' গল্পটিতে একই সমস্যার ট্রাজিকে রূপ অঙ্কিত হয়েছে। পাঁচ বছর বয়সে বাবা-মার সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে আসা মুম্বাইয়ের শ্রমজীবী আসাদকে ভারতের পুলিশ হঠাৎ চিহ্নিত করে দেয় 'ঘুসপৈঠিয়া' বা 'অনুপ্রবেশকারী' রূপে। পুলিশের দাবি সে বাংলাদেশ থেকে আশা অনুপ্রবেশকারী। অথচ ত্রিশ বছর ধরে সে ভারতে বাস করছে, কিন্তু আসাদের কাছে ভারতীয় নাগরিকত্বের কোনও প্রমাণ ছিল না। এই কারণে ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্র তাকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী-রূপে বন্দি করে পাঠিয়ে দিল বাংলাদেশ সীমান্তে এবং ঠেলে দিল ওপারে। এই দুর্ঘটনায় আসাদের মুম্বাইয়ের সামান্য জীবনটুকুও বিপর্যস্ত হয়ে গেল। সেখানে ত্রিশ বছর রীতিমতো জীবনসংগ্রাম করে সে বেঁচেছিল। একটি নারীকে নিয়ে ঘর বাঁধার প্রস্তুতিও শুরু করেছিল। সে দরিদ্র ছিল, তবু পায়ের তলায় মাটি ছিল, একটি পরিচয় ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের খামখেয়ালে তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল বাংলাদেশে, যেখানে তার স্বজন নেই, ভূমি নেই, জীবিকা নেই। বাংলাদেশের সীমানায় সেখানকার অফিসার আসাদকে প্রশ্ন করে, বুঝল সেখানকার সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই, তাই তাকে আবার ইন্ডিয়া পাঠিয়ে দিল—

> "তার যখন জন্ম হয় সে ছিল পূর্ব পাকিস্তানি, তারপর ত্রিশ বছর ধরে ভারতীয়। এরমধ্যে পূর্বপাকিস্থান বাংলাদেশ হয়ে গেছে। এতকাল বাদে দেখা যাচ্ছে সে ভারতীয়ও নয় বাংলাদেশিও না, তার কোনো দেশ নেই। উদ্‌ভ্রান্তের মতো বর্ডারের দিকে এগোতে থাকে আসাদ"।

শুধু আসাদরা নয়, পৃথিবীতে আজও রাষ্ট্রগুলির খেয়ালে বহু মানুষ উদ্‌ভ্রান্তের মত খুঁজে বেড়ায় আত্ম-পরিচয়।

'রাজা যায় রাজা আসে'- তীব্র বিদ্রূপাত্মক গল্প। পুরাতন রাজা যায়, নতুন রাজা আসে কিন্তু দেশের হতভাগ্য মানুষের ভাগ্য বদল হয় না। ছিপতিপুরের রাজেক এই গল্পের প্রধান চরিত্র। অবিভক্ত ভারতে রাজেক ছিল সর্বহারা, সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানেও তাই। হঠাৎ রাজেকের জীবন আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল। ছিপতিপুরের অন্যতম ধনী ব্যক্তি বৈকুণ্ঠ সাহার পরিবার যখন গ্রাম ছেড়ে গেল, তখন তাদের জমি বাড়ি সমস্ত কিছুর ভার রইল রাজেকের উপর। আটমাস ধরে রাজেককে তার জীবন ধারনের জন্য জলে স্থলে ঘুরতে হয় না, তার চেহারা মন সবই রূপান্তরিত হয়ে গেল। এখানেই শেষ নয়, ছিপতিপুর গ্রামের সর্বাপেক্ষা ধনী ও মানী তোরাব আলি অযাচিতভাবে নিজের মেয়ে কামরানের সঙ্গে রাজেকের বিয়ে স্থির করে। সাহাদের

'নব্বই কানি' জমির অঘোষিত মালিক রাজেক এবার বোঝে দেশ ভাগ ও দেশ ত্যাগের মর্ম:

> "বসে বসে ভাবতে লাগল, ভাগ্যি দেশখানা দু-ভাগ হয়েছিল, ভাগ্যি বৈকুণ্ঠ সাহারা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল। নইলে এত সুখ কি তার কপালে ছিল!"

কিন্তু রাজেকের দুর্ভাগ্য, সব হয়েও হলো না। বিয়ের পাকার কথার দিনই বৈকুণ্ঠ সাহা ফিরে এলেন এক মুসলিম ভদ্রলোককে নিয়ে। রাজেক জানলো এনার সাথে সম্পত্তি বিনিময় করেছেন বৈকুণ্ঠ সাহা। অর্থাৎ রাজেক যে সম্পত্তির অলিখিত অধিকারী হয়েছিল, তা আর রইল না। হতাশ হলেও বিয়ের আশায় পৌঁছল তোরাব আলির বাড়ি। কিন্তু 'নব্বই কানি" হাতছাড়া হল বুঝে ধূর্ত তোরাব আলি বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিল। এক মুহূর্তে রাজেকের সব হারিয়ে গেল, যে আত্ম-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সে দেখেছিল তা শেষ হয়ে গেল—

> "দ্যাশের এক রাজা যায়, আরেক রাজা আসে, তাতে তর কী রে তর কী?"

প্রফুল্ল রায়ের একগুচ্ছ গল্পের মধ্যে আছে পরিত্যক্ত পিতৃভূমির জন্য গভীর বেদনা এবং তা থেকে আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। 'স্বপ্নের ট্রেন' তেমনি একটি গল্প পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় আসা অশোক বহু বছর ধরে ভোরবেলায় স্বপ্নে একটি ট্রেন দেখতে পেত, কিন্তু উদ্বাস্তু জীবনের শতধিক সংকট ও পরবর্তীকালে সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্যা অশোকের স্বপ্ন ভাঙিয়ে দিত, আর ট্রেনটি বহুদিন নিরুদ্দিষ্ট থাকতো। তবে ট্রেনটি আবার ফিরে এলো উনিশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালে। শুধু তাই নয়: "অশোক দেখল, তার গায়ে যোদ্ধার সাজ। অনুভব করল চোয়াল শক্ত, চোখমুখে কঠিন প্রতিজ্ঞা জ্বলছে।" কিন্তু ভাই, বোন, স্ত্রী, ছেলে নিয়ে জর্জরিত অশোক সত্যি বেরোতে পারে না ক্ষুদ্র গণ্ডীর সীমানা থেকে, অধরাই থেকে যায় আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন।

'রক্তকমল' ভাষা আন্দোলনের গল্প, গল্পের প্রধান চরিত্র আজম। সে সাতপুরুষের আবাদী জমিতে লাঙল না চালিয়ে, কোমল আঙুল চালিয়ে লেখে মনসামঙ্গলের পালা। কিন্তু গ্রাম বাংলার বুক থেকে মাতৃভাষার জন্য উঠে আসা আর্তি আজমকে আলোড়িত করে, সে রাত জেগে লিখতে শুরু করে ভাষা আন্দোলনের গান-

> "ওরে আমার বাংলা ভাষা-
> তুমি আমার পরান-বন্ধু, আমার বুকের লৌ,
> মায়ের মুখের মিষ্ট কথা, সখীর মুখের মৌ"।

গ্রাম্য লোককবি আজন্ম রাজনীতি বুঝতো না, রাষ্ট্রনীতি বুঝতো না। সে শুধু জানত তার মুখের ভাষা বিপন্ন, বিপন্ন তার পরিচয়।

প্রফুল্ল রায়ের একাধিক গল্পে ছড়িয়ে রয়েছে 'রুটলেস'দের সংকটের কাহিনি। 'অলীক নৌকার যাত্রী', 'শিকড়', 'কাছেই আছে'-তে প্রফুল্ল রায় উদ্বাস্তু জীবনের সেই

দিনলিপি লিখেছেন যা 'সম্পত্তি বিনিময়' বা 'property exchange' নামে পরিচিত। সাধারণভাবে এইসব মানুষেরা লাভবান হয়েছিল ঠিকই কিন্তু ভিটের মায়া রয়ে গিয়েছিল, কোথাও চলছিল রুটকে জানার খোঁজ—

> "প্রতিটি মানুষের জানা দরকার তার রুটটা কোথায়। দুনিয়ার কোথায় তার অরিজিন, সেটা না জানলে কি চলে? পার্টিশন না হলে এখানেই ওরা জন্মাত, এখানেই থাকত"।

এই রুটের টানেই ছিয়াত্তর বছরের আলতাফা কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে এসেছে 'বিদেশী' গল্পে। 'একটু অ্যাডজাষ্ট করে নাও প্লিজ' জয়তী জানে বোঝে এই একটি শব্দের মানে কত নির্মম। যদি দেশভাগ না হতো তাহলে তো হয়ত জয়তীকে পূর্ববঙ্গ থেকে এসে অ্যাডজাস্ট করতে হত না কলকাতার ভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে। এতো শুধু জয়তীর কথা নয়, লেখকও অনেক অভিজ্ঞতা দিয়ে একটি শব্দের মানে কি হতে পারে তা বুঝেছেন।

প্রফুল্ল-গল্প পরিক্রমার সীমা এখানেই সীমিত না— একথা বলাই বাহুল্য। যেমন বিচিত্র তাঁর, জীবনাভিজ্ঞতা তেমনই তাঁর ছোটগল্পের ভূবন। তাঁর গল্পাবলির জগতে পরিভ্রমণের শেষে একথা বেশ জোরের সঙ্গে বলা যায় যে— দেশভাগের পর এখনও পর্যন্ত নানা সংকটে বিপর্যস্ত মানুষ এবং নতুন সমাজবিন্যাস উঠে এসেছে প্রফুল্ল রায়ের গল্পে। প্রফুল্ল রায় তাঁর লেখায় আত্মপরিচয়ের সংকটটিকে এমনভাবে পরিস্ফুট করেছেন যা স্বাধীনতার সাতদশক পরেও রাষ্ট্র এবং মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। পটভূমি, কাহিনি এবং চরিত্র কোথাও যেন বানিয়ে তোলা রূপকথা নয়, লেখক সমকালের রক্তাক্ত রণক্ষেত্র থেকেই যেন তাদের তুলে এনেছেন—

> "ব্রিটিশ আমলে তারা ছিল ভারতীয়। তার পর পাকিস্তানি। তারপরে বাংলাদেশি। এবং তারও পরে এদের কী পরিচয়? এই রাষ্ট্রহীন দেশহীন মানুষগুলোর চাই একটি দেশ, যেখানে তারা মাননীয় নাগরিক হয়ে সসম্মানে নির্ভয়ে থাকতে পারবে। সেজন্য তাদের চাই একটি নির্ভুল পরিচয়পত্র, ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড বা রেশন কার্ড। তারই সন্ধানে তারা মরিয়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

র্যাডক্লিফ তো মানচিত্র কেটে দু'ভাগ করেন নি, বিভাজিত হয়ে গিয়েছিল সাধারণ মানুষ, বিপন্ন হয়েছিল তাঁদের আত্মপরিচয়। 'স্টেটলেশ পিপলদের সংকট এখন পৃথিবীর অনেক দেশে', বিপন্ন মানুষ আত্মপরিচয়ের জন্য মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে— বর্তমান সময়ের একটা বাস্তব সমস্যা এখানে প্রতিফলিত।

তথ্যসূত্র:

১. আখ্যান পরিক্রমা, উদয়চাঁদ দাশ, দিয়া পাবলিকেশন, কোলকাতা- ০৯।

২. উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, অমলেন্দু সেনগুপ্ত, পার্ল পাবলিশার্স, কোলকাতা - ০৬।
৩. উত্তাল ৬০- ৭০: রাজনীতির সমাজ ও সংস্কৃতি, সম্পাদনা অর্জুন গোস্বামী, চয়নিকা, কোলকাতা- ০৯।
৪. গল্প সমগ্র ১, প্রফুল্ল রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩।
৫. গল্প সমগ্র ২, প্রফুল্ল রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩।
৬. গল্প সমগ্র ৩, প্রফুল্ল রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩।
৭. গল্প সমগ্র ৪, প্রফুল্ল রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩।
৮. গল্প সরণি, প্রফুল্ল রায় বিশেষ সংখ্যা, ১৪২৩।
৯. জোয়ার ভাটায় ষাট সত্তর, অমলেন্দু সেনগুপ্ত,পার্ল পাবলিশার্স, কোলকাতা - ০৯।
১০. দাঙ্গা দেশভাগ এবং তারপর, প্রফুল্ল রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩।
১১. দেশ বিভাগ ও বাংলা আখ্যান, উদয়চাঁদ দাশ, দিয়া পাবলিকেশন, কোলকাতা- ০৯।
১২. দেশভাগের স্মৃতি: প্রথম খণ্ড, অধীর বিশ্বাস, গাঙচিল, কোলকাতা- ১১।
১৩. দেশভাগের স্মৃতি: দ্বিতীয় খণ্ড, অধীর বিশ্বাস, গাঙচিল, কোলকাতা- ১১।
১৪. দেশভাগের স্মৃতি: তৃতীয় খণ্ড, অধীর বিশ্বাস, গাঙচিল, কোলকাতা- ১১।
১৫. দেশভাগের স্মৃতি: চতুর্থ খণ্ড, অধীর বিশ্বাস, গাঙচিল, কোলকাতা- ১১।
১৬. বিভাজিত বাংলা উদ্বাস্তু সমস্যা ও বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব, স্নেহাশীষ ঘোষ ও শম্পা ঘোষ, শ্রীভূমি পাবলিশিং হাউস, কোলকাতা- ০৯।
১৭. বাংলার নব জাগৃতি, প্রথম খণ্ড, বিনয় ঘোষ, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউজ।
১৮. ভেদ বিভেদ: প্রথম খণ্ড, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩।
১৯. ভেদ বিভেদ: দ্বিতীয় খণ্ড, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩।
২০. শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রফুল্ল রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের উপন্যাসে ভাষাশিল্প

শ্রাবন্তী বর্মন
গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারাংশ : সাহিত্য সৃষ্টির মূল অবলম্বন হলো ভাষা। আর সেই সাহিত্যের শিল্প সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় ভাষার ভিন্নতর কারুকার্যে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের উপন্যাসে ভাষার কারুকার্য লক্ষিত হয়েছে। তাঁর 'লালসালু', 'চাঁদের অমাবস্যা', 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে ভিন্ন ভাষারীতির ব্যবহার উপন্যাসগুলিকে অন্য মাত্রা দান করেছে। উপন্যাস গুলিতে ঘটনা, চরিত্র, পরিবেশ, চিত্রকল্প ইত্যাদি রচনায় তিনি বিভিন্ন সময় উপমা, রূপক, উৎপেক্ষা প্রভৃতি অলংকার প্রয়োগ করেছেন। এছাড়াও শব্দ সংযোজন ও বাক্যগঠন প্রভৃতিতে তিনি মনোযোগী হয়েছেন। প্রতীকী উপস্থাপনায় তিনি সমাজের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন। যেহেতু তিনি পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজকে তাঁর রচনায় চিত্রিত করেছেন সেহেতু সেখানেও রয়েছে আঞ্চলিক ভাষা ও উপভাষা, আরব-ফারসি শব্দের বহুল সংযোজন। যা তাঁর উপন্যাসের ভাষাকে ঋদ্ধ করেছে। এর পাশাপাশি তিনি আধুনিক শিল্পরীতিরও প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে।

শব্দসূচক : ভাষা- উপভাষা, অলংকার, চিত্রকল্প, প্রতীক, বাক্য, শিল্প রীতি।

মূল আলোচনা : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পূর্ব বাংলার মুসলমান গ্রামীণ সমাজজীবনকে সুগভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। পিতার চাকরির বদলি সূত্রে তিনি একাধিক স্থানে বসবাস করেছেন। তিনি চট্টগ্রামের উপভাষার পাশাপাশি মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, ঢাকা, চিনসুরা, সাতক্ষীরা, হুগলি, ফেনী, ময়মনসিংহ ও কলকাতার উপভাষার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। যেহেতু পূর্ববাংলার গ্রামসমাজ তাঁর রচনার কেন্দ্রবিন্দু সেহেতু সেই সমাজের চিত্রাঙ্কনে তিনি ব্যবহার করেছেন গ্রামীণ লোকজ শব্দ ।উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র বিন্যাস ও প্লট বিন্যাসের ক্ষেত্রে যে ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন তা এক নতুন ঘরানার জন্ম দিয়েছে। পূর্ববাংলা ও বাংলাদেশের সাহিত্যে তিনি পথ দেখিয়েছেন, গড়ে তুলেছেন এক স্বতন্ত্র ভাষারীতি। সামন্ত প্রথা, অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি, অস্তিত্ব সংকট, ধর্মীয় গোড়ামী, ভন্ডামি, কুসংস্কারকে ব্যবচ্ছেদ করেছেন তাঁর লেখায় । তাঁর হাতে জন্ম নিয়েছে 'লালসালু'(১৯৪৮), 'চাঁদের অমাবস্যা'(১৯৬৪), 'কাঁদো নদী কাঁদো'(১৯৬৮) উপন্যাস।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এর রচিত প্রথম উপন্যাস 'লালসালু' চরিত্র প্রধান উপন্যাস। এ উপন্যাস ভাষা ব্যবহারে ও শৈল্পিক নৈপুণ্যে সমৃদ্ধ। এ উপন্যাসটিতে ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রতি তীব্র কষাঘাত হেনেছেন। যেখানে প্রধান চরিত্র হিসেবে অঙ্কিত হয়েছে মজিদ নামের চরিত্রটি। যে নিরক্ষর গ্রামবাসীদের ধর্মীয় কুসংস্কারের অন্ধকারে

নিমজ্জিত করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। উপন্যাসে মজিদ আর্থিকভাবে স্বচ্ছল- "দুনিয়ায় স্বচ্ছল ভাবে দুবেলা খেয়ে বাঁচবার জন্য যে খেলা খেলতে যাচ্ছে সে খেলা সাংঘাতিক।"[১] মাজারকে কেন্দ্র করে মিথ্যার আশ্রয়ে সে আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়েছে। স্বভাবতই- মজিদের কাম, ক্রোধ, ও হিংসা এবং ছলে- বলে-কৌশলে গ্রামে নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখা - এ কোনো অর্থেই ঐশী নয়, একান্তভাবেই বৈষয়িক। তার ব্যবহৃত মুখের ভাষা অন্যান্য চরিত্রদের থেকে আলাদা। মসজিদের ইমাম, মক্তবের ওস্তাদ, খানকার পীর, বিবাহের কাজী ইত্যাদি বৃত্তির মানুষেরা যে ধরনের বৃত্তিক ভাষারীতি ব্যবহার করেন মজিদ তার ব্যতিক্রম নয়। এই উপন্যাসে মজিদ যেহেতু ধর্মগুরু সেহেতু তার ব্যবহৃত মুখের ভাষাতেও রয়েছে আরবি - ফারসি শব্দের আধিক্য। যেমন :

(১) ....আপনারা জাহেল, বেএলেম, আনপাড়হ। মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন।[২]

(২) তুমি কিংবা তোমার বিবি গুনাহ কইরা থাকলে খোদাই বিচার করবেন। কিন্তু তুমি তোমার মাইয়ার কাছে মাফ চাইবা, তারে ঘরে নিয়ে যত্নে রাখিবা আর মাজারে সিন্নি দিবা পাঁচ পয়সার ।[৩]

(৩) আমি দোয়া- দরুদ পড়তাছি। তানারে পাক দিবার কন। ডান দিক থিকা পাক দিবেন, আগে ডাইন পা বাড়াইবেন। বাড়ানোর আগে বিসমিল্লাহ কইবেন।[৪]

লেখক এখানে মজিদের মুখে বৃত্তিক ভাষার ব্যবহার করেছেন। যেহেতু তিনি এই উপন্যাসে মজিদকে মৌলভী হিসেবে অঙ্কন করেছেন সেহেতু তার ব্যবহৃত ভাষাতেও তিনি সচেতন প্রয়াসে বৃত্তিক ভাষা ব্যবহারে সচেষ্ট হয়েছেন। কেননা মজিদের জীবন ও চরিত্র অঙ্কনের জন্য পূর্ববঙ্গীয় মোল্লা মৌলভীদের বৃত্তিক ভাষা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। পূর্ববঙ্গীয় মোল্লাদের ব্যবহৃত ভাষার শৈল্পিক প্রয়োগ হয়েছে মজিদের সংলাপে : "নাফরমানি করিও না। খোদার উপর তোয়াক্কল রাখো।"[৫] বলা যেতে পারে এ ভাষা মজিদের জীবনের ভাষা। মজিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সর্বাপেক্ষা মজিদের চরিত্র নির্মাণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এই ভাষারীতিকে কৌশলে ব্যবহার করেছেন।

অন্যদিকে রহিমা ও হাসুনির মায়ের কথোপকথনে আঞ্চলিক উপভাষাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন:

- ওনারে কইবেন, আমার যেন মওত হয়।
- ক্যান গো বিটি ?
- জ্বালা আর সহ্য হয় না বুবু। আল্লাহ যেন আমারে সত্তর দুনিয়া থিকা লইয়া যায়।[৬]

স্বাভাবিকভাবেই এখান থেকে স্পষ্ট যে এ ভাষা পূর্ববঙ্গেরই উপভাষার দৃষ্টান্ত। এ উপন্যাসে চরিত্র গুলির সংলাপে আঞ্চলিক উপভাষার ব্যবহারে চরিত্রগুলি যেন বাস্তবসম্মত হয়ে উঠেছে। তবে এ উপন্যাসের সংলাপ – "আঞ্চলিক নয়, মিশ্র-উপভাষিক বা pen- dialect, অর্থাৎ লালসালুর সংলাপে একাধিক উপভাষার সমন্বয়

আছে। কোন কোন ঔপভাষিক উপকরণে ওয়ালীউল্লাহ প্রমিতকরনও করে নিয়েছেন। সর্বনামের ক্ষেত্রেই প্রমিতকরণ ঘটেছে সবচেয়ে বেশি।"[৭] বৃত্তিগত দিক থেকে ভাষারও পার্থক্য থাকে। মুসলমান সমাজের যারা হোতা বা নিয়ন্ত্রক সেইসব মোল্লা -মৌলভীদের ব্যবহৃত ভাষা আর সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত ভাষা সমাজে বর্তমান। যার প্রমাণ আমরা পেয়েছি 'লালসালু'র মজিদ, রহিমা, হাঁসুনির মায়ের সংলাপের মধ্যে দিয়ে। আর এখানে সমাজবাস্তবতার সুনিপুণ চিত্র তুলে ধরেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। কোন কোন সমালোচক বলেছেন – "লালসালুর ভাষায় তেমন বিশিষ্টতা নেই, সাধারণ নিরাভরণ ভাষা।"[৮]

'লালসালু' উপন্যাসে ভাষার সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এ উপন্যাসে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা-উপভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি উপমা, উৎপ্রেক্ষা, উপমান, চিত্রকল্প, রূপক, প্রতীকের সার্থক ব্যবহার করেছেন। যা উপন্যাসের শিল্পগুনকে বহুমাত্রিকতা দান করেছে সন্দেহ নেই। উপন্যাসটিতে মজিদ সংগ্রামশীল শস্যহীন জনবহুল এলাকার বাসিন্দা। সেও একসময় নিজেকে অস্তিত্ববান করে তোলা ও প্রতিপত্তি পাওয়ার আশায় এসে পৌঁছেছিল মহব্বতনগর গ্রামে। শেষ পর্যন্ত তার জীবন এক ধরনের ব্যর্থতায়, অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। তারই মধ্যে দিয়ে মজিদ আশায় বুক বাঁধে। আর এ বিষয়টিকে লেখক উপন্যাসের শুরু ও শেষ বাক্যে উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসের শুরুতে আছে : "শস্যহীন জনবহুল এ-অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত যেন সদাসন্ত্রস্ত করে রাখে। ঘরে কিছু নেই। ভাগাভাগি, লুটালুটি, আর স্থানবিশেষে খুনাখুনি করে সর্বপ্রচেষ্টার শেষ।"[৯] এখানে লেখক দুর্ভিক্ষের করাল বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে। উপন্যাসটির শেষও হয়েছে আর এক উৎপ্রেক্ষায় - "বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ।"[১০] অর্থাৎ সর্বস্বান্ত মজিদের দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে। উপন্যাসটি শুরু ও শেষ হয়েছে এক ধূসরতা থেকে আরেক ধূসরতায়।

এ উপন্যাস গ্রামীণ জীবনের আখ্যান। গ্রামীণ জীবনের সংস্কার, বিশ্বাস, অনুভূতি প্রভৃতি বিষয়কে উপন্যাসে তুলে ধরতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপমার ব্যবহার করেছেন। উপমা ব্যবহারে তাঁর উপন্যাসটিতে নৈপূণ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। যে ভাষারীতি তিনি এই উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন তা ঐতিহ্য সমৃদ্ধ। তিনি উপন্যাসের ঘটনা, পারিপার্শ্বিক দৃশ্যরূপ, চরিত্রায়নে যে উপমাগুলি ব্যবহার করেছেন তা গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছে। 'লালসালু' তে মজিদ কথিত মোদাচ্ছের পীরের কবর ""মাছের পিঠে" এর উপমান বহুবার ব্যবহার করেছেন। "মাছের পিঠের মতো" কবরটি মজিদের সকল প্রতিষ্ঠা ও তার সচ্ছলতার একমাত্র উৎস। মজিদ সম্পর্কে আরেক উপমা উল্লেখযোগ্য – "এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয়,

সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ।”[১১] এ উপমা ব্যবহৃত হয়েছে মজিদের মহব্বত নগর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রসঙ্গে। যেখানে তার প্রভাব প্রতিপত্তির দ্বারা সকলকেই দমিয়ে রাখে। তবে শুধুমাত্র মজিদ নয় তার দুই স্ত্রী রহিমা ও জমিলার চরিত্র অঙ্কনেও উপমার ব্যবহার করেছেন ।মজিদের প্রথম স্ত্রী রহিমার মনোভাব বোঝাতে যে উপমাটি ব্যবহার করেছেন তা হল – “রহিমার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়, তার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল।”[১২] অপরদিকে মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলাকে যখন প্রথম বিয়ে করে আনে তখন - “সে যেন ঠিক বেড়াল ছানা”[১৩] মজিদের মনে হয়েছিল জমিলা এমনই একটা মেয়ে যে খোদাকে ভয় করবে। আসলে সে জমিলার মনে খোদা ভীতি সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। কিন্তু জমিলা শেষ পর্যন্ত মজিদের বিরুদ্ধাচারণ করে – “হরিণের চোখের মতো সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখ।”[১৪] মজিদ যখন বুঝতে পারে জমিলা তার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে তখন সে জমিলাকে বন্দী করে। মজিদের হাতে বন্দী হলে জমিলার হাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে যে উপমাটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো – “তার লইট্টা মাছের মতো হাড়গোড়হীন তুলতুলে নরম ভাব।”[১৫] এছাড়াও উপন্যাসে অন্যতম চরিত্র মধ্যবয়সী দুদুমিঞা ও তার ছেলের খৎনা হওয়ার প্রসঙ্গে মজিদের কথায় দুদুমিঞার অসহায়তা ও সমাজে তার অবস্থান নির্দেশিত হয়েছে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটি তুলনা করেছেন এভাবে- “মাথা নত করে থাকার ভঙ্গিটা যেন গাধার ভঙ্গির মতো হয়ে উঠেছে।”[১৬] খৎনা করবার জন্য বেঁধে রাখা ছেলেটির বর্ণনা – “সারাটি দুপুর কোরবানির ছাগলের মত খুঁটি- বন্দি হয়ে থাকে ছেলেটি।”[১৭] উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র আমেনা চরিত্রটি নির্মাণেও উপমা ব্যবহৃত হয়েছে। সন্তানের আশায় মাজারের পাশে বসে থাকা আমেনাকে পানি পড়া দিতে গেলে তার চোখ তুলে তাকানোর বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে- “আমেনা বিবি চোখ খুলে তাকায়, আস্তে, পাপড়ি খোলার মত।”[১৮] এই সকল লোকজ উপমা ব্যবহারে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ উপন্যাসে চরিত্রগুলিকে সার্থকভাবে রূপায়ণ করেছেন। সমাজ বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলতে তিনি এছাড়াও আরো অসংখ্য উপমার ব্যবহার করেছেন। যা আমাদের অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ করে তোলে।

এর পাশাপাশি উপন্যাসে প্রতীকী ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন তাহের, কাদেরের বাবার অন্তর্ধান ও ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গটি উপস্থিত হয়েছে তাল গাছের প্রতীকে : “মহব্বত নগরের সর্বোচ্চ তালগাছটি বন্দী পাখির মত আছড়াতে থাকে।”[১৯] স্বামী গৃহে জমিলার অবস্থাও ভয় তাড়িত ইঁদুর ও হরিণের প্রতীকে উপস্থিত হয়েছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এর ‘চাঁদের অমাবস্যা’ উপন্যাসটি জুড়ে রয়েছে যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর স্বগতকথন। অর্থাৎ এ উপন্যাসে ঘটনার বেশিরভাগই সংঘটিত হয়েছে আরেফ আলীর মনোজগতে এক দার্শনিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। এ উপন্যাসে লেখক চিত্রকল্পময় ভাবনার অনুসরণ করেছেন এক বিশিষ্ট ভাষারীতির মধ্য দিয়ে। শীতের রাতে চাঁদের আলোর উপস্থিতি এক আলো- অন্ধকারময় পরিবেশ রচনা করে। রাত্রির এক অপূর্ব চিত্র বর্ণিত হয়েছে এই উপন্যাসে। লেখকের বর্ণনায় – “চতুর্দিকে

জ্যোৎস্নার অপরূপ লীলাখেলা।”[২০] যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর ধারণা – “চন্দ্রালোকে যে অপরূপ সৌন্দর্য বিকাশ পায় তা উদ্দেশ্যহীন নয়, মূক মনে হলেও মূক নয়। হয়তো সে সময়ে, যখন মানুষ-পশুপক্ষী নিদ্রাচ্ছন্ন, তখন বিশ্বভূমন্ডল রহস্যময় ভাষায় কথালাপ করে। সে কথালাপের মর্মার্থ উদ্ধার করা মানুষের পক্ষে হয়তো অসম্ভব, কিন্তু তা শ্রবনাতীত নয় : কান পেতে শুনলে তা শোনা যায়।”[২১] প্রথম পরিচ্ছেদে চন্দ্রলোক উদ্ভাসিত মায়াময় চিত্রকল্প ব্যবহারে এক অপূর্ব আলোছায়াময় চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। আর এই চিত্র অঙ্কনে ব্যবহৃত ভাষা উপন্যাসটিকে অন্য মাত্রা দান করেছে।

এছাড়া আরেফ আলীর আত্মকথনে ভাষা হয়ে উঠেছে চিত্রকল্পময় -

(১) ওপরে ঝলমলে জ্যোৎস্না, কিন্তু সামনে নদী থেকে কুয়াশা উঠে আসছে। কুয়াশা না আর কিছু, হয়তো সে ঠিক বোঝে না। হয়তো একদল সাদা বকরী দেখে, শিং- দাঁত- চোখ কিছুই না। হয়তো মনে হয় রাত্রি গা- মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে বসেছে, চোখ ধাঁধানো অন্তহীন জ্যোৎস্নালোকে আভাস দেখা দিয়েছে।[২২]

এখানে প্রকৃতির এক অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। যে সৌন্দর্য আরেফ আলীর দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন লেখক। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর উপন্যাসে বাক্য প্রবাহেও ভীতি অনুষঙ্গী শব্দ ব্যবহার করেছেন। ভীতিবিহ্বল শঙ্কাগ্রস্থ আরেফ আলীর অস্তিত্বের স্বরূপ উন্মোচনে পতঙ্গের পাশাপাশি অন্ধকার গুহার কথাও ব্যবহার করেছেন। আরেফ আলীর বর্ণনায় ভাষা হয়ে উঠেছে প্রকৃতি ও ভীতি অনুষঙ্গী। বাঁশঝাড়ে মৃত নারীর দেহ সরানোর কাজে কাদেরকে সাহায্য করায় সে নিজের অস্তিত্বের স্বরূপকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছে :

(১) কাদেরের পায়ের তলে সে যেন ঘৃণ্য বস্তু, শিরদাঁড়াহীন নপুংসক কীট পতঙ্গ কিছু।[২৩]

(২) শ্রান্তভাবে যুবক শিক্ষক আপন মনে স্বীকার করে, তার চার ধারে ঘোর অন্ধকার, যে- অন্ধকারের মধ্যে অন্ধের মতোই সে প্রশ্নগুলি তৈরি করেছে। তবে তার সন্দেহ থাকে না যে, একবার কাদেরের সঙ্গে মন খুলে কথা বলবার সুযোগ পেলে সব অন্ধকার দূর হবে।[২৪]

শঙ্কাগ্রস্থ ব্যক্তির অস্তিত্বের স্বরূপ উন্মোচনে এরূপ শব্দ ব্যবহারে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্যতার পরিচয় দিয়েছেন।

এর আগেই আলোচিত হয়েছে মোল্লা - মৌলভীদের ব্যবহৃত ভাষা হল বৃত্তিক ভাষা। তাইতো এ উপন্যাসে ধর্মপ্রাণ দাদাসাহেব ও দরবেশ কাদেরের চরিত্র অঙ্কনে তাদের সংলাপে আরবি- ফারসি শব্দের প্রয়োগ দেখা গেছে। তাদের ভাষা হয়ে উঠেছে ইসলামধর্মীয় আবহযুক্ত। যেমন দাদা সাহেবের বর্ণনা প্রসঙ্গে এসেছে :

“দাদাসাহেব ওয়াজ- নছিহত করেন, কিন্তু সহজে কাউকে ভর্ৎসনা করেন না। তাঁর নিস্পলক দৃষ্টিই যথেষ্ট। তাঁর স্তব্ধতায় ছেলেমেয়েদের বুকে এক নিমেষে

হিমশীতলতা আসে। যেমন সেদিন রাতের ঘটনা। সকলে খেতে বসেছে। দস্তরখানায় স্তুপাকার খাদ্য। ডাল, ভাত, মাছ-তরকারী, দু-তিন রকমের ভাজি, একটু কাসুন্দি ও গরম পাতের ঘি, ঘন লাল সুরুয়ার বড় বড় করে কাটা গরুগোস্ত। ছোট পাত্রে মুখরোচোক আচার-চাটনীও কয়েক পদের। সকলেই পাতে খাবার তুলে নিয়েছে। দাদা সাহেব শ্যেণদৃষ্টিতে চতুর্দিকে তাকান। তারপর হঠাৎ তিনি বলেন, বিসমিল্লাহ্। সঙ্গে সঙ্গে চারধারে গুঞ্জন ওঠে বিসমিল্লাহ্।"[২৫]

দাদাসাহেব ও কাদেরের বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি করেছেন। আরবি-ফারসি শব্দের বহুল ব্যবহার করেছেন। যেমন - মানইজ্জত, মালিক, খিল্লাত, চোবদার, সবের-সেবন্দি, খরিতায়, জমিদার প্রভৃতি শব্দ। বলা যেতে পারে চরিত্রের আবহাওয়া অনুযায়ী লেখক সতর্কভাবে ভাষার উপস্থাপন করেছেন। আরেফ আলী ও দাদা সাহেবের বর্ণনায় ভিন্নতর শব্দ ব্যবহার করেছেন। চরিত্র অনুযায়ী ভাষা পরিবর্তনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মৌলিক পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় রেখেছেন। এ উপন্যাসে সংলাপ খুব একটা নেই বললেই চলে। যেহেতু লেখকের একমাত্র অভীষ্ট আরেফ আলীর মানসলোকে আলোকসম্পাত ঘটানো।

এ উপন্যাসে উপমা ও রূপকের ব্যবহারও লক্ষণীয় : "ওপরে ঝলমলে জ্যোৎস্না, কিন্তু সামনে নদী থেকে কুয়াশা উঠে আসছে। কুয়াশা না আর কিছু হয়তো সে ঠিক বোঝেনা। হয়তো একদল সাদা বকরি দেখে যার শিং- দাঁত -চোখ কিছুই নাই।"[২৬]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এ উপন্যাসে চেতনাপ্রবাহ রীতির সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। প্রখ্যাত দার্শনিক উইলিয়াম জেমস তার 'Principles of Psychology' গ্রন্থে সর্বপ্রথম এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন। মনের ভুবনকে উন্মোচিত বা ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি হল চেতনাপ্রবাহ শৈলী। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন পাশ্চাত্য অনুসারী। বাংলাদেশের সমাজসত্যের প্রকাশে তিনি পাশ্চাত্য জীবন দৃষ্টি ও শিল্প বোধকে আশ্রয় করে এই রীতির অবলম্বন করেছেন। উপন্যাসের ভাষা শিল্পকাঠামোরই একটি অংশ। এ উপন্যাসে যেহেতু আরেফ আলীর মনোগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঘটনা প্রবাহকে উপস্থিত করেছেন সেহেতু এখানে ভাষার এই বিশেষ রীতির প্রভাব রয়েছে। উপন্যাসে আরেফ আলীর ভাষা হয়ে উঠেছে বিশ্লেষণাত্মক। তাই লেখক কখনো কখনো দীর্ঘ বাক্য গঠন করেছেন আবার কখনো কখনো ছোট বাক্য গঠন করেছেন। যুবতী নারীর হত্যার পিছনে কাদেরই দায়ী কিনা তা প্রমাণ করতে গিয়ে আরেফ আলীর মনে নানান প্রশ্নের উদয় হয়। সত্য অনুসন্ধানে কিছুতেই সে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না। এই বিষয়টিকে লেখক উপস্থিত করেছেন যেভাবে তা হল : 'যেন', 'হয়তো', 'মনে হয়' প্রভৃতি অনিশ্চয়তা জ্ঞাপক শব্দের মাধ্যমে।যেমন যুবক শিক্ষকের মনে হয় – "বাঁশঝাড়ের ঘটনার পর কাদেরের মনে নিশ্চয়ই গভীর বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় । হয়তো একটি ঘোরতর পাপ-বোধে সে জর্জরিত হয়ে পড়ে ।"[২৭]

'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসটি দুজন কথকের বয়ানে উপস্থিত হয়েছে। কথক 'আমি'র বয়ানে এসেছে মুহাম্মদ মুস্তফার শৈশব থেকে আত্মহত্যা পর্যন্ত ঘটনাবলী এবং কথক তবারক ভুইঞার কথনে উপস্থিত হয়েছে কুমুরডাঙ্গা এবং তৎসংলগ্ন জনপদের ইতিহাস। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পুরো উপন্যাস জুড়ে 'আমি' সর্বনাম এর কথকের বয়ান উপস্থিত করেছেন। তবে তাকে কোন চরিত্র হিসেবে অঙ্কন করেনি। পুরো উপন্যাসে এই 'আমি' সর্বনামের দ্বারা লেখক মুহাম্মদ মুস্তফার জীবন রূপায়িত করেছেন। এ উপন্যাসেও লেখক চেতনাপ্রবাহ রীতির সার্থক প্রয়োগ করেছেন দেশ কাল এবং সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে। যা উপন্যাসের ভাষা শৈলীকে করে তুলেছে সমৃদ্ধ। লেখক কুমুরডাঙ্গার বর্ণনাতে কখনো কখনো দীর্ঘ বাক্য সংযোজন করেছেন। যেমন : "স্টীমার আসবে না- সে কথাই স্টেশন মাস্টার বারবার ভাবে: নিত্য একবার উজানে একবার ভাটিতে দু-দুবার ঘাটে জীবন-স্পন্দন জাগিয়ে অব্যর্থভাবে যে-স্টিমার এসেছে সে-স্টীমার আসবে না। সুগম্ভীর সুরে বাঁশি বাজিয়ে দূরত্বের বিচিত্র আবহাওয়া সৃষ্টি করে স্টীমারের আগমন, ঢেউ-এর উচ্ছৃঙ্খল নৃত্য, যাত্রীদের ত্রস্তব্যস্ত ওঠা-নাবা, লস্করদের কর্ম তৎপরতা, অবশেষে স্টীমারের প্রস্থানের পর আকস্মিক নীরবতা, আরো পরে উল্টো পথের স্টীমারের জন্য প্রতীক্ষা- এ-সব দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পর নিতান্ত গতানুগতিক মনে হলেও খতিব মিঞার জন্যে একটি সত্যের পুনরুচ্চারণের মতোই : সে ঘাটের স্টেশনমাস্টার।"[২৮] কুমুরডাঙ্গায় স্টীমার চলাচল বন্ধ হয়ে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে তা বর্ণনা হয়েছে তবারক ভুইঞার দৃষ্টিকোণ থেকে দীর্ঘ বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে । তবে এ উপন্যাসে বহু দীর্ঘ বাক্যের সংযোজন করেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। 'লালসালু', 'চাঁদের অমাবস্যা'র মত এ উপন্যাসেও ভীতি অনুষঙ্গবাহী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন : কলিজা ভীতি ও কান্না জনিত ভয়। কলিজা ভীতি মুহাম্মদ মুস্তফার জীবনকে কীভাবে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে এ উপন্যাসে। অপরদিকে কান্না জনিত ভীতি কেবলমাত্র কোন এক ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না সেই ভীতি কুমুরডাঙ্গার সকল অধিবাসীকেই গ্রাস করেছিল। কান্না জনিত ভীতি সৃষ্টিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। কুমুরডাঙ্গার বাকাল নদীতে চর পড়ে যাওয়ায় সকল অধিবাসীই যেন কান্নার বিচিত্র আওয়াজ শুনতে পেত। সে কান্না যেন নদীরই কান্না। সেই নদী বোধ হয় কুমুরডাঙ্গার সকল অধিবাসীর দুঃখেই কেঁদেছিল।

তবে এ উপন্যাসে- "ওয়ালীউল্লাহ সংলাপেও উপভাষা এড়িয়ে গিয়েছেন - একটি অনাঞ্চলিক সর্বজনীন উপন্যাস রচনাই তাঁর আদর্শ ছিল। তাঁর গদ্য ভাষা কাব্যিক বা সংবাদবহ কোনটাই নয়"[২৯] - তা হলবিশ্লেষণধর্মী। এ উপন্যাসে উচ্চারিত অনুচ্চারিত বাক্য স্রোত যেন নদীর ধারার মতো বয়ে চলেছে। নদীর প্রতীকের মাধ্যমে মানুষের জীবনকে তুলে ধরেছেন 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে। নদীর বহমানতার সঙ্গে

জীবনের সম্বন্ধ গড়ে তুলেছেন। সামাজিক বাস্তবতাকে তিনি প্রতীকী ভাষায় তুলে ধরেছেন। কুমুরডাঙ্গায় বাকাল নদীতে চর পড়ায় যখন স্টীমার আসা বন্ধ হয়ে যায় তখন সেই কুমুরডাঙ্গা শহরের জীবনের স্বাভাবিক ছন্দেরও একটি বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও তার উপন্যাস গুলিতে ভাষার সৌন্দর্যে সমাজ বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। "উপন্যাসের পক্ষে যা-কিছু প্রয়োজনীয়-সর্ববিধ বিষয়, এবং সর্বস্তরের মানুষ, তথা এর বিস্তৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করার যোগ্য ভাষাই উপন্যাসের আদর্শ ভাষা।"[৩০] তাঁর রচিত 'লালসালু' উপন্যাসের ভাষা হল বর্ণনামূলক, 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের ভাষা আত্মকথন মূলক ও বিশ্লেষণাত্মক। অপরদিকে 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতাকে সরাসরি উপস্থাপন না করে প্রতীকী ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

তথ্যসূত্র :

(১) মকসুদ সৈয়দ আবুল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস-সমগ্র, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২৬
(২) তদেব. পৃ. ২৫
(৩) তদেব. পৃ. ৪৩
(৪) তদেব. পৃ. ৭৩
(৫) তদেব. পৃ. ১১
(৬) তদেব. পৃ. ৩৪
(৭) মুসা মনসুর লালসালু এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, (সম্পাদনা মমতাজউদদীন আহমদ), মনন প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৪৯
(৮) তদেব. পৃ. ৫৪
(৯) মকসুদ সৈয়দ আবুল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস-সমগ্র, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২১
(১০) তদেব. পৃ. ১১১
(১১) তদেব. পৃ. ৮৪
(১২) তদেব. পৃ. ১০০
(১৩) তদেব. পৃ. ৮৭
(১৪) তদেব. পৃ. ৯৫
(১৫) তদেব. পৃ. ১০৫
(১৬) তদেব. পৃ. ৩০
(১৭) তদেব. পৃ. ৩২
(১৮) তদেব.পৃ. ৭২

(১৯) তদেব. পৃ. ৪৪
(২০) তদেব. পৃ. ১২০
(২১) তদেব. পৃ. ১২০
(২২) তদেব. পৃ. ১১৭-১১৮
(২৩) তদেব. পৃ. ১৪৬
(২৪) তদেব. পৃ. ১৫৩
(২৫) তদেব. পৃ. ১২৭
(২৬) তদেব. পৃ. ১১৮
(২৭) তদেব. পৃ. ১৭৭
(২৮) তদেব. পৃ.২৪২
(২৯) সৈয়দ আব্দুল মান্নান সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ অগ্রন্থিত রচনাগুচ্ছ অপ্রকাশিত আলোকচিত্রাবলি, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৮০
(৩০) আলী জিনাত ইমতিয়াজ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১১৩

সত্তরের রাজনীতির প্রেক্ষিতে প্রতিবাদী নাট্যব্যক্তিত্ব অমল রায়

অমর ভাণ্ডারী
গবেষক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয় সংক্ষেপ : বিশ শতকের সাতের দশককে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়, সেই পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে নাটককার অমল রায় রচনা করেন একাধিক নাটক। যেমন, 'লাসবিপণি', 'নিজবাসভূমে', 'পঙ্কজ দত্ত আসছেন' ইত্যাদি। নাটকগুলিতে তিনি কথা বলেন সাধারণ মানুষের—কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত পরিবার ইত্যাদি। সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য দায়ী করেছেন সরকারের বিভিন্ন ভ্রান্ত নীতিগুলিকে এবং বিরোধীদের চুপ করে থাকাকে। তিনি আজীবন নকশাল মনস্ক ছিলেন। তাঁর নাটকও হয়েছে সেই নকশাল দর্শনে রচিত। কমিউনিস্ট পার্টির সংশোধনবাদ সেজন্য বারবার তাঁর নাটকে সমালোচিত হয়েছে।

সূচক শব্দ : নকশাল আন্দোলন, জরুরি অবস্থা, রাজনৈতিক হিংসা, শ্রেণিশত্রু, শ্রেণিঘৃণা, পুলিশি অত্যাচার, সংশোধনবাদ, কংগ্রেস, ইন্দিরা গান্ধী।

মূল প্রবন্ধ : পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে সাতের দশক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে পরিপূর্ণ। ছয়ের দশক থেকেই যার প্রস্তুতি চলছিল। নকশাল আন্দোলন, সামাজিক অবক্ষয়, জরুরি অবস্থা, রাজনৈতিক হিংসা, খুন, পুলিশি তৎপরতা ইত্যাদি ছিল সাতের দশকের রাজনীতিতে অন্যতম সব ঘটনা। যা ঘটনা জনজীবনে প্রভাব ফেলে খুব গভীরভাবে। ফলে খুব স্বাভবিকভাবেই সাহিত্যে এইসব বিষয় নানা দিক থেকে বিশ্লেষিত হতে থাকে। নাটক তার ব্যতিক্রম নয়। এই সময়ের থিয়েটারের জগতে উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র প্রমুখ খুব পরিচিত নাম। কিন্তু এঁদের বাইরে আর একজন ছিলেন অমল রায়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক নাটক লিখে তিনি সেসময়ে খ্যাতিই শুধু অর্জন করেননি, সেই সঙ্গে দর্শকদেরও রাজনীতি সচেতন করেছেন। তবে তাঁর নাটকগুলি প্রপাগাণ্ডা মূলক। সেজন্য তাঁর নাটককে আমরা 'এজিটপ্রপ' নাটক বলতে পারি।

২

অমল রায় (১৯৫০-২০১১)-এর নাটকের পরিচয় দেওয়ার আগে তাঁর ব্যক্তি পরিচয় জানা প্রয়োজন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র তপনকুমার দাস যিনি নাট্যজগতে অমল রায় নামে খ্যাত। তাঁর বাবা ব্রজেন্দ্রনাথ দাস একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও নেতাজীর অনুগামী ছিলেন। পিতার সংগ্রামী আদর্শের উত্তরাধিকার অমল রায়-ও বহন করত। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যে

সময় তিনি প্রেসিডেন্সির ছাত্র সে সময় ছাত্র-আন্দোলনের একটা অগ্নিময় যুগ। বামপন্থী আদর্শকে সমর্থন করতেন, কিন্তু সি. পি. আই. (এম)-এর সুবিধাবাদী রাজনীতির বিরোধিতাও করতেন। পরবর্তীতে নকশালবাড়ি আন্দোলন সংঘটিত হলে তার মধ্যে নিজের ঈপ্সিতকে খুঁজে পেয়েছিলেন। ফলে আজীবন তিনি নকশাল আদর্শ ও আন্দোলনকে সমর্থন করে গেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমার নাট্যকার জীবনের শুরুই হয়েছিল নকশালবাড়ির রাজনীতির প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে।'[১] ফলে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে নকশালদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাজকর্মে অংশ নিয়েছেন, সেজন্য তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হতে হয়েছে বারবার। তিনি চাকরি খুইয়েছেন, জেলে গেছেন। তাতেও আদর্শচ্যুত হননি। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর নাটক যেন গর্জে উঠেছে। তিনি হয়ে উঠেছেন বাংলার আপোসহীন শিল্পী। দিলীপকুমার মিত্র তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'মানুষই তো তাঁর আরাধ্য, মানুষকে ভালোবেসেই তিনি পাবেন তাঁর ঈপ্সিতকে, যা হল সর্বহারার অধিকার স্থাপন। এই আদর্শ তাঁকে সারাজীবন তাড়িত করেছে।'[২] সেই সুর আমরা পাব তাঁর রচিত নাটকে।

৩

অমল রায় তাঁর জীবনে চারশোর অধিক নাটক রচনা করেছেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধে সাধারণ মানুষের সংগ্রাম নিয়ে 'অমর ভিয়েতনাম' (১৯৬৭) রচনা করে তাঁর নাট্য-জীবনের যাত্রা শুরু। নাটককার হিসেবে তাঁকে প্রতিষ্ঠা এনে দেয় 'কেননা মানুষ' (১৯৭২) নাটকটি। আমাদের এই প্রবন্ধে আমরা অমল রায়ের সেইসব নাটক নিয়ে আলোচনা করব যেগুলি তিনি সাতের দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে রচনা করেন। এই নাটকগুলির আলোচনা করে আমরা যেমন দেখে নেব সাতের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতাকে, তেমনি চিনে নেব নাটককারের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সমর্থন ও চিন্তাকে।

নকশাল আন্দোলনকে দমন করতে পুলিশ ও কংগ্রেসি গুণ্ডারা মিলিত হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় নকশাল কর্মীদের হত্যা করে। তার মধ্যে বারাসাত, বরানগর, কাশীপুরের হত্যাকাণ্ড বিশেষ পরিচিত। এইসব হত্যাকাণ্ডর কথা অমল রায়ের নাটকে ফিরেফিরে এসেছে। তিনি নাটকের মাধ্যমে এইসব হত্যার প্রতিবাদ করেছেন। বারাসাত হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে তিনি রচনা করেন 'আট জোড়া খোলা চোখ' নাটকটি। নাটকে দেখা যায় ১৯ নভেম্বর ১৯৭০, যখন রাজ্যে জরুরি অবস্থা বহাল, সেই ভোরবেলায় যখন সকলে ঘুমিয়ে, তখন পুলিশ ও কয়েকজন কংগ্রেসি গুণ্ডা একত্রে আটজনের লাস বারাসাতে ফেলে দিয়ে আসে। সেই আট জনের মধ্যে যতীন দাস ও কানাই ভট্টাচার্য দুজনেই ছিল শ্রমিক এবং প্রথমে সি. পি. আই. (এম) করত। পরে তারা যোগ দিয়েছিল নকশালদের সঙ্গে। বাকি ছয়জন অর্থাৎ স্বপন পাল, টুকটুক দত্ত, শঙ্কর চ্যাটার্জী, সমীর মিত্র ও তরুণ দাস ছিল স্কুল, কলেজ বা ইউনিভার্সিটির ছাত্র ও নকশাল কর্মী। নাটকটি রচনার পিছনে নবারুণ ভট্টাচার্যের 'এই মৃত্যু উপত্যকা

আমার দেশ না' কবিতার প্রভাব সুস্পষ্ট। তাই বারবার নাটকের চরিত্রের সংলাপে কবিতাটি ধ্বনিত হয়েছে।–

> '১ম।। যে পিতা সন্তানের নাম শনাক্ত করতে ভয় পায়—
> তিনজন।। আমি তাকে ঘৃণা করি।
> ২য়।। যে ভাই এখনও নির্লজ্জ স্বাভাবিক হয়ে আছে—
> তিনজন।। আমি তাকে ঘৃণা করি।
> ৩য়।। যে বুদ্ধিজীবী কবি ও কেরাণী
> ৪র্থ।। প্রকাশ্য রাজপথে এই হত্যার প্রতিশোধ চায় না
> তিনজন।। আমি তাকে ঘৃণা করি।'[৩]

আটজনের হত্যার খবর দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রকাশ পায়, রাজ্যের মানুষের জানতে বাকি থাকে না এই হত্যার জন্য কারা দায়ী—কিন্তু তাদের কোনও শাস্তি হয় না। চাপে পড়ে সরকার তদন্ত কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু তার গঠন বা কর্মসূচি কিছুই বাস্তবায়িত হয় না। আটজন মৃতের পরিবার নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু অন্যদিকে হত্যাকারীরাই আবার ক্ষমতা দখল করে।

শহর অঞ্চলে নকশালদের হত্যা ও জেলবন্দী করে তাদের উপর যে নির্যাতন করা হচ্ছিল সেই প্রসঙ্গে অমল রায়ের আর একটি নাটক 'পঙ্কজ দত্ত আসছেন'। নাটকের শুরুতেই ভাষ্যকার জানিয়েছে—

> '...সেই বীভৎস দুঃসময়ে যে পেশাদার খুনী গুপ্তঘাতকের দল দিল্লীর বেগমসাহেবার মদির ভ্রুভঙ্গের ইঙ্গিতে এই দেশের শত শত তরুণ প্রাণের রক্ত ঝরিয়েছিল, তাদের কেউ যাতে আজকে রেহাই না পায়, যাতে তারা দিন বদলের দিনে উর্দি বদলিয়ে আমাদের মধ্যে মিশে না যেতে পারে—যাতে প্রতিটি হত্যাকারীকে আমরা খুঁজে বার করে তাদের প্রাপ্য শাস্তি দিতে পারি—সেই জন্যেই আমাদের আজকের নাটক'।[৪]

নাটকটি পাঁচজন নকশাল বন্দীর আদালতের বিচারকে কেন্দ্র করে রচিত। কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-নকশাল নেতা পঙ্কজ দত্তকে হত্যা করেছে পুলিশ, কিন্তু প্রচার করেছে সে পলাতক। সেই সত্য উদ্‌ঘাটন করাই নাটকের মূল লক্ষ্য। পাঁচজন বন্দীর মধ্যে একজন ছিল নারী। এই সময় নকশাল করত যেসমস্ত মহিলারা তাদের উপর পুলিশ কীভাবে অত্যাচার চালাত সেকথাও এখানে এসেছে বন্দিনীর সংলাপে।–

> '...নারীত্বের কোন সম্মান আছে আপনাদের কাছে। এই যে আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে ভিন্‌দেশী সি. আর. পি-দের দিয়ে ধর্ষণ করাননি আপনারা? আপনাদের এস. বি. অফিসাররা জ্বলন্ত সিগারেটের আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে আমার সারা বুক পুড়িয়ে দেয় নি? গোপন অঙ্গে রবারের নল'[৫]—ইত্যাদি।

সাতের দশকের রাজনীতির পটভূমিতে অধিক সংকটের মুখে পরেছিল কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্র-সমাজ। জমিদার, জোতদারদের ও কারখানার মালিকদের শোষণে কৃষক ও শ্রমিকরা কীভাবে সর্বশান্ত হয়ে যায়, সমাজ বিন্যাসের পরিকাঠামোয় শিক্ষিত ছাত্ররা চাকরির সন্ধানে কীভাবে দিশেহারা হয়, তার রূপায়ণ আছে 'লাশবিপণি' নাটকে। নাটকটি সম্পর্কে কবি কমলেশ সেন বলেছিলেন 'লাসবিপণি তো একসময় মিথ হয়ে গিয়েছিল।'[৬] আশিষ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় ও ইউনিট থিয়েটারের প্রযোজনায় নাটকটি মঞ্চস্থ করতে গিয়ে নাট্যকর্মীরা পুলিশি বাধা ও কংগ্রেসি গুণ্ডা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল।[৭] এসব তথ্য থেকেই বোঝা যায় তৎকালীন রাজনীতির প্রেক্ষাপটে শাসকের স্বরূপ উন্মোচনে নাটকটির প্রভাব কতটা ছিল।

রাজনৈতিক হিংসা, পুলিশি অভিযান, রাজনৈতিক হত্যা ইত্যাদি সাতের দশকের সামাজিক জীবনে যেন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সেজন্য নাটককার সারা দেশকে একটি মৃতদেহ উৎপাদক সংস্থা হিসেবে দেখেছেন। যে সংস্থার নাম 'লাসবিপণি'। মৃতদেহ উৎপাদন করা যেন আমাদের দেশে এক অন্যতম শিল্পে পরিণত হয়েছে—যার চাহিদা বিশ্বময়। সেজন্যই 'ইন্দুমাসীর (ইন্দিরা গান্ধী) আয়োজনে আন্তর্জাতিক মৃতদেহ প্রদর্শনী' অনুষ্ঠিত হয়েছে লাসবিপণির ম্যানেজিং ডিরেক্টর পাতিরাম পতিতুণ্ডর তত্ত্বাবধানে। প্রদর্শনীতে আগত দেশ-বিদেশের অতিথিবর্গের সামনে তিনি যে উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছেন তাতে তৎকালীন রাজনীতির অবস্থা উঠে এসেছে। যেমন ব্যাঙ্গের ছলে জানান, ভারতবর্ষে সমস্ত কিছুতে ভেজাল দেওয়া হলেও শোষণে ও মৃতদেহ উৎপাদনে কোনও ভেজাল দেওয়া হয় না।এখানে গাইড ও ঘোষকের জবানিতে নাটককার যে গান বসিয়েছেন তাতে সেই সময়ের রাজনীতিকে ব্যঙ্গই করা হয়েছে—

'লোকে কেন পায়না খেতে, আগে বলতে—চীন
এসব শুনে স্যামু চাচা ছাড়ত অনেক ঋণ!
মেঘগুলো সব ডাকছে কেন, কেন এমন খরা?
জবাব ছিল সহজ অতি, চীনই অমনতরা!
এসব শুনে স্যামুচাচার চাটতে গিয়ে পা—
দিন বদলের দিনগুলোতে ওসব ভুলে যা!
...
এখন—রুশের সঙ্গে যুক্তি, দুই শেয়ালের যুক্তি
উঠবে যেথায় বিরোধীতার ঝান্ডা।
সমাজবাদের মুখোশ এঁটে, সাম্যবাদের বাটনা বেঁটে
লাগাও জোড়ে প্রগতিশীল ডান্ডা।'[৮]

মৃতদেহ প্রদর্শনীতে তিনটি লাস দেখানো হয়েছে—কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্র। সত্তরের রাজনীতিতে এই তিন শ্রেণির মানুষ কীভাবে লাসে পরিণত হত তার কাহিনি

নাটককার তাদের মুখেই বলিয়েছেন। প্রথমে দেখানো হয় ১৫ই আগস্ট ১৯৭৩ সালের একটি গ্রাম্য কৃষক রমজান মিঞ্যার লাস। যার সবকিছু হরণ করে জোতদার শিব মুখুজ্যে সর্বশান্ত করে দেয়। তারপরেও যখন সে তার প্রতিবাদ করে তখন পুলিশের সহায়তা নিয়ে শিব মুখুজ্যে তাকে 'পাকিস্তানি গুপ্তচর' অভিযোগে কারাবন্দি করায়। পরবর্তী ঘটনা তার জবানিতেই শুনে নেব—

> 'আমারে ফাটকে পোরলো। আটমাস বাদে যখন ঘরে ফিরলাম, তখন—ঘরটা আমার গরস্থান, দু-দুটো ছাওয়াল না খেতি পেয়ে মরেছে, বিবিটা যে কোথায় চলি গেল, ভিটে মাটি পর্যন্ত ঐ বাবুর দখলে। গেরামে কেউ কাজ দিল না।...শহরে আলাম। বাবু—একডা কাজ দেবে, যে কোনো কাজ...কোথাও কাজ নাই। অথচ আগুন জ্বলছে প্যাটে...তখন একটা পয়সা দেবে বাবু—দু'দিন কিছু খাইনি।'[৯]

নাটকের দ্বিতীয় লাস ১৯৭২ সালে মৃতশ্রমিক হারাণচন্দ্র মাঝির। এ সম্পর্কে গাইড দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, '...এবার দেখুন এই সমাজতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকের লাস কীভাবে জাতীয়তাবাদের কড়াইয়ে সেদ্ধ হয়।'[১০] সমাজতান্ত্রিক দেশের মূল স্তম্ভই শ্রমিক শ্রেণি। অথচ ইন্দিরা গান্ধীর সমাজতন্ত্রে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তারাই। বাজারে জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য হওয়ায় সংসার চালানো শ্রমিকদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অথচ কারখানায় লক্-আউট, ক্লোজার, ছাঁটাই চলছে নিত্যদিন। যার প্রতিবাদে তাঁরা আন্দোলন করে। কিন্তু কারখানা চালু হচ্ছে না। ট্রেড-ইউনিয়ানের শ্রমিক নেতারাও মালিকপক্ষের সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়ে শ্রমিকদেরই ক্ষতি করছে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রমিক আন্দোলনকে মজবুত করেনি—এই দিকটাও নাটককার দেখিয়েছেন। শ্রমিকদের আন্দোলন চালানোর জন্য যে খরচ প্রয়োজন তার জন্য শ্রমিকরা চাঁদা চায় পথে-ঘাটে। পরবর্তী সময়ে তাদের জীবন কোন পথে যায় তা হারাণচন্দ্র মাঝির কথাতেই শোনা যাক—

> '...অনেকেই আমায় দেখেছেন—ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, পাড়ায় পাড়ায়—হাতে এই চাঁদার কৌটা নিয়ে—ধর্মঘট শ্রমিকের সাহায্য করে যান দাদারা, ধর্মঘটি শ্রমিকদের দুটো পয়সা দেবে গো বাবা...ঘরে সাতটি প্রাণী বাবারা—এক মুঠো চাল দেবে গো মা—তিনদিন কিছু খাইনি, বাবারা—ছেলেটা না খেয়ে শুকিয়ে মরছে বাবা, দুটো পয়সা দেবে ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাবা, বৌটা গলায় দড়ি দিয়েছে মা, দুটো বাসী রুটি দেবে গো—দারুণ খিদে...'।[১১]

এভাবেই মারা যায় শ্রমিক হারাণচন্দ্র মাঝির মত কত শত শ্রমিক। নাটকে প্রদর্শিত অন্তিম লাস ১৯৭১ সালে মৃত ছাত্র সুমিত মিত্রর। সুমিতের ইচ্ছা ছিল বিলেতে গিয়ে গবেষণা করার, কিন্তু বাবার অবসরের পর সংসার চালানোর তাগিদে কর্মের সন্ধানে বেড়িয়ে পরতে হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখে তাঁর এতদিনের শিক্ষা ফিজিক্সে ফার্স্ট

ক্লাস অনার্স হওয়া সত্ত্বেও কর্মের ক্ষেত্রে তার কোনও দাম নেই। তার বদলে তার কাছে জানতে চায় সে টাইপিং বা ইলেক্ট্রিকের কাজ বা কাটিং জানে কিনা। অবশেষে সে সব কিছু শিখেও কাজ হাসিল করতে পারেনি। তার বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না, বোনগুলো বিপথে চলে যাচ্ছে, ভাইগুলো সমাজবিরোধী কাজে যুক্ত হচ্ছে। এসব সত্ত্বেও সে আত্মহত্যা করেনি। কারণ তার কথায়—

> '...এটা একাত্তর সাল,...কেউ গলায় দড়ি দিয়ে মরে না, বিষ খায় না, আমি হাতে তুলে নেব গোলাপ ফুলের মতো পাইপ গান'।[১২]

সুমিত মিত্রর মত অসংখ্য ছাত্র সেই দুর্বার পদক্ষেপ নিলে তার সঙ্গে এসে যোগদান করে রমজান মিঞার মত কৃষকরা, হারাণচন্দ্র মাঝির মত শ্রমিকরা। শুরু হয় নকশাল আন্দোলন। শোষিত, অবহেলিত, অবদমিত মানুষরা বাঁচার আশা পায়। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও সরকার তা দমন করার জন্য অবলম্বন করে হিংসাত্মক পথ। তাই পতিতুণ্ড বলেছেন—

> 'অহিংসা পদ্ধতিতে মৃতদেহ উৎপাদন যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন আমরা সৃষ্টি করি—বারাসাত, বেলেঘাটা, বরাহনগর।'[১৩]

সাতের দশকের রাজনীতিতে সব থেকে বিতর্কিত ও অন্ধকারের অধ্যায় ২৫ জুন ১৯৭৫-এ মধ্যরাতে জরুরি অবস্থার ঘোষণা। ২১ মাস বহাল থাকে সেই অবস্থা। ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্রের মতে জরুরি অবস্থায় সারা দেশ জুড়ে প্রায় ১১০,০০০ জন 'মিসা' ও 'ডি.আই.আর' আইনে গ্রেপ্তার হয়েছিল।[১৪] দেশের যত বিরোধী নেতা ছিল সকলেই এই সময় ছিল কারাবন্দি—যেমন জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজি দেশাই, অটলবিহারী বাজপাই, অরুণ জেটলি প্রমুখ।[১৫] যেসব পত্রিকা ইন্দিরা গান্ধীর সমালোচনা করত সেগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল—যেমন 'মাদারল্যাণ্ড', 'অর্গানাইজার', 'এভরিম্যান', 'লোকনীতি' ইত্যাদি।[১৬] বহু সাংবাদিকও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন—যেমন গৌরকিশোর ঘোষ, বরুণ সেনগুপ্ত, কুলদীপ নাইয়ার, কে. আর. ম্যালকানি প্রমুখ। এই সময় মৌলিক অধিকার বলে কিছুই ছিল না। সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল পুলিশের হাতে। এরকম পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে জরুরি অবস্থাতেই সরকারের সিদ্ধান্তকে তীব্র আক্রমণ করে অমল রায় রচনা করেছেন 'নিজবাসভূমে' 'ঝড় উঠুক' 'বদলা' ইত্যাদি নাটকগুলি। বর্তমান প্রবন্ধে কেবল 'নিজবাসভূমে' আলোচনা করা হবে।

'নিজবাসভূমে' নাটকটির শুরুতেই পটভূমি সম্পর্কে নাটককার বলেছেন—

> '...যখন স্বৈরাচারী এক দানবীয় জিঘাংসার শানিত নখরাঘাতে সারা দেশ ছিন্নভিন্ন—রক্তাক্ত; যখন সারা দেশ জুরে এক বিশাল বন্দীশিবির "স্বাধীনতা" শব্দটিকেই ব্যাঙ্গ করছে—সেই কালো অন্ধকারজরুরি অবস্থার সন্ত্রাস শাসিত পটভূমিতেই আমাদের নাটকের বিস্তার।...এ নাটকের সময়—১৯৭৬ সাল, যখন অত্যাচারিত

> পশ্চিমবাংলার বহু রাজনৈতিক কর্মী এলাকাছাড়া, গৃহহীন, পলাতক, নিরাশ্রয়'।[১৭]

জরুরি অবস্থার সময় ইন্দিরা-বিরোধী নেতানেত্রীরা ছিল হয় কারাবন্দী নাহলে পলাতক। সেইরকমই নাটকটিতে সি.পি.আই. (এম) কর্মী সুগত, বিদ্যুৎ, রফিক, প্রশান্ত, সমীরণ ও অনির্বান পলাতক। তারা আত্মগোপন করেছে একটি ভাঙা গীর্জায়। নাটকের শুরুতেই সি.পি.আই. (এম) কর্মী নান্টু তার মাকে দেখতে এলে কংগ্রেসি গুণ্ডাদের হাতে তাকে প্রাণ হারাতে হয়। অর্থাৎ নাটকের প্রথম থেকেই সময়ের সংকটকে তুলে ধরেছেন। এটি একটি আত্ম-সমালোচনার নাটক। জরুরি অবস্থায় যখন সি.পি.আই. (এম) কর্মী, সমর্থকরা সংকটে এবং পালিয়ে পালিয়ে তাদের প্রাণ রক্ষা করতে হচ্ছে তখন অতীতে গৃহীত ভুল সিদ্ধান্তগুলির কথা মনে করেছে সমীরণরা। সংসদীয় গণতন্ত্রে অবিশ্বাসী নকশালদের তারা শত্রু ভেবেছিল। তুলনায় ইন্দিরা গান্ধীকে বেশি সঠিক মনে হয়েছিল। পড়ে তিনিই যখন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন, তখন সব থেকে বেশি বিপদে পরেছিল সি.পি.আই. (এম)। ফলে তাদের মনে হয়েছে বিল্টুর মত নকশালদের আক্রমণ করাটা তাদের রাজনৈতিক জীবনের সব থেকে বড় ভুল। সেজন্যই তাদের 'ইলিউশনে' বিল্টু এসে বলেছে তাদেরই আত্মপাঠ—

> '...ফ্যাসীবাদ কাউকে ছাড়ে না, সে আগে মারে কমিউনিস্টদের— তারপর অন্য সবাইকে'।[১৮]

সমীরণদের বর্তমান অবস্থার কারণ যে তাদের পূর্ব সিদ্ধান্তগুলিই—সেকথা কান্তিও বলেছে। কারণ কংগ্রেস ভাঙন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, বাংলাদেশ যুদ্ধ সব কিছুতেই তারা ইন্দিরা গান্ধীকেই সমর্থন জানিয়ে এসেছে। যা তাঁর স্পর্ধা বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে পরবর্তী সময়ে তিনি আর বিরোধিতা সহ্য করতে পারেননি। যখনই বিরোধিতা হয়েছে তখনই তিনি যেভাবেই হোক তা দমন করতে চেয়েছেন। সেজন্যই যখন বিরোধ চরম শিখরে তখন তা বন্ধ করতে তিনি অবলম্বন করেন জরুরি অবস্থা জারির।

৪

পুর্বেই বলেছি অমল রায় রাজনৈতিকভাবে সমর্থন করতেন নকশালপন্থাকে। তিনি বিশ্বাস করতেন বুলেটে, ব্যালটে না। সেই ভাবনায় তাঁর নাটকগুলি ঋদ্ধ। নাটকগুলি পাঠ করলে আমদের বুঝতে বাকি থাকে না নাটককারের সমর্থন কোন দিকে। সেজন্যই তিনি চরিত্রের সংলাপে অনায়াসেই বসাতে পারেন, 'শোষক শ্রেণীর আদালতে ন্যায়বিচার হয় না—হবে না', 'একটি বিপ্লবীর ঝড়লে খুন, সারা দেশে জ্বলবে আগুন', 'শোষকের আদালত ভেঙ্গে ফেল, জনতার আদালত গড়ে তোল'[১৯] ইত্যাদি কথা।

নকশাল আন্দোলন সেসময় ব্যর্থ হলেও নাটককার তার প্রতি ভরসা হারাননি। সে ইঙ্গিতও তাঁর নাটকে আছে। যেমন 'লাসবিপণি'-র শেষে তিনি বলেছেন—

> '...তবু এই দুঃসময়েও স্বপ্ন দেখি—এমন একদিন আসবে যেদিন এই ঘুমন্ত নিঃস্পৃহ ভিসুভিয়াস ফেটে পড়বে দুর্বার ক্রোধ আর ঘৃণায়

(ক্রমশ একটা মিছিল এগিয়ে আসতে থাকে) হ ভেঙে দেবে স্পর্ধিত অত্যাচারের এই লাসবিপণি।'[২০]

অথবা 'নিজবাসভূমে'-র শেষ উক্তি, 'লেট দেয়ার বি লাইট মাই বয়, লেট দেয়ার বি লাইট'। আবার 'ঝড় উঠুক' নাটকে নকশাল নেতা কৌশিক সেন মারা গেলেও সেই খবর পুলিশকে জানায়নি বন্ধু গোপাল হালদার এবং নাটক শেষ করেছেন মানুষের মিছিল দিয়ে।

অমল রায় নাটককে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তিনি নাটকের আঙ্গিকগত গুরুত্বের থেকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন বিষয়গত দিকে। তিনি যেহেতু বাম-মনস্ক ছিলেন সেজন্য তাঁর নাটকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের কথা। নাটকের মাধ্যমে তিনি দর্শককে সচেতন করতে চেয়েছেন শ্রেণিশত্রু সম্পর্কে—সেজন্য 'দুই চোরের গপ্পো' নাটকে মাস্টার গণেশ ও মকবুলকে বলেছে যে, আমাদের আসল শত্রু টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কা, ডালমিয়াদের মতো পুঁজিবাদীরা। শুধু শ্রেণিশত্রু চিনিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, সেইসঙ্গে শ্রেণিঘৃণা উদ্রেক করারও চেষ্টা করেছেন। যেমন 'বদলা' নাটকে শেষপর্যন্ত বিকাশের বাবাকে বাধ্য করিয়েছে বিকাশের হত্যার প্রতিশোধ নিতে। নাটকের মূল সুর হয়েছে 'শ্রেণীশত্রুর রক্তে রাঙিয়ে নাও শ্রেণীযুদ্ধের হাতিয়ার!'

অবশ্য একথাও বলতে হয়, অমল রায় সময়ের সমস্ত সংকটকে বিচার করেছেন নকশালবাদী নজর দিয়ে। তিনি কোন জায়গায় নকশালদের সমালোচনা করেননি। এমনকি নকশালদের স্কুল-কলেজ ও মূর্তি ভাঙার মতো কাজকেও কেবল ভুল বলেই ছেড়েছেন। ফলে তাঁর নাটক হয়েছে বড়বেশি একপেশে। তাঁর বিপুল নাটকের মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র থাকলেও দৃষ্টিভঙ্গির তেমন কোনও পার্থক্য নেই। সবটাই বড্ডবেশি একঘেয়ামি। অর্থাৎ কয়েকটা নাটক পড়ার পরই তাঁর সমস্ত নাটকের মূল সুর ধরতে পারা যায়। তা সত্ত্বেও পরিশেষে এটাই বলতে হয় যে, তিনি সেই সময়ের শাসকের রক্তচক্ষুর সামনে দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধায় তার সমালোচনা করে গেছেন এবং তাঁর নাটকগুলি হয়ে উঠেছে সময়ের দলিল।

তথ্যসূত্র :

১. দিলীপকুমার মিত্র, 'অনন্য নাট্যপুরুষ অমল রায়', দেবতোষ ঘোষ (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাদেমি পত্রিকা-১৫, আগস্ট ২০১২, কলকাতা। পৃ-২৩৮

২. তদেব-২৩৭

৩. অমল রায়, 'আট জোড়া খোলা চোখ', মিলন গোপাল গোস্বামী, 'নকশালবাড়ী আন্দোলনের নাটক সমগ্র', ২০১৪, করুণা, কলকাতা, পৃ-৩৭৭

৪. অমল রায়, 'পঙ্কজ দত্ত আসছেন', মিলন গোপাল গোস্বামী, 'নকশালবাড়ী আন্দোলনের নাটক সমগ্র', ২০১৪, করুণা, কলকাতা, পৃ -৩২৯
৫. তদেব-৩৪৬
৬. অমল রায়, 'লাসবিপণি', বজ্রনির্ঘোষের নাটক, ২০০৪, উবুদশ, কলকাতা, পৃ-৮৬
৭. তদেব-৮৬
৮. তদেব-৬৫
৯. তদেব-৭৩
১০. তদেব-৭৩
১১. তদেব-৭৭
১২. তদেব-৮৩
১৩. তদেব-৮৪
১৪. Bipan Chandra, In the Name of Democracy : JP Movement and the Emergency, 2003, Penguin Books, India, Page-157
১৫. Coomi Kapoor, The Emergency : A Personal History, 2015, Penguin Books, India, page- xxii
১৬. রামকৃষ্ণ দাশগুপ্ত, কয়েকটি তথ্য, জ্যোতির্ময় দত্ত (সম্পা.), কলকাতা পত্রিকার বিশেষ রাজনীতি সংখ্যা (বর্ষা- ১৯৭৫, বসন্ত-১৯৭৭), প্রতিভাস ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৪, কলকাতা, পৃ-১২-১৩
১৭. অমল রায়, 'নিজবাসভূমে', বজ্রনির্ঘোষের নাটক, ২০০৪, উবুদশ, কলকাতা, পৃ-১১৬
১৮. তদেব-১২৮
১৯. অমল রায়, 'পঙ্কজ দত্ত আসছেন', প্রাগুক্ত-৩৪১
২০. অমল রায়, 'লাসবিপণি',প্রাগুক্ত-৮৫-৮৬

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর নির্বাচিত ছোটোগল্পে অবক্ষয়ী জীবন সংগ্রামের যন্ত্রণা

সুকন্যা বেরা
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : সমাজের বিভিন্নস্তরে অবস্থিত প্রান্তেবাসী, অবক্ষয়ী মানুষের কথা স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর বিভিন্ন ছোটোগল্পের মধ্যে তুলে ধরেন। সমাজের এক অন্ধকার দিক আমাদের সামনে নিয়ে আসেন যার থেকে আমরা মুখ ঘুরিয়ে, চোখ বন্ধ করে থাকতে ভালোবাসি। সেই অন্ধকারই আমাদের চাবুকের মত আঘাত করে। সমাজের বিভিন্ন জেয়গায় ছড়িয়ে থাকা অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক শোষণের শিকার হওয়া প্রান্তেবাসী মানুষগুলির জীবন নিজের সুগভীর বাস্তবিক অভিজ্ঞতার দরুণ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাবে চিত্রিত করেছেন লেখক। সেই অবক্ষয়ী জীবন যন্ত্রণার কথা যত্নসহকারে তাঁর ছোটোগল্পগুলির উপাদান হয়ে উঠে এসেছে। সমাজের যারা বঞ্চিত, শোষিত, অপাংক্তেয় সেই সব মানুষের নীরব উচ্চারণ ভাষা পেয়েছে তাঁর ছোটোগল্পগুলির মধ্য দিয়ে।
সূচকশব্দ : স্বপ্নময় চক্রবর্তী, দারিদ্রতা, শ্রেনী বৈষম্য, সামাজিক শোষণ, জীবন সংগ্রাম।

বাংলা সাহিত্যের প্রতিভাবান কথাসাহিত্যক স্বপ্নময় চক্রবর্তী। ক্ষুরধার রচনার মাধ্যমে নিজের সময় ও সামাজকে অসাধারণ ভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। নিজের চারপাশের সময় ও সমাজের পরিবর্তনশীলতা, অস্থিরতা, নাগরিক জীবনের অন্ধকার, মানুষের নৈতিক অবক্ষয়, দারিদ্রতা যেমন খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন লেখক, তেমনি চাকরির সুবাদে গ্রাম-বাংলাকে খুব কাছ থেকে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন গল্পকার, সেই অভিজ্ঞতাই ধরা পড়েছে তাঁর বিভিন্ন ছোটোগল্পগুলিতে। সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটোগল্প প্রসঙ্গে বলেন-

> ‘স্বপ্নময়ের চরিত্র চিত্রণ দক্ষতা অসামান্য, ভাষাও যথাযথ, সংহত ও সাবলীল। সর্বশ্রেণীর মানুষকেই দেখান তিনি। তবে মধ্যবিত্তের মনস্তত্ত্ব প্রতিফলিত করাতেই তাঁর সর্বাধিক দক্ষতা। মানুষের মধ্যে সৎ প্রয়াস তিনি দেখতে পান, দেখানও’ [১]

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে থাকা বৈষম্য, শোষণের সাথে আমরা সকলেই হয়তো অল্পবিস্তর পরিচিত, কিন্তু লেখক সামগ্রিক ভাবে তাঁর ছোটোগল্পগুলির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে থাকা অনাচার, শোষণের এক পূর্নাঙ্গ ছবি পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। আমাদের শান্ত আরামদায়ক গৃহ পরিবেশের মধ্যে এক আন্দোলনের ঝড় নিয়ে আসে। গল্পগুলি আমাদের চেতনায় গিয়ে আঘাত করে, আমাদের ভাবতে বাধ্য করে।

'স্বপ্নময় চক্রবর্তীর নির্বাচিত ছোটোগল্পে অবক্ষয়ী জীবন সংগ্রামের যন্ত্রণা' শীর্ষক আলোচনা পত্রে তাঁর নির্বাচিত ছোটগল্পগুলির পাঠ নেওয়ার মাধ্যমে তাঁর লেখার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেই সব প্রান্তেবাসী মানুষের সংগ্রামের কথা আমরা তুলে ধরব।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর এক অসাধারণ সৃষ্টি 'রত্নাকরের পাপের ভাগ'। গল্পটি তাঁর 'ভূমিসূত্র' গল্পসংকলনের অন্তর্গত, এই গল্পসংকনটি রচনার প্রেক্ষাপটে লেখক ভূমিরাজস্ব দপ্তরে চাকরির সুবাদে গ্রামকে দেখেছিলেন খুবই কাছ থেকে, সেই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন উঠে আসছে 'ভূমিসূত্র'র গল্পগুলিতে, লেখকের বক্তব্য- ' এই চাকরিটা আমার চোখ খুলে দেয়, উত্তর কলকাতার বাগবাজার গলি জীবনে যা বোঝা যায়নি, টের পাওয়া যায়নি আমাদের গ্রাম জীবন, ভূমি, ভূমির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, সামন্ত ও ভূমিদাস, উচুজাত-নিচুজাত – এই সবকিছু নিয়ে, মন্দির-দরগা- গোরস্থান-লোককথা-মেলা এইসব কিছু মেশানো মাখানো জীবন আমাকে প্ররোচনা দিতে থাকল লেখো, এই সব জীবনের কথা লেখো' [২]। অর্থনৈতিক বৈষম্য, প্রান্তবাসী মানুষদের অবস্থার বাস্তব ছবি খুঁজে পাওয়া যায় 'রত্নাকরের পাপের ভাগ'-এ। কলকাতা থেকে দাদার শ্বশুরবাড়ি ডিহিলা গ্রামে বেড়াতে আসা গল্পের কথকের চোখ দিয়ে পুরো গল্পটি লেখক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। চারিদিকে সবুজ সমারোহের মাঝে ধনী শ্বশুরের বিরাট দালানবাড়ি 'জয়ধ্বজার মত স্থির'। সম্পন্ন ধনীজমিদারের ছবি চারিদিকে, মা লক্ষ্মীর অফুরন্ত আশীর্বাদের চিহ্ন সর্বত্র –'গোয়াল ঘরে দশ-বারোটা গরু মোষ বাঁধা, সারা বারান্দায় শস্যের ঘ্রাণ', 'তিন হাজার টাকার মাছ' গর্ভেধারী বাড়ির বিরাট পুকুর। দুপুরবেলায় সরু চালের সাথে বাড়ির কচিপাঠা সহযোগে বিরাট ভোজের আয়োজন, সঙ্গী মহামান্য অতিথি সেটেলমেন্টের কানুনগো সাহেব। জমি জরিপের কাজে আগত কানুনগো সাহেবকে খুশি করতে এই মহাভোজের আয়োজন- পাতার উপরে উচ্ছিষ্ট হাড়ের স্তূপ, আধচেবানো মাংসের ছিবড়া; এই লোভনীয় পরিবেশে, আকণ্ঠ বিলাসিতার মধ্যে ডুবে থাকা লোকগুলির সামনে বিপ্রতীপ ব্যঞ্জনা নিয়ে হাজির হয় একদল মূর্তিমান কঙ্কাল। বুবক্ষের মত শিশুগুলি দূর থেকে দেখে শুষে নেয় সেই অপ্রাপ্যনীয় স্বাদের আস্বাদ-

> 'বারান্দার সামনে ধানের গোলাটার পিছনে কাঁঠাল গেছের ডালে পাঁচ-ছয়টা ল্যাংটো ছেলে-পিলে বসে বসে শেষ ব্যাটারির টর্চলাইটের মতো চোখে আমাদের খাওয়া দেখছে, দেখছে শেফালিফুলের মতো ঝরঝরে ভাতের সাথে মাংসের কুচি মিলিয়ে যাচ্ছে আমাদের মুখের ভেতরে,...দই আর রসগোল্লা এল। কাঁঠাল গাছ থেকে একটা সমবেত চিৎকার শোনা গেল- গজু গজু রে মোন্ডা দেখবি আয় মোন্ডা...'[৩]

যা তাদের চরম দুষ্প্রাপ্য তাই তাদের চোখের সামনে উঠে আসছে এই বাবুদের মুখে। এই বিপুল ঐশ্বর্যের বিপ্রতীপে অবস্থিত হত দরিদ্র বাগদি পাড়ার এক উলঙ্গ ছবি উঠে

আসে গল্পে– পথের ধারে পড়ে থাকা শুকনো বিষ্ঠা, কাঠের ধোঁয়া, রান্নার বোটকা গন্ধের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জড়িয়ে থাকা বাগদি পাড়া; তাদের জীর্ণ ঘর, তাদের ন্যাংটো ক্ষুধার্ত ছেলেরা পেটভরাবার জন্য এক ফোঁটা ফুলের মধু লাভের আশায় কামড়াকামড়ি, গালিগালাজে লিপ্ত; তাদের মেয়েদের পরনে শাড়ি নেই। তাদের বেঁচে থাকের সব রসদ গিয়ে জমা হচ্ছে ওই সব জমিদারদের ঘরে। তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে ফুলে ফুপে উঠছে আর একশ্রেনীর মানুষ। তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফলানো ফসল গিয়ে জমা হচ্ছে জমিদারদের ঘরে, তাদের ঘর আজ লক্ষ্মীহীন। যে বুড়ো খেতমজুর নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলাচ্ছে, সেই ফসল সেই চাষীর ঘরে আজ উঠছে না, চাষী আজ অভুক্ত- 'কার ধান, কে চষে, কোথায় যায় সে জানে না, তাকিয়ে থাকে' [৪]।

এই মহামান্য জমিদারের দরিদ্র, মরণাপন্ন প্রজা কেষ্ট বাগদি। কেষ্ট বাগদির অজান্তেই মহামান্য জমিদারের কেরামতিতে কর্মনিষ্ঠ সেটেলমেন্ট অফিসারের এক আঁচড়ে জমিতে তার নাম কেটে জমিদারের নাম উঠে যায়। কেষ্টর বাড়িতে খাওয়ার অন্ন নেই, তার কোলের সন্তান আজ অভুক্ত, তার বাড়ির নারীর লজ্জা নিবারণের নূন্যতম বস্ত্রও আজ নেই, সে নিজে আজ মরণাপন্ন- তার বুক থেকে কোমর পর্যন্ত প্লাসটার আঁটা, জমিদারের বলদ গুঁতিয়ে তার জীবনী শক্তি হরণ করেছে- জীর্ন ঘর, দেওয়াল হেলে গেছে।...কেষ্টের বুকের সাদা প্লাস্টারের ওপর জল পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা, সমস্ত ঘরটাই কর্দমাত্মক, খিদের জ্বালায় অস্থির বাচ্চার চিৎকার বন্ধ করতে এক মা তার সন্তানের মুখে বস্তার টুকরো চেপে ধরে। 'তার মা বলছে মর মর আবাগীর পো, দোম বন্ধ হয়ে মর'।

সেই অভুক্ত দরিদ্র মানুষের মুখের সর্বশেষ গ্রাস 'পোয়াটাক পচাই' কেড়ে নিয়ে নিজের দু-হাজার টাকার মাছ রক্ষায় ছোটে জমিদারপুত্র। অক্ষম মরাপন্ন কেষ্ট বাগদির থাকে তাজা মাছগুলি অমূল্য। রাতে তা দিয়েই জমিদার বাড়িতে জোর খাওয়া-দাওয়া মাছের চার পদ। কেষ্টর মত মানুষেদের জন্য পৃথিবীর বুকে আজ কোন জেয়গা নেই, পৃথিবীতে রাজত্ব আজ ধনীদের হাতে। কেষ্ট মরবে, তাদের সন্তান মরবে...কিন্তু এই মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? এই পাপের ভাগ কার? কব্জি পর্যন্ত দুধের বাটিতে হাত ডুবিয়ে, কলকাতা থেকে আগত কথকের মনে আলোড়িত হয় এই প্রশ্ন- এই বিলাসিতসার মধ্যে লেগে রয়েছে বহুমানুষের চোখের জল, বহুশিশুর মুখের খাবার কেড়ে গড়ে উঠেছে এই প্রভূত সম্পদ ; কব্জি পর্যন্ত দুধ না যেন আকণ্ঠ পাপে নিমগ্ন এই সব কিছু। কিন্তু এই দ্বিধা ক্ষণিকের। দস্যু রত্নাকরের পাপের মত এই পাপের ভাগও মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী মানসিকতা এক লহমায় ঝেড়ে ফেলেছে নিজের উপর থেকে। এই যুগই যেন নিজের ভালো থাকার যুগ। কলকাতার আধুনিক চেতনায় দীক্ষিত কথকও খুব সহজে এই অন্ধকার থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে পেরেছে। সামাজিক শোষণ, অর্থনৈতিক

বৈষম্যের পাশাপাশি লেখক মধ্যবিত্তের আপাত ভদ্র মুখোশের আড়ালে সুবিধাবাদী, আত্মসুখ সচেতন নগ্ন চরিত্রকে উন্মোচন করেছেন অসাধারণ ভাবে।

শ্রেনী শোষণের অপর এক বাস্তব গল্প 'রক্ত'। এখানে লেখক আমাদের শুনিয়েছেন সমাজের প্রান্তে বসবাসকারী এমন দুটি মানুষের কথা যারা পারিবারিক সূত্রে আত্মীয় না হলেও, বেঁচে থাকার তাগিদে তাদের পাশাপাশি সহাবস্থান; যেখানে দুজন দুজনের সমব্যাথী। পাঁচু এবং জবা গল্পের প্রধান দুই চরিত্র। বিধবা জবা দুই সন্তান নিয়ে দাদার গলগ্রহ আর মাংসের দোকানে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কারকারী পাঁচু নিজেও যেন এক উচ্ছিষ্ট। এই মানুষদুটি বেঁচে থাকার তাগিদে, সন্তান প্রতিপালনের জন্য, সামনের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পেতে বেছে নেয় তিলে তিলে মৃত্যুর পথ। বেঁচে থাকার জন্য তারা খুঁজে নিতে বাধ্য হয় এমন একটি পথ যা তাদের ঠেলে দেয় এক অন্ধকার মৃত্যুর দিকে, জীবনকে নিয়ে এক বিরাট জুয়া খেলায় লিপ্ত হয় তারা- এ রক্তের ব্যবসা, নিজের শরীরে বয়ে যাওয়া আপাত মূল্যহীন রক্তস্রোত যা মানুষের শরীরের কোশে কোশে প্রাণ পৌঁছে দেয়, সেই রক্তকণিকাই হয়ে ওঠে এক অমূল্য সম্পদ এদের কাছে; অল্প অল্প নিজের শরীর থেকে প্রাণ বার করে খুঁজে নেয় পরিবারের প্রাণ রক্ষার উপায়। জবার 'রক্ত ব্যাচা' টাকায় হাসি ফুটে তার সন্তানদের মুখে।

এই পাঁচু, জবার মত মানুষদের কোন নাম, পরিচয় হয় না। এরা কোন দিন উত্তম কুমার, তো কোনদিন কিশোর কুমার; পরাশ্রয়ী জবা এদের খাতায় হয়ে ওঠে সুচিত্রা সেন। স্বপ্নের নায়ক, নায়িকা হয়ে এরা পূর্ণ করে নিজেদের সামান্য বেঁচে থাকার ইচ্ছা। সামান্য কিছু লাভের জন্য এই পাঁচু, জবার মত মানুষদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে আমাদের চোখের সামনেই উদ্ভব হয়েছে সুবিধাবাদী ভদ্র ব্যাবসায়ীশ্রেনীর- রক্তের ব্যবসায়ী। সামান্য মূল্যের বিনিময়ে এই অভুক্ত, অসহায় মানুষগুলির শরীর থেকে শুষে নিচ্ছে বোতল বোতল রক্তবিন্দু। পাঁচুর শরীরে রক্ত ভালো, ওর রক্ত সবার ফিট করে, বাবুরা ওর শরীর থেকে বার করে নেয় টাটকা, গরম রক্ত, যে রক্তের বদলে তার হাতে উঠে আসে পঞ্চাশ টাকা; তারা যেন আর মানুষ নেই তারা হয়ে উঠেছে বাবুদের লোভনীয় পয়সা রোজকারের এক জন্তু, তার টাটকা রক্তের বদলে তার মূল্য নির্ধারণ হচ্ছে , পাঁচুর চোখের সামনে ভেসে ওঠে-

> 'পাঁচুর ডেরার কাছে খাটাল আছে একটা। বাবুরা ভোর থেকে বসে থাকে। সামনে দুইয়ে দুধ নেয়। গরম। বেশি টাকা লাগে'[৫]

গল্পে আঘাত লাগে যখন রক্তবেচা জবার শরীরে মারাত্মক রক্তের অভাব দেখা দেয়, পাঁচুর কাছে দুঃস্বপ্নের মত সংবাদ নিয়ে আসে জবার ভাইপো – 'হাসপাতালে বলে দিয়েছে রক্ত নেই। পিসি যেখানে রক্ত দিত, সেখানেও বাবা গেছিল। রক্ত নেই। কয়েকটা লোক বলেছিল রক্ত এনে দেবে, অনেক টাকা দিতে হবে' [৬] ।

যে রক্ত বিক্রি করে জবা, পাঁচুর মত রক্তব্যাচাদের হাতে দেওয়া হয় সামান্য টাকা আর কিছু খাবার; সেই উচ্ছিষ্ট মানুষদেরই বোতলবন্দী রক্ত বাবুদের হাতে পড়ে

মহামূল্যবান হয়ে ওঠে, তার মূল্য তখন কয়েক গুন বেড়ে যায়, মৃত্যুমুখী জবার সামনে দাঁড়িয়ে অসহায় রক্তব্যাচা পাঁচুর মনে হয়-

> 'সবই মহাজনের হাতের কেরামতি। সকল বস্তু।... শালা পাঁঠাটা, ঘাস খায়, তরকারির খোসা খায়, যেইনা আইলুনের হাতে পড়ল, ওমনি নাড়ী- ভুড়ি, ছাল চামড়া সব কিছুর মূল্য হয়ে গেল। শরীলডার মধ্যি রক্তগুলান আছে, চুপচাপ আছে দাম নি, ঝ্যাখনি মহাজনের হাতে পড়ল......'[৭]

এ এক অদ্ভুত লাভজনক ব্যাবসা, মানুষের জীবনের ব্যাবসা। এখানে অর্থের বদলে বলী হয় স্বয়ং মানুষ। তোমার অর্থ থাকলে তুমি জীবন কিনে নাও, না হলে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সব যন্ত্রণার অবসান। হাসপাতালেই পাঁচু জানতে পারে নোংরা সুঁচ থেকে হওয়া ইনফেকশানের ফলে পাঁচুর শরীরের রক্ত নষ্ট হয়ে গেছে, জবাইয়ের সময় ছাগলের শেষ আর্তনাদের মত এক শব্দ বেরিয়ে আসতে চায় পাঁচুর সর্বশরীর থেকে- ওর রক্তের আর কোন দাম নেই! ও তবে শেষ। শেষ। ও তবে কিছু নয়। হাসপাতাল ওয়াডে মৃত্যুমুখী জবার সামনে দাঁড়িয়ে অসহায় পাঁচুর মনে হয়-

> 'তুই এ্যাতো রক্ত দিলি, তুই এক ফোঁটা রক্ত পালি না......
> তোর শরীলের রক্ত মহাজনরে দেছিস। আর আমার রক্ত পচা......'[৮]

জবা, পাঁচুর মত হাজারো মানুষ প্রতি দিন অল্প অল্প করে এগিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর দিকে, এখানেও পাঠকের মনে উচ্চারিত হয় একই প্রশ্ন- এর জন্য দায়ী কে? এই পাপের ভাগী কে?

'শনি' গল্পে একজন অসহায়, দরিদ্র স্বামীর; একজন পিতার তার ভাবী সন্তানকে রক্ষার এক সংগ্রামের ছবি তুলে ধরেন লেখক। নিঃসন্তান তাজুদ্দিন ও হাসুনারা সন্তান কামনায় বার বার ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়িয়েছে আল্লার দরবারে, সন্তানপ্রাপ্তির আশায় হাসুনারার দুই হাত ভরে উঠেছে তাবিজ-মাদুলিতে। শুধুমাত্র আল্লা নয় গাছতলার গনক ঠাকুরের প্রতিবিধান অনুসারে ধর্মীয় সংস্কার ভেঙ্গে তাজুদ্দিন মাথা নত করেছে শনি ঠাকুরেরে কাছে। শেষ পর্যন্ত জোহলের স্পেশাল তাবিজেই হোক, ঘুটিয়ারী শরীফের মানতেই হোক বা শনির দোয়াতেই হোক হাসুনারা সন্তানসম্ভবা হয়। সন্তানজন্ম না হওয়া পর্যন্ত তাজুদ্দিন প্রতিসপ্তাহে শনি পূজা বজায় রেখেছে, এমনকি স্ত্রী সন্তানের মঙ্গলকামনায় মুসলিম তাজুদ্দিন বাড়িতে এনে রাখে শনির পাঁচালিও। একটু একটু করে সন্তান আগমনের খুশিতে নতুন স্বপ্ন বাঁধতে থাকে দুটি মানুষ। আট মাসের গর্ভবতী হাসুনারা হাজারো স্বপ্নের আনন্দ চোখে নিয়ে ভাবীসন্তানের জন্য কাঁথা বুনে চলে। কদম গাছের ডালে সন্তানের জন্য দোলনা বাঁধার স্বপ্ন দেখে তাজুদ্দিন। হাসুনারার পেটের উপর কান রেখে আজানের আওয়াজ পেয়েছে তাজুমিঞা। সে অনুভব করে হাসুনারার শরীরে পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজন, দরিদ্র তাজু সন্তানের পুষ্টির জন্য-

> 'তাজুদ্দিন খুব দুধ খাওয়াচ্ছে, সস্তার দুধ। মিলিক পাউডার। গরম জলে ক'চামচ গুলে দাও, ব্যস, দুধ হয়ে গেল' [৯]

ইছামতী নদীর ওপারে বাংলাদেশ থেকে আগত এই গুড়ো দুধ ছেয়ে গেছে ঘরে ঘরে; সীমান্ত পেরিয়ে ট্রেনে, টেম্পোতে পাড়ি দিয়ে গুড় দুধ এখন প্রবেশ করেছে ভারতবর্ষের রক্তে রক্তে।

তার ঘরে এখন ভর্তি সস্তা মিলিক পাউডার, এক টাকার গুঁড়ো দুধে তিন পোয়ার মত দুধ। এর মধ্যে দ্রুত ঘটে যায় পরপর কিছু ঘটনা, যা এক লহমায় গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তাজু একদিন হাজি সাহেবের মুখে শোনে বাংলাদেশ থেকে আগত এই মিলিক পাউডারে খারাপ জিনিস মেশাচ্ছে, যাতে কমজোরি হয়, গর্ভবতী মায়েদের সন্তান বিকলাঙ্গ হয় এতে 'রেডিও-বিষ' আছে। কিছুদিনের মধ্যেই খরের কাগজের পাতায় ভেসে ওঠে একটি খবরে- 'তেজস্ক্রিয় দুধ'- এই গুঁড়ো দুধ বাংলাদেশ পোল্যান্ড থেকে আমদানি করে। চেরনোবিল পারমানবিক বিদ্যুতকেন্দ্রে পারমানবিক বিস্ফোরণের ফলে পোল্যান্ডের ঘাস ও শষ্য তেজস্ক্রিয় হয়ে ওঠে, বাংলাদেশি বিজ্ঞানীরা এই দুধে রেডিও- অয়াক্টিভিটি সনাক্ত করে, ফলে বাংলাদেশ সরকার এই গুঁড়ো দুধ ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। একট মুহূর্তে ঘুরে যায় তাজুদ্দিনের সমস্ত পৃথিবী - পারমাণবিক ছাই কী জিনিস, রেডিও- অ্যাকটিভিটি কী? কোথায় চেরনোবিল? কেন চেরনোবিল? কোন কিছুর উত্তর পায় না সে। চেরনোবিল কত হাজার মাইল দূরে তাজুদ্দিন তা জানে না, কিন্তু ভয় ওর পিছু ছাড়ে না, অসহায় তাজুদ্দিনের ঘুম আসে না। ভীত তাজু স্ত্রীর পেটে কান লাগিয়ে শুনতে চেষ্টা করে সন্তানের বুকের আওয়াজ। তাজুদ্দিন ও হাসুনারা যেন হয়ে উঠে গল্পের দুই প্রতীক চরিত্র, তারা যেন চিরকালীন পিতা-মাতা, সন্তানকে রক্ষার জন্য অসহায়, ভয়ার্ত পিতা-মাতার এক লড়াই। তাজুদ্দিনের মত পাঠকের মনেও যেন প্রশ্ন উঠে আসে-

> 'কিসের কারণে এই সব চেরনোবিল হয়? কেন জলের মধ্যে ঘাসের মধ্যে দুধের মধ্যে রেডিও-বিষ, মানুষের মনের মধ্যে রেডিও-বিষ? ফেরেশতা কীসের কারনে তার সোনালি ডানা ছিঁড়ে ফেলে, হীরে জহরতের মুকুট খুলে ফেলে নীলবর্ণ হয়ে শকুনের পিঠে চড়ে কোন ভয়ংকর বিষ বাতাস ফুঁকে দিচ্ছে আসছে দিনের মানুষের আত্মায়-শরীরে?'[১০]

কোন প্রশ্নেরই উত্তর পায়না তাজু। সন্তানের মঙ্গলকামনায় ছুটে যায় পীর সাহেবের কাছে, নিয়ে আসে তাবিজ। কিরপা কর, কিরপা কর একমাত্র এই প্রার্থনা বুকে নিয়ে বেঁচে থাকে দুটি মানুষ। পাঠকের বুক থেকেও উঠে আসে এই প্রার্থনা। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে সরকারি নীতির অসাড়তা সম্পর্কে, মানুষের জীবন আজ গিনিপিকের শামিল, রক্ষকই আজ ভক্ষক, মানুষের মৃত্যু আজ কেবল মাত্র এক সরকারি পরিসংখ্যান মাত্র। কীসের লোভে, কাদের লোভের শিকার হচ্ছে এই মানুষগুলি, বলী হচ্ছে আমাদের

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, কোন পৃথিবীর আলো আমারা আমদের সন্তানকে দেখাবো। আমাদের মনেও জেগে ওঠে গভীর অবিশ্বাস- কে আছে? কাকে বিশ্বাস? কিন্তু আমরা মানুষ, হাজারো অন্ধকারের মধ্যে আমরা খুঁজে নিয়েছি বাঁচার অন্তিম আলো, তাই তাজুর সাথে আমরাও যেন সমস্ত অন্ধকার ভেদ করে নতুন প্রাণকে আহ্বান জানাই-

> 'সমস্ত চেন্নোবিল, সমস্ত ষন সাতঙা- দেওদের কেরদানিকে নাথি মারতি মারতি, নাথি মারতি আয়রে আমার আহ্লাদ'[১১]

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর আর এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'ভালো করে পড়্গা ইস্কুলে'। এখানেও লেখক প্রান্তেবাসী মানুষের নিরুচ্চারকে যেমন ভাষা দিয়েছেন, তেমনি আঘাত এনেছেন মধ্যবিত্ত মানসিকতার ঠুনকো ভদ্রতার অবয়বে। আগোগোড়া শহুরে নাগরিকতার মোড়কে আবৃত কথকের সাহিত্যিক বন্ধুর স্ত্রী, কন্যা নিয়ে শৌখিন গ্রাম ভ্রমণকে কেন্দ্র করে কাহিনি গড়ে উঠেছে- 'অন্তঃসারশূন্য নাগরিক মধ্যবিত্তবর্গ নিজেদের জন্য কেবলই কৃত্রিম বাস্তবতাকে নির্মাণ করে। আর শৌখিন ভ্রমণ-বিলাসের মতো কখনও কখনও তারা গ্রামজীবনকে দেখতে বেরোয়' [১২]। টুম্পার সাহিত্যিক, কমরেডী বাবার ও শিক্ষিতা, রুচিশীল স্কুলশিক্ষিকা মা। টুম্পা নামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্রী, আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের ছবি আঁকা প্রতিয়োগীতায় টুম্পা ফাস্ট হয়েছে। সুন্দর, প্রতিভাবান টুম্পার বিপরীতে লেখক গল্পে তুলে আনেন তারই সমবয়েসী হারান আর কার্তিককে। টুম্পার কল্পিত রাখাল বালকের বাস্তব চিত্র নিয়ে এই ছেলেদুটি গল্পে উঠে আসে, তারা বাঁশি বাজাতে জানে না, প্লাস্টিকের বাঁশি ফু মেরে বাজায়, তারা স্কুলে যেতে পারে না বাপের মারের ভয়ে, গাড়ি কচু বিক্রি করে তাদের পেটের খাবার জোটে; তাদের গায়ে খোস-পাঁচড়া -

> 'টুম্পা তেমন রাখাল বালক দেখেনি, যে বট গাছের ঝুরিতে হেলান দিয়ে এক পায়ের উপর অন্য পা টেরচা ভালে তুলে দিয়ে বাঁশের বাঁশি বাজায়।টুম্পা সেরকম ছোটো নদী দেখতে পেল না, যার ধারে হাট বসে, বংশী বদন গাড়ী চালালে তার ভাগ্নে মদন পাশে বসে থাকে। সমাজের বন্ধু চাষী ভাইয়ের যেমন ছবি দেখেছে বইতে, মাথায় ইয়া বড়ো ধানের তোড়া, অরন্যদেবের মতো পায়ের গুলি...।অথচ সত্যিকারের চাষী যখন দেখল তখন বুঝল রাঙামামার চাইতেও রোগা... বইতে এ ভিলেজ আব বেঙ্গল-এর ছবিতে দেখেছে পুকুরে ফুটে আছে কত পদ্ম, অথচ সত্যিকারের পুকুর দেখে মনে হয়েছে সায়েন্স বইয়ের বিওয়্যার অফ পলিউটেড ওয়াটার ছবির কথা'[১৩]

বিপ্রতীপ দুই জগতের ব্যাঞ্জনা ধবনিত হয়েছে সমস্ত গল্প জুড়ে। এই ব্যাঞ্জনার সুরই পদে পদে আঘাত করেছে পাঠকের চেতনায়। শহুরে শৌখিন জনদরদী সাহিত্যিকের

কলমে উঠে এসেছে সাধারণ মানুষের কথা, কিন্তু বাস্তবে সেই দারিদ্রতার সম্মুখীন হয়ে ওই মানুষগুলির প্রতি ঘৃনায় কুঁকড়ে উঠেছে শহুরে মানসিকতা- 'দেখ ইশ- পায়ে কী সব ইয়ে- শতরঞ্জি থেকে সরে বসতে বল'...মধ্যবিত্তের আপাত শৌখিন দারিদ্র বিলাসকে যেমন আঘাত করেছেন লেখক, তেমনি স্কুলের সেক্রেটারির মাধ্যমে তুলে এনেছেন মধ্যবিত্তের চাটুকারি স্বভাবকে- শহুরে সাহিত্যিককে তিনি আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হওয়ার আমন্ত্রণ জানান – 'কলকাতার সাহিত্যিক যখন পেয়েছি, ছাড়ছি না'। আর আপনার মেয়েটি হবে বিশেষ শিল্পী। শহুরে, শিক্ষিতা, সেরা শিল্পীর খেতাব জয়ী টুম্পা গ্রামের শিশুদের কাছে হবে 'ব্রাইট একজাম্পেল'। অন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ অনুষ্ঠানে এক ঘর না খেতে পাওয়া হত দরিদ্র মানুষ দিকে জুলজুল চোখে তাকিয়ে দেখে শহুরে টুম্পাকে- 'বোড় ঘরের মেয়্যা বটেক', টুম্পার উপস্থিতি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সেই হত দরিদ্র মানুষগুলির পাশে । টুম্পা আবৃতি করে যায় বীরপুরুষ- এবার ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা। অনুষ্ঠানের শেষপর্বের ডারঘর নাটকের অংশ বিশেষ, কিন্তু নাটকের সুধা, দরিদ্র গ্রাম্য ছাত্রী সন্ধ্যা তখন বেপাত্তা। দরিদ্র সন্ধ্যার পরিবর্তে অমলের চরিত্রে অভিনয় করা কানুগো সাহেবের ছেলের পাশে ঝলমলে টুম্পাই সুধার চরিত্রে সকলের পছন্দ, টুম্পাকে পেয়ে ধন্য হয়ে উঠে সকলে। শাড়ি পড়া ঝলমলে টুম্পার পাশে গল্পে বিপ্রতীপ ছবি নিয়ে এসে দাঁড়ায় হাতে পায়ে গোবর মাখা সন্ধ্যা, স্কুলে গানের ফাঁকে সে গিয়েছিল কিছু গোবর কুড়িয়ে নিতে, যা তার পরিবারের মুখে তুলে দেবে ক্ষুধার অন্ন- ঘুটের এখন অনেক দাম। টুম্পার নিশ্চিত, শান্ত, সুন্দর জীবনের পাশে লেখক তুলে আনেন হারান, কার্তিক ও সুধার মত শিশুদের। দারিদ্রের অন্ধকারে বড় হওয়া এইসব শিশু- যাদের কাছে এক বেলা পেটভরে খেতে পাওয়াও এক স্বপ্ন, বেঁচে থাকার নূন্যতম অধিকারটুকুও যাদের পেতে হয় সংগ্রাম করে; সেই বেঁচে থাকার লড়াইয়ে তারা হারিয়ে ফেলে তাদের শৈশব; উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে হারিয়ে যায় বহু প্রতিভা। তাইতো ফিরে এসে সন্ধ্যাকে শুনতে হয়- 'তুই বাদ। শহরের মেয়েটাই সুধা হবে'। যে সন্ধ্যা সামান্য গোবরের আশায় স্কুলের অনুষ্ঠান ছেড়ে ছুটে যায়, তাকেই টুম্পা তার অভিনয়ের দরুন প্রাপ্ত পুরষ্কারের টাকা সন্ধ্যার হাতে তুলে দিতে চাইলে , সে নির্দ্বিধায় বলে ওঠে- তুমার টাকা আমি নেব কেনে? সে ভিখারি নয়। যে টাকা তার নয় তা সে একলহমায় ফিরিয়ে দিতে পারে। কাজল ধেবড়ানো চোখে অন্য সুধার অভিনয় দেখতে দেখতে সে হিসাব করে নিজের অভিনয় সুযোগ হারিয়ে ফেলার বদলে এই সন্ধ্যায় তার প্রাপ্ত টাকার পরিমান- দেড় টাকা শ' হলে, দেড়শ ঘুঁটের দাম কত?

কেষ্ট, পাঁচু, মত মানুষেরা সমাজে একা নয়; আরও বহু বহু কেষ্টরা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতি নিয়ত শোষণের শিকার হয়ে চলেছে; সন্ধ্যা, হারাণ, কার্তিকরা আজও তাদের বেঁচে থাকার সাধারণ অধিকারটুকু পায় না, হারিয়ে যাচ্ছে তাদের শৈশব। আমরা আমাদের পরম নিশ্চিত জীবনের মধ্যে ভুলে থাকি, মুখ ফিরিয়ে থাকি

তাদের থেকে। গল্পকারের অসাধারণ লেখনী স্পর্শে প্রাণ পায় গল্পের প্রতিটি চরিত্র, গল্পগুলির সাথে একাত্ম হয়ে কখনও পাঠক কেঁদে ওঠে, কখনও কামনা করে উদ্ধারের উপায়। প্রতিটি গল্পেই সমাজে ঘটে যাওয়ে এক একটি অনাচারের কথা তুলে আনে, প্রতিটি গল্পের শেষে পাঠক এক অব্যক্ত প্রশ্নের মুখোমুখি হয়, যার কোন সাজানো উত্তর লেখক আমাদের দেয় নি, তা খুঁজে নিতে হবে আমাদের বিবেক থেকে।

তথসূত্র

১। সুমিতা চক্রবর্তী, ২০০৪, *ছোটগল্পের বিষয় আশয়,* পৃ.৯৩, পুস্তক বিপনি, কলকাতা।

২। স্বপ্নময় চক্রবর্তী, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, *লেখা ও না-লেখা নিয়ে লেখা,* পৃ.২১০।

৩। স্বপ্নময় চক্রবর্তী, শ্রেষ্ঠ গল্প, ২০১৭, *রত্নাকরের পাপের ভাগ,* পৃ.২৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৪। তদেব পৃ.৩০।

৫। স্বপ্নময় চক্রবর্তী, শ্রেষ্ঠ গল্প, ২০১৭, *রক্ত* , পৃ.৪৮, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৬। তদেব, পৃ. ৪৯।

৭। তদেব, পৃ. ৫০।

৮। তদেব, পৃ. ৫২।

৯। স্বপ্নময় চক্রবর্তী, শ্রেষ্ঠ গল্প, ২০১৭, *শনি* , পৃ.৭৮, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

১০। তদেব, পৃ.৮২।

১১। তদেব, পৃ.৮৩।

১২। তপোধীর ভট্টাচার্য, ২০০০, ছোটগল্পের অন্তর্ভুবন, পৃ.১৭২, মহাজাতি প্রকাশনা, কলকাতা।

১৩। স্বপ্নময় চক্রবর্তী, শ্রেষ্ঠ গল্প, ২০১৭, *ভালো করে পড়্গা ইশ্‌কুলে* , পৃ.২০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সুন্দরবনের প্রকৃতি ও পরিবেশ- সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

অলোক কোরা
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার হল সুন্দরবন। দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে সুন্দরবন দ্বিখণ্ডিত হয় ১৯৪৭ সালে। সুন্দরবনের বেশির ভাগটাই বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যে চলে যায়। ক্লড রাসেলের হাত ধরেই সুন্দরবন আবাদ ভুমিতে পরিণত হয়। ধীরে ধীরে জনসংখ্যার চাপ বাড়তে থাকে সুন্দরবনে। প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের লোলুপ দৃষ্টি সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যকে ধীরে ধীরে সংকটের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। মানুষের ক্রিয়া কর্মে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ ও প্রাণী প্রজাতি আজ বিপন্ন। প্রাকৃতিক দুর্যোগও সুন্দরবনকে ক্রমাগত বিধ্বস্ত করে চলেছে। বিশ্ব-উষ্ণায়নের প্রভাব থেকেও সুন্দরবনের রক্ষা নেই। জনসচেতনতাই সুন্দরবনকে রক্ষা করার মূল চাবিকাঠি।

সূচকশব্দ : সুন্দরবন, বাস্তুতন্ত্র, ম্যানগ্রোভ, ড্যাম্পিয়ার-হজেস, বিশ্ব-উষ্ণায়ন

"পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে বনে বনে হরিণের চোখে
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর মুক্তার আলোকে"[১]

-জীবনানন্দ দাশ।

পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ সুন্দরবন। যেমন নয়নাভিরাম তেমনই ভয়াল ও ভয়ংকর। নদীনালা- খালবিল-বাঘ-কুমির-শ্বাপদ অধ্যুষিত এই সুন্দরবনকে ঘিরে রয়েছে নানান কুহক মিশ্রিত কাহিনিমালা।পর্যটক থেকে শুরু করে সমস্ত মানুষকে সুন্দরবন অনবরত কাছে টানতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে সমুদ্রকূলবর্তী বঙ্গোপসাগরের কোলে ঝালরের মতো বিশাল, লবনাক্ত, পল্লবময়, অসংখ্য বৃক্ষ-গুল্ম ও ম্যানগ্রোভ আচ্ছাদিত শ্বাপদ সংকুল অরণ্যের বিস্তৃতি এবং বহু দ্বীপ বেষ্টিত যে জনসংস্কৃতি সেটাই হল সুন্দরবন। সাত হাজার বছর আগে পর্যন্ত সুন্দরবন জলের তলাতে নিমজ্জিত ছিল। হিমালয় ও ছোটনাগপুর পর্বতমালা থেকে বাহিত পলি ও কাদামাটি গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরের নোনা জলের সংস্পর্শে এসে যুগ যুগ ধরে জমে জমে গড়ে উঠেছে সুন্দরবনের অসংখ্য দ্বীপ অঞ্চল। দ্বীপ গুলিকে ঘিরে রয়েছে ছোট বড় নদী ও অসংখ্য সুতি খাল। ভাঙ্গা গড়ার জ্বলন্ত ইতিহাসের সাক্ষী হল সুন্দরবন।

সুন্দরবনের মোট আয়তন ২৫,৫০০ বর্গকিলোমিটার[২]। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে সুন্দরবন দ্বিখণ্ডিত হয়। সমগ্র সুন্দরবনের ২/৩ অংশ বর্তমান বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়, বাকি ১/৩ অংশ ভারতের মধ্যে আসে। ভারতীয় সুন্দরবনের আয়তন ৯,৬৩০ বর্গকিলোমিটার।নদীনালা ঘেরা দ্বীপের সমষ্টি হল সুন্দরবন। সুন্দরবনের দ্বীপের সংখ্যা ১২০টি। সুপারী ভাঙা ও লোহাচরা দ্বীপ দুটি বঙ্গোপসাগর গ্রাস করেছে। সাগর

দ্বীপের অন্তর্গত ঘড়ামারা দ্বীপটি এখন সময়ের প্রহর গুনছে। সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিল করে ৫৪টি দ্বীপ প্রকৃতির কাছ থেকে গ্রাস করে ভোগীদের বাসস্থান তৈরি করা হয়েছে। ৫৪টি দ্বীপের আয়তন ৫,৩৬৬ বর্গকিলোমিটার[৩]। এই ৫৪ টি দ্বীপ এক সময় প্রকৃতির পরিচর্যায় ছিল, বর্তমানে দ্বীপ গুলিতে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানব সভ্যতার শাসন ও শোষণ চলছে।

ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে সুন্দরবনের প্রাচীন সভ্যতাগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। সমগ্র সুন্দরবন জঙ্গলে ঢাকা পড়ে যায়। প্রথম থেকেই সুন্দরবন রাজা-বাদশা-জমিদারদের মৃগয়া বিলাস ও রাজস্ব আদায়ের লাভজনক ক্ষেত্র ছিল। কথিত আছে লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংস গড়ের মাঠের বাদাবনে বাঘ শিকার করেছিলেন।শ্যামবাজার এলাকাতে দিনে দুপুরে বাঘ ঘুরে বেড়ানোর খবর প্রকাশিত হতো সেকালের পত্র-পত্রিকায়। অর্থাৎ কলকাতা এক সময় সুন্দরবন এলকাকার মধ্যে ছিল। কলকাতাতে নগর তৈরির দামাম বেজে উঠলে সুন্দরবন একটু পিছিয়ে আসে। ১৭৬৫ সাল নাগাদ সুন্দরবন শুরু হতো কলকাতার দক্ষিণে ১০ কিমি থেকে, এই দূরত্ব বর্তমানে অনেক বেড়েছে।

সুন্দরবন অতি প্রাচীন। তবে এর প্রাচীন শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৫৮২ সালে টোডরমলের রাজস্ব তালিকা প্রণীত হয়। ১৬৫৮ সালে সুলতান সুজা এই তালিকার পুনর্বিন্যাস করে নতুন সরকার পত্তন করে সুন্দরবনকে তার অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৭৫৭ সালে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ অঞ্চলের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ১৭৬৪ সালে সর্বপ্রথম সুন্দরবনের সীমানা চিহ্নিত করা হয়। ১৭৭০ সালে ক্লড রাসেল সুন্দরবন আবাদ করেন। ১৭৮৪ সাল নাগাদ যশোরের জজ-ম্যাজিস্ট্রেট টিলমেন হেঙ্কেলের সময় সুন্দরবন জমিদারদের হস্তচ্যুত হয়ে জাতীয় সম্পদে পরিণত হয়। সুন্দরবনের জরিপের কাজ হয়েছে অনেকবার। ১৮১১-১৮১৪ সালের মধ্যে মরিসন সমগ্র সুন্দরবন এলাকার জরিপের কাজ শুরু করেন, তাঁর ভ্রাতা হিউ মরিসন জরিপের কাজ শেষ করেন। তখন সুন্দরবনের আংশিক ম্যাপ তৈরি হয়। ১৮২৮ থেকে ১৮৩২ সালের মধ্যে পুনরায় সুন্দরবন জরিপের কাজ শুরু হয় ড্যাম্পিয়ার ও হজেস সাহেবের তত্ত্বাবধানে। হজেস সাহেব সমগ্র সুন্দরবন পরিভ্রমন করে সুন্দরবন অঞ্চলকে ২৩৬ টি লটে বিভক্ত করে একটি সম্পূর্ণ মানচিত্র তৈরি করেন। এই মানচিত্রে ড্যাম্পিয়ার ও হজেস সুন্দরবন সীমার যে লাইন এঁকে ছিলেন তা ড্যাম্পিয়ার হজেস লাইন নামে খ্যাত[৪]। সেই মতো ভারতীয় সুন্দরবনের সীমানা হিসাবে বলা যেতে পারে "দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর বিশাল জলাশয়/ ড্যাম্পিয়ার হজেস লাইন উত্তরে অকশয়/রায়মঙ্গল, কালিন্দী আর ইচ্ছামতি নদী/ পূর্বদিকে আছে জেনো বহে নিরবধি/ পশ্চিমদিকে হুগলী নদী জানিও নিশ্চয়/ কাকদ্বীপ থকে বসিরহাট রেখার দক্ষিণ ভাগ হয়"[৫]।

উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশ হল সুন্দরবন। এই সুন্দরবনকে অনেকে 'ভাঁটি অঞ্চল' নামেও অভিহিত করে থাকে। প্রাচীন অনেক কাব্য কাহিনীতে 'ভাঁটিদেশ' কথাটি অনেক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। কবিকঙ্কন ও হরিদেবের লেখাতে ভাঁটি বা অষ্টাদশভাঁটি কথা গুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে নানান মতকে খণ্ডন করে সুন্দরবনের নামের উল্লেখ ও যথাযথ ব্যবহার সুন্দরী গাছের থেকে এসেছে বলে দ্বিধাহীন ভাবে গ্রহণ করা হয়। সারা সুন্দরবন জুড়ে সুন্দরী গাছের আধিক্য নজর কাড়ে। কেবলমাত্র সুন্দরী নয় সারা সুন্দরবন জুড়েই ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের বিপুল সম্ভার। শুধু নামেই এর মাহাত্ম তা কিন্তু নয়, সুন্দরবনের কার্যকারিতা সুদূরপ্রসারী।

সুন্দরবনের উপযোগিতা

দক্ষিণ পূর্ব ভারতের জলবায়ুর প্রধান নিয়ন্ত্রক হল সুন্দরবন। অথচ এই সুন্দরবন আজ গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়ে রয়েছে। দীর্ঘ দুইশত বছর যাবৎ সুন্দরবনকে সংস্কার করে মানব সভ্যতার প্রয়োজনীয়তা মেটানো হচ্ছে। ১৭৭০ সাল থেকে যারা বসতি স্থাপন করেছে সুন্দরবনে তারা বন সংরক্ষণ কিংবা প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় না রেখেই বন ধ্বংস করেছে।সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল সংস্কার করার উদ্দেশ্য ছিল কৃষির বিস্তার ঘটানো, মাছের চাষের ভেড়ী বানানো, লবণ তৈরির জায়গা বাড়ানো ও কাঠের প্রয়োজন মেটানো। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব আদায়ের। সেই মতো দেশের নানা প্রান্ত থেকে প্রজা ধরে এনে সুন্দরবনের সংস্কার করে আবাদ ভূমির সম্প্রসারণ ঘটানো হয়। ধীরে ধীরে সারা সুন্দরবন জুড়েই জনবিস্ফোরণ সুন্দরবনের সঙ্কটকে আর ঘনীভূত করে তোলে। বাস্তুতন্ত্রের সুসামাঞ্জস্য এক পরিবেশ পরিলক্ষিত হয় সুন্দরবনে। সুন্দরবনের প্রতিটি সম্পদ একে অন্যের উপর ভীষণ ভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু যতো দিন যাচ্ছে সেই ভারসাম্য তত সংকটের দিকে এগছে।

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের গুরুত্ব

একটি গাছ একটি প্রাণ। পরিণত একটি গাছ পরিবেশ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে নিয়ে ফিরিয়ে দেয় বিশুদ্ধ অক্সিজেন। গাছ ধরিত্রীর নীলকণ্ঠ। ১৬২ মিটার ব্যাস সম্পন্ন একটি পিপুল গাছ ঘণ্টাপ্রতি ২২৫২ কিলোগ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে আর পরিবেশে ফিরিয়ে দেয় ১৭১২ কিলোগ্রাম অক্সিজেন। ৫৮০ বর্গমিটার চওড়া বনবিথী বাতাস থেকে সালফার যৌগের ৭০ শতাংশ শুষে নেয়। একটি পরিণত বৃক্ষ ২৩ হাজার কিলোমিটার অতিক্রমী গাড়ীর দূষণও শুষে নিতে পারে[৬]। অক্সিজেনের মূল উৎস উদ্ভিদ।

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ পৃথিবী বিখ্যাত। সারা পৃথিবীর মোট ৫০ টি উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে সুন্দরবনে ৩৫ টি প্রজাতি পাওয়া যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- সুন্দরী, গরাণ, কেওড়া, গেঁওয়া, বাইন, গর্জন, গোলপাতা, পশুর, আমুর, গড়িয়া, হেঁতাল, ধুঁদুল, বাবলা, খলসি, সমুদ্র, তরা। ম্যানগ্রোভ হল দলভুক্ত বিশেষ উদ্ভিদগোষ্ঠী। যে

উদ্ভিদ নোনা মাটির উপর জন্মায়। জোয়ার ভাটার নোনা জল দ্বারা প্রভাবিত হয়, বেড়ে ওঠে ও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে। ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ গুলি শ্বাসমূল, ঠেশমুল বা বাকানো মুলের সাহায্যে অভিযোজনে সক্রিয়। ঝড়ে কিংবা জোয়ার-ভাটার টানে মাটিচ্যুত হয় না। দ্বীপ গুলিকে নদীর ধ্বংসের হাত থেকে ক্রমাগত বাঁচিয়ে রাখে।ভেষজ গুনের সাথে সাথে অর্থকরী দিক থেকেও ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। সুন্দরী বৃক্ষের পরিণত কাঠ নৌকা নির্মাণ শিল্পের জন্য অধিক উপযোগী[৭]। গরাণ দিয়ে নদীর বাঁধ নির্মাণ, বাসগৃহ নির্মাণ প্রভৃতি কাজের জন্য অপরিহার্য। এছাড়া গরাণ কান্ডের ছালের রস ট্যানিনের জন্য, চর্ম ও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত হয়[৮]। বাইন গাছের পরিণত কাঠ যেমন মূল্যবান তেমনই এই গাছের পাতা ও ডালপালা জৈবসারের জোগানদার। বাইন ফলের রস ফোঁড়া নিরাময়কারী ভেষজ ওষুধ হিসাবে গণ্য। পশুর গাছের পরিণত কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র তৈরি ও নৌকা নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়[৯]। গোলপাতা ঘর ছাউনির জন্য ও সিগারেটের কাগজ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এই গাছে মূল থেকে অ্যালকোহল ও ভিনিগার তৈরি হয়[১০]। সুন্দরবনের বনাঞ্চলের জৈব ভর নিয়ে এক বিপুল সম্ভবনা লুকায়িত রয়েছে। এই ধরণের সমীক্ষা পশ্চিমবাংলায় হয়নি বললেই চলে।

সুন্দরবনে প্রাণী সম্পদের উপযোগিতা

সুন্দরবন জীব বৈচিত্র্যের আকর। সুন্দরবনের জঙ্গল পরিপূর্ণ রয়েছে নানান প্রজাতির প্রাণী। সুন্দরবনের নদী-নালা-খাল প্রভৃতিতে রয়েছে অপর্যাপ্ত মৎস্য সম্পদ। ১৫৮৬[১১] প্রজাতির প্রাণী কুলের বিচিত্র সমাহার সুন্দরবনে।উল্লেখযোগ্য প্রাণী সম্পদের মধ্যে বাঘ, কুমির, বানর, হরিণ, কাঁকড়া, হাঙর, গাঙ্গেয় ডলফিন, কচ্ছপ, সাপ, মৌমাছি, নানা জাতের পাখি ও মাছ। জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ- এই প্রবাদে রচিত সুন্দরবন। পৃথিবীর বৃহত্তম কুমিরের অবস্থান সুন্দরবনে। সুন্দরবনের এসটুয়াসাইন ক্রোকোডাইল ২০-২৫-৩০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়[১২]। সুন্দরবনের ভয়ঙ্কর-সুন্দর এই সরীসৃপ প্রাণীটি আজ অবলুপ্তির পথে। কুমীর প্রকল্পের মধ্য দিয়ে এর সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে।

সুন্দরবনের মূল আকর্ষণ বাঘ। রয়েল বেঙ্গল টাইগার নামে পরিচিত। তার সাহসিকতা ও সৌন্দর্য আজও কিংবদন্তী। বাঘ জাতীয় পশু। চণ্ডীর বাহন। সুন্দরবনবাসী বাঘকে দেবতা (‘দক্ষিণরায়’) রূপে পুজো করে। সুন্দরবনের বন সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন বাঘ সংরক্ষণ। ১৯৭৩ সাল থেকে এই প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। বাঘও আজ অবলুপ্তির পথে। জঙ্গল হাসিল করে আবাদ ভূমির সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে বাঘ নিধনের কাজ চলছে। শেষ সেনসাস্ রিপোর্ট অনুযায়ী সমগ্র ভারতবর্ষে বাঘের সংখ্যা ৩৫০০ থেকে ৪০০০ এর মতো। সুন্দরবনে কেবলমাত্র ২৫০টির মতো বাঘ রয়েছে। তবে এ পরিসংখ্যান নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। প্রতিটি প্রাণীর মতো বাঘের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ মানুষের জীবনদায়ী ওষুধের খনি। বাঘের নখ থেকে চুল সর্বরোগহারা। প্রাচীন এই

বিশ্বাস থেকে চীন, তাইওয়ান, হংকং, কোরিয়া, মায়ানমার প্রভৃতি দেশে বাঘের চাহিদা প্রবল। সে বাঘ পাচার হয় ভারত থেকে। বাঘের চোরা শিকার সুন্দরবনে সবথেকে বেশি। আন্তর্জাতিক বাজারে বাঘের অর্থনৈতিক মূল্য অধিক। কিন্তু সুন্দরবন সংরক্ষণের জন্য বাঘের মূল্য অপরিসীম।

সুন্দরবনের মানুষের খাদ্য তালিকায় মাছ একটা অতীব পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাদ্য। সুন্দরবনবাসীর কাছে কৃষিকাজের পর মাছ চাষ ও মাছধরা প্রধান উপজীবিকা। সুন্দরবনের নোনা ও মিষ্টি জলে নানান জাতের মাছ পাওয়া যায়। মানুষের প্রাত্যহিক খাদ্যতালিকাভুক্ত ও অর্থনৈতিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ মাছগুলি হল- পারশে, ভাঙ্গন, ভেটকি, ভোলা, ইলিশ, পমফ্রেট, তপসে, গলদা চিংড়ি, বাগদা, রুই, কাতলা, মৃগেল, বাটা, জিওল, কই, মাগুল, শোল, বোয়াল[১৩]প্রভৃতি। সুন্দরবনের মাছের বার্ষিক উৎপাদন গড় ত্রিশ হাজার মেট্রিক টন। যা স্থানীয় প্রয়োজন মিটিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে বিদেশের বাজারে পৌঁছে যায়। সারা বছর মাছ পাওয়া গেলেও বর্ষায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

জল ও জঙ্গলের সঙ্গে পাখির নিবিড় এক সম্পর্ক। সুন্দরবনের অরণ্যে ১৮৬ প্রজাতির পাখি ও ৫০ প্রজাতির অতিরিক্ত পরিযায়ী পাখি লক্ষ্য করা যায়। পরিবেশের অবনতির জন্য সুন্দরবনে বর্তমানে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা এখন খুবই কম। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধির কারণে তাঁর প্রভাব এসে পড়েছে সুন্দরবনে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্রমশই বেড়ে চলেছে সুন্দরবনে। যেকারনে সুন্দরবন তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা থেকে ক্রমশ অবনতির দিকে এগোচ্ছে। বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে সুন্দরবনে।

সুন্দরবনে জনবিস্ফোরণের বৃদ্ধির হার

টিলম্যান হেঙ্কেল সাহেব যখন সুন্দরবনের জমি আবাদ করলেন তখন এই অঞ্চলে দলে দলে লোকের আগমন শুরু হল। কেউ ব্যবসায়ের অভিপ্রায়ে, কেউ বা মধু সংগ্রহের কারণে, কেউ আবার মাছ ধরার নেশায়। জঙ্গল সংস্কারের জন্য বিহার রাজ্যের ছোটোনাগপুর, রাঁচি, হাজারীবাগ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আদিবাসী, সাঁওতাল, মুন্ডা, ভূমিজ, হো প্রভৃতি মানুষের আগমন ঘটে সুন্দরবনে। ধীরে ধীরে সুন্দরবন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের বাসভুমি হয়ে ওঠে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের যশোর, খুলনা, বরিশাল থেকে জনগোষ্ঠী এসে সুন্দরবনে ভিড় জমায়। জনসংখ্যা বাড়তে বাড়তে ভারতীয় সুন্দরবনের ৫,৩৬৪ বর্গকিমি অঞ্চলে ২০১১ রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ বসবাস করে। নিম্নে সুন্দরবনে ১৭৭২ সাল থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার[১৫] দেখানো হল-

অবিভক্ত সুন্দরবনের জনসংখ্যা- ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে- ২,৯৬,০৪৫ জন।

অবিভক্ত সুন্দরবনের জনসংখ্যা- ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে- ৪,৮৭,৩৭৭ জন।

অবিভক্ত সুন্দরবনের জনসংখ্যা- ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে- ৭,৫৪,৪২১ জন।

ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা- ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে- ১১,৫৯,৫৫৯ জন।

ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা- **১৯৬১** খ্রিষ্টাব্দে- **১৪,৪৬,২৮২** জন।
ভারতীয় সুন্দরবনের জনসখ্যা- **১৯৭১** খ্রিষ্টাব্দে- **১৮,০০,০০০** জন।
ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা- **১৯৮১** খ্রিষ্টাব্দে- **২৭,০০,০০০** জন।
ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা- **১৯৯১** খ্রিষ্টাব্দে- **৩১,৫৪,৮৯০** জন।
ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা- **২০০১** খ্রিষ্টাব্দে- **৩৭,৫৫,৯২৬** জন

এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সুন্দরবনের বন ও বন্য প্রাণীর উপর দিনের পর দিন চাপ বেড়ে চলেছে। নষ্ট হচ্ছে জীব বৈচিত্র্য। হারিয়ে যেতে বসেছে বহু প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির অস্তিত্ব।

বিশ্বজোড়া খ্যাতির শিখরে সুন্দরবন

১৯৮৬ সালের **১**লা মার্চ শনিবার প্রশাসনিক সুবিধার্থে চব্বিশ পরগণা জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা নামক দুটি জেলার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই দুই জেলার দক্ষিণাংশ হল ভারতীয় সুন্দরবন। পশ্চিমবঙ্গের দুই চব্বিশ পরগণা জেলার **১৯** টি ব্লক নিয়ে সুন্দরবন গঠিত। জীব বৈচিত্র্যের আকর সুন্দরবন। ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের সমাহার সারা বিশ্ববাসীর কাছে সুন্দরবনকে পৃথক একটা পরিচিতি দিয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব ভারতের জলবায়ুর প্রধান নিয়ন্ত্রক সুন্দরবন। পশ্চিমবাংলার সমগ্র বনভূমির অধিকাংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে সুন্দরবন। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় সমগ্র বিশ্ব আজ জর্জরিত। বাদ নেই সুন্দরবনও। তবুও সুন্দরবনের খ্যাতি বিশ্বজুড়ে রয়েছে। সুন্দরবনকে ঘিরে নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সুন্দরবনের মুকুটে জুড়েছে নতুন নতুন সব পালক। নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি[১৬] সুন্দরবনকে রক্ষা করতে তৈরি হয়েছে।

১৯৭৩ সালে- সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ গঠিত হয়েছে।
১৯৭৩ সালে- সুন্দরবনে স্থাপিত হয়েছে- সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প।
১৯৭৬ সালে- সুন্দরবন কুমীর প্রকল্প (ভাগবতপুর) গঠিত হয়েছে।
১৯৭৬ সালে- সুন্দরবনে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (সজনেখালি) গঠিত হয়েছে।
১৯৮৪ সালে- সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান রূপে ঘোষিত হয়েছে।
১৯৮৪ সালে- সুন্দরবন ওয়ার্ল্ড ন্যাচারাল হেরিটেজ সাইট এর স্বীকৃতি লাভ করেছে।
১৯৮৯ সালে- সুন্দরবন জীবপরিমন্ডল সংরক্ষণ স্থান হিসাবে ঘোষিত হয়েছে।

এই সব সংরক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে সুন্দরবন আজ কতোটা সুরক্ষিত তা নিয়ে নান প্রশ্ন বিশ্বের আনাচে কানাচে ঘোরাঘুরি করছে।

সুন্দরবনবাসীর সংগ্রাম

২০১১ সালের সেনসাস্ রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে সুন্দরবনে ৫০ লক্ষের অধিক মানুষ প্রতিনিয়ত জীবনী সংগ্রাম করে চলেছে। অযাচিত ভাবে নয়, সুন্দরবনে মানুষের আগমন অভিপ্রয়ানের হাত ধরে। জঙ্গল সংস্কারের মধ্যে দিয়ে হাজার হাজার মানুষ দেশ-বিদেশ থেকে সুন্দরবনে এসে লোকালয় তৈরি করেছে। আর্থ-সামজিক জীবন

অতিবাহিত করতে বিভিন্ন পেশাতে মনোনিবেশ করেছে। সুন্দরবনে মানুষের আগমন খুব বেশি দিনের নয়। ১৯৩৯ সাল পর্যন্তও কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগরদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা প্রভৃতি দ্বীপগুলির জঙ্গল সংস্কার করে মানুষের বসবাস তৈরি হয়েছে।সুন্দরবনের মানুষের জীবিকার প্রধান অবলম্বন কৃষি। ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ মানুষ কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত। সুন্দরবনের কোথাও এক ফসলী জমি, আবার কোথাও দো-ফসলি। বৃষ্টি নির্ভর আমন ধানের চাষ অধিক। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সুন্দরবনের নিত্যকালীন সঙ্গী। ফলে বন্যার প্রকোপে সুন্দরবন নোনা জলে প্লাবিত হয়। চাষ প্রক্রিয়া ব্যহত হয়। সুন্দরবনকে ঘিরে রয়েছে নদ-নদী, খাল-খাড়ি, সুতিখাল ও ১০২ টি দ্বীপ যার ৫৪ টি তে মানুষের বাস। নদী গুলিতে রয়েছে প্রচুর মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্য। তাছাড়া জঙ্গল সংস্কার করে ভেড়িতে মাছের চাষও ও চলছে। এই মাছের উপর সারা বছর ধরে সুন্দরবনবাসীর অধিকার থাকে। ১২০০০ জেলে প্রতি বছর নদী থেকে আনুমানিক ২০০০ টন মাছ সংগ্রহ করে[১৭]।

সুন্দরবনের মানুষের নির্দিষ্ট কোন পেশা নেই। বিভিন্ন ধরণের পেশাই এদের জীবন বাঁচিয়ে রাখে। সুন্দরবনের মানুষের একটা দল বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সরকারি পাস নিয়ে এপ্রিল মে মাসে জঙ্গলে ৪৫০০ নৌকা নিয়ে মধু ও মোম সংগ্রহ করতে যায়। এরা মউলে নামে পরিচিত। প্রতি বছর মউলেরা ৫০০ কুইন্টেলেরমতো মধু ও ৩০০০ কিলোগ্রামের মতো মোম সংগ্রহ করে[১৮]। আর এক ধরণের মানুষ যারা বাউলে বা বাওয়ালী নামে পরিচিত, তারা বনের কাঠ সংগ্রহ করে অর্থ উপার্জন করে। ৩০ টার অধিক সেতু সুন্দরবনের বিছিন্নকীকরন সম্পূর্ণ করেছে, তাসত্ত্বেও নগর সভ্যতার আধুনিকীকরণ দেখা যায় না। আধুনিক জীবিকার সংস্থান নেই এখানে। মানুষ তাই শহরের পথে পাড়ি দিয়েছে। বিভিন্ন প্রকার কুটিরশিল্প গুলি সঠিক পরিকাঠামোর অভাবে হারিয়ে যেতে বসেছে।

সুন্দরবনের লোকাচার ও দেবদেবী

সুন্দরবনের সমাজ গ্রামকেন্দ্রিক। প্রাকৃতিক সম্পদের উপর এখানকার মানুষ নির্ভরশীল। প্রতিকূল পরিবেশ কেন্দ্রিক জীবনে অযাচিত ভাবেই বিভিন্ন সংস্কার এসে জমা হয়েছে এদের কাছে। সেই সংস্কার জন্ম দিয়েছে নতুন সব ধারণার। আর সেখান থেকেই নানান দেবদেবীর উদ্ভব সুন্দরবনে। বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়, সাপের দেবী মনসা, কুমিরের দেবতা কালুরায়, বাদাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বনবিবি সুন্দরবনের মানুষের কাছে প্রতিনিয়ত পূজিত হন। এই লোকাচারের সঙ্গে এখানকার মানুষের জীবন ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু শহরের ভোগবাদের কাছে এই সংস্কৃতি কালের অগ্রগতিতে হারিয়ে যেতে বসেছে।

সুন্দরবন অসুন্দরের পথে

জনবিস্ফোরণ সুন্দরবনের পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর জনসংখ্যার চাপ, অপরিকল্পিত উন্নয়ন, লোভীমানুষের অরণ্য ছেদন প্রক্রিয়া

সুন্দরবনের মাহাত্ম্য কেড়ে নিচ্ছে ধীরে ধীরে। পশ্চিমবাংলার পরিবেশের উপর এক গভীর সংকট টেনে আনছে আগামীতে। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। অপর্যাপ্ত ভেড়ী যেখানে কৃত্তিম ভাবে মাছ চাষ হচ্ছে, এই খামার গুলি জরুরি বন্ধ করা আবশ্যক। অধিক উৎপাদনের আশায় যে ধরণের কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে সুন্দরবনের মাটির উর্বরতা শক্তি হারিয়ে যাচ্ছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতি বছর ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের ধ্বংস হয়ে চলেছে। এর পর ও সুন্দরবনবাসী প্রতিনিয়ত বনের গাছ কেটে অর্থ উপার্জন করছে নিজেদের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। কার্পাস তুলার চাষ সুন্দরবনে আর হয় না। লবণ তৈরি শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। মানুষের স্বদিচ্ছার অভাবে আগামীতে হয়ত আর কোন কুটির শিল্প মাথা তুলে দাঁড়াবে না। শীতকালে আগের মতো পরিযায়ী পাখির ভিড় দেখা যায় না। সুন্দরবনবাসীর রুচিশীলতায় শহরীয় ভাবাবেগ আক্রমন করেছে, সেই সরলতা আর নেই। সুন্দরবনের জঙ্গলে গেলে ধরা পড়ে প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পদের বিপন্নতা। এক ধরণের লালপোকার আক্রমণে সুন্দরী গাছ বিপন্ন হতে বসেছে। গোলপাতার জঙ্গল অধিক নজরে আসে না। সারা দিন নদীর জলের দিকে তাকিয়ে থাকলে ডলফিনের সাথে পরিচিতি হবার উপায় থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভবনাই প্রবল।

বিশ্বউষ্ণায়ন আজকের দিনে একটা বিপর্যয় ডেকে নিয়ে এসেছে। পৃথিবীতে জমে থাকা বরফ গলে গিয়ে সমুদ্র বাহিত হয়ে নদীতে প্রবেশ করছে। সমুদ্র ও নদীর উচ্চতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা বেড়েছে। যেকারনে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণও বেড়েছে সমানতালে। আয়লা, ফনী, বুলবুল ও আমফান নামধারী দানবীয় প্রাকৃতিক দৈত্য সুন্দরবনকে কেড়ে নিতে শুরু করেছে। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভই পারে এই দৈত্যরূপি প্রাকৃতিক দানবকে পর্যুদস্ত করতে। কিন্তু যদি এই ম্যানগ্রোভ না থাকে। আগামী দিনে হয়ত এর থেকে অধিক শক্তিশালী প্রাকৃতিক দানব সুন্দরবনের উপর আছড়ে পড়বে। তার মোকাবিলা করার শক্তি কি থাকবে সুন্দরবনের। কথায় আছে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম আমারা বুঝিনা। এমন কোন দিন যেন না আসে, হয়ত কলকাতার কোন মনুমেন্টের উপর থেকে দাঁড়িয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে নির্দেশ করে বলতে হয় ঐ দিকে সুন্দরবন ছিল?

তথ্যসূত্র:

১। সুকুমার সিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ইতিহাস (একখন্ড), মাস এনটার্‌টেন্‌মেন্ট্‌ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ ৬৭৯।

২। কানাইলাল সরকার, সুন্দরবনের ইতিহাস, পাণ্ডুলিপি, কলকাতা, ২০১৭, পৃ ৩৫।

৩। তদেব, পৃ ৩৬

৪। তদেব, পৃ ৮১।

৫। তদেব, পৃ ৩৬।

৬। সুভাস মিস্ত্রী, লোকায়ত সুন্দরবন, লোক, কলকাতা, ২০১৩, পৃ ৬৪।

৭। তদেব, পৃ ৬৬।

৮। তদেব, পৃ ৬৭।

৯। তদেব, পৃ ৬৮-৬৯।

১০। সুকুমার সিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ইতিহাস (একখন্ড), মাস এনটার্‌টেন্‌মেন্ট্‌ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ ৭২৪।

১১। তদেব, পৃ ৭২৫।

১২। সুভাস মিস্ত্রী, লোকায়ত সুন্দরবন, লোক, কলকাতা, ২০১৩, পৃ ১০২।

১৩। তদেব, পৃ ১০৫।

১৪। বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরি, সুন্দরবন, নান্দনিক, কলকাতা, ২০১৪, পৃ ১৫।

১৫। দেবপ্রসাদ জানা (সম্পাদনা), শ্রীখন্ড সুন্দরবন, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪, পৃ ১৫৯।

১৬। পূর্ণেন্দু ঘোষ, ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্ট ক্যানিং, লোকসখা প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৭, পৃ ৫৭।

১৭। রঞ্জন চক্রবর্তী ও ইন্দ্র কুমার মিস্ত্রী, সুন্দরবনের অর্থনীতি জনসংস্কৃতি ও পরিবেশ, রিসা ফেয়ার সার্ভিস, কলকাতা, ২০০৭, পৃ ৬৪।

১৮। তদেব, পৃ ৬২।

সৈকত রক্ষিতের "সিঁদুরে কাজলে" উপন্যাসে : প্রান্তিক নারীর অবস্থান

রিবা দত্ত
গবেষক, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া

সারসংক্ষেপ : 'প্রান্তিক' শব্দটি স্থূল অর্থে মূল স্রোতের থেকে বিচ্ছিন্ন, সর্বার্থে প্রান্তে বসবাস করা, পিছিয়ে পড়া মানুষকে বুঝালেও সূক্ষ্মভাবে শব্দটি বিশ্লেষণ করলে তা বিভিন্ন অর্থ বহন করে। সৈকত রক্ষিতের 'সিঁদুরে কাজলে' উপন্যাসে প্রান্তিক নারীর অবস্থান শুধুমাত্র স্থূল অর্থই বহন করেনি, সূক্ষ্ম অর্থও সমানভাবে সচল রয়েছে। উপন্যাসে ভাদরি চরিত্রের আগাগোড়া বিশ্লেষণ করলে গ্রামীণ প্রান্তিক নারীর অবস্থানটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। ভাদরি শুধুমাত্র ব্যক্তি নাম নয়, গ্রামীণ নারী জীবনের সংকটের দ্যোতনা অর্থে ভাদরি চরিত্রের সার্থকতা। ভাদরি তার মননের স্বাধীন আকাঙ্খাগুলোকে বাস্তবে মেলাতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। কৈশোরের অবদমিত উচ্ছ্বাসের ফলে সে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার কঠোর বাস্তবতাকে বুঝে উঠতে পারেনি। ভাদরি তার নারী জীবনে অনেক পুরুষের সম্মুখীন হয়েছে কিন্তু সে তাদের মধ্যে মানুষ খুঁজে পায়নি, পেয়েছে শুধুমাত্র পৌরুষের অন্ধকার দিকটিকে। লেখক আমাদের সামনে গ্রামীণ সমাজ বাস্তবতার দিকটিকে তুলে ধরেছেন।

সূচক শব্দ : প্রান্তিক, সৈকত রক্ষিত, পুরুলিয়া, যন্ত্রণা, পুরুষতন্ত্র, গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা।

মূল আলোচনা :

সত্তরের দশকে বাঙালি জীবন ও সমাজে নেমে আসা ছোট-বড় গণ আন্দোলন ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকা লেখক গোষ্ঠী শহুরে মনোরঞ্জনের জন্য বিজ্ঞাপিত প্রেম-যৌনতা নির্ভর কাহিনি লিখলেন না, বরং গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলার পরিকল্পনায় এঁরা বিভিন্ন প্রান্তিক জনজীবনের সংগ্রামের কাহিনি, কখনও নিম্নবর্গের জীবনকথা, কখনও আদিবাসী গোষ্ঠী তাদের অস্তিত্বের সংঘাত ও সমস্যার দিক, কখনওবা ভৌগোলিক ব্যবধান, ধর্ম-বর্ণ শ্রেণি বিভক্ত উপজাতি, জনজাতির অদেখা-অজানা জীবনকেই প্রতিভাত করেছেন তাঁদের রচনায়। এই বলিষ্ঠ লেখকদের কালিকলমে উঠে আসা সাহিত্য মাটির সঙ্গে বেশি সম্পৃক্ত হয়ে রক্তমাংসময় সজীবাকার ধারণ করেছে। অগ্রবর্তীর ভূমিকায় মহাশ্বেতা দেবীর আবির্ভাবের পরই দেবেশ রায়, সাধন চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ সেন, ভগীরথ মিশ্র, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, সৈকত রক্ষিত, অনিল ঘড়াই প্রমূখ কথাসাহিত্যিকরা গ্রামজীবনের অপরিচিত ও অনাবিষ্কৃত দিকগুলোকেই তুলে আনলেন তাঁদের লেখায়। এঁদের মধ্যে সৈকত রক্ষিত আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের এক অন্যতম কথাকার। তিনি মূলত পুরুলিয়ার অচর্চিত

জনজীবন নিয়ে লেখালেখি করেছেন। তথাকথিত প্রান্তিক জেলা পুরুলিয়া যেমন উন্নয়নে পশ্চাদমুখী তেমনি সাহিত্যের পরিসরে পুরুলিয়ার বিশেষ কোনো অবদান ছিল না। অথচ লোকসংস্কৃতির আঁতুর ঘর পুরুলিয়ার লোকায়ত জীবনের বহু বিষয় অলিখিতই থেকে গেছে। সৈকত রক্ষিত এ বিষয় নিয়েই বলেছেন- "ছাত্রাবস্থায় বাংলা গল্প উপন্যাস যখন পড়তাম, তখন দেখতাম যে, বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারে পুরুলিয়ার কোন অবদান নেই। এই অঞ্চলের জনজীবন নিয়ে এমনই একটি উপন্যাস নেই যা থেকে এই জেলার সমাজ সংস্কৃতি তথা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত হতে পারে। ...আমার তখন মনে হয়েছিল আমার লেখার অন্যতম উদ্দেশ্য হবে কথাসাহিত্যের মধ্যে এই পুরুলিয়াকেই প্রতিবিম্বিত করা।"[১] তাই কথাশিল্পী সৈকত রক্ষিত তাঁর কলমকে বাড়িয়ে দিলেন পুরুলিয়ার রুক্ষ কাঁকর ভূমিতে। তাঁর কলমের আঁচড়েই এক একটি সোনালি ফসল বাংলা সাহিত্য জগতে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে। সৈকত রক্ষিতের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল- “আকরিক”(১৯৮৪), “হাড়িক”(১৯৯০), “অক্ষৌহিনী”(১৯৯৬), “ধূলা উড়ানি”(১৯৯৬), “বৃংহণ”(২০০০), “সিরকাবাদ”(২০০১), “সিঁদুরে কাজলে”(২০০২), “ঢেঁকিকল”(২০০৩), “মদনভেরি”(২০০৮), “স্তিমিত রণতূর্য”(২০১৪), “বৈশম্পায়ণ কহিলেন”(২০১৪), “জয়কাব্য”(২০১৫) প্রভৃতি। এই উপন্যাস গুলিতে পুরুলিয়ার আদিম অধিবাসী ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, তাদের জীবন-যাপন, সংস্কার, আচার, বিশ্বাস, ভৌগোলিক পরিবেশ তথা সার্বিক চিত্র রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

সৈকত রক্ষিতের "সিঁদুরে কাজলে" উপন্যাসটিতে লোকসমাজে উপস্থিত প্রান্তিক নারীর অবস্থান কি রূপ তার বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সমাজ বৃত্তের পরিধিতে অবস্থিত কোনো মানুষ বা মানব গোষ্ঠী যারা আর্থ, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে কেন্দ্রের তুলনায় দূরে অবস্থান করছে এবং সেই অবস্থান থেকে উন্নততর অবস্থানে এগিয়ে আসার জন্য সংগ্রাম করছে। সাধারণ অর্থে তাদের 'প্রান্তিক' বলা হয়। এই প্রান্তিকতা বিভিন্নভাবে হতে পারে- স্থানগত, বর্ণগত, বৃত্তিগত, লিঙ্গগত ও ধর্মগত প্রান্তিকতা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান চিরকালই প্রান্তিক। আর এই 'সমাজই মানুষকে নারী করে তোলে।' নারীকে পিঞ্জরা বদ্ধ করে। এই পুরুষতন্ত্রের দ্বারাই নারীদের অত্যাচারিত ও অবহেলিত হতে হয়। নিজেদের সুবিধার জন্যই নারীকে দাসীতে পরিণত করে। তাদেরকে ভোগ্যবস্তু হিসেবে দেখে। আসলে পুরুষতন্ত্রের দ্বারাই সমাজের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। যদিও এই সমাজের বিরুদ্ধে শিক্ষিত শহরকেন্দ্রিক নারী যতটা সোচ্চার হতে পেরেছে, অন্ত্যজ বা নিচুতলার নারীরা কি ততটা পেরেছে? কারণ তাদের জীবন তো সুযোগ সুবিধাহীন, অশিক্ষা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির মধ্যেই আবদ্ধ। তাই প্রান্তিক নারীর অবস্থান প্রান্তিকেরও প্রান্তিক। তারা সবচেয়ে বেশি অবহেলা, বঞ্চনার শিকার। তাদের জীবন সংগ্রাম আরো কঠিন। "সিঁন্দুরে কাজলে" উপন্যাসটিতে ঔপন্যাসিক একদিকে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার রুঢ় বাস্তব রূপকে যেমন অঙ্কন করেছেন, তেমনি অন্যদিকে সেই সমাজের করাল দংশনে

দংশিত হওয়া ভাদরির দুর্বিষহ জীবন সংকটকে তুলে ধরেছেন। একুশ শতকে দাঁড়িয়ে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার পশ্চাদমুখী রূপটিকে লেখক আমাদের সামনে এনেছেন।

"তুমার সীতার সিঁদুর দামিনী চৈখের কাজল যামিনী
কানফুলটি কামিনী করিছে ঝলমল।
বঁধু, আর কী দিঁয়ে সাজাব তুমাকে-সিঁদুরে-কাজলে টলমল।..."[২]

এই ঝুমুর গানই ভাদরির জীবনে চরম বিপদ ডেকে আনে। রাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে বার বার ছুটে যেত কানুর কাছে তেমনি শ্রীকান্ত রাজোয়াড়ের এই ঝুমুরের সুরে ভাদরির জীবনে পূর্বরাগ, অভিসার ও মিলনের আকুতি নিয়ে আসে। আসলে শ্রীকান্ত এই ঝুমুর গানের সংযোজিত কথাগুলিকে মোহিনী শক্তি করে ভাদরির উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করত। অবোধ ভাদরিও ঝুমুরের মোহিনী বাণে বারবার আহত হয় ও শ্রীকান্তের ডাকে সাড়া দেয়। ভাদরির বাবা ল্যালহা মাহাত প্রথম থেকেই ঝুমুরের প্রতি অনীহা, বীতরাগ পোষণ করতেন, কারণ- "ল্যালহা মাহাত মানুষটা একটু নরম প্রকৃতির। নির্ঝঞ্ঝাট। তবু ঝুমৈর জিনিসটাকে সে সহ্য করতে পারত না। বলত, 'চুয়াড়দের জিনিস।' এটা নাকি মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ানো বাগাল ছ্যেলাদের মুখেই মানায়। ... ঝুমৈরে বহির্মুখী টান আছে। আবেগের তীব্রতা আছে। তার ভাব-ভাষা ও সুর নিয়ে যে আবেদন, তাতে সাড়া দিয়ে মেয়েরা বিবাগী হয়ে যায়। এবং সত্যিসত্যি তেমন অনেক মেয়ে হয়েছে।"[৩] ল্যালহা মাহাত বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছে অনেক মেয়েকে বিবাগী হতে এবং তারা সকলেই 'নাচনী'তে পরিণত হয়। আর এই নাচনিরা শৈল্পিক দিক থেকে মর্যাদা পেলেও প্রাত্যহিক জীবনে তাদের যন্ত্রণা ও দুর্দশার কথা মানভূমের মানুষের কাছে অজ্ঞাত নয়। যতদিন তাদের যৌবনের জোয়ার থাকে ততদিন তাদের কদর, যেই শরীরে ভাটার টান পড়ে, তাদের দিকে আর কেউ ফিরেও তাকাই না, বরং অশ্লীল কুৎসা মন্তব্য করে। ভাদরির আগাম ভবিতব্য জীবনের কথা ভেবে ল্যালহা মেয়েকে ধমক দেয়, সতর্ক করে কিন্তু হায়- 'ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার।' শ্রীকান্ত ল্যালহার বাড়িতে শ্রম মজুরীর কাজ করে। পুরুলিয়াতে যে কর্মটিকে 'বাগাল' বলে। আর একজন রাখালিয়ার প্রতি নারীর মন যে কিরূপ হতে পারে তা আমরা "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের কথা স্মরণ করলেই বুঝতে পারব। ভাদরি ও শ্রীকান্তের সম্পর্কের শিখা প্রজ্বলিত হওয়ার কিছু দিন পরে ভাদরির বিয়ে হয়ে যায় মালথোড় গ্রামের আদালত মাহাত'র সাথে।

ভাদরি ও আদালতের দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন যেন তাসলিমা নাসরিনের "নিয়তি" কবিতাকেই মনে করায়- "নপুংসক বেঘোরে ঘুমোয়/ আমার পুরোটা শরীর তখন তীব্র তৃষ্ণায়/ ঘুমন্ত পুরুষটির স্থবির শরীর ছুঁয়ে/ এক ফোটা জল চায়, কাঁদে।" নপুংসক আদালত ভাদরির শারীরিক ক্ষুধা মেটাতে ছিল অক্ষম। তাই ভাদরি বারবার স্বামীর পৌরুষত্বের উপর প্রশ্ন তুলে। রাগে, ঈর্ষায় আদালতও তার স্ত্রীর স্বভাবের উপর

কুৎসা ছড়ায়, অশ্লীল মন্তব্য করে। যে দাম্পত্য সম্পর্কে ভালোবাসার বন্ধন নেই। সেই মানুষটির সাথে প্রতিদিন নির্বাপিত করা যন্ত্রণাসম মনে হয় ভাদরির। এদিকে অষ্টমঙ্গলা না পেরোতেই শাশুড়ির মৃত্যু হওয়ার ঘটনা ও বিয়ের এক বছর পেরিয়ে গেলেও তাদের সন্তান না হওয়ার কারণে ভাদরি গ্রামবাসীদের কাছে 'কুলৈক্ষণা বউ' হয়ে ওঠে। যদিও শাশুড়ির মৃত্যুতে ভাদরির কোনো দোষ ছিল না। আসলে অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ফলে গ্রামীণ মানুষের মনে এই ধারণার জন্ম হয়। ভাদরির দাম্পত্য জীবন সুখী, সুদৃঢ় হলে হয়তো কোনো সমস্যায় হত না কিন্তু তা না হওয়ার কারণেই ভাদরি তার রাখালিয়া বন্ধুকে স্মরণ করে, কৌশলে শ্বশুর বাড়িতে মজুরীর কাজ দেয়। ফলে তাদের মধ্যে যে দুরত্ব ছিল তা ক্রমেই অবসান হয়। তিলোত্তমা মজুমদারের "ঝুমরা" উপন্যাসের নায়িকার মতই ভাদরিও যেন মনে মনে ভাবে- "সেই তো প্রেমের সংজ্ঞা। বয়ঃক্রম বিচার করে না। জাত, কুল, ধর্ম মানে না। মানে নাকো সমাজশাসন। শুধু ভালবাসে।"[৪] ভাদরি শ্রীকান্তের ঔরসেই দুই সন্তানের জন্ম দেয়। পরবর্তীকালে তাদের সোহাগের পরশ এতটাই বিধ্বংসী আকার নেয় যে বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে ভাদরি নিজের হাতে প্রথম সন্তান ভভকে হত্যা করে। সেই রাতেই শ্রীকান্তের হাত ধরে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করে।

ভাদরি ও শ্রীকান্তের ভ্রাম্যমাণ জীবনে একদিকে ছিল তাদের সমাজ বহির্ভূত সম্পর্কের জন্য ভয় আর অন্যদিকে ভাদরির মধ্যে পুত্রহন্তার মনস্তাপ। ইতিমধ্যেই ভাদরির উপর শ্রীকান্তের যে টান ছিল তা ক্রমশ আলগা হতে শুরু করে। যে শ্রীকান্ত ভাদরির নিরাভরণ শরীর দেখার জন্য নিজের আঙুল পর্যন্ত কাটতে চেয়েছিল সেই শ্রীকান্তই এখন তার শরীরের প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভব করে না। শ্রীকান্ত নাচনির আসরে ঝুমুর গেয়ে বেড়ায়। আসলে শ্রীকান্ত বাধাহীন উন্মত্ত জীবন চেয়েছিল, যেখানে থাকবে না কোনো বাধা বা পিছুটান। শুধু সেখানে নিজের যৌনাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হবে। তাই তাদের সম্পর্কের মধ্যে যখন বন্ধন চলে আসে তখন শ্রীকান্ত তা থেকে মুক্ত হতে চায়। সে ভাদরিকেও তার উন্মত্ত জীবনের সঙ্গী করে, নাচনি 'লীলাবতী'তে পরিণত করতে চায়। কিন্তু ভাদরি তার দীর্ঘ জীবন অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারে পুরুষের মন। সে পুরুষের কাম লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে। ভাদরির অনেক সময় নিজের রূপ যৌবনকেই শত্রু বলে মনে হয়েছে- 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী।' ভাদরি এও বুঝতে পারে যে নাচনির মধ্য দিয়ে তার শরীরের বেসাতি শুরু হবে। তার নারীত্বকে পণ্যে পরিণত করা হবে। নাচনিদের প্রতি হওয়া এই নারী অবমাননার দিকটি আমরা সৈকত রক্ষিতের "খেমটি" ও "মুসরিয়া বাই" গল্পেও পাই। উপন্যাসে ভাদরি শুধু চেয়েছিল নিজের ভালোবাসার মানুষ ও সন্তানকে নিয়ে স্বাধীন, সুখী সংসার জীবন। তার সে আশা পূরণ হয়নি। শ্রীকান্তের বিশ্বাসঘাতকতায় তার মোহভঙ্গ ঘটায়। তাই বাধ্য হয়েই শ্রীকান্তের কবল থেকে মুক্তি পেতে কন্যা চম্পিকে নিয়ে সে পাঁচ বছর পর পতি গৃহ মালথোড়েই ফিরে আসে। যে মালথোড়ে তার অস্তিত্বের শিকড় রয়েছে,

আদালতের পত্নী হিসেবে আত্মপরিচয় রয়েছে। কিন্তু গ্রামীণ জনসমাজ তাকে আশ্রয় দেয়নি, আদালতও এগিয়ে আসেনি তাকে গ্রহণ করতে। আসলে 'মেয়েমানুষের গায়ে একটা দাগ পড়লেই মৃত্যু পর্যন্ত সে খুঁতো হয়ে যায়।'[৫] তাই ভাদরি সেখান থেকে অত্যাচারিত, অপমানিত ও প্রহৃত হয়ে ফিয়ে যায় অনিকেত জীবনে। তার জীবনের সমাপ্তি দিয়েই উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে। লেখক একজায়গায় বলেছেন- "আমি কারো জন্য কিছু করতে পারিনি জীবনে, কিন্তু যেকোনো মানুষের বেদনার কাছে নত হতে চেয়েছি, পাশে দাঁড়াতে চেয়েছি, অনুভব করতে চেয়েছি তার একা হয়ে যাওয়া কাতর হৃদয়কে, অন্যদের অবহেলা-অপমানে তার ছোট ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নিজস্ব জগৎকে।"[৬] এই উপন্যাসের লেখক হৃদয় দিয়েই অনুভব করেছেন ভাদরির মতো প্রান্তিক নারীর জীবন যন্ত্রণা ও সংকটকে।

উপন্যাসের মধ্যে আমরা ভাদরির জীবনকে মোটামুটি তিনটি পর্বে ভাগ করতে পারি-

১| ভাদরির কুমারী জীবন।
২| ভাদরির বৈবাহিক জীবন।
৩| ভাদরির ভ্রাম্যমাণ জীবন।

জীবনের তিনটি পর্বেই ভাদরি বহু পুরুষের সম্মুখীন হয়েছে কিন্তু কোথাও সে মানুষের 'হৃদয়' দেখতে পায় নি, দেখেছে শুধুমাত্র এই 'জগতের ছদ্মরূপ'কে। অর্থাৎ উপিন্দ কাকা, মুকুন্দ, কমলাকান্ত, হর পাগল, নিবারণ, শ্রীকান্ত, বর্বর মুনশির মতো বিচিত্র সব পুরুষ চরিত্রের বহুরূপতাকে। এরাই ভাদরির জীবন দর্শনকে পূর্ণ করেছে। সভ্যতার সচলতায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বারবার তাদের পৌরুষের থাবা বসিয়েছে নারী দেহে ও নারী হৃদয়ে। আর এ কর্মের জন্য পুরুষ জাতি কলুষিত হয় না, তাদের পৌরুষের দীপ্তি বেড়ে যায়, নষ্ট হয় শুধুমাত্র সেই অব্যক্ত নারী হৃদয়। ঝুমুরের সুরে যে কথাগুলি ভেসে ওঠে তা শুনে ভাদরি মোহিত হয়ে শ্রীকান্তের ডাকে সাড়া দিয়েছিল। আসলে সে চার দেওয়ালের অচলায়তন ভেঙ্গে স্বাধীন স্বপ্নের সওয়ারী হব ভেবেছিল। আর এই ভাবনা-য় তার জীবনে কাল হয়ে দাঁড়ালো। ক্রমেই সে বুঝতে পারে ঝুমুরের কাব্যগুন ও বাস্তব জীবনের পরিসীমায় নৈকট্যের চেয়ে দূরুত্বই বেশি। তাই ঝুমুর শিল্পীদের দেখে ভাদরির মনে হয়েছে- "শৈখিন প্রেমের আড়ালে এদের শুধুই ছেলানি আর উৎশৃঙ্খলতা।"[৭] আসলে অশিক্ষা ও কুসংস্কার কারণে গ্রামীণ জনজাতির মধ্যে সেই আদিম জৈব প্রবৃত্তির উৎশৃঙ্খলতার রূপটি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আর ভারতীয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদের জীবন তো এমনিতেই ছিল দুর্বিষহ। যদিও বর্তমানে প্রযুক্তিগত সভ্যতায় নারীরা অনেকটা এগিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্ন অনেকক্ষেত্রে থেকেই যায়। কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ চায় না নারীদের বশ্যতা স্বীকার করতে, তারা চায় নারীদের উপর কর্তৃত্ব ফলাতে।

ভাদরি চেয়েছিল ভালোবাসার মুক্ত বারান্দা, তাই আদালত মাহাতর সংসার ছেড়ে পালিয়েছিল শ্রীকান্ত রাজোয়াড়ের কাছে। কিন্তু তখনও সে ভাবেনি একটি পুরুষের কবল থেকে পরিত্রাণ পেতে, সে আরেকটি পুরুষের বরাহ গ্রাসের আশ্রয়প্রার্থী হতে চলেছে। আর যখন সে বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হল তখন প্রথাগত সামাজিক বন্ধনেই ফিরে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু ততক্ষণে চোরাবালির গহীনে তার জীবন রথ আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ভাদরি এমন এক পুরুষের সান্নিধ্য চেয়েছিল যে তাকে 'মনের স্বাধীনতা, কল্পনার স্বাধীনতা, এবং সর্বোপরি তার ভালোবাসারও স্বাধীনতা'[৮] দেবে। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস তার এই সন্ধানী দৃষ্টি তাকে শুধুমাত্র যন্ত্রণা ও প্রহৃত করেছে, সমাধানের পথ খুঁজে দেয়নি। তাই কখনও কখনও তার মনে হয়েছে- "নারী শুধু নারীই। সে পুরুষের সঙ্গিনী নয়, সহধর্মিনীও নয়, অর্ধাঙ্গিনী তো নয়ই। আসলে সে পুরুষবীর্য বহনকারিণী আমিষ কৌটোমাত্র। এবং এই উপলক্ষেই সে আনন্দদায়িনী, সে সেবাদাসী, সে এমনি আরও বহু কিছুই। আদতে, সে কিছুই নয়।"[৯] ভাদরি তার স্বামীকে পরিত্যাগ করে প্রেমিক পুরুষের হাত ধরে বেরিয়ে গিয়ে কী ভুল করেছে? ভুল তো সে প্রথম দিনই করেছিল যখন ঝুমুরের সুরমুর্ছনায় আসল মানুষকে চিনতে না পেরে। অশিক্ষা ও প্রবল আবেগের বশবর্তী হয়ে ভাদরি তার জীবনে অন্ধকার ডেকে আনে। তবে একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই, সে সর্বক্ষেত্রেই কিন্তু দোষী ছিল না, বাস্তব পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। তাই পাঁচ বছর পর ফিরে আসা ভাদরির প্রতি গ্রামবাসীদের কোনো ক্ষমা নেই, তার বদলে প্রশ্ন বাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে-

১| ক্যানে পেটের ছ্যেলাকে তুঁই খুন করে গেলি?

২| ক্যানে গ্যারাম ছাইড়ে পালায় গেলি?

৩| ক্যানেই-বা তুঁই পুনুরায় ই-খেনকে আইসে ঢুকলিস?[১০]

এই তিন প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ভাদরির সারা জীবনের ইতিহাস, যে ইতিহাস তার সুখ স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করেছে। সে নিজের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে বোঝাতে চেয়েছে কিন্তু গ্রামীণ রক্ষণশীল সমাজ তা বুঝতে চায়নি বা বোঝার চেষ্টা করেনি। শুধু পুরুষ নয়, গ্রামের নারীরাও ভাদরিকে দোষী ও অপরাধী রূপেই দেখেছে। যে ভাদরি আলোর পথে যাত্রা করতে চেয়েছিল সেই ভাদরি'ই হৃদয়হীন স্বার্থপর রূঢ় সংসারের আঘাতে অন্ধকার থেকে গভীর অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গেল। কিন্তু ভাদরি তার নারী জন্মের এই বেদনাদায়ক জীবন যন্ত্রণা ও অসহায়তাকেই ধন্য বলে মনে করেছে। কারণ নারী না হলে তো সে পুরুষের আড়ালে থাকা পশুত্বের চিত্রকে দেখতে পেত না। সে উপলব্ধি করতে পারত না সৌন্দর্যের আড়ালে থাকা প্রকৃত অন্ধকারের সত্যতাকে।

ঔপন্যাসিক বেশ কিছু ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রান্তবাসী নারীর জীবন চিত্রকে তুলে ধরেছেন। ডাকাতের হাত থেকে স্ত্রীর সম্মান রক্ষার্থে ডমন মাহাত প্রাণ বিসর্জন দেয়। এখানে নারী সুরক্ষার প্রশ্নটি থেকে যায়। আবার 'বুধি' নামে কুলগাছটি

প্রান্তিক নারীরই প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে। অনেকটা 'গ্রামের কাকী খুড়ির মতো'ই গাছটি। গাছ থেকে কুল পাড়তে ছেলেরা ঢিল ছোঁড়ে। নারীর প্রতি হওয়া নিপীড়ন ও অসহায়ত্বের পাশাপাশি আমরা নারীত্বের অপমান ও অসম্মানের দিকটিও পায়, যেখানে সুভাষ রাজুয়ার দুর্গা লিঙ্গের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করে। নারী শরীর যেন তাদের কাছে রঙ্গ তামাশার বিষয়। আবার চম্পি বা ভাদরির কারোর ক্রন্দনরোলে গ্রামবাসীর হৃদয় বিগলিত হয় নি, তারা চম্পির কথা ভাবেনি, নিজেদের সামাজিক নিয়ম-নীতিকেই বড় করে দেখেছে।

সবশেষে এ কথায় বলা যায় যে, প্রান্তিক নারীর জীবনে ঘটা এই অসম্মান, অপমান, অবহেলা ও তাদের যন্ত্রণাদায়ক জীবন সংকট পাঠক হৃদয়কে বেদনাহত করে তোলে। কোথাও যেন আমাদের মননে প্রশ্ন ধারার বর্ষণ ঘটায়। কারণ এই অসহায় জীবন গাঁথা কী শুধু মালথোড়ের পরিবেশেই সীমাবদ্ধ? না এই চিত্রপট অতীত-বর্তমান বিশ্বে ঘটা বা ঘটে চলা নারীর অবহেলিত, অবরুদ্ধ, অবদমিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত রূপকেই প্রদর্শায়িত করে তুলছে। সর্বোপরি, "সিঁন্দুরে কাজলে" উপন্যাসটিকে আমরা সার্থক উপন্যাস বলতে পারি।

তথ্যসূত্র :

১| সম্পাদিত : অরূপ পলমল, কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত, লেখা এক অপ্রত্যক্ষ সংগ্রাম, ডাব পাবলিশিং, কলকাতা, বইমেলা ২০১৩, পৃষ্ঠা : ২০-২১

২| সৈকত রক্ষিত, সিঁদুরে কাজলে, মুক্তাক্ষর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, ২০০২, পৃষ্ঠা : ১৪

৩| তদেব, পৃষ্ঠা : ৩৭

৪| তিলোত্তমা মজুমদার, ঝুমরা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ২০১৮, পৃষ্ঠা : ২০০

৫| সুচিত্রা ভট্টাচার্য, দহন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৯৫, পৃষ্ঠা : ৪৯

৬| সৈকত রক্ষিত বিশেষ সংখ্যা, আরশি নগর, কলকাতা, বইমেলা ২০২০, পৃষ্ঠা : ২৪

৭| সৈকত রক্ষিত, সিঁদুরে কাজলে, মুক্তাক্ষর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, ২০০২, পৃষ্ঠা : ৮৮

৮| তদেব, পৃষ্ঠা : ১১

৯| তদেব, পৃষ্ঠা : ১৫

১০| তদেব, পৃষ্ঠা : ৭৬

সহায়ক গ্রন্থ :

১| সৈকত রক্ষিত, সিঁদুরে কাজলে, মুক্তাক্ষর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, ২০০২

২| সুচিত্রা ভট্টাচার্য, দহন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৯৫

৩| তিলোত্তমা মজুমদার, ঝুমরা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ২০১৮

৪| সম্পাদিত : অরূপ পলমল, কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত, লেখা এক অপ্রত্যক্ষ সংগ্রাম, ডাব পাবলিশিং, কলকাতা, বইমেলা ২০১৩

৫| অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

৬| ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী, লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০১০

৭| সম্পাদনা : গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নবম মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৮

৮| সোহারাব হোসেন, বাংলা ছোটগল্প তত্ত্ব ও গতি-প্রকৃতি, করুনা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১২

৯| সম্পাদনা : পুলক চন্দ, নারী বিশ্ব, গাঙচিল, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৮

পত্র-পত্রিকা :

১| সৈকত রক্ষিত বিশেষ সংখ্যা, আরশি নগর, কলকাতা, বইমেলা ২০২০

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস : প্রসঙ্গ 'সংস্থান' ধারণা

সন্দীপ দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ (Abstract) : বিশিষ্ট ভাষাবিদ সুকুমার সেন বলেছিলেন, বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্রের পরেই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ। পরবর্তী কালে বিজিত দত্ত তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্থে সুকুমার সেনের সিদ্ধান্তে শিলমোহর প্রদান করেন। কারণ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন বাংলার কালানুক্রমিক (প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ থেকে মুসলমান বিজয় পর্যন্ত) সময়পর্বকে তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসে বেশ কৃতকৌশলের দ্বারা উপস্থাপন করেছিলেন। সেক্ষেত্রে সমকালে (বিশ-শতক) তিনি সাহিত্যিক হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের পরেই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাখালদাস বাংলার প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ নিয়ে লেখেন, 'পাষাণের কথা', 'হেমকণা' ও প্রায় ছ-শো বছরের গুপ্ত যুগ নিয়ে লেখেন, 'শশাঙ্ক', 'করুণা', 'ধ্রুবা', উপন্যাস তিনটি, অন্যদিকে পাল যুগের রাজা ধর্মপালকে নিয়ে 'ধর্মপাল' উপন্যাস ও মুসলমান বিজয়ের কাহিনি বিধৃত করেছিলেন তাঁর 'অসীম', 'লুৎফ-উল্লার'-র মত উপন্যাসে। উপন্যাস হল কথার শিল্প। কথক তাঁর সৃজিত আখ্যানে কথা দিয়ে বিশেষ একটি কালপর্বের সমাজ ব্যবস্থাকে (রাজনৈতিক-ভৌগলিক-আর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক) তুলে আনেন উপন্যাসের বাচনস্তরে। সেক্ষেত্রে উপন্যাসের বাচনস্তরে কাহিনিকাল নির্মিত হয় ঔপন্যাসিকের 'ফোকালাইজেশন' বা নিরীক্ষণের দ্বারা। যেহেতু কথা-আখ্যান মূলত স্থান-কাল-ঘটনা ও চরিত্রের (কনটেন্ট ও এক্সপ্রেশন) অবস্থার মিলিত প্রকাশ। প্রতিটি 'কনটেন্ট' কথকের নিরীক্ষণে পুনর্বিন্যস্তাকারে পুননির্মিত হয় তাঁর আখ্যানের মাত্রায়ণে। অর্থাৎ, উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'সংস্থান' একটি বিশেষ উপদান সে-কথা স্বীকার করে নেওয়া যায়। যে-কোনো উপন্যাসের কাহিনিই এই 'সংস্থান' বিন্যাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বললেও খুব একটা ভুল বলা হয় না। উপন্যাসের বাচন পরিসরে প্রকাশিত 'সংস্থান' বিন্যাসই বলে দেয়, উপন্যাসের কাহিনিকাল। তারই ভিত্তিতে উক্ত প্রবন্ধে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির বাচন পরিসরে 'সংস্থান' বিন্যাসের ধারণা আলোচনা করা হবে। সেক্ষত্রে, সংস্থানের যে-যে উপাদানের নিরিখে রাখালদাসের ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংস্থান আমরা বিচার করব, সেগুলি হল, - ১. স্থান (place) ২. কাল (the time) ৩. পাত্র (character) ৪. ঘটনা (story)। কারণ, স্থান+কাল+পাত্র+ঘটনা = সংস্থান।

সূচকশব্দ (Key Word) : ইতিহাস (history), সময় (time), বাচন (discourse), ঐতিহাসিক উপন্যাস (Historical novel), স্থান (place), কাল (the time), চরিত্র (Role), ঘটনা (story), কথক (the narrator), নিরীক্ষক (auditor), সংস্থান (settings) ইত্যাদি

শুরুর কথা-

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫, ১৩ এপ্রিল) একাধারে ছিলেন যেমন ঐতিহাসিক ; তেমনি একজন ঔপন্যাসিক। তিনি বিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রায় কুড়ি বছর ধরে (১৯০৫-১৯২৮) নিরলস সাহিত্যচর্চা করে অসংখ্য বাংলা প্রবন্ধ, গল্প, ঐতিহাসিক উপন্যাস ও সামাজিক প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি হল, -'পাষাণের কথা' (১৯১৪),'শশাঙ্ক' (১৯১৪), 'ধর্ম্মপাল' (১৯১৫),'ময়ূখ' (১৯১৬), 'করুণা' (১৯১৭), 'ধ্রুবা' (১৯১৯), 'অসীম' (১৯২৪), 'লুৎফ-উল্লা' (পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি)। আমরা তাঁর উপন্যাসের বাচনে (discourse) কাহিনি কিংবা ইতিহাসের পুনর্নির্মাণে তিনি কিভাবে সংস্থানকে ব্যাবহারে করছেন তার একটি পাঠ নেবার চেষ্টা করা হবে উক্ত প্রবন্ধে।

১

আখ্যানের (the narrative) বাচনস্তরকে যদি 'কনটেন্ট' এবং 'এক্সপ্রেশন' –এর দিক থেকে দেখা হয়, তাহলে বাচনের আখ্যান উপাদানের তৃতীয় কনটেন্ট উপাদান হল সংস্থান (setting)। সংস্থান মূলত আখ্যান বাচনে নির্মিত 'স্থান-কাল-ঘটনা-চরিত্রে'র স্থিতি অবস্থাকে নির্দেশ করে। মূলত লেখক উক্ত চারটি উপাদান দ্বারা তাঁর কথনবিশ্ব নির্মাণ করেন। নির্মাণ কৌশল সেক্ষত্রে শব্দ নির্মিত ভাষা দ্বারা প্রকাশিত। অর্থাৎ শব্দ নির্মিত ভাষা যখন এই চার উপাদানের প্রকাশ মাধ্যম, তখন তার অস্তিত্ব, অন-অস্তিত্ব, বাস্তব-অবাস্তবের মাত্রা আয়ত্ত করতে হয় পাঠককে। কারণ, এগুলির বাস্তবে কোনই অস্তিত্ব নেই, এর অস্তিত্ব শুধু মাত্র সৃজিত বাস্তবে। তাই অমিতাভ দাস, এগুলিকে 'পেপার রিয়ালিটি' বা 'কাগুজে বাস্তব' বলে অভিহিত করেছেন।[১] কথকের নিরীক্ষণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এই উপাদানগুলি আখ্যানে নিজেদের জায়গা করে নেয় ; আখ্যান কাহিনির মাত্রা আয়ত্ত করে নিতে নিতে। সেক্ষেত্রে গুরুত্ব হয়ে পড়ে কথকের দেখার দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি কীভাবে দেখবেন ? আর বাচনে কীভাবেই বা প্রকাশ করবেন, তাঁর আখ্যানের 'কনটেন্ট উপাদান'কে? এক্ষেত্রে কথক সাহায্য নেন সংস্থানের। যার দ্বারা কথক নির্মাণ করেন তাঁর সৃজিত বাস্তব উপাদান (স্থান-কাল-কাহিনি-চরিত্র) –এর সঙ্গে পাঠকের সরাসরি সম্পর্ক। অমিতাভ দাসের মতে, -

> *"আখ্যান কথনের এই অপ্রত্যক্ষ ও সৃজিত বাস্তবকে পাঠকের দৃষ্টিসীমায় প্রত্যক্ষবৎ এনে দিতে চায় সেটিং বা সংস্থান – কখনো পটভূমি হিসেবে, কখনো আঞ্চলিকতার মায়ায়, কখনো*

> *ঐতিহাসিকতার কোনো মাত্রা আয়ত্ত করে নিতে নিতে ; যেখানে তার গুরুত্ব আখ্যানের আর একটি ভূমিকার মতোই।”*[২]

অর্থাৎ সেটিং যখন ঐতিহাসিক মাত্রা আয়ত্ত করতে সক্ষম, তখন তার নিরিখেই রাখালদাসের উপন্যাসের সেটিং দেখে নেওয়া যেতে পারে। কীভাবে রাখালদাস তাঁর উপন্যাসে সংস্থানের মাধম্যে ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ করলেন। কীভাবেই বা তাঁর আখ্যানের কাহিনি, স্থান, কাল বা চরিত্র ইতিহাস হয়ে উঠল।

রাখালদাসের ‘শশাঙ্ক’ উপন্যাস থেকে স্থান সম্পর্কিত একটি সংস্থান তুলে ব্যখ্যা করলে বিষয়টি আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হবে।

“কপোতিক সঙ্ঘারাম অতি প্রাচীন সৌধ। জনশ্রুতি ছিল যে, ইহা সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত। ইহার ভিত্তি হইতে সৌধশীর্ষ পর্যন্ত পাষাণ নির্মিত এবং ইহার চতুর্দিকে বহু সুদৃঢ় প্রস্তরনির্মিত বেষ্টনী ছিল। এই সুবৃহৎ সঙ্ঘারামে পঞ্চসহস্রের অধিক ভিক্ষু স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিত, এবং সহস্রাধিক ভিক্ষু তখনও এই স্থানে বাস করিতেছিল। সঙ্ঘারামের চারিদিকে চারটি তোরণ, তাহা সর্বদা উন্মুক্ত থাকিত। রাষ্ট্রবিপ্লবে বহুবার নাগরিকগণ কপোতিক সঙ্ঘারাম ধ্বংস করিয়াছিল, এই জন্য অবশেষে অসংখ্য লৌহকীলকে আচ্ছাদিত কবাট তোরণসমূহে স্থাপিত হইয়াছিল। বিশেষ বিপদের আশঙ্কা না দেখিলে মহাস্থবিরগণ তোরণ রুদ্ধ করিবার আদেশ দিতেন না, কারণ নাগরিক গণ, সকল সময়ে দেবদর্শন মানসে সঙ্ঘারামে আসিত।”[৩]

উক্ত অনুচ্ছেদটি দ্বারা শাহাজদাবাদের একটি সঙ্ঘারামের কথা পেলাম। এখানে রাখালদাসের নিরীক্ষণ দ্বারা পাঠক প্রাচীন ইতিহাসের খ্রিস্টিয় ষষ্ট শতকে পৌঁছাতে পারলেন। নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে বাচনে স্থান গুরুত্ব পেয়েছে। একটি চিত্রের দ্বারা বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে।

কথকের নিরীক্ষণ লক্ষ্যণীয় :

[স্থান – কাল – ঘটনা – অ্যাক্‌ট্যান্ট] ⇐ [+ কথক {+ নিরীক্ষক (+ অ্যাকট্যান্ট)}]

⇩

বাচন >   (স্থানের প্রতি প্রমুখন)

যদি উক্ত উদাহরণ সাপেক্ষে আমরা সাজাই, তাহলে পাই, -

[কপোতিক সঙ্ঘারাম –ষষ্ট শতক - বন্ধুগুপ্তের সন্ধানে শশাঙ্কের আশ্রয়- শশাঙ্ক]

[+রাখালদাস {+ রাখালদাস (+ শশাঙ্ক)}] ⇦

⇩

(বাচনে কথকের নিরীক্ষণের দ্বারা স্থানের প্রমুখন ঘটছে)

আবার কখনো স্থান বর্ণনা কথকের নিরীক্ষণ দ্বারা একটি ভূমিকা চরিত্র দখল করে বসছে বাচনে। তখন সেই স্থান বাচনে একটি ভূমিকার গুরুত্ব পেয়ে যাচ্ছে। পাঠকের কাছে টেক্সটের গতি বেড়ে, একটি চলনপরিস্থিতি গড়ে তুলছে। এ যেন কথকের সামনে দেখা কোনো প্রাচীন স্থান কথা বলে উঠছে তাঁর সেটিংসের দ্বারা। 'ময়ূখ' উপন্যাসে অষ্টম পরিচ্ছেদ 'ঘূর্ণা বাত্যা' অংশে সপ্তদশ শতকের প্রাচীন বাংলার একটি স্থানিক সংস্থান রাখালদাস এভাবে করলেন।

"সহসা নদীবক্ষে বিস্তৃত বালুকাক্ষেত্র বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ; সঙ্গে সঙ্গে শান্ত নদীবক্ষ ভীষণ মূর্তি ধারণ করিল ; চারিদিক হইতে মেঘ আসিয়া নীলাকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল ; বায়ু বহিতে আরম্ভ করিল, সুবাদারের বজরা ভীষণ বেগে নাচিতে আরম্ভ করিল, কিন্না হইতে হাহাকার রব উঠিল। বৃষ্টি আরম্ভ হইল, পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালা আসিয়া কিল্লায় আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, সহসা প্রকান্ড বজরা পদৃশ্য হইল।"[৪]

নিরীক্ষণ লক্ষ্যণীয় : বাচনে 'স্থান' গুরুত্ব পেয়েছে। এবং কথকের নিরীক্ষণ দ্বারা স্থান জীবন্তরূপ পেয়েছে।

আবার, কথা-আখ্যানে স্থান নির্মাণ নানা রকম ভূমিকা পালন করে। কারণ, স্থান হল ঘটনা সংঘটনের জায়গা মাত্র। তাই অনেকক্ষেত্রে স্থানের স্বল্প বা বিশদাকারে বাচনে যে বর্ণনা থাকে, তার লক্ষ্যই হল কাহিনির পশ্চাৎপট রচনা। রাখালদাসের উপন্যাসেও স্থানের এই নির্মাণ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত। সেক্ষেত্রে তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্থানের সংস্থান তিনি দেখিয়েছেন চার পদ্ধতিতে। পর-পর পদ্ধতি অনুসারে স্থানের সংস্থান রাখালদাসের উপন্যাসে দেখে নিতে পারি।

'ধ্রুবা' উপন্যাসে সমুদ্রগুপ্তের গৃহের বর্ণনায়,-

"উজ্জ্বল কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত সভামণ্ডপের ন্যায় সমুদ্র-গৃহ। সমুদ্রগুপ্ত নির্ম্মিত সভাকুট্টিমের এক পার্শ্বে শুভ মর্ম্মর নির্ম্মিত বিস্তীর্ণ বেদী। তাহার উপরে সুবর্ণ নির্ম্মিত মণিমুক্তাখচিত বৃহৎ সিংহাসন। বেদীর নিম্নে অসংখ্য চন্দন এবং বহুমূল্য কাষ্ঠনির্ম্মিত, হস্তিদন্তখচিত সুখাসন। বিশাল সভামণ্ডপ প্রায় জনশূন্য। চারিদিকে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ। প্রতি দ্বারের বাহিরে সশস্ত্র প্রতিহার ও ভিতরে মূক বধির অন্তঃপাল।... গৃহটি অতি ক্ষুদ্র এবং তাহার চারিদিকে চারটি দুয়ার। কক্ষের চারিদিকে একটি প্রশস্ত অলিন্দ এবং তাহার চারিদিকে চারটি দীর্ঘ কক্ষ। বিশেষ গোপনে মন্ত্রনা করিবার জন্য বৃদ্ধ সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত এই মন্ত্রণাগৃহ করাইয়াছিলেন। অলিন্দের বাহিরে চারিটি কক্ষে অসংখ্য সশস্ত্র রক্ষী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।"[৫]

উপরিউক্ত উদাহরণে গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের গৃহ বর্ণনা দিয়েছেন রাখালদাস। সেক্ষেত্রে বাচনে যে স্থানিক বিবরণ তিনি দিলেন, তা অনেকটা চিত্রকের ভূমিকা পালন করল। প্রাচীন গুপ্ত রাজপ্রাসাদের গৃহ-সজ্জা আমাদের কাছে একের পর এক চিত্রের মতো উঠে এল বাচনে। 'ধ্রুবা' উপন্যাসে যখন রামগুপ্ত কর্তৃক মাধবসেনা অত্যাচারিত, চন্দ্রগুপ্ত দ্বারা অত্যাচার লঙ্ঘন, ঠিক সেই সময় প্রয়োজন হয়ে পড়ে সমুদ্রগৃহে রামগুপ্তের বিচার। বলাবাহুল্য, এই বিচার পূর্বক বিচারের স্থান বর্ণনা উপন্যাসের একটি পশ্চাৎপট সৃষ্টি করল। এভাবে রাখালদাসের অধিকাংশ ঐতিহাসিক উপন্যাসে এই স্থানিক বর্ণনা বাচনে আখ্যানের পশ্চাৎপট রূপে চিত্রের মত ব্যবহৃত হয়েছে। সেক্ষেত্রে স্থান বর্ণনায় উঠে এসেছে, তৎকালীন মানুষের গৃহ -নির্মাণের কৌশল ও অভিরুচি।

উপন্যাসের বাচনে স্থান সংস্থান শুধুই যে বিরতির ভূমিকা পালন করে তাই নয়, অনেকসময় সেই স্থান সম্পৃক্ত হয়ে যায়, তৎকালীন (উপন্যাসের কাহিনিকাল) মানুষের জীবন ও জীবিকার বিশেষ ইঙ্গিতে। ফলে, স্থানের সাথে সাথে চরিত্রের জীবনদর্শন বিগর্ভিত হতে থাকে অনবরত বাচনে। 'শশাঙ্ক' উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে 'ধীবর গৃহে' অংশে এমনি স্থানের নির্দেশ বর্ণনা করেছেন রাখালদাস। সেখানে, স্থানের সাথে সাথে ৬ষ্ঠ শতকের শেষ সময়কালের সমাজের সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার অর্থাৎ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা বাচনে তুলে এনেছেন। সেক্ষেত্রে বাচনে 'স্থান সংস্থান' সমকালিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নির্দেশক।

"শীতলাতীরে আম্র-পনসের ঘন ছায়ায় একখানি ক্ষুদ্র কুটীর। কুটীরের গোময়লিপ্ত পরিস্কার অঙ্গনে বসিয়া একটি অসিতাঙ্গী যুবতী ক্ষিপ্রহস্তে জাল বুনিতেছে, তাহার সম্মুখে বসিয়া একজন গৌরবর্ণ যুবক বিস্মিত হইয়া তাহার কলাকুশলতা লক্ষ্য করিতেছে। কুটীরখানি দেখিলেই বোধ হয় যে, উহা মৎস্যজীবর গৃহ। চারিদিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ জাল, কুটীরদ্বারে একরাশি শুষ্ক মৎস্য এবং নদীতীরে শুভ্র বালুকাসৈকতে দুই তিনখানি ক্ষুদ্র নৌকা পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে আর মনুষ্যের আবাস নাই। চারিদিকে বিস্তৃত জলরাশি ও স্থানে স্থানে হরিদ্বর্ণ কুঞ্জ। যুবতী অসিতাঙ্গী বটে,কিন্তু তথাপি সুন্দরী, তাহার সুগঠিত অবয়বগুলি দেখিলে বোধ হয়, কোন নিপুণ শিল্পী কৃষ্ণমর্ম্মর প্রস্তর খুদিয়াতাঁহাকে গড়িয়া তুলিয়াছে। যুবতী গ্রীবা বাঁকাইয়া মনোহর ভঙ্গী করিয়া দুইহাতে জাল বুনিতেছিল, এবং এক একবার ঈষৎ হাস্য করিয়া সতৃষ্ণনয়নে তাহার সঙ্গীর দিকে চাহিতেছিল। সে দৃষ্টির অর্থ আর কিছুই হইতে পারে না, তাহার অর্থ – অসহ্য তৃষ্ণা, অদম্য আকাঙ্খা এবং হৃদয়ের নিদারুণ অব্যক্ত যন্ত্রণা। সঙ্গী তরুণ যুবক, বয়ক্রম বিংশতি বর্ষের অধিক হইবে না, কিন্তু তাহার রূপ অপরূপ। তেমন রূপ কখনও ধীবর কৈবর্তের গৃহে দেখা যায় না। তরুণ তপনতাপে বিকশিত তামরসের অন্তরাভার ন্যায় তাহার বর্ণ অনির্বচনীয়, মলিনবসনে ধূলিশয্যায় তাঁহাকে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় দেখাঁইতেছিল।"[৬]

আবার এই স্থানই কখনো রাখালদাসের ঐতিহাসিক উপন্যাসে কোনো কোনো চরিত্রের মনের ভাব প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর ঐতিহাসিক কথা-আখ্যানে এই স্থান কখনো চরিত্রের ভাব প্রকাশের সহায়ক, আবার কখনো সরাসরি চরিত্রের ভাবপ্রকাশক রূপে বর্ণিত। তবে রাখালদাসের উপন্যাসের মূল লক্ষ্য যেহেতু প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও স্বদেশ প্রেমের আত্মরসে উদ্দীপিত, তাই তাঁর উপন্যাসে চরিত্রের বিকাশ সেভাবে বিকশিত হয়নি। তবুও তিনি যথেষ্ট কৌশলের সঙ্গে স্থানের সাথে চরিত্রের সংস্থান নির্মাণ করেছেন একজন শক্তিশালী লেখকের মতো।

২

ঐতিহাসিক উপন্যাসের আখ্যানকাল সাধারণত হয়ে থাকে লেখকের পূর্ববর্তী নির্ধারিত কোনো সময়কাল। যেমন, বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের কাহিনিকাল হল মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময়কাল, আবার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গৌড়মল্লার' উপন্যাসের সময়কাল শশাঙ্কের মৃত্যু পরবর্তী কুড়ি বছর অর্থাৎ ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী। তেমনি রাখালদাসের ঐতিহাসিক উপন্যাসের সময়কাল কথনকাল অপেক্ষা প্রাচীন। যেমন, প্রাচীন গুপ্ত সাম্রাজ্য নিয়ে রচিত 'সমুদ্রগুপ্ত', 'শশাঙ্ক', 'করুণা' ও 'ধ্রুবা' অন্যদিকে পালবংশের ইতিহাস নিয়ে রচিত 'ধর্মপাল' আবার মোঘলসাম্রাজ্যের শেষ সময়ের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, 'লুৎফ-উল্লা' ও 'অসীম' উপন্যাস দুটিতে। অর্থাৎ তাঁর উপন্যাসের কাহিনিকাল বাচনে সময়ের সাথে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। সেক্ষেত্রে, একজন দক্ষ ঔপন্যাসিকের গুণ হল, সমকালের আদর্শে আখ্যানে, (চরিত্র-স্থান-ঘটনার) সংস্থান সামঞ্জস্য প্রতিবিধান করা। রাখালদাসের সে গুণ ছিল। তিনি তাঁর উপন্যাসে যে কালের কাহিনি বলেছেন, সেকালের সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্মের সামঞ্জস্য রেখেই বাচনে তাঁর আখ্যানের 'কনটেন্ট' ও 'এক্সপ্রেশন' নির্মাণ করেছেন। সেক্ষেত্রে স্থান-সংস্থান একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে তাঁর উপন্যাসে। কারণ, আমরা জানি, স্থান আখ্যানে নিতে পারে সময়-নির্দেশকের ভূমিকা। যেমন, ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ি আর যন্ত্রে টানা ট্রামগাড়ি একসময়ের নয়। ল্যাম্পপোস্টে গ্যাসের আলো আর বৈদুতিক আলো একসময়কে প্রকাশ করে না। যে-সকল গল্প-উপন্যাসের কাহিনিতে বার্তা পাঠাতে টেলিগ্রাফ ব্যবহার হয়, আর যেখানে ই-মেলকে ব্যবহার করা হয় তা একসময়কে নির্দেশ করে না। যে গল্প উপন্যাসগুলি ইতিহাস-আশ্রিত বলে চিহ্নিত করা হয় সেখানে স্থানকে সময়-নির্দেশক করার ক্ষেত্রে লেখকের বাড়তি সচেতনতা থাকে।সে সচেতনতা রাখালদাসের ছিল। কাহিনিকাল যে সময়ের পটভূমির উপর স্থাপিত, স্থানিক বর্ণনাও তাঁর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্বাসনির্ভর করে তুলতে পেরেছিলেন রাখালদাস তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসে। কয়েকটা উদাহরণ তাঁর উপন্যাস থেকে তুলে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে, -

"বর্তমান পাটনা নগরের যে-অংশে এখন মহারাজখন্ড নামে পরিচিত, ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে সেই অংশ লিচ্ছবিপুর নামে বিখ্যাত ছিল। তখন পাটালিপুত্র নগরের সমস্ত ধনাঢ্য

ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই লিচ্ছবিপুরে বাস করিতেন। গঙ্গা ও শোণ সঙ্গমের পূর্বকূলে মৌর্যবংশীয় সম্রাটদিগের বিশালপ্রাসাদে তখন মথুরার শকবংশীয় রাজার সেনাপতি ও শাসনকর্তা মহাক্ষত্রপ উপাধিধারী একজন সম্ভ্রান্ত শকও বাস করিতেন। পুরাতন দুর্গ ও প্রাসাদের সীমার মধ্যে শকগণ ভারতবর্ষীয় কোনো লোককে প্রবেশ করিতে দিত না, - বাস করা তো দূরের কথা। সেই জন্যই সম্ভ্রান্ত সম্পন্ন অধিকাংশ ভারতবাসী লিচ্ছবিপুর নামক পাটালিপুত্রের উপনগরে আবাস নর্মাণ করিয়াছিলেন।’’[৭]

অর্থাৎ এই অংশের যে স্থানিক বর্ণনা আমরা পেলাম তাঁর সময়কাল বাচনে বলা আছে। এবং ইতিহাসের সাথে সাথে স্থানের সংস্থান রাখালদাস করে গেলেন প্রাচীন ইতিহাসের কালের ইঙ্গিতে।

একটি চিত্রের দ্বারা বিষয়টি স্পষ্টীকৃত করা গেল, -

[স্থান-কাল-ঘটনা-অ্যাক্ট্যান্ট]   [+কথক {+ নিরীক্ষক (+ অ্যাক্ট্যান্ট)}]

⇓ (কালের প্রমুখন)

বাচন

এমনি উদাহরণ পাই তাঁর সমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসে। অন্য একটি উদাহরণ তাঁর উপন্যাস থেকে তুলে দেওয়া গেল, -

> *“কুমারগুপ্তের সম্রাট-পদবী প্রাপ্তির কিয়ৎকাল পড়ে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম পাদের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে। ...পাটালিপুত্র তখনও উত্তরপথের রাজধানী। গঙ্গা ও শোণ-সঙ্গমে অবস্থিত বিস্তৃত নগর তখনও সমৃদ্ধশালী ছিল। সমুদ্রগুপ্তের পৌত্র কুমারগুপ্ত তখন বিস্তৃত গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, সমুদ্র হইতে সমুদ্র এবং হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্য সুশাসিত, শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ। সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পড়ে অর্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে, এখন আর্যাবর্তে ও দাক্ষিণাত্যে সর্বত্র গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণের প্রভাব অপ্রতিহত। চন্দ্রগুপ্তের সুদীর্ঘ রাজত্বের অবসানে পৌঢ় বয়সে কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কুমারগুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র স্কন্ধগুপ্ত তখন সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্ত শক রাষ্ট্রের মন্ডলেশ্বর।’’*[৮]

“তখন মোঘল সাম্রাজ্যের শেষ দশা। বাদশাহ মহম্মদ শাহ নামে মাত্র সম্রাট (১৭৪০-৫০)। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসন কর্ত্তারা প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে মুরশিদকুলী খাঁ তাঁহার জামাতা শুজাউদ্দীন খাঁকে রাজ্যভার দিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন (১৭২৭)। ... স্বাধীন হইলেও মোগল সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের

সুবাদাররা দিল্লীতে একজন প্রতিনিধি বা উকীল রাখিতেন। বাদশাহী দরবারে তখনও যাহা কিছু সামান্য কাজকর্ম্ম ছিল, তাহা এই উকীলরাই করিতেন।"[৯]

এছাড়াও আখ্যানের বাচনে ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসের কাহিনিকালকে ধরতে চান, তৎকালীন সমাজের ধর্ম-রাজনীতি, ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। যেমন, করুণা, শশাঙ্ক, কিংবা ধর্মপাল উপন্যাসগুলির কাহিনিকাল যে সময়ের, সেই সময় প্রাচীন বাংলায় হিন্দু-বৌদ্ধ সংঘাত একটি বিশেষ স্থান জুড়ে ছিল। তাই উপন্যাসের বাচনে সেই সংঘাত কিংবা বলতে গেলে উপন্যাসগুলির পরিণতও নির্ধারণ করেছে, এই হিন্দু-বৌদ্ধ সংঘাতের পটভূমি।

৩

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস মূলত চরিত্রকেন্দ্রিক। উপন্যাসের নামকরণেই তার ইঙ্গিত বর্তমান। 'হেমকণা' ও 'পাষাণের কথা' ছেড়ে দিলে বাকি সাতটি উপন্যাসেই চরিত্র নির্ভর। 'শশাঙ্ক' 'ধর্মপাল' 'ধ্রুবা', 'সমুদ্রগুপ্ত', করুণা', 'অসীম' ও 'লুৎফ-উল্লা'। বলাবাহুল্য, তাঁর উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণ একটি বিশেষ দিক দাবি করে। তবে আমার কাছে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের মনস্তাত্বাতিক দিক অপেক্ষা চরিত্র নির্মাণের গঠনগত দিক বেশি গুরুত্ব পেয়ে যায়। কীভাবে রাখালদাস তাঁর উপন্যাসে চরিত্রের সংস্থান করেছেন? কীভাবে তাঁর আখ্যানে একের পর এক চরিত্রকে প্রকাশ করেছেন? অবশ্যই সেক্ষেত্রে চরিত্রের মনস্তাত্বিক ও সংগঠনের আন্তঃর্ঘাতেই চরিত্রের প্রকাশ হবে।

কারণ, কথা-আখ্যনের 'কাহিনি' চরিত্র দ্বারাই বাচনে প্রকাশ পায়। চরিত্র আলোচনার একটি বিশিষ্ট দিক, তার মনস্তাত্বিক পাঠ ; তবে তা নিছক বিষয়-নির্ভর আলোচনার একটি বৈশিষ্ট্য মাত্র। সেক্ষেত্রে আখ্যানে কোনো চরিত্র সম্পর্কে আভাসে, ইঙ্গিতে, কিংবা বর্ণনার স্পটতায় যে পাঠ থাকে, তা থেকে বেশিরভাগ পাঠক সেই চরিত্রের সঙ্গে বাস্তবের প্রত্যক্ষ কোনো চরিত্রের অবয়ব খুঁজে নেন। কিন্তু আসলে তা তো নয় ! আখ্যানে চরিত্র সম্পর্কে যেটুকু বলা থাকে তা, 'হিমশৈলের নির্বাচিত উপরিভাগ মাত্র'। আসল অস্তিত্ব গল্প-উপন্যাসের তলায় নিহিত থেকে যায়। অর্থাৎ আমাদের বিবেচ্য হল, চরিত্রের সংগঠন। সেখানে চরিত্ররা 'কেমন' প্রশ্ন অপেক্ষা 'কীভাবে' প্রকাশ পাচ্ছে তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। একজন সংগঠনবাদীর কাছে আখ্যানের চরিত্ররা নিছক কথার নির্মাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। ফলত একটি চরিত্রের যা যা বৈশিষ্ট্য - তাঁকে আমাদের বাস্তবের দোষ বা গুণ বলে ধরা যাবে না। তার যাচাই করতে হবে শিল্পের বাস্তবে তার সংগতি-অসংগতিগুলির মাত্রার নিরিখে। এক্ষেত্রে বাচনে তিন পদ্ধতি অনুসরণ করে সাধারণত কথাকারেরা তাঁর কথা-আখ্যানে বিশ্বাসনির্ভর চরিত্রের সংস্থান করে থাকেন। সেগুলি হল, -

১. চরিত্রগত সংস্থান।

২. চরিত্র সম্পর্কে কথকের মনোভঙ্গি বা সরাসরি মন্তব্য সাজিয়ে।

৩. আখ্যানের কাহিনিতলের অন্তর্গত বিভন্ন চরিত্রের সংলাপ-ক্রিয়া ইত্যাদির সংসক্তি দ্বারা।

এই চরিত্রায়ন ঘটবে সাধারণত [+ কথক { + নিরীক্ষক (+ অ্যাক্ট্যান্ট)}] –এর কথন পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।

রাখালদাসের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতেও চরিত্রায়নের ক্ষেত্রে এই তিন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। চরিত্রের সংস্থানে ইতিহাসের পুনর্বিন্যাসে, চরিত্রগুলিকে ঐতিহাসিক রূপ দিতে। উপন্যাস থেকে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল, -

> *"রমণী যুবতী, তাঁহার যৌবন বর্ষার নদীর ন্যায় পূর্ণ, তিনি অসামান্যা সুন্দরী। বর্ণ কুন্দের ন্যায় শুভ্র, গঠন চিত্রের ন্যায় দোষশূন্য ও অতি মনোহর, কেশজাল ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ, চক্ষুদ্বয় নীলাভ, গন্ডস্থল ও ওষ্ঠদ্বয় স্বভাবতঃ রক্তাভ। তাঁহার অঙ্গে বহুমূল্য শ্বেত কৌষেয় বস্ত্র, সর্বাঙ্গে হীরকখচিত অলংকার, বয়স অষ্টাদশ বর্ষের অধিক নহে।"*[১০]

উক্ত উদাহরণে করুণার চরিত্রায়ণ ঘটেছে। এবং এখানে কথক-নিরীক্ষক তাঁর স্বামী ভানুমিত্রের চরিত্রগত সংস্থান নির্মাণ হয়েছে। অর্থাৎ, ভানুমিত্রের 'ফোকালাইজেশন' -এ করুণার চরিত্র বাচনে প্রকাশ লাভ পেল। এই উদাহরণটি চিত্রের সাহায্যে আমরা বুঝে নিতে পারি, -

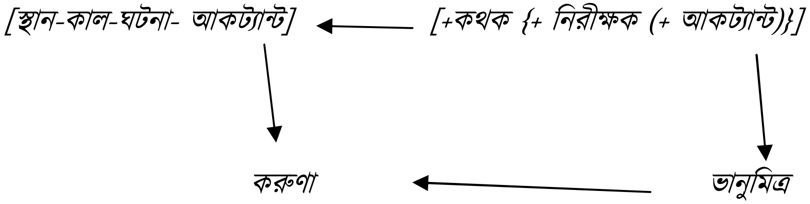

অর্থাৎ বাচনে, এক আকট্যান্ট বা চরিত্র দ্বারা আরেক চরিত্রের সংস্থান নির্মিত হল। ফলে চরিত্রের প্রমুখন ঘটলো।

আবার, একটি আখ্যানে চরিত্রের সংস্থান গড়ে উঠতে পারে কথকের সরাসরি মনোভঙ্গি ও কাহিনিতলের অন্তর্গত বিভিন্ন চরিত্রের কথা-সংলাপের দ্বারা। তখন কখনো কথকের নিরীক্ষণ, আবার কখনো চরিত্রের নিরীক্ষণ উদ্‌ভাসিত হয়ে দুইয়ের আঃন্তর্ঘাতে গড়ে উঠতে থাকে আখ্যানের আরেক চরিত্র। রাখালদাসের 'সমুদ্রগুপ্ত' উপন্যাসে এই ধরণের চরিত্র নির্মাণের কৌশল অতিমাত্রায় লক্ষ্য করা যায়।

"বিষম বিপদে ফেললে ঠাকুর। মনুয়ার মা বেটি বুড়িকে যতই মিষ্ট কথা বলি সে ততই দাঁত খিঁচিয়ে আসে।"[১১]

উক্ত উদাহরণে নিরীক্ষণ লক্ষ্যণীয়, যে গনপতি অর্থাৎ কাহিনির ভিতরে অবস্থিত চরিত্রের দ্বারা বা সংলাপে আরেক চরিত্রের (মনুয়ার মা) স্বভাব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাচ্ছে।

আবার উপন্যাসে কথকের মন্তব্য দিয়েও কোনো কোনো চরিত্রের অবয়ব কিংবা চারত্রিক সংস্থান ঘটিয়েছেন রাখালদাস তাঁর 'সমুদ্রগুপ্ত' উপন্যাসে।

> *"তুমি কি বলছ গণপতি, আমি তো কিছুই বুঝিতে পারছি না। কচি লাউ, একদিনের লাউ, গড়িয়ে পড়েছে কী? এই লাউটা তুলতে তুমি ছাদের উপর গিয়ে ধস্তাধস্তি করলে...। কচি লাউটা তুলতে গেলে কেন বলো দেখি? যদি ছিঁড়ে থাকো তা হলে বোঁটা ধরে সাবধানে নামিয়ে নিয়ে এস। ... গণপতি তুমি পাগল হলে নাকি? লাউ-এর বোঁটা নেট, কী যে বলো। আজ্ঞে এটি বৌদ্ধ-লাউ কিনাতাই বোঁটা নেই, এই জাতের লাউগুলো রাত্রি কালে বড়ো বাড়ে।"*[১২]

উক্ত উদাহরণে চরিত্র প্রকাশে দুই রীতিই বেশ স্পষ্ট। একদিকে দুই চরিত্রের ক্রিয়া-সংলাপে ও অন্য দিকে কথকের মনভাবনায় প্রকটিত হতে থাকছে অন্য একটি চরিত্র। উপন্যাসে যিনি একজন বৌদ্ধ কাপোতিক সঙ্ঘারামের আচার্য। নাম ত্রিশরণ। উপন্যাসে যেমন বৌদ্ধদের শত্রু রূপে অঙ্কিত করা হয়েছে ; রাখালদাসের গবেষণা সূত্রে জানা, তিনিও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষদের প্রাচীন বাংলার রাজতন্ত্রের বিনাশকারী জাতি বলেই চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন।
বিষয়টি চিত্রের দ্বারা বুঝে নেওয়া যায় এভাবে।

[স্থান-কাল-ঘটনা- আকট্যান্ট] ← *[+কথক {+ নিরীক্ষক (+ আকট্যান্ট)}]*

↙ ↓ ↘

(ত্রিশরণ)(রাখালদাস)(গণপতি + গৃহস্বামিনী) ← ←

নিরীক্ষণ লক্ষ্যণীয় : (রাখালদাস + কাহিনিতলের অন্তর্গত দুই চরিত্র দ্বারা ত্রিশরণ চরিত্রের সংস্থান নির্মিত হচ্ছে, এবং বাচনে ত্রিশরণ চরিত্রটি প্রকাশিত হচ্ছে।)

শেষের কথা :

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির নিরিখে বাচনস্তর সম্পর্কিত আলোচনায় 'স্থান-কাল-পাত্র-ঘটনা' নির্ধারণে সংস্থানের দ্বারা বাচনে 'ইতিহাসের পুনঃনির্মাণ' কীভাবে প্রকাশলাভ করেছে তার আলোচনায় উক্ত প্রবন্ধে এতক্ষণ ধরে করা হল। উপন্যাসের সংগঠন যেহেতু, লেখকের বাচনকৌশলের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, সেক্ষেত্রে লেখকের গদ্যগত শৈলী বিভাজন উপন্যাসের বাচনস্তরে প্রকাশ পায়। তখন তাঁর রচিত আখ্যান (উপন্যাস) হয়ে ওঠে শৈলী বনাম সংগঠনের আন্তঃর্ঘাতে বাচনে পুনর্বিন্যাস বা পুনঃনির্মিত কাহিনির স্বতঃপ্রকাশ। রাখালদাসের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির বিচারে তাই বাচনস্তরের একটি ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী উপাদান 'সংস্থান' বিন্যাসের আলোচনা ক'রে বা ধারণা নিয়ে, উক্ত প্রবন্ধে দেখাতে চাওয়া হয়েছে, তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের পরতে পরতে কাহিনিকাল কীভাবে

লেখকের নিরীক্ষণে (focalization) পুনঃনির্মিত ইতিহাস হয়ে উঠছে উপন্যাসের বাচনস্তরে (discourse stage)।

তথ্যসূত্র :

১. আমিতাভ দাস, আখ্যানতত্ত্ব, ২০১৯, পৃ. ৪২

২. আমিতাভ দাস, আখ্যানতত্ত্ব, ২০১৯, পৃ. ৩১

৩. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক (উপন্যাস), পৃ. ১০৯

৪. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ময়ূখ (উপন্যাস), পৃ. ০৪

৫. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুবা (উপন্যাস), পৃ. ১২

৬. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক (উপন্যাস), পৃ. ১৭৬

৭. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমুদ্রগুপ্ত (উপন্যাস), কাঁসাই-শিলাই/এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০০৫, পৃ. ৩১০

৮. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা (উপন্যাস), পৃ. ৩১০

৯. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, লুৎফ-উল্লা (উপন্যাস), পৃ. ১৭

১০. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা (উপন্যাস), পৃ. ৩০৭

১১. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমুদ্রগুপ্ত (উপন্যাস), কাঁসাই-শিলাই/এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০০৫, পৃ. ৩১০

১২. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমুদ্রগুপ্ত (উপন্যাস), কাঁসাই-শিলাই/এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০০৫, পৃ. ৩১৪

গ্রন্থপঞ্জি :

গুপ্ত, ক্ষেত্র। *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)*। কলকাতা : গ্রন্থনিলয়। ২০১৫

চক্রবর্তী, অলোক। *আখ্যানের তত্ত্বভুবন।* কলকাতা : আশাদীপ। ২০২১

চৌধুরী, কমল। সম্পাদিত। *রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাস চিন্তা।* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং। ২০১৫

দত্ত, বিজিত। *বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস।* কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ

দাস, আমিতাভ। *আখ্যানতত্ত্ব*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং। ২০১৯

- *আখ্যানতত্ত্বের সীমা।* আমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত বিশ্বভারতী পত্রিকা। জুলাই-ডিসেম্বর সংখ্যা। ২০০৯

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক। *রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)।* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। ২০০১

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক। *রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)।* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। ১৯৯৩/বি

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস। *ধ্রুবা।* কলকাতা : মর্ডান কলাম। ১৯৬৩
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস। *লুৎফ-উল্লা।* কলকাতা : মর্ডান কলাম। ১৯৭০
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস। *পাষাণের কথা।* কলকাতা : মর্ডান কলাম। ১৯৬৭
মজুমদার, রমেশচন্দ্র। *বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)।* কলকাতা : জেনারেল। ২০১৪
সুর, অতুল। *আঠারো শতকের বাংলা ও বাঙ্গালী।* কলকাতা : সাহিত্যলোক। ২০১৬
Carr, David. *Time, Narrative and History.* Indiana University Press. Bloomington/ Indianapolis. 1991
Dijk, Tenna Van (Ed). *Discourse and Literature,* John Benjamins Publishing company. Amsterdam/Philadelphila. 1995
Fowler, R(ed), *Style and Structure in Literature.* Oxford, Basil Blackwell. 1975
Genett, Gerard. *Narrative Discourse : An Essay in Method.* Cornell University Press. Ithaca & New York. 1983
Genett, Gerard. *Narrative Discourse : Revisited.* Cornell University Press. Ithaca & New York. 1988
Lukacs, Georg. *The Historical Novel.* Trans, Hannah and Stanley Mitchell. Penguin Books. 1969
Todorov, Tzvetan. *The place of Style in the Structure of the Text. In S. chatman (ed) Literary Style : A Symposium.* London & New York. Oxford University Press. 1971

রবীন্দ্রনাথের নাটকে সঙ্গীতের ভূমিকা : অচলায়তন ও মুক্তধারা

অনিন্দিতা শেঠ
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারমর্ম: রবীন্দ্রনাথের নাটকে যে অন্তর্লীন ব্যঞ্জনা থাকে সঙ্গীতের মাধ্যমে তা সুচারু রূপে প্রকাশিত হওয়ার অবকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' ও 'মুক্তধারা' এই রূপক সাংকেতিক নাটকগুলিতে ঘটনাক্রমের অগ্রগতি ব্যখ্যা করতে কিংবা গভীরতম অনুভূতি প্রকাশ করতে সঙ্গীত একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই বিষয়টিকে আমার প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হল।
সূচক শব্দ: নাটক, সঙ্গীত, রচনা, সংলাপ, নাট্যকাহিনী।

মুল আলোচনা: রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত কবি। রবীন্দ্রনাথের শিল্প-সাহিত্যের যেকোনো শাখা নিয়ে চর্চা বা বিশ্লেষণের গোড়াতেই একটা বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রপ্রতিভা মূলত গীতধর্মী। সেইজন্য তাঁর গল্প, উপন্যাস যেমন কাব্যধর্মী হয়েছিল, তার নাটকগুলিও তেমনি কাব্যাশ্রয়ে গঠিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের নাটকে ঘটনার ঘনঘটা নেই, তার নাটকে ঘটনার আবর্ত যুদ্ধবিগ্রহ কিংবা জীবনের দ্বন্ধ সংঘাত তেমন নেই কিন্তু তাঁর নাটক গীতোচ্ছ্বাসময়, গীতিকবিতার আবেগে রঞ্জিত। রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যগুলির কথা এ প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করে উল্লিখিত হয়ে থাকে একথা ঠিকই কিন্তু তাঁর লোকাশ্রিত নাটক বা গদ্যনাটকগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়। এই নাটকগুলিতেও সঙ্গীত বহুলতা ও নাটকের নাট্যমূল্য বৃদ্ধিতে গানের প্রয়োগের চিন্তাভাবনা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গীতধর্মী মানসকেই চিহ্নিত করে। এই গানগুলির মধ্যে কিছু গান নাটকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং কিছু গান স্বতন্ত্র রবীন্দ্রগান হিসেবেও গেয়। তাই রবীন্দ্রনাথের নাটক নির্মাণে গান ও নাট্য-কাহিনী নির্মাণের দ্বৈত শাসনে নাটকগুলি হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র, কালজয়ী এবং বাংলা থিয়েটারি আবেগের প্রভাবমুক্ত।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যের ঊষা লগ্ন থেকে একেবারে অন্তিমকাল পর্যন্ত সঙ্গীতের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যা সংলাপে বহিঃপ্রকাশ ঘটে না ঠিক ততটা, সেটি গানের মধ্য দিয়ে শ্রোতার হৃদয়ের এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথের গীতিপ্রধান নাটক বা গীতিনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১), 'কালমৃগয়া' (১৮৮২), 'মায়ার খেলা'-য় সঙ্গীতের গুরুত্ব যেমন প্রাধান্য পেয়েছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ত্বমূলক নাটক, কাব্যনাট্য ও রূপক সাংকেতিক নাটকেও সঙ্গীত অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে খুব অন্তর্লীনভাবেই নাটকে উচ্চারিত হচ্ছে 'আত্মনিবেদন,

প্রেমের উদ্বোধন এবং প্রাণের জাগরণ'-এর মন্ত্রগুলি। মোটামুটিভাবে বিংশ শতকের প্রথম দশকের শেষদিকে রবীন্দ্রনাট্যের অভিমুখ পরিবর্তিত হয় এবং ক্রমশঃ ঋতুনাট্য এবং সংকেতধর্মী নাট্যসৃষ্টির দিকে গুরুদেব মনোনিবেশ করেন। এইসব সাংকেতিক তত্ত্বনাটকগুলিতে শিল্পের আবরণে ধর্ম, প্রেম, মানবচেতনা, সমাজচেতনা সম্পর্কে কবির সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা গেল। রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা যতই পরিণতির দিকে ধাবমান হয়েছে ততই নাটকে গানের প্রয়োগও বৃদ্ধি পেয়েছে। নাটকের তত্ত্বচিন্তা বা মুল বক্তব্যকে গানের সাহায্যে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন গুরুদেব। সেইজন্য এই নাটকগুলি আরো হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে প্রভু গুহঠাকুরতা মন্তব্য করেছেন :

> "It is essentially the musical qualities, which distinguish his dramatic genius."

আবার ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন – "Tagore's musical compositions cannot but help the drama because of the very nature and, nurture of his genius."

বাংলা নাটকে ঐতিহ্যের ধারাকে নিজের নাটকে ধরে রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাই তাঁর নাটকে গানের ব্যবহার বহুল পরিমাণে হয়েছে। বিশেষত সুরহীন কথার তুলনায় গানের প্রতি তাঁর আস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশ্য সবসময় যে শুধু নাটকের প্রয়োজনেই গান রচিত হয়েছে এমন নয়। কখনও কখনও 'জনরুচির দায়ে'-ও এই গান রচনা করেছেন। আবার তিনি এই গানের পথ ধরেই শ্রোতৃচিত্ত আর রবীন্দ্রমানসের সেতুবন্ধটি রচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির চরিত্রচিত্রণ, ঘটনার পারম্পর্য রচনা, সংলাপ রচনা, পরিণতি ও সৃজন – নাট্যরীতির এই চিরাচরিত পথ ধরে চললেও তার রসগ্রহণের মাত্রাকে নাটকের রস ও রসায়নের আবেদনকে সংবেদনশীল স্তরে টেনে নিয়ে গিয়েছে তাঁর গান। 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধে গুরুদেব মন্তব্য করেছেন –

> "...................... ভাষার তো হৃদয়ের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ নাই, তাহাকে মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়.... তাহাকে বুঝিতে অর্থ করিতে অনেকটা সময় যায়। কিন্তু সংগীত একেবারে এক ইঙ্গিতেই হৃদয়কে আলিঙ্গন করিয়া ধরে।
>
> এইজন্য কবিরা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে একটা সংগীত নিযুক্ত করিয়া দেন..... ছন্দে এবং ধ্বনিতে যখন হৃদয় স্বতই বিচলিত হইয়া উঠে তখন ভাষার কার্য অনেক সহজ হইয়া আসে..."

রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য, গদ্যনাট্য, ঋতুনাট্য এবং পুনর্লিখিত বা রূপান্তরিত নাটক মিলিয়ে প্রায় অর্ধশত নাটক রচনা করেছেন। নাটক নিয়ে তার ভাবনাচিন্তা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকেও একথা বোঝা যায় যে, নিজের নাটককে তিনি

নৃত্য, গীত, সংলাপ, ছন্দবৈচিত্র্য, চিত্রকল্প, কাব্যগুণ, পরিবেশন, মঞ্চসজ্জা – সকল দিক থেকেই পূর্ণতম রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছেন।

> "নাট্যাভিনয়ে আমাদের হৃদয় বিচলিত করিবার অনেকগুলি উপকরণ একত্রে বর্তমান থাকে। সংগীত, আলোক, দৃশ্যপট, সুন্দর মঞ্চসজ্জা, সকলে মিলিয়া নানা দিক হইতে আমাদের চিত্তকে আঘাত করিয়া চঞ্চল করে; তাহার মধ্যে একটা অবিশ্রাম ভাবস্রোত নানা মূর্তি ধারণ করিয়া, নানা কার্যরূপে প্রবাহিত হইয়া চলে – আমাদের মনটা নাট্যপ্রবাহের মধ্যে একেবারে নিরুপায় হইয়া আত্মবিসর্জন করে এবং দ্রুতবেগে ভাসিয়া চলিয়া যায়। অভিনয়স্থলে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন আর্টের মধ্যে কতটা সহযোগিতা আছে, সেখানে সংগীত, সাহিত্য, চিত্রবিদ্যা এবং নাট্যকলা এক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সম্মিলিত হয়, বোধহয় এমন আর কোথাও দেখা যায় না"। (পঞ্চভূত, গদ্য ও পদ্য)

রবীন্দ্রনাটকে গানের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কতখানি সেই আলোচনায় প্রবেশ করতে গেলে সর্বাগ্রে ঋতুনাট্যের কথাই এসে পড়ে ঠিকই কিন্তু এই নিবন্ধে আমরা পরিক্রমণ করব তাঁর নাট্যে বিবর্তনের পথটিকেও – 'অচলায়তন' ও 'মুক্তধারা' – এই দুই নাটকের আলোচনায় একাধারে সম্পূর্ণ হয় রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটকের বৃত্তীয় পরিধিটি।

অচলায়তন - 'অচলায়তন' (১৯১২) নাটকটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৩১৮) প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ১৭ই শ্রাবণ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তন' নাটকটি নাম হিসেবে 'গুরু' নামটিকে পছন্দ করেছিলেন এর প্রমাণ মেলে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় :

> "প্রথমে যেদিন অচলায়তন নাটক পাঠ করেন, সেদিনই উহার নাম গুরু রাখিবার ইচ্ছা কবি প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু আমরা অচলায়তন নামটিকেই অধিক সমর্থন করাতে তাহাই বহাল থাকিয়াছিল"।

রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তন' এর পঞ্চক ও মহাপঞ্চক নাম দুটি এবং কাহিনির যৎসামান্য সূত্র সম্ভবত পেয়েছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' গ্রন্থের 'Story of Panchak' থেকে।

> অচলায়তন নাটকটি একটি তত্ত্বনাটক। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটকের মূল বিষয় মৌলিক দ্বন্দ্ব। এই মৌলিক দ্বন্দ্ব হল জড়ধর্মের সঙ্গে প্রাণধর্মের। জড়ধর্মের প্রাধান্য যতই হোক না কেন প্রাণধর্মের কাছে তার পরাজয় নিশ্চিত। এই তত্ত্বকেই রবীন্দ্রনাথ নাটকগুলিতে

বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত করেছেন। মানুষের তৈরী অর্জিত অন্ধ ও বিকৃত সংস্কার ও অনুশাসনগুলি বহুদিনের সমাজকে কিভাবে নাগপাশের সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছে তার স্বরূপ প্রকাশ করে সেখানে থেকে মুক্তির কথা বলেছেন অচলায়তন নাটকের মধ্য দিয়ে। 'অচলায়তন' নাটকের চরিত্রগুলি হল – পঞ্চক, মহাপঞ্চক, সুভদ্র, ছাত্রদল, বিশ্বম্ভর, সঞ্জীব, জয়োত্তম, বালকদল, তৃণাঞ্জন, উপাধ্যায়, আচার্য, উপাচার্য, শোনপাংশুদল, দাদাঠাকুর, রাজা, পদাতিক, দর্ভকদল।

রবীন্দ্রনাথ তিনটি অচলায়তনের কথা বলেছেন। যেমন – মহাপঞ্চকদের অনুগামীদের অনুশাসন, শোনপাংশুদের অচলায়তন, দর্ভকদলের অচলায়তন। এদের সাধনার পথও ভিন্ন এবং মুক্তির ঠিকানাও। এরা নিজস্ব পথে কেবল সাধনা করে বেরিয়েছে, অপরের সঙ্গে সমন্বয় সাধনার চেষ্টা করেনি, নিজের পথটাকেই এরা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছে এবং সকলেই গুরুকে খুঁজেছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ কেবল আচার সর্বস্বতার বিরুদ্ধে অভিযান করেননি মননের স্বাধীনতার তিনি প্রয়াসী যার একমাত্র উপায় হচ্ছে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের একত্র সমন্বয়। এই তিনটির সমন্বয় সাধনই তিনি চেয়েছেন।

অচলায়তন নাটকে গানের সংখ্যা ২২টি। নাটকে পঞ্চকের গান ১২টি, শোণপাংশুদলের গান ৫টি, দাদাঠাকুরের গান ২টি, দর্ভকদলের গান ৪টি, বালকদলের গান ১টি। অচলায়তন নাটকের ৬টি গান 'গুরু' তে নেওয়া হয়েছে। 'ঘরেতে ভ্রমর এল' গানটি 'অচলায়তন' নাটক ছাড়া 'তাসের দেশ' নাটকেও ব্যবহৃত হয়েছে। পঞ্চকের গান দিয়েই অচলায়তন নাটকের সূচনা।

'তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে
কেউ তা জানে না,
আমার মন কাঁদে, আপন-মনে,
কেউ তা মানে না'।

আচার-আচরণ সূত্রবৃত্তি পঞ্চক অচলায়তনের মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই মুখস্থ করতে পারে না। পঞ্চক অচলায়তনের একজন আবাসিক। পড়ার যত বইগুলোকে সে বিদায় দিলেই বাঁচে। নিয়ম ভেঙে সে গান শুরু করে। কারো কারো মতে সে নাকি অচলায়তনের 'দুর্লক্ষণ'। এই অচলায়তনের বন্ধনকে ছিন্ন করে তার মনে কেবল মুক্তির স্বাদ খুঁজে চলে।

'দূরে কোথায় দূরে দূরে
মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে'

সমগ্র নাটকে পঞ্চক সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ পঞ্চক চরিত্রকে জীবন্ত রূপে নির্মাণ করেছেন। অচলায়তনের দুর্বোধ্য ও নিরর্থক মন্ত্রোচ্চারণে সে কোনো উৎসাহবোধ করেনি। তার সতীর্থরা এই মন্ত্রোচ্চারণকেই প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের উপায়

বলে মনে করলেও পঞ্চকের কাছে তা মূল্যহীন। রবীন্দ্রনাথ একে মূর্খ বলেও অঙ্কন করেননি। কিন্তু সে প্রকৃত জীবনসত্যের সন্ধান পেয়েছিল। সে ছিল জীবনরসের রসিক। মহাপঞ্চক যখন পঞ্চককে সপ্তকুমারীগাথা পাঠের সময় মনে করিয়ে দিচ্ছে তখন পঞ্চক গেয়ে ওঠে –

'বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর,
কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর
কেউ তো হানে না'।

দ্বিতীয় দৃশ্যে পঞ্চকের গানে শোনপাংশুদল নেচে ওঠে -

'এ পথ গেছে কোন্‌খনে গো কোন্‌খনে-
তা কে জানে তা কে জানে'

শোনপাংশুদল মনের আনন্দে চাষ করে। কর্মোদ্যমের মধ্য দিয়ে তারা জীবনের জয়গান গেয়েছে –

'আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে'।

তৃতীয় শোনপাংশু বলেছে, তারা লোহার কাজ করে, তাই লোহাও তাদের কাজ করে। গানের মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ করেছে -

'কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন
ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে!
লক্ষযুগের অন্ধকারে ছিল সংগোপন,
ওগো, তায় জাগাইনু রে'।

পঞ্চক যেমন আচলায়তনের সহস্র বন্ধনের নিগড়ে আবদ্ধ অন্যদিকে শোনপাংশুদলের জীবন স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত। তাদের গুরু দাদাঠাকুর তাদের কোনো কাজেই নিষেধ করে না। পঞ্চক বলে – 'ভাই, তোরা সব কাজ করতে পাস? তোদের দাদাঠাকুর কিছুতেই তোদের মানা করে না?'

তখন শোণপাংশুগণের গান –

'সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।
বাধাবাঁধন নেই গো নেই।

প্রথম শোনপাংশু বলে, দাদাঠাকুর তাদের সব দলের শতদল পদ্ম। গানের মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ ঘটে এইভাবে -

'এই একলা মোদের হাজার মানুষ
দাদাঠাকুর।
এই আমাদের মজার মানুষ

দাদাঠাকুর'।

দাদাঠাকুরকে নিয়ে দিনরাত যে শোনপাংশুগণ মাতামাতি করে, এই দেখে পঞ্চকও তার সাথে নিরালায় বসে কথা বলবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

দাদাঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করে পঞ্চক যখন বলে – 'তোমার কাছে সবই বড়ো হয়ে গিয়েছে, তখন দাদাঠাকুর বলেন – 'না ভাই বড়ো হয় নি, সত্য হয়ে উঠেছে – সত্য যে বড়োই, ছোটোই তো মিথ্যা'। অর্থাৎ সংস্কারমুক্ত অনুশাসনহীন এক পরম সত্যের অনুসন্ধান পাওয়া যায় দাদাঠাকুর চরিত্রটির মধ্য দিয়ে সেটি পরিস্ফুট হয়েছে। পঞ্চক বলে – 'তুমি এমন করে মনটাকে উতলা করে দিলে – তারপর?' গানের মধ্য দিয়ে সেই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন দাদাঠাকুর –

'যা হবার তা হবে।
যে আমাকে কাঁদায় সে কি অমনি ছেড়ে রবে।
পথ হতে যে ভুলিয়ে আনে, পথ যে কোথায় সেই তা জানে,
ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাড়ায় সেই তো ঘরে লবে'।

অচলায়তনের কঠোর অনুশাসনের পথ থেকে সরে এসে দাদাঠাকুরের সান্নিধ্যে তার, 'মন খেপেছে', মন কেবল দাদাঠাকুরের কাছে আসতে চায়। তার কাছে পঞ্চকের আত্মনিবেদন –

'আমি কারে ডাকি গো
আমার বাঁধন দাও গো টুটে।
আমি হাত বাড়িয়ে আছি
আমায় লও কেড়ে লও লুটে'।

দাদাঠাকুরের সংস্পর্শে এসে পঞ্চকের মধ্যে এক সজীব প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। মুক্তির স্বাদ অনুভব করছে সে এবার। পঞ্চক বলেছে – 'এই মাটিকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করে'। তার গানে ধ্বনিত হয়েছে –

'আজ যেমন করে গাইছে আকাশ
তেমন করে গাও গো'।

অচলায়তনের উত্তরদিকের জানলা খোলার অপরাধে সুভদ্রকে দিয়ে মহাতামসব্রত করানোর সিদ্ধান্ত নেন মহাপঞ্চক এবং অন্যান্যরা। কিন্তু আচার্য অদীনপুণ্য এবং পঞ্চক এতে বাধা দেন। এইজন্য এদের দুজনকে দর্ভক পাড়ায় নির্বাসন করা হয়। দর্ভকপল্লীতে এসে পঞ্চক বলেছে 'এখনও মনটাকে তার খোলসের ভিতর থেকে টেনে বের করতে পারছি নে কেন'!

'এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে রে
তোরা আমায় বলে দে ভাই বলে দে রে'।

দর্ভকপল্লীতে পঞ্চক প্রবেশ করলে দেখা যায়, সেখানে দর্ভকদল নামগান করে।

'ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,

ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি!
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরাণের বঁধু!

অচলায়তনের দর্ভকপল্লীতে কোনো মন্ত্র নেই, তাই তারা গান গায় –

‘উতল ধারা বাদল ঝড়ে,
সকল বেলা একা ঘরে’।

সমগ্র নাটকে গুরুর জন্য যে প্রতীক্ষা দেখা গেছে, পঞ্চম দৃশ্যে দেখা যায় গুরু আসবার পূর্বে সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করা হয়েছে, গুরুকে একমাত্র দেখেছেন অচলায়তনের মালী ও শঙ্খবাদক। আসলে এই শঙ্খবাদক এবং মালী এরাই কেবল সুর সৌন্দর্যের সন্ধান করেছিল। অন্যরা সুস্থ জ্ঞান ও আচারের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। যারা মুক্ত জীবনের প্রতিষ্ঠাতে আবির্ভাব।

নাটকের শেষে দেখা যায়, নাটকে গুরু শোনপাংশুদের দাদাঠাকুর যোদ্ধৃবেশে শোনপাংশুদের সহায়তায় অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে অচলায়তনিকদের জ্ঞানকে তন্ত্রমন্ত্রের ও ক্রিয়াকর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করে অসীমের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দিলেন। এই দাদাঠাকুরই অচলায়তনিকের গুরু রূপে পঞ্চককে ভাঙা ভিতের উপর জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে আহ্বান জানিয়ে ধর্মমন্দির প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিলেন। ক্রমে অচলায়তন জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির যোগে আনন্দ নিকেতন পরিণত হল। এইভাবেই ‘অচলায়তন’ নাটকের গানগুলি নাট্যিক প্রয়োজন সিদ্ধ করে, নাট্যকারের অভিপ্রায়কে শৈল্পিক পূর্ণতা দিতে পেরেছে।

মুক্তধারা – ‘মুক্তধারা’ (১৯১২) নাটকটি ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩২৯) প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপরেই মুক্তধারা ১৩২৯ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখাকেই ভেঙে গড়ে বারবার নতুন রূপে উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রেও দেখা যায় নাটকের পূর্বসূত্র ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নাটকেও অনুভব করা যায়। নাটকটিকে তিনি প্রথমে ‘পথ’ নামে অভিহিত করেছিলেন। রাণু অধিকারীকে এক পত্রে (৪ মাঘ, ১৩২৮) তিনি লিখেছিলেন – “আমি সমস্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখছিলুম – শেষ হয়ে গেছে, তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নয়, এর নাম পথ। এতে কেবল প্রায়শ্চিত্ত নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই’ - শুধু চরিত্র নয়, ভাবনায় ও উপস্থাপনায় মুক্তধারা একটি অভিনব নাট্যপ্রয়াস।

মুক্তধারা নাটকে উগ্রজাতীয়বাদ, পররাজ্যলোলুপ, রাষ্ট্রনীতি এবং যন্ত্রসভ্যতার আস্ফালন নগ্নভাবে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ যন্ত্র-সভ্যতার ঊর্ধে প্রাণসত্তাকেই স্থান দিয়েছেন। প্রকৃতির উপর অত্যাচার করলে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেয়। মানুষের তৈরি যন্ত্রের অহংকারকে ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও যন্ত্র যদি মনুষত্বের অনুকূল না হয় তবে তার ধ্বংসই কাম্য। রবীন্দ্রনাথ ‘মুক্তধারা’ নাটকে এই কাম্যতাকেই

শিল্পরূপ দান করেছেন। সমগ্র নাটকটি পথে সংঘটিত হয়েছে। এই নাটকের কোন অঙ্ক এবং দৃশ্য বিভাজন নেই। মুক্তধারা নাটকে মোট সংগীত রয়েছে ১৪টি। এর মধ্যে আবার ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান ১১টি, বাউলের গান ১টি আর জনসাধারণের এবং ভৈরবপন্থীদের গান রয়েছে ১টি – যা আংশিক বা সমগ্রভাবে মোট আটবার গীত হয়েছে। এই নাটকের দ্বন্ধ কল্যাণের সঙ্গে অকল্যাণের। ভৈরব এই নাটকে কল্যাণের প্রতিভূ। তিনি প্রয়োজনে অকল্যাণকে ধ্বংস করেও কল্যাণকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। লক্ষ্যণীয় গানগুলি নাটকের নাটকীয় ভাবনার সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ করে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, নাটকের সূচনায় গানে বলা হল –

‘জয় ভৈরব! জয় শংকর...
জয় সংশয়ভেদন
জয় বন্ধনছেদন
জয় সংকটসংহর’।

আবার নাটকের সমাপ্তিতেও ভৈরবপন্থীদের গান ব্যবহৃত হয়েছে –

‘রুদ্র শূলপাণি
মৃত্যুসিন্ধুসন্তর
শংকর শংকর’!

এরই বিপরীতে অবস্থান বিভূতি আর তার যন্ত্রের প্রয়োগের। এই নাটকে যন্ত্র মূর্তিমান অকল্যাণের মতোই প্রযুক্ত হয়েছে। নাটকে ভৈরবপন্থীদের গানের পরেই উত্তরকূটবাসীরা বিভূতিকে সম্বর্ধনা করে যন্ত্রের জয়গান করেছে। গানটি এইরকম –

‘নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র
তুমি চক্রমুখরমন্দিত, তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত’

এই গানের দ্বারা নাটকের মূল দ্বন্ধটিও প্রকাশ পেয়েছে।

এই নাটকের আর একটি গান গীত হয়েছে বাউলের কন্ঠে। বিজয়পাল যুবরাজ অভিজিৎকে রাজশিবিরে ডেকে পাঠালেন তাকে বন্দী করবার গোপন অভিপ্রায় নিয়ে। রাজকুমার সঞ্জয়ও বিপদের অনুমানে তার সঙ্গে যেতে চাইছিলেন। এর আগে নাটকে দেখা গেছে যে, অভিজিৎ একদিকে রাজপরিবার থেকে মানসিকভাবে দূরবর্তী হয়ে পড়ছেন। রাজকুমার এতে মানসিক বেদনা অনুভব করছেন। তার আত্যন্তিক ইচ্ছা যুবরাজকে ভালোবাসার বাঁধনে বেঁধে রাখার। কিন্তু বৃহত্তর সত্যের প্রতিষ্ঠায় সেটি হওয়ার নয়। তাই নাটকে বিজয়পাল যুবরাজকে নিয়ে যাওয়া মাত্রই বাউলের গান সঞ্জয়কে যেন যুবরাজের বিষয়ে মুক্ত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। গানটি হল –

‘ও তো আর ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না রে।
ঝড়ের মুখে ভাসল তরী, কূলে আর ভিড়বে না রে’।

নাটকের বাকি একাদশটি গান গীত হয়েছে ধনঞ্জয় বৈরাগীর কন্ঠে। এই বাউল বা বৈরাগী চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রূপক–সাংকেতিক নাটকগুলিতে শুদ্ধ বিবেকের

প্রতীকের মতো ব্যবহার করেছেন। ধনঞ্জয় এই নাটকে অত্যাচারিতের আত্মশক্তি স্বরূপ। রাজার সঙ্গে শিবতরাইবাসীকে সে এই মন্ত্রেই দীক্ষা দিতে চায়। আবার, রাজার বিরুদ্ধেও তার এই অস্ত্র। মানুষকে জাগাবে সে এই তার পণ। নাটকে তার কণ্ঠে প্রথম গানে তার এই অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গানটি হল –

'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব
বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয়-ভাঙা এই নায়ে।
মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে
ছেঁড়া পালে বুক ফুলিয়ে'

তার কণ্ঠে দ্বিতীয় যে গানটি শোনা যায় তা হল –

'আরো আরো প্রভু, আরো আরো।
এমনি করেই মারো মারো।
লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,
ভয়ে ভয়ে কেবল তোমায় এড়াই
যা-কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো'।

শিবতরাইয়ের মানুষদের আত্মবলহীনতা ও ধনঞ্জয়ের উপর তাদের আত্যন্তিক নির্ভরতার প্রেক্ষিতে ধনঞ্জয় তাদের এই আত্মশক্তি উদ্বোধনের গানটি গেয়ে শুনিয়েছে।

তৃতীয় গান –

'ভুলে যাই থেকে থেকে
তোমার আসন-পরে বসাতে চাও
নাম আমাদের হেঁকে হেঁকে'।

এখানে ধনঞ্জয় শিবতরাইয়ের প্রজাদের বোঝাতে চেয়েছে রাজত্ব একা রাজার নয়। প্রজারাও একইভাবে রাজত্বের অংশীদার। যে রাজা সেকথা মানেননা, রাজা–প্রজায় এত অধিকার ভেদ করেন, অন্যায়ভাবে প্রজাদের স্বাভাবিক অধিকার খর্ব করেন তিনি প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিধাতার বিধানকেই লঙ্ঘন করেন। বিশ্ববিধাতা যিনি তিনি কিন্তু সব মানুষের মনুষ্যত্বকে সমান অর্থে প্রযুক্ত দেখতে চান। ধনঞ্জয় গণেশকে লক্ষ্য করে তার এই গানে সেই কথাই বোঝাতে চেয়েছে।

চতুর্থ গান,

'আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন,
সে কি অমনি হবে?'

এই গানে ধনঞ্জয় রাজার শাসনের ভয়কে জয় করবার কথা শোনাচ্ছেন। বলের দ্বারা জয় সেখানে আসবে না। বরং রাজা প্রেমের দ্বারা নিজের হৃদয়কে যদি রাঙিয়ে তুলতে

পারেন তবেই তাতে বিশ্বভুবন তার বশ হবে। প্রীতির বল বাহুবলের তুলনায় অনেক শক্তিশালী,

‘কে আমারে ভরসা করে আনতে আপন বশে?
সে কি অমনি হবে?

ধনঞ্জয়ের পঞ্চম গান-

‘আমারে পাড়ায় পাড়ায়
খেপিয়ে বেড়ায়
কোন্ খ্যাপা সে!’

এই গান ধনঞ্জয় গেয়েছে রাজার সামনে। রাজা যখন ধনঞ্জয়কে প্রশ্ন করেন যে ধনঞ্জয় প্রজাদের খাজনা না দেওয়ার জন্য খেপিয়েছে কিনা, তার উত্তরে ধনঞ্জয় এই গান করে। ধনঞ্জয়ের এই গানে বৃহত্তর জগতের ব্যাপ্তির প্রতি ইঙ্গিত আছে। রাজার সংকীর্ণ চিন্তার ঊর্ধে ধনঞ্জয় তার ব্যাপ্তির ভাবনাকে স্থাপন করেছে -

‘ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কী যে বাজায় কোন্ বাতাসে’।

ষষ্ঠ গান, রাজার হুকুম জারির বিরুদ্ধে। রাজার শাসনের ঊর্ধে যে বিশ্ববিধাতার শাসন সেই কথা রাজাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ধনঞ্জয় –

‘রইল বলে রাখলে কারে?
হুকুম তোমার ফলবে কবে?
টানাটানি টিকবে না ভাই,
রবার যেটা সেটাই রবে’।

রাজার বাহুবল, যাকে রাজা মনে করছেন অজেয়, তা সে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, ধনঞ্জয় সেই কথাই বলতে চেয়েছে। ধনঞ্জয় রাজাকে সচেতন করে দিয়েছেন এই বলে যে, রাজা যেটা না চান, এই জগতে তাও ঘটবে -

‘ভাবছ হবে তুমি যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,
দেখবে হঠাৎ নয়ন মেলে
হয় না যেটা সেটাও হবে’।

ধনঞ্জয়ের সপ্তম গান -

‘তোর শিকল আমায় বিকল করবে না’।

রাজা যখন বৈরাগীকে বন্দী করে রাখার প্রস্তাব দেন, তখন রাজার শাস্তি যে ধনঞ্জয়কে তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না, এই গানে বৈরাগী তারই ইঙ্গিত দিয়েছে। ধনঞ্জয় যে জগতে বাস করে, রাজার প্রহরীর শাসন নাগাল পাবে না -

‘তাঁর আপন হাতের ছাড়-চিঠি সেই যে,
আমার মনের ভিতরে রয়েছে এই যে-

তোদের ধরা আমায় ধরবে না'।
অষ্টম গান –
'আগুন, আমার ভাই
আমি তোমারি জয় গাই'।

বন্দীশালায় আগুণ লাগিয়ে খুড়া মহারাজ বিশ্বজিৎ, অভিজিৎ আর ধনঞ্জয়কে বন্দীশালা থেকে বের করে এনেছেন। অভিজিৎ মুক্তধারার শৃঙ্খল মোচনের জন্য বদ্ধ পরিকর। তাই সে খুড়া মহারাজের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে না থেকে, দুর্গমের পথে বেরিয়ে পড়তে চায়। এই প্রেক্ষিতে ধনঞ্জয়ের মনে হয়েছে এই আগুনেই হয়ত ছাই হয়ে যাবে এতোদিনের উত্তরকূটের জমা পাপ। অভিজিৎ নিজে জ্বলে, আত্মদানের মাধ্যমে উত্তরকূটকে শুদ্ধ করবে। এই ইঙ্গিত মেলে তার গানে,

'সকল দাহ মিটবে দাহে-
ঘুচবে সব বালাই'।

নবম গান, 'শুধু কি তার বেঁধেই তোর কাজ ফুরাবে'। উত্তরকূটের নাগরিকেরা অভিজিতকে শাস্তি দেওয়ার অভিপ্রায় খুঁজছে। কিন্তু অভিজিৎ এদের অনেক উর্ধে, ধনঞ্জয়ের গানে তার ইঙ্গিত আছে। অভিজিৎ যে তাদের শাসনকে পরাভূত করে দিতে চলেছে তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল গানের কথায়, 'তা হলে হার হল যে হার হল
শুধু বাঁধাবাঁধিই সার হল'।
দশম গান-

'ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে   ও অবোধ?'

এই গানেও নাটকের পরিণতির ইঙ্গিত আছে। যে বেদনা আজ অভিজিতের অন্তরকে ব্যথিত করেছে, বিশ্বপ্রকৃতি অভিজিতের সে বেদনাকে ধৌত করে দেবে। অনন্ত নিখিলে অভিজিতের আকুলতা ব্যাপ্ত হয়ে আছে, যে আকুলতাকে প্রকৃতিই স্বস্তি দেবে। এই গানে–

'যারে করলি হেলা সবাই মিলি
আদর যে তার বাড়িয়ে দিলি',

এই অংশের সঙ্গে নাটকের শেষে সঞ্জয়ের বর্ণনা, 'মুক্তধারা তাঁর সেই আহত দেহকে মায়ের মতো কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল' সমভূমিতে এসে মিলে যায়।
একাদশতম গান বাঁধ ভাঙার বর্ণনা, -

'বাজে রে বাজে ডমরু বাজে'
হৃদয়মাঝে, হৃদয়মাঝে'।

বন্ধনমুক্ত মুক্তধারার স্রোতে এখানে ভৈরবের কল্যাণশক্তি পুনর্জাগ্রত হওয়ার ইঙ্গিত মিলবে।

এইভাবে 'মুক্তধারা' নাটকের গানগুলি নাট্যিক প্রয়োজন সিদ্ধ করে, নাট্যকারের অভিপ্রায়কে শৈল্পিক পূর্ণতা দিতে পেরেছে।

তথ্যসূত্র :

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী ৩য়, ১৫শ, ১৯শ, ২৩শ, ২৫শ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৩-১৪০১ বঙ্গাব্দ।

২। অশ্রুকুমার সিকদার, 'রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য', ১ম আনন্দ সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৯৩

৩। দেবশ্রী নন্দী, রবীন্দ্রনাট্যের অন্তর্বয়নে সঙ্গীতের ভূমিকা।

৪। ডঃ নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি : প্রেক্ষিত লোকসংগীত

দেবলীনা দেবনাথ
সহকারী অধ্যাপক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
সেখ একরামুল হোসেন
গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মূল প্রবন্ধ :-

(১)

পল্লিবাংলার সাধারণ মানুষের আঁতের কথাকে সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছিলেন ‘রাঢ়ের কথাশিল্পী’তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ- শরৎচন্দ্র- বিভুতিভূষণ প্রমুখের সঙ্গেই তাঁর নাম উচ্চারিত হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকাংশ গল্প- উপন্যাসের নায়ক- নায়িকারা হলেন গ্রাম বাংলার প্রান্তিক বা লোকায়ত মানুষ। রাঢ়বঙ্গের সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিঢ় যোগ। তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মে সমকালকে তুলে ধরেছেন- যেখানে একদিকে জমিদারতন্ত্র ভেঙে পড়ছে আর সেখানে উদ্ভব হয়েছে বণিক বা অভিজাততন্ত্রের। এই দুই শ্রেণির সংঘাতের প্রেক্ষাপট তাঁর সাহিত্যের বিষয়। একইসঙ্গে পুরাতন ও নতুনের দ্বন্দ্বে ভেঙে পড়ে পুরাতনের নানা বিশ্বাস- সংস্কার- গ্রামীণ লোকায়ত জীবনের চালচিত্র তাঁর লেখনীতে নিবিঢ় ভাবে প্রতিফলিত হতে দেখি। অভিজাত জমিদারি বংশের সন্তান হওয়ার সত্ত্বেও বিলাসবহুল ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনচর্চার বদলে সাধারণ মানুষের সেবা কর্মে নিজেকে উদ্বুদ্ধ রাখতে চেয়েছেন সর্বদা। সাহিত্য জগতে তিনি বহু উপন্যাস রচনা করেছেন- যা তাঁর বিচিত্র জীবন তিক্ততার পরিচয়বাহী।

এক আশ্চর্য ও অবিস্মরণীয় উপন্যাস ‘কবি’। ‘কবি’প্রথমে ছিল গল্প। ‘প্রবাসী পত্রিকায়’১৩৪৭ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পে বসন ছিল না। কয়েক মাস পরে গল্পটি উপন্যাসে রূপান্তরিত হয়ে পাটনার ‘প্রভাতী পত্রিকায়’১৩৪৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র থেকে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ঐ বছরেই, ১৯৪২ সালে।

> “এমন এক কবির কাহিনি এই উপন্যাস যার কবি হয়ে ওঠা আশ্চর্য, আরো আশ্চর্য তার কবিজীবন, তার থেকেও আশ্চর্য তার মনুষ্যত্ব। আলোর মতো ঋজু, বায়ুর মতো সাবলীল, স্রোতের মতো উচ্ছল সেই কাহিনি মধুর এবং করুণ। পড়তে ভালো লাগে, পড়ে ভালো লাগে। নান্দনিক তৃপ্তি এবং নৈতিক প্রাপ্তি এতই গভীর যে, ধাবমান কাল তার স্মৃতিকে ধূসর করে দিতে পারে না। এই কবি স্বভাবকবি, অন্ত্যজ হিন্দু, এবং বীরভূমের অট্টহাস গ্রামে তার বাস। তার ক্লেদজ কুসুমতুল্য কবিত্ব এবং নিকষিত হেমতুল্য প্রেম কাহিনিতে অবিচ্ছিন্ন। তার জীবনে জীবনের গদ্য ও কাব্য, তার প্রেমে প্রেমের বাস্তবতা

ও রোমান্টিকতা সুসম্বন্দ। কবি কাহিনি তাই অন্য এক কাহিনিও। যে ক্রমোচ্চ স্তরবদ্ধ সমাজ শম্বুকবধের দু- হাজার বছর পরেও অন্ত্যজদের উল্লম্ব সচলতা মেনে নিতে পারেনি, সেই অচল হিন্দু সমাজে একালের এক শম্বুকের আত্মোদ্ধারের কাহিনিও এই উপন্যাস।”[১]

(২)

লোকসাহিত্যের অন্যতম একটি শাখা হল লোকসংগীত। লোকসংগীত বলতে এককথায় বোঝায় লোকজীবনের গান। লোকসংগীতকে আবার সম্পাদনমূলক লোকসংস্কৃতি (Performing Folklore)- এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংগীত বা গান মানব মনের বা অন্তরের বাঙ্ময় প্রকাশ। মনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেদন সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এছাড়াও সংগীতের মধ্য দিয়েই মানব জীবনের সুখ- দুঃখ ইত্যাদি মানবিক আবেদনকে ফুটিয়ে তোলা হয়। পুরাণ সাহিত্যে বলা হয়েছে- “নৃত্যং গীতং বাদ্যং চেতি সঙ্গীতমুচ্যতে”অর্থাৎ নৃত্য বা নাচ, গীত বা গান এবং বাদ্য বা বাজনার সহযোগে সংগীতের সৃষ্টি। নানান আঙ্গিকে মানব মনের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম এই সংগীতের আবেদন চিরন্তন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কবি’উপন্যাসে লোকসংগীতের বিভিন্ন দিকগুলোর উপর আলোচনার প্রয়াস রেখেছি। এই উপন্যাসে অন্ত্যজ বংশের সন্তান নিতাই- এর কবিয়াল হয়ে ওঠার কাহিনিকে কেন্দ্র করে ঘটনাবৃত্ত আবর্তিত হতে দেখা যায়। উপন্যাসের শুরুতেই আছে মাঘী পূর্ণিমার চামুন্ডা দেবীর পূজা উপলক্ষে মেলার আয়োজন করা হয়। আর এই মেলার অন্যতম আকর্ষণীয় ঘটনা কবিগানকে কেন্দ্র করেই। এই কবিগানের টানেই দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসে সাধারণ মানুষ। আর তাদের সিংহভাগ মানুষই সাধারণ, দারিদ্র্য ও অন্ত্যজ শ্রেণির। নিতাই কবিয়াল রূপে অবতীর্ণ হন। মহাদেব কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার গানের পালা চলে। কবিগানের মূল বিষয় হচ্ছে উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে গানের বা ছড়ার ঢঙে বিভিন্ন তথ্য যুক্তিসঙ্গতভাবে উপস্থাপন করা। এই কৌশল যে- সে মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য উপযুক্ত বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। শাস্ত্র কথার মাধ্যমে সংগীতের সূচনা হয় পরে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা পঙ্কিলতায় জরাজীর্ণ হয়ে ওঠে। যা শুনে শ্রোতা মন বিহ্বল- আন্দোলিত বা রসাবিষ্ট হয়ে ওঠে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিতাই কবিয়াল। জন্মসূত্রে অন্ত্যজ, লেঠেল বংশজাত। এদের উপাধি ‘বীরবংশী’। এককালেআবারএরা‘লাঠিয়ালবলে বিখ্যাত ছিল। আর কোম্পানি আমলে জীবিকা হারিয়ে হয়েছিল ডাকাত। 'নবাবী আমলে ছিল পল্টনে কিন্তু জাত বংশের পেশা কে উপেক্ষা করে নিতাই সাহিত্যচর্চার পথে নিঘটিয়ে একজন কবিয়াল হয়ে উঠেছেন। এই কবিয়াল হয়ে ওঠার পথে সঙ্গী হিসাবে পেয়েছেন বন্ধু রাজনকে। উপন্যাসের শুরুতেই মাঘী পূর্ণিমার মেলায় কবিগানের সূচনা। উপন্যাসের শুরুতেই পাই বন্দনামূলক সংগীত। যা নিতাই এর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে–

"ক'-য়ে কালী কপালিনী- খ-য়ে খপ্পরধারিণী,
গ-য়ে গোমাতা সুরভি- গণেশ জননী-
কণ্ঠে দাও মা বাণী।"[২]

এরপর নিতাই কবিয়াল নিজ জ্ঞানের পরিচয় তুলে ধরেছেন অপর এক সংগীতে–

"শুনুন মহাশয় দীনের নিবেদন।
গো কিম্বা গরু তুচ্ছ নয় কখন।।
গাভী ভগবতী, ষাঁড় শিবের বাহন।
সুরভির শাপে মজে কত রাজন।।"[৩]

নিতাই কবিয়াল এর এই ছড়া শুনে সকলে একসঙ্গে বলতে লাগলো 'ভালো ভালো'। ঢুলিটাঢোলেকাঠিদিলএবংনিতাইবলেউঠল-

"শাস্ত্রের সার কথা আরও বলে যাই।
গো- ধন তুল্য ধন ভূ- ভারতে নাই।।
তেঁই গোলকপতি- বিষ্ণু বনমালী
ব্রজধামে করলেন গরুর রাখালি।।"[৪]

নিতাই কবিয়ালের এই উপস্থিত জবাব সকলকে অবাক করে দেয়। ছন্দবেঁধে এমন ত্বরিত ও যুক্তিসম্পন্ন জবাব দেওয়া তো সহজ কথা নয়। নিতাই- এর বন্ধু রাজন পর্যন্ত হতবাক। নিতাই তারপর বলে উঠল–

"তা ছাড়া মশাই- আছে আরও মানে-
গো মানে পৃথিবী শুধান পন্ডিত জনে।"[৫]

ক্রমে তাঁর যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপন দর্শক-শ্রোতা মনকে আকর্ষিত ও উদ্বেলিত করে তোলে। তাঁর প্রতিপক্ষ মহাদেব কবিয়াল নিতাই এর বংশ পরিচয় তুলে কড়া ভাষায় আক্রমণ হানে–

"সুবুদ্ধি ডোমের পায়ে কুবুদ্ধি ধরিল।
ডোম কাটারি ফেলে দিয়ে কবি করতে আইল।।
ও- বেটার বাবা ছিল সিঁদেল চোর, কর্তা-বাবা ঠ্যাঙাড়ে।
মাতামহ ডাকাত বেটার- দীপান্তরে মরে।।
সেই বংশের ছেলে ব্যাটা কবি করবি তুই।
ডোমের ছাওয়াল রত্নাকর, চিংড়ির পোনা রুই।"[৬]

মাঝে একজন ফোড়ন দিয়ে বলে উঠল–

"অল্পজলই ভাল চিংড়ির- বেশী জলে যাস না।"[৭]

এভাবে মহাদেব কবিয়াল নিতাই এর জাত বংশ ধরে বিদ্রুপের কষাঘাত হানে। উক্ত কবিগান পালায় নিতাই পরাজিত হন ঠিকই কিন্তু এর মাধ্যমে তাঁর কবিগানের খ্যাতি

চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তিনি মনে মনে আত্মদগ্ধ হতে থাকেন। কবি সাধনার পথকে উপজীব্য করে চলতে থাকে তাঁর জীবন পরিক্রমার ক্রমবিস্তার।

(৩)

দোয়ারেরা পরমোৎসাহে মহাদেবের নতুন ধুয়াটা গাইতে শুরু করে–

"আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা- স্বগ্ গে যাবার আশা- গো!
ফরাৎ ক'রে উড়ল পাতা- স্বগ্ গে যাবার আশা গো!
হায় রে কলি- কিই বা বলি-
গরুড় হবেন মশা গো- স্বগ্ গে যাবার আশা গো।।"[৮]

অকস্মাৎ মহাদেব বলে উঠল–

'আহ্, জ্বালাতন রে বাপু'- বলে সে নিজের পায়ে একটা চড় মেরে বসল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গাইতে শুরু করল–

"পায়েতে কামড়ায় মশা- মারিলাম চাপড়।
গোলকেতে বিষ্ণু কাঁদেন- চড়িবেন কার উপর।।"[৯]

মহাদেবের দোয়ার, যাকে উপেক্ষা করে নিতাই কবিয়াল হয়েছে- সেই এবার ফোড়ন দিয়ে বলল–

"চটাৎ চড়ের সয় না ভর, স্বগ্ গে যাবার আশা গো"।[১০]

এরপর রাত যত অগ্রসর হল মহাদেবের তান্ডব ততই বেড়ে গেল। শ্লীল-অশ্লীল গালিগালাজ নিতাইকে মহাদেব বিপর্যস্ত করে দিল। মহাদেবের এই শূল-প্রতিরোধের ক্ষমতা নিতাইয়ের ছিল না। কিন্তু তার বাহাদুরি এই যে জর্জর ও ক্ষতবিক্ষত হয়েও নিতাই ধরাশায়ী হল না। মুখ বুজে, হাসিমুখে, সব সহ্য করল। নিতাই কবিয়াল গালিগালাজের উত্তরে কেবল ছড়া কেটে বলল–

"ওস্তাদ তুমি বাপের সমান তোমাকে করি মান্য।
তুমি আমাকে দিচ্ছ গাল, ধন্য হে তুমি ধন্য।।
তোমার হয়েছে ভীমরতি- আমার কিন্তু আছে মতি তোমার চরণে।
ডঙ্কা মেরেই জবাব দিব- কোনই ভয় করি না মনে।"[১১]

নিতাই কবিয়াল উৎসাহ ভরে কবিয়ালদের নকল করে গালে হাত দিয়ে মুখের সম্মুখে অপর হাতটি রেখে একটু ঝুঁকে রামায়ণের কথা স্মরণ করে তাঁর কন্ঠে রামায়ণের সুর ধ্বনিত হয়–

ক) "রাজার বেটা যোবরাজ   তেজার বেটা মহাতেজা
খায় সে খাস্তা খাজা গজা
বিদিত ভো- মন্ডলে!"[১২]

কিংবা, রামায়ণ রচনার পূর্ব প্রেক্ষাপটকে উপস্থাপন করতে উল্লেখ করেন–

খ) "রামনাম ব্রহ্মস্থানে পেয়ে রত্নাকর।
সেই নাম জপে ষাট হাজার বৎসর।।"[১৩]

গ) “বর দিয়া ব্রহ্মা গেলা আপন ভবন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।।”[১৪]

রাজা লাফ দিয়ে ঘরের ভিতর হতে তার পৈতৃক ঢোল ও তার নিজের কাঁসি বের করে এনে নিজেই নিয়েছিল ঢোলটা- ছেলেটার হাতে দিয়েছিল কাঁসিটা। ওই কাঁসিটা রাজার বাবা রাজাকে কিনে দিয়েছিল মহেশপুরের মেলায়। সেইদিন দ্বিপ্রহরে কবিগান জমে উঠেছিল রাজার ঘরে। রাজার পুত্র ‘যোবরাজ’এর প্রসঙ্গক্রমে রাজপরিবারের উদ্দেশ্যে গীত হয় গান-

“রাজার ঘরের ঘরণী যিনি- তিনি মহামান্যা রানী–
তিনি খান বড় বড় ফেনি-
সর্বলোকে বলে।”[১৫]

অথবা-

“সেই মেলাতে কবে যাব
ঠিকানা কী হায় রে!
যে মেলাতে গান থামে না
রাতের আঁধার নাই রে।
ও রসময় ভাই রে!”[১৬]

একসময় মনের আবেশে নিতাই প্রিয় বন্ধু রাজনকে গান গেয়ে শোনায়। সুমিষ্ট কণ্ঠে ঈষদ সুরে গেয়ে ওঠে-

“আমি ভালোবেসে এই বুঝেছি সুখের সার সে চোখের জলে রে।
তুমি হাস আমি কাঁদি বাঁশি বাজুক কদমতলে রে।।”[১৭]

উপন্যাসে অপর আরেক কবিয়াল ছিলেন তারণ কবি। তিনি ছিলেন মদ্যপ। মদ্যপ অবস্থায় তিনি উন্মাদসুরে গান গাইতেন। সেই তারণ কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল–

“তোমার লাথি আমার বুকে পরম আশিস শোনো দশানন,
তোমার চরণধূলা আমার অঙ্গে অগুরু চন্দন
বিভীষণের রাক্ষস জন্মের শাপবিমোচন,
খালাস, খালাস, খালাস, আমি খালাস নিলাম হে।”[১৮]

দক্ষ জীবনাভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিতাই এর কণ্ঠে সংসার জীবনের গূঢ় সত্য উদঘাটিত হতে শোনা যায়–

“সংসারে যে সহ্য করে সে-ই মহাশয়।
ক্ষমার সমান ধর্ম কোনো ধর্ম নয়।।”[১৯]

ঠাকুরঝির দুঃখের সমব্যথী হয়ে নিতাই এর চোখে নিঃসৃত হয় অশ্রুবারি এবং অন্তর থেকে উদগত হয় গান–

“আমি ভালোবেসে এই বুঝেছি-

সুখের সার সে চোখের জলে রে।”[২০]

এই ভালোবাসার গাঢ়তা তাৎক্ষণিক নয়। তিন বছরের অন্তরঙ্গ আলাপ এর মূল সুর। তাছাড়া ঠাকুরঝির কথা প্রসঙ্গে কালো মেয়ের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করলে নিতাই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে–

“কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?
কেন কাঁদ?”[২১]

ঠাকুরঝি ক্রমে স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুলের মতো ছোটো হয়ে পথের বাঁকে মিলে গেল। নিতাই বসে আপনমনেই ঘাড় নাড়াতে আরম্ভ করলো। গানের দ্বিতীয় কলিটাও তার মনে এসেছে–

“কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে।”[২২]

উপন্যাসে দেখি রাজা কাজের ফাঁকে সময় পেলে নিতাই কবিয়াল এর কাছে এসে হাজির হয়। ক্রমে বাড়ির বাইরে রাজার স্ত্রী শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠ বেজে উঠেছিল–

“হাসিস্ না লো কালামুখী - আর হাসিস্ না,
লাজে মরি গলায় দড়ি- লাজ বাসিস্ না?”[২৩]

বিপ্রপদ ঠাট্টার ঢঙে মহাদেবের সেই পূর্বের গানটি সকৌতুকে গেয়ে উঠল–

“আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা - স্বগ্ গে যাবার আশা গো!
ফরাৎ ক'রে উঠল পাতা- স্বগ্ গে যাবার আশা গো।
হায়রে কলি- কীই বা বলি- গরুড় হবেন মশা গো।”[২৪]

নিতাই কবিয়ালের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং বিচিত্র বিচার- দৃষ্টি একটা নতুন স্বাদের সৃষ্টি করেছিল। সত্যিই তো- 'কালো যদি মন্দই হবে'- তবে কালো চুলে সাদা রং ধরলে মন উদাস হয়ে ওঠে কেন? নিতাই বারবার এই প্রশ্নটির জবাব চেয়েছিল। উপন্যাসে দেখতে পাই 'ছিষ্টিধর' একজন খ্যাতিমান কবিয়াল। মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগ নিবিড়। তিনি সেই প্রশ্নের জবাব রসিকতার ছলে দিতে গিয়ে গানের সুরে বলে ওঠেন-

“কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদি ক্যানে?
কাঁদি না রে! কলপ মাখি!
কলপ মাখি, - না হয়, বউ তুলে দেয় হ্যাঁচকা টানে।”[২৫]

পরের দিন আসরে নিতাই কবিয়াল কে মহাদেব ইচ্ছা করে ছিষ্টিধরের মুখের কাছে নিয়ে গেছিল। সেদিন আসরে ছিষ্টিধর দ্রোণ অপরদিকে মহাদেব একলব্য। পূর্বের দিন প্রচুর বমির ফলে মহাদেবের শরীরের অবস্থাও ভালো ছিল না, গলাটাও বসে গেছিল এবং ছিষ্টিধরের কাছে হেরে যাওয়ার ভয় ও ছিল। তাই সম্বন্ধ পাতাবার পর মহাদেব আসর বন্দনা করে গেয়ে উঠেছিল–

“আমার চুল পেকেছে দাঁত ভেঙেছে বয়স আমার অনেক হ'ল-
ব্যাধের ব্যাটা একলব্য বয়স তাহার বছর ষোলো;
আমাকে কি মানায় তাই? তাই হে দ্রোণ মোর বক্তব্য

একলব্যের বাবা আমি নিতাই হল একলব্য।
বলি- মানাবে ভালো হে!”[২৬]

তার প্রত্যুত্তরে ছিষ্টিধর উঠে প্রথমেই কপালে চাপড় মেরে গেয়ে ওঠে–

“-টাকা কড়ি চাই নে কো মা- তোর দন্ডসাজা ফিরিয়ে নে
হায় মহিষের কৈলে বাছুর বধের হুকুম ফিরিয়ে নে।
নিজে বধলি মহিষাসুরে-
ছানাটাকে দিলি ছেড়ে-
আমায় বলিস বধতে তারে এ আজ্ঞে মা ফিরিয়ে নে।”[২৭]

তারপর মহাদেব এবং নিতাইকে জড়িয়ে গালিগালাজের আদি অন্ত রাখে নাই ছিষ্টিধর। ছিষ্টিধর বলে–

“নিতাই যদি মহাদেবের পুত্র হয় তবে তাহারা অন্ত্যজ ব্যাধও নয়, তাহারা অসুর;
মহাদেব ব্যাটা মহিষাসুর আর নিতাইটা মহিষাসুরের বাচ্চা!
- হায় অসুরের শ্বশুরবাড়ির ঠিক- ঠিকানা নাই-
গরুর পেটে হয় দামড়া
গায়ে তাহার বাঘের চামড়া
বিধাতা সে অধোবদন- এ ব্যাটা ঠিক তাই।”[২৮]

সে যেন নিষ্ঠুর আক্রোশে কুপিয়ে কুচি কুচি করে কাটা। মহাদেবের ও অধোবদন হয়েছিল। ভাঙা গলা নিয়ে জবাব দেওয়ার তার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু নিতাই কবিয়াল দমে যাওয়ার পাত্র নয়। সে তৎক্ষণাৎ গান ধরেছিল অকুতোভয়ে–

“ভান্ড পুত্ত দ্রোণ ব্রাহ্মণ তোমার কান্ড দেখে অবাক হে!”[২৯]

নিতাই এর গানের সুর মুহূর্তের মধ্যে সকলের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তাদের কৌতুক- উচ্ছ্বাসকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। বর্ষার জোলো হাওয়ার মাতামাতির উপর ছড়িয়ে পড়া গুরুগম্ভীর জলভরা মেঘের ডাকের মতো বললে অত্যুক্তি বলা হবে না। কারণ নিতাই এর গলার স্বর সুমিষ্ট এবং সে গান ধরিয়ে দিয়েছিল, খাঁটি গান। তারই একখানি গান–

“আহা- ভালোবেসে- এই বুঝেছি
সুখের সার সে চোখের জলে রে-
তুমি হাসো- আমি কাঁদি
বাঁশি বাজুক কদমতলে রে।
আমি নিব সব কলঙ্ক তুমি আমার হবে রাজা
(হার মানিলাম) হার মানিলাম
দুলিয়ে দিয়ে জয়ের মালা তোমার গলে রে।

আমার ভালোবাসার ধনে হবে তোমার চরণপূজা
তোমার বুকের আগুন যেন আমার বুকে
পিদিম জ্বালে রে।"[৩০]

উপন্যাসের নবম পরিচ্ছদে দেখি, চায়ের গন্ধ পেয়ে ও ষ্টিলের মগের শব্দ শুনে তৃষ্ণার্তের মতো আগ্রহে বসন্ত ইতিমধ্যেই আগমন ঘটেছিল। সকলকে চা পরিবেশন করতে করতে নিতাই গানের সুরে বলে উঠে–

".. প্রেমডুবি দিয়ে বাঁধতে নারলেম হায়,
চন্দ্রাবলীর সিঁদুর শ্যামের মুখচাঁদে।
আর কী উপায় বৃন্দে- এইবার এনে দে এনে দে-
বশীকরণ লতা- বাঁধবে ছাঁদে ছাঁদে।"[৩১]

অবশ্য উক্ত গানটি নিতাইয়ের বাঁধা নয়, নিতাই কবিয়ালের আদর্শ তারণ মোড়লের বাঁধা গান; গানটি পূর্বে নিতাইয়ের মুখস্থ ছিল।

উপন্যাসের দশম পরিচ্ছদে খেউর গানের উল্লেখ আছে। গানটি হল–

"ঝুম ঝুমাঝুম বাজেলো নাগরী :
নূপুর চরণে মোর। ও সে থামিতে না চায় গো।
তোরা আয় গো!
জল ফেলে কাঁধে তুলে নে গো সখি গাগরি
রজনী হইল ভোর :- আয় সখি আয় গো; নিশি যে ফুরায় গো!
নূপুর চরণে মোর থামিতে না চায় গো।
ঝুম ঝুমাঝুম, ঝুমাঝুম ঝুমাঝুম।"[৩২]

ঝুম ঝুমাঝুমের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করল নাচ। আসরটা স্তব্ধ হয়ে গেল। এমনকি ক্রুদ্ধ রাজা পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গেল। মেয়েটার রূপ ও কণ্ঠ উভয়ই ছিল। সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলেন।

উপন্যাসের চতুর্দশ পরিচ্ছদে পেসাদের কথা পাই। বসনের মুখ ছিল হাসিতে ভরপুর। সেই হাসি নিতাই ইতোপূর্বে কখনো দেখেনি। সে অবাক হয়ে নিতাইয়ের দিকে চেয়ে রইল। বসন জিনিসপত্র গুছাবার অজুহাতে তার দিকে পিছন ফিরল। গুনগুন করে সে চন্ডীদাসের গান করতে ছিল। নিতাইও সে গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল–

"তোমার চরণে আমারই পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি,
জাতিকুলমান সব বিসর্জিয়া নিশ্চয় হইনু দাসী।"[৩৩]

কবিয়ালদের সকলের চেয়ে বড় বুদ্ধি হল কূটবুদ্ধি। সবচেয়ে বড় শক্তি হল গলাবাজি। অর্থাৎ জোর করে আপন বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করা বা নিজেকে শ্রেষ্ঠ রূপে প্রতিপন্ন করা। হয়- কে নয় এবং নয়- কে হয় করে গলার জোরেই কবিয়ালরা জয়লাভ করে। বুদ্ধি

করে অশ্লীল রসের গালিগালাজ উপেক্ষা করে নিতাই কবিয়াল সেই চেষ্টা করল। সে ধরল–

"বন্দে তুমি নিন্দে আমার কর অকারণ,
নয় অকারণে- কারণ পেয়ে মত্ত তোমার মন।"[৩৪]

কবিগান ছাড়াও টপ্পা গান নিতাইয়ের ভালো লাগে। বসন্ত নিতাইকে টপ্পাগান শিখিয়েছে। টপ্পার সঙ্গে নিধুবাবুর নামও সে জেনেছে। আসলে এগুলো সব নিতাইকে বসন্তই বলে দিয়েছে। মনে মনে নিতাই নিধুবাবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নিতাই বলে–

"এই না হলে গান!
তারে ভুলিবে কেমনে!
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে।"[৩৫]

কিংবা,

"ভালোবাসিবে ব'লে ভালোবাসি নে।
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানি নে।"[৩৬]

নিতাইয়ের কবিচিত্তকে প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করেছে প্রেম। কবিজীবনকে জীবনের পূর্ণতা দিয়েছে প্রেম। তবুও অযাচিতভাবে প্রেম তাদের জীবনে নিয়ে এসেছে এক স্বর্গীয় পুস্পরূপ বা পরশমণি হিসাবে।

রোগ যন্ত্রণা ও মৃত্যুযন্ত্রণার থেকেও বড়ো যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রেম। দুর্ভাগ্যবশত নিতাইয়ের ঐ যন্ত্রণার পিছনে যে জীবন তাঁর আকাঙ্খিত ছিল সেই জীবনকে উপেক্ষা করে সে অনাকাঙ্ক্ষিত জীবন অর্থাৎ মৃত্যুকে পেল-

"এই খেদ আমার মনে মনে।
ভালোবেসে মিটল না আশ- কুলাল না এ জীবনে।
হায়, জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?"[৩৭]

বসন বলেছিল–

"কবিয়াল- তোমার গান আমার জীবনে ফলে যায়। এ গান তুমি কেনে বাঁধলে
কবিয়াল। গানটা বসনের জীবনে সত্য হইয়া গেল। হায়! হায়! বসন কি মরিয়া শান্তি
পাইয়াছে? এ- জগতের যত তাপ- যত অতৃপ্তি সব কি ও- জগতে গিয়া জুড়াইল?
জীবনে যা পাওয়া যায় না- মরণে কি তা-ই মেলে? সুর গুনগুন করিয়া উঠিল।

"জীবনে যা মিটল না কো মিটবে কি হায় তা-ই মরণে?"[৩৮]

এ- প্রশ্ন কি কেবল নিতাই ও বসনের? উত্তর স্বরূপ বলা যায়- সকল মানুষেরও মর্মগত প্রশ্ন।

এবং

"এ ভুবনে ডুবল যে চাঁদ সে ভুবনে উঠল কি তা?
হেথায় সাঁঝে ঝরল যে ফুল হোথায় প্রাতে ফুটল কি তা?
এ জীবনের কান্না যত- হয় কি হাসি সে ভুবনে?
হায়! জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?"[৩৯]

তৎক্ষণাৎ একটা কোলাহলে তার গানের তন্ময়তা ভেঙে গেল। মনটা ছিঃ ছিঃ করে উঠল। বাইরে দলের লোকদের মধ্যে চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে। নির্মলা তীক্ষ্নস্বরে চিৎকার করছে। সে বাইরে এসে দাঁড়াইল। ব্যাপারটা শুনে সে আরও মর্মাহত হল। ঝগড়া বেঁধেছে বসনের স্থান পূরণ নিয়ে।

একটা সময় নিতাই খুশি হয়ে উঠল। থাকতে থাকতে গানের একটা নতুন কলি তাঁর মনে জেগে উঠল–

"মরণ তোমার হার হল যে মনের কাছে
ভাবলে যারে কেড়ে নিলে সে যে দেখি মনেই আছে
মনের মাঝেই বসে আছে।
আমার মনের ভালোবাসায় কদমতলা-
চার যুগেতেই বাজায় সেথা বংশী আমার বংশীওলা।
বিরহের কোথায় পালা-
কিসের জ্বালা?
চিকন- কালা দিবস নিশি রাধায় যাচে।"[৪০]

নিতাইয়ের মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এ যে কেমন করে হল তা সে জানে না, তবে হল। বসন্ত হারায়নি। পূত পবিত্র মনে সে গঙ্গার ঘাটে নেমে মুখ হাত ধৌত করল। তারপর বাড়ির দিকে রওনা দিল।

একটা সময় দেখি নিতাই চুপ করে রইল। কোনো কথার সে প্রত্যুত্তর দিল না। একটুখানি চুপ করে থেকে গলা ছেড়ে গান ধরল; তখন নিতাইয়ের মনে নতুন গানের পদ এসেছে–

"বসন্ত চলিয়া গেল হায়,
কালো কোকিল আজি কেমনে গান গায়
বল- কেমনে থাকে হেথায়!"[৪১]

(৪)

লোকসংস্কৃতির বিচিত্র অঙ্গনের অন্যতম প্রধান ফসল হল লোকসংগীত- যা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কবি'উপন্যাসখানির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন বহুমাত্রিকভাবে। তবে এই গান কবিগানকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। উপন্যাসের নায়কস্থানীয় চরিত্র

নিতাই এর জীবনপ্রবাহে কবিয়াল হয়ে ওঠার ঘটনা তাঁর মধ্য দিয়েই কবিগানে বিচিত্র রসময়তার দিকটি উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়। রাঢ় বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হল এই কবিগান। উপন্যাসে নিতাই একজন স্বভাব কবি। তিনি একইসঙ্গে শিল্পী, প্রেমিক। তাঁর মন প্রেমাবিষ্ট হয়ে ওঠে বন্ধু রাজনের স্ত্রী তথা 'ঠাকুরঝি' কে কেন্দ্র করে। এই প্রেমিক সত্ত্বায় হয়তো তাঁকে কবি বা শিল্পীজীবনে চলার পথে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। এছাড়াও সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তাঁর মধ্যে ছিল কবিয়াল হয়ে ওঠার বড় প্রবণতা, যা তাঁকে তাঁর লক্ষ্যে উপনীত করে তুলেছে। উপন্যাসে দেখি বিভিন্ন কবিয়ালের সঙ্গে তিনি তর্ক যুদ্ধ লেগেছেন যুক্তি- তর্কেবিশ্ল -বিচার ,েষণ কখনো বা হেরেও গেছেন (মহাদেব কবিয়াল), কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি মনকে ক্ষত- বিক্ষত করলেও কবিয়াল থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাননি। কারণ- তাঁর মনে ছিল স্বতঃস্ফূর্ত স্বচ্ছন্দ ও প্রেমাবেগ। যা উপন্যাসে প্রারম্ভিক ঘটনা থেকে কার্যকারণ পরম্পরায় ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। নিজের কল্পনা বা রচনা শক্তিকে বারবার কুর্ণিশ জানিয়েছে মনে মনে। ক্রমে তাঁর এই আলোড়ন বদ্ধমূল নীচতার বোধ থেকে ক্রমমুক্তির দিশা দেখিয়েছে। যদিও একদিনের আস্তাকুঁড়ে থেকেই তাঁর কবিত্বের ক্রমবিকাশ ঘটেছিল। নিম্নবৃত্ত সম্প্রদায়ের হাত ধরেই তিনি কবিত্বের আসরে উন্নীত হয়ে উঠেছিলেন। তাই শুধুমাত্র কবিত্বই নয় মানবচরিত্রের পূর্ণতম বিকাশ তাঁর জীবনের অন্যতম এক বিবর্তন বলা চলে। শৈশবকাল থেকেই বিষময় সমাজের আবর্জনা স্তুপ থেকে তাঁর মনে কবিত্ব রক্তবীজের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। ক্রমশ স্বীয় প্রতিভা ও প্রচেষ্টায় তিনি উন্নতির চরম শিয়রে উপনীত হন। কবিত্ব বলে তিনি কদর্যময় জগৎকে জয় করেন। ঈশ্বর চিন্তা তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। শুধু কবিগান নয় ঝুমুর বা টপ্পাগানেও তিনি অসামান্য দক্ষতা লাভ করেন। এইভাবে 'কবি' উপন্যাসে কবিয়াল নিতাইয়ের সমগ্র জীবন পরিক্রমায় 'ছড়ি টানিয়া, সুর বাঁধিতে বাঁধিতেই জীবন কাটিয়া গিয়েছিল'।তাই লোকসংস্কৃতির বিচিত্রমুখী ধারায় লোকসংগীত রূপে কবিগানের ভূমিকা 'কবি' উপন্যাসে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত করে তুলেছেন ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সূত্রনির্দেশ :-

১) "It is a tragedy of a man belonging to a so called low- caste, striving to gain his status in caste- bound society"
- MahasvetaDevi :TarasankarBandyopadhyay (1975), P. 43.

'This is a story of the struggle of an out- caste towards vertical mobility'- Sisir Kumar Das :**A History of Indian Literature**(1911-1956), (1995), P. 314.

২) **'তারাশঙ্কর- রচনাবলী'**, ষষ্ঠ খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- ১৩৫৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ- ১৩৯২, এপ্রিল ১৯৮৫, পৃ.- ৯

৩) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ৯

৪) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ১০

৫) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ১০

৬) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ১১

৭) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ১১

৮) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ১১

৯) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ১১

১০) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ১১

১১) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ১১

১২) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ১৫

১৩) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ২৪

১৪) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ২৫

১৫) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ১৬

১৬) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ১৯

১৭) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ২১

১৮) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ২২

১৯) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ২৬

২০) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ২৯

2১) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.-২৯-৩০

২২) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ৩৩

২৩) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ৩৪

২৪) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ৩৬

২৫) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ৪০

২৬) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ৪১
২৭) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ৪১
২৮) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ৪১
২৯) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ৪১
৩০) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ৪২
৩১) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ৫৫
৩২) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ৬২
৩৩) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ৮৩
৩৪) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ৮৫
৩৫) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ১০৬
৩৬) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ১০৬
৩৭) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ১২২
৩৮) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ১২২
৩৯) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ১২২
৪০) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ১২৪
৪১) পূর্বোক্ত, 'তারাশঙ্কর- রচনাবলী', পৃ.- ১২৬

গ্রন্থপঞ্জি :-

১) '**তারাশঙ্কর- রচনাবলী**', ষষ্ঠ খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- ১৩৫৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ- ১৩৯২, এপ্রিল ১৯৮৫

২) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : '**আমার কালের কথা**', বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা- ১২, প্রথম সংস্করণ- বৈশাখ ১৩৫৮, দ্বিতীয় সংস্করণ- জৈষ্ঠ্য, ১৩৫৯

৩) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : '**আমার সাহিত্য জীবন**', বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা- ১২, প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ- ১৩৬০

৪) মিলনকান্তি বিশ্বাস : '**প্রসঙ্গ লোকসংস্কৃতি**', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা- ২০১৪

৫) সেখ একরামুল হোসেন : '**ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি**', লোক ভারতী পাবলিকেশন, গ্রীন পার্ক, ঢালুয়া, কলকাতা- ৭০০১৫২, প্রথম প্রকাশ- ৩০ নভেম্বর, ২০১৯

৬) শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : '**বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা**', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা- ৭০০০০৯

৭) আব্দুর রহিম গাজী : '**তারাশঙ্করের উপন্যাসে প্রকৃতি জগৎ ও লোকজীবন**', বর্ণ সংস্থাপন, প্রথম প্রকাশ- ২০

৮) শ্রী দুলাল চৌধুরী : '**বাঙলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি**', লোকায়ত প্রকাশন, কলিকাতা- ৪৫, প্রথম প্রকাশ- আশ্বিন ১৩৬৭

প্রসঙ্গ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য: সৃষ্টির নেপথ্যে ইতিহাস

সুদেব বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ

সারসংক্ষেপ : বস্তু পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনাবলী, ঘাত-প্রতিঘাত স্রষ্টার হৃদয়রসে জারিত হয়ে সাহিত্য-বীজের সৃষ্টি হয়। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে তৈরি হয় অন্তর্লীন যোগসূত্র। আবার কখনো বা স্রষ্টার অন্তর্জগতের প্লাবনে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয় তাঁর সাহিত্য ভাবনা। ফলত সৃষ্টির নেপথ্য মানস ভাবনা ও জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত প্রতিফলিত হয়। প্রতিভাত হয় সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে স্রষ্টার জীবন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যে রয়েছে বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ প্রভাব বা ছাপ। আছে ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন ঘটনার শিল্পিত অবক্ষেপ। দক্ষিণ ২৪ পরগণার চম্পাহাটি পর্বের জীবন অভিজ্ঞতা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের ভূবনকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। জীবনের প্রতি ভালোবাসার সর্বব্যাপ্তি থেকে তিনি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন।
সূচক শব্দ : সৃষ্টি, স্রষ্টা, ঘাত-প্রতিঘাত, প্রেম, তাগিদ, পরিবেশ, জীবন-অভিজ্ঞতা, মেশামেশি।

(ক)

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে পঞ্চাশের দশকে যাঁরা লিখতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে জমি, পরচা, দলিল, খতিয়ান, মানুষের সঙ্গে জমির সম্পর্ক, পাল্টে যাওয়া জমির বিন্যাস প্রভৃতি সম্পর্কে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো কারো এমন গভীর ধারণা বা এমন অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি নেই। এই বিপুল অভিজ্ঞতায় তিনি সমৃদ্ধ হয়েছিলেন চম্পাহাটি পর্বে। নিজের হাতে-কলমে শিখেছেন তিনি এসব কাজকর্ম। এইসব কাজ করতে করতেই, কখনো লাভ হয়েছে, কখনো লোকসান। গল্প হয়েছে। হয়েছে উপন্যাস। কিন্তু কখনো থেমে থাকেননি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রায় প্রত্যেক লেখকেরই সাহিত্য জীবনে শুরুর আগে একটা ধাপ থাকে। লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য জীবন শুরুর আগেও আরেকটা শুরুর পর্ব আছে। সেই শুরুর কথা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই জানিয়েছেন জীবনের উল্লেখযোগ্য দুটি ঘটনার মধ্য দিয়ে। ঘটনা দুটির উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর স্মৃতিচারণ মূলক গ্রন্থ ‘জীবন রহস্য’ বইতে।

ঘটনা-১: ‘চর’ গল্পটি এক হাতে করে পড়তে নিয়ে গিয়েছিলাম। সভাপতি তখনকার যুবক প্রতাপচন্দ্র। সেখানে পড়বার পর রোগামত বয়স্ক এক ভদ্রলোক বললেন, কাল সকালে গল্পটি আমার বাড়িতে নিয়ে যেও।

---আপনার ঠিকানা?

---ফোন গাইডে পাবে।

---আপনার নাম? এ প্রশ্নে সবাই দেখলাম আমার দিকে তাকিয়ে।

---তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরদিন অনেক সময় নিয়ে তারাশঙ্কর সে গল্পটি কাটাকুটি করেছিলেন। অমার প্রথম গল্প।

ঘটনা-২: ‘মহাকাল কেবিন’ গল্পটি নিয়ে দু’জনের মতান্তর হল। একজন তারাশঙ্কর, অন্যজন প্রেমেন্দ্র মিত্র। মতান্তরের কথাশুনেছিলাম সুনীল ধরের মুখে। পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রও বলেছিলেন। গল্পটি হারিয়ে গেছে। ছাপা হয়েছিল ‘তরুণের স্বপ্ন’ কাগজে। তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র দু’জনেই সম্পাদক মন্ডলীতে সুনীল ধর ছিলেন অফিস সম্পাদক। গল্পটি ছাপা হওয়ায় দশ টাকা পেয়েছিলাম। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ইচ্ছায় গল্পটি ছাপা হয়েছিল। কিন্তু গল্পই বৃত্তি পাল্টে দিল।

কথাসাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যে রয়েছে তাঁর বাল্যকালের প্রকৃতি ও পরিবেশ, যৌবনের বহু বিচিত্র পরিবেশে চাকরি, শেষ বয়সে চম্পাহাটি অঞ্চলে বাড়ি, জমি, ফসল, গরুর সান্নিধ্য মাটির সঙ্গে নতুন করে পরিচয় প্রভৃতি অভিজ্ঞতা। সেই প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর উপন্যাস-ছোটগল্পে তাঁর জীবন দর্শনের নিরিখে বাস্তব রূপ পেয়েছে। কেননা কারখানায় কাজ করার সময় লেখক দেখতেন শেডের নিচে ম্যাগনেটিক ক্রেন এসে ঝুপ করে স্ক্র্যাপ দাঁতে কামড়ে তুলে নিয়ে যায়। সেই ক্রেনকে নামতে বলার সময় বলতে হয়--- আড়িয়া, আড়িয়া। তুলবার সময় বলতে হয় হাফেজ, হাফেজ। এই নিয়ে লেখা হয় প্রথম উপন্যাসের খসড়া---

‘একখানা উপন্যাস লিখে ফেললাম। নাম
দিলাম আড়িয়া হাফেজ। ছাপানো হয়নি।
এরকম ইচ্ছে করেই হারাই।’

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনে প্রেম এসেছে বারে বারেই। তবে এই প্রেমকে তিনি শিল্পের আধারে পরিবেশিত করে চির স্মরণীয় করে রেখেছে। প্রেম ও সম্পর্কগুলো ধরা দিয়েছে লেখা হয়ে। ইতি’র সঙ্গে বিয়ের আগে মীরা সরকার নামে এক মহিলার সঙ্গে শ্যামলের খুব ভাব হয়েছিল। মীরা বিদেশে পড়াশোনা করতে গিয়ে শ্যামলকে অনেক চিঠি লিখত, টাকা পাঠাত। এই মীরা সরকারের বৃত্তান্ত-ই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘তুষার হরিণী’ গল্পে স্থান পেয়েছে। ১৯০৮ সালের সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশিত হয়। ‘দেশ’ এ প্রকাশিত এটিই তাঁর প্রথম গল্প। ঐ সময় আরো বেশ কিছু গল্প লেখেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। যেমন--- ‘ব্রিজের এপাশে’, ‘ফোয়ারার ওপারে’, ‘অরবিন্দু বাবুর

ডায়েরি এবং স্ত্রী' প্রভৃতি। মীরা সরকার ছাড়াও শ্যামলের ছোটবেলাকার প্রেম ছিল রানুর সঙ্গে। দীর্ঘ অদর্শনও বিচ্ছেদের পর রানুকে একদিন দেখলেন পার্ক হোটেলের উল্টোদিকে একটি বিদেশী গাড়ির গায়ে হেলান দেওয়া অবস্থায়। এই রানু ও রানুর সঙ্গে জড়িত স্মৃতি শ্যামলের 'পরীর সঙ্গে প্রেম' উপন্যাসে এসেছে।

বিয়ের পরপর-ই বাড়তি দায়িত্বে কাজের ব্যস্ততা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে একেবারে নাজেহাল করে তোলে। এই ব্যস্ততার মধ্যেই আনোয়ার শাহ রোডের বাড়িতে স্থানাভাবের মধ্যে লিখে ফেললেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বৃহন্নলা' (১৯৬১)। যেটা পরে মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে ১৯৭৭ সালে 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' নামে বের হয়। প্রায় এই রকম ব্যস্ততায় লিখেছেন 'অনিলের পুতুল'। এই উপন্যাসটি লেখার সময় ছিল বিচিত্র, বেলা তিনটে নাগাদ। বউ বাজারে ব্যোমকেশ বাবুর প্রেসে। সকালে শিফটের ডিউটি করার পর ওখানে গিয়ে লিখলেন। প্রকাশক রবি রায় মহাশয় তা ছোট ট্রেডলে ছেপে বের করেছিলেন।

ক্ষুধার্তের মতো শ্যামল লেখার জায়গা খুঁজছিল আর তার সঙ্গে ছিল নতুন বিষয় পাওয়ার তাগিদ। ১৯৬৫ সালে লক্ষ্মীপুজোর দিন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগণার চম্পাহাটির গ্রামে রওনা দেন। চম্পাহাটিতে নিজের বাড়িতে প্রবেশ করেন ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে। প্রায় ২ বছর ধরে থাকেন কয়েকটি ভাড়াবাড়িতে। সাউথ গড়িয়ার একটি বাড়িতে কিছুদিন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় পরিবার নিয়ে ভাড়া ছিলেন। বাড়ির মালিক সুহৃদবাবু। তাঁর স্ত্রী অন্যপুরুষের সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্কে লিপ্ত ছিলেন। সেই কারণে ঐ মহিলা নিজের স্বামীকে খুন করে। বাড়ির এই গল্প শুনে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ আগ্রহ বোধ করেন এবং সুহৃদবাবুর দিদির কাছ থেকে মাসিক সত্তর (৭০) টাকা ভাড়ায় ঐ বাড়িতে ওঠেন। সুহৃদবাবুর বাড়ির এই ঘটনাকে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় শিল্পরূপ দিয়ে সৃষ্টি করেছে 'খরার পরে' ছোটগল্প এবং একটি উপন্যাস 'হননের আয়োজন'। চম্পাহাটিতে নিজের বাড়িতে ওঠার পর অনেক নামকরা সাহিত্যিক বন্ধু আসতে লাগল। এই পর্বে বের হল একটি সাহিত্য পত্রিকা--- 'বাসুদেব সাহিত্য পত্রিকা'। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় গল্প লিখলেন আর শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় লিখলেন একটি ধারাবাহিক উপন্যাস। উপন্যাসের নাম 'গণেশের বিষয় আশয়'। তিনটি সংখ্যা বের হওয়ার পর পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। তখন একদিন সাগরময় ঘোষ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে এলেন এবং সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখতে বলেন। 'গনেশের বিষয় আশয়' উপন্যাসটির নাম পরিবর্তন করে 'কুবেরের বিষয় আশয়' নামে লেখেন দেশ-এ। মাত্র চার সপ্তাহের মধ্যে উপন্যাসটিকে সমাপ্ত করতে বাধ্য হন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। চম্পাহাটি পর্বে-ই 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসের সমাপ্তি ও শেষ। বই প্রকাশের পরই পেয়েছিল অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা আর প্রশংসা।

বিভিন্ন হুজুগ আর মেশামেশির নেশায় শ্যামল বাবু অনেক মানুষজনকে বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। এই রকম একজন হলেন বিপিনবাবু। বেহালা বাদক। বেহালাবাজিয়ে জোছনা রাতে পরী নামিয়ে দেখানোর কথা ছিল বিপিনবাবুর। দেখাতে পারেননি কিছুই। এই বিপিনবাবু ও তার পরী নামানোর কাহিনি শিল্পরূপ পেয়েছে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘পরী’ নামক ছোটগল্পে। চম্পাহাটি থেকে চলে আসার পর শ্যামলের ঠিকানা হয় ৫০/১ প্রতাপাদিত্য রোড। এই বাড়িতে থাকাকালীন সময়ে মেতে উঠল ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকা নিয়ে। কবিতার পত্রিকা হওয়া সত্ত্বেও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কৃত্তিবাসে ছাপলেন শ্যামলের একটি অসাধারণ গদ্য ‘সুন্দর’ আর একটি ছোটগল্প ‘বিদ্যুৎ চন্দ্র পাল বিষয়ে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়’। প্রতাপাদিত্য রোডের বাড়িতে তখন সকাল-বিকেল তরুণ শিল্পী- নাট্যজগতের সঙ্গে একাত্মবোধ করেন। এবং তার-ই সোনার ফসল ‘অদ্য শেষ রজনী’ নামের একটি উপন্যাস। উপন্যাস সৃষ্টির প্রেক্ষাপট লেখক নিজেই জানিয়েছেন--- ‘তখনই অজিতেশ, কেয়া, রুদ্রপ্রসাদ, অসীম চক্রবর্তী--- কিছু পরে মনোজ মিত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। এদের দেখেই আমার মনে অদ্য শেষ রজনী এসেছিল’।

বাড়ি পরিবর্তনের মত শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের আর একটি নেশা ছিল গাড়ি পরিবর্তন। বিভিন্ন রকমের গাড়ি। গতিময় জীবনের নানা উত্থান-পতন নিয়ে লিখলেন ১৯৭৯ সালে ‘হাওড়াগাড়ি’ উপন্যাস। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশিরভাগ লেখার মধ্যে গানের সুরের সৌন্দর্য খুঁজে পাওয়া যায়। গান ছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রিয় একটি বিষয়। সুর পাগল এই মানুষটি গানের রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে লিখতে বসতেন। এই গানকে কেন্দ্র করে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকটি উপন্যাস ও ছোটগল্প আছে। উপন্যাসের মধ্যে ‘মাতৃচরিতমানস’ ও ‘তারসানাই’ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ছোটগল্পের মধ্যে ‘পুরকায়েতের আনন্দ ও বিষাদ’, ‘ঝিঁঝোটি দাদরা’, গানের বাগান’, ‘তবলাগলির কাফি’ উল্লেখযোগ্য। ব্রক্ষপুরের ভাড়াবাড়িতে মশার হাত থেকে বাঁচতে বিরাট মশারির মধ্যে লিখে ফেললেন দুটি খন্ডে মহাকাব্যিক উপন্যাস ‘শাহজাদা দারাশুকো’। ‘বর্তমান’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেরোতে শুরু করে এই উপন্যাস। ১৯৯১-৯২ সালে উপন্যাসটি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়। এছাড়া শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর জীবন ব্যাপী সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পুরস্কার পান। তার মধ্যে গজেন্দ্রকুমার মিত্র স্মৃতি পুরস্কার, ‘কথাশিল্পী’ পুরস্কার, শরৎ স্মৃতি পুরস্কার প্রভৃতি। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে ইহলোকের মায়া ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে যান। তবে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আজীবন বেঁচে থাকবেন পাঠকদের মধ্যে।

গ্রন্থঋণ :

১. শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। ‘জীবনরহস্য’। বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৫৮।

বাংলা ভাষায় উপসর্গের বিশেষ গুরুত্ব ও অবস্থান

মৌমিতা দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বাংলা ব্যাকরণের অন্যতম একটি অধ্যায় উপসর্গ। উপসর্গ কি? কোথায় উপসর্গের ব্যবহার দেখা যায় এ বিষয়ে ছেলেবেলা থেকেই বাংলা ব্যাকরণ থেকে আমরা জেনেছে। পরবর্তী সময়ে উপসর্গের গুরুত্ব ও অবস্থানের প্রসঙ্গে বারবার শোনা গেছে উপসর্গের কোনো স্বতন্ত্র অবস্থান নেই। কেন নেই? – এই প্রশ্ন আমাদের মনে আসতেই পারে। কেন উপর্গের নিজস্ব কোনো ভূমিকা নেই? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বসে খুঁজে পাওয়া যায়, উপসর্গের বিশেষ ভূমিকার কথা। থিটা তত্ত্বের ভিত্তিতে বাক্যে উপসর্গের বিশেষ ভূমিকা কিভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে তা আলোচ্য প্রবন্ধে সংক্ষেপে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ আছে। এছাড়া বাংলায় প্রচলিত কুড়িটি উপসর্গ ছাড়াও যে আরো বেশ কিছু উপসর্গ আছে, সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।
মূল শব্দ : উপসর্গ, থিটা, ধাতু, অর্থ, উৎকর্ষ, অপকর্ষ, প্রত্যয়, বিভক্তি, ক্রিয়া, সংসক্ত।

প্রচলিত সাধারণ ব্যাকরণে বলা হয়ে থাকে যে সমস্ত অব্যয় কোনো প্রত্যয় যুক্ত হয় না, যা ধাতুর আগে বসে এবং ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটায়, তাকে উপসর্গ (prefix) বলা হয়ে থাকে। উপসর্গ ধাতুর আগে বসে ধাতুর অর্থকে কখনো কখনো প্রকাশ করে, কখনো কখনো ধাতুর অর্থের পুষ্টিসাধন করে আবার কখনো বলপূর্বক ধাতুর অর্থের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিধান করে নানারকম অর্থান্তর ঘটায়। অর্থাৎ, নতুন শব্দের সৃষ্টির ক্ষেত্রে উপসর্গের সাহায্য প্রয়োজন হয়। কিন্তু শব্দের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিধান করা সম্ভব নয়। উপসর্গের ব্যবহারের ফলে শব্দের অর্থের পরিবর্তন হয়। শব্দের অর্থের উন্নয়ন ঘটতে পারে আবার না ঘটতেও পারে। যাকে আমরা (+Development) ও (-Development) হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।
উদাহরণ –

অব্যয়(যাতে প্রত্যয় যুক্ত হবে না) + ধাতু
আ (উপসর্গ) + কৃ (ধাতু) = আকার

আকার এর অর্থ মূর্তি এবং কৃ ধাতুর অর্থ কোনো কিছু করা। এখানে ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে।
এখানে বোঝা যাচ্ছে উপসর্গ গঠিত হয় অব্যয় ও ধাতুর সহযোগে।
এখন প্রশ্ন হল ধাতু কি? ব্যাকরণ অনুসারে ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণে ক্রিয়া বিভক্তিকে বাদ দিয়ে যে মৌলিক রূপ পাওয়া যায়, তা হল ধাতু।

যেমন – চল + ইতেছে = চলিতেছে

পড় + ইবে = পড়িবে

কর্ + এ = করে

এখানে ‘চল্’, ‘পড়’, ‘কর্’ হল ধাতু। যা ক্রিয়ার মূল অর্থ প্রকাশক অবিভাজ্য মৌলিক অংশ। ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশক এই অবিভাজ্য মৌলিক অংশের পূর্বে উপসর্গ বসে নতুন শব্দ গঠন করে।

প্রত্যেক ধাতুর নিজস্ব একটা অর্থ থাকে।

যেমন – কৃ (ধাতু) এর অর্থ – করা

হৃ (ধাতু) এর অর্থ – হরণ করা

গম্ (ধাতু) এর অর্থ – যাওয়া

নম্ (ধাতু) এর অর্থ – নত হওয়া

এই সূত্রে ধাতু এবং উপসর্গের একটা সম্পর্ক তৈরি হয় বাংলা ব্যাকরণে। যখন ধাতুর সঙ্গে উপসর্গ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরী হয়। তখন ধাতুর এই নিজস্ব অর্থ কখনো কখনো থাকে, কখনো কখনো ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটে।

যেমন – উপ+কৃ = উপকার

এখানে, কৃ ধাতুর অর্থ করা

উপকার করার অর্থ মঙ্গল। [অর্থাৎ ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে]

বি+হৃ = বিহার

হৃ ধাতুর অর্থ হরণ করা।

বিহার এর অর্থ ভ্রমণ করা।

এভাবেই,

কৃ ধাতুর অর্থ করা।

প্র+কৃ = প্রকার

পরি+কৃ = পরিস্কার

সম+কৃ = সংস্কার

অধি+কৃ = অধিকার

গম্ ধাতুর অর্থ যাওয়া।

সম্+গম্ = সংগত

বি+গম্ = বিগত

নিঃ+গম্ = নির্গমন

আ+গম্ = আগমন

একই ধাতুর সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গ যুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নির্মাণ করেছে। ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটছে।

আবার কখনো কখনো ধাতুর অর্থ শব্দে বজায় থাকে। সেক্ষেত্রে ধাতু নামপদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি করে।

যেমন – প্র+তাপ = প্রতাপ

অনু+রূপ = অনুরূপ

প্রতি+দিন = প্রতিদিন

ধাতুর পূর্বে যে অব্যয় বসে তৈরি করে নতুন শব্দ, এই অব্যয়কেই বলা হয় উপসর্গ। বাংলা ভাষায় এমন কতগুলি পদ আছে, যা কোন অবস্থাতেই কোনভাবে পরিবর্তিত হয় না। সেগুলি হল অব্যয়পদ। অর্থাৎ, যে পদের ব্যয় হয় না, তা হল অব্যয়পদ। অব্যয়পদ কোনো প্রত্যয় যুক্ত না হয়ে ধাতুর পূর্বে বসলে তা হয় উপসর্গ বা Prefix।

যেমন –

প্র + হৃ = প্রহার

উপসর্গ - (প্র, পরি, আ) পরি + কৃ = পরিস্কার

আ + গম্ = আগমণ

কখনো কখনো ধাতুর পূর্বে এক বা একাধিক উপসর্গ যুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ, একটিমাত্র অব্যয়পদ ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন অর্থযুক্ত শব্দ গঠন করে না। একাধিক অব্যয়পদ ধাতুর পূর্বে বসে, অর্থাৎ, উপসর্গ একের বেশি হয়।

যেমন –

সম্ + আ + লোচ্ + অন + আ = সমালোচনা

বি + অব + হৃ + ঘঞ = ব্যবহার

এখানে একের অধিক উপসর্গ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে। কখনো কখনো ধাতু নয়, শব্দের সঙ্গে উপসর্গ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে। সেক্ষেত্রেও আগের শব্দের অর্থ থাকে না। নতুন অর্থ তৈরি হয়।

যেমন – দুঃ + মুখ = দুর্মুখ

আমরা জানি, মুখ শব্দের অর্থ আনন। দুর্মুখ শব্দের অর্থ কটুভাষী।

ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী তাঁর *ভাষাবিজ্ঞান* বইতে দেখিয়েছেন সংসক্ত ভাষাকে। একাধিক অর্থযুক্ত উপাদান জুড়ে জুড়ে শব্দ গঠিত হয় এবং প্রতিটি উপাদান পাশাপাশি স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে। এদের মধ্যে কোনো রূপতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে না। শবদগুলি পাশাপাশি জুড়ে যেন বাক্যগঠন করে, তাই এই ধরনের ভাষাকে Agglutinative language বলা হয়।

এই ভাষার প্রকারভেদে তিনি দেখিয়েছেন উপসর্গ ও পরসর্গ যুক্ত সংসক্ত ভাষাগুলিকে। তিনি উপসর্গ সংসক্ত ভাষার উদাহরণ হিসেবে আফ্রিকার বান্টু ভাষার কথা বলেছেন। পরসর্গ সংসক্ত ভাষা হিসেবে ভারতীয় কন্নড় ভাষার কথা বলেছেন। উপসর্গ ও পরসর্গ উভয় সংসক্ত ভাষা হিসেবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় কোনো কোনো ভাষার কথা বলেছেন। এবং আংশিক সংসক্ত ভাষার উদাহরণ হিসেবে আগালক ভাষার কথা বলেছেন।

এই আগালক ভাষায় শব্দের মাঝে প্রত্যয় ও বিভক্তি বসে এবং অর্থের পরিবর্তন ঘটায়।

যেমন – sulat = লেখা

Sumulat = কাজ করা (এখানে ‘mu’ প্রত্যয় বা বিভক্তি)

বাংলাতে উপসর্গ ও পরসর্গ থাকলেই মধ্যসর্গ বা infix লক্ষ্য করা যায় না।

অর্থাৎ, অব্যয়ের তিনটি রূপ দেখা যায়।

- উপসর্গ (Prefix)
- মধ্যসর্গ (Infix)
- পরসর্গ (Suffix)

আমাদের মূল আলোচ্য অংশ উপসর্গ। বাংলায় এর বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মধ্যসর্গের ব্যবহার বাংলা ভাষায় নেই। পরসর্গ বাংলা ভাষাতে আছে। যেমন – আমা+র = আমার। এখানে 'র' পরসর্গ। অনেকে মনে করেন পরসর্গ ও অনুসর্গ একই বিষয়, তা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। মূল শব্দের অন্তে যুক্ত প্রত্যয় ও বিভক্তি হল পরসর্গ বা Suffix।

যেমন – ছেলে + রা = ছেলেরা (এখানে 'রা' পরসর্গ)

পরসর্গ মূল শব্দের সঙ্গে একসাথে যুক্ত হয়ে থাকে। অনুসর্গ উপসর্গের মতন অব্যয়, যা বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে পৃথকভাবে বসে এবং পদের অর্থ অ কারককে স্পষ্ট করে তোলে।

যেমন – রাম কর্তৃক রাবণ নিহত হল। (এখানে 'কর্তৃক' হল অনুসর্গ)

অনুসর্গ করণ কারক ও অপাদান কারককে চিহ্নিত করে।

করণ কারক [দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, করিয়া প্রভৃতি]

অপাদান কারক [হতে, থেকে, হইতে, চেয়ে প্রভৃতি] অনুসর্গ ও পরসর্গ এক বিষয় নয়। সংস্কৃত থেকে প্রায় কুড়িটি উপসর্গ ব্যবহৃত হয় বাংলায়। এছাড়া বাংলার নিজস্ব কিছু উপসর্গ আছে, ইংরেজি ও ফারসী কিছু উপসর্গ আছে।

প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব্, অনু, নির্, দুর, বি, অধি, সু, উদ্, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ। - এই উপসর্গগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে তৈরি। উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ না থাকলেও, তা অর্থের দ্যোতক হয়। সংস্কৃত উপসর্গের প্রায় প্রতিটি বিভিন্ন অর্থের দ্যোতক।

যেমন – 'প্র' উপসর্গটি উৎকর্ষ/ আধিক্য/ বৈপরীত্য/আরম্ভ/দক্ষতা/পরবর্তী/পূর্ববর্তী প্রভৃতি অর্থের দ্যোতক রূপে প্রকাশ পায়।

এই কুড়িটি উপসর্গ ছাড়াও আরো নয়টি স্থানীয় অব্যয় ধাতুর পূর্বে বসে উপসর্গের মতন ব্যবহৃত হয়।

যেমন – অন্তঃ, আবিঃ, বহিঃ, প্রাদুঃ, তিরঃ, পুরঃ, অলম্, সাক্ষাৎ, পূর্ব।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সংস্কৃত উপসর্গ ধাতু ছাড়াও বিশেষ্য ও বিশেষণের পাশেও বসে।

যেমন – প্র+পিতামহ = প্রপিতামহ।   প্র+খর =প্রখর

বাংলা উপসর্গগুলি ধাতুর পূর্বে বসে না। এগুলি বিশেষ্য ও বিশেষণের পূর্বে বসে। বাংলা উপসর্গগুলি হল – অ, আ, অনা, কু, সু, নি, নির্, পাতি, বি, ভর, হা, ভরা, স প্রভৃতি।

উদাহরণ – 'অ' (না অর্থে) অচেনা
'আ' (মন্দ অর্থে) আকাল
'অনা' (মন্দ অর্থে) অনাসৃষ্টি

ফারসী ও ইংরেজি উপসর্গ ব্যবহৃত হয় বাংলাতে। এগুলিকে loan Prefix বলা হয়। বাংলা ভাষার কোনো একটি শব্দের সঙ্গে জুড়ে এগুলি নতুন শব্দ তৈরি করে, এবং শব্দের অর্থের (+Development) ও (-Development) হয়।

যেমন – গর + মিল = গরমিল

হেড + মাস্টার = হেডমাস্টার

উপসর্গের থিটা ভূমিকা :

প্রত্যেক শব্দের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। শব্দ সাধারণত তিন ধরণের ভূমিকা পালন করে। যে কোনো শব্দে এই তিনটি ভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত মানসিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত তথ্য লাভ করা যায়।

১) উপাদান শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য : যেমন – খাব [+V -N]
আমি [+N -V]

২) অবর উপাদান শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য : যেমন – যাব [VP]
আমি [NP]

৩) বাছাইগত সীমাবদ্ধতা : খাব

প্রত্যেকটা শব্দের এই বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণভাবে থাকে। এখন আমরা দেখব উপসর্গের এরূপ ভূমিকা কেমন হয় –

Word	Position
Noun	+N -V
Verb	+V -N
Adjective	-N -V
Prefix	-N -V

Creat New Word

শব্দার্থতত্ত্বের বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দিয়েছেন চমস্কি। তিনি তাঁর তত্ত্ব P & P Theory তে Theta Theory নির্ধারণ করেছেন। শব্দের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ভাবগত ও বিষয়বস্তুগত সম্পর্ক। এই বিষয়বস্তুগত ভূমিকাকে তিনি বললেন Theta Role, এবং এই চিন্তাভাবনা থেকেই তৈরি হল Theta Theory। ভাষাবিজ্ঞানী Jackendoff, Sillmore, Gruber প্রমুখ শব্দের বিষয়বস্তুগত ভূমিকার কথা বলেছেন।

প্রত্যেক যুক্তির এক বা একাধিক Theta Role থাকবে। প্রত্যেকটা থিটা ভূমিকার সঙ্গে যুক্তির সংযোগ থাকবে। যাকে বলা হয় থিটা যোগ্যতা। চমস্কি তাঁর P &

P তত্ত্বে Theta Theory দ্বারা বাক্যের মধ্যে শব্দের বিষয়বস্তুগত ভূমিকাকে দেখান। কিন্তু সেখানে তিনি বিভক্তি, অব্যয়, প্রত্যয় প্রভৃতির Theta position দেখাননি। ইংরেজিতে যেহেতু সে অর্থে বিভক্তি, প্রত্যয়, অব্যয়, অনুসর্গ নেই, তাই P & P তত্ত্বে Theta position দেখানো হয়নি। কিন্তু বাংলা ভাষায় অনুসর্গ, উপসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি, অব্যয়ের ব্যবহার আছে, বাক্যে এগুলির কোনো Theta Role আছে কিনা এ প্রশ্ন মনে আসে। এগুলির বিষয়বস্তুগত ভূমিকা আছে কিনা তা দেখা যাতে পারে।

বাংলাতে প্রত্যয়, বিভক্তি, অনুসর্গ, উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। বাক্যে এগুলির নিজস্ব কোনো ভূমিকা নেই। সেকারণে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় না। আপাতভাবে তাই মনে হবে এগুলির Theta Position নেই। চমস্কি যে আট প্রকার Theta Role দেখিয়েছেন, তা ছাড়া যে বহু Theta role তৈরি করা সম্ভব তা আমরা জানি। এখন দেখতে হবে উপসর্গ, বিভক্তি, প্রত্যয় দ্বারা গঠিত নতুন শব্দ কোনো Theta Position তৈরি করতে পারে কিনা।

উপসর্গ ধাতু বা নামপদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, সেই নতুন শব্দের Theta Role বাক্যে থাকে। অর্থাৎ, বাক্যে থাকা উপসর্গ দ্বারা গঠিত নতুন শব্দের Theta Role এ উপসর্গের ভূমিকা থাকে। কারণ, একটি উপসর্গ নানারকম ধাতু বা শব্দের সঙ্গে জুড়ে নতুন নতুন শব্দ যেমন তৈরি করে তেমনি তৈরি করে নতুন Theta Role।

যেমন – নাটকটি অভিনীত হল।

অভিনীত = অভি + নী (ধাতু) + ক্ত

এখানে 'অভি' উপসর্গ। তার নিজস্ব কোনো থিটা ভূমিকা নেই। অথচ তা যখন নতুন অর্থ যুক্ত শব্দ গঠন করছে তার একটা Theta Position তৈরি হচ্ছে বাক্যে। ক্রিয়া (verb) এর পূর্বে বসে 'অভি' উপসর্গ নতুন থিটা ভূমিকা পালন করছে।

আবার,

অভিনীত নাটকগুলি খুব ভালো।

এখানে একই শব্দ ভিন্ন Theta Role এ বাক্যে অবস্থান করছে। এখানে তা বিশেষণ (Adjectives) হিসেবে ভূমিকা পালন করছে।

এইভাবে একই উপসর্গ যেমন নতুন নতুন শব্দ তৈরি করতে পারে, তেমনি সেই নতুন শব্দের নতুন Theta Position তৈরি করতে পারে।

যেমন – অনুরূপ (বিশেষ্য)
অনুগত (বিশেষণ)
অনুকৃত (বিশেষ্য)

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, একই উপসর্গ নতুন নতুন শব্দ গঠন দ্বারা নতুন নতুন Theta Role তৈরি করছে।

যেমন – আনত (বিশেষণ) প্রতিবিম্ব (বিশেষ্য) অপকার (বিশেষ্য)

আভাস (বিশেষ্য) প্রতিপালন (বিশেষণ) অপকৃত(বিশেষণ)

প্রত্যেকটি উপসর্গ বিভিন্ন শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে নতুন শব্দ তৈরী করছে। তাদের একটা নিজস্ব শ্রেণিকরণ তৈরি হয় বাক্যে প্রয়োগ করায়। বাক্যে প্রয়োগ হলে তার Theta ভূমিকাও তৈরি হয়, আবার আলাদাভাবে শব্দগুলির শ্রেণিকরণ তৈরি হয়। উপসর্গ(Prefix) হল [-N, -V], কিন্তু এই উপসর্গ তৈরি করতে সক্ষম বিশেষ্য বা বিশেষণ বা ক্রিয়া পদ। বাক্যের গঠন হওয়ার পর এই শব্দগুলি বাক্যের গঠন অনুযায়ী বদলে যেতে থাকে। অর্থাৎ, উপসর্গ নিজে কোনো বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াপদ না হলেও তা বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াপদ তৈরি করতে পারে।

Prefix(-N,-V) + Root/ Main word = New Word (+N,+V)

বাক্যে স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত না হওয়ার কারণে উপসর্গের নিজস্ব কোনো থিটা ভূমিকা নেই। শব্দ বা ধাতুর সহযোগে নতুন শব্দ তৈরি করতে উপসর্গের বিশেষ ভূমিকা আছে। সেই নতুন শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হয় এবং সেই শব্দের বাক্য নিজস্ব থিটা ভূমিকা আছে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে উপসর্গ বাক্যে একটা থিটা ভূমিকা পালন করে। যার ফলে এলই উপসর্গ বাক্যে নতুন নতুন শব্দের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন থিটা ভূমিকা তৈরি করে।

যেমন – প্রখর রোদ্দুর উঠেছে।

বাক্যে (প্র+খর) 'প্রখর' শব্দটির অবস্থান বিশেষণ রূপে আছে। বাক্যে এর একটা Theta Role আছে। উপসর্গ 'প্র' এর আলাদা কোনো থিটা ভূমিকা না থাকলেও তা পরোক্ষে একটা থিটা ভূমিকা তৈরি করছে।

আবার, এই একই উপসর্গ যখন অন্য থিটা ভূমিকা তৈরি করে। তখন –

যেমন – প্রভাতে সূর্য ওঠে।

এখানে (প্র+ভাত) 'প্রভাত' শব্দটির অবস্থান বিশেষ্য রূপে। যার ফলে একই উপসর্গ 'প্র' বাক্যে নতুন আর একটি শব্দের মধ্য দিয়ে অন্য আর একটি থিটা ভূমিকা পালন করছে।

অর্থাৎ, একই উপসর্গ ভিন্ন ভিন্ন শব্দ কেবল গঠন করতে পারে না, একই সঙ্গে তা ভিন্ন ভিন্ন Theta Position কে নির্দেশ করে।

উপাদান শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উপসর্গগুলি -N, -V। অর্থাৎ, বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়া জাতীয় কোনো পদগত ভূমিকা নেই, কারণ উপসর্গের কোনো অর্থ নেই। যার ফলে বাক্যে স্বতন্ত্র ব্যবহার নেই উপসর্গের। কিন্তু উপসর্গ নিজে -N বা -V হলেও, তা তৈরি করতে পারে (+V -N), (+N -V)। কখনো কখনো উপসর্গ নিজে শব্দ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত উপসর্গগুলির মধ্যে অন্যতম হল – অতি, অনু, প্রতি প্রভৃতি উপসর্গ। এই উপসর্গগুলি স্বাধীন, এগুলি পৃথকভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে অর্থ প্রকাশ করে। সেই সময় এগুলিকে শব্দ হিসেবে ধরা হয়, উপসর্গ

হিসেবে নয়। আবার যখন, এই উপসর্গ ধাতু বা অন্য শব্দের সঙ্গে জুড়ে যায় তখন তাদের পুরোনো অর্থ সর্বদা বজায় থাকে না। নতুন ভূমিকা তৈরি হয়ে যায়।

কখনো কখনো আবার কেবলমাত্র উপসর্গের বদলের ফলে শব্দের অর্থ, গঠন ও তার ভূমিকা সমস্ত কিছুর বদল ঘটে। অর্থাৎ, শব্দের গঠনে ও অবস্থানে উপসর্গের একটা Theta Position আছে।

যেমন – প্রশ্বাস > নিঃশ্বাস
সজন > বিজন
প্রকীর্ণ > সংকীর্ণ
প্রকৃতি > বিকৃতি

সাধারণ ব্যাকরণে মনে করা হয়, উপসর্গের কোনো অর্থ নেই, আলাদা করে কোনো ভূমিকা নেই। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *উপসর্গের অর্থবিচার* অনুসরণে ও *সংবর্তনী ব্যাকরণ* এর থিটা তত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলা ভাষায় ও ব্যাকরণে উপসর্গের বিশেষ ভূমিকা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও কেবলমাত্র থিটা ভূমিকা নয়, উপসর্গের আরো বহু ভূমিকা নির্ণয় করা সম্ভব। আধুনিক ব্যাকরণে উপসর্গের নতুন ভূমিকা দেখানো সম্ভব। যা থেকে উপসর্গের গঠন, অর্থ, অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মাধ্যমে উপসর্গের নতুন কিছু দিক নির্দেশ করা যাবে। উপসর্গের নিজস্ব পদগত ভূমিকা না থাকলে উপসর্গ থিটা ভূমিকা তৈরি হতে দেখতে পাই আমরা। ব্যাকরণের অন্যতম একটি বিষয় উপসর্গ। তা যে কেবল ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে এমনটা নয়, শব্দের অবস্থান, অর্থ, ভূমিকাকেও নির্ধারণ করে। থিটা ভূমিকা ছাড়াও রূপতত্ত্বেও উপসর্গের বিশেষ ভূমিকা দেখা যায়। কারক নির্ণয়েও উপসর্গের গুরুত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

সহায়ক গ্রন্থ তালিকা :

- চক্রবর্তী, বামনদেব। *উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ।* অক্ষয় মালঞ্চ প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা। কলকাতা। ২০০৭।
- চক্রবর্তী, উদয়কুমার। *বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ।* আনন্দ পাবলিকেশন। কলকাতা। ২০১৩।
- চক্রবর্তী, উদয়কুমার, এবং চক্রবর্তী, নীলিমা। *ভাষাবিজ্ঞান।* দেজ পাবলিশিং। কলকাতা। ২০১৫।
- ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ। *উপসর্গের অর্থবিচার।* জিজ্ঞাসা। কলিকাতা। ১৯৭৯।
- দাস, ঋষি এবং চট্টোপাধ্যায় নরনারায়ণ। *ব্যাকরণ বীথি*। ত্রয়ী প্রকাশ। কলকাতা। ২০০৩।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। *বঙ্গীয় শব্দকোষ (প্রথম খন্ড)।* সাহিত্য আকাদেমি। কলকাতা। ২০১১।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। *বঙ্গীয় শব্দকোষ (দ্বিতীয় খন্ড)।* সাহিত্য আকাদেমি। কলকাতা। ২০১১।

রবীন্দ্র সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ন

মুকুল সেন
সহ: শিক্ষক - নিত্যানন্দপুর হাই স্কুল (উ: মা:)
নিত্যানন্দপুর, গঙ্গাজলঘাটি, বাঁকুড়া

সারসংক্ষেপ - মানুষের জীবনের বিনোদনের অঙ্গ হল চলচ্চিত্র বা সিনেমা। লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় প্রথম সিনেমা তৈরি করেন। ১৮৯৫ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর প্যারিসের গ্র্যান্ড ক্যাফেতে কুড়িটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি দেখানো হয়। ১৮৯৬ সালে বোম্বাইয়ে সিনেমা প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে ভারতে সিনেমার সূচনা হয়। ভারতীয় সিনেমার এই যুগকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় নির্বাক ও সবাক। ১৯১৮ সালে হীরালাল ও মতিলাল সেন রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি তৈরি করে মঞ্চসফল নাটক গুলিকে পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে শুরু করেন। বাংলায় সিনেমা তৈরি করতে এগিয়ে আসেন জে এফ ম্যাডান। ১৯১৯ সালে তাদের প্রযোজনায় প্রথম বাংলা কাহিনি চিত্র 'বিল্বমঙ্গল' তৈরি হয়। তবে রবীন্দ্র কাহিনির চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রথম এগিয়ে আসেন পরিচালক নরেশচন্দ্র মিত্র। তবে সেটা নির্বাক যুগ। নির্বাক যুগেই মানভঞ্জন, বিসর্জন, বিচারক, গিরিবালা, নৌকাডুবি নির্মিত হয়। ১৯৩১ সাল থেকে বাংলা চলচ্চিত্রে সবাক যুগ শুরু হয়। এই সময় থেকে রবীন্দ্র উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কবিতা ও জীবনসাহিত্য অবলম্বনে বহু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। নীতিন বসু, মধু বসু, সতু সেন, নরেশচন্দ্র মিত্র, তপন সিনহা, মৃণাল সেন, দেবকীকুমার বসু থেকে শুরু করে সত্যজিৎ রায় একালের ঋতুপর্ণ ঘোষ প্রায় সকলেই রবীন্দ্রকাহিনি অবলম্বনে ছবি নির্মাণ করেন। ম্যাডান, নিউথিয়েটার্স, এন. এফ. ডি. সি. থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সকলেই রবীন্দ্র কাহিনি ভিত্তিক ছবি তৈরিতে এগিয়ে আসেন। আশা করি এই ধারা অব্যাহত থাকবে। রবি কাহিনি নির্মিত ছবি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।

মূলশব্দ: লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়, বায়োস্কোপ, ম্যাডান, নরেশচন্দ্র মিত্র, অগ্রদূত, তপন সিনহা, সত্যজিৎ রায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, চারুলতা, সেলুলয়েডের পর্দা। রবীন্দ্র সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ন।

চলমানতার স্রোতে মানুষের জীবন বয়ে যায়। সেই জীবনের ভাসমানতায় দৈনন্দিন একঘেয়েমি কাটানোর জন্য মানুষের জীবনে আনন্দানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। সুপ্রাচীন কাল থেকে শিকার, পাশাখেলা, নাচ-গান প্রভৃতি ছিল মানুষের উৎসব অনুষ্ঠানের অঙ্গ। তারপর মানুষ পাহাড় চূড়ায় নাটক অভিনয় করতে ও দেখতে শিখলো। এরই পথ ধরে এলো মঞ্চবেঁধে নাটকের অভিনয়। ধীরে ধীরে মানুষের জীবনকে সেলুলয়েডের পর্দায় রূপ দেবার বাসনা জাগলো। জন্ম হল বায়োস্কোপ বা সিনেমার। অগাস্ট এবং

লুই লুমিয়ের অর্থাৎ লুমিয়ের ব্রাদার্স নামে যারা খ্যাত তারাই প্রথম সিনেমা তৈরি ও প্রদর্শন করেন। ১৮৯৫ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর প্যারিসের গ্রান্ড ক্যাফেতে কুড়িটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি দেখানো হয়। ফ্রান্সের প্রথম সিনেমা প্রদর্শনীর মাস ছয়েক পর ১৮৯৬ সালের ৭ ই জুলাই লুমিয়েরদের প্রতিনিধি মরিস সেসটিয়ার বোম্বাইয়ের ওয়াটসন হোটেলে ছবি দেখান। সেই থেকে ভারত জুড়ে নির্বাক চলচ্চিত্রের সূচনা হয়। ঐবছরই ডিসেম্বর মাসে কলকাতাতেও সিনেমা প্রদর্শিত হয়। তারপর ব্রিটিশদের সাথে বোঝাপড়া করে কলকাতার থিয়েটার প্রেক্ষালয় গুলি থিয়েটারের পূর্বে স্বল্প দৈর্ঘ্যের বায়োস্কোপ দেখাতে শুরু করে। এভাবে বিদেশি কোম্পানির হাত ধরে বাংলায় এল বায়োস্কোপ।

১৯১৮ সালে হীরালাল সেন এবং তাঁর ভাই মতিলাল সেন রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানি তৈরি করেন। সেই সময়কার মঞ্চসফল নাটকগুলিকে তিনি পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে শুরু করেন। বাংলায় সিনেমা তৈরি করতে এগিয়ে আসেন জে. এফ. ম্যাডান। ১৯১৯ সালে ম্যাডান কোম্পানির প্রযোজনায় প্রথম বাংলা কাহিনি চিত্র ‘বিল্বমঙ্গল’তৈরি হয়। তবে রবীন্দ্রকাহিনির চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রথম এগিয়ে আসেন পরিচালক নরেশচন্দ্র মিত্র। তবে সেটা নির্বাক যুগ। সেই সময় অর্থাৎ ১৯২৩ সালে মিত্র মহাশয় তাজমহল ফিল্ম কোম্পানির প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প অবলম্বনে ছবি করেন ‘মানভঞ্জন’। এর আগেও রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে বাংলা সিনেমা তৈরি হতে পারত। ১৯২০ সালে ‘বিসর্জন’ নাটক নিয়ে ছবি করার কথা ভেবেছিলেন ম্যাডান কোম্পানির রুস্তমজি দোতিয়ালা। তিনি আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বা ডি জি কে ‘বিসর্জন’ পরিচালনার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি সেই অনুরোধ গ্রহণও করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯২০ সালে এই নাটক চলচ্চিত্রের আকারে মুক্তি পায়নি। ব্যবসায়িক বুদ্ধির মানুষ ম্যাডান সাহেব বা ম্যানেজার মি. রুস্তমজি দোতিয়ালার সঙ্গে হয়তো ডি জি-র মনমালিন্য হয়। সেই কারণেই বোধহয় ‘বিসর্জন’ চলচ্চিত্র সম্পূর্ণ করা যায়নি। সেই অর্থে ‘মানভঞ্জন’-ই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য নিয়ে তৈরি প্রথম ছবি।

অবশ্য নির্বাক যুগেই রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’ নাটক চলচ্চিত্রে রূপ পাই ১৯২৮ সালের ২৩ শে ডিসেম্বর। ওরিয়েন্ট পিকচার্স কর্পোরেশন ও ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে ‘বিসর্জন’ চলচ্চিত্রায়িত হয়। ১৯২৮ সালে রবীন্দ্রনাথের ‘বিচারক’ চলচ্চিত্রে রূপ পাই। এই ছবির পরিচালক ছিলেন দিকপাল নাট্যব্যক্তিত্ব শিশির কুমার ভাদুড়ি। ছবির প্রযোজক ছিল ইস্টার্ন ফিল্ম সিন্ডিকেট। কিন্তু সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র না পাওয়ায় কয়েকদিন পরেই ছবির প্রদর্শন বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৩২ সালের ২২ শে মার্চ সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র সহ ছবিটি পুনরায় প্রদর্শিত হয় ও দর্শকদের সমাদরও পায়।

১৯৩০ সালে নির্বাক যুগে রবীন্দ্রনাথের ‘মানভঞ্জন’ ছোটগল্প অবলম্বনে আবার ছবি তৈরি করেন মধু বসু; নাম দেন 'গিরিবাল'। এই বছরেই তিনি রবীন্দ্রনাথের

'দালিয়া' ছোটগল্পকে পর্দায় ছবিতে রূপ দেন। দুটি ছবিরই প্রযোজক ম্যাডান। চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে মধু বসু যথেষ্ট সম্মান পেয়েছিলেন। চিত্র পরিচালনাকে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করার প্রথম সম্মান তাঁরই প্রাপ্য। ক্রাউন সিনেমা হলে বক্সে বসে 'গিরিবালা' ছবির মুক্তির প্রথম দিন রবীন্দ্রনাথ তা দেখেছিলেন। ভালো ছবি করার সুবাদে মধু বসু কবির আশীর্বাদও পেয়েছিলেন। নির্বাক যুগে রবীন্দ্রকাহিনির শেষ ছবি 'নৌকাডুবি'। রবীন্দ্রউপন্যাসের এই চলচ্চিত্রর রূপ মুক্তি পায় ১৯৩২ সালে। পরিচালক নরেশচন্দ্র মিত্র, প্রযোজক ম্যাডান থিয়েটার্স। কিন্তু মুন্সিয়ানার অভাবে এ ছবি অনর্থক দীর্ঘায়িত হয়; যা তৎকালীন দর্শকদের মনোরঞ্জনের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটায়। আর এই ছবি নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা সিনেমায় নির্বাক যুগের অবসান ঘটে। ১৯৩১ সাল থেকে বাংলা চলচ্চিত্রে সবাক যুগ শুরু হয়। এই সময় থেকে রবীন্দ্র উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কবিতা ও জীবনী সাহিত্য অবলম্বনে বহু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'দৃষ্টিদান' ছোটগল্প অবলম্বনে ১৯৪৮ সালে নীতিন বসুর পরিচালনায় এস. বি. প্রোডাকশনের প্রযোজনায় সাদা-কালো ছবি 'দৃষ্টিদান' তৈরি হয়। রবীন্দ্রগল্প 'কাবুলিওয়ালা'-কে সেলুলয়েডের পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে অগ্রসর হন তপন সিনহা। ১৯৫৭ সালে ১১ রিলে তৈরি হয় সাদা-কালো ছবি। এই ছবির নাম ভূমিকায় অর্থাৎ কাবুলিওয়ালা রহমতের চরিত্রে ছবি বিশ্বাসের অনবদ্য অভিনয় কখনো ভোলার নয়; আর সেই মিনি চরিত্রে চার বছরের টিংকু ঠাকুরের অভিনয়ও অসাধারণ। ১৯৬১ সালে অর্থাৎ রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে হেমেন গুপ্তের পরিচালনায় পুনরায় 'কাবুলিওয়ালা' নির্মিত হয়; তবে এটি হয় হিন্দিতে।

'কাবুলিওয়ালা'-র পর তপন সিনহা 'ক্ষুধিত পাষাণ'-কে সেলুলয়েডের পর্দায় ফুটিয়ে তোলেন। যদিও এর পশ্চাতে কারিগর ছিলেন হেমেন গাঙ্গুলী। তিনি নিজে পরিচালককে বলেন- "আপনাকে দিয়ে আমি একটা ছবি করাতে চাই। যদি সাবজেক্টটা পছন্দ হয় তবেই আমার কাছে আসবেন, না হলে আসার কোন দরকার নেই। সাবজেক্টটা হলো রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'।" পরিচালক এই ছবির কথা শুনেই কাহিনীর গোটা বাড়িটার একটা কল্পিত ছক করে নেন। এ ব্যাপারে তপন বাবুকে সাহায্য করেন সত্যজিৎ রায়। ফতেপুরি আর্ট-এ জাফরির সাজেশনটা তারই দেওয়া। এই ছবির আউটডোর লোকেশন এর জন্য হেমেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে তপন সিনহা প্রথমে যান গুজরাটের আমেদাবাদে। রবীন্দ্রনাথের দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন যে বাংলোতে ছিলেন অর্থাৎ যেখানে বসে রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষুধিত পাষাণ' লেখেন। কিন্তু মোগল আমলের পুরনো সেই বাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় সেখানে শুটিং সম্ভব হয়নি। পরে ভোপালের নবাব বাড়িতে শুটিং হয়। পরে বিকনিরের মরুভূমিতেও শুটিং হয়েছিল। এ ছবির সম্পদ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ও অরুন্ধতী দেবীর অসাধারণ অভিনয় এবং আলী আকবর খাঁ সাহেবের মিউজিক। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৬০ সালের

৬ই মে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জন্ম সপ্তাহে। ১৯৬৫ সালে তপন সিনহা নিউ থিয়েটারসের প্রযোজনায় তৈরি করেন 'অতিথি'। নতুন শিল্পীদের নিয়ে তৈরি হয় এই লিরিক্যাল ছবি। তারাপদ চরিত্রে পার্থ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে পলাতক রবীন্দ্রমনকেই খুঁজে পাই। ১৯৬০ সালে অগ্রদূত তৈরি করেন রবীন্দ্র ছোটগল্প অবলম্বনে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'। তারপর রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সেলুলয়েডের পর্দায় আশ্চর্যভাবে ফুটে ওঠে বিশ্ববরণ্যে পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের হাতে। ১৯৬১ সালে তিনি নির্মাণ করেন 'তিনকন্যা'; উৎসভূমি রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোটগল্প 'পোস্টমাস্টার', 'সমাপ্তি' এবং 'মনিহারা'। নারীত্বের তিনটি ধরন নিয়েই রবীন্দ্রনাথের তিনকন্যা। নারীত্বের তিন অভিব্যক্তি এ গল্পগুলোতে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। রতন কিশোরী, মৃন্ময়ী তরুণী, মনিমালা যুবতী। রতনের বয়স এগারো বারো, মৃন্ময়ী তার তুলনায় খানিক বড় এবং মনিহারা প্রগাঢ় যৌবনা। নারীত্বের তিনটি ধরন, পুরুষকে অভিমুখ করে তাদের দিকে। 'পোস্টমাস্টার' এমনই এক প্রেমের গল্প যেখানে সন্নিহিত পুরুষ ও নারী পরস্পরের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন নয়। এই বিষয়টি সত্যজিতের ছবিতে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়। 'সমাপ্তি'-তেও গ্রামের ডিটেলিং অসামান্য। গ্রামের নদী, কাদাভর্তি পাড়, ধাবন্ত রানার, গাছের দোলনা, কাঠবিড়ালি, চরকি মৃন্ময়ীকে এক ধরনের পূর্ণতা দিয়েছে। এই ছবিকে আরও পরিপূর্ণ করে তুলেছে সত্যজিতের পরিচালনার মুন্সিয়ানা এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেনের অসাধারণ অভিনয়। ১৯৭১ সালে হিন্দিতেও সমাপ্তি তৈরি হয় 'উপহার' নামে, পরিচালনা করেছিলাম সুধেন্দু রায়। তিন কন্যার শেষ কন্যা মনিমালিকা। এই ছবির কিছু শিল্পগত ত্রুটির জন্যই বিদেশে প্রদর্শনীতে তা বাদ যায়। ১৯৬৪ সালে সত্যজিৎ রায় সেলুলয়েডে রূপ দেন রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্পটি, ছবির নাম 'চারুলতা', প্রযোজক আর. ডি. বনসাল। 'চারুলতা'-কে তার শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম বলে স্বীকার করেছেন সত্যজিৎ রায়। এ ছবিতে সৌমিত্র ও মাধবী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় এবং সংগীতের ব্যবহার দর্শকদের মুগ্ধ করে। ১৯৬৪ সালে পার্থপ্রতিম চৌধুরী নির্মাণ করেন ১৩ রিলের সাদা-কালো ছবি 'সুভা ও দেবতার গ্রাস'। ১৯৭০ সালে রবীন্দ্রছোটগল্প অবলম্বনে তৈরি হয় তিনটি ছবি - স্বদেশ সরকারের পরিচালনায় 'শাস্তি'; মৃণাল সেন চিলড্রেনস ফিলম সোসাইটির প্রযোজনায় নির্মাণ করেন 'ইচ্ছাপূরণ'। অরুন্ধতী দেবী তৈরি করেন 'মেঘ ও রৌদ্র'। বিখ্যাত পরিচালক অজয় করের নির্দেশনায় তৈরি হয় ১৯৭১ সালে 'মাল্যদান'; পূর্ণেন্দু পত্রী করেন ১৯৭৩-এ 'স্ত্রীরপত্র'। ১৯৮৫ সালে নব্যেন্দু গুপ্ত 'দিদি' নির্মাণ করেন। ১৯৯৬ সালে পরিচালক নীতিশ মুখোপাধ্যায় এন. এফ. ডি. সি.-র প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের 'রবিবার' গল্পটিকে পর্দায় রূপ দেন।

রবীন্দ্র উপন্যাস-কে চলচ্চিত্র রূপ দেওয়ার কাজ শুরু হয় নির্বাক যুগেই। ১৯৩২ সালে পরিচালক নরেশচন্দ্র মিত্র 'নৌকাডুবি'-কে সেলুলয়েডের পর্দায় ফুটিয়ে তোলেন। তবে সবাক যুগে রবীন্দ্র উপন্যাস 'গোরা' কে সিনেমার পর্দায় সকলের সামনে আনেন

সেই নরেশচন্দ্র মিত্র। এই ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯৩৮ সালেই সতু সেনের পরিচালনায় 'চোখের বালি' চলচ্চিত্রে রূপ পায়। ২০০৩ সালে ভেঙ্কটেশ ফিল্মসের প্রযোজনায় ঋতুপর্ণ ঘোষ পুনরায় ১৪ রিলের রঙিন ছবি 'চোখের বালি' নির্মাণ করেন। এই ছবিতে বিনোদিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেন ঐশ্বরিয়া রায়। ১৯৪৭ সালে 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের কাহিনিকে পুনরায় পর্দায় রূপ দেন পরিচালক নীতিন বসু; ছবিটিকে তিনি হিন্দিতেও তৈরি করেন 'মিলন' নামে। ১৯৭৯ সালে অজয় করের পরিচালনায় ১৬ রিলের সাদাকালো ছবি 'নৌকাডুবি' পর্দায় রূপ পায়। পুনরায় ২০১১ সালে ঋতুপর্ণ ঘোষ 'নৌকাডুবি'-র কাহিনিকে সেলুলয়েডের পর্দায় ফুটিয়ে তোলেন। তবে এটি হয় রঙিন ছবি।

ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রবীন্দ্র কাহিনী নিয়ে ছবি তৈরি অব্যাহত থাকে। ১৯৫১ সালে হেমেণ গুপ্তের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' পর্দায় রূপ পায়; পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৫২ সালে হিন্দিতে 'চার অধ্যায়' রূপ পায় 'জলজ্বলা' নামে, পরিচালক পল জিলেস্। ১৯৫৩ সালে রবীন্দ্রনাথের তিনটি উপন্যাস সেলুলয়েডের পর্দায় ফুটে ওঠে বউ ঠাকুরানীর হাট, মালঞ্চ, শেষের কবিতা। নরেশ মিত্রের পরিচালনায় রূপ পায় বউ ঠাকুরানীর হাট। প্রফুল্ল রায় নির্মাণ করেন দুটি ভাষায় 'মালঞ্চ'। বাংলাতে 'মালঞ্চ' নামেই ছবি তৈরি হলেও হিন্দিতে নাম দেন 'ফুলওয়ারি'। মধু বসুর পরিচালনায় ১৪ রিলের সাদাকালো ছবি নির্মিত হয় রবীন্দ্র উপন্যাস 'শেষের কবিতা'-র। পরিচালক নীতিন বসু আবার রবীন্দ্র উপন্যাস অবলম্বনে ছবি তৈরি করার কথা ভাবেন ১৯৫৮ সালে। বেছে নেন রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কাহিনিকে। তৈরি হয় ১৫ রিলের সাদা কালো ছবি।

রবীন্দ্র উপন্যাসের কাহিনিকে পর্দায় রূপ দিয়ে জগৎবিখ্যাত করে তোলেন বিশ্ববরেণ্য পরিচালক সত্যজিৎ রায়। সত্যজিতের ইচ্ছে ছিল তিনি নিজের ফিল্ম জীবন শুরু করবেন রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের চিত্ররূপ দিয়ে। এ বিষয়ে তিনি বেশ কিছুটা অগ্রসরও হয়েছিলেন। এ ছবির জন্য সত্যজিৎ চিত্রনাট্য লিখেছিলেন ১৯৪৬ সালে, ফিল্ম তৈরির পরিকল্পনা হয় ১৯৪৮ এ। কিন্তু নানা কারণে তখন 'ঘরে বাইরে' প্রকল্প বাতিল হয়। 'ঘরে বাইরে' পরিকল্পনাটি যদি সাফল্য পেত তাহলে বাংলা ছবিতে সত্যজিতের আবির্ভাব ঘটতো রবীন্দ্রনাথের কাহিনি নিয়েই। কিন্তু এর বেশ কিছুদিন পর ১৯৮৫ সালে এন. এফ. ডি.সি.-র প্রযোজনায় সত্যজিৎ রায় নির্মাণ করেন ১৫ রিলের রঙিন ছবি 'ঘরে বাইরে'। এই ছবিতে সন্দীপের ভূমিকায় অভিনয় করেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, নিখিলেশ হন ভিক্টর ব্যানার্জি, বিমলা স্বাতীলেখা মিত্র।

রবীন্দ্র প্রতিভা সৃষ্টির পর সৃষ্টি করে গেছেন। নির্মাণ কৌশলের রথে চড়ে তিনি নবপ্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন। বিশ্বের এমন কোন দিক নেই যা রবিরশ্মির আলোয়

আলোকিত হয়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথ কবিতা, উপন্যাস, গল্প, নাটক ইত্যাদি রচনা করেছেন। আর চলচ্চিত্র নির্মাতারা বারবার দ্বারস্থ হয়েছেন রবীন্দ্র কাহিনির। তাই রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস থেকে যেমন ছবি তৈরি হয়েছে; তেমনি রবীন্দ্রনাট্য-কবিতাও চলচ্চিত্রের বিষয় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাট্য প্রথম সেলুলয়েডের পর্দায় ফুটিয়ে তোলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' নাটকটিকে তিনি পর্দায় রূপ দেন সবাক যুগের শুরুতে ১৯৩২ সালে। পুনরায় দেবকীকুমার বসু 'চিরকুমার সভা' করেন ১৯৬৫ সালে। ১৯৪২ সালের সৌমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ও নিউ থিয়েটারসের প্রযোজনায় 'শোধবোধ' রবীন্দ্রনাট্য পর্দায় রূপ পায়। ১৯৪৪ সালে রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' নাট্য কাহিনিকে সেলুলয়েডের পর্দায় ফুটিয়ে তোলেন পশুপতি চ্যাটার্জী। ১৯৭৭ সালে পুনরায় 'শেষ রক্ষা' নাটকটিকে পর্দায় রূপদান পরিচালক শঙ্কর ভট্টাচার্য। এ ছবির সংগীত পরিচালনা করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ১৯৫৫ সালের রবীন্দ্রনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' কে সেলুলোয়েডের পর্দায় আনেন হেমচন্দ্র ও সৌরেন সেন। ১৯৬৫ সালে জল ভিল্লানি হিন্দিতে নির্মাণ করে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকটিকে পর্দায় তুলে ধরেন। এটি ইংরেজিতেও তৈরি হয়। ১৯৭৪ সালে বীরেশ্বর বসুর পরিচালনায় ১১ রিলে সাদাকালো ছবি 'বিসর্জন' নির্মিত হয়। ১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' নৃত্যনাট্য চলচ্চিত্রে রূপ পায়। নিউ থিয়েটার্স এর প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় এটি পর্দায় ফুটে ওঠে। ফিল্মটির শুরুর দুটি দৃশ্যে রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করেন। ১৯৪০ সালে ৭ ই আগস্ট নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও তে আগুন লাগলে এর বেশ কিছু অংশ ভস্মিভূত হয়। পরে কোন সূত্রে ১৬ মিলিমিটার নির্বাক ফিল্মের অংশ বিশ্বভারতীতে আসে। বহু প্রচেষ্টায় এর সংস্কার হয় ১৯৯৫ সালে তারপর তা রবীন্দ্রভবনের হাতে তুলে দেওয়া হয়।।

সমগ্র বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম পরিচয় একজন কবি হিসাবে। সেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা অবলম্বনেও চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। ১৯৬১ সাল বিশ্ববাসীর কাছেও গুরুত্বপূর্ণ; ভারতীয় তথা বাঙালীদের কাছে তো বটেই - কারণ এটি রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী। সেই বছরেই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণের কথা ভাবেন ভারত সরকার। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর ইচ্ছা ছিল এই তথ্যচিত্র নির্মাণ করুক সত্যজিৎ রায়। সেই অনুযায়ী ভারতীয় ফিল্মস ডিভিশনের প্রযোজনায় সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় ১৯৬১ সালে মুক্তি পায় তথ্যচিত্র 'রবীন্দ্রনাথ'। সেই বছরই রবীন্দ্র কবিতা অবলম্বনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজনায় দেবকিকুমার বসুর পরিচালনায় তৈরি হয় 'অর্ঘ্য'। রবীন্দ্রনাথকে অর্ঘ্য নিবেদন এর উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় 'অর্ঘ্য' নামক চলচ্চিত্র। বেছে নেওয়া হয় রবীন্দ্রনাথের তিনটি কবিতা - দুই বিঘা জমি, পুরাতন ভৃত্য ও অভিসার- এই তিনটি কবিতার চলচ্চিত্রায়নে সংগীত পরিচালক ছিলেন সন্তোষ সেনগুপ্ত। অভিনয় ছিলেন মঞ্জুশ্রী চাকী, বনানী চৌধুরী, সন্ধ্যা রায়, দ্বিজু ভাওয়াল, জ্ঞানেশ মুখার্জি প্রমুখ। ১৯৬১ এর ৮ই মে ছবিটি মুক্তি পায়। ঐ বছরই

বছরই অর্থাৎ ১৯৬১ সালে ফনি মজুমদারের পরিচালনায় তৈরি হয় রবীন্দ্রনাথের ‘বীরপুরুষ’ কবিতাটির চলচ্চিত্রায়ন। ১৯৮৬ সালে রবীন্দ্রনাথের ‘ছেলেটা’ কবিতাটি সেলুলয়েডের পর্দায় ফুটে ওঠে। এই ছবির প্রযোজক পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পরিচালক সন্তোষ ঘোষাল। সাদা কালো ১০ রিলে তৈরি হয় এই ছবি। রবীন্দ্রনাথের কাহিনী ধর্মী আরও বহু কবিতা চলচ্চিত্রে রূপ পাবার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে মুক্তি, ক্যামেলিয়া, বাঁশি, প্রথম পূজা, শাপমোচন, সাধারণ মেয়ে প্রভৃতির নাম করা যায়। রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত দীর্ঘতর বর্ণনামূলক কবিতাগুলির উপযুক্ত চিত্রনাট্য নির্ভর অভিনয়কে যদি সেলুলয়েডের মাধ্যমে ধরে রাখা যায়, তবে সেই চলচ্চিত্র রূপায়ণ নিঃসন্দেহে বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্র সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়নের আরেকটি দিক উত্থাপন করে এই প্রসঙ্গের আলোচনায় ইতি টানবো। রবীন্দ্র সাহিত্যের বিপুল ভান্ডারের মধ্যে রয়েছে আত্মজীবনী ও। রবীন্দ্রনাথের সেই ‘ছেলেবেলা’ গ্রন্থটিকে চলচ্চিত্রে রূপদান করেন পরিচালক সুকান্ত রায়। রবীন্দ্র সাহিত্য এক অফুরন্ত রত্নের ভান্ডার। তাই সেই সাহিত্য ভান্ডার থেকে রত্ন আহরণ করে চিরকাল ধরে সিনেমা নির্মাণ করে চলবেন সাহিত্য ও সিনেমা প্রেমী মানুষেরা। আমরাও পথ চেয়ে রইলাম নবরূপে রবীন্দ্র সাহিত্যকে পর্দায় দেখবার আশায়।

তথ্যসূত্র

১. ‘পশ্চিমবঙ্গ’ (রাজ্য সরকারের মাসিক মুখপত্র), রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র বিশেষ সংখ্যা, মে ২০০৬।

২. বাংলা ভাষা ও শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, বাংলা চলচ্চিত্রের কথা অধ্যায়।

৩. ‘পশ্চিমবঙ্গ’ (রাজ্য সরকারের মাসিক মুখপাত্র), কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব সংখ্যা।

৪. ‘কথা সূত্র’ পবিত্র সরকার, সাহিত্য ও চলচ্চিত্র পরিচ্ছদ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ২০০৩।

৫. রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র: অরুণ কুমার রায়, চিত্রলেখা প্রকাশনী, ১৯৮৬।

৬. বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র: নিশিথ কুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দধারা, ১৯৮৬।

৭. কেমন করে সিনেমা তৈরি হয়, খাজা আহমেদ আব্বাস, অনুবাদ অমিতাভ চক্রবর্তী, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নিউ দিল্লি, ইন্ডিয়া, ২০০৯।

বিশ্বায়নের আলোকে সোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুইটি বাংলা নাটক ও বিপন্ন শিক্ষার্থী

তাপস চক্রবর্তী
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

একবিংশ শতাব্দীর কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের যুগে বাস করে ছোট বড় সকলের কাছেই এখন একটি পরিচিত নাম বিশ্বায়ন বা Globalization। এই বিশ্বায়ন যেন সমগ্র পৃথিবীটাকে এক ছাতার তলায় এনে দাঁড় করিয়েছে। তাই একবিংশ শতাব্দীর – শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত সকল মানুষকে বাজারমুখি করে তুলতে পুঁজিবাদী দুনিয়া একের পর এক টোপ দিতে থাকে। আর অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া লোভে (অগ্নিতে পতঙ্গের মতো) ঝাঁপিয়ে পড়ে আপামর সাধারণ মানুষ। সেল, ফ্রি গিফ্ট, মেগা-অফার, সারপ্রাইস অফার, সবকিছু ক্রেতাকে যেন একটা মোহের মধ্যে ফেলে দিয়ে, সুকৌশলে পুঁজিবাদী শোষণের ফাঁদ তৈরি করে। এইভাবেই সমগ্র দুনিয়ার মানুষকে বাজারমুখি করতে বাজারে ছেড়ে গেছে নানান ভোগবাদী বিলাস সামগ্রী, রঙচঙে পোশাক পরিচ্ছদ। ক্রেতারা পৌঁছে যাচ্ছে-মডেলাইজেসান, ফ্যাশন শো, আর ইন্টারনেটের অনলাইন শপিং এর দুনিয়ায়। ফলস্বরূপ মানুষের চাহিদা ক্রমশ দ্বিগুণ থেকে দ্বিগুণতর হয়ে উঠেছে। এই বাণিজ্যিক পণ্যের পরিচিতি বাড়াতে দামামা বাজাচ্ছে বিজ্ঞাপন। শুধু ভোগ্যপণ্য নয়, সারা বিশ্বকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নত কৌশল। তাই আজ ছয় থেকে ঘাট সকলের হাতে সেলফোন। গরীব থেকে ধনী সকলের বাড়িতেই টিভি, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাব – আরও কত কি! পোশাকে এসেছে পাশ্চাত্যের ছাপ। তাই আজকের বাঙালি ধুতি পাঞ্জাবি ছেড়ে হয়ে উঠেছে সাহেবি বাঙালি। টেলিভিশনের ফ্যাশন শো এর বেআব্রু পোশাক সমাজের সকল যুবক-যুবতীকে প্রলুব্ধ করছে। সহজাত জৈবিক প্রবৃত্তিকে উদ্দামতা দিতে স্কুল থেকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় – সকল ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে পর্ণোগ্রাফি টেলিফিল্ম বা ম্যাগাজিন। শুধু তাই নয় বিশ্বের নামকরা তারকারা নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে ভোগবাদী দুনিয়ার বিজ্ঞাপন দিতে।

আধুনিক জনজীবনে জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে উঠেছে বিপন্ন শৈশব। শিশুর শৈশব হারিয়ে যাচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তির যাঁতাকলে। শিশু খেলাধূলা হারিয়ে হয়ে উঠছে মোবাইল প্রেমী। বয়ঃসন্ধির মধ্যবর্তী সময় সীমায় দাঁড়িয়ে তাদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে

জৈবিক প্রবৃত্তি সম্পর্কে অতিসক্রিয়তা। ফলস্বরূপ শৈশবের খেলাধূলা হারিয়ে কৈশোর জীবনেই ভোগ করতে হচ্ছে একাতিত্বা, শূন্যতা, জীবনের লক্ষ্যহীনতা।

সোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা নাটকে ভোগবাদী জীবন দর্শন ও ভোগবাদী বিলাস সামগ্রিকে আশ্রয় করেই বিশ্বায়নের প্রভাবে খুব বেশি করে প্রকাশিত হয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত লালসাময় ভোগবাদ শুধু যে অপরিণত মস্তিষ্ক যুবক-যুবতিকেই মৃত্যুর পথে, ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে তা নয়, প্রবীণ বিচারকের মনেও দগদগে ঘা তৈরি করেছে। তাই নিজের ভুল কাজের অনুশোচনায়, বিবেকের দংশনে দীননাথের মতো অভিজ্ঞ এক্স বিচারক ও কোমায় আক্রান্ত হয়। নাটককার সোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'শুঁয়োপোকা' নাটকেও সেই ভোগবাদের-অস্থির ভয়ঙ্কর, কুৎসিত, নিদারুণ, মর্মান্তিক করুণ রূপটা প্রকাশিত হয়েছে। নাটকটি ২০০৭ সালে রচিত। ২০১০ সালে মার্চ মাসে 'নটরঙ্গ' নাট্যদলের প্রযোজনায় প্রথম অভিনীত হয়।

নাটকে ১৪-১৫ বৎসরের স্কুল ছাত্রী ধ্রুবা বয়স সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে শরীরে জেগে ওঠা জৈব প্রবৃত্তির উদ্দামতাকে তৃপ্তি দিতে যে পথে পা বাড়িয়েছে সেই পথ ধরেই সমাজের ধূর্ত, কামার্ত যুবক সম্প্রদায় দেবর্ষি, অতনুর মতো ছেলেদের দ্বারা তাকে ধর্ষিতা হতে হয়েছে। এই নারী জীবনের চরম অবনতি ও পরিণতির কারণ যে বিশ্বায়নের মুক্ত নীতি ও উদ্দামতা তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। নাটকের প্রথমেই দেখা গেছে- ধ্রুবার মা সীমা অফিস চলে যাবার পরই সদ্য যুবতী ধ্রুবা -

"কম্পিউটার অন করে। কোন ব্লু ফিল্মের সিডি চালায়। শব্দ ভেসে আসে। ধ্রুবা ঘামছে। সারা শরীরে অস্বস্তি। হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে। ফেক ফেক। কক্ষনো হতে। পারে না। কক্ষনো না।..."

ধ্রুবা শুধু পর্ণোগ্রাফির ছবি দেখেই শান্ত হয় না। রাত্রি জেগে পড়াশুনার নাম করে ধ্রুবা পর্ণোগ্রাফি ম্যাগাজিনে অনাবৃত যৌন মিলনের ছবি দেখতে গিয়ে মায়ের কাছে ধরা পরে প্রচুর মার খায়। আসলে সমাজে যা ছিল গোপন, অপ্রকাশিত তাও আজ খোলা বাজারের পণ্য সামগ্রী। নব্য প্রযুক্তির সহায়তায় তা আজ পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে খুবই সহজলভ্য। এই সেও প্রতিমুহূর্তে চোরাবালির মত ঘোড়সওয়ারকে আহ্বান করেছে।

বিপথে হাঁটছে বর্তমান ইয়াং জেনারেশান। বয়স্ক অবসরপ্রাপ্ত জর্জ দীননাথ যখন নাতনি ধ্রুবাকে আদর করে তখন ধ্রুবা জৈবিক উদ্দামতার কারণে দাদুকে বলে –

"দাদুভাই তোমার গায়ে কি দারুণ গন্ধ। আর ভীষণ ভালো লাগছে, আমাকে চেপে ধর। আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দাও। (ধ্রুবার গলায় এক চরম মাদকতা) দীননাথ চমকে ওঠে। ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মত ধ্রুবার থেকে ছিটকে দূরে চলে যায়। ধ্রুবা হাত বাড়িয়ে আছে।"

তখন ধ্রুবা আবার বলে "কি হল দাদুভাই? ধর আমায়। ধর? নাকি তোমারও ঘেন্না করছে, আগলি ডাকলিংকে ভুল করে সিন্ডরেলা ভেবেছিলে, তাই না দাদুভাই? তাই না? কি হল ধর? ধর আমায়? "

ধ্রুবার এই যৌন ক্ষুধা জন্ম দিয়েছে বিকৃত যৌনমনস্তত্বের। যার পরিণতিতে দাদু দীননাথ আত্মানুশোচনায়, হৃদয়ের যন্ত্রণায় নিজের প্রতি ঘৃণায়-মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। যে ঘটনাকে ধ্রুবা কারও কাছেই প্রকাশ করতে পারেনি। এমনকি শেষ পর্যন্ত ধ্রুবাই ভোগ্য পণ্যের মতো পাড়ার যুবকদের দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে সেও এই পৃথিবী ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

আসলে বিশ্বায়ন একবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র বিশ্বকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এলেও এর প্রভাব সমাজকে যেমন ভালো কিছু দিয়েছে, তেমন অনেক কিছু কেড়েও নিয়েছে। মানুষ যেন মূল্যবোধহীন যান্ত্রিক মানুষে পরিণত হচ্ছে। ধ্রুবা তাই এই চাকচিক্যময় সমাজ থেকে মুক্তি পেতে যোশেফ দাদুর সঙ্গে তাদের গ্রামে যেতে চেয়েছে। যেখানে—

"চারিদিকে ফুল ফুটে রয়েছে। প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে ফুল থেকে ফুলে। ধ্রুবা ওই প্রজাপতির ভিড়ে হারিয়ে যায়। যেন সে নিজেই একটা প্রজাপতি হয়ে ওঠে। দূর থেকে ভেসে আসে জোসেফের গলা। ধ্রুবাকে দূর থেকে আরো দূরে আরো দূরে উঁচুতে উড়ে যেতে বলছে সে।" বিশ্বায়নের যুগে 'ফোন (চলভাস) একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যমে হয়ে দাঁড়িয়েছে। সার্বিক প্রসার ও প্রাপ্তি হল বিশ্বায়ন। ব্যবসায়িক মুনাফা লাভের কারণে আজকের তরুণ প্রজন্ম হয়ে পড়ছে ভোগ্যপণ্যের স্বীকার। তার ফায়দা লুটছে ধনী ব্যবসাদারেরা। ধ্রুবা তার ব্যতিক্রম নয়। সেই ম্যাগাজিনের পর্ণোগ্রাফি ছবি পাঠ্য বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু মা সীমার কাছে সেই ম্যাগাজিনটি বই এর ভাঁজ থেকে পড়ে যায় –

> "ধ্রুবা উঠতে গেলে পড়ার বইয়ের ভাঁজ থেকে একটা চটি বই মাটিতে পড়ে যায়। সীমা কুড়িয়ে নেয়। একটা সস্তার পর্ণোগ্রাফি ম্যাগাজিন।"

আসলে বিশ্বের উন্নত দেশগুলির কূটনৈতিক কৌশলে প্রাচ্য দেশগুলির যুবক-যুবতী সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ডকে ভিতর থেকে ধ্বংস করার জন্য মুক্ত বাণিজ্যের নাম করে পর্ণোগ্রাফির উত্তেজক ভিডিও, ম্যাগাজিন, বিক্রি করে এক ঢিলে দুই পাখিকে মারতে চেষ্টা করছে। সেই ফাঁদে পা দিচ্ছে বিশ্বের যুবক-যুবতি সম্প্রদায়। নিজেদের যৌন চাহিদাকে তৃপ্তি দিতে পতঙ্গের মতো সেই ভিডিও, ম্যাগাজিন, কিনতে ব্যস্ত হয়ে পরে এই যুবক-যুবতী সম্প্রদায়। আর তাদের অপরিণত মস্তিষ্কের অপরিণাম দর্শিতার কারণে সমাজে ঘটেছে ধর্ষণের মতো ঘটনা। ফলস্বরূপ হারিয়ে যাচ্ছে ধ্রুবার মতো মেয়েদের অস্তিত্ব। এই জৈবিক চাহিদার কারণে ধ্রুবা নিজেকে সামলাতে না পেরে, পাড়ার; বায়োলজির টিউশন টিউটর দেবর্ষিকে বলে-

> "আমাকে তোমার অ্যাট্রাকটিভ লাগে দেবর্ষিদা? জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করে? ইচ্ছে করে আমার সারা গায়ে হাত বোলাতে? আমায় আদর করবে দেবর্ষিদা? আমার খুব ভালো লাগে আমার সারা গায়ে কেউ হাত বুলিয়ে দিলে। আমি বায়োলজির এই চ্যাপ্টারটার সব জানি। ইন্টারনেট ঘেঁটে আরো
>
> অনেক কিছু জেনেছি। ওভুলেশন কি জানো দেবর্ষিদাঃ সাইকেলের ঠিক মাঝখানে ওভারি থেকে ওভাম বেরিয়ে আসে। তখন শরীরে একটা তোলপাড় হয়। গোটা শরীরটা টাচ চায়। আমি স্কুল যেতে পারি না।"

ধ্রুবার এ সমস্ত কথায় দেবর্ষি ভয় পায়। পাড়ার কেউ শুনে ফেললে খুব ভয়ানক কান্ড ঘটতে পারে - দেবর্ষি এই আশঙ্কা প্রকাশ করে। কিন্তু ধ্রুবার কোন শঙ্কা নেই। সে যেন শরীরী খিদে মেটাতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ভোগাদের দুনিয়ায় তার ভোগের চাহিদা যেন তৃপ্ত হতে চায় না। তাই দেবর্ষিকে উত্তেজিত করতে ধ্রুবা বলে।

> "ভয়ের কিছু নেই, আমি কাউকে কিছু বলবো না। এখন সবদিক থেকে স্রেফ। বিলিভ মি (দেবর্ষিকে জড়িয়ে ধরে) ব্লু ফিল্ম দেখবে? আমার কাছে আছে।... আমায় একটু আদর করো। ছোঁও আমায়।"

বিশ্বায়নের হাত ধরে আসা ভোগবাদের দুনিয়া ফ্রি সেক্সের জগৎ, লিভ টুগেদার – এই সমস্ত ধ্যানধারণা বাংলা নাট্যজগতকেও প্রভাবিত করেছে। ধ্রুবার মতো বর্তমানের যুবক-যুবতীরাও এই নেশায় মত্ত হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে টিনএজ এই যুবক-যুবতীরা। কোন সংযম নেই, কোন পবিত্রতা নেই, শুঁয়োপোকার রুঁয়োর মতোই গোটা সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের কামনার হাতছানি। শুঁয়োপোকার রোঁয়া যেন বাস্তবে কামনার বীজ। ওই রোঁয়া বিশ্বায়নের যুগে ভোগবাদীসত্তা যৌনতার অঙ্কুর। যা

সমগ্র বাজারে বিস্তারলাভ করেছে। ফলস্বরুপ টিনএজার যুবক-যুবতীদের মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে। যুবক-যুবতীদের অস্থির করে দিচ্ছে। এই অস্থিরতার প্রকোপকে বয়ঃসন্ধিক্ষনের ছাত্রছাত্রীদের চিন্তন মনন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নাটকটিকে শুঁয়োপোকার রোঁয়া বিশ্বায়নের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে আগত অস্তিবাদী ধারণা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রেম, ফ্রয়েডিও মনস্তত্ব প্রভৃতি এদেশিয় সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই নাট্য সাহিত্যের জগত এই সমস্ত পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্ব থেকে নিরপেক্ষ থাকতে পারেনি। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এই সমস্ত চিন্তাভাবনা সাহিত্যকে বাস্তবের সঙ্গে এক করে দিয়েছে।

নাটককার সোহন বন্দ্যোপাধ্যায়র লেখা ‘মেগাপড’ নাটকটি স্বাধীনতাত্তোর বাংলা নাট্য সাহিত্যের ধারায় বিশ্বায়নের অন্যতম অভিজ্ঞান। ২০০৭ সালে জুন মাসে ‘নটরঙ্গ’ নাট্যমঞ্চে ‘মেগাপড’ নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। নাটকটির নির্দেশনা করেন নাটককার সোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি নাটককার নিজে মেগাপড় চরিত্রে অভিনয়ও করেন। বিংশ শতাব্দীর নয়ের দশক থেকে সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া বিশ্বায়নের প্রভাব এই নাটকটিকে অন্যমাত্রা দান করেছে। তাই আধুনিক ভোগ্যপণ্যে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা বর্তমান প্রজন্ম এই নাটকের চরিত্র হয়ে উপস্থিত হয়েছে। আধুনিক ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাশার প্রবল চাপে শিশু হারাচ্ছে তার শৈশব। আর জন্ম নিচ্ছে মেগাপড়ের যারা জন্মলাভ করেই স্বাবলম্বী। বাবা-মা, সংসার-কার প্রতি মায়া নেই, মমতা নেই, কোন দায়বদ্ধতা নেই এই মেগাপডদের। এই মেগাপডদের নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে বহুজাতিক কোম্পানী ও শেয়ার বাজারের মেতে ওঠার মধ্যে দিয়ে বিশ্বায়নের রূপ উঠে আসে মেগাপড’ নাটকে। আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে উপস্থিত হয় পুঁজিবাদ। তারা শোষণ করে নিতে চায় দুর্বল দেশগুলির অর্থ ভাণ্ডার। শিল্প প্রযুক্তির জগতে ইন্টারনেট, ফেসবুক, হোয়াইট অ্যাপ, টুইট্যার, মোবাইল ফোনের পাশাপাশি শপিংমলের চাকচিক্য, প্রমোটার রাজ মানুষকে পরিণত করেছে HOLLOW-MAN এর পাশাপাশি মিডিয়া বিজ্ঞাপনের দামামা বাজিয়ে ভোগ্যপণ্যের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। ফলস্বরূপ বিশ্বায়ন তৈরি করেছে এমন এক মূল্যবোধহীন, আত্মকেন্দ্রিক, ভোগসর্বস্ব সমাজ! যেখানে মানবিক সম্পর্কগুলি পর্যন্ত হয়ে পরে ঠুনকো। যে সমাজে পিতা টাকার লোভে পুত্রকে ঘাতকের হাতে তুলে দেয়। মেগাপডদের আগমনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারি প্ররোচনায় টাকার বিনিময়ে স্বামী তার স্ত্রীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। বিশ্বায়নের এই সর্বব্যাপ্তময় প্রভাব ও পরিণতি নাটককার সোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মেগাপড়' নাটকে নানাভাবে প্রকাশ পেতে দেখা যায়।

‘মেগাপড’ নাটকের প্রথম দৃশ্যেই নির্বেদ ও চিরন্তনের সংলাপের মধ্যে দিয়ে প্রাত্যহিক জীবনের ভোগবাদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। আর এই ভোগবাদে নারীরা

হয়ে উঠেছে পুরুষের প্রত্যেক রাতের ভোগ্যবস্তু। কোন সংযম নেই, নেই কোন পবিত্র হৃদয়ের বন্ধন। আরো চাই, আরো খিদে – শারীরী খিদে মেটাতে মেটাতে নারী ও পুরুষ হয়ে উঠেছে লালসাময় কামার্ত জীব। তাই নির্বেদ বন্ধু চিরন্তন চ্যাটার্জীকে বলেছে –

"তুই বৌকে ছেড়ে থাকবি? তাহলেই হয়েছে।

গত এক বছর ধরে অফিস আর খাট করে লাইফ কাটাচ্ছিস।"

এই নাটকে চিরন্তন আর দিশার সন্তান হল মেগাপড। যে মাতৃগর্ভ থেকেই তার নিজের নাম বলেছে 'মেগাপড'। শুধু তাতেই শেষ নয়, মেগাপড় দিশার গর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় তার শারীরিক নানা অসুবিধা কথা মা দিশাকে জানায়। এমনকি গর্ভবতী দিশা কিভাবে ৬৬ কেজি ওজন থেকে হঠাৎ ৯০ কেজি হয়ে গেল তার কারও ব্যাখ্যা করে। আসলে মেগাপড়ের আবির্ভাবনাটকে যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো। মেগাপড যেন মহাভারতের অভিমন্যুর মতোই এই বর্তমান কুরুক্ষেত্রের চক্রবূহ্যের প্রবেশ দ্বার জেনে ফেলেছে কিন্তু বেরোবার পথ জানা নেই। তাই মেগাপডকে অসহায়ভাবে এই পৃথিবী থেকে চলে যেতে হয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্র রূপ রাষ্ট্রনেতা ও বেনিয়াদের অতর্কিত আক্রমণে।

বিশ্বায়ন যেমন অর্থনৈতিক ভাবে সমগ্র পৃথিবীটাকে গ্রাস করতে চায়, তেমনি সংস্কৃতিগত ভাবেও গ্রাস করতে চায়। তাই ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশ্বায়ন গভীরতার ছাপ ফেলেছে। ভারতীয় সংস্কৃতি বাবা-মা কে শ্রদ্ধা ভক্তি করা হয়। কিন্তু বাবা মাযে একেবারে সমবয়স্ক বন্ধু হতে পারে তাও এই মেগাপড নাটকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন নাটককার। চিরন্তন চ্যাটার্জীর ছেলে মেগপডই জন্মেই ৩০ বৎসরের পূর্ণ বয়স্ক মানুষ। যদিও নাট্য কাহিনিতে কোন কোন অবাস্তব কল্পিত কাহিনি উঠে এসেছে, তবুও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে কোথাও কোথাও মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যের ছেলেরা যেমন ওভারস্মার্ট, তেমনি মেগাপড়ের আচরণে সেই ওভার স্মার্টনেস দেখা গেছে। তাই মেগাপড – তার মা দিশার প্রসবকালীন পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছে –

> "শালারা বাপের কালে এমন কেস দেখিনি কে জানে, বাবা, হয়তো দাঁত ছরকুটে চিত্তির হয়ে যেত। একদিকে ভালোই হয়েছে বাড়িতে ভেলিভারড় হায়। হ্যাঁ, জন্মেই একটু বেগার খাটতে হল, বাট কি করা যাবে? আফটার অল নিজের মা। তবে আমার বাপটা মাইরি টোটাল পাঁঠা।।"

এই ধরণের সংলাপ যেন বিশ্বায়নের যুগে দাঁড়িয়েই মানায়। যেখানে কোন সম্পর্কের বন্ধন নেই। নেই কোন জন্মদাতা প্রতিশ্রদ্ধা ভক্তি । মুখের অপ্রিয় সহজ সত্যকথা একেবারে অনাড়ম্বর ভাবেই প্রকাশিত হয়। এই মেগাপড়দের কাছে নীতিবোধ, মূল্যবোধ যেন মধ্যযুগের বিষয়। কোন মূল্যবোধ নেই, কারও প্রতি কোন নির্ভরতা নেই। শুধু আছে আত্মনির্ভরতা, আত্মস্বার্থসর্বস্বতা এবং বেঁচে থাকার সংগ্রাম।

নাটককার সোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'মেগাপড' নাটকে একসময় দেখা যায় মেগাপড সন্তানরা বিশ্বের সর্বত্র জন্মলাভ করছে। এই মেগাপড সন্তানদের মধ্যে নেই কোন কর্তব্য দায়বদ্ধতা, প্রেম, প্রীতি ভালোবাসর বাঁধন। যন্ত্রের পৃথিবীতে তাদের আবির্ভাব যেন মানবযন্ত্র রূপে। তারা কোন দায়িত্ব কর্তব্যের ভার নিতে রাজি নয়। তারা পৃথিবীতে তাদের মতো করে বাঁচবে এটাই তাদের অঙ্গীকার। নাটকের চতুর্থ দৃশ্যে প্রতিবেশি অনিলদাকে দিশা এই মেগাপডদের আবির্ভাব সম্পর্কে জানান দিয়েছে।

> "তাহলে এবার ওরা সত্যিই আসছে? দলে দলে ঘিরে ফেলবে এই পৃথিবীটাকে। ওদের কোন মা নেই, বাবা নেই। কোন পিছুটান নেই। কোন দায়িত্ব নেই। আমাদের আশার বোঝা আর ওরা বইবে না।"

শুধু দিশার মুখের কথা নয় পৃথিবীর বিভিন্ন সংবাদ চ্যানেলে বিভিন্ন ভাষায় মেগাপডদের আবির্ভাবের সংবাদ সম্প্রচারিত হচ্ছে। একটি বাংলা নিউজ চ্যানেলের সংবাদ পাঠিকা খবর পড়ছে। খুব জোরে ভেসে আসছে বাংলা খবর।

> "খবর : মানবসভ্যতা আজ বিপন্ন। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক শেষ হয়ে আসার মুখে। এক মহামারীর প্রচণ্ড প্রকোপে পৃথিবীর সমস্ত দেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। লণ্ডন, টোকিও, নিউইয়র্ক, প্যারিস, দিল্লী, কলকাতা সব জায়গার মিনিটে মিনিটে জন্মগ্রহণ করছে মেগাপডের দল।" ক্রমশ খবর আসতে লাগল একটা নয়, প্রতিটি ঘরেই জন্ম নিচ্ছে এমন মেগাগড প্রজন্ম।

আজকের সমাজে যেমন সন্তানদের মন ও মানসিকতার এক বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি পিতা মাতাদেরও চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে কম-বেশি অধিকাংশ পিতা মাতারই তাদের বিশাল আশার বোঝা তাদের সন্তানদের পিঠে চাপিয়ে দিতে চায়। আর এই পিতা মাতাদের অতিরিক্ত প্রত্যাশার চাপে শিশু হারাচ্ছে তার শৈশব। বর্তমানের গতিশীল জীবনযাত্রা ও ভোগ্যপণ্যকে খুব কম সময়ে আয়ত্ত্ব করার শিক্ষায় শিক্ষিত হতে গিয়ে শিশু আর বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় পায় না। ফলস্বরূপ শিশুর মনের সুস্থ বিকাশ ঘটে না। তাই বর্তমান শিশুদের হয়ে মেগাপড, তার মা দিশার কাছে প্রতিবাদ জানায়। দিশা যখন মেগাপডকে বলে -

"দিশা: সমস্ত বাবা মা তাদের সন্তানকে ঘিরে স্বপ্ন দেখে। তাতে দোষের কি? তখন মেগাপড মায়ের কথা উত্তর দিতে গিয়ে জানায়-

মেগাপড : "হ্যাঁ, স্বাভাবিক-খুব খুব স্বাভাবিক কিন্তু এই র‍্যাট রেসের যুগে, স্বপ্ন দেখার মধ্যে ব্যাপারটা আটকে থাকে না। – দাবি হয়ে যায় – এক ভয়ঙ্কর দাবি -শিশুর শৈশব কেড়ে নিরে বোঝার পর বোঝা চাপানো হয়। তার ওপর একটা নিঃশ্বাসও তাকে দেওয়া হয় না নিজের মতো করে টানতে – আঁকার স্যার, হোম টাস্ক, নাচের স্কুল, আবৃত্তি, আকাডেমি, প্রাইভেট কোচিং, ক্রিকেট ক্যাম্প, কম্পিউটার ক্লাস – অলিতে গলিতে অন্ধকার।

গোলকধাঁধার জীবন – শুধু কম্পিটিশন আর কম্পিটিশন। সবাইকে হারাতে হবে তোমায়, অল স্কোয়ার ও বেস্ট অফ দ্য লট – লুজারস আর আনওয়ান্টেড – আমি চাই এমন হও – অমার চাই তুমি তেমন হও – তার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হবে কিছু মহাপুরুষের জীবনীর সস – আর কি চাই-নিপাতনে সিদ্ধ কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাতেই হবে।“

শুধু পিতা-মাতার আশার বোঝা নয়। প্রত্যেক পিতা-মাতাই তাদের সন্তানকে বড়ো করে তুলে তাদের ভাবষ্যতের বাঁচার আশ্রয় হিসাবে। তারা যেন তাদের সন্তানদের কাছ থেকে রিটার্ন পেতে চায়। তাই সেই রিটার্ন পাওয়ার কথা মেগাপডের সংলাপে প্রকাশ পেয়েছে।

“মেগাপডঃ যে বিশাল আশার বোঝা তোমরা দিনের পর দিন আমাদের ওপর চাপিয়ে চলেছ তাঁর পেছনে তোমাদের একটাই চিন্তা কাজ করে।

দিশাঃ কি চিন্তা?

মেগাপডঃ রিটার্ন

দিশাঃ রিটার্ন মানে?

মেগাপডঃ শুধু অর্থ নয়। প্রতিপত্তি, যশ, সামাজিক, স্বীকৃতি। ওই যে দেখছেন, সবার আগে, ওটা আমার ছেলে। ওই যে ওইতো, ঝলমল করছে। ওটা আমার মেয়ে।“ আসলে মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপেই যে স্বার্থ লুকিয়ে থাকে সেই ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। আমরা যে গতিশীল জগতে অবস্থান করছি সেই সময়ে দাঁড়িয়ে নবজন্ম শিশু যেন সর্বজ্ঞ হয়ে পৃথিবীতে এসেছে। কোনো কিছুই তার অজানা নেই। মেগাপড পাখির মতই তারা জন্মলাভ করে স্বাবলম্বী। এই গতিশীল যুগে আমরা এতটাই গতিশীল হয়ে গেছি যে আমাদের মানবিক সত্তাটা যেন হারিয়ে ফেলেছি। অনাস্থা, অবিশ্বাস, হতাশার জন্ম বিংশ শতকে শুরু হয়েছিল আজ একবিংশ শতকের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সেটা আজ মহীরুহ আকার ধারন করেছে। বিশ্বাসের সেই গাছটা যেন আজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এভাবেই নাটককার সোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুইটি বাংলা নাটকে বিশ্বায়নের অনুসঙ্গে উঠে এসেছে আধুনিক সমাজ জীবনের নানা দিক। বর্তমান সমাজ জীবনে বিশ্বায়নের এই দিকগুলি উন্মোচিত হয়েছে সমগ্র নাটকে।

উল্লেখপঞ্জি

১. ‘শুঁয়োপোকা, সোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিন্দী ব্রাত্যজন, কল্পনা অপসেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০১৫, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা-২০১৬

২. ‘মেগাপড, সোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিন্দী ব্রাত্যজন, কল্পনা অপসেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০১৫, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা-২০১৬

৩. সনৎ কুমার নস্কর (সম্পাদিত)। 'বিশ্বায়ন ও বাংলা সাহিত্য’ এবং প্রান্তিক,

বারাণসী ২২১০০৫। প্রথম প্রকাশ। নভেম্বর ২০১৬
৪. সমীর বসু (সম্পাদিত), 'বঙ্গ সংস্কৃতি ও বিশ্বায়ন', পদক্ষেপ ৩৪ ডিসেম্বর ২০০৩। প্রথম প্রকাশ। বইমেলা সংকলন। ডিসেম্বর ২০০৩
৫. শুভ্র মজুমদার, 'নটরঙ্গের মেগাপড় কেন্দ্রভ্রষ্ট এক বিশালতায় হারিয়ে গেল মুল সমস্যা', আনন্দবাজার ১৫ জুন, ২০০৭ (দৈনিক) [নাট্যশোধ সংস্থা কর্তৃক সংরক্ষিত CF/139]
৬. গৌতম হালদার । শুঁয়োপোকার প্রজাপতি হওয়ার স্বপ্ন"। আনন্দবাজার পত্রিকা। শনিবার ২৩ অক্টেবর ২০১০ (দৈনিক) [নাট্যশোধ সংস্থা কর্তৃক সংরক্ষিত CF/139]
৭. 'বিষয় যখন জরুরি'। আজকাল পত্রিকা। ১৯শে জুন, ২০১০ (দৈনিক) [নাট্যশোধ সংস্থা কর্তৃক সংরক্ষিত CF/139]
৮. 'When rainbow colours romanced dark truths", The Times of India. 23.11.2013 [নাট্যশোধ সংস্থা কর্তৃক সংরক্ষিত CF/139]
৯ . Ananda Lal. 'A different vision'. The The Telegraph. Kol. 19.06.2010 [নাট্যশোঁধ সংস্থা কর্তৃক সংরক্ষিত CF/139]

বাংলা গানের নবরূপায়ণে বিস্মৃতপ্রায় যোগসূত্র: অতুলপ্রসাদ, দিলীপকুমার ও নজরুল

গৌরব চৌধুরী
রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট
নজরুল সেন্টার ফর সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল

সারসংক্ষেপ : বাংলা গানের আঙিনায় বহু অচর্চিত প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে গবেষণার বিজয়রথ গতি পায়। আবার তথ্যাভাবে বা ইচ্ছার অভাবেও হয়ে পড়ে বিস্মৃত। হারিয়ে যায় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের কৃতিত্ব, সৃষ্টির ঐতিহাসিক ক্ষণ। নজরুল সংগীতের বা নজরুলগীতির গবেষণায় এইরকম একটি বিষয় এখানে আলোচিত হয়েছে যা ক্রমশ বিলুপ্তির পথে। বিংশ-শতকের বাংলা গানে মধ্যপ্রাচ্যের যে প্রধান দুটি সাংগীতিক রূপের নান্দনিক মিশ্রণ ঘটে তা হল — ঠুংরি ও গজল। এই দ্বিধারার প্রণয়ন করেন দুই সঙ্গীত-মহারথী। একজন রবীন্দ্র-সমসাময়িক গীতকার অতুলপ্রসাদ সেন যার সার্ধশতবর্ষ নীরবে পেরিয়ে গেছে এবং অন্যজন রবীন্দ্রোত্তর-ধারার গীতকার কাজী নজরুল ইসলাম। কিন্তু প্রণয়ন তো শিল্পকলার বিকাশ নয়। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত রূপকার, আধার। যিনি সৃষ্টির বিকাশকে পৌঁছে দেবেন শ্রোতার মনের মাঝে — তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল-পুত্র দিলীপকুমার রায়, এ বছর যাঁর সপাদশতবর্ষ নিঃশব্দেই পালিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই ত্রিবেণীসঙ্গমেই বাংলা গান নব-সুরাভরণে সেজে উঠেছিল, যা প্রকৃত অর্থেই বিস্ময় জাগায়। তাই এই ত্রয়ীর বিস্মৃত যোগসূত্র হয়ে উঠুক আলোচনার মূল কথা।

প্রাসঙ্গিক শব্দাবলী: বাংলা গান, সংগীত, অতুলপ্রসাদ সেন, দিলীপকুমার রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, অতুলপ্রসাদী, ‘দৈলিপী’ সংগীত, নজরুলগীতি, লক্ষ্ণৌ, বাংলা ঠুংরী, বাংলা গজল, মধ্যপ্রাচ্যের সুর, নবরূপায়ণ, *গীতিগুঞ্জ, সুরবিহার, সাঙ্গীতিকী, স্মৃতিচারণ, বুল্‌বুল্ (প্রথম ভাগ)*

মূল আলোচনা:

বাংলা গানের বিবিধ-রতন হোক বা নানা ধারা — সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে বিস্ময়। সে কীর্তনের মতো ‘মহান নাট্যসংগীত’ হোক; বাউলের মতো দেহতত্ত্বের গান হোক; সারি, জারি, গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া-র মতো জীবনমুখী পল্লীসংগীত হোক; রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি, কান্তগীতি, অতুলপ্রসাদী বা নজরুলগীতির মতো জীবনদিশারী গানই হোক

অথবা বিস্মরণের পথিক 'দৈলিপী' সংগীত বা হিমাংশু দত্তের গান হোক — যেদিকেই তাকাই না কেন পাই অনন্ত বৈচিত্র। সংগীত ও সাহিত্যের মেলবন্ধনে আমরা পেয়েছি সৃষ্টিকর্তার নামে গানের বিশেষ ধারা। এই প্রবাহ প্রচলিত হয়ে এসেছে সেই রামপ্রসাদ সেনের সময় থেকেই, কারণ এই সুর আজও মৌলিকত্ব বহন করে চলেছে, যতই সময়ের পরিবর্তন হোক-না কেন। বাংলা গানের সুরসৃষ্টির সীমানা শুধুমাত্র পল্লীসংগীতের বা ধ্রুপদ-ধামার-খেয়ালের গাম্ভীর্য ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেই থাকেনি। সমস্ত কিছুর সাথে সাযূজ্য বজায় রেখে আদিকাল থেকেই মৌলিক রূপটি পেয়েছিল। আমরা জানি গরানহাটীর কীর্তনে পেলবতার সাথেই ধ্রুপদী ঝোঁক ও দুরূহ-ছন্দের নান্দনিক যোগাযোগ ছিল। তবে সে-সময়েও বাংলা গানে ছিল সনাতনী শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রভাব। যতটুকু জানা যায়, লঘু সংগীত বা Light Classical Music তখনও বাংলা গানে প্রয়োগ করাটা নিন্দনীয় ছিল বলেই তদানীন্তন বিদ্বজ্জনেরা মনে করতেন। এখানে লঘু সংগীত বলতে টপ্পা, ঠুংরি ও গজলের কথাই বোঝানো হচ্ছে।

বাংলা গান মূলত মাটির গান ও সনাতনী সংগীতের নানা ধারার সম্মিলিত সৃষ্টি। তাই সনাতনী প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বাংলা গান ক্রমশ নবরূপে সেজে উঠছিল। এর পথিকৃত অবশ্যই শ্রদ্ধেয় রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯) বা 'নিধুবাবু'। জানা যায়, ছাপরা জেলায় (বিহার, ভারত) এক উস্তাদের কাছে তিনি সংগীতচর্চা করতেন। বেশ কয়েক বছর শিক্ষাগ্রহণ করে তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করলেও তিনি দেখেন উস্তাদ তাঁর ঘরানার রহস্য প্রকাশ করছেন না। শেষে তিনি মিঞা সাহেবকে সেলাম জানিয়ে বলেন

> আমি তোমাদিগের ... গান করিব না, আপনিই বঙ্গভাষায় হিন্দি গীতের অনুবাদ পূর্ব্বক রাগরাগিণী সংযুক্ত করিয়া গান করিব। [১]

এইভাবে উত্তর-ভারতীয় সংগীতের একটি বিশেষ শাখা বাংলা গানের অঙ্গনে পেল প্রবেশাধিকার। মনে রাখা ভালো, যে-সময়ে নিধুবাবুর টপ্পা বাংলা গানে প্রবেশ করেছিল, কলকাতায় তথা অবিভক্ত বঙ্গে একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। এই পরিবেশে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সম্পর্ক তখনও নিবিড় হয়ে ওঠেনি। মুখ্যত বাংলা গান আর সনাতনী সংগীতের নিবিড় সম্পর্ক রাজা-মহারাজা, দেওয়ান, জমিদার, মুৎসুদ্দি প্রমুখ বনেদি পরিবারের সংগীত-সভা ও বাগানবাড়িতেই সঞ্চারিত হয়েছিল। অথচ সমগ্র বাংলায় লোকরঞ্জন শিল্পে দেখা যেত পরস্পর বিরোধী প্রবণতার সংমিশ্রণ। এঁরা একদিকে যেমন নিতান্ত স্থূল গ্রাম্যতা বর্জন করতে পারেন নি; অন্যদিকে তাঁরাই ছিলেন সুসংস্কৃত, সূক্ষ্ম শিল্পের সমর্থক। অর্থাৎ কবিগান, পাঁচালী গান, তর্জা, খেঁউড় ও 'বাঈনাচ' এগুলি ছিল স্থূলতার নিদর্শন। অপরপক্ষে বৈঠকী সংগীত, টপ্পা ছিল সূক্ষ্ম শিল্প। অর্থাৎ ধীরে ধীরে মধ্যপ্রাচ্যের সুরব্যঞ্জনা বাংলায় গুঞ্জরিত হতে থাকে। এই বক্তব্যের সমর্থনে 'ভাষাকোবিদ্' সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) মহাশয় লিখেছেন

> আঠার শতকে মধ্য এসিয়ার তুরাণ্ থেকে উত্তর ভারতে নূতন সুরের আমদানী হয়েছিল। গীতপ্রবাহ এসেছিল আরব, ইরাণ্ ও ইয়েমেন থেকে। কৃষ্ণনগরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় দেখা গিয়েছিল আরব্য-ইরাণীয় লোকব্যবহার ও জীবনধারা। [২]

এখন আরব্য-ইরাণীয় সংগীতধারা বলতে আমরা যতটুকু বুঝি তার প্রধান আঙ্গিক দুটি। সেই দুটিই এই প্রবন্ধের মূল বিষয়। তার আভাস পাঠকের সামনে উপস্থাপন করার পূর্বে ঐতিহাসিক আজিজ্ আহ্মেদ-এর বিখ্যাত মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে

> Apart from Urdu, which is modelled entirely on the Persian tradition, other languages of Muslim India show considerable influence of Persian. Bengali borrowed from it nineteen forms of meter and the Ghazal. [৩]

এখানে উল্লিখিত উনিশটি ‘meter’-এর বিবরণ না থাকলেও বাংলা গজলের ক্ষেত্রে বক্তব্যটি প্রাসঙ্গিক। তবে একথাও বলাবাহুল্য যে কবি কাজী নজরুল ইসলাম ব্যতীত বাংলায় পূর্ণাঙ্গ গজল গান লেখা হয়েছিল বলে জানা যায় না। কিন্তু তাঁর গজলের গানের বেশ কিছু বছর আগেই সুদূর লক্ষ্মৌয়ে সংগীতের আরেকটি ধারা বাংলা গানে প্রবেশ করেছিল। এনেছিল আরেক নতুন চমক। আমরা তাকে জানি ‘ঠুংরি’ নামে। এই ধারার উৎপত্তি ও চমকের সার্থকতা এসেছিল সেই টপ্পা থেকেই। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুযোগ্য পুত্র দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০) এই ঠুংরি সম্পর্কে বলেছিলেন

> ... টপ্পাকে যে মার্গসংগীতের অন্তর্ভুক্ত করা হ’ল তার কারণ আছে। ... সুরের সভায় ওরও একটা স্থান আছে : it takes all sorts to make the world : সুররাজ্ঞীর ডাইনে বাঁয়ে ওর ঠাঁই নেই বটে কিন্তু পদপ্রান্তে ওর জন্যে বিঘৎখানেক জায়গা থাকবেই ... ওর একটা মহৎ কৃতিত্ব এইখানে যে, ও নিজে ব্যর্থ হ’য়েই ইঙ্গিত দিল কোন পথে উজ্জ্বলতর সার্থকতার অভ্যাগম হ’তে পারে। এককথায় — ও ঠুংরি নামক অপরূপ সঙ্গীতস্রোতটির উৎসমুখ দিল খুলে। ... যেহেতু failures are the pillars of success সেহেতু ঠুংরির মহৎ সাফল্যের আভাস এনে ও ধন্য। ও যে দেখিয়ে দিল সত্যিকার দরদ, পেলবতা, লালিত্য কার নাম। [৪]

বাংলা গানে ঠুংরির প্রভাব নতুন চমক এনেছিল একথা ঠিকই তার কিছু কারণ আছে। ঠুংরির গায়ন শৈলী, স্বরগত ব্যঞ্জনা, সামঞ্জস্যপূর্ণ কাব্য-সুরের যুগল-সম্মিলনই তার 'জীবন্ত বিকাশ'এর রহস্য। তাই দিলীপকুমার বলেছেন

> ... ঠুংরি মহীয়সী এই প্রাণশক্তিতে। শুধু সৌন্দর্যে নয়— মাধুর্যে; লালিত্যে নয়— বৈচিত্রে; ভাবাবেশে নয়— সৌকুমার্যে; সর্বোপরি— অশ্রান্ত মিশ্রণ শক্তিতে। ... অফুরন্ত ওর উচ্ছলতার, ইঙ্গিতের, সংকেতের ক্ষমতা— কাব্যপরিভাষায় যার নাম ব্যঞ্জনা— সাজেস্টিভনেস্। রূপসৃজনীর চাতুরীও এর কারুর চেয়েই কম নয়। ক্ষণে ক্ষণে বদলায়— এই আছে এই নেই— elusive par excellence— বহুরূপী। [৫]

এই 'রাগসঙ্গীতের বিকাশভঙ্গির প্রাণভঙ্গির কাছ থেকে' বিদায় নেওয়া ঠুংরির আমেজ বাংলা গানে প্রথম আসে কবি অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)-এর হাত ধরে। এই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে বাংলা সংগীতের এই রূপকারের জন্ম-সার্ধশতবর্ষের আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি। অনেকেই হয়তো বিস্মৃত যে তাঁর ঠুংরি-চালের গান জনসমক্ষে আসে ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে দিলীপকুমারের মতো 'সুরসুধাকর'-এর জন্যই। প্রকৃতপক্ষে ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যেই অতুলপ্রসাদ, দিলীপকুমার ও নজরুলের ত্রিবেণীসঙ্গমে বাংলা গানের জগতে ছড়িয়ে গিয়েছিল ঠুংরি ও গানের প্রভাব। শুরু হয়েছিল বাংলা গানে রবীন্দ্রোত্তর যুগের গানের-ধারা। বলা যায়, দিলীপকুমারের প্রথমবার দেশে প্রত্যাবর্তনের (১৯২০-২১) পর ১৯২৩ সাল থেকে বাংলা-ঠুংরি গানের প্রচার করেন। আবার ১৯২৬-২৭ সালে দ্বিতীয়বার বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে শুরু করে পণ্ডিচেরী আশ্রমে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের (১৯২৮) পূর্ব পর্যন্ত সময়ে নজরুলের বাংলা-গজল গানকে অর্জিত শিক্ষা দিয়ে সাজান।

১৯২৩ সালেই দিলীপকুমার সুরের 'ভ্রাম্যমাণ' হয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে গেলেন প্রবীণ, অভিজ্ঞ শিল্পীদের গান শোনবার জন্য, গান সংগ্রহ ও সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য। যাত্রা শুরু হয়েছিল লক্ষ্ণৌ দিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল টপ্পা, ঠুংরি ও গজল শেখা। এই সূত্রে তিনি লক্ষ্ণৌয়ের উস্তাদ আবদুল্ রশিদ্, অচ্ছনবাঈ, জানকীবাঈ, ইন্দরবাঈ, মঙ্গুবাঈ, হুশ্‌নাজান-এর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেই সময়ে তিনি ছিলেন সংগীতবেত্তা ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছেই তিনি ওঠেন। তাঁর বাড়িতে মাসিক পত্রে প্রথম দেখলেন অতুলপ্রসাদের গান

পাগলা, মনটারে তুই বাঁধ্।
কেন রে, তুই যেথা সেথা পরিস প্রাণে ফাঁদ?
শীতলবায়ে আসলে নিশ,
তুই কেন রে হোস উদাসী
ওরে নীলাকাশে অমন করে হেসেই থাকে চাঁদ। [৬]

দিলীপকুমার লিখেছেন

> ...আমার গান শুনে অতুলদা কী খুশী! তারপরে (ঈষৎ সলজ্জে) বললেন: "আমিও গ্-গান বেঁধেছি দু'চারটি।" তাঁর সুমিষ্ট ঈষৎ তোৎলামি তাঁর স্বাভাবিক লাজুকতাকে ফুটিয়ে তুলত।
>
> আমি বললাম: জানি। আর আমি আপনার কাছে দু-একটি গান শিখতে চাই বিশেষ করে আপনার 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ।'
>
> খুশিতে তাঁর স্বভাবকোমল মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে তোৎলামিও আরো পরিস্ফুট।
>
> "ও-গানটি আমার ব্-বড় প্রিয় গান। তোমার এত ভালো লেগেছে শ্-শুনে কী যে আনন্দ হচ্ছে —"
>
> "আরো আনন্দ হবে আমাকে গানটি শিখিয়ে দিলে।"
>
> আমার পিঠে চাপড় দিয়ে: "বাপকা বেটা বটে! ত্-তিনিও এমনি সহজে আলাপ জমাতেন। তা শোনো — এ শাদামাটা ভৈরবী, তুমি স্-সহজেই শিখে নিতে পারবে।" [৭]

দিলীপকুমার এই গান শিখলেন সরাসরি অতুলপ্রসাদের কাছে। ক্রমেই এল বাংলা সংগীতের নবরূপায়ণের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। শিখলেন আরও একটি গান। যে গান একসময়ে লক্ষ্মৌয়ের অবাঙালি শ্রোতাদেরও ভীষণ প্রিয় ছিল বলে জানা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অতুলপ্রসাদের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনকালে হরিদ্বার থেকে ২১/১১/১৯৭১ তারিখে অরুণকুমার সেনকে দিলীপকুমার একটি অতিদীর্ঘ পত্র পাঠান। এই পত্র একদিকে যেমন অমূল্য তথ্যে ঠাসা তেমন মানুষ অতুলপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ও অতুলপ্রসাদের গানের ব্যাখ্যার নির্ভরযোগ্য দস্তাবেজ। কিন্তু যে গানে ঠুংরির প্রভাব ছিল, এই পত্র লেখার সময় দিলীপকুমার গানটি বিস্মৃত হয়েছিলেন। গানের উল্লেখ আমরা পাই *'স্মৃতিচারণ'* গ্রন্থে

> এর পরেই তিনি গাইলেন:
>
> রুমক ঝুমক রুম ঝুম নুপূর বাজে ...
> বিরহী পরাণখানি সে দুটি চরণ যাচে।
>
> ধূর্জটি সমঝদার তো — ব'লে উঠলো: "ইউরেকা! এরই তো নাম সৃষ্টি!"
>
> আমি সায় দিয়ে সোৎসাহে বললাম: "শুধু সৃষ্টি নয়, বাংলা গানে এর আগে ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পার আমদানি হয়েছে — কেবল ঠুংরি বাকি ছিল। আপনিই তার এ-অভাব পূর্ণ করলেন।" [৮]

শুরু হল ঠুংরি-আশ্রিত বাংলা গানের পথচলা। ক্রমশ অতুলপ্রসাদের গান দিলীপকুমার তাঁর নানা 'কন্সার্টে' নানান শিল্পীদের দিয়ে গাওয়াতে শুরু করেন। দেখতে দেখতে লোকপ্রিয় হতে থাকে সেসব গান। তখনকার সময়ে যারা এই গানের প্রশংসা করতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ছিলেন সোমনাথ মৈত্র, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মেঘনাদ সাহা, পাহাড়ী সান্যাল, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অমিয়নাথ সান্যাল, রেণুকা মিত্র প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা। শুধু বাঙালি নয় বরং অবাঙালি শিল্পীরাও ছিলেন এ-গানের ভক্ত। কাশীর বিখ্যাত মোতিবাঈ পর্যন্ত 'রুমক ঝুমক রুম ঝুম' গানটি শেখেন দিলীপকুমারের কাছে। তাই অতুলপ্রসাদের গানের এই বিরাট কর্মযজ্ঞকে দিলীপকুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছেন

> অতুলদার গান আমার কাছে ঠিক সময়েই এসেছিল, কেন না, সে-সময়ে আমি নানা ওস্তাদের ও বাইজির কাছে, বিশেষ ক'রে হিন্দি ঠুংরিতেই তালিম নিচ্ছিলাম। তাই বাংলায় ঠুংরির রস পরিবেশন ক'রে আমি নিখর্চায় নাম কিনলাম। [৯]

যতখানি 'নিখর্চায়' নাম কিনেছিলেন বলে দিলীপকুমার প্রকাশ করুন না কেন, গানের পিছনে স্রষ্টার প্রভাব বজায় রেখে সেই গান ঠুংরি আঙ্গিকের আদিরসে পরিবেশন, শিক্ষণ, গানের বেদনাকে বোধনে রূপান্তর ও সর্বোপরি স্বরলিপি প্রস্তুত এ-সবই ছিল যথেষ্ট দুরূহ কাজ। তবু সব কাজ করলেন নিখুঁত ভাবেই। স্বয়ং অতুলপ্রসাদ তাঁর *'কাকলি'* স্বরলিপি-গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন

> আমি স্বরলিপি জানিনা; তাই আমার ভাই 'মন্টু' (অর্থাৎ শ্রীমান দিলীপকুমার রায়) স্বরলিপি ছাপাবার ও আমার বোন 'ঝুনু' (অর্থাৎ শ্রীমতী সাহানা দেবী) আমার গানের স্বরলিপি ক'রে দেবার ভার নিয়েছেন। তাঁদের আগ্রহ ও সহায়তা না পেলে আমার গানগুলি মূক হয়েই থাকত, 'কাকলি' শ্রবণগোচর হ'ত না। [১০]

কিন্তু শুধু অতুলপ্রসাদের ঠুংরি-চালের গানেই দিলীপকুমার মজে রইলেন না। ফিরে এলেন বাংলায়, ততদিনে বাংলা গানে শুরু হয়েছে আরেক শৈলীর মেলবন্ধন। সেই নবধারার বাংলা গানের জনক কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলা গানে গজলের নবরূপায়ণ, সংগীত ও সাহিত্যের সীমারেখাকে প্রশস্ত করল। এই গানের সূচনা-পর্বের দিকটির সাথে দিলীপকুমারের সান্নিধ্যের নৈকট্য সব চেয়ে বেশি। যে 'সুরবিহার' বা improvisation তাঁর চেতনায় বাসা বেঁধেছিল সে মুক্তি পেয়ে সুরলিপি লিখে দিল নজরুলের সে-যুগের গজল গানে। একথা মনে রাখতেই হয় যে তিনি বারে বারে আধুনিক সংগীতের মূলমন্ত্রটি এই 'সুরবিহার' দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন বাংলা গানকে শাস্ত্রীয় সংগীতের সমতূল্য করে তুলতে। কারণ সেই যুগে বাংলা গানে রবীন্দ্রোত্তর-ধারা এঁরা দুজনেই উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু সংগীত-সমালোচকদের

কাছে সেই ভাবনা কিছু ক্ষেত্রে গ্রহণীয় হলেও বিরোধিতার সুরও বেজেছিল। যদিও ‘দৈলিপী’-চিন্তায় সর্বাপেক্ষা সমর্থন ছিল নজরুল ইসলামের। দিলীপকুমার লেখেন

> সে গুণী ছিল তাই বুঝত যে মুক্তপক্ষ সুরকে স্বরলিপির কাঠামোতে বেঁধে রাখতে তার গগনবিহার ব্যাহত হয়ই হয়। আজ শুনি একদল অগায়ক ক্রিটিকের মুখে যে এ স্বাধীনতা অক্ষমনীয়। কিন্তু অতুলপ্রসাদ ও কাজীর অনুমতি পাওয়ার পরে এসব রুক্ষক্রিটিকদের মাথা-নাড়া উপেক্ষা করা চলে। কাজী আমার মুখে তার গানের নানা সুরবিহারে বিশেষ উৎফুল্ল হয়েছিল। [১১]

এই বিষয়ে জানা যায় যে দিলীপকুমারের এই ‘সুরবিহার’-এ নজরুলের গান নতুন গতি পেয়েছিল। স্বনামধন্যা সংগীত-শিল্পী ফিরোজা বেগম বলেছেন

> ...তাঁর গজল গানগুলি কথায় ও সুরে তুলনাহীন কিন্তু গোড়ায় কিছুটা একঘেয়েমী ছিল। দিলীপকুমার রায়ের ভ্যারিয়েশনে সেই একঘেয়েমী কেটে গিয়ে এত সুন্দর হয়ে ওঠে যে মানুষের মনের গভীরে পৌঁছে। গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ গানগুলিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে। [১২]

গ্রাম-গ্রামান্তরে কতটা এই গানের প্রসার হয়েছিল তার পরিচয় আমরা পাই নারায়ণ চৌধুরী-র লেখনী থেকে

> কাজী সাহেবের গজল গান একদা বাঙলার আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াতো। উচ্চবিত্ত সমাজের সৌখিন গীতামোদী থেকে আরম্ভ করে খেটে খাওয়া বিড়ি মজদুর আর গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান পর্যন্ত সমাজের সকল স্তরের মানুষের মুখে মুখে ওই সব গজল গানের কলি ফিরতো। দিলীপকুমারের সুরের ঢঙের সঙ্গে যদিও নজরুলের সুরের ঢঙের আকাশ পাতাল পার্থক্য, তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, নজরুলের গজলের জনপ্রিয়তার পিছনে দিলীপকুমারের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। দিলীপকুমারই উদ্যোগী হয়ে গানের প্রচার সবচেয়ে বেশি করেছিলেন। সেজন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। [১৩]

এই ঘটনা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে আরেক বিখ্যাত নজরুল সমসাময়িক গীতিকবি ও বহু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কবি প্রণব রায়ের কথায়। তিনি লিখেছেন

> কাজীদার বাংলা গজল গানের প্রথম প্রচার করেছিলেন যিনি, আজকে তিনি অন্য মার্গের একজন সাধক বলে পরিচিত। তখন তিনি সদ্য বিদেশ থেকে মিউজিক সম্পর্কে অনেক পড়াশুনা, অনেক শিক্ষালাভও করে সবে দেশে ফিরেছেন। তিনি হলেন স্বর্গীয় ডি এল

> রায়ের পুত্র দিলীপকুমার রায়। দিলীপকুমার রায় মহাশয়ই সর্বপ্রথম কাজী সাহেবের গান বিবিধ জলসায় গেয়ে গেয়ে প্রচার করে বেড়াতেন এবং দিলীপকুমারের বহু সুকণ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীরাও ক্রমশ গজল গাইতে শুরু করলেন। আমি নিজে এমনি বহু জলসা শুনেছি। সে জলসাগুলি হত রামমোহন লাইব্রেরী হলে। [১৪]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য দিলীপকুমার প্রণীত *'গীতিমঞ্জরী'* (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) স্বরলিপি গ্রন্থে অতুলপ্রসাদের বাংলা ঠুংরি গানের ও কাজী নজরুলের একটি গানের দৈলিপী-স্বরলিপি পাওয়া গেছে যা নজরুল-সংগীতের গবেষণায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ নথী হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে। একথা খুব সহজেই অনুমেয় যে, যে-স্তরে দিলীপকুমার নতুনভাবে নজরুল-সংগীত চর্চার প্রচলন করেন তা অমূল্য দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্র-সমসাময়িক যুগে এইরকম যুগান্তরমূলক কাজের উদাহরণ প্রায় নেই বললেই চলে। এ-যাবৎ আলোচনায় আমরা দেখলাম বাংলা গানে ঠুংরি ও গজলের বিকাশ ও প্রভাবের নানা সূত্র। কিন্তু কোথায় এই তিন মহারথীর সাংগীতিক ত্রিবেণীসঙ্গম? এই ভাবনার দিকটিও আশ্চর্যভাবে খুলে যায় দিলীপকুমারের *'স্মৃতিচারণ'*-এ।

দিলীপকুমার সদ্য শেখা 'চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে' গানটি শুনিয়ে [১৯২৩ সাল] অতুলপ্রসাদের দরাজ কণ্ঠের সাধুবাদ পেয়ে তিনি লেখেন

> ...এর ঠুংরি চালে বাঙালি রসিক পেয়েছিল বাংলা কবিতার ভাব ও হিন্দি ঠুংরির সুর, দুইয়ের মনোহর সমন্বয় – রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অর্ধনারীশ্বর যুগলমিলনের রস। ... অচ্ছন বাইয়ের নানা মর্মস্পর্শী মীড়, কম্পন ও সূক্ষ্ম কারুকাজ এ-গানটির মধ্যে সহজেই অনুপ্রবেশ করেছিল অতুলদার শিল্পিহৃদয়ের আনন্দের সহজ তাগিদে। ... এর পরে আমার ও কাজি নজরুলের কয়েকটি সুর নিয়েও তিনি গান বেঁধেছিলেন কয়েকটি। [১৫]

দিলীপকুমার এই কয়েকটি 'গান' বলতে কোনগুলি তার উল্লেখ কোথাও করেন নি, তবে অতুলপ্রসাদের প্রথম গীতগ্রন্থ *'কয়েকটি গান'* (মর্ডান আর্ট প্রেস পাবলিশার্স, ১৩৩৪) ও শেষ গীত-সংকলন *'গীতিগুঞ্জ'* (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, সপ্তম সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৮৬) অনুসারে যে দুই-শত সাতটি গান পাওয়া যায় তার মধ্যে 'গজল' উল্লিখিত গানের সংখ্যা মোট পাঁচটি। এই পাঁচটি গানের মধ্যে আশ্চর্য দুটি সাযুজ্য হল এই যে, প্রতিটি গানের ভাবে বেদনার আবেদন খুব স্পষ্ট। প্রতিটি শব্দেই যেন অজানা, অচেনা অসীমের প্রতি মানব-মনের নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা — চিরন্তন অশ্রুসজল আরাধনা। সেই আরাধনা যেন আরও কমনীয় হয়ে উঠেছে প্রতিটি গানের প্রথম পঙক্তির প্রশ্নবোধক নিবেদনে। এই সাযুজ্য সত্যিই অপ্রত্যাশিত। গানগুলি যথাক্রমে,

- 'কে গো তুমি বিরহিণী, আমারে সম্ভাষিলে?' [৫৮ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা ৭২, বিভাগ 'প্রকৃতি']
- 'ভাঙা দেউলে মোর কে আইলে আলো হাতে?' [৯৫ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা ১২২, বিভাগ 'মানব']
- 'রাতারাতি করল কে রে ভরা বাগান ফাঁকা?' [১৩৩ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা ১৬০, বিভাগ 'মানব']
- 'কত গান তো হল গাওয়া, আর মিছে কেন গাওয়াও?' [১৯২ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা ২২৯, বিভাগ 'বিবিধ']
- 'ওগো ক্রন্দসী পথচারিণী, তুমি কোথা যাও, তুমি কারে চাও?' [২০৩ সংখ্যক গান, পৃষ্ঠা ২৪০, বিভাগ 'বিবিধ']

এর মধ্যে 'কত গান তো হল গাওয়া' গানটি দিলীপকুমার রায়ের 'যদি দিন না দেবে তবে এত ব্যথা কেন সওয়াও' গান ভেঙে সৃষ্ট। মূলগানটি দিলীপকুমারের কাছে সরাসরি শেখেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ও অতুলপ্রসাদের শিষ্য পাহাড়ী সান্যাল। সেই গান তিনি শোনান অতুলপ্রসাদকে। পরে এক সন্ধ্যায় অতুলপ্রসাদের বাড়িতে গান শিখতে গিয়ে

> ...অতুলদা চোখে চশমা এঁটে আগে তাঁর লেখা গানখানি পরে শোনালেন। গানের কথাগুলি খুবই ভালো লাগল শুনতে। কাজেই গানের ওই কথার সঙ্গেই সুর দেওয়া হয়েছে সেটা শোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে হারমোনিয়ামে সুর টিপলাম। অতুলদা গানের প্রথম ছত্রটি যখন গাইলেন তখন আমি হঠাৎ হারমোনিয়াম থামিয়ে বলে উঠলাম, "এ কী অতুলদা! এ যে মন্টুদার 'যদি দিন না দেবে'-র সুর!" অতুলদা খুব উঁচু গলায় হেসে উঠে বললেন, "আরে তা তো বটেই। তাঁর সুরটা এমন করে মনে সাড়া তুলেছিল বলেই তো গানটা লিখতে পেরেছি।" [১৬]

আমার ধারণা ঠিক এইভাবেই তাঁর অন্যান্য গানে নজরুলের গজল গানের বৈশিষ্ট্য বা প্রভাব খুঁজে পাওয়া যাবে। শুধু গজল নয় তাঁর ঠুংরি চালের গানেও এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এবার অতুলপ্রসাদ ও নজরুল পারস্পরিক প্রভায় প্রভাবিত গানগুলি একটু দেখে নেওয়া যাক —

- দিলীপকুমার তাঁর 'আলোর বাণীবহ নজরুল' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন নজরুলের 'এত জল ও কাজল চোখে' গানটি থেকে 'জল বলে চল্ মোর সাথে চল্' গানটি রচনা করেন। দুটি গানই কাজরীর আদলে রচিত। তবে বর্তমান প্রচলিত 'আল্‌গা কর গো খোঁপার বাঁধন' গানের নৈকট্য অতুলপ্রসাদের গানের সাথে বেশি। নানান তথ্য দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় 'আল্‌গা কর গো খোঁপার বাঁধন' গানের সুর প্রামাণ্য সুর বা আদি-সুর নয়।

- ইসলামী সংগীত বাংলা গানের জগতে অন্যতম সৃষ্টি ও প্রাণ। হজরত মোহম্মদ বা পরবর্দিগারের কীর্তিবন্দনার পাশাপাশি হাম্‌দ-নাত-সংগীত বিশেষ উল্লেখ্য। এটিও ইসলামী সংগীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুর। যেহেতু অতুলপ্রসাদ লক্ষ্ণৌয়ের খাস-মানুষ তাই এই সুরও তাঁর অজানা হবার মতো নয়। তবুও আমরা নজরুলের 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে' গানটির সুর শুনি তবে খুব সহজভাবেই যে অতুলপ্রসাদী গানটি মনে আসে তা হল 'মোর নাচি ফুলে ফুলে দুলে দুলে'। এই গানটি অতুলপ্রসাদের কাছ থেকেই পাওয়া বলে ধরে নিতেই হয় কারণ নজরুলের গানটি ১৯৩৩ সালে মেগাফোন কোম্পানী *JNG 57* রেকর্ডে আব্বাসউদ্দীন আহ্‌মেদ-এর কণ্ঠে প্রকাশ করেন। কিন্তু অতুলপ্রসাদের গানটি তারও আগের রচনা কারণ আমরা জানি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ *'গীতিগুঞ্জ'* ১৯৩১ সালে প্রকাশ করেন।
- নজরুলের 'আঁধার রাতে কে গো একেলা' গানটি 'আলেয়া' নাটকে 'কাকলি' চরিত্রের কণ্ঠে গীত। আবার জানুয়ারী ১৯৩৪ সালে মেগাফোন কোম্পানী *JNG 94* রেকর্ডে বাণী নিয়োগীর কণ্ঠে গানটি প্রকাশ করেন। এটি অতুলপ্রসাদের 'চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে' গানের জুড়িগান। আমাদের আলোচনায় আমরা আগেই দেখেছি যে এটি নজরুলের উক্ত গানের পূর্বের রচনা।
- 'ব্রজগোপী খেলে হোরী' গানটিও অতুলপ্রসাদের 'মধুকালে এলো হোলি' গানের 'অনুগীতি' বা জুড়িগান। এই গানের চলনে লক্ষ্ণৌ ঠুংরির প্রভাব খুবই স্পষ্ট।

উপরোক্ত গানগুলির মধ্যে একটি বিষয় খুব স্পষ্ট যে ঠুংরি গানের আবেশগুলি নজরুলের গানে নান্দনিক রূপ ফেলেছে। তবে দিলীপকুমার নজরুলের গানের বিস্তার সম্পর্কে বলেছেন

> এক সময় আমি তার নানা গানই গাইতাম, বিশেষ করে প্রেমের গান, যথা, বাগিচায় বুলবুলি তুই, বসিয়া বিজনে কেন একা মনে, এত জল ও কাজল চোখে, কেন কাঁদে পরাণ কি বেদনায় কারে কহি, চেও না আর চেও না সুনয়না এ-নয়ন পানে, কেন দিলে এ কাঁটা যদি গো কুসুম নাহি দিলে, কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে, সখী বলো বঁধুয়ারে নিরজনে, নিশি ভোর হ'ল জাগিয়া পরান পিয়া, আমারে চোখ ইশারায় দাক দিলে হাউ কে গো দরদী, করুণ কেন অরুণ আঁখি, গরজে গম্ভীর গগনে কভু প্রভৃতি। এ গুলির মধ্যে কয়েকটি কাজী নিজের হাতেই আমার খাতায় লিখে দিয়েছিল — সে খাতাটি আজো আমার আছে। কাজীর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের গৌরব স্মৃতির মাধ্যমে চাখতেই একবার উল্লেখ করলাম। [১৭]

দিলীপকুমার 'সুরবিহার' প্রসঙ্গে বারে বারে অকপটে স্বীকার করেছেন

> তার সঙ্গে আমার আর একটি মস্ত মিল ছিল এইখানে যে, তার গা[নে] সুরবিহারের স্বাধীনতা আমাকে সানন্দেই দিত যেমন দিতেন আমার পিতৃদেব ও অতুলপ্রসাদ। এ নিয়ে কবিগুরুর সঙ্গে আমার মতভেদে কাজী ও অতুলপ্রসাদ দুজনেই ছিলেন আমার দিকে। ... সে তার 'বুলবুল' কাব্যগ্রন্থটির প্রথম ভাগ আমাকেই উৎসর্গ করে। সে-যুগে আমার বাংলাগানের পাঁচটি ধারা ছিল : পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলালের, অতুলপ্রসাদের, রজনীকান্তের, কাজীর ও আমারে নিজের। মনে পড়ে কত আসরে এ-দুই সুরকারকেই এক সঙ্গে শুনিয়েছি তাঁদেরই রচিত গান। এ-সৌভাগ্য কজন গায়কের হয়েছে জানি না। তবে যাঁদের হয়েছে তাঁদের কাছে এ-স্মৃতি থাকবেই অনপনেয়— বিশেষ ক'রে এ জন্যে যে, অতুলপ্রসাদ ও কাজী শুধু গায়কই ছিলেন না, ছিলেন আদর্শ শ্রোতা তথা সমজদার। [১৮]

তাই প্রবন্ধের শেষে বন্ধুর প্রতি বন্ধুর উৎসর্গ-বাণীই হোক মধুরেণসমাপয়েৎ-এর সুর

সুর-শিল্পী, বন্ধু
দিলীপ কুমার রায়
কর-কমলেষু

আমার শুধু এ বাণী হে বন্ধু, আমার শুধু এ গান।
তুমি তারে দিলে রূপ-রঙ্গিমা, তুমি তারে দিলে প্রাণ!
আমার ব্যথায় বেঁধেছিল নীড় যে গানের বুল্‌বুলি,
আপনি আসিয়া আদরে তাহারে বক্ষে লইলে তুলি'।
আমার পাখির কণ্ঠে মিশালে তোমার দরদ ল'য়ে,
আমার বেদনা বাজে আজ তাই সবার বেদনা হ'য়ে।
যে গান গেয়েছি একাকী নিশীথে কুসুমের কানে কানে,
ওগো গুণী, তুমি ছড়াইলে তা'রে সব বুকে, সব খানে।
বুকে বুকে আজ পেয়েছে আশ্রয় আমার নীড়ের পাখি,
মুক্তপক্ষ উড়িতে যে চায়—কেন তা'রে বেঁধে রাখি?
তোমার কাননে উড়ে গেল মোর বাগিচার বুল্‌বুলি,
বড় ভীরু সে যে, দোস্ত্, তাহারে দস্তে লইও তুলি'!

কলিকাতা
১৫ই আশ্বিন — তোমার প্রতিভা ও প্রাণমুগ্ধ
১৩৩৫ — **নজরুল** [১৯]

তথ্যসূত্র

১। *বিস্মৃত দর্পণ,* সম্পাদনা – রমাকান্ত চক্রবর্তী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, Digital Library of India Item 2015.265395, পৃ. ৫,

২। তদেব, পৃষ্ঠা. ২৪।

৩। *Studies in Islamic Culture in the Indian Environment,* Aziz Ahmed, Oxford University Press, 1964, p. 233।

৪। *দিলীপকুমার রায় রচনা সংগ্রহ* [১], *সাঙ্গীতিকী,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ২১৫,

৫। তদেব, পৃ. ২১৬-১৭।

৬। *গীতিগুঞ্জ,* অতুলপ্রসাদ সেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, সপ্তম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৮৬, পৃ. ১৭৬।

৭। *তত্ত্বকৌমুদী,* অতুলপ্রসাদ সংখ্যা, সম্পাদনা – দিলীপকুমার বিশ্বাস, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১৩৭৯, পৃ. ৪৭-৪৮।

৮। *স্মৃতিচারণ,* দিলীপকুমার রায়, প্রথম সংস্করণ, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ৭ই আশ্বিন ১৮৮২ [শক], পৃ. ৫২০,

৯। তদেব, পৃ. ৫২২।

১০। *কাকলি,* শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, কলিকাতা, পৌষ ১৩৩৬, 'ভূমিকা'।

১১। *নজরুল স্মৃতি, 'কাজী নজরুল ইসলাম',* দিলীপকুমার রায়, সম্পাদনা – বিশ্বনাথ দে, সাহিত্যম্, কলিকাতা ১লা মাঘ ১৩৭৯, পৃ. ১৯।

১২। *নজরুলগীতি অন্বেষা, 'ফিরোজা বেগম',* সম্পাদনা – কল্পতরু সেনগুপ্ত, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১২১,

১৩। তদেব, *'নারায়ণ চৌধুরী',* পৃ. ১৪৩।

১৪। *দেশ, 'কাজী সাহেবের গান: সঙ্গ-প্রসঙ্গ',* প্রণব রায়, বিনোদন সংখ্যা ১৩৯১, কলকাতা, পৃ. ৬৭,

১৫। *স্মৃতিচারণ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৪।

১৬। *মানুষ অতুলপ্রসাদ,* পাহাড়ী সান্যাল, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৫০।

১৭। *নজরুল স্মৃতি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯,

১৮। তদেব, পৃ. ১৯।

১৯। *বুল্‌বুল্ (প্রথম ভাগ),* নজরুল্ ইস্‌লাম, [উৎসর্গ-পত্র], নতুন সংস্করণ (ডি. এম.), আষাঢ় ১৪০৯, কলকাতা।

অভিব্যক্তিমূলক মনোচিকিৎসায় সাইকোড্রামার প্রয়োগ-প্রক্রিয়া

আরাফাতুল আলম
সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সার-সংক্ষেপ : মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন হতে আজ অবধি মানুষ নিজেদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বহু মাত্রিক কর্ম প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। প্রায় সহস্রাধিক বছরের চেষ্টায় নিরাময়ী পদ্ধতি বর্তমানে যে রূপ লাভ করেছে 'অভিব্যক্তিমূলক মনোচিকিৎসা' সেগুলোর মধ্যে অনন্য। সুস্বাস্থ্যের জন্য শরীর, মন ও সামাজিক সম্পর্কের সুষম বিন্যাস অপরিহার্য। অর্থাৎ শরীরের সাথে মন ও সামাজিক সম্পর্কগুলো সুন্দর ও স্বাভাবিক রাখতে পারলে, সামগ্রিক অর্থে সুস্থ-সুন্দর তথা ভাল থাকা সম্ভব। আর ভাল থাকার বহুমুখী উদ্যোগ ও কর্ম প্রচেষ্টায় বিকল্প নাট্য আঙ্গিক, বিশেষ করে 'সাইকোড্রামা' এর ব্যবহার এই সার্বিক নিরাময়ী-শিল্প-পদ্ধতিকে দিয়েছে নতুন মাত্রা। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে অভিব্যক্তিমূলক মনোচিকিৎসার স্বরূপ অন্বেষণের পাশাপাশি সর্বাধিক প্রযুক্ত সাইকোড্রামার সামগ্রিক প্রয়োগ-প্রক্রিয়া গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়েছে।
মূলশব্দঃ অভিব্যক্তিমূলক মনোচিকিৎসা, সাইকোড্রামা, প্রধান ভূমিকাভিনেতা, সহযোগী ভূমিকাভিনেতা, ভূমিকাভিনয়, দ্বিত্বাভিনয় ইত্যাদি।

ভূমিকা

মানুষ স্বভাবত নিজের দুঃখ-কষ্ট ও ব্যর্থতার কথা কাউকে জানাতে চায় না। দিনের পর দিন কষ্ট জমিয়ে-জমিয়ে হারিয়ে যায় শূন্যতার অতল গহ্বরে। 'শরীর' নামক সসীম অবয়বের বিভিন্ন সমস্যার প্রতিকারে মানুষ যতটা সচেতন; সেই নির্দিষ্ট অবয়বের মধ্যে থাকা 'মন' নামক অসীম জগতের ভাল-মন্দের খবর নিতে ততটা উদাসীন। এতদসত্ত্বেও, আমাদের দেশে মনোস্বাস্থ্য নিয়ে প্রাজ্ঞ মহলের আগ্রহ, চিন্তা-ভাবনা ও কার্যক্রম ক্ষীণালোকে জ্যোতি ছড়াচ্ছে নিরন্তর। বর্তমানে মনোস্বাস্থ্য বিপর্যয় প্রতিরোধ ও প্রতিকারকল্পে প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতির পাশাপাশি 'অভিব্যক্তিমূলক মনোচিকিৎসা' নামক কর্মভিত্তিক শিল্প প্রচেষ্টার ব্যবহার, মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিয়ে এসেছে নতুনত্ব। যেখানে অংশগ্রহণকারী দলীয়ভাবে ব্যক্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণে সমর্থ হন। পাশাপাশি অন্যান্য সদস্যদের সাথে অনুভূতি বিনিময় ও অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা সাপেক্ষে বিভিন্ন সৃজনশীল কলাবিদ্যার মাধ্যমে, সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার সহজ পথ খুঁজে পেতে সক্ষম হন। তাই মনো-সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অভিব্যক্তিমূলক

মনোচিকিৎসার অনুশীলন, আলোচনা-পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা সমকালীন ও প্রাসঙ্গিক।

১. অভিব্যক্তিমূলক মনোচিকিৎসা

সাধারণ অর্থে 'মনোচিকিৎসা' বা 'সাইকোথেরাপি' বলতে কোন মনোস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলে সমস্যা নির্ধারণ পূর্বক মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও জ্ঞানের আলোকে সমাধান করাকে বোঝায়। পক্ষান্তরে- বিভিন্ন শিল্প ও নাট্য আঙ্গিকের দ্বারা মানসিক চিকিৎসা প্রদানের ঔষধবিহীন পদ্ধতি 'অভিব্যক্তিমূলক মনোচিকিৎসা' বা 'এক্সপ্রেসিভ সাইকোথেরাপি'নামে অভিহিত। অর্থাৎ এক বা একাধিক ব্যক্তির জীবনে সংঘটিত হওয়া কোন নেতিবাচক ঘটনা বা পরিস্থিতির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে কিংবা সম্ভাব্য নেতিবাচক পরিস্থিতির ঝুঁকি প্রতিরোধকল্পে; যে শৈল্পিক নিরাময়ী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা হল অভিব্যক্তিমূলক মনোচিকিৎসা।

প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে বিগত এক শতাব্দি সময়কাল ধরে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন নামে মনোবিশ্লেষক অভিব্যক্তিধর্মী ও সৃজনশীল শিল্পকলার অনুশীলন হলেও বাংলাদেশে ২০২১ সালে সর্বপ্রথম "এক্সপ্রেসিভ সাইকোথেরাপি" নামে পাঠ ও অনুশীলন শুরু হয়। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'ইউনাইট্ থিয়েটার ফর সোশাল অ্যাকশন্ (UTSA/উৎস)' এবং 'কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (CBIU/সিবিআইইউ)' এর যৌথ উদ্যোগে বিদ্যায়তনিক অনুশীলনের যাত্রারম্ভ। এই অভিনব ও কার্যকরী নিরাময়ী শিল্প প্রচেষ্টার অনুশীলন, পঠন-পাঠন ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মোস্তাফা কামাল যাত্রা। যিনি বাংলাদেশের নিরাময়ী ও নিরীক্ষাধর্মী নাট্য জগতে 'এক্সপ্রেসিভ সাইকোথেরাপি'র পথিকৃৎ রূপে সর্বজন স্বীকৃত। তিনি মনে করেন-

> 'এক্সপ্রেসিভ সাইকোথেরাপি' একটি আমব্রেলা টার্ম। ছাতার যেমন অনেকগুলো সিক তথা সলাকা থাকে, তেমনি আলোচ্য এক্সপ্রেসিভ সাইকোথেরাপিরও রয়েছে অনেকগুলো সুক্ত। যে সুক্ত তথা উপকরণ বা কৌশলগুলোর সম্বন্বিত নামাঙ্কন হল 'এক্সপ্রেসিভ সাইকোথেরাপি'। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সলাকাগুলো বা কৌশলসমূহ হল সাইকোড্রামা, সোসিওড্রামা, প্লে-বেক থিয়েটার, ড্রামা থেরাপি, ডান্স থেরাপি, মুভমেন্ট থেরাপি, ব্রিদিং থেরাপি, মিউজিক থেরাপি, আর্ট থেরাপি, পয়েট্রি থেরাপি, মাইম থেরাপি ইত্যাদি। (কামাল যাত্রা, ২০২১:০৪)

মূলত অভিব্যক্তিমূলক মনোচিকিৎসা অনেকগুলো বিশেষ নাট্য ও শিল্প কৌশলের নিরাময়ী প্রচেষ্টার সন্নিবেশ। যা অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির মনের গভীর স্তরে গিয়ে তার স্বতঃস্ফূর্ততা ও সৃজনশীলতাকে অনুরিত করে বিভিন্ন ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও যৌথ সৃজনের মাধ্যমে মনো-দৈহিক এবং মনো-সামাজিক ভারসাম্যহীনতা, বিষণ্ণতা, মানসিক অস্থিরতা, হতাশা, মানসিক বিপর্যয়সহ প্রভৃতি নেতিবাচক চাপ ও প্রভাবের বিপরীতে একটি সার্বজনীন অভিব্যক্তিমূলক সুখানুভবের উন্মেষ ঘটায়। বস্তুত এই

প্রতিবিধানমূলক শিল্প প্রচেষ্টা অংশগ্রহণকারীদের সামগ্রিক অভিব্যক্তিকে বিকাশোন্মুখ হতে সহায়তা করে। ফলশ্রুতিতে অংশীজনের অন্তরাত্মা যেমন তৃপ্ত ও প্রসন্ন হয়, তেমনি পারস্পরিক সম্পর্কও সুস্থিত এবং সুদৃঢ় হয়।

> "এ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের স্বতঃস্ফূর্ততার ও সৃজনশীলতার মাত্রা বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে- সম্মিলিতভাবে তারা তাদের আবেগ, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে অভিব্যক্তি আকারে উপস্থাপন বা প্রদর্শন করে। যেখানে অংশগ্রহণকারীরা 'পুরানো পরিস্থিতির প্রতি একটি নতুন সাড়া'হিসাবে যেমনি তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে; তেমনি 'নতুন পরিস্থিতির প্রতি একটি যথার্থ সাড়া'হিসাবে সু-সমন্বিত প্রদর্শনমূলক ভাব প্রকাশ করে থাকে। যাকে বিশ্লেষকগণ মনোবিশ্লেণধর্মী অভিব্যক্তিমূলক সৃজনশীল কলাবিদ্যা তথা 'এক্সপ্রেসিভ সাইকোথেরাপি'র দর্শন হিসাবে মান্যতা দিয়েছেন।" (কামাল যাত্রা, ২০২১:০৭)

প্রকৃতপক্ষে এই নিরাময়ী শিল্প দর্শনের উপর ভিত্তি করে অভিব্যক্তিমূলক মনোচিকিৎসার সার্বিক প্রয়োগ-প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। যেখানে ক্রমান্বয়ে পাঁচটি অপরিহার্য স্তর বা পর্যায় গুরুত্বসহকারে অনুসরণ করা হয়। যার 'কর্ম-প্রস্তুতি পর্ব' দিয়ে হয় সূচনা এবং 'ভাববিনিময় পর্ব' দিয়ে হয় সমাপ্তি। নিম্নে পর্যায়গুলোর একটি চিত্রিত মডেল দেখানো হল-

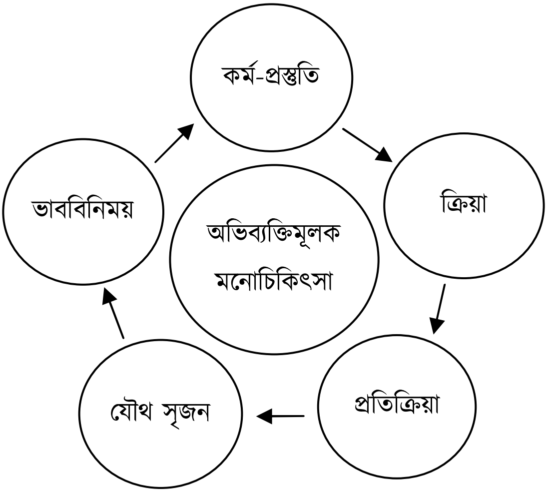

চিত্র নং : ০১

২. সাইকোড্রামা

ড. জ্যাকব লেভি মোরেনো কর্তৃক উদ্ভাবিত ‘গ্রুপ সাইকোথেরাপি’ প্রদানের একটি কার্যকরী নাট্যিক আঙ্গিক হল ‘সাইকোড্রামা’। যার প্রধান ভিত্তি হল- ‘Theory of Role’ বা ‘ভূমিকা তত্ত্ব’। মোরেনো প্রচলিত নাট্য চর্চায় শিল্পীর অপ্রকাশিত সৃজনশীলতার লক্ষণ দেখে এমন এক নাট্য চর্চায় ব্রত হন, যা দর্শক-অভিনেতা উভয়ের ভাবের বিমোক্ষণ ঘটায়। তাই-

> “ফ্রয়েড প্রবর্তিত ‘সাইকো এনালাইসিস’ তত্ত্বের বিপরীতে মোরেনো স্বতঃস্ফূর্ততাহীন এবং সৃজনশীলতাবর্জিত প্রচলিত নাট্যঅভিনয়-এর [নাট্যাভিনয়ের] ঊর্ধ্বে উঠে অভিনয় কলাকে ‘আর্ট অব ইমপ্রোভাইজেশন’ এর মর্যাদা দান করেছেন। যে প্রক্রিয়ায় তাৎক্ষণিক অভিনয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পুনঃসৃজন করা হয়ে থাকে।” (কামাল যাত্রা, ২০১৮:১১০)

“Psychodrama is a method for exploring problems by improvisationally enacting them as if in a play.” (Allison, 1999:416) অর্থাৎ সাইকোড্রামা নাটকেরই অনুরূপ একটি পদ্ধতি যা তাৎক্ষণিক অভিনয়ের মাধ্যমে সমস্যা অন্বেষণ করে। সহজে বলা যায় সাইকোড্রামা হল এক ধরনের অভিজ্ঞতামূলক, ক্রিয়াভিত্তিক পদ্ধতি যেখানে মানুষ তাদের অতীতের ঘটনাগুলোর পুনরাভিনয়ের মাধ্যমে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে।

> “প্রকৃতপক্ষে মনোবিশ্লেষক নাট্যক্রিয়ার অন্যতম প্রধান প্রয়োগশৈলী ‘সাইকোড্রামা’ হচ্ছে সঙ্কটের কার্যকারণ খুঁজতে স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে দিয়ে চরিত্রাভিনয়ের বিশেষ এক প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়া অংশগ্রহণকারীদের শরীর, মন ও অন্তরাত্মাকে প্রসন্ন এবং প্রশান্ত করে পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে জীবনবোধ অন্বেষণের উপায় উপস্থাপনের পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনের অপরাপর চরিত্রের বা ব্যক্তির সাথে স্বতঃস্ফূর্ত ও যৌক্তিক জীবনাচারের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ব্যক্তিক ও সামষ্টিক স্বতঃস্ফূর্ততাকে জাগ্রত করে সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে সৃজনশীলতার বিস্তার ঘটানোই হচ্ছে সাইকোড্রামার মূল উদ্দেশ্য।” (কামাল যাত্রা, ২০১৭:৪২-৪৩)

বস্তুত অভিব্যক্তিমূলক অনুশীলনের ক্ষেত্রে মনোচিকিৎসায় সর্বাধিক ব্যবহৃত কর্ম-কৌশল হল সাইকোড্রামা। উল্লেখ্য বাংলাদেশের মনো-বিশ্লেষক নাট্য-বিজ্ঞানী মোস্তফা কামাল যাত্রা ১৯৯৮ সালে ‘বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী’ শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এই বিশেষায়িত নাট্য আঙ্গিক বাংলাদেশে সর্বপ্রথম প্রয়োগ শুরু করেন।

৩. সাইকোড্রামার মূলনীতি

অভিব্যক্তিমূলক মনোচিকিৎসায় সাইকোড্রামার অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্য ও থেরাপিস্ট বা পরিচালক অবশ্য পালনীয় যে চারটি 'নিয়ম' বা 'নীতি' বিবেচনায় রেখে সামগ্রিক অধিবেশন সম্পন্ন করেন তা সাইকোড্রামার মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত। অনেকেই এই মূলনীতিগুলোকে 'চুক্তি' বা 'শর্ত' হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। নিম্নে মূলনীতিসমূহের চিত্রিত মডেলসহ বর্ণনা করা হলঃ-

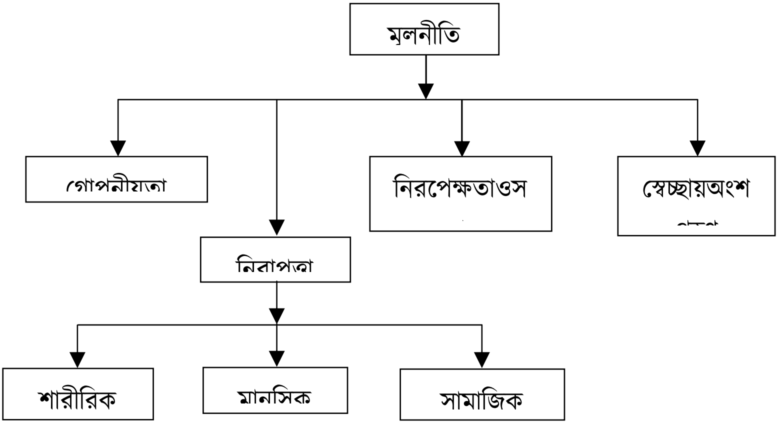

চিত্র নং: ০২

৩.১ গোপনীয়তা রক্ষা

অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীর গোপনীয়তা রক্ষা হল সাইকোড্রামার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। অধিবেশনে বিভিন্ন 'ক্রিয়া' সম্পাদনে অংশগ্রহণকারীর আন্তঃব্যক্তিক, ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত অপ্রকাশিত অভিজ্ঞতা উঠে আসে। যা বাইরে উন্মোচিত বা প্রকাশিত হলে ব্যক্তিটি কষ্ট হয়ত পেতে পারেন। তাই প্রত্যেক সদস্যকে অংশগ্রহণকারীদের গোপনীয়তা রক্ষার মূলনীতিটি যেকোন মূল্যে মেনে চলা ও অক্ষুণ্ণ রাখার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হয়।

৩.২ নিরাপত্তা প্রদান

সাইকোড্রামার দ্বিতীয় মূলনীতি হল অংশগ্রহণকারীর 'নিরাপত্তা' বা সুরক্ষা প্রদান। অধিবেশন চলাকালে কোন সদস্য অন্য সদস্য বা থেরাপিস্ট দ্বারা যাতে আঘাত প্রাপ্ত না হন সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হয়। কেননা কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হলে বা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন কাজে অংশ নিতে পারে না। তাই

অধিবেশনে বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে যাতে কেউ নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে সে দিকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। পাশাপাশি সদস্যগণ একে অপরের প্রতি তিন ধরনের অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বা সুরক্ষা প্রদানে সচেষ্ট থাকেন।

৩.৩ বিচার নিরপেক্ষতা ও সম্মান প্রদর্শন

সাইকোড্রামায় দলে একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে কারো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, কাজ বা মতামতের প্রতি বিচার নিরপেক্ষ অভিব্যক্তি প্রকাশ এবং প্রত্যেক সদস্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মূলনীতি মেনে চলা অপরিহার্য। বস্তুত এই নীতি অনুসরণ করলে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের বিপরীতে কাজে মনোযোগ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পায়।

৩.৪ স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ

সাইকোড্রামার সামগ্রিক প্রক্রিয়া বিকাশে যেহেতু অংশগ্রহণকারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা মুখ্য, সেহেতু অধিবেশনের প্রতিটি ধাপে ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ততা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সদস্যদের মধ্যে কেউ কাউকে কোন কাজ বা ভূমিকা পালনে জোড়ারোপ করতে পারেনা। তাই স্বেচ্ছায় অধিবেশনের কাজে অংশ নেয়ার নীতি মাথায় রেখে স্বীয় স্বতঃস্ফূর্ততা ও সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়ে সামগ্রিক কাজে নিজেকে যুক্ত রাখা অত্যন্ত জরুরি।

৪. সাইকোড্রামার উপাদান

একটি সাইকোড্রামার অধিবেশন পরিচালনার জন্য যে পাঁচটি মৌল অংশ বা অপরিহার্য উপকরণ প্রয়োজন তা সাইকোড্রামার উপাদান নামে সমাদৃত। নিম্নে সাইকোড্রামার উপাদান সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হল :-

৪.১ পরিচালক

সাইকোড্রামার মঞ্চে পরিচালক হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে সাইকোড্রমার অধিবেশন সফলভাবে সঞ্চালনা বা পরিচালনা করেন। তিনি অধিবেশনের লক্ষ্য অর্জনে সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় সমন্বয় সাধন করেন বলে, অভিন্ন অধিবেশনে একই পরিচালকের বিভিন্ন ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। যেমন সময়ের প্রয়োজনে কখনো তিনি থাকেন 'দলনেতা', কখনো 'বিশ্লেষক', কখনো 'থেরাপিস্ট'। মূলত সাইকোড্রমায় একজন পরিচালক অংশীজনের নির্ভরশীল 'পথ নির্দেশক' হিসেবে কাজ করেন। তাই পরিচালককে সাইকোড্রামায় অভিজ্ঞ ও দক্ষ হতে হয়। যেহেতু, অধিবেশনের প্রতিটি মুহূর্তে একজন পরিচালক অগণিত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। তাই একজন দক্ষ পরিচালক সাবধানতার সাথে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে প্রধান ভূমিকাভিনেতার অনুকূলে পরিস্থিতি অক্ষুণ্ণ রেখে বুদ্ধিদীপ্ততার সাথে সামগ্রিক লক্ষ্য পূরণের পথে অগ্রসর হন। সাধারণত, একশত (১০০) ঘন্টার অধিক প্রশিক্ষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে একটি অধিবেশন পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হয় না। তবে একজন পেশাদার ও অনুমোদিত পরিচালকের স্বীকৃতি পেতে হলে নূন্যতম সাতশত আশি (৭৮০) ঘন্টার প্রশিক্ষণ সুসম্পন্ন করা প্রয়োজন।

৪.২ প্রধান ভূমিকাভিনেতা

যিনি তার ব্যক্তি জীবনের কোন মুহূর্ত বা বিশেষ ঘটনা পরিচালকের সহযোগিতায় দলের সম্মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থাপন করেন। সাধারণত, একজন প্রধান ভূমিকাভিনেতা দল দ্বারা নির্বাচিত হতে পারেন, হতে পারেন স্ব-নির্বাচিত কিংবা থেরাপিস্ট দ্বারা নির্ধারিত। সাইকোড্রামা যেহেতু অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও কর্মভিত্তিক তাই এই প্রক্রিয়ায় প্রধান ভূমিকাভিনেতার অভ্যন্তরীণ বাস্তবতার দ্বার উন্মোচিত হয়। নিরীক্ষণের সুবিধার্থে একজন প্রধান ভূমিকাভিনেতা তার ঘটনা বা মুহূর্তের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেন। যাতে তা দলের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠে। মোরেনো'র মতে এটির লক্ষ্য এই যে, রোগীদের অভিনেতাতে পরিণত করা নয় বরং তাদের মঞ্চে আসার জন্য আলোড়িত করা, যা তারা জীবনের বাস্তবতায় আরো স্পষ্ট ও গভীরভাবে উপস্থাপন করে।

৪.৩ সহযোগী ভূমিকাভিনেতা

সাইকোড্রামার তৃতীয় উপাদান হল এক বা একাধিক 'সহযোগী ভূমিকাভিনেতা'। অধিবেশন চলাকালে পরিচালক ও প্রধান ভূমিকাভিনেতা ব্যতীত দলের অন্য এক বা একাধিক সদস্য যারা সহযোগী হিসেবে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন তাদেরকে বলা হয় সহযোগী ভূমিকাভিনেতা। তারা পরিচালক কিংবা প্রধান ভূমিকাভিনেতা দ্বারা যেমন নির্বাচিত হতে পারেন; তেমনি স্ব-প্রণোদিত হয়েও সহযোগী ভূমিকাভিনেতার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন। তারা স্বীয় সৃজন ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রধান ভূমিকাভিনেতার সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে থাকেন। মোরেনো সহযোগী ভূমিকাভিনেতাদের তিনটি কাজের ধরণ উল্লেখ করেন। যথা-

ক. একজন ভূমিকাভিনেতা হিসেবে

খ. একজন থেরাপিস্ট এজেন্ট হিসেবে

গ. নিষ্ক্রিয় দর্শকের বিপরীতে সক্রিয় সামাজিক অন্বেষক হিসেবে।

৪.৪ মঞ্চ

সাইকোড্রামায় মঞ্চ বলতে অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী দলের সদস্যদের অবস্থান উপযোগী যে কোন উন্মুক্ত বা ছাদ আবৃত স্থানকে বোঝায়। যেখানে অংশীজন তাদের সুবিধামতো চলাচল, প্রস্তুতি ও উপস্থাপনা সম্পন্ন করতে পারেন। মোরেনো মনে করেন, সাইকোড্রামার মঞ্চ হল জীবন বাস্তবতার বাহিরে জীবনের একটি সম্প্রসারণ। যেখানে বাস্তবতা ও কল্পনা বিরোধপূর্ণ নয়, বরং উভয় একটি বৃহৎ বৃত্তে গাঁথা। তাই সাইকোড্রামার মঞ্চে সবকিছুই সম্ভব। মোরেনো মঞ্চকে নিয়ন্ত্রিত বাস্তবতার বিপরীতে একটি বহুমাত্রিক প্রাণবন্ত স্থান হিসেবে বর্ণনা করেন। ড. ফ্রয়েডের উদ্দেশ্যে মোরেনো বলেন, "...আপনি মানুষের সাথে মেশেন আপনার অফিসে একটি কৃত্রিম পরিবেশে।

আর আমি মিশি তাদের বড়িতে, রাস্তায় সর্বোপরি প্রকৃতির সংশ্রবে।" (কামাল যাত্রা, ২০১৭:৪০)

৪.৫ দর্শক

সাধারণত একদল মানুষ বা পর্যবেক্ষক যারা অধিবেশনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন, তাদের বলা হয় সাইকোড্রমার দর্শক। এই দর্শক হল চূড়ান্ত ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেননা অধিবেশনের শেষ পর্যায়ে দর্শক ও প্রধান ভূমিকাভিনেতার সাথে স্বীয় উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা ও মতামত বিনিময় করেন। আর এই ভাববিনিময়ের মধ্য দিয়ে প্রধান ভূমিকাভিনেতা দলগত সোসিওমেট্রিতে পুনরায় প্রবেশ করেন। মোরেনো-সাইকোড্রামার অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী দর্শকদের দুটি কাজের কথা উল্লেখ করেন। যথা-

ক. সাইকোড্রামা এবং মঞ্চে প্রধান ভূমিকাভিনেতার পরিবেশনা পর্যবেক্ষণ।

খ. শিক্ষানবিশ বা রোগী হিসেবে অংশগ্রহণ।

৫. সাইকোড্রামার প্রয়োগ-প্রক্রিয়া

সাধারণত অবস্থাভেদে সাইকোড্রামার প্রয়োগ-প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন কৌশলের সংযোজন-বিয়োজন ঘটে থাকে। অধিকন্তু একটি আদর্শ সাইকোড্রামার অধিবেশনে তিনটি অপরিহার্য পর্যায় বা পর্ব বিদ্যমান। যথা- 'কর্ম-প্রস্তুতি পর্ব', 'উপস্থাপনা পর্ব' এবং 'ভাববিনিময় পর্ব'। তিনটি পর্বে বিভিন্ন উপায়ে মোরেনো'র ট্রায়াডিক পদ্ধতির (সোসিওমেট্রি, সাইকোড্রামা ও গ্রুপ সাইকোথেরাপি) প্রতিফলন পরিলক্ষিত। নিম্নে সাইকোড্রামার প্রয়োগ-প্রক্রিয়া চিত্রিত মডেল সহ বর্ণনা করা হলঃ-

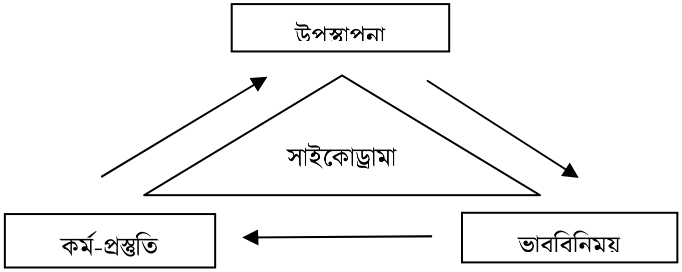

চিত্র নংঃ ০৩

৫.১ কর্ম-প্রস্তুতি পর্ব

কর্ম-প্রস্তুতি পর্ব হল একটি কর্মভিত্তিক পর্যায়। যেখানে দলের সদস্যদের পরিচিতি, দলগত সমন্বয়ের অনুভূতি তৈরী এবং বিশ্বাস স্থাপনার বিভিন্ন কর্যক্রম অনুশীলন করা হয়। বস্তুত প্রক্রিয়াটি শুরু হয় পাঁচ থেকে পনের মিনিটের সাধারণ আলোচনার মধ্য দিয়ে। পরবর্তীতে বিভিন্ন পরিমাপক (ব্যারোমিটার, স্পেকট্রোগ্রাম, লোকোগ্রাম প্রভৃতি), শ্বাস ব্যায়াম, মন ও শরীর কেন্দ্রীভূতকরণ, আস্থার স্থরকে শক্তিশালীকরণ, কল্পনাকে

উদ্দীপিতকরণের বিভিন্ন অনুশীলন করা হয়। যাতে অংশগ্রহণকারীর আত্মপ্রকাশের পথ সুগম হয়। সাইকোড্রামার অধিবেশনে এই পর্বটি দলের জন্য অপরিহার্য। মনোযোগের অভাবে অধিবেশন যেমন ব্যর্থ হয়, তেমনি পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়া পরবর্তী ধাপগুলো হয় অসম্পূর্ণ। তাই গুরুত্বসহকারে কর্ম-প্রস্তুতি পর্ব সু-সম্পন্ন করা খুবই জরুরি। কেননা এই প্রস্তুতি পর্বই পরবর্তী পর্বের ভিত্তি বা বুনিয়াদ।

৫.২ উপস্থাপনা পর্ব

সাইকোড্রামার প্রধান বৈশিষ্ট্য-মন্ডিত ও ক্রিয়া ভিত্তিক পর্যায় হল এই উপস্থাপনা পর্ব। যেখানে ব্যক্তির জীবন থেকে একটি বিশেষ ঘটনা বা মুহূর্তের উপস্থাপনা পরিবেশিত হয়। থেরাপিস্ট বিভিন্ন সাইকোড্রামাটিক কৌশল ও ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ জীবনকে সাইকোড্রামার মঞ্চে নিয়ে আসেন। এই সেই জাদুকরী পর্যায়, যেখানে অংশগ্রহণকারী বাস্তবতা থেকে অতিরিক্ত বাস্তবতায় চলে যায়। উল্লেখ্য অভিব্যক্তিমূলক মনোচিকিৎসায় সাইকোড্রামার প্রয়োগ-প্রক্রিয়ার এই পর্বে নিম্নোক্ত কৌশলগুলোর অধিক ব্যবহার পরিলক্ষিত। যদিও অংশগ্রহণকারীর অবস্থা ও অবস্থান বিবেচনায় কৌশলগুলোর সংযোজন-বিয়োজন হয়ে থাকে।

ক. ভূমিকাভিনয়

প্রতিটি ব্যক্তি তার যাপিত জীবনে কোন না কোন চরিত্রের অধিকারী। অর্থাৎ পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি বিবেচ্য বিষয়ের সামষ্টিক রূপ হল একজন মানুষের চরিত্র। পক্ষান্তরে নির্দিষ্ট কাজ, সম্পর্ক বা শর্তের বিপরীতে একজন মানুষ যে বিশেষ-বিশেষ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখায় বা দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে, তা হল উক্ত ব্যক্তির 'ভূমিকা'। অর্থাৎ 'চরিত্র' হল অসংখ্য ভূমিকার 'সামষ্টিক রূপ' আর 'ভূমিকা' হলো চরিত্রের 'খণ্ডাংশ' বা বিশেষ মুহূর্ত মাত্র। সাইকোড্রামায় এই বিশেষ মুহূর্তে যিনি অভিনয় করেন তাকে 'ভূমিকাভিনেতা' এবং যা করেন তা 'ভূমিকাভিনয়' হিসেবে পরিগণিত। একটি সাইকোড্রামার উপস্থাপনায় অন্তর্নিহিত, আন্তঃব্যাক্তিক, সামাজিক, সাইকোড্রামাটিক, আধ্যাত্মিকসহ বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা পরিলক্ষিত। যদিও প্রথাগত নাটকে ভূমিকাগুলো থাকে লিখিত ও পূর্বনির্ধারিত, কিন্তু সাইকোড্রামাতে থাকে বাস্তব জীবনের মত স্বতঃস্ফূর্ত। একজন দক্ষ পরিচালক প্রতিটি অংশীজনকে ভূমিকাভিনয়ের স্তর ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত করার পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে একজন প্রধান ভূমিকাভিনেতা হিসেবে গড়ে উঠতে সহযোগিতা করেন।

খ. দ্বিত্ব

'দ্বিত্ব' হল সাইকোড্রামায় অংশগ্রহণকারী দলের এমন একজন সদস্য; যিনি প্রধান ভূমিকাভিনেতার ডান দিকে, একটু পেছন-পাশে অবস্থান করে তার আবেগ ও আচরণের অভিনয় করেন। যা 'দ্বিত্বাভিনয়' হিসেবে পরিগণিত। অর্থাৎ প্রধান ভূমিকাভিনেতা যা বিশ্বাস করেন, যা ভাবেন কিন্তু তার অভ্যন্তরে আটকে রাখেন তা

দ্বিত্ব অভিনয়ের মাধ্যমে সবার সামনে প্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে দ্বিত্ব প্রধান ভূমিকাভিনেতার অভ্যন্তরীণ বাস্তবতার সাথে বাহ্যিক বাস্তবতার একটি সংযোগ স্থাপন করেন। তাই একে প্রধান ভূমিকাভিনেতার সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এক কথায়, দ্বিত্ব হল প্রধান ভূমিকাভিনেতার অব্যক্ত অনুভূতি প্রকাশের 'অন্তঃস্থিত কণ্ঠস্বর'।

গ. পরকলা

একজন সহায়তাকারী সদস্য যখন প্রধান ভূমিকাভিনেতার চিত্রিত রূপে পুনরাভিনয় করেন, তখন তা 'পরকলা' নামে পরিচিত। অর্থাৎ এক্ষেত্রে অন্যের পুনরাভিনয় দেখে প্রধান ভূমিকাভিনেতা স্বীয় কথোপকথন, ঘটনা ও সামগ্রিক দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পায়। তাই এই কৌশলটি গভীর দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে ও আবেগগুলোকে বেশ ভালোভাবে অনুধাবন করতে কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

ঘ. ভাস্কর্য

সাইকোড্রামার এই অনুশীলনটি আন্তঃব্যক্তিক, ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক প্রভৃতি পরসীমার মধ্যে অনুভূত সম্পর্ক অন্বেষণে ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হয়। একজন ব্যক্তি তার ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক বিবেচনায়; দলের অংশগ্রহণকারী সদস্যদের নিয়ে উক্ত ঘটনার আদলে একটি ভাস্কর্য নির্মাণ করেন। ফলশ্রুতিতে এই প্রক্রিয়াটি পদ্ধতিগত কাঠামোর মধ্যে একটি বাহ্যিক ও কার্যকরী অভিব্যক্তি প্রদান করে। তাই সাইকোড্রামার বাইরে বিশেষত পারিবারিক থেরাপিতে এই ভাস্কর্য অনুশীলনটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ঙ. বিপরীত ভূমিকাভিনয়

দলের দুজন সদস্যদের মধ্যে যখন একজন অন্যজনের ভূমিকায় বা বিপরীত ভূমিকায় অভিনয় করেন, তখন তা 'বিপরীত ভূমিকাভিনয়' বা 'ভূমিকাবিনিময়' নামে সমাদৃত। উপস্থাপনা পর্বে বিপরীত ভূমিকাগ্রহণের কৌশলটি অধিক কার্যকরী। যা ছাড়া সত্যিকারের সাইকোড্রামা প্রায় অসম্ভব। কেননা এখানে নিজেকে অন্যের চোখ দিয়ে দেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এটির অনুশীলনে ব্যক্তির আবেগ-অনুভূতি, দুঃখ-কষ্ট, পছন্দ-অপছন্দ প্রভৃতি বিষয়াধির পাশাপাশি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে কোন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

চ. স্বগতোক্তি

প্রচলিত থিয়েটারের স্বগতোক্তি সাইকোড্রামায় ব্যবহৃত হয় অংশীজনের অভিব্যক্তি প্রকাশ ও বিমোক্ষণে সহায়তাকারী কৌশল হিসেবে। এই পদ্ধতিটির মাধ্যমে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ চিন্তা-ভাবনা ও অনুভূতিগুলো দর্শকের কাছে বর্ণিত হয়। যাতে দর্শক ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ চিন্তা ও অনুভূতির বৃহত্তর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে সামগ্রিক বিমোক্ষণে উন্নীত হতে পারেন।

ছ. খালি চেয়ার

সাইকোড্রামায় ভূমিকাভিনয়, দ্বিত্বাভিনয় কিংবা অতিরিক্ত বাস্তবতার বিশেষ মুহূর্ত সৃজনে ও কথোপকথনে স্বস্তিদায়ক অনুভূতি তৈরিতে এক বা একাধিক খালি চেয়ারের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত। খালি চেয়ার অনেক সময় সহায়তাকারীর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। তাই মোরেনো- খালি চেয়ারকে 'চার পায়ের সহায়ক' হিসেবে উল্লেখ করতেন। কখনো কখনো একটি খালি চেয়ার সাইকোড্রামায় দলের সহায়ক সদস্যদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাই সাইকেড্রামায় খালি চেয়ার বিভিন্ন পর্বে ভিন্ন-ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করা হয়।

জ. ভূমিকা-বর্জন

উপস্থাপনা পর্বে সবশেষ যে কৌশলটি প্রয়োগ করা হয় তা হল 'ভূমিকা-বর্জন'। দলের সদস্য যে ভূমিকায় অভিনয় করেন তা পরিবেশনার শেষে, একবার স্বীয় স্থানে ডান দিকে ঘুরে, পুনরায় 'অভিনেতা সত্তা' থেকে নিজের 'ব্যক্তি সত্তায়' ফিরে আসাকে বলে ভূমিকা-বর্জন। যা অনেকটা সময় পরিভ্রমণের মত। অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ততা ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে 'বাস্তবতা' থেকে 'আধা বাস্তবতা' ও 'অতিরিক্ত বাস্তবতার' জগতে গিয়ে পুনরায় বাস্তবতায় ফিরে আসার বুদ্ধিদীপ্ত, কার্যকরী ও নিরাময়ী কৌশল হল ভূমিকা বর্জন।

৫.৩ ভাববিনিময় পর্ব

সাইকোড্রামার সর্বশেষ ও অপরিহার্য পর্যায় হল 'ভাববিনিময় পর্ব'। যা অধিবেশনের অংশগ্রহণকারী দর্শক ও ভূমিকাভিনেতার বিমোক্ষণ ঘটাতে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। মূলত-

> "তাৎক্ষণিক ও স্বতস্ফূর্ত [স্বতঃস্ফূর্ত] এই নাট্যাভিনয়ের শেষ পর্যায়ে দর্শক উপস্থাপিত নাট্যক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট স্বীয় অভিজ্ঞতার ঐক্য-অনৈক্য, মিল-অমিল প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে শেয়ার করে থাকেন। এই পর্বে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আদান প্রদান করে অংশগ্রহণকারীর সকলের মধ্যে একধরনের সামষ্টিক মানসিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। যা একটি দলগত উপলব্ধির জন্ম দেয়। তাই 'সাইকো-ড্রামা' মনোস্তত্ত্ববিদদের [য.প্রা.] কাছে 'গ্রুপ-সাইকোথেরাপি' হিসাবে স্বীকৃত।" (কামাল যাত্রা, ২০১৭:৪৩)

এই পর্বটি দলের সদস্যদের মধ্যে একীকরণ পর্যায় হিসেবে কাজ করে। যেখানে তারা নিজেদের জীবনের আখ্যান ও অভিজ্ঞতার সংযোগের পাশাপাশি প্রধান ভূমিকাভিনেতার সাথে আন্তঃব্যক্তিক সংযোগ অনুভব করেন। "এই ধারার নাট্যচর্চায় দর্শক ও অভিনেতাকে পৃথক করা হয় না বরং দর্শক ও অভিনেতার পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ভিত্তিতে যুথবদ্ধ সার্বজনীন শিল্পের প্রকাশ দেখতে পাই।" (হোসেন,

২০১৮:৬২) যেহেতু সাইকোড্রামার উপস্থাপনায় মাঝে মধ্যে খুব আবেগীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়; সেহেতু উদ্ভূত আবেগীয় পরিস্থিতির সাথে দর্শকের অনুভূতি প্রকাশেরও একটি সুযোগ তৈরি হয়। ফলে এখানে দর্শক ও ভূমকাভিনেতা উভয়েরই 'বিমোক্ষণ' ঘটে। সাইকোড্রামার এই পর্বে ভাববিনিময়ের বিপরীতে কোন 'প্রতিক্রিয়া' বা 'পরামর্শ প্রদান' গ্রহণযোগ্য নয়। বরং উপস্থাপনার উপর ব্যক্তির 'অন্তর্দৃষ্টি' ও 'সনাক্তকরণ' গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য একজন পরিচালকও এই পর্বে তার পেশাদারী সীমারেখায় অবস্থান করে অংশগ্রহণকারীদের সাথে ভাববিনিময়ে যুক্ত হতে পারেন।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিভিন্ন শিল্প আঙ্গিকের যৌথ-শৈল্পিক-নিরাময়ী ও কর্মভিত্তিক দর্শন হিসেবে অভিব্যক্তিমূলক মনোচিকিৎসার অনুশীলন খুবই তাৎপর্যময়। যেখানে অন্যতম প্রধান কর্ম-পদ্ধতি হিসেবে সাইকোড্রামার মত নিরাময়ী নাট্য কৌশলের প্রয়োগ, এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে করেছে অধিকতর সমৃদ্ধ। যা অদূর ভবিষ্যতে সুস্থ জাতি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। মহামারীর এই সংকটময় মুহূর্তে এরূপ কর্ম প্রচেষ্টা মানব মনে একটি ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। তাই প্রচলিত মনোচিকিৎসার পাশাপাশি সময়োপযোগী, মনোবিশ্লেষক, কর্ম-পদ্ধতি হিসেবে অভিব্যক্তিমূলক মনোচিকিৎসার প্রয়োগ-প্রক্রিয়া নিয়ে বিদ্যায়তনিক 'পঠন-পাঠন' , 'আলোচনা-পর্যালোচনা' , 'অনুশীলন' ও 'নিবিড় গবেষণার' পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা এখন সময়ের দাবি।

সূত্র নির্দেশ

১. কামাল যাত্রা, মোস্তফা "মানসিক সাস্থ্য সুরক্ষায় "এক্সপ্রেসিভ সাইকোথেরাপি" বিদ্যায়তনিক পাঠ ও গণ প্রয়োগ", মানসিকা, সম্পা. মুহাম্মদ শাহ্ আলম, চট্টগ্রাম: ইউনাইট্ থিয়েটার ফর সোশাল অ্যাকশন্ (উৎস/UTSA), সংখ্যা ৩০, জুলাই ২০২১ খ্রি:।

২. কামাল যাত্রা, মোস্তফা "অভিব্যক্তিমূলক মনোবিশ্লেষণধর্মী সৃজনশীল কলাবিদ্যা এক্সপ্রেসিভ সাইকোথেরাপি'র দর্শন ও প্রয়োগ প্রক্রিয়া", মানসিকা, সম্পা. মুহাম্মদ শাহ্ আলম, চট্টগ্রাম: ইউনাইট্ থিয়েটার ফর সোশাল অ্যাকশন্ (উৎস/UTSA), সংখ্যা ৩১, ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি:।

৩. কামাল যাত্রা, মোস্তফা "থিয়েটার ফর থেরাপি ও বাংলাদেশে প্রাসঙ্গিক নাট্যধারা", আনর্ত, সম্পা. রহমান রাজু, রাজশাহী, বর্ষ ০২, সংখ্যা ০২, অক্টোবর ২০১৮ খ্রি:।

8. Allison, Nency CMA, *The Illustrated Encyclopedia of Body-Mind Disciplines*, New York: The rosen publishing group, Inc. 1999.

৫. কামাল যাত্রা, মোস্তফা নাট্য সংক্রান্ত, শোভন থিয়েটার সেন্টার, প্রথম খন্ড, চট্টগ্রাম, এপ্রিল, ২০১৭ খ্রি:।
৬. তদেব, পৃ. ৪০।
৭. তদেব, পৃ. ৪৩।
৮. হোসেন, সাদ্দাম "থিয়েটার অভিযাত্রায় বাংলাদেশ থেরাপিউটিক থিয়েটারের সম্ভাব্যতা", নাট্যবিদ্যা, সম্পা. ইসমতআরা ভূঁইয়া ইলা, ময়মনসিংহ: থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ০২, ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি:।

সন্ন্যাসী ভোলানাথ সুন্দরবনের ইতিহাসে এক উপেক্ষিত ব্যক্তি

দীপক মন্ডল
বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ,
বজবজ কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ

সারাংশঃ সন্ন্যাসী ভোলনাথ ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত সুন্দরবনের আবাদ ভূমিতে অবহেলিত, শোষিত সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়ণে সদর্থক ভূমিকা নিয়েছিলেন। এখানকার লক্ষ লক্ষ মানুষেৰ জন্য জীবন যাপনের যথার্থ পরিকাঠামো নির্মাণ তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে পৃথক সুন্দরবন জেলা স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ণ, নদী বাঁধগুলির মজবুতিকরণ, সুন্দরবনের মানুষের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস উদ্ধার, সকলের জন্য শিক্ষা, ভূমিহারা ও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সুতরাং সন্ন্যাসী ভোলানাথ বা ব্রহ্মচারী ভোলানাথ মানসেবার ধর্মে নিজেকে নিবেদন করেছিলেন একথা অনস্বীকার্য।

সূচক শব্দঃ জঙ্গল হাসিল, আবাদ ভূমি, লটদার, গাঁতিদার মধ্যস্বত্বভোগী, অভিমুখ।

বিংশ শতকের চল্লিশের দশকে সরকার তার স্বার্থচরিতার্থ করার জন্য লটদার, গাঁতিদার, চকদার, হাওয়ালাদার প্রভৃতি নামের এলাকা ভিত্তিক এবং স্তরভিত্তিক মধ্যস্বত্ত্বভোগী সৃষ্টি করে।[১] এই মধ্যস্বত্ত্বভোগীরা প্রায় সকলে ছিলেন শহরবাসী। শহরের মোকামে বসে তাঁরা সুন্দরবন এস্টেটের আয় বুঝে নিতেন। ফলে ব্রিটিশ শাসনে সুন্দরবনের আবাদভূমি ছিল উপনিবেশের মধ্যে ক্ষুদ্র উপনিবেশ।[২] ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সুন্দরবনের তৎকালীন আটটি থানায় জনসংখ্যা ছিল ২,৯৬,০৩০ জন। ১৯৪১-এ তা দাঁড়ায় ৯,৬০,৯৩৪ জন। আর দেশভাগের অব্যবহিত পরে ১৯৫১ তে জনসমষ্টির পরিমান ১১,৬২,২১৭ জন।[৩] ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি দশকে ১৮ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে সুন্দরবনে কিন্তু এই বিপুল জনসমষ্টির জন্য সরকারি উদ্যোগে যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষালয় বা চিকিৎসালয়ে কোন আয়োজন হয়নি। পঞ্চাশ-ষাট দশকের উন্নয়ণ প্রত্যাশী বিছিন্ন সুন্দরবন জনপদের মানুষের স্বপ্ন বাস্তবে মেলালেন পরম নির্ভরতার মানবিক সাথী ব্রহ্মচারী ভোলানাথ। যিনি তাত্ত্বিক নন ব্যবহারিক। সমস্ত সাম্যবাদ নিংড়ে, সংকীর্ণতাবাদের উর্ধ্বে, মানবতাবাদে দীক্ষিত এক কর্মযোগী, সমাজসেবক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। যিনি সমকালীন প্রেক্ষিতটাকে ধরতে পেরেছিলেন, সময় বাস্তবতার নিরিখে।[৪]

সমাজতান্ত্রিক নেতা নেতৃবৃন্দ যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন, আছেন, অথবা থাকবেন, তাঁরা কি কোনদিন গ্রাস রুট লেভেলের মানুষের নৈকট্যে, দৈনন্দিন সমস্যা-সংকটের শরিক হয়ে, তাদের আত্মিক প্রতিনিধি হতে পরেছেন? জনশ্রুতি অনুসারে তিনি তাই পেরেছিলেন।

তখনকার সংবাদপত্রে বা নির্বাচনী প্রচার পুস্তিকায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ছাড়াও লালবাহাদুর শাস্ত্রী, পরবর্তীকালে ইন্দিরাগান্ধীর সঙ্গে তাঁর সুন্দরবন উন্নয়ণ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনারত ছবি দেখে জনগণ প্রত্যয়ী হতেন, উজ্জীবিত হতেন, ভোলা সাধুর সন্ত সুলভ চমৎকারিত্বেরক স্বপ্ন বাস্তবের দোলায়িত দৃষ্টান্ত।[৫]

'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' মন্ত্রে দীক্ষিত ভোলানাথ ব্রহ্মচারীকে সুন্দরবন জনপদ গড়তে গিয়ে ভূমিপূত্র হয়ে সুন্দবনে জন্মানোর প্রয়োজন হয়নি বরং তিনি স্বোপার্জিত ভূমিপুত্র অভিধার অধিকারী। তিনি দেখেছেন এখানকার মানুষেরা নিদারুণ দারিদ্র, জোতদার-মহাজনের শোষণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে সঙ্গী করে জীবন অতিবাহিত করে। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে এই অসহায় শোষণ জর্জরিত মানুষের কথা শহুরে মধ্যবিত্তের গোচরে আসে। এই সময়ে ১৯৩৯ সালে শরৎচন্দ্র বসু এবং সুভাষ চন্দ্র বসুর ইচ্ছাক্রমে তৈরী হয় 'সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতি'।[৬] এই সংগঠনের সম্পাদক হয়েছিলেন হুগলী জেলার এক তরুণ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ভোলানাথ।

সন্ন্যাসী ভোলানাথ বিশ্বাস করতেন অবহেলিত, পীড়িত মানুষের সেবা করাই ঈশ্বর সেবা। 'সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতি' প্রতিষ্ঠার সময় সুন্দরবনের মানুষ-কে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার একটি প্রেরণা ছিল। তিনি কিন্তু সুন্দরবনের মানুষকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে কোন রাজনৈতিক আদর্শের প্রচার করেন নি। চল্লিশের দশকে তিনি সুন্দরবনের কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে তিনি স্থিতিশীল অবস্থার মধ্যে ধীরে ধীরে মানুষের সার্বিক উন্নয়ণে সচেষ্ট ছিলেন। ফসলের নিশ্চয়তা এলে দারিদ্র বিমোচন হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলে এই অঞ্চল থেকে কৃষি পণ্য রপ্তানি হবে এই ছিল তাঁর ভাবনা।[৭]

সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতির সম্পাদক হিসাবে সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, হাটগাছা, হেমনগর, দুলদুলি, ভাণ্ডারখালি, যোগেশগঞ্জ, পাটঘরা প্রভৃতি স্থানে চাষিদের গৃহে আশ্রয় নিয়ে থাকতেন, সুন্দরবনের সমস্যাগুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য। ভোলানাথ ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর বেশভূষা পরিধান করলেও ধর্মকে কখনও তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেননি। বরং যথার্থ মানবসেবার আদর্শকে রাজনীতির উপাদান করে তুলেছিলেন। তিনি সুন্দরবনের দুরবস্থার কথা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে

উপস্থাপিত করেন।[৮] সেই সময়ে দাঁড়িয়ে ভোলানাথ ব্রহ্মচারী যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অনুন্নত সুন্দরবনের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো নিয়ে সুদূরপ্রসারী ভাবনা ও কাজে যে দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন তা আজও প্রাসঙ্গিক ও অনুধাবনযোগ্য। হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের প্রত্যন্ত অঞ্চল গুলি সুন্দরবন কৌলিণ্যের মানচিত্রে জায়গা পায়নি। যেভাবে হ্যামিলটন সাহেব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৌমেন ঠাকুর মহাশয়ের মতো মহান মানুষদের দৌলতে গোসাবা পেয়েছিল। ব্রাত্য হিঙ্গলগঞ্জ জনপদের সুন্দরবনকে তিনিই কৌলিণ্যে পাংক্তেয় করার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর থেকে আজ অবধি সেই ভোলা ব্রহ্মচারীর বিকল্প উত্তরসূরী হিঙ্গলগঞ্জ জনপদ পায়নি।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ এর মধ্যে সুন্দরবনে উদ্বাস্তু জনসাধারণের আগমন ঘটে। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের খুলনা অঞ্চলের জনসাধারনই সুন্দরবনের প্রধান বাসিন্দা হয়ে ওঠেন। এই সময়ে ভোলানাথ ব্রহ্মচারীর ‘সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতি’ তৎকালীন সুন্দরবনের তুঁষখালি, মণিপুর, ঝড়খালি, হেড়োভাঙ্গা, মথুরাপুর প্রভৃতি স্থানে উদ্বাস্তুদের সেবাকাজ নিয়োজিত করেছিল।

দীর্ঘদিন ধরে তিনি সুন্দরবনাঞ্চলের মানুষের পাশে থাকার সুবাদে ১৯৬৭ সালে হিঙ্গলগঞ্জ সংরক্ষিত কেন্দ্রে কংগ্রেস ও বামপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রার্থী হন এবং জয়লাভও করেন।[৯] অজয় মুখোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় ভোলানাথ নম্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে ভয়, লজ্জা বা হীনমান্যতাবোধকে দূরে রেখে সুন্দরবনের সমস্যা সম্যকভাবে বিধানসভায় তুলে ধরতেন। তাঁর বক্তব্যের কিছু অংশ বিধান সভার প্রোসিডিংস থেকে তুলে ধরা হলো।[১০]

“আমি সুন্দরবনের একজন সামান্য সেবক মাত্র। ৩০ বছরের অধিক আমি সুন্দরবন অঞ্চলের উন্নতিবিধানকল্পে সযত্নে ঐকান্তিক সেবা করিয়া আসিতেছি। এই সেবার জন্য ইতিহাস বিখ্যাত নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ও বাংলার বাঘ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর শুভ আশীর্বাদ লাভ করিয়া আমি ধন্য”।[১১]

তিনি সুন্দরবন অঞ্চলের নদী বাঁধ মজবুতিকরণ, কুটীর শিল্পের বিকাশ, স্লুইসগেটের ব্যবস্থা, শিক্ষালয় স্থাপন, সেচব্যবস্থার উন্নয়ণ, খাদ্য সংকটের সমস্যা দূরীকরণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, একফসলী জমিকে দুই ফসলী জমিতে পরিণত করা, বৈদ্যুতিকরণ, উদ্বাস্তু জনসাধারণের বাসস্থানের ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।[১২] অনুন্নত সুন্দরবনকে পৃথক জেলা করার জন্য দিল্লিতে জহরলাল নেহেরুর কাছে এবং সোনারপুর থেকে সন্দেশখালি এবং বসিরহাট থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত রেললাইন তৈরীর পরিকল্পনা করে তৎকালীন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী লালবাহাদুর

শাস্ত্রীর কাছে পেশ করেন।[১৩] সুন্দরবনের জনজীবন এবং প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কে বিষদ অভিজ্ঞতা থাকার জন্য ১৯৫৭ সালে শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রীসভায় সর্বসম্মতিক্রমে 'সুন্দরবন উন্নয়ণ কমিটিতে বিধায়ক না হওয়া সত্ত্বেও সন্ন্যাসী ভোলানাথ-কে স্থান দেওয়া হয়েছিল।[১৪]

এই সময়ে সতীশ চন্দ্র মিত্রের 'যশোহর খুলনার ইতিহাস'- দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। যেখানে যশোহর থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত প্রতাপাদিত্যের আধিপত্য স্থাপনের কথা জানা যায়। ব্রহ্মচারী ভোলানাথ এই ইতিহাসকে পাথেয় করে প্রাচীন সুন্দরবনের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য হিঙ্গলগঞ্জের হাটগাছা গ্রামের নাম দিয়েছিলেন 'প্রতাপাদিত্যনগর'।[১৫] আর গড়ে তোলেন নিজের সম্পাদনায় "প্রতাপাদিত্য স্মৃতি পরিষদ অব সুন্দরবন'। তিনি দলমত নির্বিশেষে সকলের উর্দ্ধে উঠে অসহায় সুন্দরবনবাসীর পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের (জুলাই) তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু মৃত্যুর পরে সুন্দরবন অঞ্চলের নবীন প্রজন্মের মানুষেরা এই ব্রহ্মচারীকে ভুলতে বসেছে। কালের নিয়েমে আজ তিনি বিস্মৃত প্রায়।

সূত্র নির্দেশ:

(১) বরুণ দে (সম্পাদনা)- গেজেটিয়ার অফ পশ্চিমবঙ্গ, ২৪ পরগনা, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-২৬১।

(২) কমল চৌধুরী, 'দক্ষিণ ২৪ পরগণার ইতিবৃত্ত'- কলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-১৯১।

(৩) Census of India, 1951, West Bengal

(৪) স্বপন কুমার মণ্ডল (সম্পাদনা)- 'দক্ষিণের সাঁকো'- কলকাতা, ২০১৭, পৃষ্ঠা-১৬।

(৫) তদেব, পৃষ্ঠা-১৭।

(৬) Copy of the Bengali Letter dt. 20/08/1956.............
Addressed to S. Tagore, 4 Elgin Road, Kolkata-20 from Brahmachari Bholanath, General Secretary, Sundarban Prajamangal Samity, Collin Street, Cal-16, DIB Report, File no.-166/26, W.B.S.A.

(৭) স্বপন কুমার মণ্ডল (সম্পাদনা)-তদেব, পৃষ্ঠা-৯।

(৮) ময়ূখ দাস (সম্পাদনা)- 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি'- কলকাতা, ২০১৭, পৃষ্ঠা-১৩৯।

(৯) স্বপন কুমার মণ্ডল (সম্পাদনা)-তদেব, পৃষ্ঠা-৮।

(১০) Assembly Proceedings, 13th July, 1967, W. B. L. A., পৃষ্ঠা-২১২।

(১১) DIB Report, File No. 166/26, W. B. S. A.।

(১২) স্বপন কুমার মণ্ডল (সম্পাদনা)- তদেব, পৃষ্ঠা-১২।

(১৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, তারিখ- ১৫/০৬/১৯৫৫।

(১৪) আনন্দবাজার পত্রিকা, তারিখ- ১৩/১১/১৯৫৭।

(১৫) ময়ুখ দাস (সম্পাদনা)-তদেব, কলকাতা, ২০১৭, পৃষ্ঠা-১৪১।

UTILIZING SOCIAL MEDIA PLATFORM AS A STRATEGY TO IMPROVE STUDENTS' ENGLISH WRITING SKILLS

Sanjib Kumar Haldar
Assistant Teacher,
Mukundabagh High School (HS), Murshidabad

Abstract: The growing popularity of using social media has influenced every facet of our lives. This article aims to explore the potential of using social media to develop students' English writing skills. Reaching proficient level of literacy is a universal goal for all children in an elementary classroom. This objective is especially challenging for foreign language learners particularly in learning English mostly in the domain of writing. Writing is considered as the most essential skill because the world is still very much text-oriented. For this purpose, there is a great demand of effective educational technique to improve writing skills of this particular population. As a developing country like ours, learning a second language has always been a part of our educational undertakings. It is suggested thatthrough the technology, pre-taught vocabulary and the implementation of positive diverse literacy practices, this goal can be attained. The purpose of the article is to investigate how easily social media platforms help the student to improve their English writing skills.
Keywords: WritingSkills. Educational Technique, social media, Technology.

Introduction: Technology has influenced almost all corners of our lives and education is not an exception. It has revolutionized the traditional methods of teaching by introducing modern and innovative methodologies. With continuing popularity and growth of social media, many educators are considering the potential of using social media for educational purposes as they are of the view that social media have the ability to encourage active learning and collaboration among students (Maloney, 2007). However few educators are also concerned about the negative impact of social media on students 'academic performance and discourage its utilization in education (Barbizon, 2007). Despite the popularity and incorporation of social media as a tool for language teaching inside and outside classroom, role of social media context focused on investigating the trends of use it among students and there is a lack of empirical research investigating the impact of using social media on language learning. In this scenario, it is necessary to conduct empirical

research to examine the impact of using social media on students writing skills.

Discussion: In the colonial times, there was a conglomeration of nationalities and languages: English, French, Portuguese, Dutch, Irish, and also Native Languages. Because of this vast diversity, there was a tremendous need for a sense of unity. In the time of British Period, the official language was obviously English, and English was also the language of aristocrats. For the fact, the colonist decided that English would be theirprominent language. Following the path of Revolution, the pressure was on for all citizens to learn English language via common schools. It was then the final decision was made for English to be the common foreign language. But speaking English is quite different from writing English. To know a foreign language, it is very much in need to practice the writing skills. For the first-generation learners, the main obstacle standing in the way of the success for the students is writing. Writing is a fundamental component of language. When a child writes, thoughts and knowledge are blended together creating a unique meaning. Consequently, students identify the skill of writing, as more difficult than listening and reading. Furthermore, writing is the skill that the most students areleast proficient in when acquiring a new language. Even the most advanced students score lower in writing than in any other domain.

There are numerous reasons for writing to be the last acquired domain of learning English, more detailed and analyzed knowledge of a language is needed to write it than to understand it. First generation students do not come to school with the same background knowledgeas the regular English speakers; therefore, it is more difficult for them to write with meaning. Their vocabulary is often limited, and while they can communicate orally and be understood throughgestures and so forth, writing proves to be frustrating for them as they attempt to express their ideas without the luxury of using their hands. Additional worktime is also a necessity for students who are processing two or more languages and, all too often, they are not given such opportunities. All of these factors contribute to this ongoing problem of writing successfully.

Writing has always been as an important skill in English language acquisition. This importance is due to the fact that it reinforces grammatical structures and vocabulary that educators strive to teach their students. It is the area in which learners need to be offered adequate time to develop their writing skill, therefore more time should be devoted to it in classrooms containing that they will be prepared to effectively communicate in real life as well as academic situations. Exposing them to

the writing process itself through various venues is an excellent way to reach this goal. Additionally, writing skills can be developed when the learners' interests are acknowledged and when they ae given frequent opportunities to actually practice writing. Because one of the main goals fo the students is to learn to produce a well-thought-out piece of writing, a specific writing program must be in place in order to meet the needs of these learners. After careful evaluation of the literature, it is found that numerous researchers discovered the need for the students to be exposed to a variety of genres, strategies, and methods in order to succeed in the writing of English. Using social media is a current strategy to improve the writing skills for not only the first-generation students but also for all, who need it.

Summary: Researches aregoingon to study the effects of using Facebook on students writing skills. Using Facebook for discussion and paragraph writing skills are chosen as variables. A pretest – posttest single group design is alsoveryfavorable. When a teacher gives a lecture to students about paragraph writing in the class, the students learn about the structure and components of paragraph writing. Now, here is a need to make a secret group on Facebook page with the students who would have easy access to Facebook. Every student might feel free to post their views, opinion on the given topic or comment on others' posts..In this way the students would discuss, post and engage by choosing their own topic of writing.

Conclusion: This articleis written to explore the use of social media as a forum for discussion to improve school students writing skills. To conclude it can be said that with the need to upgrade our language classes by incorporating social advancement in technology media with traditional classroom practices in order to motivate and engage students in this growing digital world. The article revealed that students 'easy access to Facebook makes it a potential tool to be used in language teaching to facilitate language learning. The students will able to improve their writing skills as they will be motivated to write in an organized way in a stress – free environment provided by Facebook. The use of Facebook will increasethe student teacher interaction and enable the students to learn from their teachers and peers through collaborative learning experience. However, Facebook should not be seen as a substitute or replacement of traditional classroom learning but as a tool to assist the language teaching in classroom.

Review of Literature: Developments in the field of internet and advent of networked technology in communication have given rise to use

of social media all over the world. Safka considers social media as “user – generated content; blogs, audio, video, music, news, photos, tweets – working together with digital technology in [an] environment [where] everything is accessible from everywhere and everything is connected (2009: 24). Grahl (2013) classifies social media into six different categories i.e., social networks, bookmarking sites, social news, media sharing, micro blogging and blogging. Facebook, Twitter, Skype are some of the Social Networking Sites (SNSS) relying on social media technology.

Social networks are used for the purpose of socialization with peer, to be in touch with family and friends, to obtain new information and to advertise and promote the products (Wankel, 2011). Use of social networking sites by students in a language that is not their own can help students to learn the language. Output Hypothesis by Swain (2007) considers “the act of producing language (speaking or writing) as the part of the process of second language learning Swain and Lapkin (1995) are of the view that a need to produce the language supports language learning Therefore, motivating and encouraging students to speak and experiment with the use of language is important for learning language. Social networking sites can provide opportunities to learn through observation as students will observe others behavior and able to amend their language to interact with others on social media. Use of social media for interactional purposes engages students in meaningful language tasks. It is found that participation on social networks like Facebook and Twitter helped students to enhance their vocabulary and also improved their writing skills (Li, 2010; Yunus et al. 20012). However, Schmidt and Brown (2004) are of the view that the use of social media should be taken as combination of online and traditional classroom teaching.

Tiene (2000) found that written communication by using social media allows students to actively participate in discussions at a convenient time and also facilitates them to express themselves in a clearer, planned and structured way. Abdulateef (cited in Alfaki and Alharthy, 2014) conducted a study about using Facebook to improve students writing skills and concluded that students were highly motivated to practice English writing informally because writing on the Facebook allowed the freedom of expression and convenience of time and the support from their peer comments and feedback. According to Bandura’s social learning theory (1986) learners ‘peers and situations both affect individual’s learning. Social learning theory “basically explains how the environmental and cognitive components collaborate to affect an

individual learning and behavior pattern “(Ainin et al, 2015). Social media provides a learning environment which encourages the constructivist learning by supplying authentic activities and substantial variety of tasks combining different formats such as text, graphics, audio, and video.

References:

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall, Inc.
Deng, L., Tavares, J. N. (2013). “From Moodle to Facebook: Exploring students ‘Motivation and experiences in online communities. Computers & Education, 68: 167-176.
DuBois, D.L ... Holloway, B.E., Valentine, J.C. and Cooper, H. (2002) Effectiveness of mentoring programs for youth: A meta – analytical review. American Journal of Community Psychology, 30 (2), 157-197.
Krashen, S. D. (1981). Principles and Practice in second language acquisition. Oxford: Pergamon Press Inc.
Li, J. (2010). Learning vocabulary via computer – assisted scaffolding for text processing. Computer – Assisted Language Learning Journal, 23 (3), 253-275.
Liu, Y. (2010). Social media tools as a learning resource. Journal of Educational Technology Development and Exchange, 3 (1), 101-114.
Maloney, E. 2007. What Web 2.0 can teach us about learning? Chronicle of Higher Education. 53 (18).
Murphy, E. (2009). Online synchronous communication in the second – language classroom. Canadian Journal of Learning and Technology, 35 (3).
Munoz, C. L., & Towner, T. L. (2009). Opening Facebook: How to use Facebook in the college classroom. In L. Gibson et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2009 (pp. 2623-2627). Chesapeake, VA: AACE.
National School Boards Association. (2007). Creating and Connecting Research and Guidelines on Online Social – and Educational Networking [Electronic Version]. Retrieved from http://www.nsba.org/Secondary Menu / TLN/ CreatingandConnecting.aspx on 14th April, 2016.
Purcell, K., Buchanan, J. & Friedrich, L. (2013). The Impact of Digital Tools on Student Writing and How Writing is Taught in Schools. Pew Research Center’s Internet & American Life Project: Washington, D.C.

Rachel. (2012). The Use of social media in Higher Education for Marketing and Communications: A Guide for Professionals in Higher Education.

of Advantages and Disadvantages Compared to Face to – Face Discussions. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 9 (4), 371-384.

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society: The development of higher psychology processes. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Wankel, C. (2011). Educating Educators with social media. Bradford: Emerald Group Publishing.

Ziegler, S. (2007). The Education of generation M. Learning, Media and Technology, 32 (1), 69-81.

A Study of the Local Legends and Cultural Heritage of the Agrarian Sufi Cult of Bengal

Jahira Hossain
Assistant Professor, Department of English
Surendranath College, Kolkata

Abstract: The Pir cult of Bengal has been marked as undeniably significant regarding the preaching of Islam in Bengal. Richard M. Eaton, while studying the social roles of Sufis, slavery and cultural history of pre-modern India, contends that in the agrarian deltas of Bengal, the spread of Islamic cultural beliefs was mostly accompanied by the Sufi Saints and not by any forceful conversion. Interestingly, the Pir cult in most of the places also marks the cultural fluidity of local myths and the foreign Sufi ethos that the Pirs would import. The same is noticeable for Pir Hazrat Shah Abbas Ali Razi or locally known as Pir Gorachand, a Sufi Saint of the 14th Century Bengal. The paper locates the Sufi Saint Pir Hazrat Shah Abbas Ali Razi or Pir Gorachand as a historical and Sufi figure to bridge the cultural fluidity of the indigenous Hindu and Muslim local myths and legends of the region. He is idealised as a Muslim Saint, warrior and martyr but also as a champion of the poor, advocating for their rights against the local King Chandraketu. He was regarded as a religious, spiritual and moral guide for most of the local and indigenous people, irrespective of their caste, creed or religion. And as far as the manifestation of the supernatural powers of this saint is concerned, there are invariably many local legends and tales associated with him.
Keywords: Local legends, Cultural fluidity, Sufi Cult, Sufi Saint, Mysticism.

The Pir cult of Bengal has been marked as undeniably significant regarding the preaching of Islam in Bengal. Richard M. Eaton (1996), while studying the social roles of Sufis, slavery and cultural history of pre-modern India, contends that in the agrarian deltas of Bengal, the spread of Islamic cultural beliefs was mostly accompanied by the Sufi Saints and not by any forceful conversion. Eaton (1996) further notes that tracing the genealogy of working of the Sufi cult across the world reveals that "from the seventh century on, Muslims everywhere had been engaged in projects of cultural accommodation, appropriation and assimilation" (6). Interestingly, the Pir cult in most of the places,

including Bengal also marks the cultural fluidity of local myths and the foreign Islamic Sufi ethos that the Pirs would import:

> ...the whole Islamic history can be seen as a 'venture' consisting of the many ways that peoples living in different ages and cultures managed, without rejecting their local cultures, to incorporate into their lives a normative order as they understood it to have been revealed in the Quar'an. (Eaton, 2003).

While studying the impact of the Sufi cults in the indigenous agrarian sections "one repeatedly sees how traditions rooted in South Asia simultaneously connect local communities with the larger Islamic world" (Eaton, 7). The same tradition is noticeable for Pir Hazrat Shah Abbas Ali Razi or locally known as Pir Gorachand, a Sufi Saint of the 14th Century Bengal. The present paper locates the Sufi Saint Pir Hazrat Shah Abbas Ali Razi or Pir Gorachand as a historical and Sufi figure to bridge the cultural fluidity of the indigenous Hindu and Muslim local myths and legends of the region. Gorachand Pir is idealised as a Muslim Saint, warrior and martyr and also regarded as a champion of the poor, advocating for their rights against the local ruler Raja Chandraketu. Pir Gorachand was regarded as a religious, spiritual and moral guide for most of the local and indigenous people, irrespective of their caste, creed or religion. And as far as the manifestation of the supernatural powers of this saint is concerned, there are invariably many local legends and tales that are associated with him.

To situate the local reception of the Sufi cult among the rural agrarian community, it is important to understand that the connotation of the word 'Pir' in Bengali does not conform to the exact meaning of Persian or Arabic Sufism, rather, is situated in a hybridised form of understanding. The literal translation of the Persian word 'Pir' refers to an aged and wise person and the connotations of an aged wise person as the moral or spiritual guide is not alien to the medieval Indian Hindu and Buddhist understandings. The assimilation and appropriation of the existing normative meaning and the imported meaning resulted in an amalgamated version of Pir cult in the agrarian deltas of Bengal, which is not exactly a refraction of the theological 'Sufi' culture so to say; neither is this culture in austere reverence to the concepts of the 'Guru' or 'Datababa' that existed before the arrival of the Sufi cult, but an amalgamation of both. The practices of paying respect to the 'Pir' or the 'Murshid' as a mediator between the ordinary human being with Allah, the Creator in Islamic belief system is in close proximity to the practices of the agrarian Hindu culture of considering the 'Guru' or 'Baba' as a

religious leader. The 'Pir' cult in Bengal definitely has travelled a long way - both temporally and metaphorically. A descendant from the old and original Sufi culture from Baghdad, Bokhara, Samarkhand, East Persia – the Sufi cult, as travelled into the interior and agrarian regions of Bengal had taken in hybridised forms and practices and an amalgamation of the existing agrarian Hindu practices and the new Sufi culture resulted into a hybridised form of agrarian cultural beliefs and practices. So the indigenous rural Muslims, who were not the descendants of the pure *Ashraf* Muslims, with the help of the Sufi cult emerged out as a new form of indigenous, local Bengali Muslims, and as a social category inherited certain traits and beliefs from their previous Hindu generations as well.

A look at the sociological reality reveals that the rural Muslim as a social group was a new phenomena in the sociological picture of Bengal that were gradually becoming visible towards the end of the 16th century. The 'Bengali rural Muslim' as a social community did not have a registered identity before the 16th century. The Sufi saints or the Pirs had a significant contribution in creating a social group of rural and agrarian people who could be termed as 'Bengali Muslims' and it can be noted that 'the first recorded evidence of substantial rural Muslim communities appears from the very end of the sixteenth century" (Eaton, 230).

The tradition of the Pirs or the Sufi and saints provided an environment of togetherness and belongingness among people of different social and religious categories. What this amalgamated emerging identity "certainly provided was a local Muslim identity that bound the community to the land where they dwelt" (Digby, 237). Simon Digby (2003) in his studies on the medieval Sufis in India contends that there can be no homogenous attributes of the Sufis. But certain characteristics can definitely be referred to that helped to create the aura of mysticism around the Sufi mystique:

> Descent from the Prophet, his Companions, or other *ashraf*; connection with a Sufi *silsila* of already established prestige; a reputation for strict orthodoxy; austerities sometimes of a more and sometimes of a less orthodox character; a mastery of Islamic doctrinal or Sufi texts, or an abundance of literary compositions; the working of miracles together with a careful avoidance of vulgar display of them. (Digby 17).

The aura of mysticism and the working of the miracles as pointed out by Digby were very much pertinent to Pir Hazrat Shah Abdul Ali Razi as per the local tales and legends. The cult of the Saint Pir Gorachand during his

lifetime and the Mazar after his death create a tradition among the agrarian local Muslims that bind them together in a tie of cultural fluidity. The local tales related to the miraculous power of Pir Gorachand have travelled a long way both orally and metaphorically and new meanings have been assigned to the tales with changing times.

Pir Gorachand or Hazrat Shah Abbas Ali Razi was the Pir of Balanda, Haora, a place located at the South 24 Parganas of West Bengal. As per the available historical records and research findings, he was born in Mecca in 693 Hizri, on 21st Ramadan or 1294 AD. The name of his father was Hazrat Karimulla and the name of his mother was Biwi Maymuna Siddiqua. He was a descendant of Hazrat Ali from father's relations and Hazrat Abu Bakr from his mother's relations. His religious guide or 'Murshid' was Hazrat Shah Jalal Yemani, an influential Sufi saint in the provinces of Sylhet. He was a follower of the 'Kaderia' *silsila* of Sufism which was founded by Hazrat Abdul Kader Jilani. As per the historical records, Hazrat Pir Gorachand came to India with his Murshid Pir Shaz Jalal Yemani. He was preaching Islam at the Balanda Pargana of Haroa in North 24 Parganasa of West Bengal during the historical period of 1302 to1322 (approx).

There are some local Punthis, Panchali on Pir Gorachand and some of the versions of the local myths and tales concerning the Pir differ with each other. As per the account of Mohammad Ebadullah's "Pir Gorachand Panchali", Hazrat Shah first arrived in Sylhet as he was following the divine order to preach Islam in Bengal. After reaching Sylhet, he became the Murid of Shah Jalal and after taking Bayat he returned to Mecca to bid goodbye to his parents to come back to India permanently. He came back to the Balanda Pargana and established his *Astana* at Ejaypur and as per the practices of the Sufi cult, he ordered the King Chandraketu to offer him Nazrana. According to the local tales and legends, the Pir, a champion of the cause of the poor and downtrodden had countered the oppressive enterprises of the ruler Raja Chandraketu upfront. There were several conflicts between the oppressive ruler, the Raja and the Pir who had become a protector and saviour for the poor fishermen and agrarian community. The conflict and the rift between the two increased and at Hatigarh Pir Gorachand had a terrible figh with Akananda and Bakananda, the two main commanders of Raja Chandraketu. Pir Gorachand was mortally wounded in the battle. As per the local tales the wound could only be treated with a medicine made with the combination of brick dust, lime, cow milk and some medicinal herbs. But the powerful ruler had inhibited people to visit him and the

local milkman Kalu Ghosh and his cow 'Kobli Gaai' would visit the Pir secretly at the break of dawn to wash the wounds with the milk. The same version of the local story believes that the 'Kobli Gaai' had such reverence and love for the Pir that it would not even feed its own calf and run to the Pir at the sight of the first ray of sun in the morning. The wound was about to be healed when the ruler Raja Chandraketu was informed by his informants and in utter vengeance he locked up the cow in his castle. Apparently , the cow died due to this act and the wound of the Pir, unhealed, caused his demise on the 12th falgun in 1373 C.E.

As evident, the local myths, legends and history go hand in hand in creating the persona and aura of mysticism of Pir Gorachand. Critics differ in defining the nature and scope of local myths in the context of folk narratives and tales. French anthropologist Claude Levi Staruss in his famous book *Myth and Meaning* (2005) has also talked about the significance of myths and their important role in forming certain structures in society. He said, "[m]yths of a given population can only be interpreted and understood in the framework of the culture of that given population" (Strauss, 11). The mere fact of how the Sufi Saint Pir Hazrat Shah Abbas Ali Razi had been popularised as 'Gorachand' also remains shrouded under various versions of folktales and their interpretations. As per some of the myths, he was a fair skinned brave warrior and so he became popular as 'Gorachand' – 'Gora' being extremely fair and 'Chand' being the moon- connoting as fair as the moon. Abdul Gafur Siddiqui in his book *Pir Gorachand* (1996) recounts that Kamala, the queen of Raja Chandraketu called him 'Gorachand' as she first saw him during the discussion sessions between the King and the Pir. Presumptions and local tales suggest that she had not encountered a man as fair skinned as Pir Gorachand before and she was overwhelmed with his oration of the Persian verse. Evidently this points out the fact that the skilled oration of the Holy Quran or other Islamic scriptures or the Persian verse would add up to the aura of mysticism that attracted the local indigenous people to the Sufi mystics. Pir Gorachand is a popular saintly figure among both Hindus and Muslims as both his *Astana* during his lifetime and his shrine (Mazar) after his death were open to all religious, social and cultural groups of people. As the local stories have it, during the last phase of his life when he was mortally wounded by Akananda and Bakananda, the milkman Kalu Ghosh and his cow would tend after his wound secretly, as he was in seclusion, sheltering himself from the Raja. The deeply dense groves in the regions of Haroa and his *Astana* that was built on the banks of the Vidyadhari river also hints at

the bioregional negotiations of spirituality as found in the tales of 'Banabibi' in the denser forests of the Sunderbans. The Balanda pargana of Haora is also a part of the Sunderban bioregions, and there are some variants of the local myths related to Pir Gorachand that describe him as sitting on a tiger as the popular image of 'Banabibi'. One aspect that is prevalent in the constructions of such local myths is the appropriation of the deity or the saint as the saviour figure, situated within the bioregion. Though Pir Gorachand was not a deity like the much popularised 'Banabibi' of the Sunderbans, yet the popular imagination concerning the manifestation of his supernatural power gets assimilated with how the rural indigenous people regarded their deities.

As already pointed out, the emergence of the rural and agrarian Muslim community was largely being influenced by the saint cults and the mosques were also of great importance to the local population as the "programme of mosque building was not in itself sufficient to satisfy the longing for the sanctification of a land, where [...] the Muslim population grew up in the shadow of the loss of the immediate homeland of their fathers (Eaton, 236). The Red Mosque or the Ranga Masjid, located at Haroa- Balanda in the 24 Parganas and the local tales surrounding the mosque are associated with Pir Hazrat Shah Abbas Ali Razi. The legend of the Ranga Masjid or Red Mosque needs to be located in the context of the cultural fluidity between the local Hindu and Muslim tales and not in complete isolation of the practice of the Sufi cult in Bengal. The Red Mosque of Haroa can be traced as a site of local legends and mysticism and cultural amalgamation that invariably hints at the localisation of Sufi mysticism and an assimilation of the same with the existing local tales. As is always true for indigenous legends and myths, the legends concerning the Ranga Masjid also have various cultural roots. The local tales attest to the construction of the mosque by Islamic angels that was supposed to be completed within the span of a night. Some archaeological researchers have suggested that the floor of the Red Mosque was originally built on the site of a ruined Buddhist *stupa,* dating back to the early Pala period or late Gupta period.

The Red Mosque, popularly known as the Ranga Masjid is a reservoir of the cult of the saint and also attests to the fact that these cults were mostly based on the local indigenous agrarian value system and the ethics of reverence to the land, the river and the ecosystem. As far as the memory of the present generation of people residing at Balanda, apparently there have been too many attempts to demolish the mosque and the big banyan tree that protects the archaic structure, but all those

attempts had to meet with the invisible power of some divine wrath and imminent death. As far as the construction of the mosque is concerned, more than one version of the tale can be found. According to some local tales, the mosque was being built by the Islamic angels and the divine instruction was to construct the mosque within the span of one night only. This version of the local tale further asserts that the three ponds that surround the mosque were created on the same night and the bricks were being made out of the clay from those ponds. But due to some inadvertent human intervention towards the last quarter of the night, the angels couldn't complete the structure and the mosque remained incomplete forever. Since many centuries it was believed that anyone who would build up a construction made of brick and cements would be subjected to destruction and hence going to the Mazar of Pir Gorachand and paying obeisance was a practice among both the Hindus and the Muslims in this region.

The Red mosque and the tales surrounding the mosque had profound impact on defining the nature of the practice of religion among the rural indigenous community and the role of the mosque in the 'Islamization of the countryside' (Eaton, 2003) was huge. The importance of mosques in rural Bengali society especially built during the times of the Pirs can be summed up in the following words:

> The continuing social significance of the mosque in today's Bengali society is a legacy of a time when a religious gentry of *Ulama* and *pirs* – and in their institutional forms – mosques and shrines – first emerged as nodes of authority around which new peasant communities originally coalesced, and in relation to which such communities were understood as "dependents". (Eaton, 234).

The structure of the mosque also requires special attention as the grandiosity assigned to the buildings in Islamic culture is quite remarkable. But the humble structure of mosques in agrarian Bengal was equally important for the prayers, as Eaton contends:

> Whether a grand edifice or a humble thatched hut, the mosque conceptually conflates Islam's macro-community of the *umma* – the worldwide body of believers – into a microcommunity of fellow villagers or fellow city-dwellers, affording them the physical space to articulate their collective response to word of God. As such the mosque is the physical embodiment of the social reality of Islam, and hence the paramount institution by

which community identity and solidarity are expressed. (Eaton, 230).

The Red Mosque or the Ranga Masjid, built around the 14th Century is one of the most remarkable reservoirs of cultural heritage in Bengal. The mosque was built when no human agents had inhabited the deep groves of the bioregions of the Sunderbans. The incomplete structure of the mosque, which is mostly in ruins, serves as the symbol of the emergence of evolution of the agrarian indigenous community at the belts of the Vidyadhari river. Though the structure is incomplete, the Red mosque being the first site of religious prayers in public space, still is revered as the place of public prayers among both the Hindus and the Muslims. The local Muslims offer the Eid Prayer at the open space that lies before the ruins of the mosque, whereas the local Hindus still visit the mosque with their 'mannats' or secret offerings to the Almighty. Adjacent to the ruined structure of the mosque is the 'mazar' of the Fakir who was the attendant of Pir Gorachand, his *Khidmatgar*. People still visit the places with faith in the miraculous power of the mosque and the Pir.

The contestations of how to substantiate the tales related to the miraculous power of the 'Pir' in reality have changed. But some of the tales, stories and anecdotes still define the cultural landscape and the name of the places where he had lived and worked. The name of the place known as Berachampa in Haroa is directly related to the miraculous power of Hazrat Shah Abdul Ali Razi. The local myths have it that the conflicts between Pir Gorachand and the Raja Chnadraketu was a perpetual one, Pir Gorachand being an upright advocate for the rights of the poor and the downtrodden farmers and other people. On one such conflicting occasions, as challenged by Raja Chandraketu, the Pir had miraculously made the 'Champa' flower bloom on the bamboo walls. Based on that narrative, the place has been named as Berachampa and remains so till date. The close connection of Pir Gorachand with the local people is evident from the tales of how the local Hindus helped him survive during the last phase of his life. The tales of miracles as associated with the stick he used for walking is equally important to note. His stick is said to exhibit miraculous power and during the last phase of his life he planted the lifeless stick at the banks of the ponds, few yards away from the red mosque and the unknown species of the bamboo immediately sprang into life and flourished into a small bamboo grove. Visitors often the visit the bamboo grove that flourished from the *asha bari* (bamboo stick) of Pir Gorachand.

The Mazar or the shrine of the Pir is equally an important symbolic trope of cultural and religious site. The culture of paying obeisance to mazars and darghas is typically associated with the practice of Islam in indigenous and folk areas, which is a significant division from the practices of strict theological Islam. The Mazar or the Dargah of the Pir represents the amalgamation of the faith and religious practices of Hindus and Muslims. A large number of local Hindus who didn't embrace Islam used to regard Gorachand as their religious and moral guide. This Mazar culture attest to Eaton's contention that the process of Ismalisation in Bengal was not a radically transformative process, rather a natural process of assimilation of the Islamic religion and identity at the context of an existing Hindu culture and both were indigenous and agrarian. The practices of visiting the 'Mazar' to seek the blessings of the Pir, the practices of playing 'Kawali' or 'Kirtan' at the premises of the 'Mazar' every Friday and offering Chadar for the Pir – these are practices that result from the agrarian indigenous Hindu cultures of the local people. So even if Pir Gorachand had a huge influence on the Islamisation among the downtrodden of the society during the reign of the ruler Raja Chandraketu, the conversion was not a result of forceful coercion, neither aimed at changing the existing patterns of spiritual practices among the rural indigenous communities. That evidently results in the fluidity of cultural communication and the 'Mazar' and the 'Mosque' became site of such kind of cultural communication. As the Hindu milkman Kalu Ghosh had tended to the wounds of the Pir, the local Hindu milkmen wash the Mazar every year on 12th Falgun with milk. On this occasion, a huge fair and Urs Mela are organised at Haroa, which has remained one of the most popular form of human gathering and communication during the past few centuries. This culture of the Urs or Mela concerning the religious shrines and mazars is a cultural heritage of Bengal that definitely demonstrates the varied cultural diversity and fluidity.

But such familiar landscapes of the known myths and practise seem to suffer extensively under the aegis of globalisation and market capitalism. The Urs or Mela of the 12th Falgun, which used to attract thousands of people coming from different regions and backgrounds seem to have lost its vigour in the neo imperialistic cultural landscape. Lack of proper research and archaeological preservations, the remaining wall of the red mosque is left in abject neglect and in utter ruins. Due to lack of interventions the many versions of the oral tales, myths and narratives have not been recorded properly and the oral history seem to be fading away too quickly. Only extensive research interests and

findings and proper documentation can provide some hope to preserve the heritage that is facing imminent doom and destruction.

Works Cited

Ahmed, R. "The Bengal Muslims, 1871-1906: A Quest for Identity". *Understanding the Bengal Muslims*. Ed. R. Ahmed. New Delhi: Oxford University Press, 1981.

Claude. L. S. *Myth and Meaning*. London: Routledge, 2005.

Das, G. N. *Bangla Pir Sahiyter Katha*. 24 Parganas: Shahid Library, 1976.

Digby, S. "Abd Al- Quddus Gangohi (1456- 1537 AD): the Personality and Attributes of a Medieval Indian Sufi". *Medieval India: A Miscellany.* Aligarh: Aligarh Muslim University Press. III, 1975. pp- 17-18.

Digby, S. "The Sufi Shaikh as a Source of Authority in Medieval India". *India's Islamic Traditions, 711-1750.* Ed. R. Eaton. New Delhi: Oxford University Press, 2003.

Eaton, R. M. *The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760.* Berkeley: University of California Press, 1993.

Eaton, R. M. "Who Are the Bengal Muslims? Conversion and Islamization in Bengal". *Understanding the Bengal Muslims*. Ed. R. Ahmed. New Delhi: Oxford University Press, 1981.

Green, N. *Making Space: Sufis and Early Settlers in Early Modern India*. New Delhi: OUP, 2013.

Haque, E. M. *Bange Sufi Pravab*. 24 Parganas: Shahid Library, 2012.

Molla, N. *Changing Muslim Identity in Bengal, 1871 – 1947*. New Delhi : Kunal Books, 2017.

Roy, A. *Islamic Syncretistic Tradition in Bengal.* Princeton, N J: Princeton University Press, 1983.

Siddiqui, A. G. *Balandar Pir Hazrat Gorachand Razi.* Dhaka: Bangla Akademi, 1962.

AN OVERVIEW ON TEACHER EDUCATION ENVISAGED BY NEP 2020

Sajal Dey
Assistant Professor
Cooch Behar B.Ed. Training College
Tengonmari, Rajarhat Cooch Behar

Abstract:
The present paper focuses on the very inevitable changes set in the NEP 2020 document in teacher education. The paper discusses some of the issues in implementing these changes in the teacher education field in the country. National Education Policy 2020 is a comprehensive framework for elementary education to higher education as well as vocational training in both rural and urban India. Teacher Education plays a vital role in case of making teachers who are engaged directly to teach the students of various levels of education. NEP 2020 recognizes that teachers will require training in high-quality content as well as pedagogy. By 2030, minimum degree qualification for our teachers will be a 4-years integrated B.Ed. degree that teaches a range of knowledge content and pedagogy. The National Education Policy recognizes and identifies teachers and faculty as the heart of the learning process. The policy will empower teachers of India and lists out various reforms for their recruitment, continuous professional development, service conditions, etc.

Keywords: inevitable changes, implementing changes, comprehensive framework

Introduction:

National Education Policy 2020 is a comprehensive framework for elementary education to higher education as well as vocational training in both rural and urban India. The National Education Policy (NEP), 2020 provides an important opportunity to move Indian Education from “strong and selection” to “human development” enabling every student to develop to their maximum potential.

The policy aims to transform India education system by 2040. The objective of the NEP, 2020 is to make India a global knowledge super power. The policy envisages broad based, multi disciplinary, holistic under graduate education with flexible curricula, creative combinations of subjects, integration of vocational education and multiple entry and exit points with appropriate certification.

The policy proposes that all universities and colleges aim to be multi-disciplinary by 2040. This policy will boost employment in the country and fundamentally change our educational system.

But the actual success of this policy depends on the teachers. Teaching is one of the best and noble profession and the teachers is prominent personality in this world (Barman and Bhattacharya, 2017). Great teachers have the ability to change lives for the better. They can be role model and inspiration to go further and to dream bigger. They hold students accountable for their successes and failures. Teaching is a tough job, but it is one where you can make the most impact in another person's life. So teacher has a significant role in making the students life bright and productive, and Teacher Education play a vital role in case of making teachers who are engaged directly to teach the students of various levels of education. Hence, a great emphasis should be given on the matter of teacher educators.

NEP 2020 with respect to Teacher Education:

Being a good teacher requires good training. Teacher Education in India is one of the largest systems of Teacher Education all over the world. Teacher Education is the integral part of education. It is spotlight of the 21st century. Thus the quality of education depends on the quality of education of teachers. As stated by NCTE (1998) in Quality Concerns in Secondary Teacher Education "The teacher is the most important element in any educational programme. It is the teacher who is mainly responsible for implementation of the educational process at any stage." NEP-2020 puts it "Teacher education is vital in creating a poll of school teachers that will shape the next generation. Teachers preparation is an activity that requires multi- disciplinary perspectives and knowledge, formation of dispositions and values, languages, knowledge, ethos and traditions including tribal traditions, while also being well-versed in the latest advances in education and pedagogy."

NEP 2020 envisages:

- To restore the prestige of the teaching profession. Stringent action against substandard and dysfunctional teacher education institutions (TEIs) that do not meet basic educational criteria. By 2030, only educationally sound, multidisciplinary, and integrated teacher education programmes shall exist.
- To establish, education departments by all multidisciplinary universities and colleges, run B.Ed. programmes, in collaboration with other departments such as psychology, philosophy, sociology,

neuroscience, Indian languages, arts, music, history, literature, physical education, science and mathematics.

- To convert all stand-alone TEIs to multidisciplinary institutions by 2030, and offer the 4-year integrated teacher preparation programme.
- To function the 4-year integrated B.Ed. by multidisciplinary HEIs by 2030, in the form of a dual-major holistic Bachelor's degree, in Education alongwith specialized subject such as a language, history, music, mathematics, computer science, chemistry, economics, art, physical education, etc. including sociology, history, science, psychology, early childhood care and education, foundational literacy and numeracy, knowledge of India and its values/ethos/art/traditions, and more. The HEI offering the 4-year integrated B.Ed. shall be able to conduct 2-year B.Ed., for students who have already received a Bachelor's degree in a specialized subject. A 1-year B.Ed. may also be offered for candidates who have received a 4-year undergraduate degree in a specialized subject.
- To provide scholarships for meritorious students admitted for 4-year, 2-year, and 1-year B.Ed. programmes.
- To ensure the availability of experts in education and related disciplines as well as specialized subjects by the HEIs offering teacher education programmes.
- To maintain uniform standards for teacher education, the admission to pre-service teacher preparation programmes shall be through suitable subject and aptitude tests conducted by the National Testing Agency.
- To diverse the faculty profile in Departments of Education keeping in mind the quality of teaching/field/research experience which will be highly valued.
- To take credit-based courses by all fresh Ph.D. entrants in teaching/education/pedagogy/writing related to the chosen Ph.D. subject during the doctoral training period. To expose pedagogical practices, designing curriculum, credible evaluation systems, communication. Ph.D students have to undertake a minimum number of hours of actual teaching experience.
- To meet the needs of enriched teaching-learning processes for quality education in-service continuous professional development for college and university teachers will continue and these will be strengthened and substantially expanded.

- To make use of technology platforms such as SWAYAM/DIKSHA for online training of teachers to ensure standardized training programmes by large numbers of teachers.
- To provide short and long-term mentoring/professional support to university/college teachers by establishing a National Mission for Mentoring.

The National Education Policy recognizes and identifies teachers and faculty as the heart of the learning process. The Policy will empower teachers of India and lists out various reforms for their recruitment, continuous professional development, service conditions, etc.

NEP 2020 recognizes that teachers will require training in high-quality content as well as pedagogy. By 2030, minimum degree qualification for our teachers will be a 4-year integrated B.Ed. degree that teaches a range of knowledge content and pedagogy. This degree will also include strong practicum training in the form of student-teaching at local schools. Meanwhile, the 2-year B.Ed. programmes will also be offered, by the same multidisciplinary institutions offering the 4-year integrated B.Ed. It will be intended only for those teachers who have already obtained Bachelor's Degrees in other specialised subjects. These B.Ed. programmes may also be suitably adapted as 1-year B.Ed. programmes. They will be offered only to those who have completed the equivalent of a 4-year multidisciplinary Bachelor's Degree or who have obtained a Master's degree in a speciality stream.

- Furthermore, special shorter local teacher education programmes will also be available at BITEs, DIETs, and school complexes. These courses will promote local professions, knowledge, and skills, such as local art, music, agriculture, business, sports, carpentry, and other vocational crafts. This also aligns with the vision of the policy to provide holistic education.
- A new and comprehensive National Curriculum Framework for Teacher Education, NCFTE 2021, will be formulated. The framework will be developed after discussions with all stakeholders including State Governments, relevant Ministries / Departments of Central Government and various expert bodies, and will be made available in all regional languages. The NCFTE 2021 will also factor in the requirements of teacher education curricula for vocational education.
- Teachers will be given more autonomy in choosing aspects of pedagogy, so that they may teach in the manner they find most effective for the students in their classrooms. Teachers will also focus

on socio-emotional learning - a critical aspect of any student's holistic development. Teachers will be recognised for novel approaches to teaching that improve learning outcomes in their classrooms.

- Teachers will be given continuous opportunities for self-improvement and to learn the latest innovations and advances in their professions. These will be offered in multiple modes, including in the form of local, regional, State, National, and international workshops as well as online teacher development modules. Each teacher will be expected to participate in at least 50 hours of CPD opportunities every year for their own professional development, driven by their own interests. CPD opportunities will, in particular, systematically cover the latest pedagogies regarding foundational literacy and numeracy, formative and adaptive assessment of learning outcomes, etc.
- A robust merit-based structure of tenure, promotion, and salary structure will be developed, with multiple levels within each teacher stage that incentivizes and recognizes outstanding teachers. As Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi has said, "We remain grateful to the hardworking teachers for their contributions towards shaping minds and building our nation." NEP 2020 will honor and recognize the efforts of all educators in making India a Vishwa Guru.

References:

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Education_Policy_2020

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Policy_on_Education

https://shikshan.org/nep-2020

Rajeev, K. R. (31 July 2020). "Teacher education set for major overhaul". *The Times of India*. Retrieved 31 July 2020.

Barman, P. Bhattacharya, D. (2017) Teaching Effectiveness of Teacher Educators in Different Types of B.Ed. Colleges in West Bengal, India. *Science and Education Publishing.*

Is Higher Mind Free from Empirical Mind & from Rational Pressure ? A Brief Discussion in the Light of Sri Aurobindo's Philosophy

Santanu Ger
Assistant Professor, Department of Philosophy
Ranaghat College, Nadia

Abstract : Sri Aurobindo says that the gradation itself depends fundamentally upon a higher or lower substance, potency, intensity of vibrations of the being, of its self-awareness, of its delight of existence, of its force of existence. The ascent of consciousness from our own mental mind upwards through a series of gradations is resolved by Sri Aurobindo into a stairway of four main ascents, each with its high level of fulfillment. According to him the world has been created by a descent of consciousness; it maintains itself, it proceeds and develops through a series of descent. In fact, creation itself is a descent, the first and original one, the descent of the supreme Reality into Matter and as Matter.
Keywords : Ascend, Descend, Consciousness, Aspect of Cognition, Aspect of Will.
Introduction : The vast difference between the nature of mind and Supermind presupposes grades between them, otherwise all ascent or descent is highly improbable. As we rise beyond Mind, there takes place a large dynamic descent of light, knowledge, power, bliss of other supernormal energies into our self of silence. Sri Aurobindo says, "When the powers of any grade descend completely into us, it is not only our thought and knowledge that are affected, the substance and very grain of our being and consciousness, all its states and activities are touched and penetrated and can be remoulded and wholly transmuted. Each stage of this ascent is therefore a general, if not a total, conversion of the being into a new light and power of a greater existence."[1]

Mind belongs to the lower hemisphere and it has to ascend to the higher sphere. So, there must be some intermediary steps through which this transition will be brought about. Mind in its essence is a consciousness which measures, limits, cuts out forms of things from the indivisible whole and contains them as if each were a separate integer. It conceives, perceives, senses things by analyzing them into their component parts. We have also seen that reality cannot be known by such a process, for that mind some how has to rise above its normal activities and try to cultivate some capacity for unification. Mind is always building up ideas, some of which are wrong, some a mixture of truth and

error, some true in their way, but true only in a certain field or in certain conditions or for some people, and it proceeds not only to make "pets" of them, but to try to impose them as universal and absolute truths or general standards which everybody must follows. Sri Aurobindo says, "The mind is a rigid instrument: it finds it difficult to adapt itself to the greater plasticity of the play of life or the freedom of the play of the spirit. It wants to catch hold of either or both of these spontaneous powers and cut them into its own measures. It poses as the mediator and interpreter between life and the spirit; but it knows neither; it only knows itself and its own constructions out of life and its own deformations or half reflections of the truth of the spirit. Only the supermind can be a true mediator and interpreter."[2]

Four steps of ascent lead from the human intelligence to the Supermind. The order of ascent from mind to Supermind is through the following intermediary steps; Higher Mind, Illumined Mind, Intuitive Mind and Overmind. The passage from mind to Supermind is a passae from Nature to Super-Nature.

Discussion : The first important step out of our human mentality is an ascent into Higher Mind. According to Sri Aurobindo, Higher Mind is a mind no longer of mingled light and obscurity or half-light, but a large clarity of the spirit. Its basic substance is a Unitarian sense of being with a powerful multiple dynamisation capable of the formation of a multitude of aspects of knowledge, ways of action, forms and significances of becoming, of all of which there is a spontaneous inherent knowledge.

Sri Aurobindo says, "It is a luminous thought-mind, a mind of spirit-born conceptual knowledge. An all-awareness emerging from the original identity, carrying the truths the identity held in itself, conceiving swiftly, victoriously, multitudinously, formulating and by self-power of the Idea effectually realising its conceptions, is the character of this greater mind of knowledge."[3] Higher Mind is the first step out of separative knowledge which is in ignorance, to the concept of unity and spiritual identity. Sri Aurobindo describes it as "the spiritual parent of our conceptive mental ideation."[4] In the Higher Mind, there is no need of the analytical activities that mind normally performs. In his words, ". . . . there is no need of a seeking and self-critical ratiocination, no logical motion step by step towards a conclusion, no mechanism of express or implied deductions and inferences, no building or deliberate concatenation of idea with idea in order to arrive at an ordered sum or outcome of knowledge."[5]

For, According to Sri Aurobindo, this kind of activity – this limping action of our reason – is an activity in the realm of ignorance. This higher knowledge is a consciousness formulating itself on a basis of awareness and manifesting parts of its integration into the expression of ideas. In Higher Mind what we know is the totality of things though not an integral knowledge. It is the self-revelation of an eternal knowledge. Higher Mind, therefore is a self-aware activity towards integration. Sri Aurobindo says, "This higher consciousness is a knowledge formulating itself on a basis of self-existent all-awareness and manifesting some part of its integrality, a harmony of its significances put into thought-form. It can freely express itself in single ideas, but it's most characteristic movement is a mass ideation, a system or totality of truth-seeing at a single view."[6]

Higher Mind sees that the relations of idea with idea are not established by logic. Truths, here, are not established by logic, they are sought to be seen in their wholeness – in their pre-reflective unity. The thought of Higher mind is a self-revelation of eternal wisdom, not an acquired knowledge. In the stage of Higher Mind, there is the initial attempt to break away from the bondage of logic and rational analysis and enter into the realm of ideal. Higher Mind contains a priori knowing of an eternal wisdom in the universe, based on higher ideal instead of empirical knowledge acquired through sense-experience.

Besides the cognitive aspect, we have the volitional as well as the effective aspect of the Higher Mind, that is the aspect of will. Sri Aurobindo says, "This is the Higher Mind in its aspect of cognition, but there is also the aspect of will, of dynamic effectuation of the truth: here we find that this greater more brilliant Mind works always on the rest of the being, the mental will, the heart and its feelings, the life, the body, through the power of thought, through the idea-force."[7] It purifies, delivers and creates through knowledge. Heart and life become conscious of the idea and respond to its dynamisms. Feelings, will and actions become the vibrations of this higher wisdom. The idea works even in the body so that the potent thought or will of health replaces its faith in illness and its consent to illness, or the idea of strength calls in the substance, power, motion, vibration of strength. The idea generates the force and form proper to the idea and imposes it on our mind, life and matter. In his words, "It is in this way that the first working proceeds; it charges the whole being with a new and superior consciousness, lays a foundation of change, prepares it for a superior truth of existence."[8]

Higher Mind is a thing in itself above the intellect. It is only when something of its power comes down and is modified in the lower mind substance that it acts as part of the intellect. The power of the spiritual Higher Mind and its idea-force, modified and diminished as it must be by its entrance into our mentality, is not sufficient to sweep out all these obstacles and create the Gnostic being, but it can make a first change, a modification that will capacitate a higher ascent and a more powerful descent and further prepare an integration of the being in a greater Force of consciousness and knowledge.

Conclusion : Higher Mind is still not free from the empirical and rational pressure. There is as yet not a luminous seeing which knows things in a direct grasp. For this, what is needed is not a mind of higher thought, but a mind of spiritual light. Light is essentially illuminative, and in a special sense, creative also. Thought-process is very slow, its reveals its objects piecemeal, through gradual steps, but there is the need of a sudden and a direct insight. Therefore, the next stage into which mind can ascent is the stage of Illumined Mind.

Notes & References

1. Sri Aurobindo, *The Life Divine* (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 7th Ed., 2nd Imp., 2010), p. 973
2. Sri Aurobindo, *Letters on Yoga* – IV (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 4th Ed., 2nd Imp., 2015), p. 5
3. Sri Aurobindo, *The Life Divine* (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 7th Ed., 2nd Imp., 2010), p. 974
4. Ibidem, p. 974
5. Sri Aurobindo, *The Future Evolution of Man* (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 3rd Ed., 5th Imp., 2011), p. 85
6. Sri Aurobindo, *The Life Divine* (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 7th Ed., 2nd Imp., 2010), p. 975
7. Ibidem, p. 975
8. Ibidem, p. 976

BIBLIOGRAPHY

1. Sri Aurobindo, *Bases of Yoga* (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 3rd imp., 1989)
2. Sri Aurobindo, *Essays on the Gita* (The Sri Aurobindo Library, New York City, 1950)
3. Sri Aurobindo, *Evolution* (Arya Publishing House, Calcutta, 1933)

4. Sri Aurobindo, *Ideals and Progress* (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, Rep., 1996)
5. Sri Aurobindo, *Letters on Yoga*, Part – I (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 7th imp., 2002)
6. Sri Aurobindo, *Lights on Yoga* (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 2nd imp., 1987)
7. Sri Aurobindo, *On India : A Compilation* (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 1957)
8. Sri Aurobindo, *Supramental Manifestation* (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 1952)
9. Sri Aurobindo, *The Complete works of Sri Aurobindo* (Sri Aurobindo Ashram Trust, 2003)
10. Sri Aurobindo, *The Foundations of Indian Culture* (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 1980)
11. Sri Aurobindo, *The Human Cycle, The Ideal of Human Unity, War and Self-Determination* (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 7th imp., 1997)
12. Sri Aurobindo, *The Ideal of Karmayogin* (Arya Publishing House, Calcutta, 1945)
13. Sri Aurobindo, *The Life Divine* (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 6th imp., 2001)
14. Sri Aurobindo, *The Riddle of this World* (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 4th imp., 1996)
15. Sri Aurobindo, *The Superman* (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 4th imp., 2015)
16. Sri Aurobindo, *The Supramental Manifestation upon Earth* (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 2nd imp., 1980)
17. Sri Aurobindo, *The Synthesis of Yoga* (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 2nd imp., 2000)
18. Sri Aurobindo, *Thoughts and Glimpses* (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 9th imp., 2003)
19. Choudhury, Haridas, *The Integral Philosophy of Sri Aurobindo* (George Allen and Unwin Ltd. London, 1960)
20. Dalal, A. S., Compilation and Introduction, *Emergence of the Psychic – Governance of Life by the Soul* (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 1st ed., 2002)
21. Das, A. C., *Sri Aurobindo and Some Modern Problems* (General Printers and Publishers Pvt. Ltd., Calcutta, 1958)

22. Joshi, Kireet, *Philosophy and Yoga of Sri Aurobindo and Other Essays* (The Mother's Institute of Research in association with Mira Aditi, Mysore, 1st ed., 2003)
23. Keshavmurti, *Sri Aurobindo The Hope of Man* (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 1969)
24. Lal, B. K., *Contemporary Indian Philosophy* (Motilal Banarasi Dass Publishers Pvt.Ltd., Delhi, Rep., 2005)
25. Maitra, S. K., *An Introduction to the Philosophy of Sri Aurobindo* (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 6th imp., 2001)
26. Nirodbaran, *Sri Aurobindo for All Ages* (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 5th imp., 2004)
27. Pandit, M. P., *Commentaries on Sri Aurobindo's Thought*. Vol. 1 & 2 (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, Rep. 1995)
28. Price, Joan, *An Introduction to Sri Aurobindo's Philosophy* (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 5th imp., 2004)

JOURNALS

1. *Bulletin of Sri Aurobindo International Centre of Education* (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry)
2. *Mother India, Monthly Review of Culture* (Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry)
3. *New Race, A Journal of Integral Studies* (Institute of Human Study, Hyderabad)
4. *Sraddha, A quarterly devoted to an exposition of the teaching of The Mother and Sri Aurobindo* (Aurobindo Bhavan, Kolkata)
5. *Sri Aurobindo Mandir Annual* (Sri Aurobindo Pathmandir, Kolkata)

Religion-Science Interface: Revisiting the Select Works of Rajsekhar Basu

Somnath Roy
Assistant Professor, Department of Chemistry,
M. U. C. Women's College, Purba Bardhaman

Abstract: Rajsekhar Bose (March 16, 1880 – April 27, 1960) was a noted writer, translator, chemist and lexicographer. He is best known for his satirical intellect and satirical stories under the pseudonym Parashuram. In his early life, he worked in Bengal Chemical and Pharmaceutical Works of Acharya Sir Prafull Chandra Roy. He was also known in the field of literature under the same pseudonym 'Parashuram'. In the textual article, we will first show the influence of science in various literatures (humorous and otherwise); Then a discussion of scientific articles. It may be mentioned here that this effect is a bit more ironic and even bizarre in literature. However, their discussion is very important.

Key-words: Satire, science, superstitions and science consciousness of Parashuram

Introduction:

Rajsekhar Bose will be immortalized in the history of Bengali literature for writing stories, literally. This renowned writer himself was a chemist, having graduated in chemistry and physics from Presidency College (with honors in both subjects), so he had no problem doing his post-graduation in chemistry from Calcutta University. In a very natural way, unprecedented patterns of scientific thought can be noticed in his writings. He imprinted this scientific mentality in his numerous articles and stories, and was also associated with the Bengal Science Council for a long time.

From 'Rajshekhar's Boyhood' (Shardia Jugantar) written by Shasishekhar Bose (Rajsekhar's elder brother) it is known that since childhood there was a great interest in knowing what was inside the mechanical toys that made them move. The emergence of this question is in fact the beginning of the scientific mentality.

Firstly, the Automatic Durgagraph machine is seen in the story titled 'Sri Sri Siddheshwari Limited'. Sri Sri Durga if written 12 times, 9 times with ink and stamp will become 108 times in multiplication. Inventor is in the process of obtaining a patent. The whole thing is not only ridiculous, but at the same time the issue of science being manipulated by religion and even patenting to serve their own interests

comes up. It is also worth noting here that vegetable soup is made from the abandoned flower leaves of the temple.

Same thing was seen in the 'Chikitsa Sankat' story. The description of how one doctor after another starts cheating behind the scientific jargon is very enjoyable. For example, after Nandababu asked the allopath doctor, the doctor replied, "Unless we watch for a few more days, we cannot say for sure”. But I suspect a cerebral tumour with strangulated ganglia. The skull should be punctured with a trephine, and the neck should be operated to release the tangle of nerves because it becomes “Short—circuited."

In another context when Nanda asks Tarini Kobrej about his illness and the so called medication, he retorts: If I tell you that you have differential calculus in your stomach, will you understand something? Do not eat rice, avoid bread twice a day, avoid fish and meat, only take bean juice, stop bathing, drink a little hot water; do not eat tobacco because smoke will spoil the medicine. Do you think the medicines in my cupboard are spoiled? Don’t get anxious, my copper is mixed with sulphur-thirty." Only Parashuram can imagine sulphur-thirty in tobacco.

This is where Parashuram stands out. Hence Birinchibaba's 'gool' (blatant lies) such as teaching Einstein, the theory of relativity are equally popular today and the manner in which they are presented is not only rare in Bengali literature, but also makes an important contribution in making people aware of the effects of fabricated science. It exposes the tar tuffs and charlatans in our society.

Although satirized in the article called 'Apabigyan', he wrote a very important piece on the topic of pseudoscience. According to him, "just as false religion is created by using religion, so pseudoscience is also created by using science”. In all countries, many new misconceptions have been popularized in the name of science. I am talking about a few of the misconceptions that have become popular in this country under the guise of science."

Discussion:

In this case, the first thing that comes to mind is electricity. The way he was being used for 'science' after the discovery and commercial use of electricity, it needs proper attention to defame pseudoscience. He wrote - "A few days ago, a Kabiraj Mahasaya wrote in a monthly magazine: 'Always remember that uninterrupted electric current is being transmitted everywhere in the basil tree.' He did not say where he got the wonderful information, whether it was in ‘Sushruta’ or in his heart. Electric salsa and electric ring are well-known in the market. The quality of octametal

in 'Maduli' is no longer depends on scriptures or proverbs. Electricity is generated because there are two types of metal in the battery, so why shouldn't the usefulness of octametal be more! The advertisement of electric waist belt is also getting endorsements in foreign newspaper." After that, since his witty comments have not hurt the sentiments of British officers, the advertisement of electric salsa was legitimizing by this.

Then, based on the misinterpretation the scientific terminology and discussion in detail on several erroneous scientific opinions, he says - "Sophist will say - why do I obey the infallible law of nature? In my mind the fruit falls to the ground, the lunar eclipse occurs, addition of two and three results into five." But there may be a world or a situation where there are exceptions to the rules. The scientist answers - your doubts are justified. But the field of science is the vision of this ever-familiar world and the human nature of yours and mine. When I go to another world or see another type, I will compose another science. It is true that the formula which scientists formulate sometimes has to be corrected, but it is not the result of a change in the laws of nature. "It was not only a humorous work about the era; it was one of the best in mainstream Bengali literature".

He is right in saying that "as a result of the spread of science, the old superstitions are gradually disappearing. But in the place of what is going on, some new rubbish is being planted. Just as absurdity is created by using religion, pseudoscience is also developed by using science. In all countries, many new fallacies have been popularized in the name of science.

It is well known that Rajashekhar Bose in his book 'Bichinta', in his essay 'Science in Bengali', divides it into two parts. A group who do not know the English language or know very little; On the other hand there are those who know English and have read little science in English. Young children and young adults who know little or no English are in first grade. Class II readers are those who know the English language and have studied more or less science in English.

Scientific essays are written in Bengali keeping in mind the above two classes of readers. According to the author, since first class readers have not read science in English, it is relatively easy for them to read scientific references in Bengali. On the other hand, it is difficult for those who know English and have read more or less science in English before, to read science in Bengali language. In order to study science in Bengali, they have to discard prejudice and bias towards English and adopt the

mother tongue method with love. Suddenly, if they go to study science in Bengali, they will feel confused; the terminology will also be unfamiliar. Just as children in western countries can easily read science in their mother tongue from the very beginning, first class readers can read science in Bengali in the same way. On the other hand, the task is not so easy for Class-II readers. Rajashekhar Bose in this essay has given several important suggestions to Bengali science-writers.

According to him, in order to write scientific essays in Bengali, writers need to be aware of the language of proper translation. The meaning of English words is not the same as that of Bengali words. Therefore, it is necessary to use different Bengali words as synonyms of a single English word in different cases. Besides, while translating different sentences, the basic nature of Bengali language should be kept intact.

He also said that the language of scientific writing should be simple and clear. The title, the sign and the consonant of the word, the term must be used in these three types of meanings. Signs, connotations and allusions, exaggerations, etc. should be avoided. The author, by way of example, says that the "Himalayan is the standard of the world" is suitable for poetry but not for geography. The satire is evident and makes the story relevant to our days and times.

He has seen that there are many factual errors in the scientific writings in Bengali periodicals. The editor should be careful about this and check with an experienced person before printing the work of an unknown author.

He speaks on the limitations of the scientific knowledge of the people of this country when compared to the West. It is not possible to understand a scientific article without being familiar with the basics of science. It is very easy to write popular science in Europe and America, because ordinary people understand it effortlessly. But the social situation in our country is not so simple. What is written here for adults is not as easy to understand if it is not written from the beginning as in elementary science. Those who write about science in Bengali have to keep these things in mind in order to gain popularity. The essayist said these words while explaining the need to expand science education. It should be remembered that if the spread of science education is not proper, it is not possible to develop science related literature.

Even though he was a science student, he did not forget to write about the bad aspects of science. In particular, in the article 'Bigyaner Bibhishikha, he identifies the different strands of the practitioners of science. There are many knowledgeable pure scientists who are

inquisitive, who do not think of profit. But there are many more who want to achieve their goals with the help of science. Newton, Faraday, the Curie couple and their daughter, Einstein, etc., are mainly pure scientists, although their discoveries have been put to use by others. But inventors of engines, telephones, phonographs, radio radars, drugs such as salverson, streptomycin, and lethal weapons such as guns, cannons, torpedoes, and atom-hydrogen bombs, practiced science to follow. For them, science is mainly a way of success, as for lawyers, knowledge of law is a way of winning lawsuits. The discovery of new theories and the application of theories - these two disciplines are sciences, but if science is misapplied, it is terrible.

Although this difference is very small in reality, awareness against this unnatural science of that era is definitely rare in Bengali literature. As a socially conscious writer and literary figure, Rajshekhar Bose not only emphasized the pursuit of science, but also sought to cultivate a secular mindset. On the one hand, science in the mother tongue was the central issue in the practice of science; on the other hand, there was the fight against the creation of superstitions in the name of science. This trick came to make satirical literature with the example of deception?

Parashuram aka Rajshekhar Bose is one of the best non-world first class writers in Bengali literature. Generally, writers who only create comic literature tend to have a tendency towards super-weird character designs. Their main goal is to make the reader laugh, sometimes there is such artificiality in the exaggeration and amplification that when reading their writings there is no trace of reality, the reader forgets his own space and time and cannot connect the group of characters depicted.

This real creation is the characteristic of Parashuram. Reading his writing seems to be genuine, lively. There is no exaggeration here. Humour does not exist without exaggeration and amplification. Analysing it, it can be understood that Parashuram-literature has both. But the artist's writing style creates such an illusion in the reader's mind that it seems that his characters are familiar to us, like old neighbours.

Rabindranath Tagore wrote, “The book (Gaddalika) is a character gallery. If I hear the sound of breaking stones when I enter the sculptor's house, I think breaking is his job. However, the idea is like a boy, - if you look at it properly, it is understood that building is his business. I have not noticed whether the author has hurt the intellect of the people in his writings. I saw him build idol after idol. It has been made in such a way that I think I know them forever. ”

Conclusion:

Parashuram's artistic vision is very attentive and attractive. He looked at life closely. Over a long period of time, the ancient social life of India has been going through various changes — weaknesses and inconsistencies have accumulated towards it. Parasuram's talent found inspiration in this. He did not seek to find the supernatural things. That is why, Brahmachari Shrimat Gunamanda, Ganderiram Batpariya, Raya Bansholochan Banerjee, Bandmaster Latubabu, Birinchi Baba, Nakur Mama, Nanda— all came from the common strata of our ever-familiar social life. From the great Indus of our mundane life, the artist has brought out the various materials of class character like experienced jeweller and made one caricature after another with that material.

Satire is basically of two kinds - individual and collective. A few caricatures he has drawn on the basis of class inconsistency, ambiguity, ignorance or stupidity and these stands unparalleled in world literature. Parashuram is the greatest artist in sharp, restrained and spicy satire. One of the main features of Parashuram's caricatures is concealment and generosity. As a result of the literary creations of Dryden, Pope, etc., it seems that the word 'satire' is associated with a sharp, hurtful feeling in English literature. Parashuram's caricatures are of a completely different variety. A la Lamb, his humour is rainbow humour and the satire congenial. Though it exposes the hypocrisy of our society, it’s never personal. This makes his writings universal in true spirit and immensely enjoyable.

References:

1. Adritiya Rajashekhar - Amitabh Chowdhury – M.C. Sarkar & Co. Pvt. Ltd, Kolkata. 2001
2. Parashuram Galpasamagra - Rajshekhar Bose, Editing - Dipankar Bose, M.C. Sarkar & Co. Private Limited, Kolkata. 1992.
3. Laghuguru Prabandhabali - Rajshekhar Basu, Ranjan Publishing House, Calcutta. 1939
4. Bichinta - Rajashekhar Bose. Indian Associate Publishing Co. Private Limited 1362 (1955).

A CRITICAL STUDY OF THE NOVELS OF AMITAV GHOSH FROM THE POST COLONIAL PERSPECTIVE

Rana Gorai
Department of English
State Aided College Teacher, Category I
Saltora Netaji Centenary College

ABSTRACT : Post-Independence Indian English fiction is virtually synonymous with Post-Colonial Indian English fiction. Literally, 'Post-Colonialism' refers to the period following the decline of colonialism, e.g., the end or lessening of domination by European empires. Although the term post-colonialism generally refers to the period after colonialism, the distinction is not always made. In its use as a critical approach, post-colonialism refers to "a collection of theoretical and critical strategies used to examine the culture (literature, politics, history, and so forth) of former colonies of the European empires, and their relation to the rest of the world". Among the many challenges facing postcolonial writers are the attempts; both to resurrect their culture and to combat preconceptions about their culture.

The term ‘Post-colonial’ came after the term ‘colonial’ which was based on the theory of the superiority of European culture or Imperial culture and the rightness of the empire. Colonial literature means the literature written by the native people including the writings by Creoles and indigenous writers during the colonial times. Postcolonial literature means the literature written after the withdrawal of the imperial power from the territory of the native people. After gaining freedom from colonial rule, the Postcolonial people’s quest for their identity began. In the postcolonial era, the lives of ordinary people and their culture have been widely discussed in both Indian English Fiction and Indian English Poetry by the different perceptions of different writers and poets of different cultures.

Indian English writing is the consequence of the arrival of British people in India as it was after their departure that Indians thought of writing about India in English language. The novel as a literary genre is a recent development if we compare it with prose, poetry and other genres. It is also the best medium of expressing the social reality with its culture, lifestyle, ways, ideals and problems. Though in the beginning it was a challenging task to write in colonizer’s language but gradually their problem was overcome with the arrival of great authors like Bankim

Chandra Chatterjee, Rabindra Nath Tagore, Aurobindo etc. who proved it through their creative capacity that literature and literary creation were beyond such trivial limitations.

The history of Indian-English novels is known for its systematic development which starts with Bankim Chandra Chatterjee's novel Raj Mohan's Wife. In pre-independent Indian society there were novelists and their novels like Mulk Raj Anand's Untouchable(1935), Raja Rao's Kanthapura(1938), R.K. Narayan's Swami and Friends(1935) and Bachelor of Arts(1936) and Manohar Malgonkar's A Bend in the Ganges(1964) which have taken the political and social problems in their novels. They proved to be great social reformers through their works.

But after the independence of India feminist writing was developed with the arrival of women writers like Nayantara Sahgal, Kamala Markandaya, Sashi Deshpande who were concerned with women's fight for equality in patriarchal Indian society. They voiced the feministic concerns quite objectively and appealingly. The new Indian writing in the 1980's and onwards has acquainted us with a literary renaissance, Salman Rusdie, Vikram Seth, Sashi Tharoor, Arundhati Roy, V.S. Naipaul, Jhumpa Lahiri, Upmanyu Chaterjee and above all Amitav Ghosh are the foremost and renowned novelists of the period who have taken diverse themes like east- west encounter, hunger for identity, rootlessness, colonial rule, exploitation, corruption, frustration, alienation etc. in their fictional work. These writers have perfectly expressed Indian sensibility in Indian English. Not only this, they have also made a distinct mark on the world literary scene with their rich cultural heritage and skilled language control. Thus Indian English is on the move and here I feel myself fortunate enough as I carry out my present paper work on one of the most prominent Indian English writers, Amitav Ghosh.

Keywords: Quest of Identity, Ethnicity, Nationalism, Hybridity, Corruption, Alienation.

INTRODUCTION

Amitav Ghosh, a fascinating Indian English writer was born in Calcutta on 11 July 1956. He grew up in East Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Iran and India. He attended the Doon School in Dehradun, and then received a B.A. with honours in History from St. Stephen's College, Delhi University in 1976 and an M.A. in Sociology in 1978, and then a PhD in Social Anthropology from Oxford University in 1982. He worked for a while as a journalist for The Indian Express newspaper in New Delhi. Since then he has been a visiting fellow at the centre for Social Sciences, at Trivandrum, Kerala (1982-83), a visiting professor of

Anthropology at the University of Virginia (1988), the University of Pennsylvania (1989), the American University in Cairo (1994), and Columbia University (1994-97), and Distinguished Professor of Comparative Literature at Queens College of the City University of New York (1999-2003). In the spring of 2004, he was visiting Professor in the Department of English at Harvard University. He spends part of each year in Calcutta, but lives in New York with his wife, Deborah Baker, and their children Leela and Nayan. His wife Deborah Baker is also an autobiographer and essayist. Her most important work is **The Life of Laura Riding**(1993).

Amitav Ghosh has been a winner of Sahitya Academy Award in 1989 for **The Shadow Lines**, the prestigious Prix Medicis Estrangere Award, Arther C. Clarke prize, and recently he was honored with Padam Shri, on 26th January, 2007. His **Sea of Poppies** was also shortlisted for the Man Booker Prize. In 2018, he was also conferred 54th Jnanpith Award which is India's highest literary honour and he was the first English language writer to receive this award. In 2019, Foreign Policy Magazine named him: Important global thinkers of the preceding decade.

Amitav Ghosh himself is interested in History, Sociology and Anthropology and this interest is thoroughly reflected in his novels. He mainly discusses the theme of nationalism, multiculturalism, communal violence, political and geographical freedom, restlessness, rationalism, peaceful co-existence, humanitarian attitude, scientific quest and partition etc. He mostly portrays contemporary theme and brings forth a short of realization of the events that have happened in the past and continues to make their presence in the present. There is an intermingling of these periods coupled with a tense of current ecological issues which make his novels a kind of fact cum fiction based reading.

The purpose of my present research work is to carry out a critical study of the various thematic concerns in the novels of Amitav Ghosh. Such a study will reveal the creative capacity of Amitav Ghosh, as an artist and will endeavour to explore various thematic concerns in his following novels, **The Circle of Reason** (1986), **The Shadow Lines** (1988), **The Calcutta Chromosome** (1996), **The Glass Palace** (2002), and **The Hungry Tide** (2004). It is proposed to divide the work tentatively into the following topics:-

CHAPTERIZATION

In this chapter an attempt will be made to study contemporary Indian society from political and social points of view. After independence there has come a tremendous change in Indian social structure as well as in the

attitude of people. But the clash of tradition and modernity is always there. This has resulted in a sort of disorder and agony in society which has been a very popular subject matter of Indian English novelists. Then there are some Diaspora writers like V.S. Naipaul, Salman Rushdie, Vikram Seth who take the Indian themes in their work but who are worried for their roots for their identity and their rootlessness thus identity crisis is always reflected in their work.

In the second part an attempt will be made to study Amitav Ghosh as post- colonial writer who has made various subjects of contemporary society as the theme of his novels. He minutely observes the multifarious changes in society and at once gives language to them through his fictional work. But above all, he is interested in the common man and his concern for the individual is present in almost all his novels. This part will also study the formative and other external influences on Amitav Ghosh as a creative writer.

OBSESSION AND EXILE: The Circle of Reason

In this section we shall study the role of chance, the theme of obsession, exile and rationalism, represented through the novel **The Circle of Reason**. Chiefly it is the story of an Indian protagonist Balaram, who is suspected of being a terrorist, his ideals, obsessions and his tragic end. The novel also consists of some other characters having their own ideals and obsessions. Balaram at Lalpukur is obsessed with phrenology and carbolic acid. Toru Debi, wife of Balaram, is always preoccupied with the world of sewing machines, Alu with weaving, Jyoti Das with his occupation, Zindi herself is obsessed with Durban Tailoring House and Professor Samuel with the theory of queues. The novel deals with the theme of obsession and emphasizes on how people in this world spend their lives in achieving their ideals and in pursuing their obsessions but the fate of humanity is inevitable, sometimes we get achievements and sometimes failure and feel restlessness, still the main thing in life is hope. The Circle in the novel **The Circle of Reason** symbolizes restlessness. It contains elements of fictional narratives and is distinctly post-colonial in its marginalization of Europe and postmodern in its small linear nature and thick intertexuality. The novel also re-interprets and re-emphasizes the unrecorded historical events, like A Pasteurized Cosmos and the History of Cotton. There is also a clash of tradition and modernism and an appeal to the people for a humanitarian outlook.

EMPHASIS ON PEACEFUL CO-EXISTENCE AND HUMANITARIAN ATTITUDE: The Shadow Lines

In this chapter we shall study Ghosh's emphasis on peaceful co-existence and humanitarian attitude among cultures represented through the novel **The Shadow Lines**. Here he challanges the conventional portrayal of the nation as a unique entity. He considers the lines that demarcate natins as "shadowy" and unreal. Shadow lines appear not only between countries but also between imagination and reality, the past and the present, memory and desire. It is the story mainly of two families, one is Indian and the other is English. They are deeply saved by following the departure of the British from India in 1947. Here we find Mr. Justice Chandra Shekhar Datta Chaudhary and Lionel Tresawsen who became friends despite the fact that they belonged to different religions, races and regions. The Shadow Lines attempts to highlight the fact that the considerations of country, class, race and region have put the people in fetters, but fortunately the human race continually strives for freedom. The novelist does not limit himself within the shadow lines of nationality and culture and freely roams in three countries- India, Pakistan and England. This work also highlights the quest for political freedom, the riots of partition, violence and the role of rumor in it. The novel has succeeded in presenting the truth that human society all over the world has the same emotions and feelings but the distinction of castes, colour and creed have divided it into small units which are almost baneful and worthless.

SCIENTIFIC QUEST: The Calcutta Chromosome

In this section we shall study the novel, **The Calcutta Chromosome** which is reported to be the first science-fiction novel in English. The narrative is suffused with a kind of scientific quest that combines literature, fantasy, philosophy and imagination in it. It describes the life account of an Egyptian Computer Clerk, Antar who is working on his machine, Ava, to find out the whereabouts of a missing scientist L. Murugan on the one hand and on the other, it deals with the discovery of the malarial parasite, by Ronald Ross, who received the Nobel Prize for Medicine in 1902. The theme of the novel also includes history, politics of scientific research, psychological afflictions, technology, memory and even spiritual meditation.

COLONIAL DISPLACEMENT: The Glass Palace

In this chapter we shall study the theme of colonial displacement represented through the novel **The Glass Palace**. The characters in the novel, King Thebaw, Queen Supayalat, The Burmese princess and the common people, like Dolly, Rajkumar, Saya John – All equally become the victims of colonial displacement. It is a post –colonial novel where

the theme of colonizer and colonized has been highlighted and the colonial history is presented in a fascinating way chiefly, it is the story of Rajkumar who gradually becomes a powerful member of the Indian community in Burma. He loves and later marries Dolly who lives in a distant Indian City of Ratnagiri. The novel revolves around the interaction between three families of Dolly & Rajkumar in Burma, of Uma and her brother in India and of Saya John and his son Mathew in Malaysia.

CONCERN FOR THE INDIVIDUAL: The Hungry Tide

In this section we shall study Ghosh's novel **The Hungry Tide**. The theme of the book is concern for the individual against a broader historical and geographical backdrop. The novel also tries to re-assert the co-existing relation between man and nature and the truth that over interference in nature leads to uncertain devastating tides and subsequently the tides in human relation either internal or external. The book has two sections- the Ebb & the Flood. The setting takes place in Sunderban which means beautiful forest, located in the Northern part of the Bay of Bengal. The conflict of the government and the local populace regarding the Bengal tiger which has killed thousands of people is also obvious. Simultaneously, Ghosh's characters also become aware of the futility of division between individuals of any social class. The theme of crossing the borders and obliteration of it through the portrayal of the flood on land is always there.

CONCLUSION:

Indian writing in English has stamped its eminence by mixing up modernity and tradition in the production of art. Furthermore, the oral transmission of literary Indian works gained ground slowly. It formed an indelible mark in the heart and mind of the lovers of art. Amitav Ghosh is one of the renowned postcolonial writers. Ghosh is immensely affected by the cultural and political milieu of post independent nation. Ghosh weaves the magical realistic plot along with postcolonial background. Postcolonial migration to the foreign nation is yet another trait of postmodernism. Irony plays an important role in the postcolonial fiction. Ghosh is very careful in using the vernacular transcriptions and English. Ghosh improves a rich and conscious tradition in Indian English fiction, a tradition which includes Shashi Dehspande and R.K. Narayan. In Amitav Ghosh's novels **The Circle of Reason, The Shadow Lines, The Calcutta Chromosome, The Glass Palace and The Hungry Tide**, the postcolonial traits like ignorance, illiteracy, caste identity, starvation, ethnicity, poverty, suffering and humiliation are obviously present.

Finally, it is summed up that Amitav Ghosh is one of the gifted Indian English writers of the present time. He is not limited to any particular topic or subject, but like a wandering butterfly sits on every flower and brings its sweetness to his readers in the form of thrilling fictitious works. He amalgamates history, politics, anthropology, scientific discovery and human emotions in one fabric and constructs a well-plotted novel in which there are a number of themes dealt with in different style and manner.

REFERENCES

PRIMARY SOURCES:

1. **Amitav Ghosh, (1986), "The Circle of Reason"**, New Delhi, Ravi Dayal, Permanent Black. Print.
2. **Amitav Ghosh, (1988), "The Shadow Lines"**, New Delhi, Oxford University Press, 1988. Print.
3. **Amitav Ghosh, (1996), "The Calcutta Chromosome"**, New Delhi, Ravi Dayal, Permanent Black1996. Print.
4. **Amitav Ghosh, (2000), "The Glass Palace"**, New York, Random House, Inc.2002. Print.
5. **Amitav Ghosh, (2000), "The Glass Palace"**, Uttar Prades; Harper Collins India, 2000, Print.
6. **Amitav Ghosh, (2004), "The Hungry Tide"**, New Delhi, Ravi Dayal, Permanent Black, 2004. Print.

SECONDARY SOURCES:

1. **Brinda Bose: Amitav Ghosh, Critical Perspectives**, Delhi:Pencraft International, 2003.
2. **R.K. Dhawan: Explorations in Modern IndoEnglish Fiction**, New Delhi, Bahri, 1982.
3. **R.K. Dhawan: The Novels of Amitav Ghosh,** New Delhi, Prestige Books, 1999.
4. **John C. Howley: Contemporary Indian Writers in English: Amitav Ghosh,** New Delhi, Foundation Books, 2005.
5. **Srinivasa Iyenger, R.K.: Indian Writing in English**, New Delhi,Sterling Publishers, 2005.
6. **Tabish Khair: Amitav Ghosh: A Critical Companion,** Delhi,Permanent Black, 2003.
7. **Tabish Khair: Babu Fictions: Alienation in Contemporary Indian English Novels**, New Delhi, Oxford U.P, 2001.

8. **M.K. Naik : A History of Indian Literature**, New Delhi, Sahitya Academy, 1982.

9. Dr. Alpana Rastogi: Communal Strife and Partition in Amitav Ghosh's The Shadow Lines. Research Journal, Helicon Views, July 2006.

10. P.S. Ravi: Modern Indian Fiction : History, Politics and Individual in the Novels of Salman Rushdie, Amitav Ghosh and Upmanyu Chatterjee, New Delhi, Prestige Books, 2003.

Online Education & Covid 19

Aniruddha Saha
Assistant Professor
Asannagar Madan Mohan Tarkalankar College
Aryakannya Samanta
Independent Researcher

Abstract : The COVID-19 is a global pandemic. Covid-19 pandemic successfully forced global shutdown including educational activities. The Covid-19 pandemic has become a critical challenge for the higher education sector. Pandemic often compels the students to stay at home for long period of time and obstructs teaching learning process. Therefore Teachers can use virtual classroom to teach from home with all necessary online platforms which makes the online session more effective. But online platform has many advantages and disadvantages and it has resulted in tremendous crisis-response migration of universities with online learning serving as the educational platform. This pandemic is a huge challenge to education system.

Keywords : Covid-19 pandemic, Internet use, Online Teaching and Learning, Challenges

Introduction-

The novel corona virus, known as covid-19 was discovered in the year 2019 in a sea food market in Wuhan. Clinical research shows that the virus is transmitted to individuals. In March 2020 The Director-General of WHO declared social distance as a way to prevent the spread of the pandemic and after assessing the rapid spread and severity of the deadly virus worldwide, Declared Covid-19 as an pandemic. Social distancing is conscious increse in the physical gap between people in order to curb dissemination of disease. In this pandemic situation Schools, sport activities, global physical closure of business and all institutions are closed across India as part of a national lockdown in march-2020. Due to Covid-19 pandemic all institution intend the online platforms online learning is the use of internet and some other important technologies to develop materials for educational purpose.

Objectives-

Online learning in its entirely is dependent on technical devices and internet, instructions and students with bad internet connection are liable to be denied access to online learning. The dependency of online learning on technical equipment and provision of the equipment was a big challenge for institutions, faculty and learners. Online learning has taken

away the face to face interaction with fellow students and teachers. For some students this lack of social interaction can lead to feelings of isolation. While social distancing is an effective way to slow the spread of covid-19 it leads to many mental health issues, including depression.

Discussion-

Due to lockdown across the world Teaching learning process turn into digital mode. The education system was completely dependent on the internet by using online apps like Google meet, zoom app, Shodganga, e-shodh sindhu, e-PG Pathshala, CEC-UGC YouTube channel, SWAYAMPRABHA, SWAYAM online course, National Digital Library, teach mint, unacademy learner app, great learning online, BYJU"S, UG/PG MOOCs, Vidwan, Facebook live, Skype, Lark, Teams, Uber Confirmation, Ding talk, Slack video calls. Now we will discuss benefits and limitations of online education.

Advantages of online education

There are many benefits of online education although we will discuss some of them.

1. **Fascinating method of the present age:**

At present children have a keen interest in technological instruments. For example, they are more attracted to computers, laptops & mobiles. That's why students are now showing more interest in studying onlines. Whereas before, parents had to force their children to go to school.

2. Higher education courses and various programs:

Maximum colleges are offering online education courses because of the long distance between universities. Like doctoral programs, M-phil programs, & are also conducted online.

3. Flexibility:

Many people have completed their higher education while on the track of the classes and make their own time, As a result, They do not miss the classes which is not possible in offline classes. For this flexibility of online learning people enables to handle their family's responsibilities and continue their studies with comfort.

4. Assessment from home:

For this online facility, The students do not have to be physically present to appear for the assessment. Through a comfortable and seamless online learning platform, teachers can test students, learning ability through test, quizzes or even final examination.

Tests can be done in different formats, such as multiple choices, True or false, feeling in the blanks , sequences, image matching etc. In

this case, with the help of unique software teachers can check whether the students are cheating or not.

5. Meet interesting people:

The teaching process in an institution is executed only by the teachers of that particular institution, but in the case of online studying there are opportunities to learn from different teachers of different institutions.

6. Group communication:

Group communication is the act of sending and receiving messages to multiple members of a group. In the case of online classes this group communication makes the students very creative.

7. Lower costs:

In most cases online classes are low cost. For example teachers can often offer online learning material, pdf etc. So that students do not have to bay text books.

8. Improving Technical skills:

Even a basic online course requires the development of new computer skills. Online classes allow students to learn how to use different devices, document sharing etc. Even various trainings are arranged to make the students proficient in computer.

9. Student activity monitoring:

Students need to log in to their online learning platform to take class online. After they login to their online portal, the system marks their login time as their presence. It help teachers observe students discipline towards their virtual class.

Teachers record student activity during virtual classes and after watching the video again will help to know about the mistakes of the class and student activities.

Disadvantages of online education-

We have analyzed the numerous benefits of online learning. The statistics of 2020 show a huge growth and a lot of enthusiasm for online education. However, educators around the world still acknowledge some of the measure problems plugging online education. The major disadvantages of online learning are discuss below.

1. **Stress and Anxiety:**

There are some common problems faced by students in online learning classes and which they need to solve through proper initiatives for the student's future benefits. Schools that are able to provide engaging online classes along with co-scholastic activities and regular peer to peer interaction have seen better mental health among students. For others, it has become monotonous, which has led to a rise in anxiety and

hyperactivity among children. Students who are confined at home with their parents due to covid-19 may feel more stressed and anxious. It is well known that the school environment influences achievement through peer effects. Being in a classroom and having the opportunity to interact with classmates and friends may be relieves anxiety and stress.

1. **Technical problem:**

Online learning in its entirety is dependent on technological devices and internet, teacher and student with bad internet connection responsible to be denied access to online learning the dependency of online learning on technological equipment was a big challenge for institution teacher and learners. On the effect of covid-19 and online learning on teachers and teaching it is stated that students without dated technological devices might find it hard to meet up with some technical requirement of online learning. Many times student could not download the particular app after several time attempts.

2. **Limited feedback:**

In traditional classroom teachers can give students immediate face-to-face feedback**.** Students who are experiencing problems in the curriculum can solve them directly during the lecture. Getting direct feedback makes the learning process easier richer and more meaningful. Increase the level of motivation of students.

On the other hand in the case of learning, students who have completed regular assessments are dissatisfied with the lack of feedback when they need personal feedback. Traditional methods of responding to students do not always work in an online learning environment and because of this, online education providers are forced to look at alternative methods for responding.

3. **Lack of face to face communication:**

Interaction between a teacher and students is an integral part of the learning process. And the face to face approach is an efficient language learning method because it combines different part including writing , speaking, listening, and reading. This is not possible in online education system, so there is a great lack of communication between teacher and students.

2. **Health issue:**

Online education is very harmful to health. Parents worry about their child health. Because it is unhealthy to seat in front of a computer screen for hours on end. Prolonged exposer to computer or laptop screen can also damage their eye sight. Not only this back problems can occur due to incorrect seating position.

3. **Internet problem:**

We all know that online education is more flexible and easily accessible from anywhere with a good internet connection. But I remote rural areas there are still no good internet connection. Online classes are very problematic for them. Also if the phone or computer is be connected with a good internet connection many important things are missed due to buffering. Also for a good internet connection parents have to spent monthly or annually money which is a problem for poor and middleclass families.

4. **Inconvenient to the computer illiterate people:**

Online classes are very difficult for those people who don't know how to operate a computer or laptop cannot use a mobile. In the case of adult education, Older people who are getting education have difficulty in learning computer.

5. **Expensive:**

You all are have been confused to seeing this disadvantages because we have already said that it costless. But this is expensive those economically weaker students whose parents are unemployed because of Covid-19.Those parents cannot afford a smartphone or computer for their children for online education. In such cases digital learning may be accessible but not easily affordable.

Conclusion-

As a result of Covid-19 School College all business institution, universities experienced shut down all across the world globally, all over the world 1.2 billion children's are out of the classroom and use online platforms to learn. Internet bandwidth is relatively low with lesser access points, and data packages are too costly and incomes of the people are decrease for lockdown. Policy-level intervention is required to improve the situation. Need for developing tools for authentic assessments and timely feedback is found to be another area of study. Making online teaching creative, innovative, interactive, attractive and interesting through use friendly tools is the other area research development. The lesson learnt from the covid-19 pandemic is the teachers and students should be oriented on the use of different online educational platforms. After thecovid-19 pandemic when situation has normalized and schools, universities reopened, normal classes has restarted teacher and student should be encouraged to continue using such online teaching platforms to farther improve the quality, the value of teaching and learning.

Reference-

1. DD news. UGC forms committee to encourage online learning amid lockdown. Retrieved on April 16th-2020 from http://ddnews.gov.in/national/ugc-forms-committee-encourage-online-learning-amid-lockdown.
2. UGC notice, an appeal for inviting ideas/suggestions for "Bharat Padhe Online campaign". Retrieved on April 16th-2020 from https://www.ugc.ac.in.
3. UGC notice LET COVID-19 not stop you from learning ICT initiatives of MHRD and UGC. Retrieved on April 16th-2020 from https://www.ugc.ac.in.
4. UNESCO Distance learning solutions. Retrieved on April 14th-2020 from https://en.unesco.org/covid19/educationresponse.
5. Wiesemes, R. & Wang. R.(2010). Video conferencing for opening class room doors in initial teacher education: Socio cultural process of Mimi king and improvisation. International journal of media, technology and life log learning,6(1):1-15.
6. Daniel, S. J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, 49(2020) 91-96. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3.
7. Wang, C., Cheng, Z., Yue, X. G., & McAleer, M. (2020). Risk management of COVID-19 by universities in China. Journal of Risk and Financial Management, 13(2), 36. https://doi.org/10.3390/jrfm13020036
8. Wang, C., Horby, P. W., Hayden, F. G., & Gao, G. F. (2020). A novel coronavirus outbreak of global health concern. The Lancet, 395(10223), 470-473. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30185-9 Worldometer. (2020). Retrieved on 26 September 2020 from https://www.worldometers.info/coronavirus/
9. Arasaratnam-Smith, L. A., & Northcote, M. (2017). Community in Online Higher Education: Challenges and Opportunities. Electronic Journal of e-Learning, 15(2), 188-198. Retrieved fromhttps://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1141773. Pdf

M. N. Roy's Philosophical Reflection on Humanism

Kalpita Nandi
Assistant Professor of Philosophy
Krishnagar Women's College

Abstract: Humanism is embedded with social, moral, political and economic aspects of human life. Here I am going to discuss how Manabendra Nath Roy envisaged his political and social ideas towards humanism? How is it possible to overcome from most strife and uncertain situation in today's world by M N Roy's socio-political view of life? In this discussion I also introduce his Humanistic approach towards common people. How his views help us to set human destiny and therefore its manifestation? All these queries will be discussed in my small endeavor that will be helps us to know his pertinent view of Philosophy of life.
Key words: humanism, nationalism, freedom, truth, decolonization

Now let us concentrate on the great revolutionary Indian thinker's thought – Manabendra Nath Roy. He can be rightly regarded as one of the forerunner of Indian socialist thought. While he is better known as a political philosopher, yet his social and economic content of ideas are no less important. His contribution occupied leading positions in the great movements of Nationalism, Communalism and Humanism.[1] His biography can be divided in three stages – National Anarchism, Marxism and New Humanism/Radical Humanism. Actually this is a continuum journey of thought process. Throughout his life, he had a pursued the quest for human freedom and truth. For him truth and freedom were not mere the ideas to be proposed but they were the ultimate realities of human life. He said that "without reading Marxism he began his political life at the age of 14."[2] Without knowing about proletariat, class struggle, communism – people of India only had an urge to revolt against the intolerable condition of life. So need of a change was the call of hour, motivate people towards a new life embedded with sustainable condition. So human destiny decided by the human being himself based on their urge. Hence mass is the central force of his own social, political thoughts. Actually M. N. Roy's thought regarding man and his revolutionary sentiment shaped during British rule and their strategy of discrimination and exploitation in India.

Decolonization, according to Roy, arises due to the crisis in the Capitalism and Imperialism he observed that Imperialism struggle with

its inner contradiction force, by encouraging partial industrialization of colonial country. British imperialism had changed its strategy of exploitation in India after World War II. In this strategically plan, according to Roy, "colonial possessions represents labor,"[3] and we all know that "more labor more profit" was the key policy of colonial success at that time. The strategy was shifted from land to labor because "land as a means of production was exhausted. So British Imperialism lost their profitable field and the crisis of existence arises. They lost their exploitative grip over the people of India. This necessitated the introduction of other means of production other than land. This was the process of Decolonization according to Roy. He challenged that British rule in India was not a legally established rule but get a chance in a disguise way and therefore there was no illegalness to overthrown such a rule that imposed on the mass which was not chosen. And there was no other way than revolt against such exploitative and oppressed rule from the people and of the people of India. So a revolutionary struggle for freedom was justified by M. N. Roy to preserve existence of men as men not as a means of profit. In this way a philanthropy attitude reflects in M. N. Roy's thought.

Roy has his own conviction and originality of thought. Yet he always respected the points of view of others. He advocated a progressive approach to socio-economic reform based on the application of modern science and technology. His faith in science lays stress on the low-governed universe. And he believed that the universe is rational which had a crucial influence in his philosophy of man. Actually he mainly tried to rescue rationalism and ethics from devastating consequences of skepticism. A twentieth century Renaissance based on radical vision about human being is the need of contemporary world according to him. This world is dissemination among the people of certain values and attitudes, followed by the setting up of appropriate political, economic and social institution through which those values and attitudes may be expressed. This twentieth century Renaissance asserts that individual freedom is the basic value of personal and social life. Being derived from the biological urge for existence, the urge to freedom – the urge to live a life in which the human potentialities of the individual would be fully developed is inherent in human nature and is shared consciously or unconsciously by all human beings. According to Roy reason enables individual to acquire knowledge, to develop self-reliance, to appreciate the necessity of moral norms in social life, and to secure freedom in cooperation with fellow beings. He always advocates moral impulses of

human beings, and the morality does not require the sanction of religious faith so that moral standards in a society grow with the growth of reason. So individual freedom, morality is the central part of human being that naturally insists to revolt against all the superstitions determinism, oppression and dictatorship. His social human centric, political approach based on the scientifically derived values of freedom, rationalism and secular morality. And this is required by the entire contemporary world for human resurgence. So the democratic life – freedom, equality, and fraternity should be wrapped with humanistic values. And all these values must be realized through all the political, economic and social institutions.

He also advocates the conscious faculty of human being with their dignity, moral sensitivity and conviction. This quality actually helps an individual himself to make their own future. So the objective of his humanist philosophy is all about to help others to help themselves. Instead of class appeal he had very much faith on individual moral appeal. Class appeals are primarily based on the economic gains according to him. So to avail such economic gain moral justification must be needed. For him moral appeal is more powerful than class appeal. For him a moral appeal is also necessary in dealing with caste or communal. That's why Roy criticized nationalism for breeding class or racial hatred and biasness. Although Roy supported the ideal of Internationalism in order to bring happy, peaceful and harmonized relation in the universe. So his concept of internationalism is very much conflicting with nationalism.

According to him individual is prior than society and individual freedom must have priority over social organization. So there should not any compulsion and external force on individual conviction and moral sense. He thought that concentrated power of a state makes people helpless to fulfill all practical purpose. "People's power" is highly appreciated in his conception of man and the philosophy of humanism in general. With the increase of people's power state power will be subordinated, and under the control of mass power. He wanted to construct a society where no obstacle remains in the way of progress and development of human personality. By the progress and development of human personality Roy wanted to revive faith in ma regarding his potentialities. Any attempt to promote social reconstruction, economic welfare and political liberty – all cases must begin with man. "Man is the measure of his own world"[4] – according to Roy. By developing individual intellectual faculties and moral values he can secure a better

life for himself. So from his philosophy a kind of positive value entails. His humanistic approach secures that "man is to be restored to his proper place of primacy." Roy in his book Reason, Romanticism and Revolution said that "man must be regarded as the archetype of society, because the potentiality of evolving entire social patterns is inherent in every individual." Therefore he can discharge social responsibilities without a surrounding liberty."[5]

In the Third Thesis he mentioned that "the position of the individual is the measure of the progressive and liberating significance of any collective effect or social organization."[6] In the Thesis Nineteen he talked about the ideal of Democracy. In this Thesis Roy said that, "democracy will be attained through the collective efforts of spiritual free men united in the determination of creating a world of freedom."[7] So it is very interesting to note that Roy emphasized on the union of spiritually free men that helps individuals to leads unite, peaceful and harmonized life with other fellow beings. Although he considered that the main purpose of human life is to develop the human personality with moral, rational faculty. And state or nation must serve to fulfill the basic purpose of human life. Roy's view much related with political and social than spiritualism.

M. N. Roy gives values to the human convictions and his envision promotes a new form of philosophy that values human dignity by recognizing their moral and rational faculty. As a revolutionary thinker his thought covers the philosophy of life by admitting human existence. Roy goes with rationality to achieve the human development with the social and political freedom. He became a great admirer of rational faculty of human being. We can say that rationality entails morality and vice versa.

I may conclude with the note that Roy's humanist thought stands for the attainment for human development. As a result of this a free, rationalized, moral and social life would emerge upon earth, a life characterized by unity, peace and harmony. His view offered a new remedy to the problems of relation regarding – political, economic, social phenomena. According to Roy, Rationality can subordinate man's selfishness to enlightened self interest, which is a social virtue. With proper education man can learn what is real and then by using rational faculty improve moral senses hence developed human personality. And the developed personality of man helps for the manifestation of human purpose on the earth. So the application of his thought makes an inspiration that allow conquering the world with the sense of morality and

rationality. Therefore the objective of his thought attached a great importance to the objective of world peace, unity, brotherhood and harmony. His positive philanthropic philosophy entails a hope that lies in human endeavor.

References:

1. Tarkunde, V.M., *Radical Humanism,* Ajanta Publication, New Delhi, 1983.
2. Bharathi, K.S., *The Political Thought of M. N. Roy,* Encyclopaedia of Eminent Thinkers,
   Vol. 10, Concept Publishing Company, New Delhi, 1998. P – 13.
3. Ibid., p- 19.
4. Ibid.
5. Ibid., p- 43
6. Ibid., p- 35
7. Ibid., p- 40

Bibliography:

1. Lal, Basant Kumar, *Contemporary Indian Philosophy*, Motilal Banarsidas Publishers, Delhi, 2004.
2. Tarkunde, V.M., *Radical Humanism,* Ajanta Publication, New Delhi, 1983.
3. Bharathi, K.S., *The Political Thought of M. N. Roy*, Encyclopaedia of Eminent Thinkers, Vol. 10, Concept Publishing Company, New Delhi, 1998.
4. Bhattacharya, Dr. Samarendra & Mukhopadhyay, Goutam, *Samakalin Bharatiya Darshan*, Book Syndicate Pvt. Limited, Kolkata, 2021 (Bengali Book)
5. Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. 1, George Allen & Unwin LTD, New York, 1977.

Comparison of Cyber etiquette and its importance to the economic development of India

Trisha Paul
Research Scholar, Mahatma Gandhi University

Abstract: In India, the number of internet users is rapidly increasing. However, many internet users are not aware of cyber etiquette,which could pose a serious threat to a democratic and secular society; We often see social media posts triggering violent strikes in a particular area. So, a common question arises whether we Indians are aware of cyber etiquette. India lost billions every year due to violence, and riots which were triggered by social media.

Cyber etiquette is the behaviour which we should show in the world of the internet. If people show proper cyber etiquette, many violence, and riots can be stopped.

In this study, we will compare cyber etiquette among people in the Dooars area. We will discuss the behaviours of cyber etiquette. The importance of cyber etiquette to the economic development of India will also be discussed in this study.

Keywords: Cyber etiquette, economic, economic development

Introduction:

Internet users are increasing rapidly in India. Almost 50% of its population use the internet which is a humongous number. But, a large portion of internet users is not aware of cyber etiquette. It might become very dangerous for a democratic and secular country. Very often we see that a social media post triggers violence in a certain area. So, the government force to shut down the internet to control the violence. As a result, India losses billions every year.

India is the 6th largest economy in the world. Now India is the fastest growing economy in the world. When India loses billions every year due to violence and internet ban, it hampers India's economy.

Conceptual framework:

Cyber etiquette: Cyber etiquette is a certain code of behaviour or conduct and manners applied while we use the internet technology in everyday scenarios, including social media, online classes, business email, etc.

Economic: According to Alfred Marshall, "Political economy or economics is a study of mankind in the ordinary business of life, it examines that part of individual and social action which is most closely

connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being."

Economic development: The meaning of economic development of a country is the increase in national income in terms of money. In the words of Prof. C.L. Anand, "Economic development means the proportion of national income that is devoted to physical investment".

Objectives:

- To study the cyber etiquette among male and female people of the Dooars area
- To study the cyber etiquette among the people living in the joint and the nuclear family of the Dooars area
- To study the cyber etiquette among the people living in the municipality and panchayat of the Dooars area
- To study the behaviours of cyber etiquette
- To study the importance of cyber etiquette to the economic development of India

Hypothesis:

- **H_0 1:** There is no significant difference in the cyber etiquette among male and female people in the Dooars area.
- **H_0 2:** There is no significant difference in the cyber etiquette among the people living in the joint and the nuclear family of the Dooars area.
- **H_0 3:** There is no significant difference in the cyber etiquette among the people living in the municipality and panchayat of the Dooars area.

Methodology: In research methodology, the process of conducting a study is studied. It is primarily a method of systematically solving the research problem. For a smooth research process, it is important that the researcher knows not only the research procedures but also the methodology, which includes the substantive steps that are generally followed by a researcher in analysing a research problem.

Variables: A variable is a thing which varies with time. Here cyber etiquette, gender, family type and locality are taken as variables.

Research method: The research method can be defined as the method by which the researcher conducted the study. this study has been conducted using a descriptive survey method.

Sampling: Here the samples are collected through the purposive sampling method.

Sample: A total of 172 samples are collected from the Dooars area to conduct the study.

Gender	Sample size
Male	50
Female	122
Total	172

Sample distribution based on Gender

Family type	Sample size
Join	59
Nuclear	113
Total	172

Sample distribution based on the Family type

Locality	Sample size
Municipality	59
Panchayat	113
Total	172

Sample distribution based on Locality

Data collection tools: A standardised tool was used for conducting the study. The Cyber Etiquette Scale, developed by DrThiyagu. K. and Mr Santhosh. T. was used to conduct the study.

Data analysis tools: For data analysis T-test was used.

Results and Interpretations:

- **H_0 1:** There is no significant difference in the cyber etiquette among male and female people in the Dooars area.

Table: Mean, Standard deviation, Standard error of the mean and significant difference inthe cyber etiquette among male and female people in the Dooars area.

Category	Sample Size	Mean value	S.D value	Standard error of the mean	T-value	Significant
Male	50	157	18.14	2.57	2.51	S*
Female	122	163.93	11.47	1.04		

Source: Calculated by researcher

S*= Significant at the 5% levelbut in the 1% level

df= $N_1 + N_2 - 2$= 50+122–2 = 170

(According to the t table)

t= 1.996 at 5% significant level

t= 2.60 at 1% significant level

Interpretation: Here the value of the T ratio is 2.51 which is greater than 1.996 at the 5% significant level but less than 2.60 at the 1% significant level. So, the null hypothesis is rejected at the 5% level but accepted at the1% significant level.

- **H_0 2:**There is no significant difference in the cyber etiquette among the people living in the join and the nuclear family of the Dooars area.

Table: Mean, Standard deviation, Standard error of the mean and significant difference in the cyber etiquette among the people living in the join and the nuclear family of the Dooars area.

Category	Sample Size	Mean value	S.D value	Standard error of the mean	T-value	Significant
Joint family	59	159.83	15.66	2.04	1.33	NS
Nuclear Family	113	163	13.07	1.23		

Source: Calculated by researcher

S= Not Significant at 5% and 1% level

df= $N_1 + N_2 - 2$= 59+113−2 = 170

(According to the t table)

t= 1.98 at 5% significant level

t= 2.61 at 1% significant level

Interpretation: Here the value of the T ratio is 1.33 which is less than 1.98 at the 5% significant level and also less than 2.61 at the 1% significant level. So, the null hypothesis is accepted at the 5% as well as 1% significant levels.

- **H_0 3:**There is no significant difference in the cyber etiquette among the people living in the municipality and panchayat of the Dooars area.

Table: Mean, Standard deviation, Standard error of the mean and significant difference in the cyber etiquette among the people living in the municipality and panchayat of the Dooars area.

Category	Sample Size	Mean value	S.D value	Standard error of the mean	T-value	Significant
Municipality	59	166.66	10.85	1.41	3.64	S
Panchayat	113	159.44	14.91	1.40		

Source: Calculated by researcher

S= Significant at 5% and 1% level
df= $N_1 + N_2 - 2$= 59+113—2 = 170
(According to the t table)
t= 1.98 at 5% significant level
t= 2.61 at 1% significant level
Interpretation: Here the value of the T ratio is 3.64 which is greater than 1.98 at the 5% significant level and also greater than 2.61 at the 1% significant level. So, the null hypothesis is rejected at the 5% as well as the 1% significant levels.
Findings:

- There is a significant difference in the cyber etiquette among male and female people in the Dooars area at the 5% significant level, but not at the 1% significant level. Out of 50 male samples, 34 show high and 16 show moderate cyber etiquette. Out of 122 female samples, 109 show high and 13 show moderate cyber etiquette.

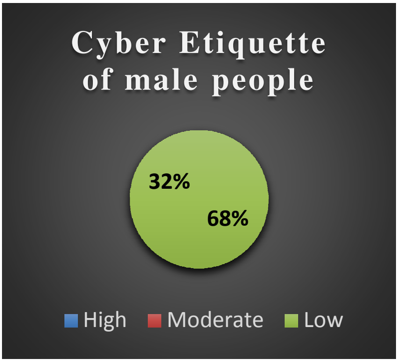

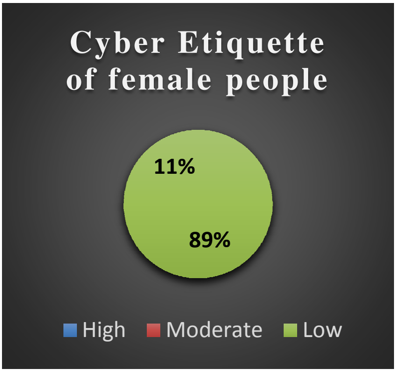

- There is no significant difference in the cyber etiquette among the people living in the join and the nuclear family of the Dooars area at the 5% and 1% significant levels. Out of 59 people living in a joint family, 46 show high and 13 show moderate cyber etiquette. Out of 113 people living in a nuclear family, 97 show high and 16 show moderate cyber etiquette.

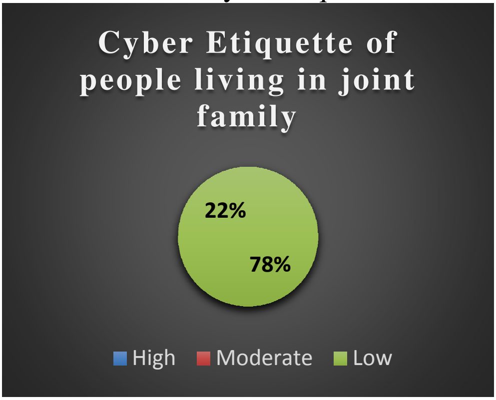

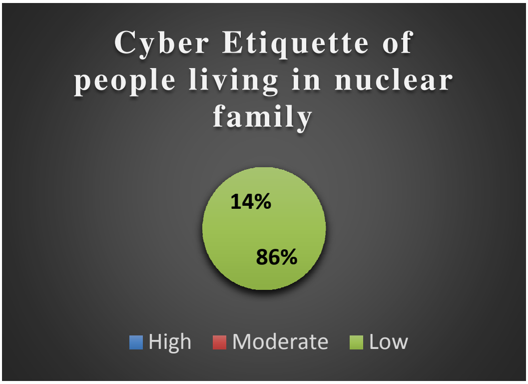

- There is a significant difference in the cyber etiquette among the people living in the municipality and panchayat of the Dooars area at the 5% and 1% significant levels. Out of 59 people living in municipality area, 55 show high and 4 show moderate cyber etiquette. Out of 113 people living in panchayat area, 88 show high and 25 show moderate cyber etiquette.

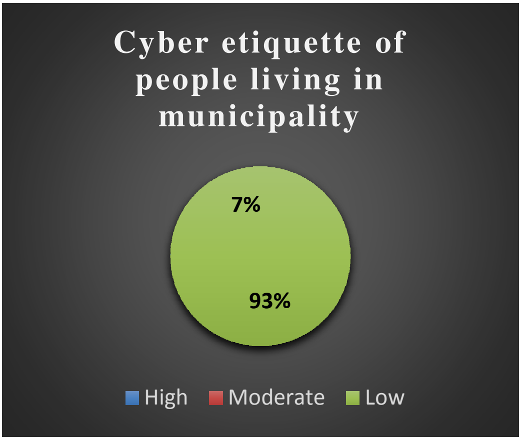

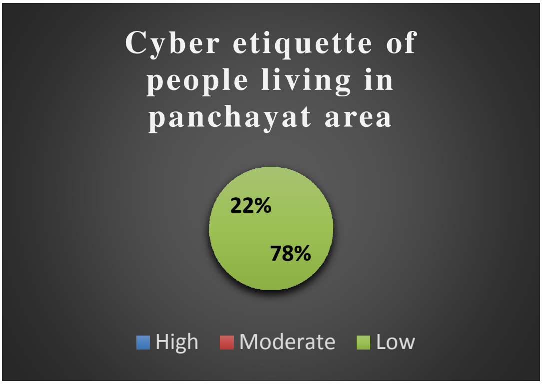

Delimitations of the Study:

- Only 172 samples from Coochbehar and Alipurduar districts are collected to conduct the study.
- The study is restricted to the variables cyber etiquette, gender, family type and locality.
- Data is collected through google form only.

Behaviours of cyber etiquette:

- **Respect Everyone's Privacy:**As one of the basic rules of Cyber Etiquette, you should also keep in mind that anything you do on the internet stays forever and you should never invade another person's privacy, just as you wouldn't want someone to invade your privacy; so, keep everyone's privacy in mind when taking online classes, attending meetings or scrolling through social media websites. Do not breach anyone's location, password, or private conversation while taking classes online. Small talk and

chatting are usually ignored in a four-walled classroom, but an online class could be difficult to manage if students take their private conversations to chats and make comments like that.

- **Control Sarcasm:** Sarcasm is difficult to convey online and is often misunderstood; You may be a humorous person in real life, but when you communicate digitally, a joke can take on a serious tone that could be offensive; Online classrooms include students from many cultures, so keep your jokes and sarcasm to a minimal.
- **Share Accurate Information:** In our hi-tech age, we are flooded with information without any reliable sources. Make sure you check the accuracy of anything you share on online platforms, and groups and send only relevant, factual information.
- **Read carefully before responding:** It is equally important to speak clearly so that others can understand you and the point you are trying to make, and it is also important to read clearly so that you understand what is being said. Many people have a tendency to respond to a message without even reading it and fully understanding it. Following this simple cyber etiquette can help you avoid heated arguments online if you don't understand what's going on.
- **Don't abuse your power:** There are those who have more power than others on the Internet, as in real life. Moderators in forums, experts in companies, or system administrators have more power than others. You should not spy on colleagues or chat with participants just because you can. For instance, system administrators should never read private emails.
- **Do not give out personal information:** Keep your child's passwords, name, address and telephone number confidential under all circumstances. Keep the name of their school or club confidential as well. Social media and identity theft have made it vital that personal information be kept confidential.

Importance of cyber etiquette to the economic growth of India:

People use the internet without proper cyber etiquette. As a result, hate speeches, and communal comments spread on social media very easily. Sometimes these become the reasons for riots. To control the riots,the governmentneed to shut down the internet. India lost $2.8 billion to internet shutdowns in 2020. According to Top10VPN's global Cost of Internet Shutdowns report, India lost $2.8 billion during the world's biggest internet blackouts in 2020.Debit cards and credit cards are used by criminals

to withdraw money from victims' bank accounts in an unauthorized manner; ATM cards are always used in this type of cybercrime. People become victims of online fraud, without proper knowledge of online banking, people are cheated.There have been a number of sectors that have seen huge technological innovations in the last two decades, including banking, healthcare, IT, agriculture, logistics, and state social welfare policies. ICRIER (Indian Council for Research on International Economic Relations) and Broadband India Forum reported that the internet contributed 5.6% to India's GDP in 2015-16. By 2020, this contribution had grown to 16% of which 8% was driven by apps. There was an estimated $537.4 billion contribution to India's GDP from the Internet economy in 2020, of which apps contributed $270.9 billion; 70% of mobile traffic was generated by apps.

Conclusion:

The study shows that we need to spread awareness in rural areas. The rural population are still not aware of cyber etiquette. For a democratic and secular country like India, it is important to educate people about privacy and confidentiality, piracy and plagiarism, and integrity and politeness. When we share anything on social media or the internet, we need to think about how we could keep the sense of brotherhood in this country.The governmentneeds to come up with strict laws and initiatives which will prevent such issues. A country is as strong as it is united internally.

References

Edu, L. (2021, July 2). *Cyber Etiquette: 11 Rules of Online Etiquette - Leverage Edu*. Leverage Edu; Leverage Edu. https://leverageedu.com/blog/cyber-etiquette/

How India lost $2.8 billion to internet shutdowns in 2020 - Times of India. (2021, January 6). The Times of India; Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/how-india-lost-2-8-billion-to-internet-shutdowns-in-2020/articleshow/80127719.cms

Narnolia, N. (n.d.). *Cyber Crime In India: An Overview*. Legal Service India - Law, Lawyers and Legal Resources. Retrieved July 7, 2022, from https://www.legalserviceindia.com/legal/article-4998-cyber-crime-in-india-an-overview.html

Samuel, S. (2016). *Comprehensive Study of Education* (p. 478,479). Prentice Hall of India.

Sikdar, A. (2021, March 10). *The economic impact of Internet in India*. Times of India Blog. https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/economic-update/the-economic-impact-of-internet-in-india/

What is Netiquette? 20 rules Internet Etiquette Rules. (2022, April 6). Www.Kaspersky.Com; Kaspersky. https://www.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/what-is-netiquette

Outlier India? Understanding the Classical Agrarian Question and Agrarian Transition in India through the Prism of Caste

Sohini Jha
Research Scholar
Dept. of History
Visva Bharati University

Abstract: This essay tries to delineate the impact of the advent of Capitalism in Indian agriculture after independence and how it transformed Indian agriculture, through its multi-diverse effects on different layers of Indian economy, society, politics, culture, etc. This we will analyse through the perspective of Caste and we will explore how the lower strata of our society such as Dalits and OBCs, while manoeuvring the capitalist agriculture created their own space to free themselves from the clutches of caste hierarchical oppression and on the other handopened up newer economic sectors to engage and enhance their position in the contemporary socio-economic and political sphere. Apart from its liberating effects, this paper also investigates how Capitalism gave rise to a newer form of bondages and context-specific peculiarities in the prevailing Indian society.

Keywords: Classical Agrarian Question, Green Revolution, Caste, Dalits, OBCs, post-independence, etc.

Discussion:

The whole debatearoundwhat is known as the "Classical Agrarian Question" finds its origin when Russian thinkers, such as V.I. Lenin, A.V. Chayanov, Karl Kautsky, Nikolai Bukharin, and so on, engaged with capitalist development in Russian agriculture in the late nineteenthcentury as the transition from feudal mode of production to capitalistic mode of production was thought to be inevitable. This leads us to three broader questions:

- First, in which way capitalism could induce development in agriculture by way of reducing or eradicating backwardness in agriculture and by increasing the productivity levels without hampering the peasant economy? Or, in other words, how could the baby of capitalist development be retained in agriculture while throwing out the bathwater?
- Second, what will be the nature of this agrariantransition that will take place because of the intervention of capitalism in agriculture? And

- Third, while facing the transition what kind of agrarian and political struggles wouldcome up?

The foregoing posers are, of course, closely connected. But in the Indian case, while the agrarian transition was going on, additional and powerful factors or variables — for instance, caste, gender, filial bonding, family labour and so on — affect the whole process and they extend the 'Classical Agrarian Question' by adding new, and sometimes unique, dimensions to it.

In India, capitalism penetrated into Indian agriculture through the Green Revolution in the mid-1960s. The latter transformed Indian agriculture, though it had its own detrimental effects, such as the rise of rich farmers as a class with definite class interests as well as a distinct political identity. In the Indian caste system those who belong to the lower strata like Dalits and OBCs, for them capitalist agriculture creates a space to free themselves from the clutches of caste hierarchical oppression and to open up newer economic sectors to engage and enhance their position in society. These capitalist interventions brought about by the Green Revolution gave, for example, monetary affluence to the Jats, a populous backward caste in western UP, who then positioned themselves against the traditional dominant caste of the Thakurs. In Gujarat, we see how non-agricultural pastoral groups, like Bharwads, Rabaris, etc., and Dalit castes, like Vaghris, Vankars, etc., took spectacular advantages of capitalist agriculture and other developments related to this. While in Coimbatore and Tiruppur in Tamil Nadu, Gounder peasant-workers from the OBC category creates a regional capitalism by diversifying their economic activities from agriculture, livestock, and plantation to various industries. In Andhra Pradesh and Raichur Doab, the Munnuru Kapus, a community belonging to the backward class, and the Madigas, an untouchable community, shifted to cottonseed production to lose their shackles of oppression from the upper caste Reddys and Kammas. For these Dalit and OBC communities, exploitation of their own family labour by themselves and their familial relations became very important for their economic betterment/improvement. With this prime argument in mind, we need to know about the populist agrarian struggles of the post-Green Revolution era and about theeffects these movements had on the contemporary caste-class structure.

Before I proceed towards the case studies by Vinay Gidwani, Sarhad Chari, Akhil Gupta, and Preeti Ramamurthy to establish my

whole argument let us now look at the debate of agrarian Marxists on the Classical Agrarian Question in a quick glance.

I have already mentioned the Classical Agrarian Question put forward by the agrarian Marxists. Let us now see the debate between Lenin and Chayanov on the "Agrarian Question" of Russia. Lenin analysed in his famous book *The Development of Capitalism in Russia* (1899) what kind of model should Russia adopt to usecapitalism for agricultural development. He classified capitalism as "good capitalism" — i.e. the US model, where capitalism spreads from below through the petty producers — and "bad capitalism" — i.e. the Prussian model where capitalism spreads from the above through landlords called '*Junkers*'. Lenin's 'American Model' postulated a situation in which capitalism developed within the peasant sector through a process of socio-economic differentiation. Lenin identifies that there are three agrarian classes that have emerged in Russia: the rich, the middle, and the poor. These middle peasants aspire to be rich but,on many occasions,their economic position declines into poverty. Lenin further held that during the shift or transition the rich class is likely to transform into the agrarian capitalist class, while the middle peasants would become tenants and the poor will become the proletariat. Lenin wanted the state to intervene in agriculture as the state can play an important role to create the peasant economy.

Chayanov, on the other hand, tried to understand that there was some sort of demographic cycle that took place among the peasants, as postulated in his *consumption-labour-balance principle*. This principle holds that "labour will increase until it meets — that is, 'balances' — the needs —that is, 'consumption' — of the household." Like Lenin, Chayanov tooargues that the peasant economy is important for the development of Russia but he does not think that the state's intervention is beneficial or even necessary for the development of the peasant economy. Family labour is important but along with family labour he also proposes the idea of co-operative farming and bringing people together so that it will reduce the role of the capitalist classes. This will also lead to a reduction in the cost of cultivation. According to Chayanov, an independent class could emerge through co-operative farming and this class would also be technically superior to the capitalist classes as they would share knowledge among themselves. But Lenin criticises this idea by saying that people are not going to stay for a long time together because there is a tendency of upward mobility from one class to another. Even if one were tointroduce a co-operative model, then also one could

not sure for how long families will stay intact in co-operative groups. To quote V.I. Lenin at length:

> "Our literature frequently contains too stereotyped an understanding of the theoretical proposition that capitalism requires the free, landless worker…[C]apitalism penetrates into agriculture particularly slowly and in extremely varied forms. The allotment-holding rural worker…assumes different forms in different countries: the English cottager is not the same as the small-holding peasant of France or the Rhine provinces, and the latter again is not the same as the Knecht in Prussia. Each of these bears traces of a specific agrarian system of a specific history of agrarian relations".[i]

So, in India too, the Classical Agrarian Question must express itself through context-specific forms and newer modalities. This is further complicated by the fact that India is geographically, linguistically, ethnically, religiously, and, therefore, culturally greatly diverse.

Vinay Gidwani in his book *Capital, Interrupted: Agrarian Development and the Politics of Work in India*[ii] gives us a case study of Gujarat's Matar Taluka, where the Mahi Right-Bank Canal (MRBC) project of the late 1960s was one of the earliest major surface-irrigation schemes commissioned in post-colonial Gujarat and which transformed the agrarian scene of the Taluka. The agrarian transformation through the introduction of irrigation canals became a good opportunity to economically and socially uplift the non-agricultural pastoral groups like the Bharwads, Rabaris, and Dalits like Vaghris and Vankars. Canal irrigation changed the cropping pattern of Matar Taluka drastically. This is witnessed in the dramatic switch from *bajra* (Millet), *tuver* (pigeon pea), *chana* (chickpea), and other so-called inferior cereals to a quasi-cash crop like paddy. Since paddy straw, which is a by-product of cultivating paddy, is a nutritive source of dry fodder, Bharwads, and Rabaris — relatively lower castes of pastoralists, who previously had to make a living by tending the cattle of large Patel landlords in exchange for minimal payment in wheat from their Patel patrons — could now own cows themselves at relatively lower maintenance costs. As a result, these pastoralists could now sell the milk of their cows to the Anand Milk-producers Union Limited (AMUL), a quasi-state co-operative body, which, in its turn, sold the same milk to villages spread all across Kheda. With this change in their mode of earning a living (even though their

occupational character did not have to change), the Bharwad and Rabari households achieved economic parity with their patrons in several villages of Matar Taluka and in some places so much as supplanted them. The reversing dynamics of the economic conditions of Patels and Bharwads since the arrival of canal irrigation to Matar Taluka are clearly observed in the land purchase and sale records maintained at the Sub-District Registrar's Office in Matar Town. Apart from this, the Bharwads also invested their surplus in money-lending by which we can assume that they diversified their occupational portfolio and minimized risks.

Vaghris or "tribe of netters" were a marginalized caste group who traditionally made their living as fowlers, hunters, sellers of *datuns* (or fibrous twigs used as toothbrushes), petty cultivators, and also were reputed to be expert distillers of (illicit) liquor. They prospered so much that their economic prominence could no longer be denied. They began to take lands on lease to cultivate cash crops like tomato and melon, which required heavy inputs of fertilizers and pesticides. Vaghris defrayed the enormous risk that accompanied their cultivation of these cash crops by minimizing their use of hired labour. They depended entirely on family labour and exchange labour from members of their community — in short, risk management via mobilization of labour surpluses across space. In one instance, as Gidwani mentions, even the wife's parents had traveled from a considerable distance from the village of Vaso to assist with cultivation. This is quite surprising, given the patriarchal taboos associated with working for one's daughter's husband's family in Indian society.

Vankars are a widespread Dalit community in Gujarat. They were traditionally weavers by occupation but also worked as paddy workers under Patel and Rajput castes. They were renowned for having nimble fingers that allowed them to transplant rice saplings and weed fields faster and more expertly than workers from other labouring groups. These Vankars improved their lot and thereby tried to free themselves from the caste oppression of the Patels. Gidwani interviewed twenty-three Vankar families out of 353 households of Vankars in the village of Shamli. There we can see that though older-generation Vankars still displayed deference towards upper-caste groups, the younger-generation Vankars openly defied the prevalent caste hierarchy. The attire and demeanour of the latter reflect their hostility to caste norms as they are better dressed than their counterparts; they refuse to tolerate the use of the term *dhed*, an abusive term that upper castes frequently employed in conversation to

describe the Vankars. Now, most of the Vankar children go outside for educational purposes and they have government jobs too.

In Gujarat, capital has also penetrated the village economy through state-led dairy development initiatives. In conjunction with the Integrated Rural Development Programme (IRDP), which provides subsidized loans for the acquisition of productive assets including livestock to marginal farmers and landless workers, it has opened up alternative sources of income for labouring households — of lower caste groups subservient to the landed middle class, particularly the Patels. With income from milk sales, now labouring households like Baraiya and Tadbda Koli sub-castes opted to withdraw, at least partially, from the labour market. Gidwani shows us that Patel farmers bitterly complain that 'their laborers' had become more impertinent and unreliable after the advent of the dairy.

So, here we can see the development machine has connected these lower caste groups to previously unimagined possibilities. By using these possibilities lower-caste communities tried to uplift themselves in the social hierarchy. In Matar Taluk, Gujarat irrigation combined with the dairy programme has unleashed forces that are recoding previously undisputed social relations and producing disquiets among the rural elite.

In Sharad Chari's work *Fraternal Capital: Peasant-Workers, Self-Made Men, and Globalization in Provincial India*[iii], Gounder Peasant Workers, an OBC group from Coimbatore and Tiruppur in Tamil Nadu made their fortune when capitalism entered that region. These Gounders, by using their family labour and caste bonding, played the central role in the development of 'regional capitalism'. Within the two decades of the 1930s and 1940s, these Gounders established themselves as middle peasants by virtue of their family labour and community ties. Here we can find that three classes of labour emerged: first, the Gounders themselves, who oversaw the whole agricultural process under other fellow Gounders; the second class of labour came from the Dalits who worked as manual labour under the Gounders; and the third class who worked as household labourers of Gounder families. These Gounders were not solely attached to agricultural work. They diversified their economic activity into the small automobile industry, selling Cambodian cotton, and maintaining livestock. As such, when in crisis in one of these sectors, they could fall back on their other economic pursuits. This fall-back mechanism was further strengthened through regional association with fellow-Gounders by supporting and assisting each other in times of crisis.

The role of Gounder women among Gounders was also significant as they were involved in taking important decisions, in looking after day-to-day economic activities, and handling payment-related issues towards other Gounders and Dalits. The whole livestock-related activities were largely dealt by the Gounder women which were a handsome economic source for the Gounders. The Gounders acquired a rational commercial behaviour of a kind that is uncommon among other different lower castes in India. The way the Gounders rationally and commercially used labour, systematically changed the crops to reduce risks in agriculture and lent as well as borrowed money from each other, made them different from their counterparts in other caste groups.

So, in Coimbatore and Tiruppur, with the minimal interference of the state, capitalism came from within not from outside through their patrilineal connections, gender relations, and caste connections. It has to be noted that just because caste is playing a major role in developing capitalism it does not mean that the relation of production is semi-feudal. The nature of capitalism seen in this context cannot be described as semi-feudal, even though the whole idea of capitalism was very much monitored and regulated by the Gounder caste structure.

In *Postcolonial Developments: Agriculture in the Making of Modern India*[iv], Akhil Gupta brought forth the predominating post-Green Revolution agrarian populism, which became an important entry point into contemporary politics. Through the Green Revolution strategy, important inputs such as high-yielding varieties of seeds (particularly, paddy and wheat), fertilizers and pesticides as well as energized well, canals, and lift irrigation facilities were brought to the doorsteps of the cultivating households in rural India. Though these inputs were supplied at state-subsidized rates, still they required considerable capital investment. Inequalities increased within regions because larger farmers were in a better position to take advantage of these new technologies. Now, while the cost of cultivation increased, the small and marginal farmers were unable to surmount the cost difficulties and ended up giving their land to rich landlords. So, here we find a form of ‘reverse tenancy’ in operation that runs counter to the formulations of the Classical Agrarian Question.

In Western UP, the jats were originally a backward class who benefitted from the Green Revolution and now stood against the social authority of the traditionally dominant upper caste of the Thakurs and against the state machinery. In other surplus-producing states like Punjab, Haryana, and Maharashtra challenge came in the form of farmers’ efforts

to construct a counter-hegemonic bloc that employed the populist discourse of development. In western UP the *Bharatiya Kisan Union* (BKU) under *Choudhary* Mahendra Singh Tikait's leadership and in Maharashtra, the *Shetkari Sanghatana* under Sharad Anantrao Joshi's leadership mobilized the farmers, focusing primarily on the growing disparities between rural-agrarian 'Bharat' and urban-industrial 'India' and issues such as fair remunerative prices for crops, reduction in electricity/canal water charges, and so on.

In the article "Rearticulating Caste: The Global Cottonseed Commodity Chain and the Paradox of Smallholder Capitalism in South India"[v],Preeti Ramamurthy surveyed the village of Panipaadu, Andhra Pradesh, where 85 percent of the population belongs to Munnuru Kapu, a backward class, and the untouchable Madigas. Both of these caste groups are occupationally smallholders.Only one percent of the population in Panipaadu belongs to the Reddys and Kammas—the richest landowners in the region. Here the bottom 85 percent worked for the top one percent of the upper-caste Reddys and Kammas and were under extreme oppression thereby. But, when international seed companies like Monsanto and Dow, and Bayer with other corporations entered this region and they encouraged these lower-caste groups to grow cottonseeds,these lower-caste groupsof the Madigas and the Munnuru Kapus started to empower themselvesby working for themselves rather than for the upper castes.By virtue of independently growing cottonseeds, the Dalit communities developed self-respect, social, economic dignity and in the end, got a chance to move upward in contemporary society.
While the above is true, this process of integration into a global network of cottonseed growing also meant for these Dalit communities longer and harder hours of work as well as a cultural-social dislocation which filled them with a sense of perplexity even as their economic lot improved. They experienced this perplexity in terms of a sense of anomie wherein they were no longer in control of every aspect of their profession and this spilled over into their social and private life. In other words, these Dalit groupsfreed themselves from the one set of social relations only to fall into another set of social relationships with the seed agents, primarily the Reddy women, who now came to control the economic activities of these Dalit communities. The work pressure of growing seeds was very high which alienated them from the society and the Madigas and Munnuru Kapus lost all their free time to socialise. This resulted, predictably, in a breakdown of their social relations.

To conclude, while discussing the Classical Agrarian Question in the Indian context, we saw from the foregoing case studies,that though capitalism did penetrate the agrarian world of the subcontinent,it had powerful context-specific peculiarities attending them. In most of these cases, it seems that agrarian capitalism had some liberating effects for the lower castes, although often it also meant newer forms of bondage, as is evident from Preeti Ramamurthy's case study. Another important aspect ishow these lower-caste communities rationally and successfully used their family labour to take advantage of the capitalist economic process. This we can relate to the Chayanovian use of family labour.We also noted how capitalist penetration of the agrarian world could enable lower castes to resist age-old upper-caste domination and oppression and even empower them to become considerably politically significant in the arena of peasants' mobilisation as well as elections, as witnessed in the cases of BKU and the Shetkari Sanghatana in quite disparate parts of the country.

References:

[i] Lelin, V. I. 1956. *The development of capitalism in Russia: The process of the formation of a home market for large-scale industry*. Moscow: Foreign Languages Publishing House. pp. 178-180.

[ii] Gidwani, Vinay. 2008. *Capital, Interrupted: Agrarian Development and the Politics of Work in India*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

[iii] Chari, Sharad. 2004. *Fraternal Capital: Peasant-Workers, Self-Made Men, and Globalization in Provincial India*. Stanford: Stanford University Press.

[iv] Gupta. Akhil. 1998. *Postcolonial Developments: Agriculture in the Making of Modern India*. Durham: Duke University Press.

[v] Ramamurthy, Priti. 2011.Rearticulating Caste: The Global Cottonseed Commodity Chain and the Paradox of Smallholder Capitalism in South India. *Environment and Planning A*. Vol. 43. Issue. 5, May 1, 2011. pp. 1035-1056.

Select Bibliography:-

Bernstein, Henry. 2009. "V.I. Lenin and A.V. Chayanov: Looking back, looking forward". *The Journal of Peasant Studies 36:1*.

Brass, Tom. 1994. "Introduction: The new farmers' movement in India". *The Journal of Peasant Studies*. Vol. 21. Issue. 3-4. pp. 3-26.

Byres, T J. 1991. "The Agrarian Question and Differing Forms of Capitalist Agrarian Transition: An Essay with Reference to Asia" in J. C. Breman and S. Mundle eds., *Rural Transformation In Asia*. Delhi: Oxford University Press.

Chari, Sharad. 2004. "Agrarian and Colonial Questions" and "Can the Subaltern Accumulate Capital" in *Fraternal Captial: Peasant-Workers, Self-Made Men, and Globalization in Provincial India*. Delhi: Permanent Black.

Gidwani, Vinay. 2008. *Capital, Interrupted: Agrarian Development and the Politics of Work in India*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Gupta, Akhil. 1998. "Agrarian Populism in the Development of a Modern Nation" in *Postcolonial Developments: Agriculture in the Making of Modern India.* Durham: Duke University Press.

Kumar, Ravi (Eds.). *Contemporary Readings in Marxism: A Critical Introduction*. New Delhi: Aakar Books.

Lelin, V. I. 1956. *The development of capitalism in Russia: The process of the formation of a home market for large-scale industry*. Moscow: Foreign Languages Publishing House. Mohanty, B. B. (Eds). 2016.*Critical Perspective on Agrarian Transition: India in the Global Debate.*New York: Routledge.

Omvedt, Gail. Dec, 1981. "Capitalist Agriculture and Rural Classes in India". *Economic & Political Weekly.*Vol. 16, No. 52. Dec. 26, 1981, pp. A-140–A-159.

Ramamurthy, Priti. 2011.Rearticulating Caste: The Global Cottonseed Commodity Chain and the Paradox of Smallholder Capitalism in South India. *Environment and Planning A*. Vol. 43. Issue. 5, May 1, 2011. pp. 1035-1056.

Sau, Ranjit. Dec, 1976. "Can Capitalism Develop in Indian Agriculture?"*Economic & Political Weekly.*Vol. 11, No. 52. Dec. 25, 1976, pp. A-126 – A-136.

Singh, Manjit. Nov-Dec 1997."The Political Economy of Agrarian Capitalism". *Social Scientist.*Vol. 25, No. 11/12. Nov. - Dec., 1997, pp. 31- 47.

A Study of the Attitudinal Differences of Teachers of Different Boards in Dooars Region

Sanghamitra Roy
Associate Professor
Eastern Dooars B.Ed Training College
Bhatibari, Alipurduar

Abstract: The present study is undertaken by the investigator with the intention of knowing the factors affecting the attitude of the teachers of secondary schools in Dooars towards teaching profession. The changing attitude of school teachers of CBSE and WBBSE is noticed on account of the various factors motivating them. Through the present study the researcher has tried to find out whether there really exists any difference in the commitment of the teachers towards their profession depending on the boards under which the school is or, gender. Through this study the investigator has tried to assess whether the teachers from different boards or of different genders possess different attitudes towards their profession.

Key Words : Profession, Dooars, CBSE, WBBSE, Attitude, Commitment.

1. Introduction:

There is seen erosion in the values, responsibilities, commitment of the teaching profession. This erosion has taken place due to the complex structure of the society, socio-economic growth, the enterprising nature of education and the pressure of work. There may be considered many more factors, both direct and indirect, responsible for this erosion. Today's teacher is as busy as professional as a software professional. A major issue in the present day education is the question of what constitute good and effective teaching. The questions rose while considering these crucial aspect of teaching are "Do teachers know how to teach and do they create interest and motivation in the students to learn?" A thorough inquiry into the modes and the ways the teacher employs to impart knowledge, understanding, skills and attitudes are necessary. For the professional development of the teachers, the study of their attitudes is very crucial. The positive and favourable attitudes not only make individuals perform well in their work but also in a more satisfying way thereby resulting in a rewarding performance by them. Unfavourable or negative attitudes, on

the other hand, make individual tired, boring and unacceptable. This is the reason that the need of a dependable multi-dimensional attitude scale is felt to measure the attitudes of the prospective and practicing teachers towards teaching profession.

1.2 OBJECTIVES OF THE STUDY

- To find out the significance of difference between the attitude of the male and female teachers working in the districts lying in the Dooars region towards teaching profession.
- To find out the significance of difference between the attitude of the male and female WBBSE teachers of the districts lying in the Dooars region towards teaching profession.
- To see if there is any significant difference between the attitude of the male and female CBSE teachers lying in the districts of Dooars region towards teaching profession.
- to find out if there is any significant difference among the attitude of teachers from Cooch Behar, Alipurduar and Jalpaiguri districts of Dooars towards teaching profession.
- To find out if there is any significant difference between the attitude of the WBBSE and CBSE male teachers of Dooars region towards teaching profession.
- To find out if there is any significant difference between the attitude of the West Bengal Board of Secondary Education and Central Board of Secondary Education female teachers of Dooars region towards teaching profession.

1.3 NULL HYPOTHESES

$H_0$1 – There is no significant difference between the attitude of the male and female teachers of Dooars region towards teaching profession.

$H_0$2 – There is no significant difference between the attitude of the male and female teachers working in the WBBSE schools lying under the Dooars region towards teaching profession.

$H_0$3 – There is no significant difference between the attitude of the male and female CBSE teachers of the schools lying under the Dooars region towards teaching profession.

$H_0$4 – There is no significant difference among the attitude of the teachers working in the different schools of Cooch Behar,

Alipurduar and Jalpaiguri districts of Dooars region towards teaching profession.

$H_0$5 – There is no significant difference between the attitude of the WBBSE and CBSE male teachers of Dooars region towards teaching profession.

$H_0$6 – There is no significant difference between the attitude of the WBBSE and CBSE female teachers of dooars region towards teaching profession.

There is no significant difference among the school adjustment of students from Cooch Behar, Alipurduar and Jalpaiguri districts of Dooars region**.**

1.4 Methodology of the Present Study

For present investigation, the researcher has tried to adopt a purposive survey method for its added advantage or economy in time, expenditure, greater speed and greater scope for accuracy.

With the intention of encompassing the overall planning of the work including a proper knowledge of the techniques means of data collection, systematic and meaningful analysis and drawing of the relevant conclusions of the study, the researcher has taken up the methodology for the same which would prove to be a relevant one.

The researcher selected the samples from the population through multiple random sampling. The total population being the teachers of secondary schools of WBBSE and CBSE in Dooars, the researcher has divided the whole population into three strata – three districts of Dooars viz. Cooch Behar, Alipurduar and Jalpaiguri. In each of these three districts there are several schools under both CBSE and WBBSE. The researcher, therefore, had to go for random sampling method to collect samples from each of these three districts.

Due to the prevalent COVID-19 pandemic, all the schools remained closed for the last few months. It became next to impossible for the researcher to approach so many school teachers during this period keeping in mind everyone’s safety. Considering the situation, the researcher has decided to convert the questionnaire of Attitude Scale Towards Teaching Profession into Google Form so that the desired number of teachers could be reached for this purpose. The researcher contacted the Head of the Institutions of about eight to ten secondary schools present in each of these three districts. Taking his permission and

then an appointment, the researcher could arrange a meeting through Google Meet where almost all the teachers of that school joined. The researcher has tried to make them understand the importance of the research work she is pursuing. She then elaborately described what role they would have to perform through filling up the Questionnaire by remaining very true to their answers. It took several months to fulfil the target and collect the required amount of filled in forms as sample.

A total number of about 386 filled in Google Forms were collected. But, to keep an even distribution of data with regard to CBSE and WBBSE TEACHERS (both male and female), the researcher selected about 150 samples which included about 75 male and 75 female teachers each from WBBSE and CBSE through random sampling method. As soon as a few schools reopened, the researcher approached several students from different districts also to investigate the level of their adjustment to the schools.

1.5 TOOL USED

The researcher had used ASTTP developed by Dr. (Mrs.) Umme Kulsum given in appendix – A. The present scale measures attitude of Secondary School teacher towards teaching profession.

1.5 (i) ASTTP: Area of Scale

The present tool is useful not only for diagnostic and prognostic purposes, but also for finding out the attitudes of teachers working. The present scale covers five areas of teaching profession given as under:-

- **Academic aspect of teaching profession**
- **Administrative aspects of teaching profession**
- **Social and psychological aspects of teaching profession**
- **Co-curricular aspect of teaching profession**
- **Economic aspect of teaching profession**

1.5 (ii) ASTTP: Items of the Scale

There are 55 statements including 25 favorable and 30 unfavorable items.

1.5 (iii) ASTTP: Scoring

Each item of the scale is provided with 4 alternative responses. The weight ranging from 4 (strongly agree) to 1 (strongly disagree) for favorable (positive items). In the case of unfavorable (negative items ranges of weight is reversed), i.e. from 1 (Strongly agree) to 4 (strongly disagree) and these are marked with * in the booklet. The theoretical

range of score is from 55. The higher indicates more favorable attitude towards teaching profession.

1.5 (iv) Samples Used for Calculation Through ASTTP

Samples are the representative of whole population. It is a small quantity of portion selected from the total population having characteristics of the sample. Keeping in view the above objective of study a total sample of 300 teachers working in secondary school in the districts of Dooars region in North Bengal of the state West Bengal such as Cooch Behar, Alipurduar and Jalpaiguri were selected on the basis of random sampling method. The schools were further categorized as CBSE schools and WBCSE Schools where about 150 teachers were taken from CBSE Schools and rest 150 teachers were taken from WBCSE Schools. Among 150 teachers of each group, 75 were male teachers and 75 were female teachers.

TABLE NO. 1
SAMPLEOFSTUDY

CBSE		WBBSE	
Male teachers 75	Female teachers 75	Male teachers 75	Female teachers 75

2. RESULT

2.1 H_0 1: There is no significant difference between the attitude of the male and female teachers of the Dooars region towards the teaching profession.

Table: The table shows the mean, sample size, standard deviation, standard error, and t-value of male and female secondary school teachers

Gender	Samplesize	Mean	Standard deviation	Standard error	Tvalue	Significance
Male	165	168.95	13.09	1.02	1.51	NS
Female	168	243.47	13.85	1.07		

Interpretation: Here the value of the T ratio is 1.51 which is less than the critical value of t= 1.97 and t= 2.59 at the 5% and 1% significant levels, So, the null hypothesis is accepted at the 5% and 1% significant levels.

2.2 H_0 2: There is no significant difference between the attitude of the male and female WBBSE teachers of the Dooars region towards the teaching profession.

Table: The table shows the mean, sample size, standard deviation, standard error, and t-value of teachers in the Dooars region.

Gender	Samplesize	Mean	Standarddeviation	Standarderror	Tvalue	Significance
Male	100	168.27	15.73	1.573	0.24	NS
Female	69	167.70	15.12	1.82		

Interpretation: Here the value of the T ratio is 1.51 which is less than the critical value of t= 1.98 and t= 2.60 at the 5% and 1% significant levels, So, the null hypothesis is accepted at the 5% and 1% significant levels.

2.3 H_0 3: There is no significant difference between the attitude of the male and female CBSE teachers of the Dooars region towards the teaching profession.

Table: The table shows the mean, sample size, standard deviation, standard error, and t-value of teachers in the Dooars region.

Gender	Sample size	Mean	Standarddeviation	Standarderror	Tvalue	Significance
Male	65	170	15.47	1.92	1.57	NS
Female	99	173.64	12.77	1.28		

Interpretation: Here the value of the T ratio is 1.57 which is less than the critical value of t= 1.98 and t= 2.60 at the 5% and 1% significant levels, So, the null hypothesis is accepted at the 5% and 1% significant levels.

2.4 H_0 4: There is no significant difference among the attitude of teachers from the Cooch Behar, Alipurduar and Jalpaiguri districts of the Dooars region towards the teaching profession.

Table: The table shows the average, variance of secondary school teachers from Cooch Behar, Alipurduar, and Jalpaiguri districts in the Dooars region.

Districts	Sample Size	Sum	Average	Variance
CoochBehar	170	28735	169.02941	270.2299
Alipurduar	75	12711	169.48	157.28
Jalpaiguri	88	15192	172.63636	174.9697

Sourceof Variation	SS	df	MS	F	P-value
Between Groups	789.7091	2	394.85453	1.7965271	0.167492
Within Groups	72529.94	330	219.78769		
Total	73319.65	332			

Interpretation: Here the value of the F ratio is 1.80 which is less than the critical value of F= 3.02 and F= 4.67 at the 5% and 1% significant

levels, So, the null hypothesis is accepted at the 5% and 1% significant levels.

2.5 H_0 5: There is no significant difference between the attitude of the WBBSE and CBSE male teachers of the Dooars region towards the teaching profession.

Table: The table shows the mean, sample size, standard deviation, standard error, and t-value of teachers in the Dooars region.

Board	Samplesize	Mean	Standard deviation	Standarderror	Tvalue	Significance
Male (WBBSE)	100	168.65	15.73	1.573	0.70	NS
Male (CBSE)	65	170	15.48	1.92		

Interpretation: Here the value of the T ratio is 0.70 which is less than the critical value of t= 1.98 and t= 2.60 at the 5% and 1% significant levels, So, the null hypothesis is accepted at the 5% and 1% significant levels.

2.6 H_0 6: There is no significant difference between the attitude of the WBBSE and CBSE female teachers of the Dooars region towards the teaching profession.

Table: The table shows the mean, sample size, standard deviation, standard error, and t-value of teachers in the Dooars region.

Board	Samplesize	Mean	Standarddeviation	Standarderror	Tvalue	Significance
Female (WBBSE)	69	167.70	15.12	1.82	2.67	S
Female (CBSE)	99	173.63	12.77	1.28		

Interpretation: Here the value of the T ratio is 2.67 which is greater than the critical value of t= 1.98 and t= 2.60 at the 5% and 1% significant levels, So, the null hypothesis is rejected at the 5% and 1% significant levels.

3. MAJOR FINDINGS

- There is no significant difference between the attitude of the male and female teachers of Dooars region towards teaching profession at the 5% and 1% significant levels.
- There is no significant difference between the attitude of the male and female WBBSE teachers of Dooars region towards teaching profession at the 5% and 1% significant levels.
- There is no significant difference between the attitude of the male and female CBSE teachers of Dooars region towards teaching profession at the 5% and 1% significant levels.
- There is no significant difference among the attitude of teachers from Cooch Behar, Alipurduar and Jalpaiguri districts of Dooars region towards teaching profession at the 5% and 1% significant levels at the 5% and 1% significant levels.
- There is no significant difference between the attitude of the WBBSE and CBSE male teachers of Dooars region towards teaching profession. at the 5% and 1% significant levels
- There is significant difference between the attitude of the WBBSE and CBSE female teachers of Dooars region towards teaching profession at the 5% and 1% significant levels.

References

Sparks, D.C. (1979). *A Biased Look at Teacher's Job Satisfaction*. University of Chicago Press. Chicago. USA.

Baker, N. (1988). *Professional Development: Teaching and Learning*. McGraw-Hill, New York.

Callahan, J. F. & Clark, L. H. (1988). *Teaching in the Middle and Secondary Schools*. (3rd ed.). Macmillan, New York.

Smith, N.A. (1990). *Educational Psychology: A Developmental Approach*. 5th Ed. McGraw-Hill. New York. USA.

Marchant, G. J. (1992). *Attitudes towards research based effective teaching behaviours*. Journal of International Psychology, April.

Women –Violence and Peace in North East India

Ananya Bose
Research Scholar, Jadavpur University

Abstract:- Justice, violence ,existential crisis , cultural security are some of the major pillars which make women of north east outstanding in their fight of existence. May it be defending their families, farming, participating in peace processes or making India proud in athletics, they are parallel maintaining their existence on the threads of insecurity and domesticity setting examples to the rest of India. This is mostly unknown to the mainland Indians. Thus my paper seeks to bring out their struggle for existence and how the government supports their fights. Though north east is a huge contested area, still I have tried to cover women of Manipur, Meghalaya, and Assam into broader lens.
Key words- violence, insurgency, human rights, peace process, sexual harassment, rape, rehabilitation

INTRODUCTION

The geographical location of north east has always been important from the geopolitical and diplomatic perspective. North east India is composed of 8 states who share their border with Bangladesh, Bhutan, china and Myanmar .Present north east was designated as north east frontier trust during the colonial period. For the efficiency of their jobs, British initiated certain policies in north east, like *Inner Line Regulation act of 1873*[1], *Schedule District Act of 1874*[2], and *Frontier Tracts Regulation act of 1880*[3].To keep entire zone separate from the mainland , British initiated Inner Line Permit Regulation which restricted outsiders to intrude into North East Frontier Tracts[4] (later designated as NEFA).Thus any Indian or non Indian entering Arunachal , Mizoram , Manipur and

---

[1] The concept has its origins in Bengal eastern frontier regulation act(BEFR)1873.Thus the inner line permit is a document required by the citizens outside the protected states to enter and stay in the area for some time.

[2] https://ncst.nic.in/sites/default/files/documents/ncst_reports /special_report_of_ncst/Part-II%20Spl%20Report%20Eng2967710654.pdf

[3] https://www.casemine.com/search/in/assam %2Bfrontier%2Btract%2Bregulation%2C%2B1880

[4] http://www.arunachalpradesh.gov.in/655-2/

Nagaland needs Inner Line Permission from the respective state governments. This forms the first stage of agitation as separation for decades gave them autonomy to not abide constitution of India when it came as merger with Indian Territory after independence. This not only separated the hills of north east from the plains but also from the rest of India. This inflicted separate political and economic crisis. The legislative assembly has always kept this issue in their discussion but concrete results are yet to achieve. The strongest Tribal community of the hills has been Nagas and when they are decided to be given special autonomy, opposition from other tribal communities cropped in. They (other tribal communities) believe Nagas are the oldest and most uncivilized tribes following old traditional norms .If Nagas are given full autonomy, they will create anarchy and dominate other tribes. This insecurity affected the tribal women and children profusely from early independence days and is still a major fear of the tribes.

TRIBAL WOMEN AND THEIR INSECURITIES:-

Since school days every tribal girl of north east is concerned about her own security. Assam Rifles and militant outfits clashes has been a constant affair of north east, especially in Assam, Manipur and Nagaland. Every tribal girl child knows to pass by armies keeping her head down to retain her security. They learn to ignore any kind of encounter amongst militants and armies or with any local people. They keep mum even if their family members get killed in such encounters in front. Women take shelter in paddy fields whenever any encounter situation crops in. Women in north east never get any environment of free movement, specially because the deployed armies are given special powers (AFSPA[5] powers).These powers were given with the justification that north east is conflict zone(disputable areas)(1958). Thus the troubles of north east never achieved any concrete solution rather than violence. It can give control of a situation but not peace. Constant disputes have taken away lives, respect, security, education- a proper living environment and all these affected women and children to the maximum. Peace can never reside on gunpoint.

---

5 https://www.mha.gov.in/sites/default/files/armed_forces_special_powers_act1958.pdf

North east is a place several where tribal communities follow matrilineal[6] societal norms and thus enjoy greater participation in domestic decision making processes. Their society often portrays equality of rights and thus humiliations of tribal women are difficult for the tribes to accept. Women movements are monitored and they get minimum access to health services, education, employment or leisure because of army surveillance. Women are even monitored which they visit churches by the armies as they suspect tribal women affinities with the militants and thus can be kept as hostages without any prior notice. They are often lifted by armies and brutally tortured based on suspicion. They not only face physical humiliations at every step but economic discrepancies as well. Poverty and unemployment pave ways to alcoholism and drug addiction or joining militancy by tribals. Tribal women thus take up responsibilities of their families' .But neither state nor the central government could offer them the amount of security they deserve in work places. They work in tea stalls on highways and often get trafficked to various parts of India. Women of Manipur and Assam, living under conflict situations, suffer acute mental health troubles. The psychological trauma which they face, may it be loss of their family members or physical assaults, automatically decreases their life span. Every woman lives in the fear of being hostage of armies. Tribal women of north east hardly get any participation scope in the mainstream economic sectors of the society. Thus running families has become a matter of serious trouble for them. They hardly get any cooperation from the government in these regards. Allocation of budgets by the government is crucial for purposes of establishing new projects for women in the region. It is in public domain that only 10 percent of the budget has been allocated for north east and a minimal amount reach to women. An increased portion of this budget could well be utilised for strengthening welfare of tribal women projects. Investment can be made for additional support services in shelter homes giving them proper counselling facilities and proper ways of earning. In Manipur and Assam, tribal women remain dependent on their relatives for economic assistance. Their situations indulge them in selling liquor, prostitution; drug trafficking or other illegal affairs in

[6] https://www.britannica.com/topic/matrilineal-society

earning their living. Some even join militancy to save their families. Grants are hardly achieved by the widows.

Sexual violence forms a major root of inflicting terror in north east. Most cases of sexual violence revolve round the armed conflicts between the militants and armed forces with special power deployed by the government. The inter-ethnic violence also inflicts sexual violence. These are tactics by the stronger militant outfits to dominate and establish their supremacy on other smaller tribes. This is seen as the attack on the honour of other tribes. This force the tribes evacuate their villages and get displaced as their crops are usually set on fire. The other option for them is to surrender. Couple of years before Assam police started projects on criminals' communal disturbances, and backwards tribes' restoration. This project is known as *Prahari*.[7] Similar such project is *Aashwas* (UNICEF sponsored) for the survival of tribal women and children. It is however a self contradictory issue that when on one hand the government is initiating policies for the betterment of Women and children while on the other hand the counterinsurgency strategies are demolishing all security perspectives. Arrests by male security officers, interrogations in army camps , torture and sexual assaults by the armies and militants is almost a common routine in north east. Security is a myth in such case. There are even instances of men sexually abusing tribal women claiming that they are non state armed groups. One such case is October 20th 2022, when a mother of five got raped by 26 year old guy at ` Kangchup, Imphal(West) District[8]. He claimed himself as a part of banned non state armed groups. On January 9th armies caught him and handed him over the state police. However, state police is reluctant to take actions against violence on women.

WOMEN IN PEACE PROCESS

The participation of women in peace process has always been a difficult task in north east. They are not welcomed in the male dominated institutional policies. As forefront politics has no place for women, their participation in the peace process gives justification to their struggle for existence. Apart from peace process women participation in the NGOs , cooperated them in their struggle for justice. Majority of them has kept

---

[7] https://police.assam.gov.in/portlet-innerpage/project-prahari

[8] https://villageinfo.in/manipur/imphal-west/lamshang/kangchup.html

motherhood as their primary source of fighting .How they work for their peace establishment is a serious matter to analyse. There are several associations has faced several criticisms(they seek sympathy , behind curtains of motherhood and underneath they are running illegal businesses) .However very first such struggle for peace establishment came from **Naga Mothers Association** (**NMA**).In 1984, this organisation was established and since then they are fighting for the growth of good thinking , development of citizens and get responsible life. Any woman's participation, from any background is accepted in the association, (may she be a mother, single or widow).They have kept education of women and children as their first priority. They have negotiated between the Naga government and **Naga Students Federation**[9] while they were undergoing conflicts regarding age limits of the government jobs. In 1994, Naga Mothers Association (NMA) formed a peace force to put an end to the excessive bloodshed between the armies and the militants. The organisation presently works for liberating the state from excessive drug consumption as we know the state is famous for drug consumption and alchohol. The **Kripa Foundation of Mumbai**[10] has collaborated with NMA and working for the betterment of the state. Even they are active in the control and eradication of HIV .Its not only in Nagaland , women association of almost all states of north east are fighting for these major issues. It is NMA, whose mediation brought ceasefire between Central Government and NSCN(IM)[11].This is the first organisation in entire south asia which has taken part as mediator in the ceasefire process. They have extended their hands towards Srilanka and Myanmar as well in resolving socio-political complications .They have solely devoted their actions towards justice, peace, welfare of the citizens and ensuring proper environment for education. Another such significant organisation which participated in the peace keeping process is **Tangkhul Shanao Long**. This tribal women association was formed in 1974 with the collaboration of the Thangkul Tribal women. They mainly focus on the establishment of women rights and respects in the society (patriarchal

---

[9] https://nagalandjournal.wordpress.com/2013/04/05/naga-students-federation-nsf/

[10] https://rehabs.in/rehabcentre/kripa-foundation-mumbai-2/

[11] https://www.satp.org/terrorist-profile/india/national-socialist-council-of-nagaland-isak-muivah-nscn-im

society).The Naga Women of Manipur got disturbed by suicides of tribal women of manipur who are sufferers of sexual assaults by border security forces. They faced and still facing excessive humiliations by the armies deployed in the border areas. This has forced the women of Manipur to form their own forces to ensure their security. The organisation was initially known as **District Women Organisation**. With constant increase of tortures by the armed forces and excessive human rights violations, this organisation took bold steps. In 1994, they coordinated the biggest march which is still a story of remembrance for entire Manipur. With the cooperation of TSL, NMA became more efficient. They also together confronted AFSPA loaded armies. Apart from this, they fight against illegal trade of alcohol, smuggling of drugs and trafficking of tribal women and children from north east**. Naga Women Union of Manipur** is another women organisation which got into action in 1994.They work for the participation of women in decision making process in the Panchayati raj system, in election processes, and in negotiation with the government regarding the demands of the tribes. With their initiative the Naga-Kuki conflict got mediated. This participation and togetherness is making the tribal women network stronger in North east. Meitei society of Manipur gave rise to **Meira Paibis** since the pre independence period. Their major issues of fighting are like restricting profuse drug trafficking from Myanmar .These are mainly opium, cannabis, alcohol and banned medicines. Besides they work for the control of HIV increase too. They also work for formidable environment for the education of the children of north east. The organisation fights for anti liquor movement and protection of the food grains from the destruction of the armies and the militants. They are the **torch bearers** of the state as they march with the torches all through the night to secure the women from getting abducted by the militants or the armies. Their contribution is a remarkable revolution in the entire Manipur.

MAJOR DEVELOPMENT INITIATIVES OF THE GOVERNMENT:-

In 2009, Government had taken special care about the demands of the women of north east, especially in Nagaland and Manipur. The tribal women association demanded much more participation of women in the government decision making process.33 percent of the reserved seats for

tribal women in the Legislative Assembly has been proposed by NMA. This also included protection and restoration of the rights of tribal women and reservation of the seats of tribal women in the districts of Nagaland by the Nagaland Municipal Council Amendment Act of 2006. They focused on deployment of village councils for restoration of peace and welfare of women and children, Nagaland state Social Welfare board development, Shelters or rehabilitation centres for the security of raped or sexually assaulted women, restoration of special board for the restriction of the increase of HIV positive cases and proper health care centres. They also demanded proper security of women from domestic violence by act of **women protection rights act of 2005** which was initiated by the government .This demands extra assistant commissioners and protection officers. They also demanded participation of women in taking land rights decisions. From 2007-2009 the number of senior women representatives in Panchayet was 63.Manipur state Commission for Women Act 2006 determines women health, educational rights and spaces for legal advices but nothing so far has matured. There is an urgency of women shelters in Imphal for tortured tribal women .In 2001 the State Commission arranged meeting for strengthening the administrative officials for their duties. Two new projects are initiated by the government , protection of motherhood and protection for domestic welfare, There is also a strong need for international cooperation for women fighting for repelling APSPA from Nagaland and Manipur. The Manorama killing case attracted the concern of international arena towards the security of women.

CONCLUSION:

As women and children suffer the most in any conflict, it forms the responsibility of the state and the civil society to provide them the protection they deserve. May it be Chipko Movement , or Narmada Bachao Andolan, women has taken active part in securing their resources .The natural resources of north east form their basic aspect of living .Tribal communities are dependent on these natural resources. Securing these natural resources form the prime responsibility of the government .Civil society of north east has taken bold steps for its protection. Tribal women of north east, specifically Manipur and Nagaland are suffering from extreme sexual abuses for decades. At times it Is the fear of AFSPA ridden armies, or else it is the dominant militant outfits establishing their

supremacy on others. Above all, losing the main earning members of the families, either by encounters or joining militancy forces the tribal women to go out to earn and run their families. They often get trapped by illegal businesses. Both state and central government needs tight security environment to safeguard these vulnerable victims. None of the states of north east deserves any more Sharmila Chanu's lifelong hunger strike to get heard.

REFERNCES:-

1.Ahuja, R. (2003).Violence against Women. NewDelhi: Rawat Publication.
2.Abeysekera, S. (2007). The implication ofinsurgency on women. In A. D. Shrestha, &R Thapa. (Eds.),The Impact of ArmedConflict on Women in South Asia.
(pp. 52-58).Regional Centre for Strategic Studies,Colombo: Manohar Publication
3.Banerjee, A.C., & Roy, S. S. (2010).Problems and Prospects of Bodoland.
New Delhi:Mittal Publication
4.Banerjee, P. (2002)..Women's Interventions for Peace in the North-East. Canada: SouthAsia Partnership.
5.Baruah, S. (1999).India Against Itself: Politics of Nationality in Assam Philadelphia,PA:University of Pennsylvania Press.
6.Baruah, S. (2002). Gulliver's Troubles: State and Militants in Northeast India.
Economic and political weekly 37(41),78-82
7.Baruah, S. (2005).Durable Disorder:Understanding the Politics of NortheastIndia
. UK: Oxford University Press.

8.Bhuyan, A. (2008). Bodo Women: Peace Makerswithin the Ethnic Paradigm. In A. Dutta, &R Bhuyan. (Eds.),Women and PeaceChapters from Northeast India (pp. 3-17).New Delhi: Akansha Publishing House

In Search of an Alternative Idea of State: John Rawls Property Owning Democracy and Liberal Socialist Regime

Md. Salim Shahzada
Research Scholar
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta (CSSSC)

Abstract:
In the year 2008, the world had seen a noteworthy monetary crisis and its consequences shook the belief of a large number of people in the globally established system of neoliberalism which constitutes a heavily competition-driven economy, economic liberalisation, privatisation, globalisation, deregulation, free trade, representative democracy with minimal taxes with a free circulation of capital, goods, and labour. Now, it is high time to think that if not neoliberalism then what will govern us in the future? In other words, as neoliberalism leads us to a regular financial crisis therefore the world needs to think about some other alternatives. In today's world, we also have radical alternatives such as "socialism with Chinese characteristics". Another important development that can be seen worldwide is that a substantial number of people turned toward Populism and Nationalism. But what happens with these alternatives is that people rely upon their faith in strong leaders who in return assure them to deliver a decent lives, but at the cost of liberties for some or all. Thereupon we need to think about an alternative that will fulfill our goal of a just society. In this context, the political philosophy of John Rawls and his ideas about a just state, formulations of Property Owning Democracy, and Liberal Socialist Regime seems ideally appropriate to provide an answer.
Keywords: John Rawls, Justice, State, Property Owning Democracy, Liberal Socialist Regime, etc.

Discussion: The book *A Theory of Justice*[1] written by John Rawls (1921–2002) was first published in 1971. After the book was published it sparked many debates and discussions on the book, critical engagements and some of the weaknesses also came out. After this Rawls addressed these weaknesses and critical engagements in the 1975 German Edition

of the book and in 1999 the English revised edition[2] of the book came out.

Rawls is often regarded as a philosopher of the welfare state and this statement is made by those belonging within the broad left or left of the centre. Similarly, the rightists or Libertarians like Robert Nozick also think that Rawls is largely a defender of the welfare state.[3]
But, this portrayal of Rawls as a philosopher of the welfare state is not correct and it is a misinterpretation of Rawlsian ideas. According to Rawls's own assessment, he made this point clearly in the preface of the revised edition of 1999.

The principal concern of political philosophy deals with the question that what is the ideal state. As an answer to this question, Rawls propagated his theoretical idea of Property Owning Democracy. According to Rawls, there is a fundamental and very important nuance difference between a Property Owning Democracy and the welfare state. Although there is a tendency among the left and the far left who marked Rawlsian Property Owning Democracy as another version of the welfare state.

For Rawls, the welfare state is generally a system where few persons will have property and as a result of that, it will have control over the societal economy and therefore politics. Whereas in Property Owning Democracy, Rawls thinks that property can be owned by a significant number of people in society if not the majority of the society. In other words, we can say that Property Owning Society is something that is more radical than the vision of an ideal welfare state in terms of property-owning by a much larger group of individuals. Now, this welfare state was already in place in the 1950s and 1960s when Rawls was developing his idea of justice.

As we know that Europe and the United States was very much place where the welfare state was established during the post-second world war period, where the state had a huge role to play in public education, healthcare, and public welfare schemes but at the same time one had the right of private property and it was largely concentrated among few families. In other words, there could be a significant number of the middle class and working class in the welfare state who won't have

any property. Whereas In Rawlsian idea of Property Owning Democracy—any person of that society could have access to the property and this property could be personal property or private property. For example, the personal property in the sense of a car or it could be private property like one can start a factory. So any person can have that access with his capabilities and he will attend that capability through education and skills. This particular Property Owning Democracy is a system of reciprocating and cooperative system as the individuals of this society are reciprocating each other's needs and demands.

Thus, a Property Owning Democracy is different from the welfare state because it gives a much larger section of individualsin that society to have access to property, not only personal property but private property too. Here what is different from the welfare state is that this society would be based on reciprocity and cooperation and through this property would be achieved, whereas in the welfare state only a small number of people would be entitled with the property. A welfare state was a compromise between the libertarian vision which was already developed in the 1940s by Friedrich August Hayek, got more materialized by Milton Friedman and Robert Nozick in the 1960s and 1970s, and the radical left. Rawls is further pushing the welfare state towards the left, but not suggesting that it should be like a socialist economy or a communist economy. But, that provision of a socialist economy is still open for Rawls as the society he argues for is based on principles of reciprocity and cooperation. So, we can say that Rawls in a way is tweaking the welfare state.

Rawls Property Owning Democracy is also a constitutional democracy carrying forward the contractarian tradition of the political philosophy in which society is a result of a contract among individuals on the basis of certain principles, whichare later codified as laws. To be specific, Rawls followed the tradition of Locke, Rousseau, and Immanuel Kant.

In the Rawlsian scheme of state, he invents an imaginary hypothetical situation which he called the original position. Suppose we have a society or a situation where individuals do not know about their past, they don't know where they are coming from and where they will be going. Rawls thinks that this is the basic original position. Here Rawls makes a significant assumption that if the individuals are rational in this

original position then at least they will agree upon two principles – firstly, the liberty principle and secondly, the difference principle.

The Liberty principle encompasses the right to life, liberty, freedom of thought and expression, freedom of association, freedom of assembly, freedom against forced detention or arrest, and political equality or political freedom. The difference principle of Rawls is not the same as what left of the centre or left suggests about social and economic equality. Rawlsian difference principle means that social and economic inequalities must be arranged in such a manner that the least advantaged could be identified. So, Rawls is not suggesting one kind of total equality because he understands that all individuals are not equal in terms of talent and there could be individual differences among the people. Here we can say that what Rawls is trying to do is in a way rationalizing inequality in favor of the poor or the least advantaged.

Now, the difference principle has two processes – 1) The social and economic inequalities must be arranged in such a manner that the least advantaged could be benefitted 2) Offices and positions must be open to all under the fair principle of equal opportunity. Here Rawls is questioning the natural aristocracy or the perverted form of natural aristocracy or oligarchy with the argument for liberal equality. This is all he suggests to defend or to have a vision of Property Owning Democracy which should be run by the principles of constitutional democracy as things like political liberty, rule of law, and enforcement of contracts are there.

Rawls is also interested in what he is suggesting here is that this Property Owning Democracy can be also a Liberal Socialist Regime – a Socialist Regime which will respect the liberal principles. Rawls thinks in this way because during the post-second world war when Rawls is formulating his theories, a lot of socialist regimes became totalitarian. In those totalitarian socialist regimes, freedom of expression, and freedom of thought were thoroughly curtailed by the ruling party and state repressive agencies. So, what Rawls called a Liberal Socialist Regime is a situation that could be open to liberal principles, and those liberal principles according to Rawls are freedom of thought, freedom of life, liberty, and fairly elected opportunity which at that time the socialist states are denying to their people. So, Rawls was in favor of the Socialist state which will respect liberal principles.

Rawls was challenging the society of the Soviet Union (USSR) and the other Eastern European socialist or communist regimes where according to him liberty principles were curbed. At the same time, Rawls is also challenging the market fundamentals of the United States and other capitalistic countries. Rawls was opposed to the market fundamentalists like Hayek, Friedman, and Nozick. According to these supporters of the libertarian state,everything should be privatized, everything is a commodity and everything has its own price, and all things can be exchanged in the market freely. Each and every transaction should be legalized and the state should not play any role except in maintaining law and order and enforcement of contracts.

So, we can say that the Rawlsian scheme of things is something which is more of left of centre position but a very moderate Liberal Socialist Tradition—a socialist tradition that will be open and respectful to the liberal tradition. It is a Property Owning Democracy and at the same time constitutional democracy—a system based on reciprocity and cooperation. When Rawls was theorizing his ideas for a just state, he was also responding to the libertarians and to the hard left – particularly socialist states of his times which became more totalitarian in their nature. Rawls was also responding to another tradition of Classical Utilitarian Tradition where he questioned the principle of maximization of happiness. Even in Rawlsian Property Owning Democracy though the majority of the people would own property, there must be few people who don't have access to the property or all property value might not be equal as individual talents are very different and their needs are different too. Therefore Rawls formulates the difference principle which according to him will do justice in society. Rawls is making a balance between individuals and the collective. He is emphasizing the distinctive role of the individual in society and at the same time, he is also interested in constructing some principles which will run as a collective.

In conclusion, we can say that a liberal socialist regime that aims at justice as fairness would be more stable and on the other hand, what it will do is it won't allow the concentration of capital in a few private hands and it also allows the liberty principles to establish within the Liberal Socialist Regime. Therefore, in this contemporary world's economic and political system importance of the Rawlsian Democratic

Socialist State is very much significant and appropriate to establish a society of reciprocity and cooperation.

References:

[1] Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice.* Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

[2] Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice.* Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

[3] Nozick, Robert. 1974. *Anarchy, State and Utopia*. New York: Basic Books, Inc., Publishers. pp. 183-231.

Select Bibliography:

Edmundson, William A, 2017. *John Rawls: Reticent Socialist*, Cambridge: Cambridge University Press.

Nozick, Robert. 1974. *Anarchy, State and Utopia*. New York: Basic Books, Inc., Publishers.

Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice.* Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice.* Revised Edition. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

Wolff, Robert Paul, 1977. *Understanding Rawls: A Reconstruction and Critique of "A Theory of Justice"*, Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Steel Workers of Burnpur-Kulti: Understanding Their Political Conflicts and Trade Union Activities during the Colonial Period

Chiranjit Gorai
Research Scholar
Department of History
Kazi Nazrul University
Asansol, West Bengal, India

Abstract: The present paper wishes to explore the trade union activities of the workers of the IISCO Steel Plant during the colonial period. The paper also tries to understand the political conflicts between various political parties through underlying trade unionism at Burnpur-Kulti. In 1918, the Indian Iron and Steel Company (IISCO) was established at Burnpur, near Asansol. But the real history of the development of the iron industry in this region can be traced back to the second half of the nineteenth century. In 1870, the Bengal Iron Works Company was established at Kulti, a few miles away from Asansol. This Bengal Iron Company was amalgamated with IISCO in 1936, therefore, the present paper also includes the trade union activities of the workers of Kulti. The present paper, thus, necessarily explores the labour union and strikes, and political conflicts in the Burnpur-Kulti region during the 1930s and 1940s. Thus, the present paper has tried to explore and examine the nature of trade unionism and political conflicts of the steelworkers at Burnpur-Kulti during the colonial period.
Key-words: IISCO, Burnpur-Kulti, trade union, political conflict, strike

The IISCO Steel Plant of the Steel Authority of India Limited (SAIL) is an integrated steel plant located at Burnpur, adjacent to Asansol. Burnpur, under the Asansol Sub-division of Paschim Bardhaman District of West Bengal (India), is a well-known town for its iron and steel industry. The Indian Iron and Steel Company (IISCO) was established in 1918 at Burnpur. Thus, gradually, Asansol became a major steel centre of the country during the first half of the twentieth century. But it should be remembered that, before the establishment of IISCO, the Bengal Iron

Works Company was established in 1870 at Kulti, about 10 miles away from Asansol and this company was amalgamated with IISCO in 1936. The establishment of IISCO is no doubt a major economic venture during the colonial period and that too happened with the involvement of the labourers. Both skilled and unskilled labourers played an important role in the development of IISCO. It may be noted that during the first half of the twentieth century, IISCO was an important iron and steel plant along with TISCO. While several historical research has been done on the workers of TISCO (Jamshedpur), the other important steel centre, i.e., Asansol (Burnpur-Kulti) has failed to attract the attention of scholars. The present paper, therefore, focuses on the political scenario of the steelworkers of Burnpur-Kulti. The present paper, thus, has attempted to explore the trade union activities of the workers of IISCO during the 1930s and 1940s. In attempting this task, the paper necessarily explores the nature of the political conflicts, labour strikes and trade unionism among the steelworkers of Burnpur-Kulti during the first half of the twentieth century.

Before moving into the political scenario and trade union activities at Burnpur-Kulti, we can have a glance at the development of the iron and steel industry in these regions. The Indian Iron and Steel Company (IISCO) was established on the 11th of March 1918 at Burnpur.[1] Famous Bengali entrepreneur Sir Rajendra Nath Mookerjee (1854-1936) along with T. A. Martin and Mr G. H. Fairhurst played a vital role in the establishment of IISCO. Though IISCO was established in 1918, it has its own history and it can be traced back to the second half of the nineteenth century. In 1870, India´s first recognisably modern ironworks were established in the Barakar-Kulti region of Bengal, 10 miles away from Asansol, under the name of the Bengal Iron Works Company.[2] The company began producing pig iron in 1877.[3] But there was no demand for pig iron, therefore, it was closed down in 1879.[4] In 1881, the Government of Bengal took over the works and operated as a public sector enterprise under the name of the Barakar Iron Works until 1889. This time, the firm was managed by Mr Von Schwartz for eight years and it produced 30,000 tons of pig iron from 1884 to 1889.[5] In 1889, the works were sold to the Bengal Iron and Steel Company

(BISCO). In 1894, Messrs. Martin and Co., of Calcutta were appointed managing agents of the works.[6] BISCO also made an important agreement with the government in 1897, under which the government agreed to purchase 10,000 tons of pig iron annually for ten years.[7] Towards the beginning of the twentieth century, the steelwork was also initiated by BISCO, however, after a few years, the project was abandoned in 1906.[8] In the post-First World War phase, BISCO went through several modifications and the company was renamed the Bengal Iron Company in 1926.[9] Meanwhile, IISCO was established in 1918 at Burnpur, and finally, the Bengal Iron Company was amalgamated with IISCO in 1936. This amalgamation laid the foundation for the establishment of a new steel plant in 1937 at Burnpur namely the Steel Corporation of Bengal (SCOB). SCOB was formed for the manufacture of steel from pig iron and the plant was set up adjacent to the blast furnaces of IISCO.[10] The establishment of SCOB certainly helped the Government of India during the Second World War, when most of the steel was commandeered for military purposes.[11] Thus, SCOB developed in a significant way and was merged with IISCO a few years after the independence.[12]

Now we can focus on the political scenario of the workers—trade unionism. In the discussion of large-scale industries, trade unionism has always been considered an important political element. As a large-scale industry, IISCO was not an exception of it. During the 1920s at Burnpur and before that at Kulti, the industrial climate was quite peaceful. That was an era when the law of supply and demand operated in respect of labour, especially unskilled, but the industrial employment opportunity was limited to Bengal. Consequently, the few thousands who found themselves fortunate in having been employed by the company were keen to retain their foothold. Those were the days when labour was not organised. There was no works committee. In fact, in the testimony which was submitted by IISCO in 1929 to the Royal Commission on Labour, it was stated that there was no organisation of the employees to the knowledge of the employer.[13]

The labour movement had a late start in Asansol, especially in Burnpur-Kulti. Apart from some agitation in Kulti during the Non-

cooperation movement, trade unionism started properly only after 1937.[14] Although the first strike in Kulti took place during the Non-cooperation movement under the initiative of the Congressmen, this remained an isolated incident.[15] There was no plan to organise a permanent union of the workers or any sustained agitation on economic issues.[16] Thus, the strike led by the Congress in Kulti during the Non-cooperation movement was merely an isolated incident. But the workers of IISCO had general grievances regarding the wages, service conditions, dearness allowance, and medical and educational facilities. Thus, the workers of IISCO were ready to express their grievances against the company. However, the actual trade unionism in the Burnpur-Kulti region was started in the late 1930s, especially after 1937. During this time, the workers of IISCO formed a union and contacted Manek Homi the renowned labour leader of Jamshedpur and requested him to take charge of the newly founded union as its President.[17] Manek Homi responded to that offer. It may be noted that Manek Homi was a leader of the Jamshedpur Labour Federation of the TISCO workers, and at the same time, he was also the first labour leader in the Burnpur-Kulti belt.[18] Local employees of IISCO like T. C. Ghosal and B. Prasad were the original organisers of the union who called Homi to provide the leadership.[19] But gradually this local leadership receded into the background. Thus, it was found that most of the important decisions such as policy making, holding negotiations with the management etc. were taken by Homi. The local organisers had little or no part in making policy or making decisions. Homi was the sole authority in all these matters.[20]

Homi had absolute control over the labour of Burnpur and Kulti since 1937.[21] During this time trouble was noticed in 1938 when a strike was started by the employees, but the company was aware of this strike, therefore taking strict steps and suppressing the strike.[22] The key elements were discharged and the entry of those suspected of fomenting trouble was banned into the district of Burdwan.[23] In 1938, 13 men were discharged, when there was a lockout for 28 days. Mr Habib Ahmed Khan was one of those who took an active part in the strike and his entry into the Burdwan district was banned.[24] During this time, the communists

became much more powerful and influenced the local workers of IISCO. Meanwhile, Homi, who had almost absolute control over the labourers of Burnpur and Kulti since 1937, lost his ground to the communists with the outbreak of the Second World War. Thus, political conflict was started between Manek Homi and the CPI. By 1941, Manek Homi was ousted from Burnpur by the CPI, but somehow he maintained his organisation in Kulti for some time.[25] During this time, the workers at Kulti continued to follow the leadership of Manek Homi for some time, but the workers at Burnpur opted for the leadership of CPI led union.

It may be noted that most of the labour organisations at IISCO were set up in the post-independence phase, but in the 1940s, IISCO saw few labour strikes. In 1944, a labour union namely the Asansol Iron & Steel Workers´ Union (AISWU) was set up and it was affiliated with the Indian National Trade Union Congress (INTUC).[26] The organisation of labour into a movement at Burnpur should be credited to Prof. Abdul Bari, in the mid-1940s. As Professor Nirban Basu has shown, labour representatives inside the union decided to invite Prof. Abdul Bari, the renowned Congress labour leader of Jamshedpur to visit Burnpur and take charge of the Asansol Iron & Steel Workers´ Union (AISWU).[27] Prof. Abdul Bari positively responded to this invitation and was actively associated with the trade union activities at Burnpur. At that time AISWU was the premier labour union at Burnpur, with Prof. Bari as its head. In March 1946, Prof. Bari gained absolute control over the union and a new Executive Committee was formed with Prof. Bari as President.[28]

During this time, again political conflict was started between the CPI and the Congress labour leader Abdul Bari. So, we need to understand the nature of that political conflict regarding trade unionism at Burnpur. When the Congress labour leader Abdul Bari formed a new Executive Committee, the CPI protested to the Labour Commissioner against this new Executive Committee and the Commissioner did not recognise it as the Executive Committee of the Asansol Iron and Steel Workers´ Union. The name of Bari´s union was therefore changed to Asansol Metal and Steel Workers´ Union (AMSWU) but the Executive Committee remained virtually the same as the old Iron and Steel Workers´ Union. But owing to the political conflict between the CPI and Congress labour leader Abdul Bari, the members of CPI and other

political groups were eliminated from Bari´s new Executive Committee.[29] The new Executive Committee was set up with 72 members. It may be noted that, out of the 72 members of the new Executive Committee, except the President (Abdul Bari), General Secretary, Organising Secretary and the Office Secretary, all other members were employees of IISCO. It may also be noted that all sections of the employees were represented in the Executive Committee, hence, several leaders emerged from the local workers such as K. L. Sharma, Samandar Khan, Manwar Singh and Ram Nandan Singh.[30] During this time, few local leaders wanted to undermine Bari´s influence in the union. Deben Sen was one of them. He was a Congress MLA from the Asansol colliery labour constituency and at the same time a leader of the Bengal branch of the Hindustan Mazdoor Sevak Sangh. Deben Sen stayed at Burnpur for about a fortnight in April 1946 and tried to undermine Bari's influence. Thus, with a considerable number of employees being in contact with members of various political parties, the composition of the union remained hybrid despite its apparent homogeneity.[31] However, Abdul Bari remained the sole authority of his union. The local leaders—individually or even taken together—were no match for Prof. Abdul Bari. All the major decisions were taken by Abdul Bari himself and whenever he needed help, he depended on his men from Jamshedpur—the local leadership had a very minor role to play.[32]

Abdul Bari was actively associated with trade unionism in Burnpur from 1946. Bari led a strike in December 1946, and consequently, the union gained the recognition of the company (IISCO) on 1st February 1947 and this strike must be regarded as an event of singular significance in the labour movement at IISCO.[33] As the head of the union organisation, Prof. Bari had noted all the demands of the employees and placed a charter of demands before the company, which covered all the companies operating at Burnpur and Kulti and this charter was sent for adjudication before justice Mr Mc Sharpe of the Calcutta High Court.[34] It was the effort of Prof. Bari and his men, however, it fixed a minimum wage at Rs 1.00 per day, the company gave cash dearness allowance instead of kind, regularised acting allowance and fixed promotion by seniority.[35] So it can be easily understood that the above facilities were

gained through the strike or we can say that the above facilities were the direct result of the strike which took place just before the independence.
In the last retort, it may be said that IISCO (Burnpur works) and Kulti Works had played an important role in the economic development of Asansol-Burnpur-Kulti. These industrial developments in the region of Asansol-Burnpur-Kulti were no doubt a major economic venture during the colonial period and labourers played a vital role in these industrial developments. Thus, during the 1920s, IISCO became one of the largest producers of pig iron and supplied its products to foreign countries. During this period, Japan was the largest purchaser of IISCO´s pig iron.[36] Thus, IISCO developed in a significant way during the first half of the twentieth century. While IISCO was developing in a significant way during the 1920s, the company faced labour strikes in the late 1930s and mid-1940s. But trade unionism at Burnpur-Kulti, as Nirban Basu explained, was started properly only after 1937.[37] Although the labour movements in the region of Burnpur-Kulti never became a part of India´s national struggle, unlike TISCO. In Jamshedpur, the Tatas, the rising Indian capitalist house, had developed a political connection with the Indian National Congress (INC). But IISCO was run by the Indo-British managing agency, therefore, had no such political connection.[38] In Burnpur-Kulti, all the trade union activities were controlled by the outsider leaders such as Manek Homi in the late 1930s and Abdul Bari in the mid-1940s—they belonged to Jamshedpur. The local leaders of Burnpur-Kulti could not stand on their own legs in front of these top leaders. Unlike the TISCO movements in Jamshedpur, the IISCO movements in Burnpur-Kulti could never become a part of the national struggle. As Prof. Nirban Basu diagnosed, the economic demands were put forward by the trade union leaders who, however, were really motivated by other considerations which prevented the growth of an anti-Imperialistic political consciousness among the workers.[39] Consequently, the labour movement in Burnpur-Kulti could not stand on its own legs during the colonial period and was always influenced by the 'outsider' leaders or the 'top boss' of the union. There were no such nationalist political elements in the labour movements of IISCO, therefore, the labour movements in Burnpur-Kulti never became a part of the Indian national struggle.

Notes and References

1 ‘*Burnpur Works*’, an official publication of the Indian Iron and Steel Company, 1961, p. 2.

2 ‘*Kulti Works’*, an official publication of the Indian Iron and Steel Company, 1961, p. 1.

3 B. R. Tomlinson, *The Economy of Modern India, 1860-1970*, Cambridge University Press, New Delhi, 1998, p. 128.

4 *Indian Industrial Commission-Inspection Notes, 1916-18,* Superintendent Government Printing, Calcutta, 1918, p. 24.

5 U. R. Bansal and B. B. Bansal, ‘Industries in India During 18th and 19th Century’, *Indian Journal of History of Science,* Vol. 19 (3), 1984, pp. 215-23 (see p. 223).

6 *Indian Industrial Commission-Inspection Notes*, *Op. Cit.,* p. 24.

7 Morris D Morris, ‘The Growth of Large-Scale Industry to 1947’, in Dharma Kumar (ed.), *The Cambridge Economic History of India*, *Vol. II, c. 1757-2003*, Orient BlackSwan in association with CUP, New Delhi, 2010, pp. 553-676. (see p. 586).

8 *The Imperial Gazetteer of India,Vol-VI*, Oxford Clarendon Press, 1908, p. 426.

9 ‘*Kulti Works’, Op. Cit.*

10 A. Z. M. Iftikar-Ul-Awwl, *The Industrial development of Bengal, 1900-1939*, Vikash Publishing House P. Ltd., New Delhi, 1982, p. 23.

11 Amiya Kumar Bagchi ‘*Private Investment in India 1900–1939’,* Cambridge University Press; 1st edition, Cambridge, 1972, p. 331.

12 The Steel Corporation of Bengal (SCOB) began producing steel in 1939 and was merged with IISCO in 1953. Thus, IISCO became country´s third integrated steel plant. The earlier two integrated steel plants were the TISCO and the Mysore Iron and Steel Works (MISW). TISCO was established in 1907 and the steel section of the MISW was started in 1936.

13 N. R. Srinivasan, *History of the Indian Iron and Steel Company*, Public Relations Department of IISCO, Burnpur, 1983, p. 116.

14 Nirban Basu, ‘Trade Unionism Among Steel Workers of Bengal on the Eve of Independence (1945-47) ’, *Indian History Congress:*

Proceedings, Vol. 61, Part One, 61st (Millennium) Session, Modern India, 2000-2001, pp. 902-908, (see p. 902.).

15 Nirban Basu, 'Labour against bondage and exploitation: A study of the movement of industrial labour in burdwan district in colonial period', in Tridibsantapa Kundu (ed.), *Exploring New Aspects of Indian History*, Levant Books, Kolkata, 2013, pp. 1-14 (see p. 6)

16 *Ibid.,* p. 6.

17 Nirban Basu (2001)*, Op. Cit.,* p. 902.

18 Nirban Basu, (2013), *Op. Cit*., p. 6.

19 *Ibid*.

20 *Ibid*, p. 7.

21 Nirban Basu (2001)*, Op. Cit.,* p. 902.

22 N. R. Srinivasan, *Op. Cit*., p. 116.

23 *Ibid.*

24 *Ibid.,* pp, 58-59.

25 Nirban Basu (2001)*, Op. Cit*., p. 902-3.

26 N. R. Srinivasan, *Op. Cit*., p. 116.

27 Nirban Basu (2001)*, Op. Cit.,* p. 903.

28 *Ibid*.

29 *Ibid*.

30 Nirban Basu, (2013), *Op. Cit*., p. 7.

31 Nirban Basu (2001)*, Op. Cit.,* p. 904.

32 Nirban Basu, (2013), *Op. Cit*., p. 7.

33 N. R. Srinivasan, *Op. Cit*., p. 116.

34 *Ibid*.

35 *Ibid*., pp. 116-117.

36 D. R. Gadgil, *The Industrial Evolution of India in Recent Times,* 4th ed., Oxford University Press, Bombay, 1942, p. 275.

37 Nirban Basu (2001)*, Op. Cit.,* p. 902.

38 Nirban Basu, (2013), *Op. Cit*., p. 9.

39 *Ibid.*

Tebhaga movement in Nadia district

Bhabananda Roy
Assistant Professor in History
Department of History
Ranaghat College

Abstract: Tebhaga peasant movement also appeared in the Nadia district. The communist movement came to life in Nadia through this movement. This Tebhaga movement was organized by the Communists' 'Bengal Provincial Krishak Sabha'. The 'Bengal Provincial Krishak Sabha' has always been agitating for the demands of the sharecroppers. At the end of the Second World War, the level of exploitation of landlords and zamindars increased anew. An intense Tebhaga movement took place in different parts of Bengal against this. The wave reached Nadia along with other parts of Bengal.[i] Since 1943, peasant movements have been taking place in Poradaha, Khoksa-Janipur villages of Kushtia subdivision of Nadia, various villages of Tehatto police station of Meherpur subdivision, and rural areas adjoining Shantipur and Palashipara and Sahebnagar areas. The main demands of the Tebhaga movement were to give one-third of the crop to the sharecroppers instead of giving half of the crop to the sharecroppers, to stop eviction from the land and to increase the wages of the *Khatmajur*. Through these movements, the undisputed peasant leaders of the district emerged as Comrade Nalini Mandal, Comrade Samarendranath Sanyal, Comrade Bimal Pal (grandfather of RCPI leader Kanai Pal), Comrade Chandicharan Bhowmik, and Comrade Kanaiya Kundu.[ii] Through this peasant movement, the communists became popular in Nadia.

Key Words : Tebhaga, Jotdar, Khatmajur, Krishok Sabha, KrishakPraja Party, Adhiyar

Main Article

Tebhaga peasant movement also appeared in the Nadia district. The communist movement came to life in Nadia through this movement. This Tebhaga movement was organized by the Communists' 'Bengal Provincial KrishakSabha'. The 'Bengal Provincial Krishak Sabha' has always been agitating for the demands of the sharecroppers. At the end of the Second World War, the level of exploitation of landlords and zamindars increased anew. An intense Tebhaga movement took place in different parts of Bengal against this. The wave reached Nadia along with other parts of Bengal.[iii] Since 1943, peasant movements have been taking

place in Poradaha, Khoksa-Janipur villages of Kushtia subdivision of Nadia, various villages of Tehatto police station of Meherpur subdivision, and rural areas adjoining Shantipur and Palashipara and Sahebnagar areas. The main demands of the Tebhaga movement were to give one-third of the crop to the sharecroppers instead of giving half of the crop to the sharecroppers, to stop eviction from the land and to increase the wages of the *Khatmajur*. Through these movements, the undisputed peasant leaders of the district emerged as Comrade Nalini Mandal, Comrade Samarendranath Sanyal, Comrade Bimal Pal (grandfather of RCPI leader Kanai Pal), Comrade Chandicharan Bhowmik, and Comrade Kanaiya Kundu.[iv] Through this peasant movement, the communists became popular in Nadia.

The 'KrishakPraja Party' and *'Krishak Samiti'* under the leadership of Mr. Shamsuddin Ahmed joined the 'Tebhaga' movement in Poradaha area. Comrade Suresh Roy of KhoksaJanipur area, Comrade Shashank Biswas (of Ishwardi region), Comrade TarapadSaha, and Comrade Azizur Rahman (of Khoksa region) led the movement of 'Tebhaga' and 'Stop Eviction'. Later came Comrade Shahabuddin Mandal (one of the leaders of the peasant movement of Tehtato police station).[v] Comrade MadhabenduMohant led the movement in Tehatto, Palashipara, and Hanspukur areas of Meherpur subdivision of Nadia. Many peasant activists like Comrade Nasiram Das, Comrade Nalini Mandal led the movement. Radhakantapur was the main office of the *Krishak Samiti*. Thus, the Tebhaga peasant movement in the Nadia district of Bengal was particularly instrumental in the development of leftist political ideology.

The main demand of the Tebhaga movement

The 'Tebhaga movement is a movement in which the peasant community divides the total crop produced from its share of land into four parts, claiming that three-fourths of the crop is due to them. The main demands of the peasant community in this movement were-

1. Not half; he wants Tebhaga,
2. Will not be distributed without a receipt,
3. No more than five *Ser* of interest will be paid,
4. No bad pay will be made,
5. Cannot be evicted from the land.[vi]

These were the minimum demands of the farmer. The sole purpose of those who owned the land was to rob the peasants of everything on the basis of ownership; Farmers have the right to take back their land. The owners have no moral right to collect a single grain of paddy. On the other hand, these demands of Tebhaga are for the survival of the

sharecroppers, the only way to save the working class, middle class, and poor peasants from the exploitation of the crop hoarders. None of the laws of this country were punishable or illegal. Even before the war (World War II), the Land Revenue Commission justified this claim. E.g.
1. The owner cannot collect more than one-third of the crop,
2. The sharecropper must give tenancy to the land.[vii]
But the owners did not follow this instruction. On the other hand, despite the increase in the cost of farming and household expenses, as the Tebhaga system was not introduced, the peasants jumped into the movement to demand Tebhaga.Which enlivened the leftist movement in Bengal.

Only to continue the imperialist exploitation did the British form the law and social system in Bengal as their own. So, the peasants collectively planned that in the only way of struggle, laws would be made in exchange for the blood of countless peasants. The peasants of Bengal took this resolution. Since land and crops are in the hands of Zamindars and *Jotedars*, the only way to get rid of them is to struggle. After harvesting, they forced *Adhiyar*(sharecropper) to take all the paddy on the threshing floor of the landlords. At his opportunity, the landlord collects half of the share crops, collects the 'abwab', and collects the arbitrary interest. On this occasion,*Jotdars* chased *Bargadar* (sharecropper) away from the market.[viii] The peasant community plans to protest against this through a movement. That is why the peasant community raised one of the slogans of the Tebhaga movement, 'Raise paddy on your own farm'. Within this slogan, the peasants of Nadia and Bengal have united, which has accelerated the rise of communists in Nadia and Bengal.

***'NijKhamare Dhan Tolo'* ('Raise paddy on your own farm')**

NijKhamare Dhan Tolo' ('Raise paddy on your own farm')- was one of the slogans of the Tebhaga movement. If the sharecropper can grow paddy in his house, then the crop will be in his possession. Then '*Adhiyar'* (sharecropper) can survive the oppression of the landlord. So, at the very beginning of the battle of Tebhaga, the issue came up whether the harvested crops belonged to the landlord or the *Adhiyar*. The sharecropper claimed that the crop would grow in his house.[ix] In this way, the sharecroppers gradually became aware of their own rights and started a movement. The leaders of all these peasant movements were mainly the communists of Nadia and Bengal. This paved the way for the political rise of the communists.

***'Jan DiboTabuo Dhan Debo Na'* (We will give life, but we will not give paddy)**

This was one of the slogans of the sharecroppers of the Tebhaga movement. This slogan was uttered on the day of the movement. The farmers knew that if the crop was lost, it could not be saved from being swallowed by the giant of the landlord. So, they decided, *'Jan DiboTabuo Dhan Debo Na' ('*We will give life, but we will not give paddy')- the Tebhaga struggle started in 1946 in Dinajpur. The 'Tebhaga' movement spread from the northern Terai of Bengal to the southern Kakdwip.[x] This sound is echoed in thousands of villages. On the one hand, the bureaucracy, the police, and the military are standing in front of the landlords; on the other hand, a group of unarmed famine-stricken, diseased skeletal peasants is in the middle of a horizontal paddy field. The struggle for possession of crops is going on in the days of the movement. Money, police, sticks, and guns are all theirs. Nevertheless, the peasants continued to win in the movement in different parts of Bengal. This victory of the peasants helped in the spread of communism in Nadia and Bengal.

'Taratari Dhan Kato, NijoKhamare Dhan Tolo' (Quickly cut the paddy, raise the paddy on your own farm'

'Taratari Dhan Kato, NijoKhamare Dhan Tolo' ('Quickly cut the paddy, raise the paddy on your own farm')- was also one of the slogans of the sharecroppers in the Tebhaga movement. The British power tried to suppress the peasant movement by inventing the following strategies :

1. Sometimes, the imperialist power offers to compromise directly or through the district government officials,
2. The authority tried to create a dispute between Hindu and Muslim peasants,
3. Since the interests of the middle class would be harmed, the British tried to take the middle class into their fold,
4. The British government forced police and bureaucrats to persecute the agitators,
5. An attempt was made to destroy the faith of the peasantry.[xi]

The agitators had planned against this and did not fall into the trap of the imperialist powers. They decided to cut the paddy quickly and raise it on their own farm. Paddy should be cut and taken home without any hindrance. I will cut the paddy I make, and there is no law, policy, or religion to stop it. If anyone interferes in this, we will not accept that obstacle. The more obstacles come, the harder we must cut the paddy and raise the paddy on our own farm. They decided that if the police-imposed section 144 against the movement, it would be illegal, and the peasants would run their own section against it - cut the paddy and take it home.

'Dhan Kete TulboGhore, BadhaDiboChurmar Kore' ('We will cut the paddy and take it home; We will crush the resistance')[xii]- this is the main voice of Tebhaga's fight. Thus, the Tebhaga movement turned into a spontaneous peasant movement.

There was talk of compromise by reducing Tebhagar's demand. But farmers can never forget that 'farming is their land'. The landlord does not spend anything on the land, sits down, and loots the profits under the imperialist law. Therefore, he does not have the right to receive even a single grain. So, the peasants want to give one-third, which is also his compromise; If Tebhaga does not agree to the compromise, the landlord will not get that either.[xiii] The protesters responded. 'There is no compromise on Tebhaga reduction' - this was the second response of the peasants in the Tebhaga movement.

Not only did the *Zamindar-Jotdars* try to sow discord among the Hindu-Muslim peasants, but they also tried to separate the *Adhiyars* from the peasants and farm laborers. Moreover, they tried to convince peasants that the battle of Tebhaga, would bring profit to *Adhiyar*, so there was no need for other farmers to get involved in it. The landlords tried to mislead agitators. Tebhaga's fight was against the landlord. The landlords left the land fallow, and the farm laborers were dying ofa lack of land. Although the poor farmers had land, in future his land would go to the landlord. If the battle against the landlord-zamindar was won, the landlord himself would be destroyed, and the farm laborer would get the land. The poor peasant would be freed from the horror of land becoming *khas*. So, with the Tebhagar struggle, the farmers' associations declared- 'Land should not be left fallow'. Protesters raised their voices- 'cultivate fallow land'. "There is no more interest than 5 *Ser* (Measurement of weight) on loan."[xiv] In this way, the peasant associations of the Tebhaga movement got united and took the movement forward. It helped the leftist attitude to spreads.

Associations associated with the Tebhaga movement understand that the Tebhaga struggle will unite all peasants. That is why the associations decided that 'Krishak Samiti' should be formed in every village and union, and it should be seen that there should be no male or female farmer outside the association. Where there is a big association, there will be victory. So cut the check of the association, form the association, and become all the farmer members. This is our greatest task.[xv] By planning in this way, by uniting the peasants, by emphasizing on the formation of associations, the Tebhaga movement took a strong

form all over Bengal, which played a major role in the rise of communists in Bengal.

The Tebhaga peasant movement was strong and well-planned for their proper planning. They formed the 'Peasant Volunteer Force' to strengthen the movement. Supporters of the fight recruited women, men, teenagers, young and old as volunteers.[xvi] As a result, the movement took an organized form, which helped in the political rise of the communists in Bengal.

The work of the Peasant Volunteer Force

The task of the 'Peasant Volunteer Force' to ensure the completion of the Tebhaga movement was as follows:

Keep an eye on the movements of the landlords, the police, and their spies. Maintain connectivity between different areas. The news of the arrival of the guard, the landlord's stick or the police came running and informed beforehand. The volunteer department was opened to keep them informed and on guard. The signal of the news was like this- bell, *kashar*, playing conch.[xvii]

The Tebhaga Committee was formed to carry out the movement smoothly. The functions of that committee are as follows-

1. Arrangements were made for publicity, meetings, book sales, etc., with the aim of supporting the movement among the peasants of all parties and at all levels. To make arrangements so that the middle class, peasants, women, and other patriotic organizations do not have any misconceptions about the movement and come forward in support of the movement.
2. Keeping an eye on the movements of landlords and police, maintaining connectivity between different areas. Sending volunteer teams from one area to another.
3. To set up a 'Case Prosecution Committee' in the city for litigation, to collect money in the area, and to employ honest but experienced people for litigation. Arrange for prosecution as soon as the fight is over.
4. The task of solving all new problems and difficulties is entrusted to this committee.
5. If there is a difference of opinion in the committee, it is usually necessary to give an opportunity to all the members of the committee to express their views in the farmers' meeting and then the committee has to work according to the general decision.
6. If a farmer is arrested or forced to stay away from home for any reason, this committee is responsible for his family rearing, farming, crop protection, litigation, etc.

7. The committee has to do the other work of the education system and the organization of the volunteers.
8. Boycotts or other punishments are often required to punish *Jotdars* and other enemies. This committee has to decide about this too. In case of disagreement, the verdict of the people must be followed in all cases.[xviii]
The Tebhaga Committee made various appeals to the farmers to strengthen the Tebhaga movement, one of which was:

Farmers have to stand up against the unjust exploitation of *Zamindar-Jotdars*. In order to defeat the peasantry in the fair fight of Tebhaga, the imperialist power has sided with the landlord with its police, weapons, sticks, and guns. A police camp has been set up at *Jotdar's* house to provide security to them. According to the landlord, search warrants are being issued for snatching paddy from sharecroppers, unarmed farmers are being fired upon, farmers are being arrested irrespective of gender, and police and landlords are brutally beating them. Section 144 is even being issued to stop paddy harvesting. Meetings, and processions, are being closed by issuing section 144. Today, the imperialist power is desperate to stand up to the *Jotedar-Zamindars* to crush this peasant uprising. Farmers have to stand up against this. However, 5 million peasants have sworn that they will not bow to this barbaric oppression.[xix] By making these statements, the Tebhaga Committee made the peasants agitate. The movement is so widely organized that they are shaken by the fear of the imperialist powers. This movement played a significant role in the rise of communists in Nadia and all over Bengal.

References

---

[i] Anil Biswas (Editor-in-Chief), Rabin Dev, Shyamal Sengupta, Aniruddha Chakraborty, Dilip Banerjee, Saral Biswas (Editorial Board), *Banglar Communist Andolan Dalil O Prasangik Tattha,* (Volume II), National Book Agency Private Limited, September 2003, P. 93.

[ii] Basu Acharya, *Comrade Sushil Chattopadhyay – Ek Bismritopray Biplobi*, (Basu Acharya: Editor, Sushil Chattopadhyay Ek Anonya

Communist Biplobi), Navjatak Prakashan, Calcutta, January 2021, P. 41.

[iii] Anil Biswas (Editor-in-Chief), Rabin Dev, Shyamal Sengupta, Aniruddha Chakraborty, Dilip Banerjee, Saral Biswas (Editorial Board), *Banglar Communist AndolanDalil O PrasangikTattha,* (Volume II), National Book Agency Private Limited, September 2003, P. 93.

[iv]Basu Acharya, *Comrade Sushil Chattopadhyay – Ek BismritoprayBiplobi*, (Basu Acharya: Editor, Sushil Chattopadhyay Ek Anonya Communist Biplobi), NavjatakPrakashan, Calcutta, January 2021, P. 41.

[v]Amritendu Mukherjee, *KrishokAndolone Nadia Jela*, 'Paschimbanga', Episode of Nadia Districts, 1404 BS, Department of Information and Culture, Government of West Bengal, P. 67.

[vi] Anil Biswas (Editor-in-Chief), Rabin Dev, Shyamal Sengupta, Aniruddha Chakraborty, Dilip Banerjee, Saral Biswas (Editorial Board), *Banglar Communist AndolanDalil O PrasangikTattha,* (Volume II), National Book Agency Private Limited, September 2003, P. 94.

[vii] Anil Biswas (Editor-in-Chief), Rabin Dev, Shyamal Sengupta, Aniruddha Chakraborty, Dilip Banerjee, Saral Biswas (Editorial Board), *Banglar Communist AndolanDalil O PrasangikTattha,* (Volume II), National Book Agency Private Limited, September 2003, P. 94.

[viii] Anil Biswas (Editor-in-Chief), Rabin Dev, Shyamal Sengupta, Aniruddha Chakraborty, Dilip Banerjee, Saral Biswas (Editorial Board), *Banglar Communist AndolanDalil O PrasangikTattha,* (Volume II), National Book Agency Private Limited, September 2003, PP. 94-95.

[ix] Anil Biswas (Editor-in-Chief), Rabin Dev, Shyamal Sengupta, Aniruddha Chakraborty, Dilip Banerjee, Saral Biswas (Editorial Board), *Banglar Communist AndolanDalil O PrasangikTattha,* (Volume II), National Book Agency Private Limited, September 2003, P. 95.

---

[x]Suprakash Roy, *Tebhaga Sangram*, Radical Impressions, Calcutta, Third Edition, January 2019, p. In part from the publisher.

[xi] Anil Biswas (Editor-in-Chief), Rabin Dev, Shyamal Sengupta, Aniruddha Chakraborty, Dilip Banerjee, Saral Biswas (Editorial Board), *Banglar Communist AndolanDalil O PrasangikTattha,* (Volume II), National Book Agency Private Limited, September 2003, P. 96.

[xii] Anil Biswas (Editor-in-Chief), Rabin Dev, Shyamal Sengupta, Aniruddha Chakraborty, Dilip Banerjee, Saral Biswas (Editorial Board), *Banglar Communist AndolanDalil O PrasangikTattha,* (Volume II), National Book Agency Private Limited, September 2003, P. 96.

[xiii] Anil Biswas (Editor-in-Chief), Rabin Dev, Shyamal Sengupta, Aniruddha Chakraborty, Dilip Banerjee, Saral Biswas (Editorial Board), *Banglar Communist AndolanDalil O PrasangikTattha,* (Volume II), National Book Agency Private Limited, September 2003, PP. 96-97.

[xiv] Anil Biswas (Editor-in-Chief), Rabin Dev, Shyamal Sengupta, Aniruddha Chakraborty, Dilip Banerjee, Saral Biswas (Editorial Board), *Banglar Communist AndolanDalil O PrasangikTattha,* (Volume II), National Book Agency Private Limited, September 2003, P. 94.

[xv] Anil Biswas (Editor-in-Chief), Rabin Dev, Shyamal Sengupta, Aniruddha Chakraborty, Dilip Banerjee, Saral Biswas (Editorial Board), *Banglar Communist AndolanDalil O PrasangikTattha,* (Volume II), National Book Agency Private Limited, September 2003, P. 98.

[xvi] Anil Biswas (Editor-in-Chief), Rabin Dev, Shyamal Sengupta, Aniruddha Chakraborty, Dilip Banerjee, Saral Biswas (Editorial Board), *Banglar Communist AndolanDalil O PrasangikTattha,* (Volume II), National Book Agency Private Limited, September 2003, P. 98.

[xvii] Anil Biswas (Editor-in-Chief), Rabin Dev, Shyamal Sengupta, Aniruddha Chakraborty, Dilip Banerjee, Saral Biswas (Editorial

Board), *Banglar Communist AndolanDalil O PrasangikTattha,* (Volume II), National Book Agency Private Limited, September 2003, P. 99.

[xviii] Anil Biswas (Editor-in-Chief), Rabin Dev, Shyamal Sengupta, Aniruddha Chakraborty, Dilip Banerjee, Saral Biswas (Editorial Board), *Banglar Communist AndolanDalil O PrasangikTattha,* (Volume II), National Book Agency Private Limited, September 2003, P. 100.

[xix] Anil Biswas (Editor-in-Chief), Rabin Dev, Shyamal Sengupta, Aniruddha Chakraborty, Dilip Banerjee, Saral Biswas (Editorial Board), *Banglar Communist AndolanDalil O PrasangikTattha,* (Volume II), National Book Agency Private Limited, September 2003, P. 101.

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice aYear

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

www.ebongprantik.in

Ebong Prantik

2582 3841

Ebong Prantik

2348 487X

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102
Ph : 9804923182, 8250595647
Email : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

₹ 700/-